পূজাবার্ষিকী ১৩৯১
আনন্দমেলা

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ডকপি : রতীশ সরকার ও রাজর্ষী সরকার

স্ক্যান : মাথব রায়

এডিট : সুজিত কুন্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

দুর্গাপূজার আনন্দঘন দিনগুলি আবার এল,
অমঙ্গলের হোক চির অবসান…
আজকের এই শুভক্ষণে আপনার ত্বকের
সম্পূর্ণ পরিচর্যার দায়িত্ব নিয়ে আবার এল…
ROUND THE YEAR
FOR PROTECTION
OF YOUR SKIN...
Borocalendula® ANTISEPTIC CREAM
বোরো ক্যালেনডুলা*
অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম
বোরোক্যালেনডুলা অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম মাখুন আপনার ত্বক স্বাভাবিক ও সুস্থ রাখুন।
HL হ্যানিম্যান ল্যাবোরেটরী, কলিকাতা-১২
* A PATENT AND PROPRIETARY HOMOEOPATHIC MEDICINE OF HAHNEMANN LABORATORY, CALCUTTA-12
anjan chakraborty, Cal-74

বিশেষ রচনা

উপন্যাস

চিত্র-কাহিনী

গল্প

কবিতা ও ছড়া

পরীক্ষার্থীদের জন্য

বিজ্ঞানবিচিত্রা

খেলাধুলো

ধাঁধা, শব্দসন্ধান

প্রচ্ছদ : বিমল দাস

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাপ্পাদিতা রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত । দাম চব্বিশ টাকা ।

Alliance-600
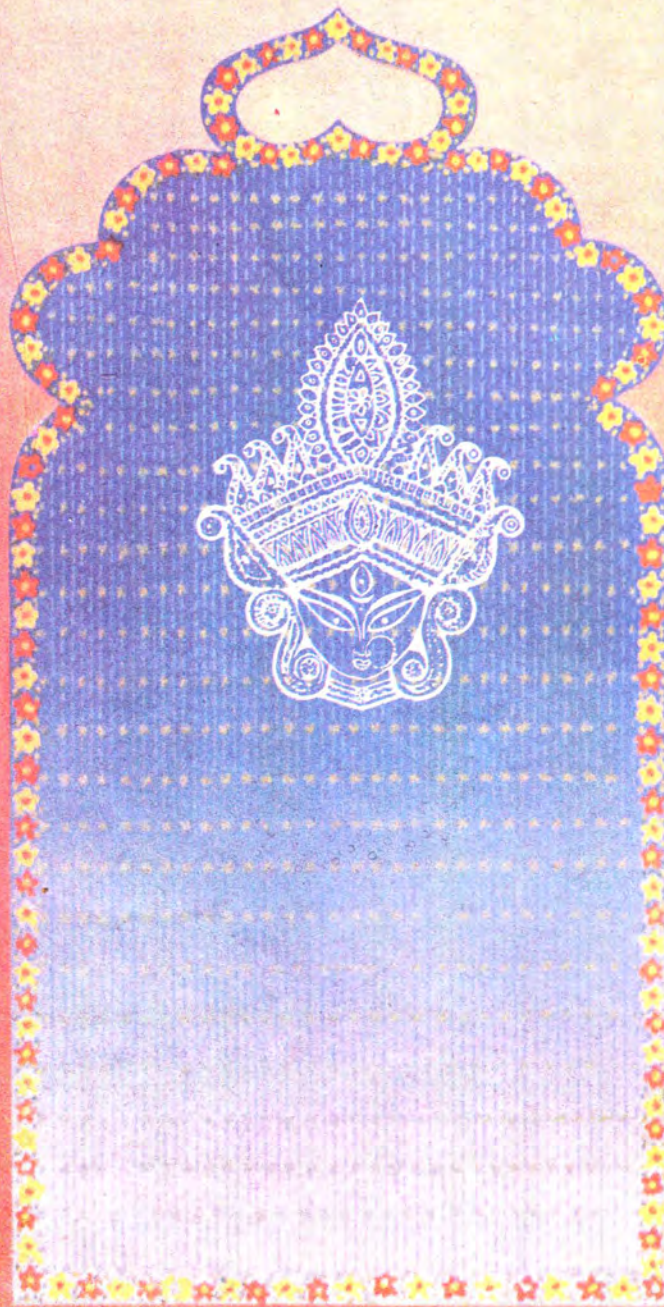
পূজার পাঁচালি

সুকুমার সেন

আমরা চিরকাল শুনে আসছি, দুর্গাপূজা বাঙালির জাতীয় উৎসব। বাঙালিদের দুর্গাপূজা উৎসব বটে, কিন্তু 'জাতীয়' কেন? অবশ্য এখনকার দিনে দেশে বিদেশে যেখানে কিছু বাঙালি থাকে, সেখানে কিছু দুর্গাপূজা হয়—ঘটাপটা করেও হয়, কিন্তু এ তো এখনকার কথা। আগে কী ছিল? আগে ছিল পূর্ব ভারতের সব অঞ্চলের উৎসব। এখনও মৈথিলীরা দুর্গাপূজা করে, অসমিয়ারা করে, ওড়িয়ারাও করে।

কিন্তু এইজন্যেই কি 'জাতীয়' বলব?

হ্যাঁ, জাতীয় বলব অনেকটা এই কারণেই। এই সব অঞ্চল চিরকাল ধান্যোপজীবী। আজ থেকে হাজার দেড়-হাজার বছর আগে এ-দেশে ফসলের দেবী যিনি ছিলেন, তিনিই আমাদের ওরিজিন্যাল দুর্গাদেবী। সেকালে আমন ধানের প্রচলন ছিল না, ছিল 'সাটি' বা সটি ধানের। সে-ধান ষাট দিনের মধ্যে পেকে যেত। একেই এখন আমরা 'শালি' বা 'কলমা' ধান বলি। এ-ধানের চাষ এখনও প্রচুর হয়। যেমন—নাগরাশাল, রামশাল, সীতাশাল, জটাকলমা ইত্যাদি।

এই ধান্যমাতা দেবীর আসল নাম ছিল শারদা। এই দেবীর পূজাই শারদীয়া পূজা। এ-পূজা শরৎকালে হয়। আমাদের শাস্ত্রে গল্প ফাঁদা হয়েছে, শারদীয়া দুর্গাপূজা দেবতাদের নিদ্রাকালে

ছবি করুণা সাহা

সংঘটিত হয় বলে দীর্ঘকাল ধরে দেবীর ঘুম ভাঙাতে হয়, সেইজন্য আসল পূজার আগে থেকে বোধন-পূজা শুরু হয়ে যায়। আসল কথা হল এই যে, শারদা দেবী বৈদিক আমলে পরিচিত ছিলেন ঊষা নামে। এঁর পূজা (যজ্ঞ নয়) হত ঊষাকালে। তাই ঊষার পূজার নামই ছিল বোধন। দীর্ঘকাল পরে ঊষা উমা হৈমবতী ও শারদা দেবীতে পরিণত হলেন, কিন্তু তাঁর বোধন-পূজা রয়েই গেল। যাঁরা নবীন শাস্ত্র লিখেছিলেন, তাঁরা বৈদিক ঊষার সঙ্গে শারদা দেবীর সম্পর্ক জানতেন না। তাই বোধনকে বলতে হয়েছে অকালে পূজার জন্য অতিরিক্ত পূজার নিবেদন।

এখনকার দুর্গাপূজায় সাধারণত ষষ্ঠীর আগে কোনো বোধনের অনুষ্ঠান হয় না। এ-বোধন হয় ষষ্ঠীর দিন অপরাহ্ণে বেলগাছের তলায়। এ-বোধন দেবীপূজার অঙ্গীভূত, সর্বত্রই হয়। কিন্তু অনেক বাড়িতে পূজায় দু'রকম অতিরিক্ত বোধন-ব্যবস্থা দেখা যায়। এক রকম হল 'প্রতিপদাদিঃ কল্পারম্ভ' মানে মহালয়ার পরদিন প্রতিপদ থেকে প্রত্যহ সকালবেলায় দেবীর বোধন ষষ্ঠী পর্যন্ত। আর এক রকম হল 'নবম্যাদি কল্পারম্ভ' অর্থাৎ মহালয়ার আগে যে কৃষ্ণানবমী, সেইদিন থেকে ষষ্ঠীর দিন সকাল পর্যন্ত।

দেবী যদি ফসলের দেবতা হন, তাহলে তাঁর প্রতিমা দশভুজা মহিষমর্দিনী কেন ? এ-প্রশ্ন আজ পর্যন্ত কেউ উত্থাপন করেননি। কিন্তু আমার মনে হয়, সকলেই কখনও না কখনও এ-কথা ভেবেছেন। একটু ভাবলেই এর উত্তর মিলে যাবে। ফসলের দেবী যখন উমা-হৈমবতীর মধ্য দিয়ে এসে মার্কণ্ডেয় পুরাণের মহাদেবীতে পরিণত হন এবং উত্তরাপথে সর্বত্র প্রচারিত মহিষমর্দিনীর সঙ্গে এক হয়ে যান, তখন থেকে শিল্পে বহুপ্রচলিত মহিষমর্দিনী মূর্তিটি পূজার প্রতিমারূপে গৃহীত হতে থাকে। এবং সেই সূত্রে চণ্ডীপাঠ সেই সময় থেকে দুর্গাপূজার কালে অবশ্যকতর্ব্য হয়ে যায়।

গোড়ার দিকে সে-প্রতিমায় লক্ষ্মী সরস্বতী ও কার্তিক-গণেশ ছিল না। সেগুলি পরবর্তী কালে পূর্ব ভারতে পূজিত দুর্গাপ্রতিমায় আরোপিত হয়েছে। দুর্গা সংসার-সম্পদের দেবী, তাই লক্ষ্মী এসেছেন, এবং সম্পন্ন গৃহস্থরা লেখাপড়া ভালবাসে, তাই সরস্বতী আছেন। কন্যা যখন আছে তখন পুত্র অবশ্যই থাকবে। এক আদুরে ছেলে কার্তিক, আর এক গোঁয়ার ছেলে গণেশ। গণেশ আর-একটি গুণের জন্যেও এসে থাকবেন, কেননা তিনি যে বিঘ্নহন্তা, এবং তাঁর বাহন ইঁদুর গৃহস্থের ধান্য সঞ্চয়ের প্রধান শত্রু। সুতরাং এঁদের সন্তুষ্ট করতেই হয়।

দুর্গাপূজা যে বাঙালির জাতীয় উৎসব, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত প্রথম পাই বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে, (রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ)। তিনি লিখেছেন

মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে সর্ব ঘরে
দুর্গোৎসব কালে বাদ্য বাজাবার তরে।

এর থেকে বোঝা যায় যে, তখনকার দিনে সম্পন্ন গৃহস্থ মাত্রই দুর্গোৎসব করতেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় পৌঁছে দেখি দেবী সম্পন্ন গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপ থেকে নেমে এসে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সব ঘরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে গৃহিণীর কোলে বসেছেন সেকালে বাঙালি মায়েদের একটা সার্বজনিক মনোবেদনা ছিল মেয়েকে নিয়ে। মেয়েকে বিয়ে দিতে হত অল্প বয়সেই, সাত-আট থেকে ন-দশ বছরের মধ্যে। বিয়ে হলেই সেই যে শ্বশুরবাড়ি যেত, আর প্রায়ই তার বাপের বাড়ি আসা ঘটত না। কেননা, তখন শহর ছিল না। পাড়াগাঁয়েও বসতি ঘিঞ্জি নয়। তাই বিবাহ হত দূরে দূরে। এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় আসা পুরুষের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল, কিন্তু মেয়েদের পক্ষে, বিশেষ করে ছোট মেয়েদের পক্ষে, কিছুতেই নয়। তাই তখনকার দিনে মেয়ের মায়েদের বেদনা শুরু হত মেয়ে জন্মাবার পর থেকেই। প্রমাণ এই পুরনো মেয়েলি ছড়াটি,

দোল দোল দুলুনি,
রাঙা মাথায় চিরুনি।
বর আসবে যখুনই,
নিয়ে যাবে তখুনই ॥

দুর্গাপূজায় বাঙালি মেয়েরা কন্যা হারানোর এই ব্যাপক বেদনা থেকে কিছুদিনের জন্য মুক্তির সন্ধান পেতেন। বাঙালির সংস্কৃতির একটু বিশেষ কমনীয়তা এইভাবে ধরা পড়েছে আমাদের দুর্গাপূজায়।

দুর্গাপূজা সাধারণ পূজা নয়। সাধারণ পূজা একদিনেই চুকে যায়। দুর্গাপূজা চারদিন ধরে হয়, ষষ্ঠীর বোধন ধরলে পাঁচদিন, আর নবম্যাদি কল্পারম্ভ ধরলে সতেরো দিন। এরকম যজ্ঞ-ব্যবস্থা বৈদিক আমলেও ছিল। সেরকম যজ্ঞ-উৎসবকে বলত সত্র। আমরাও তাই দুর্গাপূজাকে দুর্গোৎসব-সত্র বলতে পারি।

আবার প্রতিমার কথায় ফিরে যাই। মহিষমর্দিনীর মূর্তিতে দেবীকে উপাসনা করেছিলেন দেবতারা, মহিষাসুরের পরাজয়ের পর। আমাদের দেবীর অন্য মাটি-মূর্তিও ছিল। তা হল অভয়া-মূর্তি। এ-মূর্তি পদ্মাসনে বসে আছেন পা ঝুলিয়ে। বাঁ হাত তুলে অভয় দিচ্ছেন, ডান হাত প্রসারিত করে বর দিচ্ছেন, লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশ ইত্যাদি চালচিত্র সবই আছে। নেই শুধু সিংহ অসুর ও মহিষ। কিন্তু মূর্তি-পূজা চলিত হবার আগে দেবীর পূজা হত শুধু ঘটে। এখনও ঘট আছে, এবং সেইটিই দেবীর আসল প্রতীক।

প্রথমেই যে-কথা বলা উচিত ছিল, এখন সেটুকু সেরে নিই। সে-কথা হল দুর্গা শব্দটির মানে কী ? (এখানে বলে রাখি, অনেকেই নামটি 'দূর্গা' লেখে, তা ঠিক নয়।) ইতিহাসের অনুসরণ করলে দুর্গা নামের আসল অর্থ ধরতে হয় দুর্গমস্থানবাসিনী দেবী। অর্থাৎ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে বর্ণিত দেবী অরণ্যানী, যিনি পরবর্তী কালে পুরাণে বিন্ধ্যবাসিনী নামে পরিচিত। দেবীর যে স্বরূপের পূজা আমরা করি, তা বিবেচনা করলে দুর্গা নামটির মানে করতে হয়—যে দেবী মুশকিল-আসান করেন। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে প্রাপ্ত দেবতাদের স্তবে দেবী-নামের এই অর্থই আমরা পাই— 'দুর্গেস্মৃতা

হরাসভীতিম্ অশেষজন্তোঃ' অর্থাৎ 'সঙ্কটে পড়লে সব প্রাণীরই ভয় তুমি হরণ করো'।

এই মুশকিল-আসান দেবীর সঙ্গে মহিষমর্দিনী রূপের একটি ক্ষীণ অথচ দৃঢ় ঐতিহাসিক যোগসূত্র পাওয়া যায়। সে-কথা অনেকেই জানেন না, তাই এখানে সংক্ষেপে বলছি। আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে এশিয়া মাইনরে ফ্রিজীয় নামে (**Phrygian**) এক জাতি বাস করতেন। ভাষার দিক দিয়ে তাঁরা গ্রিকদের ও আমাদের সগোত্র। এঁরা এক দেবীর উপাসনা করতেন। তিনি সিংহবাহিনী আমাদের দুর্গার মতো। এই দেবীর মূর্তি মিলেছে দুর্গম পাহাড়ের উঁচুতে খোদাই করা গুহায়। এ-দেবীর বাহন সিংহ, দেবীর হাতে ত্রিশূল। আমাদের মহিষমর্দিনী দেবীরও বাহন সিংহ, হাতে ত্রিশূল। ফ্রিজীয় ভাষায় দেবীর নাম ছিল 'গদান-মা'। সংস্কৃতয় আক্ষরিক অনুবাদ করলে দাঁড়ায় 'ক্ষম্-মা'। সংস্কৃতে নামটি সংক্ষিপ্ত 'ক্ষমা' হয়ে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেবতা স্তবে গৃহীত হয়েছে। ফ্রিজীয় নামটির অর্থ হল, পৃথিবী-মা। সংস্কৃত 'ক্ষমা' শব্দেরও সেই অর্থ।

তত্ত্বকথা অনেক হল, এবার আত্মকথা কিছু বলি। "আশ্বিনের মাঝামাঝি / উঠিল বাজনা বাজি / পূজার সময় এল কাছে"— ঢাকের বাদ্যি কানে গেলেই এই বুড়ো বয়সেও বুকে মোচড় লাগে। শৈশব বাল্যের মধুর স্মৃতি আমি এখনও ভুলতে পারিনি। যেমন আমার ছ'মাস বয়সের দেওয়া টিকার দাগ এখনও মোছেনি, তেমনি। আমাদের বাড়ির পূজা বহুকালের। লোকে বলে, চৌদ্দ পুরুষের। আমি জানি, তিনশো বছরের কম নয়। আমাদের দেবীপ্রতিমা দশভুজা মহিষমর্দিনী নন, দ্বিভুজা বরাভয় দাত্রী অভয়ামূর্তি। আমাদের দুর্গাপূজা চার-পাঁচদিনের নয়, সতেরো দিনের। আমাদের বোধন আরম্ভ হয় কৃষ্ণপক্ষের নবমী থেকে। সুতরাং আমাদের পূজার আনন্দের দিন সংখ্যায় বেশি ছিল।

পূজার মজা অনেক রকমের, অনেক ধরনের। তার মধ্যে আজ একটির কথাই বলছি। বাল্যে আমার কাছে পূজার প্রথম আনন্দের দিন কৃষ্ণপক্ষের নবমী—যেদিন বোধন আরম্ভ হত এবং প্রসাদ পাওয়া শুরু হত, সেদিন নয়। আমার আনন্দের প্রথম দিন ছিল জন্মাষ্টমী। সেদিন প্রতিমার মেড়ে, অর্থাৎ কাঠের ফ্রেমে খড় জড়িয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে তাতে মাটি ছোঁয়ানো হত। তারপর প্রত্যহ প্রতিমা গড়া চলত, আমি মুগ্ধ নয়নে দেখতুম, যতক্ষণ না অভিভাবকেরা আমাকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যেতেন। প্রথমে একমেটে, তারপর দোমেটে। তারপর পলিমাটি লাগিয়ে মানকচুর ডাঁটার ছাল দিয়ে পালিশ। শুকোলে চুন লাগানো। ইতিমধ্যে মুণ্ড গড়া চলছে। সে দেখতে আরও মজা। মুণ্ড গড়া শেষ হলে তা ধড়গুলিতে বসিয়ে দেওয়া হত। জোড়ের জায়গায় পলিমাটির প্রলেপ ও পালিশ। তারপর সমস্ত প্রতিমা আবার চুন মাখানো হল এবং হাঁসের ডিমের সাদা অংশ আগাগোড়া প্রলেপ দেওয়া হল। তারপরে মূর্তিতে যথোপযুক্ত রঙ-ফেরানো হল। এর পর তুলি দিয়ে মুখ-চোখ আঁকা হল। তারপরে আলকাতরা-ভেজানো শণের চুল লাগানো হল। সবশেষে 'ডাকের সাজ' অর্থাৎ রাংতার গয়না মুকুট ইত্যাদি চড়ানো হল। ডাকের সাজ পরাতে পরাতে ষষ্ঠীর দুপুর গড়িয়ে যেত। আমার আনন্দলহরীর প্রথম তরঙ্গ এইখানেই শেষ।

চিতাবাঘ

অন্নদাশঙ্কর রায়

চিড়িয়াখানার চিতাবাঘ
খাঁচায় বন্দী চিতাবাঘ
ওই অসহায় চিতাবাঘ
করল ওকে কানা
কোন্ উল্লুক, কোন্ সে হাঁদা
কোন্ মর্কট, কোন্ সে গাধা
কোন্ শয়তান ? এ কোন্ ধাঁধা ?
জবাব নাইকো জানা।

ধরতে পারলে দিতেম জেলে
থাকত খাঁচার মতন সেলে
বাইরে থেকে খাবার ঠেলে
দিত জেলের দ্বারী।
ওরাও কিন্তু কম পাজি নয়,
ঢুকিয়ে লাঠি দেখাত ভয়,
কত লোক যে অন্ধই হয়
খোঁচা লেগে তারই।

কী বেদনা, চিতাবাঘ
আমিও শরিক, চিতাবাঘ
সেলাম করি, চিতাবাঘ
একটু দূরেই থাকি।
দুয়ার খুলে গেলে, বাবা,
আমার ঘাড়েই পড়বে থাবা,
হাতে হাতে মিলবে খাবার
ভুলব সেই কথা কি ?

জরুরি

প্রেমেন্দ্র মিত্র

খবরটা কি জলদি দেবার ?
দাও না বলে টেলিফোনে।
ফোনটা এখন বোবা বুঝি ?
দেয় না সাড়া ডায়াল-টোনে ?

তবু বলি, ভাবনা কিসের ?
তার করে দাও খুব জরুরি।
তারও বুঝি নেইকো উপায় ?
লাইনে তার গেছে চুরি ?

নাই বা মিলুক ফোন কি 'টেলি'
দাও একটা চিঠি লিখে।
দেরি একটু হলেও সঠিক
পৌঁছে দেবে বার্তাটিকে।

সে-গুড়েতেও বালি ? কেন ?
চলছে পিয়ন ধর্মঘট ?
কুছ পরোয়া নেইকো তাতেও,
হেঁটেই চলে যা চটপট।

প্রথম শীতের ভোর

সুনির্মল বসু

প্রথম রাতে গরম ছিল শেষের রাতে শীত,
বাংলাদেশে শীত এল রে, পেয়েছি ইঙ্গিত।
হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে যায়, রাতের তখন শেষ,
সামনে আমার জানলা খোলা দেখতে যে পাই বেশ।
দূর আকাশে বাঁকা সে চাঁদ হিমের চাদর গায়
নিরিবিলি গগন থেকে আমার পানে চায়।
দিনের আলো ফুটতে বাকি, জ্যোৎস্না অনাবিল,
চারিধারে মাঠেঘাটে করতেছে ঝিলমিল।
ঝিরিঝিরি বাতাস চলে, ছড়িয়ে চলে হিম,
পল্লীখানি সুপ্তিঘেরা নিঃসাড় নিঃঝিম।
শীত এল রে বাংলাদেশে, শীত এল রে ফের,
রাতের শেষে আজকে আমি পেলাম যেন টের।
শিউরে ওঠে গাছের পাতা, কাঁপছে বুনো ঘাস,
চাতক পাখির ডানার ঝাপট শুনতে তোরা পাস?
প্রথম শীতের পরশ লাগে হেমন্ত-জ্যোৎস্নায়,
মাঠের বুকে সবুজ তৃণে কাঁপন ধরে যায়।
হাওয়ায় কাঁপা চাঁপার গাছে কাঁপে চাঁপার ফুল,
জ্যোৎস্নামাখা বাঁশের শাখা কাঁপছে দোদুল-দুল।
হিম ঝরিয়ে শীত ছড়িয়ে বাতাস বহে খুব,
কোন্ তুষারের সাগরখানা আস্‌ল দিয়ে ডুব?
পুব আকাশে চিক মেরেছে,কাটল রাতের ঘোর,
ভোর হল রে, ভোর হল রে, প্রথম শীতের ভোর।

রিখিয়ার জিষ্ণু দে

বিষ্ণু দে

অসীম গুন্‌ডামিতে সেটা একমদ্বিতীয়ম্,
আমাদের কাজকম্ম যে তার কৃপাহি কেবলম্।
লাল জুতুয়া পায়ে বেড়ায়, হাত দুটো যা দোলে!
'বেই বেই' - সে ছুটে বেড়ায়, আবার ওঠে কোলে।
পরজাপতির ভয়ে পালায় বাগান ছেড়ে ঘরে,
আল্-এ উঠে ভাবে, উঠছে দিঘ্‌রিয়া-শিখরে।
নালার জলে ধানের ক্ষেতে দেখছে সমুদ্দুর,
লাল সেলামের লাল জামা তার আট্‌কে যায় সুদূর
ত্রিকূট কিংবা ঘুটঘুটিয়ায়, রাতের নীলে ঘোর
বলে : পাহাড় হারায় কোথা, নিয়ে পালায় চোর।
দিদি দুটো ভয় করে যা, উচ্ছে-ভাজা প্রিয়,
গোপাল ঘোষের রং ঘষে সে, বাদ্‌শা নীরুর স্বীয়
চেলা সেজে রং চোষে সে জামায় মেখে খুদে
দিন-রাত্তির নেচে বেড়ায় রিখিয়ার জিষ্ণু দে॥

ছবি : সমীর মণ্ডল

তিন তাস

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সোনামুখি হামিরহাটি বেলেতোড়
খোলা আছে, ভেতরে ঢোক্ ঠেলে দোর।

বেলবনী বিক্না নেবান্দা
পাননি, মশাই, আমাকে সে-বান্দা।

বোয়াইচণ্ডী ধানসিমলা পাত্রসায়ের
ভাবছি করা যায় কার নামে মামলা দায়ের।

রায়নগর গোপীনাথপুর শ্যামসুন্দর
জানতাম না রয়েছে এত গুণ তোর।

বেতুল কামরুল ইন্দাস
খেলবিনে কক্ষনো তিন তাস।

লিমেরিক

জগন্নাথ চক্রবর্তী

॥ ১ ॥

বোয়িং বিমানটিকে নিয়ে এল শিলচর
ডানা দুটো দুমড়ানো যেন খেয়ে কিলচড়
পাইলট ও হোস্টেস
খুবই ক্রিটিকাল কেস
নীলাকাশে উড়ে নাকি উভয়েরই নীল জ্বর।

॥ ২ ॥

নাটক লিখে বসে আছি পূর্ণ পঞ্চ অঙ্ক
পরিপূর্ণ হ্রদে যেমন সলিল নিষ্পঙ্ক।
ক্রিটিকরা সব দলে দলে
ভ্রান্তি ধরেন হাজার ছলে
জলের মধ্যে যেমন করে ছোঁ দেয় মৎসরঙ্ক।

ছবি জয়ন্ত ঘোষ

হাল-চাল

সন্তোষকুমার ঘোষ

১॥ বুড়োবুড়ি দু'জনাতে
বেশ মজাসে থাকত,
বুড়ি উকুন বাছত মাথার
বুড়োর মস্ত টাক তো।
নেই-কাজ, তাই দেদার ফিউচা-
রিস্টিক ছবি আঁকত!

২॥ হবি তো হবি, সেই ফিউচারই
ঘাড়ে এক দিন চাপল,
হালচাল দেখে বুড়োর মুখ চুন,
বুড়ি বলল 'বাপ্ লো!'

৩॥ বুড়ো যখন বলে 'তিন গজ',
নাতনি তখন 'ঠিক ক' মিটার?'
উনুন বুড়ি জ্বালতে যাবে,
নাতি অমনি 'এই তো হিটার।'
সাবেক কালের কয়লার চুলো
যখন হল পুরো বেকার
দু'জনেরই ঠকঠক ভাবনা
কোথায় এখন হাতটাত সেঁকা!

৪॥ গ্লাসটপ্ পড়ার টেবিলটাতে
হাল আমদানি নতুন রিডার,
অ-আ-ক-খ, হিহি-খক্ক!
এখন খালি আলফা-বিটা,
লজ্ঝড় গাড়ি গিলছে গ্যালন,
ক্যাশমেমোতে লিখছে 'লিটার'।
জ্বরের অঙ্ক দিব্যি কমকম,
সেন্টিগ্রেডে বাঁধা থার্মোমিটার!

৫॥ 'মন' গেছে বনবাসে, এখন কিলো,
মেট্রিক সংখ্যায় বিজ্লি বিল্-ও।

৬॥ বুড়োর মাথাটা ঘোরে, পায়ে ঝিনঝিন
এভাবেই যেতে হবে বাকি ক'টা দিন?
আরও ক'মাইল? থুড়ি, ক' কিলোমিটার?

মাছরাঙা

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

মাছরাঙারা থাকে কোথা ?
পুকুরপাড়ের কাঁঠালপোতায় ।
লম্বালম্বি গর্ত খুঁড়ে
মাছরাঙারা বেড়ায় ঘুরে,
মাঝেমধ্যে ঘরে যায়
বাদবাকিটা ঘুরে বেড়ায় ।

পুকুরে ডালপালার গায়ে
ছবির মতন বইঠে ঠায়ে—
মাঝেমধ্যে মারে ছোঁ,
ঠোঁটের মধ্যে মাছের পো ।

মাছরাঙারা ধরছে কী ?
নাতি-নাতনি মাছের ঝি ।
মা-বাপ মরে মাথা কুটে,
মাছরাঙা মাছ সবটা লুটে,
বকের সঙ্গে বৈরিতায়—
এক পা ছেড়ে দশ পা যায় ॥

শান্তনু

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

পাড়ায় পাড়ায় শ্রান্ত মুখে
ঘুরে বেড়ায়, সত্যি বলতে
ক্লান্ত না সে, তার কাছে পথ
পিদ্দিম আর সে তার সল্‌তে ।
জানো তোমরা শান্তনুকে ?

কোথায় থাকে শান্তনু
কেউ জানে না, হয়তো জানে
ভুবনডাঙার রামধনু ।

ভুবনডাঙার রামধনুকে
আঁটিল ছিলা, তারপরে সে
হঠাৎ কেন কোন্ অসুখে
কুঁকড়ে গেল দিনের শেষে,
কিসের বিষাদ বাজল বুকে ?

দেখল সে এক মানুষকেই
মরছে, কিন্তু তার মুখে জল
দেবার কোনো মানুষ নেই ।

শান্তনু তার কোন ঝিনুকে
জল দিয়ে সেই মুমূর্ষুকে
জীবন দিল, সেসব কিন্তু
বলতে গেলে সপ্তসিন্ধু—
বলছি তবু সকৌতুকে ।

তোমরা কি তার গানগুলি
শুনতে পাওনি ? শুনলে জানবে
শান্তনু সে গাঙ্গুলি ।

ছবি জয়ন্ত ঘোষ

গলি

আলোক সরকার

হলুদ জামা-পরা অচিন ছেলে
ছোট্ট গলিটায় ঢুকল ওই—
কোথায় যাবে সব ঠিকানা ফেলে ?
ডাইনে বাঁয়ে বাঁক ছোট্ট গলি
থামবে কোনখানে ? থামছে কই ?

আঁধার বটগাছ পেরিয়ে ভাঙা
মলিন পোড়ো বাড়ি ঘুমের দেশ
একটু পরে সেই স্বপ্নরাঙা
নিঝুম রাজপুরী—অচিন ছেলে
থামবে এইবার ? নির্নিমেষ

দেখছে কোন্ বাঁক ! দুপুর আরো
বাজছে ঝমঝম ভীষণ একা
কাঁপছে চারিদিক ! পথিক কারো
চোখে কি পড়ছে না ? ছোট্ট গলি
এগিয়ে ভেসে যায় বনের রেখা

এবার গাছপালা ওদিকে নদী ।
হলুদ জামা-পরা অচিন ছেলে
চলেছে আনমন—কখন যদি
জানত মনে-মনে সারাটা দিন
কে হাঁটে পাশাপাশি দুচোখ জ্বেলে ।

শান্তিনিকেতনে শালবীথিতে ক্লাস চলছে। মাথার উপরে ছাতা ধরে আছে বনস্পতি। শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ

গাছের তলায় ক্লাস

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

আজকের শান্তিনিকেতনকে দেখে আগেকার দিনের শান্তিনিকেতনকে ঠিক বোঝা যাবে না। আগে ছিল গ্রাম-বাংলার যে-কোনো ক্ষুদ্র একটি পল্লীর মতো দেখতে। এখন চেহারাটা খানিকটা শহুরে হয়ে উঠেছে। রাস্তাঘাট পাকা হয়েছে, রাস্তার দু'ধারে বড় বড় মোকাম উঠেছে, আধুনিক যানবাহনেরও আমদানি হয়েছে। আগে এসব কিছুই ছিল না। আম্রকুঞ্জ আর শালবীথির আশেপাশে কয়েকটি ক্ষুদ্র কুটির নিয়ে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শুরু হয়েছিল আজ থেকে প্রায় পঁচাশি বছর আগে। মাটির দেওয়াল আর খড়ের চালের ঐ কুটির ক'টিতে ছাত্ররা আর মাস্টারমশায়েরা সব একসঙ্গে থাকতেন। ইস্কুলের কোনো বাড়িঘর ছিল না, ক্লাস বসত গাছের তলায়। সেই তখন শান্তিনিকেতনের কথা হলেই লোকে বলত—গাছের তলায় ক্লাস, খড়ের ঘরে বাস।

তারও আগে শান্তিনিকেতনের জন্মকালে ঐ কুটির ক'টি তো নয়ই, আজকের আম্রকুঞ্জ আর শালবীথিও ছিল না। ছিল শুধু ধুধু প্রান্তর। সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নির্জন বাসের জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। স্থানটি অতি মনোরম, শান্ত নিস্তব্ধ পরিবেশটি মহর্ষির বড় ভাল লেগেছিল। শহরের জীবনে, সংসারের কাজে হাঁপ ধরে গেলে এখানটিতে এসে কয়েকটি দিন তিনি নির্জনে কাটিয়ে যেতেন। বাসগৃহটির নাম দিয়েছিলেন শান্তিনিকেতন। ঐ গৃহটির নাম থেকেই পরে সমস্ত স্থানটির নাম হয়েছে শান্তিনিকেতন।

বহুদিন পর্যন্ত ঐ শান্তিনিকেতন-গৃহটিই ছিল এখানকার একমাত্র পাকা বাড়ি। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গে একটি লাইব্রেরি-গৃহ নির্মিত হল। এটি শান্তিনিকেতনের দ্বিতীয় পাকা বাড়ি। এর

কিছুকাল পরে আরেকটি পাকা বাড়ি তৈরি হল। এটির নাম দেহলী। এ-বাড়িটিতে এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ থেকেছেন, পরে থাকতেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর কথাও তোমরা শুনেছ ; তিনি মস্ত বড় গাইয়ে ছিলেন। এখন ঐ দেহলী-বাড়িতে ছোটদের জন্যে হাসি-খুশি ইস্কুল হয়েছে। নাম আনন্দ-পাঠশালা। শান্তিনিকেতনের শিশুরা সেখানে নাচগান করে, সঙ্গে-সঙ্গে এক-আধটু লিখতে পড়তেও শেখে। ব্যস্, এই যে তিনটি বাড়ির কথা বললুম, ঐ তিনটিই আদি শান্তিনিকেতনের পাকা বাড়ি। বাদবাকি সব বাড়িরই মাটির দেওয়াল খড়ের চাল। আজকাল তোমরা সেই পুরনো শান্তিনিকেতনের খুব যাঁদের নামডাক শুনছ—নন্দলাল বসু, ক্ষিতিমোহন সেন, বিধুশেখর শাস্ত্রী, এণ্ড্রুজ, পিয়ার্সন—তাঁরা সবাই এই সব খড়ের বাড়িতে থাকতেন। শুধু তাঁরা কেন, রবীন্দ্রনাথ নিজেও কখনও-কখনও খড়ের বাড়িতে থেকেছেন।

আগেই বলেছি, গোড়ার দিকে ছাত্র শিক্ষক সকলে একসঙ্গে একই বাড়িতে থাকতেন। পরে অধ্যাপকদের মধ্যে যাঁরা বিয়ে-থা করে সংসারী হলেন, তাঁদের জন্যে আলাদা বাড়ি তৈরি হল। সারি সারি খড়ের বাড়ি—নাম হল গুরুপল্লী। খড়ের বাড়ি শুনলে মনে হয় শস্তাগণ্ডার ব্যাপার। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, খড়ের বাড়ি টিকিয়ে রাখা বড় সহজ ছিল না। ঝড়ে খড়ের চাল উড়িয়ে নিত, বৃষ্টিতে ভিজে খড় যেত পচে। দু'তিন বছর পরে-পরেই নতুন করে চাল ছাইতে হত। শান্তিনিকেতনের তখন অভাবের সংসার। ঘর মেরামতের কাজটা ঠিকমতো হত না। চালের ফুটো যেমনকার তেমনি থেকে যেত। বর্ষার দিনে সকলকেই দুর্ভোগ ভুগতে হত। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকরা নানা অভাবে অভ্যস্ত ছিলেন বলে এসব ব্যাপারে তাঁদের খুব একটা ভাবান্তর দেখা যেত না। লোকে বলে, অভাবে স্বভাব নষ্ট ; কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, অভাবে তাঁদের স্বভাবের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। অনেক দুঃখ-কষ্টকে তাঁরা দিব্যি হেসে উড়িয়ে দিতেন। একটা মজার গল্প বলছি, শোনো। ক্ষিতিমোহন সেন মশায় তখন থাকেন গুরুপল্লীর ঐ খড়ের একটি বাড়িতে। বর্ষাকাল, বৃষ্টি হচ্ছে অঝোরে। বৃষ্টি মাথায় করেই এক ভদ্রলোক এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। ক্ষিতিমোহনবাবু ঘরের একটি কোণে বসে তাঁর লেখাপড়ার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। আগন্তুক ভদ্রলোক ছাতাটি বুজিয়ে ঘরে পা দিয়েই বলে উঠলেন, "উঃ কী বৃষ্টি !" ক্ষিতিমোহনবাবু চোখ তুলে তাকিয়েই বিস্ময়ের ভান করে বললেন, "অ্যাঁ, বাইরেও বৃষ্টি হচ্ছে নাকি ?" দুজনেই খুব হাসতে লাগলেন। আসল কথা চালের ফুটো দিয়ে বৃষ্টির জল পড়ে ঘরের মেঝেতেই জল থৈথৈ করছে। এসব ব্যাপার তাঁরা খুব একটা গ্রাহ্য করতেন না ; তাঁদের লেখাপড়ার কাজেও তেমন বিঘ্ন ঘটত না। আর ক্ষিতিমোহনবাবুর কথার ভঙ্গি থেকেই বুঝতে পারছ যে, হাস্যে পরিহাসে তাঁরা দুর্ভোগকেও উপভোগ্য করে তুলতে পারতেন।

ইস্কুলের ছেলেরা যাতে কষ্ট না পায় সেজন্যে তাদের ঘরদোরগুলোর সাধ্যমতো যত্ন নেওয়া হত। কিন্তু কলাভবন সংগীতভবনের ছাত্ররা বয়সে একটু তো বড় ; তারা সব সময়ে রেহাই পায়নি। অধ্যাপকদের মতো তাদেরও দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে। এখানে আরেকটি গল্প বলছি। নেহাত গল্প নয়, সত্য ঘটনা। বলেছেন খ্যাতনামা শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। কলাভবনের যে ছাত্রাবাসটিতে তাঁরা থাকতেন, সেটির তখন অতি জীর্ণ দশা। ভাঙা চালের ফুটো দিয়ে এত জল পড়ছিল যে, রাতের পর রাত তাঁরা ঘুমোতে পারছিলেন না। কর্তাব্যক্তিদের কারো কারো কাছে বলেও সুরাহা কিছু হয়নি। কী করে হবে ? টাকা থাকলে তবে তো খড় কেনা হবে, মেরামতির জন্যে লোক লাগানো হবে। উপায়ান্তর না দেখে ওঁরা জন-তিনেক ছাত্র মিলে একদিন রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে হাজির। তাঁর কাছে ছাত্রদের ছিল অবাধ গতি। খুব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়েও রবীন্দ্রনাথের কাছে যেতে

শান্তিনিকেতনে আজও আছে কিছু খোড়ো-বাড়ি

কোনো বাধা ছিল না। ওঁদের দেখেই হাসিমুখে বললেন, "কী রে, কী খবর তোদের ?" তিন বন্ধু মুখ কাঁচুমাচু করে সসংকোচে তাদের দুঃখের কথাটি নিবেদন করল। রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, "তাই তো, এবারের বর্ষায় দেখছি অনেকেরই ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছে। তোদের বলব কী, কালকে রাত্তিরে আমিও ঘুমোতে পারিনি।" বেশ বুঝতেই পারছ, রবীন্দ্রনাথ নিজেও তখন একটি খড়ের বাড়িতেই বাস করছিলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, "খাটটাকে একবার এদিকে, একবার ওদিকে টেনে নানান জায়গায় সরিয়ে দেখলুম, কিন্তু সুবিধে কিছুই হল না, সব জায়গাতেই জল পড়ছে। তখন ঘুমের আশা ছেড়ে দিয়ে উঠে বসলুম। আপন মনে গুনগুনিয়ে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে একটা গান তৈরি হয়ে গেল। সুরটা ঠিক করে নেবার জন্যে গানটা বারবার করে গাইতে লাগলুম। ব্যস্, ঐ করেই রাতটা দিব্যি কেটে গেল।" আবার হেসে বললেন, "বোস্, গানটা

শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত সেই আম্রকুঞ্জ

তোদের শুনিয়ে দিচ্ছি। বলে গাইতে লাগলেন, "তোমায় গান শোনাব, তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখো। ওগো ঘুম ভাঙানিয়া।"

ঘুম ভাঙানিয়া বর্ষার গান গাইছেন রাত-জাগা এক কবি, আর গান শুনছেন রাত-জাগা তিন ছাত্র। এও শান্তিনিকেতন-জীবনের এক মজার ছবি। শিল্পী বিনোদবিহারী বলেছেন, "আমরা যে নালিশটি নিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম সেটির সুরাহা কতদিনে হয়েছিল, আজ এতদিন পরে আর তা মনে নেই। কিন্তু গানটির কথা মনে আছে, সুরটি আজও কানে লেগে আছে।"

আলোকচিত্র বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত

সম্পূর্ণ উপন্যাস

ষড়যন্ত্রের নায়ক

আশাপূর্ণা দেবী

আসবাবপত্রগুলো অবশ্য দামি-টামি কিছু নয়, তবে কোনো সংস্থার পক্ষে একটি ছোট অফিস-ঘর হিসেবে মোটামুটি বেশ সাজানো-গোছানো। এরকম ঘরে যা যা থাকা দরকার, সবই আছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে প্রায় নতুনই।

মাঝখানে টেবিল, দু-দিকে দুখানা চেয়ার মুখোমুখি। দেওয়ালের ধারে খান-তিনচার অর্ডিনারি হাল্কা কাঠের চেয়ার।

ঘরের বাইরে দরজার গায়েই লাগানো নেমপ্লেট, সেও মোটামুটি। কালোর ওপর সাদা অক্ষরে ইংরেজিতে লেখা—প্রো এম·কে·পাল, প্রো টি·সি·দাস। দুটো নামেরই পাশে আরো কয়েকটি করে ইংরেজি অক্ষর বসানো, কমা দিয়ে দিয়ে বিভক্ত। দেখে বোঝা যাচ্ছে ওই লেজুড়গুলি এই দুই ব্যক্তির গুণের পরিচয় বহন করছে, তবে কী কী গুণ, বা কোন্ জাতীয় গুণ তা বোঝা যাচ্ছে না! তবে দেখে সমীহ আসতে বাধ্য। ল্যাজই তো গৌরবের ধারক-বাহক!

বেলা দশটা।

ভোর থেকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আছে বলে বেলা বোঝা যাচ্ছে না। তবে রাস্তায় লোক চলাচলের ঘাটতি নেই, এবং তাদের সাজসজ্জা দেখে-দেখে মালুম হচ্ছে, সময়টা স্কুল-কলেজ-অফিস ইত্যাদির।

ঘরের মধ্যে থেকে খোলা দরজা দিয়ে এই লোক-চলাচল দেখা যাচ্ছে। ঘরে বসে থাকা লোক দুজন মাঝে-মাঝে অলস দৃষ্টিতে দেখছে। বোঝা যাচ্ছে ওদের সঙ্গে এই ব্যস্ততার কোনো যোগসূত্র নেই।

রাস্তা থেকে দুটো সিঁড়ি উঠে রোয়াক, তার ওপর ঘরের দরজা। রোয়াক সম্প্রতি রেলিং দিয়ে ঘিরে নেওয়া হয়েছে, কাজেই রোয়াক না বলে বারান্দা বলাই উচিত!

ঘরের মধ্যে টেবিলের দু-ধারের দুটো চেয়ারে মুখোমুখি বসে দুই তরুণ। ঠিক যুবকও বলা যায় না। আবার কিশোরও বলা চলে না, মাঝামাঝি আর কি!

দুজনে যেন দু'টি বিপরীতের নমুনা। একজন বেঁটে, একজন ঢ্যাঙা, একজন ফর্সা, অন্যজন ময়লা, একজন বেশ গোলগাল, অন্যজন স্রেফ্ খটখটে। পরনেও একজন বাদামি প্যান্ট, একরঙা ব্রাউন বুশ শার্ট, অন্যজন গাঢ় নীলরঙা প্যান্ট, আর চকর-বকরা চেন-টানা গেঞ্জি! শুধু একটি ব্যাপারেই দুজনে সমান। দুজনেরই মুখ আকাশের মতো মেঘাচ্ছন্ন

দুজনেই চুপচাপ বসে

না, দুজনেই একেবারে চুপচাপ বসে বলা চলে না, ওই গোলগালটির হাত নড়ছে অনবরত। কী করছে? টেবিলের জিনিসগুলো, যেমন পেপারওয়েট, কালির দোয়াত, পিনকুশান এইসব তুলছে, রাখছে, ঠুকছে, আর মাঝে-মাঝে রাস্তার দিকে অলসদৃষ্টি ফেলছে। আর লম্বা জন, বেশির ভাগটাই রাস্তায় চোখ

ছবি জয়ন্ত ঘোষ

রেখেছে, আর মাঝে-মাঝেই গোলগালের হাতের কাছ থেকে জিনিসগুলো সরিয়ে রাখছে।

একবার বলে উঠল, "অ্যাই, কী হচ্ছে ?"

গোলগাল লজ্জা পেল না। বলে উঠল, "ধ্যেততারি কিছু ভাল লাগছে না। মাস্টারমোশায়ের কাছে মুখ দেখানো যাচ্ছে না।"

লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলল।

গোলগাল বলল, "আচ্ছা এ-রকম কেন হল বল তো এম পি ? তিন-তিনটে কেসে আমরা অমন ছাক্‌ছেছ্‌ফুল হলুম— ।"

"আঃ টি ডি ! ফের তোর ওই 'ছাকছেছ্‌ফুল !' এই বদ্‌ অব্যেসটা ছাড়বি কি না ?"

"আচ্ছা বাবা আচ্ছা, ছাড়ব। তুই জবাবটা তো দে ! সাকছেছ্‌ফুল হলুম। কাগজে নাম বেরোল, ছবি ছাপা হল, মেনেজার পুরোসকার দিতে চাইল, মাস্টার কত শিক্ষেদিক্ষে দিল, তবু—"

খটখটে কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল,"লাক !"

"যা বলেছিস ! লাকটাই খারাপ ! মাঝে-মধ্যে মনে হচ্ছে কী জানিস ?"

"কী ?"

"মনে হচ্ছে—গজ উকিল আমাদের প্রিতিজ্ঞে করিয়ে নিয়েই লাকের বারোটা বাজিয়ে দিল।"

"ফের প্রিতিজ্ঞে ?"

"বাপ রে বাপ। না হয় প্রতিজ্ঞেই। তো বলছি ওটা না করালে, আমরা আমাদের পুরনো পেশায় ঢালাও কারবার চালাতে পারতুম !"

"টি ডি ! ফের ? ছি ছি। মাস্টারমশাইয়ের শিক্ষা-দীক্ষাটা তাহলে ভস্মে ঘি ? পুরনো পেশা ? সেই পকেটমারাইয়ের কথা বলছিস ? ছি ছি ছি !"

গোলগাল কাঁদো-কাঁদো হল, "সাধে কি আর বলছি ? বেকারের জ্বালা ! এই তিন মাস ধরে আপিস সাজিয়ে বসে থাকা হয়েছে। একটাও কেছ আসছে না !"

"ফের কেছ ?"

"ওঃ। তুই বড্ড ছুতো ধরা এম পি ! তো যাক, একটা মতলব-টতলব বাত্‌লা।"

"কী মতলব বাত্‌লাব ? দেশে সবাই যদি সাধু বনে গিয়ে বসে থাকে, চুরি-ডাকাতি, খুন-টুন না হয় ..."

"হবে না কেন ?"

গোলগাল মুখ আরও গোল করে বলল, "দোহাত্তা হচ্ছে। তুই-ই তো বেশি-বেশি খপরের কাগজ পড়িস। দেখিস না ? তো আমাদের কাছে যদি না আসে !"

ঢ্যাঙা মলিনমুখে বলল, "সেই তো কথা ! অথচ মাস্টারমশাই কত আশা-ভরসা নিয়ে খরচা করে, নিজের একটা ঘর ছেড়ে দিয়ে অফিস সাজিয়ে দিল। বলে বটে 'হবে হবে' কিন্তু হচ্ছে কই ?"

কথাটা ঠিক, প্রফেসর জগবন্ধু বোস তাঁর এই অকালকুষ্মাণ্ড পালিত ভাগনে দুটিকে কর্মজগতে প্রতিষ্ঠিত করতে অনেকটাই খরচাপত্র করেছেন। আর ছুটিতে ছোটাছুটি করে আসার পর এদের খাইয়ে-দাইয়ে পুষে, যতটা সম্ভব চালু করতে লেখাপড়া শিখিয়ে চলেছেন। তবে ঢ্যাঙা যতটা তাড়াতাড়ি শিখতে পারছে, বেঁটে ততটা নয়। এদিকে আবার অন্যদিকে তার বুদ্ধিটা হঠাৎ-হঠাৎ বেশি খোলে। তাই দুজনের ওপরই ভরসা জগবন্ধুর।

অফিসঘরের সব কিছু করে দিলেও, গোলগালের সাধ হয়েছিল নেমপ্লেটটা নিজে করবে। বলেছিল, "একটা চেনা লোকের সাইনবোটের দোকান আছে—সেখান থেকে—"

"সাইনবোট ?"

"বাবাঃ বাবাঃ তোর জ্বালায় আর পারি না। সাইনবোর্ড্‌ ! হল

তো ?”

মন্ত্রগুপ্তির মতো চুপি-চুপি ব্যাপারটাকে সমাধা করে, জিনিসটাকে দুহাতে বাগিয়ে ধরে রিকশায় চেপে, নিয়ে এসে ফেলল বেঁটে। সারা রাস্তা মুখ আড়াল, অবিরতই যে আহ্লাদে খিক-খিক করে হেসে চলেছে, তা রাস্তায় কেউ টের পায়নি। বাড়িতে এনে নামানো মাত্রই দেখা গেল, কান থেকে কান হাসি।

আবার বাগিয়ে ধরে তুলে দেখাল, “দেখুন মামাবাবু, কী মার্ভেলাছ্ লেখাটা হয়েছে।”

মামাবাবু অর্থাৎ জগবন্ধু বোস তো দেখে থ। ঢ্যাঙাও তাই। এই ঢাউস।

“এই তোর নেমপ্লেট ! ফুট-চারেক লম্বা আর ফুট-তিনেক লম্বা সাইন বোর্ডটা দু'হাতে ধরেই থেকে গোলগাল হেসে হেসে বলল, “বাঃ নামগুলো একটু বড় না হলে চলে? দূর থেকে লোকের চোখে পড়া চাই তো ?”

“কেন চাই ? এটা কি তুই দোকান খুলছিস ? হা-হা-হা ! এম পি, দেখ দেখ ভাষায় কী বাহারের ছটা।”

‘বিশ্বোবিখ্যাত গোয়েন্দা যুগল। শ্রীমান মদনকুমার পাল।

শ্রীমান ট্যাঁপাচরণ পাল। সর্বোপ্রকার বিপদে সাহায্যোদাতা !’

বেঁটে মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে তাকাল।

আহা ! সবুজ রঙকরা টিনের শিটের ওপর বড় বড় অক্ষরে লাল রঙ দিয়ে লেখা এই অপূর্ব জিনিসটা এদের পছন্দ হল না ?

জগবন্ধু আবার হাসলেন, “হ্যাঁ রে ট্যাঁপা, মদনটা তো মোটামুটি মানুষ হয়ে উঠছে, তোর কিছু হচ্ছে না কেন ? এই বানানের ছিরি ? আর নিজেরাই নিজেদের নামের আগে হা-হা-হা— শ্রীমান !”

গোলগাল অর্থাৎ ট্যাঁপা রেগে গিয়ে বলে ওঠে, “নিজেরা লিখব না ? তা আমাদের নামের আগে কে ‘ছিরিমান’ লিখতে আসছে শুনি ?”

“নাই বা এল ? ‘ছিরিমান’ হবার দরকারটা কী ? হা-হা-হা। না বাপু, এ অচল। আমিই দেখছি।”

অতঃপর জগবন্ধু বোসের তদারকিতে বর্তমানের এই নেমপ্লেট। এম কে পাল, টি সি দাস। আর ডাকটাকে আরো সংক্ষিপ্ত করতে—এম পি আর টি ডি করে দিয়েছেন জগবন্ধু, যাতে অভ্যেসের বশে ফস্ করে না বলে বসে ট্যাপা মদনা। দুজনের জন্যে দুটো সুন্দর-সুন্দর নাম ভেবে রেখেছিলেন জগবন্ধু, কিন্তু ছেলেদুটো তেমন রাজি হয়নি। খুঁতখুঁত করে বলেছে, “আজ্ঞে জন্মভোরের নামটা হঠাৎ পালটে গেলে, নিজেকে ‘আমি’ বলে মনে হবে না। ওই ‘আমি’টাকেই যদি হারিয়ে ফেলি তালে আর রইল কী ?”

অতএব সংক্ষিপ্তকরণ। ভাষান্তরে রূপান্তর।

নিজেদের মধ্যেও যখন অফিসঘরে থাকে, এই সংক্ষিপ্ত নামেই কথা।

কিন্তু ক্রমেই লজ্জা বেড়ে চলেছে। নিজেদের কোনো রোজগারপাতি নেই, কতদিন আর জগবন্ধুর ঘাড় ভাঙা যায় ?

টেবিলের ওপর একটা টর্চ, একটা মোমবাতি ও একটা দেশলাইও ছিল। হঠাৎ দরকারের জন্যে এসব মজুত রাখাই উচিত ! ট্যাঁপা নাড়তে নাড়তে দেশলাই বাক্সটা হঠাৎ খুলে ফেলে, কাঠিগুলো ছড়িয়ে ফেলল ! মদনা বলে উঠল, “এই, কী করে চলেছিস ?”

“ভাল লাগছে না।”

“এতে ভাল লাগছে ?”

“দূর !”

“তবে ?”

“ওই তবেটাই ভাবছি—” বলেই গলার স্বর নামিয়ে বলল, “ভেবে ভেবে একটা উপায় আবিষ্কার করছি।”

“কী ?”

“বলছি, আয় নিজেরাই একটা ‘কেছ’ বনাই”

মদন ভুরু কোঁচকাল। “কী বানাই”

“বললাম তো কেছ !”

মদন তেতো গলায় বলে, “তোমার ওই ‘কেছ’ স্বর ‘ছাক্‌ছেছফুল’ শুনলেই মক্কেল সঙ্গে সঙ্গে উলটোমুখো হবে চাঁদু।”

“ইশ্। আর ? জিবটাকে এবার একদিন র‍্যাঁদা দিয়ে চাঁচিয়ে নেব বলছি যে ‘কেস’ একটা নিজেরাই বানিয়ে নেওয়া ছাড়া তো আর উপায় থাকছে না। এ যেন ডাক্তার আছে রুগি নেই, উকিল আছে মক্কেল নেই, মাস্টার আছে ছাত্তর নেই। হ্যাঁ ঠিক তাই, গোয়েন্দা আছে ‘অপরাধ’ নেই। তো অফিসটা একবার একটু ইস্টার্ট করতে—”

গলার স্বর আরো কমিয়ে বলে ট্যাঁপা, “ধর ধাঁ-করে পাড়ায় একটা খুন করে এলাম ! তারপর—”

“ভ্যাট্ ! কী বকছিস পাগলের মতো ?”

“পাগলই যে হয়ে যাচ্ছি রে মদন ! ইশ্, এম পি তো পাড়ায় খুন হলেই হৈ-চৈ পড়বে, আর তখন তারা পাড়ার গোয়েন্দা অফিসে উঁকি মারতে আসবেই !”

“হুঁ ! তারপর ? খুনি ধরা পড়লে ?”

“এই দ্যাখ ! আসল খুনিকে ধরতে যাব নাকি আমরা ? চালাকি করে একটা অদৃশ্যো খুনি খাড়া করব।”

“অ্যাঁ কে বলে আমার ট্যাঁপামানিকের বুদ্ধি নেই। এ যে সোনার ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখার মতন বুদ্ধি রে। তা এই ঘিলুর বোতলে মেলাই ধুলোবালি ভরিসনে রে ট্যাঁপা, জমাট বেঁধে যাবে। সব বিদ্যেই একটা সাধনা।”

মদন ভাবছিল বন্ধুকে একটু জ্ঞান দেবে, কিন্তু ততক্ষণে চক্ষু বিস্ফারিত করে রাস্তা দেখছে

“কী রে কী হল ?”

“এই চুপ। দেখ দেখ, পানের দোকানের পাশের গলিটা দিয়ে যে লোকটা বেরিয়ে এল, ও না—”

মদন বলল, “কোন লোকটা

ওই যে ডোরাকাটা পাজামা পরা, গায়ে গলাবন্ধ নীল গেঞ্জি, গলায়—”

“বুঝেছি, ওই যে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসছে—”

“হ্যাঁ ! কিন্তু—”

ট্যাঁপা উত্তেজিত গলায় বলে, “কিন্তু ও যখন গলি দিয়ে আসছিল, পষ্ট দেখেছি দিব্যি চোটপায়ে হেঁটে আসছে।”

“দূর !”

“দূর মানে ? স্বচক্ষে দেখলুম। বড় রাস্তায় পড়েই হঠাৎ কোমর নুইয়ে হাঁটুতে হাত দিয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল।”

মদন তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, “তাহলে বোধহয় হঠাৎ পায়ের শিরে হ্যাঁচকা টান ধরেছে। আমার এরকম হয়। মাঝ-রাত্তিরে হঠাৎ আর পা টান-টান করে ছড়িয়ে শুতে পারি না।”

“যাচ্চলে।”

ট্যাঁপা ব্যাজার মুখে বলল, “যদি বা একটা রহস্যের সন্ধান পাচ্ছিলুম, তো তুই তাকে এককোপে শেষ করে দিলি ?”

কিন্তু আজ বোধহয় ট্যাঁপার ভাগ্য ভাল, তাই তার রহস্য এক কোপে কাটা পড়ল না। স্পষ্টই দেখা গেল রাস্তা ক্রস করে এদের দিকেই আসছে লোকটা।

“কী ব্যাপার রে বাবা

দুজনে নড়েচড়ে বসল

আর মদন আবার কিনা তাড়াতাড়ি ড্রয়ার টেনে একটা দূরবিন বার করে চোখে লাগাল।

কী জন্যে কী করছে, তাও জানে না, তবে বার করে চোখে

লাগাল।

ঠিক তাই। সেই লোকটাই। যাকে মদন বাজারে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছে। খোঁড়ামির চিহ্নমাত্রও ছিল না।

লোকটার নাকের ডগায় বড়সড় একটা আঁচিল।"নাকে আঁচিল মদন দূরবিনটা নামিয়ে বলল, "লোকটা সুবিধের নয়।"

"তুই এখান থেকে একটু দেখেই কী করে বুঝলি সুবিধের নয় ?"

"এই ধরনের লোক খুব খারাপ টাইপের হয় শুনেছি।"

"তুই যে কোথথেকে কী শুনিস-জানিস ভগবান জানে। আমি তো তোর সঙ্গে-সঙ্গেই সর্বদা ঘুরি—কিছুই তো জানি না।"

কথা শেষ হল না, দেখা গেল লোকটা এই বাড়ির মধ্যেই আসছে।

মদন তাড়াতাড়ি দূরবিনটা টেবিলে নামিয়ে রেখে একটা কাগজ চাপা দিয়ে, মুখের সামনে একখানা খবরের কাগজ খুলে ধরল।

দেখাদেখি ট্যাঁপাও।

তবে তাড়াতাড়িতে কাগজখানা উলটে ধরেছে তা খেয়াল করল না।

যদিও মুখের সামনে কাগজ, তবু আড়ে-আড়ে তো দেখা চলছে। লোকটা খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে রোয়াকের ধারে সিঁড়িদুটো উঠে রোয়াকে উঠে এল। দরজায় উঁকি দিল।

এতক্ষণে যেন চোখে পড়ল, এই ভাব দেখিয়ে মদন গম্ভীরভাবে বলে উঠল, "কী চাই ?"

মনে-মনে ভাবল, এবার একটা চশমা করাতে হবে। চশমা পরলে বেশ একটু কেষ্টবিষ্টু দেখায়।

লোকটা আস্তে ঘরে ঢুকে এসে বলল, "আজ্ঞে চাই না কিছু। আবার চাইও কিছু !"

ট্যাঁপা কাগজ থেকে মুখ সরিয়ে বলে উঠল, "চান না কিছু, আবার চাইও কিছু ? খুব অদ্ভুত কথা তো।"

"আজ্ঞে সেই তো ! আজ যে সকাল থেকেই অদ্ভুত সব কাণ্ড চলছে।"

"তার মানে ?"

"আজ্ঞে মানেই যদি বুঝব, তবে আর আপনাদের কাছে আসব কেন ?"

মদন বলল, "আমরা কে আপনি জানেন ?"

যদিও লোকটাকে দেখে 'আপনি' করে কথা বলতে ইচ্ছে হবার কথা নয়, তবু আজকাল নাকি রিকশাওলা, ঠ্যালাওলা, মালপত্তর বওয়া কুলি সব্বাইকে'আপনি'বলা নিয়ম, তাই মদন 'আপনি' বলল ওকে। লোকটা একগাল হেসে বলল, "তা আর জানিনে ? পাড়ার সবাই জানে এখানে একখানা টিকটিকি-পুলিশের আপিস খোলা হয়েছে।"

"পুলিশ ? কে বলেছে পুলিশ ? না না আমাদের সঙ্গে পুলিশ-ফুলিশের কোনো সম্বন্ধ নেই !" এটা বলে উঠল ট্যাঁপা।

মদন টেবিলের তলা থেকে ওর পায়ে একটা সাঙ্কেতিক চাপ দিল, যাতে না বেশি কথা কয়ে বসে !

লোকটা ফ্যাকফেকিয়ে হেসে বলল, "তা না হয় পুলিশ নয়, কিন্তু পুলিশের নামে রেগে যাচ্ছেন কেন ?"

মদন গম্ভীরভাবে বলল, "রাগের কী দেখলেন ? আমরা শখের গোয়েন্দা, "আমাদের সঙ্গে পুলিশের কোনো যোগাযোগ নেই, সেইটাই বলা হচ্ছে।"

"অ, শখের। পানওলা বলে কিনা ওটা হচ্ছে টিকটিকি-পুলিশের আপিস। নতুন খুলেছে।"

ট্যাঁপা মনে মনে বলল, পাড়ার সবাই জানে একটা টিকটিকি-আপিস খোলা হয়েছে। তবে এমন শুকনো মরুভূমি কেন বাবা ! এক-আধটা 'কেস' কি দিতে পারতিস না কেউ ? নাকি পাড়া থেকে অপকাজটাজ উঠে গেছে। আমাদেরই ভাগ্য। আমরা যদি
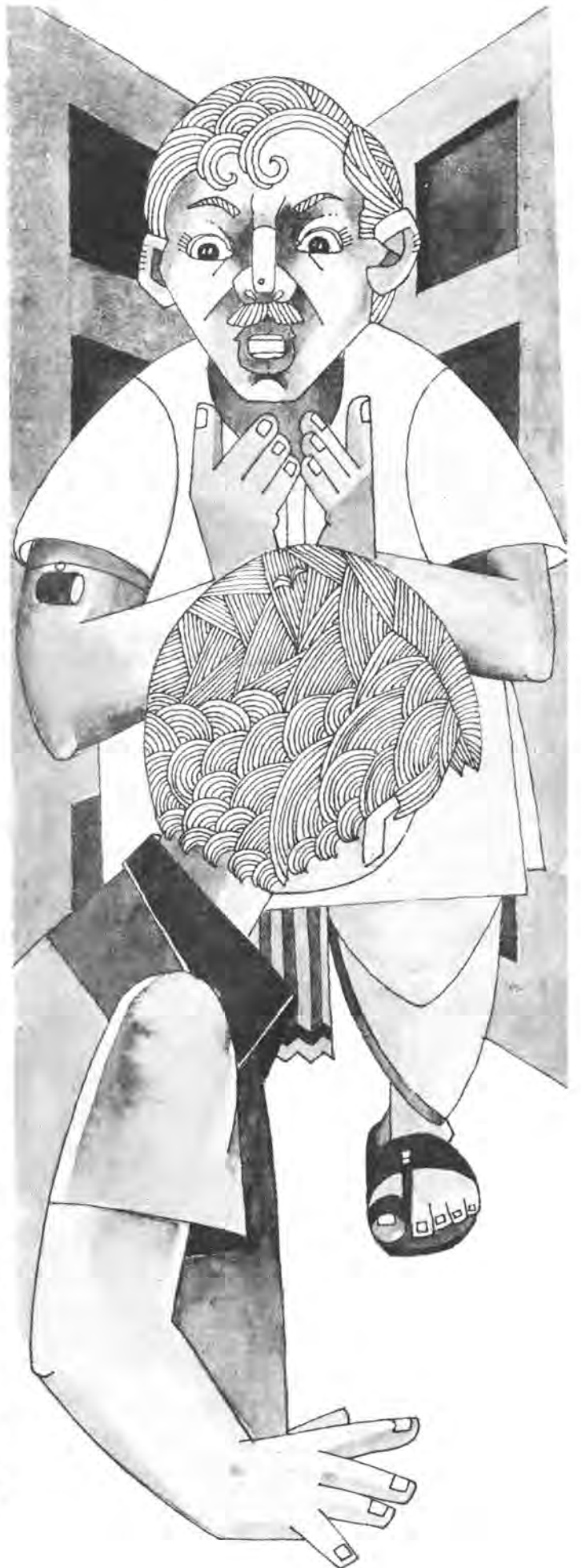
ডাক্তারখানা খুলে বসতাম হয়তো দেখা যেত পাড়া কেন, এই শহর থেকেই রোগ-ব্যাধি উঠে গেছে।

মদন ভাবল, ট্যাঁপার প্রার্থনা তাহলে পূর্ণ হল। 'কেস্ কেস্' করে যা করছিল। তবে মনের কথা মনে রেখে বেশ গাম্ভীর্যের সঙ্গে যেন অবজ্ঞাভরে বলল, "তা হঠাৎ টিকটিকি-পুলিশের অফিসেই বা দরকার পড়ল কেন?"

"ওই যে বললুম সকাল থেকে যতসব অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে। যে মানুষ কাকে 'কা-কা' করার আগেই 'চা-চা' করে তিনতলা থেকে নেমে আসে, তার বেলা দশটা অবধি চায়ের খেয়াল নেই। দরজায় খিল এঁটে বসে আছে। এদিকে যে মানুষটা ভোর থেকে চরকিপাক ঘোরে, রাতের ঘোরে ভূত না ভগবান কে জানে তার ডান পা-খানায় এইসা এক আড়াই-প্যাঁচ মোচড় দিয়ে বসে আছে, যে বারবার তিনতলায় ওঠাউঠি করে ডাকাডাকি করার খ্যামতা হচ্ছে না। ওদিকে আবার যে ক্ষিরির পৃথিবী উলটে গেলেও কাজে কামাই নেই, সেই ক্ষিরিরও সকাল থেকে দর্শন নেই। আবার ঝড় না বিদ্যুৎ না, পাঁচিল-ধারের নিমগাছটার একখানা বৃহৎ ডাল ভেঙে পাঁচিল জখম। ওই পাঁচিলটি মেরামত করতে, মিস্তিরি ডাকতেও তো এই কানা কানাই। তো পা নিয়ে—"

নিশ্চুপ হয়ে মদন লোকটার কথাগুলো শুনে যাচ্ছে, তার মুখভঙ্গি যে অবলোকন করছে তা ধরতে দিচ্ছে না। পায়ের ব্যথার উল্লেখমাত্র দু-দুবারই ট্যাঁপা প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, অনুমান করে আগে থেকেই মদন পা দিয়েই ট্যাঁপার পায়ে চিমটি কেটেছে। ঘটনাটা টেবিলের তলাতেই সংঘটিত হয়েছে, তাই আগন্তুকের নজরে পড়ল না।

সব শোনার পর মদন ট্যাঁপাকে বলল, "টি ডি, খাতাটা বার করো।"

লোকটা বলে উঠল, "টি ডি মানে কী?"

"ও আপনি বুঝবেন না। এখন কয়েকটা কথার জবাব দিন। ক্ষিরি কে?"

"এই দেখুন, ক্ষিরি আবার কে হবে? বাসন-মাজুনি ছাড়া? বাসন-মাজুনি, কাপড়-কাচুনি, ঘর-মুছুনি—"

"ঠিক আছে ঠিক আছে, টি ডি, লিখে নাও। আচ্ছা, আজ তিনতলা থেকে নামেননি কে?"

"কে আর? কর্তা! খামখেয়ালির বাদশা।"

"মাঝে-মাঝে এ-রকম খেয়াল করেন তিনি?"

"এ-রকম, সে-রকম, কত রকমই করেন। হিসেব আছে নাকি? ওই খেয়ালের জ্বালায়—"

"কথা একটু শর্টকাটে বলুন!"

"ওঃ! আচ্ছা!"

"কানাই! কানাই কে?"

"এই যে আপনাদের সামনে।"

"আপনিই! তা চোখ তো ভালই রয়েছে একজোড়া এ নাম কেন?"

"কর্তার মর্জি!"

"হুঁ! আচ্ছা কর্তা এভাবে বেলা দশটা অবধি ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে আছেন, আপনার ভয় হচ্ছে না?"

"ভয়? ভয় হতে যাবে কেন ভাবনা হচ্ছে

"কী ভাবনা হচ্ছে?"

"এই প্রাতঃকাল থেকে এতক্ষণে তিনবার চা খাওয়ার টাইম, সে জায়গায় একবারও হল না—মাথাটা না ধরে!"

"শুধু এই? আর কিছু না?"

"আর কী হবে বলুন তো
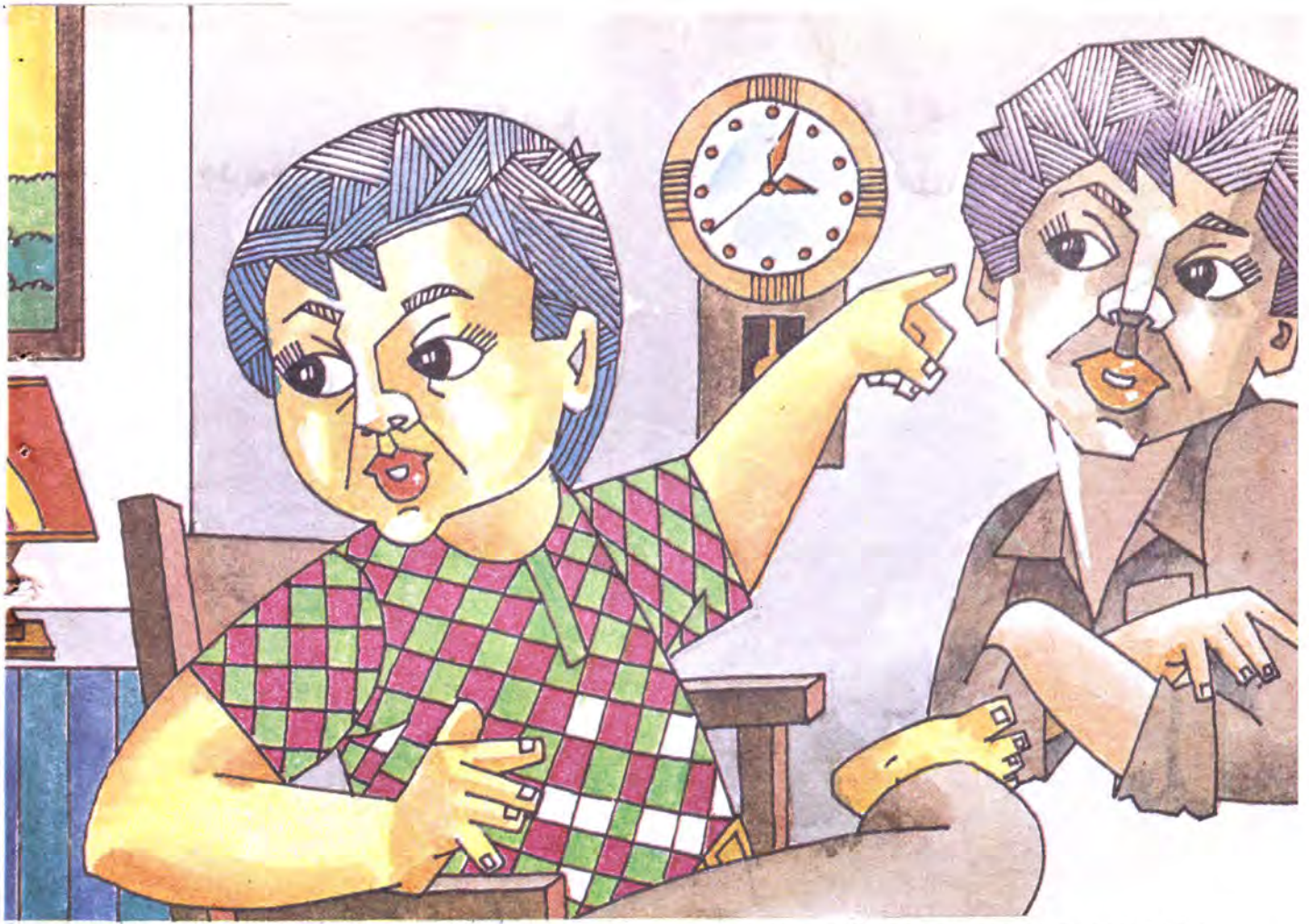
লোকটা ভুরু কুঁচকে বলল, "আর কী হবে ?"

"এই, রাতারাতি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে গেল কিনা—"

"তো আমার কিছু ভাবনা হয়নি। ব্যতিকও না, মানুষের কাণ্ড তো। তা মিস্ত্রি ডাকতে বেরিয়েছি, পানওলা বলল, 'পুলিশে একটা খবর দেওয়া উচিত।' বন্ধুলোক বলল, তাই আর কি আপনাদের কাছে—"

ওর ন্যাকামার্কা মুখের দিকে তাকিয়ে হাড় জ্বলে গেল মদনের। তবু রাগ সামলে বলল, "কর্তার কোনো সাড়া-শব্দ না পেয়েও মিস্ত্রি ডাকতে যাওয়াটা জরুরি মনে হল ?"

কথায় 'শর্টকাটের' নির্দেশের তোয়াক্কা না রেখে লোকটা বলে উঠল, "তা হবে না ? কর্তার নিদ্রাভঙ্গ হলেই পাঁচিলের দৃশ্যটি চোখে পড়বে তো কর্তার ? আর তারপর ? যা সাড়া-শব্দ উঠবে সেইটি ভেবেই যে—"

মদনের ত্রিবারণ অগ্রাহ্য করে ট্যাঁপা হঠাৎ বলে ওঠে, "আর কর্তার যদি আদৌ নিদ্রাভঙ্গ না হয় ?"

এই 'বলে ওঠাটা' তেমন পছন্দ করল না মদন, কিন্তু উপায় কী ? সেও তো পার্টনার। তারও কথা বলার অধিকার আছে। তবে লোকটার মধ্যে এতে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। অবহেলাভরে বলল, "কেন ? কর্তা কি নেশাখোর, না ঘুমের ওষুধ খায় ? তাই নিদ্রাভঙ্গ হবে না ? যখন মনে হবে নেমে এসে চা-চা করবে।"

"সেই ভরসায় বসে থাকতে হবে ?"

"আজ্ঞে কই আর বসে থাকতে পেলুম ? এই তো ছুটে এসেছি। তবে আপনার এই রিপোর্ট লেখালেখির পর ফিরে গিয়ে হয়তো দেখতে হবে নিদ্রাভঙ্গের পর এই হতভাগাকে বাড়িতে দেখতে না পেয়ে তুড়িলাফ খেয়ে বেড়াচ্ছে কর্তা। ওই পানওলাটাই—"

"হুঁ।"

মদন আরো গম্ভীরভাবে বলে, "লাফ দিয়ে বেড়ালেই মঙ্গল। তবে পাড়ার থানায় একটা খবর দিলে ভাল করতেন।"

"এই দেখুন। আবার থানা-পুলিশ কেন ? সেরেছে ! পুলিশ মানেই তো বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা ! ওই কারণেই এই এলেবেলে জায়গায় এলুম।"

"এলেবেলে !"

মদন ভুরু কুঁচকে বলল, "কিন্তু ধরুন কর্তা সারা দিনে দরজা খুললেনই না। তখন ? দরজা-ফরজা ভাঙতে হবে কি না ?"

"তা যা করার আপনারাই করবেন।"

"না !"

মদন অটল গলায় বলে, "সে দায়িত্ব আমরা নিতে পারি না। আমরা শখের গোয়েন্দা।"

"তবে আর দরজায় নামের প্লেট লাগিয়ে বসে আছেন কেন ছাই ?"

"বললাম তো শখের ব্যাপার। দরজা ভাঙার রাইট নেই।"

"তবে তো মাথা কিনেছেন ! ধ্যাত !" বলে লোকটা পাক খেয়ে ঘুরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ট্যাঁপা আর থাকতে পারল না। চেঁচিয়ে বলে উঠল, "ওহে আপনার পা ভাল হয়ে গেল কী করে ?"

লোকটা ঘাড় ফিরিয়ে জ্বলন্ত চোখে কটমটিয়ে তাকিয়ে আবার খোঁড়াতে-খোঁড়াতে চলে গেল।

মদন বলে উঠল, "তোকে নিয়ে আর পারা গেল না টি ডি। পা সেরে যাওয়ার কথা বলতে গেলি কেন ?"

"বলব না মানে ? লোকটা এতবড় একটা ধাপ্পা দিয়ে চলে যাবে, আর আমরা জেনে-বুঝে বোকার মতন চুপ করে থাকব ?"

"ওরে ট্যাঁপামানিক, ওইটিই হল গোয়েন্দা, ডিটেকটিভের প্রধান গুণ ! ওই জেনে বুঝে বোকা সেজে থাকা। কার্যক্ষেত্রের শেষপারে

ওই জানা বোঝাটি প্রকাশ করতে হয়।"
"জানিনে বাবা। তুই যে কী করে এসব শিখেছিস ?"
"তুইও শিখবি। তো হ্যাঁ, সব কথা লিখেছিস ?"
"লিখলুম তো।"
"পড় শুনি—"
ট্যাঁপা টানটান হয়ে বসে খাতা ধরে বলল, "নম্বর এক, কোনো বাড়িতে একজন চা-খেগো কর্তা, সকালবেলা—"
"চা-খেগো কর্তা লিখতে কে বলল ?"
"বলবে আবার কে ? যা শুনলুম তাই লিখেছি।"
"থাক, ওটা কাট।"
"বেশ। কাটলুম। কর্তা সকালবেলা, বেলা দশটা অবধি ঘরের দরজা খুলছে না।"
"হুঁ। তবে ব্র্যাকেটে লেখ্ অথচ লোকটা আর্লি-রাইজার।"
"ইংরিজিতে লিখতে হবে ?"
"ইচ্ছে হলে বাংলায় লিখতে পারিস। তা মানেটা জানিস ? কী, জানিস না ?"
ট্যাঁপা একগাল হাসে। "ভোরে ওঠা লোক তো ?"
"গুড ! পড়ে যা।"
"নম্বর দুই, যে লোকটা খবর দিতে এসেছিল, সে লোকটা জোচ্চোর। পায়ে কিস্যু হয়নি। মিছিমিছি খুঁড়িয়ে এসে বলে ভুক্তে না ভগবানে—"
"না ! খাতার পাতাটাই নষ্ট করলি রে ট্যাঁপা। এই তোর কেস রিপোর্টের ভাষা ? আর কী লিখেছিস শুনি ?"
"বাসনমাজুনি ক্ষিরির কামাই ! অথচ রোজ—"
"থাক। অথচ-টথচ লিখতে হবে না ? তারপর ?"
"ঝড় নেই, তবু নিমগাছের ডাল ভেঙে পাঁচিল জখম। বদমাস লোকটা কর্তার ভাবনা না ভেবে মিস্তিরি ডাকতে যাচ্ছিল—পানের দোকানের পানওলা—"
"ট্যাঁপা রে, আরো কিছু লিখেছিস ?"
"হ্যাঁ—অ্যাঁ, লোকটার নাম কানা কানাই। যদিও কানা নয়। আমাদের ওপর রাগ করে চলে গেল। আসলে পুলিশের নামে ভয় পেয়ে—"
মদন চেয়ারের পিঠে ঘাড় হেলিয়ে হতাশ গলায় বলল, "তোর আর-কিছু 'আসল' বাকি আছে ?"
"আবার কী থাকবে ? চলেই তো গেল।"
"হুঁ ! দে আমায় খাতাটা। তুই একটু চায়ের ব্যবস্থা কর বরং !"
গোয়েন্দা-যুগলের খাওয়া-দাওয়া সবই জগবন্ধু বোসের রান্নাঘরে। শুধু অসময়ে চা খাবার জন্যে এখানে জনতা স্টোভ আর অন্য সরঞ্জাম মজুত। চা বানাতে ট্যাঁপা ওস্তাদ !
কিছুক্ষণ পরে দু-হাতে দু-পেয়ালা চা নিয়ে ঘরে ঢুকল ট্যাঁপা। এবং গম্ভীর ভাবে বলল, "আর একটা দৃশ্য দেখলুম সিঁড়ির জানলা থেকে।"
"কী আবার দৃশ্য দেখলি ?"
"সেই কানা নয় খোঁড়া নয় অথচ কানাখোঁড়া লোকটা একটা রাজমিস্তিরির সঙ্গে কথা কইতে কইতে চলে গেল।"
"খোঁড়াতে খোঁড়াতে ?"
"না, সোজা স্ট্রেট।"
"কোন্ দিকে গেল ?"
"ওই পানের দোকানের পাশের গলির মধ্যে ঢুকে গেল।"
"তার মানে, ব্যাপারটি ওইদিকেই। দে চা।"
চা খাওয়ার পর ট্যাঁপা বলল, "দেখি, তুই কী লিখলি।"
"পড়।"
ট্যাঁপা পড়ে গেল—নাম্বার ওয়ান—। ১ নম্বর—ঘটনা এই। গৃহকর্তার তিনতলার শয়নকক্ষের দরজা বেলা দশটা অবধি বন্ধ ! যদিও তিনি আর্লি রাইজার।
২—বাড়িতে থাকার মধ্যে গৃহভৃত্য কানাই। তার হঠাৎ পায়ে ব্যথা হওয়ায় তিনতলায় উঠে ডাকাডাকি করতে অক্ষম।
৩—পরিচারিকা নিয়মিত হলেও, এই দিনই অনুপস্থিত।
৪—ঝড়বৃষ্টি হয়নি, তা সত্ত্বেও পাঁচিল-ধারে নিমগাছের একটি বড় ডাল ভেঙে পড়ায় পাঁচিলটির খানিকটা ধসে পড়েছে।
৫—কানাই, কর্তার এই দরজা না খোলাটাকে তাঁর খেয়াল ভেবে, নিরুদ্বিগ্ন। পুলিশে খবর দেবার দরকার বোধ করেনি।
৬— দেখা গেল, পাঁচিল সারাবার জন্যে কানাই একটা রাজমিস্ত্রি ডেকে নিয়ে গেল। গন্তব্যস্থল পানের দোকানের পাশের গলি।
ট্যাঁপা ক্ষুণ্ণ গলায় বলল, "তুই আর নতুন কী লিখলি ? আমিও তো এই লিখেছিলুম। আমি একটু গুছিয়ে লিখেছি, তুই তড়বড়িয়ে লিখেছিস।"
মদন হাসল, বলল, "তড়বড়িয়ে লেখার অভ্যেস করলে তবেই তড়বড়িয়ে কাজও শিখতে পারা যাবে রে।"
সারাদিন জল্পনা-কল্পনা চলে।
"তোর কী মনে হচ্ছে বল তো এম্ পি ?"
"মনে তো অনেক কিছুই হচ্ছে। তোর ?"
"আমার অত অনেক কিছু হচ্ছে না। ব্যাপারখানা তো সাদা বাংলা।"
"সাদা বাংলা ?"
"তা ছাড়া আর কী ? নিয্যস ওই কর্তাটা রাতারাতি নিহত হয়েছে, আর সেটি করেছে ওই জোচ্চোরটাই। বাবুর সংসারে আর কেউ নেই বোঝাই যাচ্ছে। নিজেই খতম করে নিজেই সাধু সেজে টিকটিকি পুলিশ ডাকতে এসেছিল। ভেবেছিল ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলে, ধামাচাপা দিয়ে তারপর 'বাবু বাবু' করে শোক করবে। তো আসল পুলিশের নামে ঘাবড়ে গিয়ে সটকান দিল।"
মদন বলল, "ব্যাপারটা সহজ সরল হলে তাই হয় বটে !"
ট্যাঁপা বলল, "সহজ সরল ছাড়া আবার কী ? জলের মতন সোজা। নিশ্চয়ই বুড়োর অনেক টাকা ছিল। তারই লোভে—"
"বুড়ো একথা তোকে কে বলল ?"
"বাঃ, বুড়ো নয় ?"
"কেন ? বুড়োই হতে যাবে তার মানে কী ? বুড়ো হলে তার সংসারে কিছু লোকজন থাকতে পারত।"
"ঠিক আছে, বুড়ো নয়। উঃ। আমার মনটা নিশপিশ করছে একবার দেখে আসতে। চল না মদনা।"
"আবার মদনা ? এই ! আস্তে। কোথায় চলব ?"
"ওই মার্ডারের জায়গায়।"
"জায়গাটা কোথায় তুই জানিস ?"
ট্যাঁপা মাথা চুলকোয়, "ইয়ে তাই তো !" তারপরই সতেজে বলে ওঠে, "ওই তো। পানের দোকানের পাশের গলিতে ঢুকে পড়ে খুঁজে নেব জিগ্যেস-টিগ্যেস করে—"
"লোকের বাড়ি-বাড়ি দরজা ঠেলে জিগ্যেস করবি, 'মশাই এ-বাড়িতে কোনো খুন হয়েছে কি না ?'"
ট্যাঁপা বোকা হতে পারে, তবু ঠাট্টাটা বোঝে। রেগে গিয়ে বলে, "তুই বড্ড এঁড়ে তক্কো করিস মদনা। কোন্ বাড়িতে কানা-কানাই কাজ করে সেটাই জিগ্যেস করব।...আমি বলছি ওই খুনি !"
"কিন্তু খুনই যে হয়েছে তাতে এত স্থির বিশ্বাস কেন ?"
ট্যাঁপা রেগে গিয়ে বলল, "খুন না হলে, যে লোক ভোর থেকে চা-চা করে, সে কেন বেলা দশটা অবধি দরজা খুলবে না ? সাড়াশব্দ করবে না ?"
"জ্বরটর হতে পারে। হয়তো উঠতে পারছে না।"
মদনের কথায় ট্যাঁপা একটু মিইয়ে গেলেও মুখে জোর করে বলল, "তাই যদি হবে তো ওই পাজিটা গোয়েন্দা খুঁজতে এল

কেন ? খোঁড়া সাজতেই বা গেল কেন ?"

মদন মুচকি হেসে বলল, "তুই 'কেছ্, কেছ্' করে মরছিলি, তাই বোধহয় তোকে একটা কেছ্ দিতে এসেছিল।"

"সব সময় ইয়ার্কি মারিসনি মদ্না। ভাল লাগে না। যা। এসে তো ছিল, তুই গেলি পুলিশ দেখাতে। আমরা কি আর একটা দরজা ভাঙতে পারতুম না ?"

"পারতুম, তবে পরে পুলিশ এসে আমাদের মাথা ভাঙত।"

"তার মানে ?"

"মানে সেটা হবে ওনাদের পবিত্র অধিকারে হস্তক্ষেপ। যা করতে হবে ওনাদের পারমিশান নিয়ে ! চুরিটুরির ঘটনা হলেও বা কথা ছিল। এ যে আবার গোলমেলে ব্যাপার।"

ট্যাঁপা এতশত বোঝে না।

তবে ট্যাঁপার বুদ্ধিটা নেহাত ফ্যালনাও নয়।

সে যা বলেছে, তাই তো ঘটেছে দেখা যাচ্ছে।

॥ ২ ॥

সন্ধ্যার দিকে পাড়ায় হৈ-চৈ। ভয়, আতঙ্ক ! এখানে হঠাৎ এমন একটা ঘটনা ঘটতে পারে তা কে কবে ভেবেছে ? গলির একেবারে শেষে যে পুরনো আমলের মস্ত তিনতলা বাড়িটা বরাবর পাড়ার লোকের কাছে প্রশ্নচিহ্নের মতো দাঁড়িয়ে থেকেছে, কক্ষনো কাউকে 'আসুন, বসুন' বলে আপ্যায়ন করে দরজা খুলে দেয়নি, আজ সে বাড়ির দরজা দু-হাট করে খোলা। সেখানে ভিড়ে ভিড়াক্কার ! কারণ, আজ সে-বাড়ির দরজায় পুলিশ !

তার মানে ভয়ানক একটা কিছুই ঘটেছে। তবে একা হলে কেউ পুলিশের দিক ঘেঁষতে আসে না। পুলিশের ছায়া দেখলে সরে পড়ে, কিন্তু অনেকজন হলে আর ভয় থাকে না। তাই এই লালরঙা তিনতলা বাড়িটার দরজায় আজ ভিড়।

পুলিশকে তাহলে ডেকেছে সেই কানা-কানাই ? কিন্তু এই সারাদিন পরে ? সকালের দিকেই তো পুলিশের কথা হয়ে গেছে।

আরে, সেই কানা-কানাই ডেকেছে নাকি ? সে তো দিব্যি নিশ্চিন্দি হয়ে বসে ছিল। বিকেলে ক্ষিরি এসে সব শুনে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে লোক জড়ো করে পুলিশ আনিয়ে ছেড়েছে।

যখনি সে শুনেছে সকাল থেকে দরজা খোলেনি দাদাবাবু, তখনি ছুটে তিন তলায় উঠে গিয়ে দমাদ্দম ধাক্কা দিয়েছে দরজায়। আর সেই সময়ই নাকি দরজার ফাঁক দিয়ে তার নাকে এসে লেগেছে পচা মড়ার গন্ধ !

নাকে কাপড় দিয়ে চেঁচাতে-চেঁচাতে নেমে এসে ক্ষিরি রাস্তায় বেরিয়ে লোক ডেকেছে। আর কানাইকে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি করেছে। এমনকী জোর গলায় এটা বলতেও কসুর করেনি, "দাদাবাবু সকাল থেকে দোর খোলেনি, আর তুই মুখপোড়া নিশ্চিন্দি হয়ে ওই পানওলাটার সঙ্গে ফুসফুস গুজগুজ করছিস ? ভগবান জানে দাদাবাবুকে খুন করে রেখেছিস কি না দু'জনায়।"

তখন কানাই চোটপাট করেছিল, "খুন করে তারপর মাছি হয়ে বেরিয়ে এসেছি, কেমন ? বলি ঘরটা যে ভেতর থেকে বন্ধ, তা খেয়াল আছে ?"

কিন্তু ক্ষিরি কি কম যায় ? খুনের কত ধরন আছে ক্ষিরি জানে না ? রাত্তিরে খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেওয়া যায় না ? খাওয়া-দাওয়া যার হাতে তার পক্ষে আবার এটা শক্ত কী ? সেই বিষ খেয়ে তা'পর ঘুমিয়ে মরে থাকুক মানুষটা !

পুলিশ আসার পর এসব কথায় থামা দিয়েছে। তবে নাকে কাপড়টা চেপে আছে।

ট্যাঁপা মদনা অথবা টি সি দাস, আর এম কে পাল এই অচেনা বাড়িটায় এসে ঢুকে পড়ল ভিড়ের সুযোগে, পুলিশ তখনো বন্ধ দরজা ভাঙেনি। সব লোকই তো আর দরজা ভাঙতে পারে না ! তার জন্যে আলাদা লোক থাকে। তাকে ডাকতে গেছে, তখনো

আসেনি।

পুলিশের লোক কানাই ক্ষিরি আর পানওয়ালাকে আটক করে জেরা করছে। প্রথমেই ক্ষিরি! বোধহয় 'লেডিস ফার্স্ট' হিসেবে।

"তুমি রোজ সকালে আসো?"

ক্ষিরি সতেজে বলে, "আসি না তো কাজগুলো করে কে?"

"কখন আসো?"

"বলুক না ওই কানাই মুখপোড়া, কখন আসি। তখনো রাতের অন্ধকার কাটে না। কাজ কম? এই মস্ত বাড়ি

"থামো—আজ এসেছিলে?"

"অ মা! এ যে সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতা কার পিতা? আমি এলে দাদাবাবু এই সারা দিনমান দুয়োর-বন্ধ পড়ে থাকে? তখুনি ঠেঙিয়ে দুয়োর ভাঙি না?"

"কেন আসোনি। আজই কামাই কেন?"

"কামাই? শোনো কথা! দাদাবাবুকে বলে যাইনি যোগে গঙ্গাছান করতে যাব!"

"তোমার দাদাবাবু এখন সাক্ষী দিতে আসছে না

জেরাকারী দাপুটে গলায় বলে, "এই কানাইকে তো বলে যেতে পারতে!"

"কেন? ও মুখপোড়াকে বলে যেতে যাব কেন? ও আমার মুনিব?"

"তাহলে বলছ, কানাই জানত না তুমি ছুটি নিয়েছ?"

"জানত কি না জানত ওই লক্ষ্মীছাড়াই জানে। দাদাবাবুর আদরের লোক, তিনি ওর কাছে যদি বলে থাকে। বলেছে নিয্যস। তা নইলে রাতারাতি এই কাণ্ড ঘটে?"

"চোপ্! কী কাণ্ড? জানো তুমি?"

"এর আবার জানার কী আছে? তোমরা জানছ না? পচামড়ার গন্ধ বেরোচ্ছে ঘর থেকে। আহা! দাদাবাবুর যে সোনার গৌরাঙ্গ হেন চেহারা গো! কে এমন পিচাশ আছে গো? আর কে? ওই—কানাই ছাড়া?"

"থামো বেশি বকবক কোরো না। চুপ থাকো। পালাবার চেষ্টা কোরো না।"

"পালাবার? বটে?"

ক্ষিরি চোখ পাকিয়ে বলে ওঠে, "সাধে কি আর লোকে বলে পুলিশের কথা ব্যাঙের মাথা। পালাবই যদি তো পাড়া মাথায় করে চেঁচিয়ে তোমাদের ডেকে আনাব কেন? অ্যাঁ, আনাল কে তোমাদের? অ্যাঁ?"

"চোপ!"

এরপর কানাই।

"নাম কি তোর?"

"আজ্ঞে এসে অব্দিই তো শুনছেন কানাই।"

"ওরে আমার ব্রজের কানাই। কতদিন আছিস এখানে?"

"তা সে অনেকদিন।"

"অনেকদিন মানে কী? কতদিন?"

"আজ্ঞে এ জবাব দিতে হবে জানলে সন তারিখ মাসটাস মুখস্ত রাখতুম।"

"চোপ্! সোজা কথার সোজা উত্তুর দে। বাবুর কী কী কাজ করতিস তুই?"

"আজ্ঞে কী নয়? জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ!"

"হুঁ। বাবুর আলমারি, দেরাজ-টেরাজে হাত দিতিস?"

"হাত দিতুম না? তবে বাবুর ছিষ্টি জিনিসের গোছ করত কে? হিসেব রাখত কে? ব্যাঙ্কে যেত কে? বরং বলতে পারেন বাবুই দৈবাৎ হাত দিতেন!"

"বুঝেছি। বেশ একখানা বোকাহাবা শাঁসালো মক্কেল পেয়েছিলি! তবে আর লোকটাকে হাপিস করার দরকার কী ছিল?

আসল মালপত্তর হাপিস করলেই হত !"

"আজ্ঞে কী বলছেন বুঝতে পারছি না।"

"চোপ বদমাস। বুঝতে পারছ না! খোকা! কীভাবে কী করেছিস কর্তাকে ?"

কানাই গুম হয়ে গিয়ে বলে, "আপনারাই তদন্ত করে বার করুন। আমার কথা তো বিশ্বাস করবেন না!"

"বেটা তোকে চাবকে ছাল তুলব। বাড়ি কোথায় ?"

"আজ্ঞে এই তো। এখানেই তো জীবনপাত।"

"বদমাস পাজি, বলি দেশ কোথায় ?"

"শুনেছি মেদনিপুর।"

"শুনেছিস ? দেখিসনি ?"

"আজ্ঞে না। কবে আর দেখলুম ? হতভাগা কানাইয়ের মা বাপ কোনো জম্মে ছিল, না সে ভুঁইফোঁড় তা জানি না। জ্ঞান অবধি এর ওর তার কাছে। জাঙিয়া পরার কাল থেকে পরের দাসত্ব করেছি। অবশেষে এইখানে স্থিতি।"

"হুঁ। দাসত্বর বদলে রাজত্ব। একেবারে রামরাজত্ব। বেটা তুমি দেশের বাড়ির ঠিকানা প্রকাশ করবে না ? পোস্টাপিস থেকে বার করে নেওয়া যাবে না ? মাস-মাস মনি-অর্ডার করতিস কোথায় ?"

"সেই যে বলে না, ঘরে নেই যা ছেলে চায় তা। এ হচ্ছে তাই। মনি-অর্ডার করতে হয় কোন্ কাগজে তাই জানিনে।"

"শাট্‌আপ ! বেশি কথা বলবি তো এমন মার দেব। ব্যাটা, ওই পানওলা ব্যাটার সঙ্গে তোর এত কিসের দোস্তি ? ও একটা বুড়ো লোক।"

এসময় ক্ষিরি খরখরিয়ে ওঠে, "বুড়ো লোক না হলে ওই মুখপোড়াকে জামাই করতে চাইত ? সমোবয়সী বন্ধুকে জামাই করা যায় ? তা' দাদাবাবু—"

"চুপ ! দাদাবাবুটা কে ?"

"অ মা ! আবার সেই সাতকাণ্ড রামায়ণ। দাদাবাবু হচ্ছে এ-বাড়ির মালিক। যিনি এখন খুন হয়ে পড়ে আছেন। লাশ পচে উঠেছে। আহা অমন সোনার গৌরাঙ্গর মতন চেহারা গো। তো দাদাবাবু এই সব! ফেকরা দু' চক্ষে দেখতে পারে না। বলে 'বিয়ে করে বুদ্ধুরা।' বলে, 'কানাই, স্বাধীনতার বড় সুখ নাই! বিয়ে থা করলি কি ওই সুখটি গেল। এই দ্যাখ না আমি কত সুখে আছি।' ইদিকে পানওলা বুড়ো নুকিয়ে নুকিয়ে জপাচ্ছে ওর মেয়েকে বে করতে। তাই সব্বোক্ষণ গুজগুজ ফুসফুস।"

"বটে !"

পুলিশসাহেব সারা মুখে আলো জ্বেলে টানটান হন। "তবে তো সবই পরিষ্কার হয়ে গেল ! বাড়ির মালিক ব্যাচিলার, তিনি চান তাঁর পেয়ারের চাকরও তাই থাকুক। এদিকে এরা চায় বিয়ে। কাজেই—"

নিজের হাতের চেটোয় নিজেই একটা জোর ঘুসি মেরে বলেন, "কাজেই পথের কাঁটা সরানো দরকার। তাছাড়া আলমারি-দেরাজ যখন সবই নিজের হাতে ! ব্যাটা নেমকহারাম, তোকে ফাঁসিতে না ঝুলিয়ে ছাড়ছি না আমি।"

কানাই এখন আর পুলিশ বলে ভয় করে না। নির্ভয়ে বলে, "তাই করুন। যেটা সহজ। বলি, কর্তা একটা ছ' ফুট চার ইঞ্চি যোগবেয়াম করা শরীরের মানুষ। এই চারফুটিয়া কানা-কানাইয়ের সাধ্যি তেনাকে খতম করা ?"

"তবে তুই ব্যাটা পায়ের ব্যথার ভান করেছিলি কেন ?"

"আজ্ঞে পাঁচজনের জ্বালায় বারংবার তিনতলায় উঠে দোর ধাক্কাতে হবার ভয়ে।"

"ওঃ রাস্কেল। একথা মনে আসেনি, কর্তা রাতে ঘুমের মধ্যে হার্টফেল করে মরে থাকতে পারে ?"

কানাই বলে ওঠে, "অমন অপয়া চিন্তা মনে আনতে যাব কেন স্যার ? সাতজন্মে হার্টের ব্যামো নেই, অমন জোয়ান মানুষটা। হার্টফেল শত্তুরের করুক।"

"কথার জাহাজ বেটা শয়তান ! তবু বল কী ভেবে চুপচাপ ছিলি ? এমন ক্ষেত্রে লোকে পুলিশ ডাকে না ? ভাবে না আত্মহত্যা করে বসেছে কিনা ?"

"তা ডাকতে গেছলাম হুজুর। টিকটিকি-পুলিশকে।"

"টিকটিকি-পুলিশ ?"

"আজ্ঞে এই সামনেই যে দুজনা টিকটিকি-পুলিশ একখানা আপিস খুলে বসেছে। তো ভাবলুম, একটু হোমোপাথি ডোজ দেওয়া যাক না হয়। তো এনারা তো কেসটা নিলেনই না ! বললেন দরজা ভাঙতে পুলিশ চাই। থানার পুলিশ। অত ঝামেলায় কে যায় ?"

"এঁরা। এঁরা মানে ?"

"এই যে এনারা।"

কানাই ট্যাঁপা আর মদনকে দেখিয়ে দেয়।

দারোগা ওদের দিকে একবার জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বলেন, "এই এক জ্বালাতন হয়েছে আজকাল। মশামাছির মতন ঝাঁকে-ঝাঁকে শখের গোয়েন্দা গজাচ্ছেন। সব কেসে নাক গলাতে আসা চাই। সবাই যেন সবজান্তা !"

রাগে গা জ্বলে গেলেও মদন ঠাণ্ডা গলায় বলল, "আজ্ঞে সব জায়গায় তো আর হাতিরা নাক গলাতে পারে না, ফুটো-ফাটা, ছ্যাঁদা-ছিদ্দির দিয়ে নাক গলাতে মশা-মাছিরই সুবিধে। যাক, এখানে দয়া করে নাকটা একটু গলাতে দেবেন ?"

দারোগা ব্যঙ্গের গলায় বলেন, "তা তো বলবেনই ! লাশ সরাতে আমরা, ময়না-তদন্ত করতে আমরা, সন্দেহভাজনদের লক-আপে রাখার ঝক্কি পোহাতে আমরা, আর আপনারা দুধের ওপর সরটির মতো ভেসে থেকে গোয়েন্দাগিরি করে ক্রেডিটটা নেবেন।"

"আজ্ঞে ক্রেডিট কিছু নিতে চাইছি না। বললুম তো শখের ব্যাপার। শিক্ষানবিশির কাল। আপনাদের ছায়ায়-ছায়ায় একটু দেখতে ইচ্ছে, এই আর কী ! আমাদের আর কে পাত্তা দিচ্ছে !"

তোয়াজে কিঞ্চিৎ হৃষ্ট হয়ে দারোগা হুকুম দিচ্ছিলেন— ঠিক আছে, আপনারা আসতে পারেন। এই সময় দরজা ভাঙার লোক এল।

সদলবলে সিঁড়িতে উঠে এলেন দারোগাসাহেব। দরজা ভাঙবার লোককে নিয়ে।

জগবন্ধু বোস বললেন, "আমি আর ওপরে যাচ্ছি না বাবা ! কী দৃশ্য দেখতে হবে তা তো বুঝতেই পারছি। আহা ভদ্রলোককে, লোকই বা কী, ছেলেটিও বলা যায়, কখনো-কখনো বাজারে দেখেছি। ফাইন চেহারা। ওই সার্ভেন্টটির সঙ্গে আসতেন, গাদা করে মাছ-মাংস কিনতেন। লোকটা বারণ করত, এত কিনছেন কেন বাবু, খাবে কে ? মোটে তো দুজন। তো হা-হা করে হেসে বলতেন, তুই খাবি। তুই তো একাই একশো রে !"

পাশের এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন, "সেই ভালবাসার এই প্রতিদান ! কী অকৃতজ্ঞ পৃথিবী ! পুষ্যিপুত্তুরের মতো থাকত ব্যাটা, তাতেও মন উঠল না।

॥ ৩ ॥

মদন জনান্তিকে বলল, "টি ডি. কী বুঝছিস ?"

"যা বোঝবার ঠিকই বুঝছি। তুই-ই সোজা ব্যাপারটাকে ব্যাঁকা করে দেখতে ভালবাসিস। গন্ধ পাচ্ছিস ?"

"কই, না তো !"

"তাকিয়ে দেখছিস ?" বলে ট্যাঁপা পকেট থেকে রুমাল বার করে নাকে চাপল।

মদন তাকিয়ে দেখল, সমবেত ভদ্রলোকদের সকলেরই রুমাল অথবা কোঁচার খুঁট নাকে উঠেছে।

তার মানে সকলেই সাবধানী !

দরজাটা ভেঙে খুলে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই যে পচা গন্ধটা ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে বায়ু দূষণ করবে এটা তো অবধারিত !

পুলিশের ডেকে আনা দরজা-ভাঙিয়েটি আধুনিক কোনো পদ্ধতিতে যে নিঃশব্দে দরজা ভাঙল, তা নয়, সেই চিরকেলে পদ্ধতিতে দমাদ্দম ঘা !

শেষ শব্দর আগেই অপেক্ষমান জনতা ঠিকই পায়ে পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসেছে। "ওরে বাবা, সে-দৃশ্য দেখতে পারব না" বললেও ভয়ংকর একটা কোনো দৃশ্য দেখতে পাবার লোভও তো কম নয়। রোজ-রোজ তো আর পাড়ায় এমন ঘটনা ঘটছে না !

কপাট দু'খানা ভেঙে পড়ল।

দরজা হাট হয়ে গেল।

ঠেলাঠেলি পড়ে গেল দরজার কাছে।

ট্যাঁপা ও মদনা ঢুকে এল সেই ঠেলাঠেলিতে আর দেখতে পেল—

কী দেখতে পেল ?

কিছু না।

ঘরে কেউ নেই, কিছু নেই। পাখি ফুড়ুত, খাঁচা খালি। পচে-ওঠা-লাশ হাওয়া হয়ে গেল ?

ঘর যেমনকে তেমন সাজানো-গোছানো, ফিটফাট ! গতরাত্রে যে কেউ শুয়েছিল, বিছানা দেখে তা মনে হবেই না।

সামনে বারান্দার দিকের দরজাটার ওপর নীচের দুটো ছিটকিনি এঁটে স্থির হয়ে সেঁটে বসে আছে।

আর কোনো দিকে কোনো ফাঁকফোকর কিছু নেই। পুরনো আমলের বাড়ি, বাথরুম ঘরের সঙ্গে অ্যাটাচড্ নয়। পাশে প্যাসেজের গায়ে। কাজেই ঘরের পুরো চারটে দেয়ালই শক্তপোক্ত, মজবুত। আর তাতে মজবুত গ্রিল দেওয়া জানলার সারি।

বারান্দা আছে একদিকে, সেদিকে দরজাও আছে, তো সেই দরজাটি তো ওই !

বন্ধ ছিটকিনি দুটো ভাল করে দেখলেন দারোগাসাহেব।

উঠে এসেছিল কানাই আর ক্ষিরিও পাহারাওলার হেফাজতে। আসামিরা যাতে না ফুড়ুত করে। কিন্তু এ কী ? লাশই ফুড়ুত !

এদের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে দারোগা বললেন, "এর মানে ?"

কানাই মাথা চুলকে বলল, "আমি আপনাদের মানে বোঝাব স্যার ? আপনারাই তো মানে বার করবেন।"

"এই, তুমি না পচা মড়ার গন্ধ পাচ্ছিলে ?" ক্ষিরিকে এক ধমক দিয়ে প্রশ্ন করেন দারোগাসাহেব।

ক্ষিরি নাকের কাপড় সরিয়ে অবাক হয়ে ঘরটা দেখছিল। এখন নাকের কাপড় সরিয়ে বলে উঠল, "তা' মালটাই যদি হাওয়া হয়ে গেল, গন্ধটা কি ঘর আগলে বসে থাকবে ?"

মস্ত ঘর। ঘরটি নিথর, নির্মল ! মাঝখানে একখানি খাট, অথবা পালঙ্কই বলা যায়। সেকেলেমার্কা কাজ করা ভারীভুরি।

বিছানায় অবশ্য একটি বেশ শৌখিন মণিপুরী ডিজাইনের বেডকভার পাতা। খাটের ধারে ছোট একটা টেবিল, তাতে দু-চারখানা বই, একটি স্টেনলেসের বাতিদানে আধখানা পোড়া মোমবাতি গোঁজা !

পাশের দিকের দেয়ালের ধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুটো স্টিলের আলমারি, এপাশে লম্বা আরশি-দেওয়া ডেসিং টেবিল। সবই সেকেলে। একেলের মধ্যে পায়ের দিকে একটা ওয়ার্ড্রোব, আর মাথার দিকে দুটো বুক-সেল্ফ ! জানলা-দরজার পর্দাগুলোও ওই মণিপুরী ডিজাইনের। উঁচু দেয়ালে একটি ভদ্র চেহারার ব্যক্তির মস্ত ফোটো।

"ঘরটা বাবুর বাবার।" কানাই বলল, "মা তো ছেলেবেলায় গেছে।"

"ওঃ। সবজান্তা ! ওই বাপকে দেখেছিস তুই ?"

কানাই ছবিটার দিকে তাকিয়ে একটু হাতজোড় করে বলল, "আজ্ঞে না।"

"তবে নমস্কার করলি যে ?"

কানাইয়ের মুখে একটু হাসি, "আপনাদের কাছে এর আর উত্তুর কী দেব হুজুর।"

"ওঃ ভক্তি ! অতি ভক্তিই চোরের লক্ষণ, বুঝলি ? বল্, বাবু কোথায় ?"

"তাই যদি বলব, তো এত কাণ্ড-কারখানা কিসের হুজুর।"

"ঘরের মধ্যে থেকে কি উবে গেল লোকটা ? কর্পূর, না ন্যাপথালিন-গুলি ?"

কানাই অন্য দিকে তাকিয়ে হাসি গোপন করল।

সত্যি এরকম কথায় কে বা না হাসে ?

ঘরের মধ্যে দাপিয়ে বেড়িয়ে বলে উঠলেন দারোগা, "এই সব আলমারির চাবি কার কাছে থাকে ?"

"আজ্ঞে, কার কাছে আর, আমার কাছেই।"

"অ্যাঁ··· অ্যাঁ··· কী বললি, কার আর, তোর কাছেই ? রাম রাজত্বেরও অধিক। খোল্ আলমারি।"

"খুলতে হবে ?"

"হবে না ? আলমারির মাল সাফ করে, কর্তাকে এর মধ্যে গায়ের করে রেখেছিস কিনা দেখতে হবে না ?"

কানাই নীরবে বুক-সেলফের পিছনে একটা খোপ থেকে একগোছা চাবি বার করে এগিয়ে দিল।

দারোগা আর একবার দাপালেন, "আমি জানি কোনটা কিসের ? খোল্ আমার সামনে।"

কানাই মাথা নেড়ে বলে, "না, হুজুর, একবার আলমারির হাতলে আপনাদের পাউডার ছড়িয়ে আমার আঙুলের ছাপ আবিষ্কার করে বসবেন।"

"বটে বটে ! এত জানো তুমি ? ঘুঘু বদমাস !"

"এসব জানতে আর বিদ্যে লাগে নাকি স্যার ? ও আপনিই খুলুন। চাবিতে কলেতে নম্বর আছে।"

"ওঃ। আর পাউডার ছড়াবার পর আমার আঙুলের ছাপ উঠুক কেমন ?"

"সে আমি কী জানি ?"

"ঠিক আছে।"

হাতে রুমাল জড়িয়ে ঘড়াং-ঘড়াং করে আলমারি দুটো খুললেন দারোগাসাহেব।

না, সেখানে কোনো ছ-ফুট চার ইঞ্চি দেহ গায়েব করা নেই। একটার মধ্যে থরে থরে প্যান্ট-শার্ট ধুতি পাঞ্জাবি, শাল-সোয়েটার ইত্যাদি পুরুষের ব্যবহারের জিনিস। আর একটার মধ্যে থরে থরে বেডশিট, বেডকভার, চাদর, সুজনি, পর্দা, বালিশের ওয়াড় ইত্যাদি পরিপাটি করে গোছানো।

"এসব কে গুছিয়ে রেখেছে ?"

"আজ্ঞে এই হতভাগাই। বাবুকে হাত দিতে দিলে রক্ষে থাকে ? সব হাণ্ডুল-মাণ্ডুল করে ছাড়বে না ?"

"ওঃ ! বাবুর গার্জেন ! তা এত সুখে থেকেও আশ মেটেনি ? আবার বাবুকে নিয়ে খেল কেন ?"

"আপনারা বড্ড বাজে কথা বলেন হুজুর।"

"কী ? কী বললি ? এক থাপ্পড়ে সামনের মুণ্ডু পেছনে ঘুরিয়ে দিতে পারি তা জানিস ?"

"আজ্ঞে জানি বইকী। সে উড়িয়ে দিতেও পারেন।"

আলমারির মধ্যে লকারটাও খুলে ফেলেন দারোগাসাহেব। সকলে নীরব দর্শক।

"হুজুর, ওর মধ্যে ব্যাঙ্কের খাতা, বাড়ির দলিল, ইলেক্‌টিকের

বিল, টেলিফোনের বিল এই সব অগোছ করবেন না।"

"ওঃ টাকাপত্রগুলো সবই সরিয়ে ফেলেছিস, কেমন ?"

"আমার ঘর সার্চ করুন 'গে।"

"সে তো করবই। তো তুমি কি আর তেমনি বোকা যে ঘরে রেখে দেবে ?"

"হুজুর, বাবুর টাকার সন্ধানের আগে বাবুর সন্ধান করলে হত না ?"

"বটে ! তুমি ব্যাটা আমায় জ্ঞান দিতে এসেছ ? কোথায় সন্ধানটা করব শুনি ?"

"তবে আর কী বলব ? এ-কথাও বলে দিতে হবে!"

ওয়ার্ড্রোবটা খুললেন সাহেব। বিশেষ কিছু না। কয়েকটি ব্যবহৃত শার্ট-প্যান্ট। আর একখানি গেরুয়া ধুতি-পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবিতে সুতোর কাজ করা।

"এটা কী ? অ্যাঁ, এটা কী ?"

"দেখতেই তো পাচ্ছেন!"

"কে পরে এটা ?"

"যার ঘর তিনিই পরেন।"

"বটে? এত শৌখিন স্যুট-বুটের সঙ্গে হঠাৎ গেরুয়া?"

"কী করে বলি ? মানুষের মন না মতি। যোগবেয়াম করার গুরুর কাছে যেতে পরতেন।"

"ও, এতক্ষণে যে বেশ নতুন-নতুন কথা ঝাড়ছিস। কোথায় সে গুরু ?"

"তা জানি না।"

"এত জানো, আর এটুকু জানো না

"আজ্ঞে, চাকর-বাকর মানুষ, অত কি আর জানতে চাইতে আছে ?"

এবার দারোগাসাহেব একটা কনস্টেবলকে দিয়ে ঘর তছনছ করতে শুরু করেন। গদি উলটে বইয়ের থাক নামিয়ে আলমারির জিনিস ঘাঁটিয়ে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড।

বারান্দার দিকের বন্ধ দরজাটাও খুলে হাট করে দেন।

মদন আর চুপ করে থাকতে পারে না, হা- হা করে ওঠে—"এটা কী করছেন ? সব চিহ্নই তো লোপাট হয়ে যাচ্ছে।"

দারোগা অবজ্ঞার গলায় বলেন, "ঘরে তো আর মার্ডার হয়নি, এর আর চিহ্ন লোপাট কী ? দেখতে হবে ঘরের কোথাও রিভলভার-টিভলভার লুকনো আছে কি না। যে-সব লোক স্যুটও পরে গেরুয়াও পরে, তারা বড় ডেঞ্জারাস হয়, বুঝলেন ?"

"বুঝলাম।"

রিভলভার পাওয়া গেল না। আপত্তিকর কোনো জিনিসই না। আশ্চর্য ! লোকটা কি তুকতাক করে শরীরটাকে গুটিয়ে পাখিফাকি হয়ে জানলা দিয়ে বেরিয়ে গেছে নাকি ?

আর-কিছু করার নেই।

গটগট করে চলে গেলেন দারোগা দলবল নিয়ে। মার্ডার কেস তো আর নয়। নির্ঘাত কোনো বুজরুকির ব্যাপার।

যাবার সময় ট্যাঁপাদের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে গেলেন, "এবার দেখুন টিকটিকির কারবারে যদি রহস্য-ভেদ হয়।"

"নিম গাছটা একবার দেখে গেলেন না স্যার ?"

"হোয়াট নিমগাছ ?"

"আজ্ঞে কাল রাত্রেই হঠাৎ ওর একটা বড় ডাল ভেঙে পড়েছিল।"

"বটে, নাকি ? হা হা হা, একটা নিমগাছের একটা ডাল ভেঙে পড়েছিল, এটাও আপনাদের মতে একটা ক্লু বোধহয় ? এইসব করে করেই আমাদের সহজ কাজগুলোকে পেঁচিয়ে দেন আপনারা মশাই। বাড়িতে নাকি কোথায় কাক ডেকেছিল, তাদেরও দেখে

যেতে হবে নাকি ? হা হা হা।”

চলে গেলেন। অবশ্য বাড়ির বাইরে পুলিশ-পাহারা বসিয়ে। সেটা নিয়ম।

ঘরের মেঝেয় ওনাদের জুতোর ধুলোর সঙ্গে কিছু কুচোকাচা খুচরো কাগজ উড়তে লাগল। দু-একটা ক্যাশমেমো, দু-একটা ঠিকানা, সেইসঙ্গে দু-চারটে গানের ফাংশানের কার্ড—যাওয়া হয়নি। এগুলো গদির তলায় তোশকের তলায় গোঁজা ছিল। সাহেবের তাণ্ডবে ঘরময় উড়ছে।

মদন যে এর থেকে কিছু সংগ্রহ করে ফেলেছে সেটা কেউ লক্ষ করেনি।

॥ ৪ ॥

রাত অনেকটাই হয়ে গেছে।

পাড়ার লোকেরা সকলেই একে একে কেটে পড়েছেন। নাকের রুমাল খুলেই অবশ্য। কেউই খুশি নয়। যেন দারুণ একটা নাটক জমতে জমতে জমল না, হঠাৎ ঝুলে পড়ল। এ আবার কী একখানা বাজে ব্যাপার।

ট্যাঁপা আর মদন অবশ্য চলে যায়নি। এতক্ষণে তো তারা সবকিছু দেখার সুযোগ পেল।

কানাই আর ক্ষিরি দালানে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করছিল। যেটা তাদের নিত্যকর্ম।

ক্ষিরি বলছিল, “যে যা বলে বলুক, বাবুকে তুইই কিছু করেছিস।”

কানাই বলছিল, “যাই করে থাকি, তুমি তো পচা মড়ার গন্ধ পেয়ে গেছ ক্ষিরিমাসি, তারপর আর তো কিছু করার নেই, যাও, ঘরে যাও, ভাত রেঁধে খাও গে।”

“দুয়োরে পুলিশ।”

“তোমায় কিছু বলবে না। তবে তোমার শাস্তি তোলা রইল। জ্যান্ত মাছে পোকা পড়ালে তুমি। ছ্যাঃ ছ্যাঃ।”

ক্ষিরি চলে গেলে কানাই এখানে এসে দাঁড়াল।

“রাত তো অনেক হল, বাবুদের একটু চা খেলে হত না ?”

ট্যাঁপা বলে উঠল, “পেলে তবে তো—খেলে হত।”

“পেতে এক্ষুনি পারেন আজ্ঞে, যদি এই হতভাগার হাতে খান।”

“কেন, তোমার হাতে কী ?”

“আজ্ঞে যদি বিষটিষ মিশিয়ে দিই ?”

“থামো। বাজে বোকো না। চা একটু খাওয়া দরকার। আমরা আরও একটু থাকব।”

ও চলে গেলে ট্যাঁপা বলল, “লোকটা যে কীরকম ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।”

একটু পরে চা নিয়ে এল কানাই। সঙ্গে ভাল বিস্কুট। চা খেতে খেতে মদন বলল, “দু-একটা কথার জবাব দেবে ?”

“আজ্ঞে দেওয়া সম্ভব হলে দেব বইকী। আপনারা যখন রহোস্য ভেদ করতে এসেছেন।”

“হুঁ। তোমার বাবুর কী কাজ করতেন ?”

“আজ্ঞে বাঁধাধরা কিছু না। এই হয়তো ব্যবসা-বাণিজ্য।”

“চাকরি-টাকরি নয় ?”

“চাকরি ? কী দুঃখে ? বাপের রেখে যাওয়া টাকা খায় কে, তার ঠিক নেই।”

“বাবু কি নিরামিষ খেতেন ?”

“ছি ছি। ফি গরাসে মাছ নইলে রোচে না। রাত্তিরে বাঁধা নিয়মে মাংস মুরগি।”

“বুঝলাম।”

গেরুয়ার কথাটা আর জিজ্ঞেস করল না মদন। সে উত্তর তো শোনা হয়ে গেছে। এটা-ওটা জিজ্ঞেস করল, বাবু বই পড়তে ভালবাসতেন কিনা—কতক্ষণ পড়াশুনো করতেন···আত্মীয়জন বন্ধুবান্ধব কিছু ছিল কি না। কোনো নেশা ছিল কিনা।

জবাব—

“পড়াশুনো নিয়েই তো থাকা। আত্মীয়জন বেশি কেউ আসত না, বন্ধু-টন্ধু দু-চারজন। নেশা বলতে কোনো জিনিসের নেশা নেই, পান-সিগারেটটি পর্যন্ত না, একমাত্র চা। তবে জোর নেশা ওই এক, যোগবেয়াম না যোগ-বিয়োগ কে জানে। তাতেই পাগল। কিন্তু করতেন, বলতেন, এমন বলছেন কেন বাবুরা ? মানুষটাকে একেবারে নেই করেই ভাবছেন বুঝি ? কিন্তু তার কোনো প্রমাণ পেয়েছেন ?”

মদনরা লজ্জিত হয়।

“স্যরি। ভুল হয়ে গেছে ভাই। যাক, ওই নিমগাছের কাছটায় একবার ঘুরে যাব।”

“এই সেরেছে। রাত-বিরেতে নিমগাছের গোড়ায় ? শুনেছি যাঁরা নেই, তাঁরা ওখানে ঘোরাফেরা করেন রাতে!”

“তা হোক, আমাদের অত ভূতের ভয় নেই।”

“মিস্তিরি খেটে গেছে, ইঁট-পাটকেল-সুরকি পায়ে ফুটবে, বালি ছড়ানো, পায়ে ফুটবে, কাল সকালে না হয়—”

“আরে টর্চটা নিয়ে একবার ঘুরে যাব বৈ তো নয়। পায়ে তো জুতো আছে।”

“ভূতের ভয় নেই বলছেন বটে—”

কানাই গুনগুনিয়ে বলে, “ওই ডালটা ভেঙে পড়াটা কিন্তু ভুতুড়ে ব্যাপারেরই মতন। তাছাড়া সাপ-খোপ—”

ট্যাঁপা বলে উঠল, “ভূতের আবার ভূতের ভয়। টর্চ দেখলে সাপ পালায়।”

দু-দুটো টর্চ নিয়ে চলে এল ওরা নিমগাছের দিকে। কিন্তু—

বিশেষ আর কী ? কোনো লাশ পুঁতে রাখার চিহ্নটিহ্ন কই ? পাঁচিলটার যতখানি ধসে গিয়েছিল, ততটা সেই ভাঙা ইঁটগুলো দিয়েই নতুন করে সারানো হয়েছে। বৃহৎ ডালটা লম্বা হয়ে বাড়ির দেয়াল-ধারে শুয়ে পড়ে আছে।

সব কিছুর ওপর দিয়ে টর্চের আলোটা একবার বুলিয়ে নিয়ে মদন বলল, “ঠিক আছে। খুব ভাল চা খাইয়েছ ভাই, ধন্যবাদ।”

॥ ৫ ॥

অফিসঘরে এসেই মদন টেবিলের ধারে বসে, প্যান্টের পকেট থেকে টুকটাক কী-সব কাগজ বার করে খাতায় লিখতে বসল। মনে হল ওখানে কিছু-কিছু নোট করেছে।

ট্যাঁপা কিন্তু মহা উত্তেজিত। বলে, “মদনা, ওই বাজে লোকটাকে তুই ভাই বলে আহ্লাদ দিয়ে কথা বললি ?”

মদন হাসল, “আহা, লোকটা যদি বাজেও হয়, চা-টা তো দারুণ।”

“হবে না কেন ? বড়লোকের সংসার, দামি চা। ভাল দুধ। কিন্তু আসল কথায় আয়। ব্যাপারটা কী মনে হচ্ছে তোর ?”

“যা মনে হচ্ছে, সেটা এখনও সিদ্ধান্তে আসিনি, দেখি আর একটু।”

ট্যাঁপা চেয়ারে এলিয়ে পড়ে হতাশভাবে বলে, “দূর। যাও বা একটা ঘোরালো কেস হাতে আসছিল, স্রেফ গুবলেট। মূলেই হাভাত। অথচ ? অথচ খপরের কাগজ খুললেই রোজ গাদাগাদা আহত, নিহত, হতাহত।”

মদন কড়া গলায় বলল, “ভদ্রলোক খুন হলেই তোর ভাল লাগত ?”

“আমার ভাল লাগার কথা হচ্ছে না। দৈনিক কত কত খুন হচ্ছে না ? আমাদের পাড়ায় একটা হলেই দোষ ?”

“ট্যাঁপা !”

“টি ডি বল্।”

“ছাড় ও-কথা। আমার কথার জবাব দে। দরজা ভাঙার পর

যদি সত্যিই খাটের ওপর একটা রক্তমাখা লাশ দেখতে পেতিস, খুব আহলাদ হত তোর ?"

"তা গোয়েন্দা হতে হলে—।"

"গোয়েন্দা হতে হলে মায়া-মমতা বিসর্জন দিতে হবে ?"

"তা ভাল কেস আমরা পাচ্ছি কই ? মামাবাবু একদিন বলছিল কী একখানা হিরে নিয়ে নাকি পাঁচশো বছর ধরে সারা পৃথিবীর গোয়েন্দারা সন্ধান চালিয়ে আসছে। তো, সে-সব কেস আসবে আমাদের কাছে ?"

মদন একটু হাসল, বলল, "ভাগ্যে থাকলে কী না হয়।" তারপর বলল, "এই কেসটাতেও মজা আছে মনে হচ্ছে।"

"সে তুই জানিস, আর তোর ওই কানাই জানে।"

"কানাই আবার 'আমার' হল কখন ?"

"তা তুই তো ওকে বেশ সুচক্ষে দেখছিলি মনে হল। অথচ ওই তুই নেমকহারামির —"

"আচ্ছা, নেমকহারামির কী দেখলি ?"

"নয় তো কী ? বাবু অত বিশ্বাস করে সর্বস্ব ওর হাতে ছেড়ে দেয়, আর ও কি না··· ইশ··· আমি তোকে বলে দিচ্ছি মদন, মনিবকে খুন করে ও ওই নিমগাছের গোড়ায় পুঁতে রেখে, ঘরটা নিয়ে শোরগোল তুলে লোককে—বিভ্রান্তো করছে। দেখলি না নিমগাছের দিকে কিছুতে যেতে দিতে চাইছিল না। ভূতের ভয়, সাপের ভয় কত কী দেখাল। সব রহস্য ওই নিমগাছে। আর নাটের গুরু ওই কানাই।"

মদন খুব নরম গলায় বলল, "তুই ঠিকই বলেছিস রে ট্যাঁপা। সব রহস্য ওই নিমগাছেই। আর নাটের গুরু ওই কানাই। কালই গিয়ে সব ফাঁস করে দিচ্ছি।"

ট্যাঁপা এখন একটু মন ভাল করে বলল, "কী লিখছিলি দেখি।" ফস করে টেনে নিল খাতাটা।

চোখ বুলোল। "এসব কী রে ? ভাঙা ডালের আগায় দড়ির গিঁট। বারান্দার গ্রিলে তার জের। ··· ভেন্টিলেটারে পাখির বাসা। তার ফাঁক দিয়ে সরু তার। কালো নাইলন সুতো। দরজার নীচের দিকে সূক্ষ্ম ছ্যাঁদা ! পুরনো দরজা, ফাটা-চটা, চোখে পড়ার কথা নয়। এসব কী লিখেছিস রে এম পি ?"

"লিখলুম একটু সাপ-ব্যাঙ !"

"তাই তো দেখছি। মাথামুণ্ডু কিছু বুঝছি না তো। কী এসব ?"

"শেষ পরীক্ষা আটচল্লিশ ঘণ্টা একাসনে পদ্মাসন। ··· পাঁচ ঘণ্টা বায়ুশূন্য স্থানে যোগাসন। প্রণামী কুঃ হাঃ !··· নাঃ, তোর মাথাটা বোধহয় গোলমেলে হয়ে গেছে ! কুঃ হাঃ আবার কী ?"

"বললুম তো সাপ-ব্যাঙ।"

"এই ঠিকানাটাই বা কার রে ? আঠারোর তেরোর সি, নেবুতলা। নেবুতলা আবার কোথায় ? অ্যাঁ ?"

"সেটাই জানতে হবে দারোগাসাহেবের কাছে। এসব জায়গা ওনাদেরই জানা। তবে কানা-কানাইও জানে বলেই মনে হয়। কাল সক্কালেই হানা দিতে যেতে হবে। হয়তো এখনো পাখি উড়ে যায়নি।"

ভোরবেলাই এস কে পাল, আর টি সি দাস অন্তর্হিত দীপঙ্কর দত্তর বাড়ি। দরজার সামনেই কানাই আর ক্ষিরি ঝগড়া করছে।

"বল্ মুখপোড়া, দাদাবাবুকে খুন করে কোথায় পুঁতে রেখেছিস ?"

"ফের ওই কথা ? ভাল হবে না বলছি ক্ষিরিমাসি। কেবল ফ্যাচ-ফ্যাচ।"

এদের দেখে দুজনেই থামল। মদন ঢুকেই বলল, "চায়ের জল চড়েছে নাকি ভাই ? বড় ফার্স্টক্লাস চা বানিয়েছিলে কাল।"

"তা তা, আপনারা এখন সক্কালবেলা ?"

"সকালবেলাই তো দরকার হে। আরো ভাল হত যদি কাল

রাতেই কাজটায় এগোনো যেত। তা কাল তো বাড়ি গিয়ে, তবে তো নেবুতলার ঠিকানাটা দেখলুম।"

কানাই চমকে উঠে বলে, "কোথাকার ঠিকানা?"

"আহা, ওই আঠারোর তেরোর সি লেবুতলা গো! যাওনি বোধহয় কখনো, তবে ঠিকানাটা কি আর না-জানো?"

কানাই জোরে মাথা নেড়ে বলে, "আমি ওসব জানি-টানি না।"

"জানতে তো হবেই ব্রাদার। তুমি না জানো, দারোগাবাবু জানেন। তিনিই সঙ্গে যাবেন।"

"এসব কী ফ্যাচাঙে কথা, অ্যাঁ?"

কানাই রেগে বলে, "ব্যাপারটা কী?"

"ব্যাপার তোমার পক্ষে সুবিধের নয় অবশ্য। কর্তার আড়ালে বিয়েটা সেরে নেওয়া হচ্ছে না। এখুনি হয়তো এসেই যাবেন দারোগা। দরজার পাহারাদারটাকে পাঠিয়েছি দারোগাবাবুকে খবর দিতে।"

কানাই গম্ভীরভাবে বলে, "আমি এ-সব কথার মানে বুঝছি না।"

"বুঝবে। বুঝবে! তবে এত চালাক হয়েও নিমডালে বাঁধতে একটা নতুন দড়ি না কিনে কাপড় শুকোতে দেবার পুরনো দড়িটা নিয়েছিলে কেন ভাই? ওই ভুলটা করেই সব গণ্ডগোল হয়ে গেল।"

"কিসের দড়ি? কিসের পুরনো? ওই তো নিমডালটা পড়ে আছে বাইরে। যত সব—"

"তা আছে। তবে রাতারাতি দড়িটা খুলে ফেলা হয়েছে, তাই না? কিন্তু বারান্দার গ্রিলের মাথার গিঁটটা যে আটকে আছে ব্রাদার। তবে এসব কথা বলছি বলে চা-টা থেকে বঞ্চিত হব না তো? কী রে টি ডি, গল্পটা এখুনি বলে ফেলব? না দারোগাবাবু আসার জন্যে অপেক্ষা করব? থাক, বলেই ফেলি, তুই বড্ড ছটফটাচ্ছিস। এই যে কানাই, একে তুই সন্দেহ করছিস, নেমকহারাম বলছিস, এটা কিন্তু খুব ভুল, লোকটা অতি প্রভুভক্ত, অতি সৎ। নচেৎ মনিব ওকে ব্যাঙ্কের থেকে কুড়ি হাজার টাকা তুলে আনতে দেয়?"

"তার মানে? তার মানে?"

কানাই প্রায় বসে পড়ে বলে, "আপনি কী করে জানলেন?"

"টিকটিকিদের অনেক কিছুই জানতে হয় ভাই। বাবু বললেন, 'কানাই, দু'দিনের জন্যে আমি অন্তর্ধান করছি, দেখিস এই নিয়ে যেন হৈ-চৈ না হয়। লোককে বলবি বাবু ঘরের মধ্যেই আছেন, যোগসাধনা করছেন। দু'দিন পরে আসছি।' তারপর তোমায় কুড়ি হাজার টাকা তুলে আনতে বললেন। তুমি এনে দিলে। না; তোমায় আমি খুবই মহৎ বলব। অতগুলো কাঁচাটাকার লোভ সামলানো সহজ নয়। ইচ্ছে করলেই তুমি ব্যাঙ্কের থেকে আর বাড়ি না ফিরতে পারতে। যদিও তোমার বোঝা উচিত ছিল, বাবু একটি জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েছেন, হাজার-হাজার টাকা তার পায়ে ঢালছেন।"

কানাই হঠাৎ রেগে বলে ওঠে, "বুঝব না আবার কেন? পই-পই করে কি বলছি না এ-যাবৎ এত এত টাকা খরচা করে মাটি থেকে চার আঙুল উঁচু দিয়ে হাঁটতে শিখে আপনার কি স্বর্গলাভ হবে? তা শুনলে তো? তবে এবারে —"

"কী এবারে?"

"ও কিছু না। আপনি তো হাত গুনতেই জানেন দেখছি।"

"হাত গোনাটা কিছু না হে কানাই। আসলে বুদ্ধির খেলা। এই যে আমি বলছি—পরশু রাত্তিরে তোমার মনিব যখন টাকার ব্যাগটি নিয়ে গুছিয়ে-গাছিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় বলে গেলেন 'ঘরটাকে যেভাবে বন্ধ করে, যে কৌশলে বেরিয়ে আসতে বলেছি, তাই করবি। ক্ষিরিকে কাল ছুটি দিয়েছি, পরে এলে বলবি বাবুর ঘর সাফ করার দরকার নেই, বাবু ঘর বন্ধ করে বসে আছে'. এটা কি আর হাত গুনে বলতে হয়? আর তুমি যে এদিকের দরজায় খিল চাপিয়ে বারান্দার দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলে, কৌশলে দরজাটার ওপর নীচের ছিটকিনি দুটো বন্ধ করে ফেললে, সেটাও হাত গুনে বলার দরকার হয় না।"

ট্যাঁপা হাঁ করে শুনছিল, এখন ফস করে বলে ওঠে, "কৌশলটা কী?"

"আরে বিশেষ কিছু না, ওপরেরটা ভেন্টিলেটার দিয়ে চালিয়ে দেওয়া একটু তার, ছিটকিনির মাথায় বেঁধে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে তুলে দেওয়া। আর নীচেরটায় ছিটকিনির মাথায় একটু কালো নাইলনের সুতো বেঁধে টান দিয়ে রাখা, সময়ে সুতোটাকে ছেড়ে দেওয়া। পুরনো বাড়ি, খিল ছিটকিনি সবই ঢিলে। আর দরকার নীচের দিকে ছোট্ট একটু ছ্যাঁদা, ও কারুর চোখে পড়ার নয়। ভেন্টিলেটারে পাখির বাসা হয়ে সুবিধে হয়ে আছে। বাসায় খড়কুটো তার-ফার তো থাকেই।"

মদন একটু হেসে বলে, "এ পর্যন্ত সবই নিমেষে হয়ে গেল। মুশকিল করল নিমগাছের বড় ডালটা আর বারান্দার রেলিঙে টান-টান করে বাঁধা ওই পুরনো দড়িটা। রেলিং টপকে ডালটাকে ধরে ঝুলে পাঁচিলধারে চলে এসে, বাগান ঘুরে রান্নাঘরে চলে আসার কথা, কিন্তু মাঝপথে টানের চোটে ডালটা গেল ভেঙে, আর দড়িটা গেল ছিঁড়ে, এবং পাঁচিলটা হল জখম।"

কানাই মাথা নাড়া দিয়ে বলল, "এ আর হাত না গুনে বলতে হয় না।"

"তা যা বলো। তারপর—তোমার ভাবনা হল দু-দিন দু-রাত বাদ বাবু এসে এই দৃশ্য দেখে তোমায় ঘেন্না দেবেন। তাই মিস্ত্রির চেষ্টায় বেরিয়ে পানওলার কাছে জানতে গেলে কাছে কোথায় মিস্ত্রি পাওয়া যায়। সে-সময় ও আবার মেয়ের বিয়ের কথা পাড়ল। কেমন? ঠিক কি না?"

"হুঁ।"

"তুমি ভাবলে, বাবু তো দু-দিন দু-রাত বাড়ি থাকছে না, এই অবকাশে বিয়েটা সেরে ফেললেও হয়। তাই না? কিন্তু আসলে বাবুকে তুমি প্রাণতুল্য ভালবাসো, তাই বাবুকে লুকিয়ে কিছু করতে মন সায় দিল না। তাই পানওলাকে বলে ফেললে, বাবু এখনো দরজা খোলেননি, ওনাকে না জিগ্যেস করে কী করে—কেমন কি না?"

"বলে যান বাবু, সই দিয়ে যাচ্ছি।"

মদন হাসল। বলল, "মুশকিল হল, পানওলা লোকটা ভয় পেয়ে, পুলিশ-টুলিশ ডাকতে বলল। তুমি তো ষড়যন্ত্রের নায়ক, তুমি তো জানো ভয়ের কিছু নেই। তাই ভাবলে এই এক এলেবেলে টিকটিকি-পুলিশ হয়েছে পাড়ায়—তাদেরই ডাকি। তাদের ছুঁলে তো আর আঠারো ঘা নয়। খোঁড়ানোর ভান করলে কেন? আমাদের কথায় পাছে তিনতলায় উঠে দোর ধাক্কাতে হয়। তো আমরাও থানা-পুলিশ দেখাতে রেগে চলে এলে। বেচারি! ভেবেছিলে এইভাবে কোনো গতিকে দুটো দিন কাটিয়ে দেবে। বাবু ফিরে এসে পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে নিমডাল ধরে ঝুলে বারান্দায় উঠে পড়ে এ-দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে বলবে 'সাধনা সমাধা'। কিন্তু সর্বনাশ করল ওই ক্ষিরি, তাই না? অথচ তুমি বাবুর কাছে বাক্যদত্ত, প্রকৃত কথাটা বলে ফেলতে পারছ না।"

"সেই তো! বাবুর কাছে প্রমিস করে ফেলায় ওই ক্ষিরিমাসিকে তো বলতে পারছি না। তা, সর্বনাশ করেই ছাড়ল আমার। আমি ওকে দেখে নেব।"

"দ্যাখো কানাই, এক হিসেবে এতে তোমার বাবুর হয়তো সর্বটা কিছু রক্ষে হল। এখনো হয়তো সেই জোচ্চোর-গুরুটি টাকা নিয়ে, শটকাতে পারেনি। বোধহয় ওই শেষের পাঁচ ঘণ্টা, যখন বায়ুশূন্য ঘরে থাকতে বলবে, তখনই বাবুকে সেখানে গুম করে রেখে সরে পড়বে!"

কানাই ভয়ে-ভয়ে বলে, "প্রাণে মারবে না তো?"

"দেখা যাক। এখনো হয়তো আশা আছে। কিন্তু দারোগাবাবু না আসা পর্যন্ত তো কিছু হচ্ছে না। ততক্ষণ চা-টা হবে নাকি দাদা?"

"আঠারোর তেরোর সি নেবুবাগান?"

দারোগাবাবু বলে ওঠেন, "সর্বনাশ সে তো খ্যাঁদাগুণ্ডার আড্ডা! সেখানের ঠিকানা আপনি পেলেন কোথায়?"

"আপনিই দিয়ে গেছেন স্যার!"

"আমি? দিনদুপুরে স্বপ্ন দেখছেন নাকি?"

"আমাদের মতন লোকের কি আর স্বপ্ন দেখা সাজে হুজুর? আপনি ওই গদি-তোশক উটকে আমার কাজের একটু সুবিধে করে দিয়েছেন। চলুন, যেতে-যেতে কর্তার অন্তর্ধান-রহস্যর কথা বলা যাবে। মবলগ টাকা নিয়ে তো অন্তর্ধান হয়েছেন কর্তা ওই আঠারোর তেরোয় পৌঁছে দিতে।"

"অ্যাঁ! তাই নাকি? কত টাকা?"

"তা বোধহয় হাজার-কুড়ি।"

"বলেন কী, হা-জা-র কুড়ি।"

"তা শূন্যে হাঁটা শেখার পক্ষে এ আর বেশি কী স্যার? পয়সা থাকলে লোকে কী না খেয়াল করতে পারে! চলুন, এখনও যদি—এই যে চা এসে গেছে। কানাই, তুমিও যাচ্ছ আমাদের সঙ্গে! তোমার বাবুকে শনাক্ত করতে হবে তো?"

কানাই হঠাৎ কেঁদে ফেলে, "শনাক্ত? কেন বাবু? লাশই তো শনাক্ত করতে হয়।"

"আহা, তা কেন। আমরা কি ওঁকে চিনি?"

আঠারোর তেরোর সি'র একটি ঘরে মোটা গদির ওপর তখনো পদ্মাসনে বসে আছেন দীপঙ্কর দত্ত।

কানাইয়ের ডাকে চমকে উঠে রেগে চেঁচাতে গিয়ে দারোগা-পুলিশ দেখে থমকান।

তারপরই কাতরভাবে ডাকতে থাকেন, "কাকাজি। কাকাজি!"

কানাই বলে ওঠে, "আপনার কাকাজি হঠাৎ জরুরি কাজে দিল্লি রওনা হয়ে গেছেন বাবু!"

"দিল্লি চলে গেছেন? অ্যাঁ আমায় শেষ লেসনটা না দিয়ে? কখন গেছেন?"

"যেইমাত্তর আপনার হাত থেকে ব্যাগটা পেয়েছেন। নগদ কুড়ি হাজার টাকা হাতে পেয়ে কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে বাবু?"

পুলিশ দেখে বাসার সবাই কে কোথায় সরে পড়েছে। দীপঙ্করকে পদ্মাসন ভঙ্গ করে এদের সঙ্গে চলে আসতে হয়। তবু একজনকে দেখতে পেয়ে কাতর শব্দ করেন, 'বাবাজি?'

"সে ওই একই কথা বলে জরুরি কাজে দিল্লি চলে যেতে হয়েছে! আশ্চর্য কিছু না, দিল্লি তো কাকাজির ভাতের হাঁড়ি

গাড়িতে উঠে দীপঙ্কর মনমরা ভাবে বলেন, "হঠাৎ কী এত জরুরি কাজ পড়ল।"

কানাই বলে উঠল, "টাকাগুলো পাচার করাই কি কম জরুরি? তবে গিয়ে মাথার চুল ছিঁড়বেন।"

দারোগা বললেন, "কেন? কেন?"

কানাই একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বলে, "মনের ভুলে, একশো টাকা নোটের সাইজের বেশ কিছু চাঁদার বিল-বুক ব্যাগের মধ্যে ভরে ফেলেছিলাম কি না। তবে এপিঠে-ওপিঠে দু-পাঁচখানা নোট ছিল অবশ্য!"

মদন বলে উঠল, "গুড্।"

ট্যাঁপা একগাল হেসে বলে, "ভ্যালা রে মোর দাদা তুমিও আমাদের দলে চলে এসো ভাই!"

আজ কাল পরশু

আনন্দ বাগচী

সব কিছু মিছু, সব হয়ে গেছে নট,
গল্প গুলিয়ে ফেলা হিং টিং ছট।
লোহা কংক্রিটে থ্যাঁতা হল কলকাতা
গম ভাঙা জাঁতা আর লেজারের খাতা,
রাজপথ ছিপি-আঁটা জ্যামের বোতল
মিছিলে মিছিলে জগঝম্পর ঢোল।
ইতিহাস ছিঁড়ে হল গল্পের ঠোঙা,
ঝাড়বাতি গ্যাসবাতি, গ্রামোফোন-চোঙা—
সব খায় একে একে কাল-রাক্ষস
তেপান্তরের মাঠ বাকি হাফ ক্রোশ।
দুপুরের ধু ধু মজা পোড়ো দিঘি ছুঁয়ে
হানাবাড়ি চিলেকোঠা নেবে এক ফুঁয়ে।
ঝুরুঝুরু ইট খসে, হলুদের গুঁড়ো
হাতিশাল ঘোড়াশাল দেউড়ির চুড়ো।
রোজ টাঁকশালে ছাপা চাঁদের মোহর
আলো করে রাখে তবু গরিবের ঘর।
নিকেলের চশমায়, ভুষো লণ্ঠনে
দিদিমার হিজিবিজি মুখ ভাসে মনে।
নকশাল রূপকাঁথা ফুঁড়ে যায় সুঁই
ছমছমে গল্পের কোল ঘেঁষে শুই।
রেলকম ঝমাঝম হুইসেল কাঁপে,
আজ-কাল-পরশুর স্বপ্নের তাপে।

ছবি: জয়ন্ত ঘোষ

মনের মতন খাবার দেখে
জিভে যখন জল আসে
তখন খিদে না পায় যদি
কেউ কি তা আর ভালবাসে?
চোঁয়া ঢেঁকুর বদহজমের
জ্বালা যখন জ্বালায় প্রাণ
তখন ভাবি কেমন করে
এ মুশকিলের হয় আসান?
এক চামচেই আরাম দেবে
বলতে পারো তার হদিশ?

বেঙ্গল কেমিক্যালের সেই

এখন নতুন শিশিতে নতুন লেবেলে

বৃথা আশা

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

নরহরি নাগ-রায় বাড়ি তার খাগড়ায়
তাগড়া জোয়ান ছেলে, চুলগুলো ঝাঁকড়া ;
জামা গায়ে যারে পায়, 'মামা' বলে পাকড়ায়,
ছাড়ে নাকো না-খাওয়ালে 'দইবড়া' কাঁকড়া ।
চাড় নেই পড়বার, কারবার করবার,
ওস্তাদ অন্যের কাজে দিতে বাগড়া ।
আছে বিঘে-সাত মোটে, 'লাখেরাজ' ভাত জোটে
মুখে বন্দুক ছোটে, মরে হাতি-বাঘরা ।
পায়ে দিয়ে স্যাণ্ডেল গেছল সে ব্যাণ্ডেল,
সেথা হতে গাড়ি চড়ে পাড়ি দিল আগ্রা ।
সেই থেকে নাগরায় শোভা পায় নাগ-রায়
বউকে ছাড়িয়ে শাড়ি পরিয়েছে ঘাগরা ।

পাগড়ি বেঁধে সে যায় কুস্তির আখড়ায়,
'কাঠ'কে 'লাক্‌ড়ি' বলে, ছাগলেরে 'বাক্‌রা' ।
'আগ্রা রিটার্নড্‌', তার উপাধিটা 'এজি· আর·' !
ওটা তো স্বোপার্জিত, তাই উঁচু-নাকরা
মানতে চায় না ; শেষে পাত্তা না পেয়ে দেশে
রাগ করে ভেবেছে সে যাবেই 'নায়াগ্রা' ।
সে বহু টাকার খেল, কী হবে পাকলে বেল ?
অথবা সে নারকেল, বৃথা কাঁদে কাগরা ।

ছবি দেবাশিস দেব

সুয্যিমহারাজ

কবিতা সিংহ

রাতটি এলে ঘুমটি পেলে
সুয্যিমহারাজ
ডাকেন মা'কে, বলেন তাঁকে,
চাই যে ঘুমের সাজ!
এক্ষুনি চাই রঙিন দোলাই
দাও না মেজে মুখ!
গাল তুল্‌তুল্‌ স্বর্গ-পুতুল
ঠোঁট দুটি টুক্‌টুক্‌!
বাড়িয়ে তিনি দেন চিরুনি,
বলেন মাকে হেসে,
দাও না মাগো আঁচড়িয়ে চুল
যাব ঘুমের দেশে।
পশম-পশম নরমসরম
দুল্‌ছে কালো চুল,
চোখ ঘুমঘুম ঠোঁট চুমচুম্‌
এক মুঠো জুঁইফুল!
নেইকো মানা দূর ঠিকানা
বুজ্‌লে দু'চোখ, পাই
দুই কাঁধে দুই রেশ্‌মি ডানা,
দূর আকাশে যাই!
যাই উড়ে মা ছড়িয়ে ডানা
সূর্য-চাঁদের শেষে,
ঝলমলানো সুর-ঝরানো
স্বপ্নখুশির দেশে।

কিড়ি কিড়ি ধা

সুনীল বসু

ধা কিড়ি কিড়ি ধা,
বেগুন পোড়া দিয়ে বেবুন
পেট পুরে তুই খা।

একশো বছর বাঁচবি বলে
তিনশো বছর দু'কান ম'লে
উল্টো-পাল্টা ডিগ্‌বাজি তুই খা।
ধা কিড়ি কিড়ি ধা।

উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে
ওরে ভোঁদড় ডিম পেড়ে যা
নদীর পাড়ে।

ডিম ফেটে তোর
বেরিয়ে যাবে কোলা ব্যাঙের ছা।
ধা কিড়ি কিড়ি ধা।

হাওয়ার ভিতর নুন দিয়ে তুই
ভূতের বাপের বানা রসুই
গন্ধ শুঁকে প্যাঁচায় করবে হাঁ।
ঘোড়ার ডিমে ভেড়ায় দেবে তা।
ধা কিড়ি কিড়ি ধা।

আবোল তাবোল বকি বলেই
ঝোল টানি যে নিজের কোলেই
রক্তে চিনির দোষ বেড়েছে
ধা কিড়ি কিড়ি ধা।

ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ বলেই
দেশটা গেল রসাতলেই
মাটির ফাটল করছে এখন হাঁ।
ছাদের পরে ধাই ধপাধপ
পড়ছে কাদের পা।
ধা কিড়ি কিড়ি ধা!

টুপুর ভাবছে

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

আমি যদি মন্ত্রবলে
হয়ে মেঘ যেতাম ভেসে,
কী মজাই হত তাহলে—
সোজা লস এঞ্জেলেসে।

টিকিটের সাত-সতেরো,
আরও সব হাজার ঝুঁকি
থাকত না বেড়াও, ফেরো,
দাও মুখ বাড়িয়ে উঁকি

খুশিমতো, নেই ঝামেলা,
একা মেঘ সহজ, স্বাধীন,
স্টেডিয়ামে হরেক খেলা
দেখে নাও সমস্ত দিন।

সোনা-রুপো জিতলে ভারত,
হাসতাম সোনার রোদে,
হেরে গেলে বারিধারাবৎ
কাঁদতাম দুঃখে ওদের।

আর ঠিক রাত্রি হলে,
আকাশের উজান বেয়ে
ফিরে এসে মায়ের কোলে
ঘুমোতাম লক্ষ্মী মেয়ে।

ছবি জয়ন্ত ঘোষ

কবিগুরুর ক্লাসে

মমতা দাশগুপ্ত, অমিতা ঠাকুর

ছাত্রজীবনে আমরা একজন বিশ্ববিশ্রুত 'গুরু'র ক্লাস করার সুযোগ পেয়েছিলাম। ছেলেবেলায় এমন সুযোগ পাওয়া ভাগ্যের কথা। আমাদের জীবনে সে এক অক্ষয় অম্লান স্মৃতি। সেই স্মৃতির ঝাঁপি একটু খুলি।

১৯২৬ সাল। শান্তিনিকেতনে তখন গ্রীষ্মের ছুটির হাওয়া। আমরা গুরুপল্লীর মেয়েরা তো ওখানকারই বাসিন্দা, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আর কজন ছাত্রছাত্রীও আশ্রমে রয়ে গেল। সেই বছরই আমাদের প্রবেশিকা পরীক্ষা। তাই যুক্তি এঁটেছিলাম মিলেমিশে পড়াশুনা করব। আশ্রমে থাকলে আশ্রমিক শিক্ষকদের সাহায্যও পাওয়া যাবে। রোজ সকালে আমরা কালীপদদার কাছে অঙ্ক করতে এবং গুরুপল্লীতে আমাদের মাস্টারমশাই অধ্যক্ষ প্রমদারঞ্জন ঘোষের কাছে ইংরেজি পড়তে যেতাম। চমৎকার ইংরেজি পড়াতেন তিনি। আমরা কিন্তু মোটেই মেধাবী পড়ুয়া ছিলাম না। ইংরেজি কবিতাগুলো ঠিকমতো কব্জা করতে পারছিলাম না, তাই কজনে মিলে একদিন উত্তরায়ণে গিয়ে গুরুদেবের শরণাপন্ন হলাম।

কথায় কথায় তিনি বুঝে নিলেন কোথায় আমাদের ঘাটতি। তারপর বললেন, কাল থেকে তোরা সন্ধেবেলায় আমার কাছে এসে ইংরেজি কবিতা পড়বি। বই-টই আনতে হবে না, শুধু খাতা আনবি।

পরদিন থেকে কোণার্কের বারান্দায় তিনি নিয়মিত আমাদের ইংরেজি কবিতা পড়ানো শুরু করলেন। প্রায় মাসদুয়েক তিনি আমাদের পড়িয়েছিলেন। পড়ুয়া ছিলাম আমরা জনাছয়েক। কাঁকরের উপর মোড়া পেতে বসতাম আমরা। গুরুদেব বসতেন একটা আধা-ইজিচেয়ারে কুশানে হেলান দিয়ে। আশেপাশে থাকতেন অতিথি বা বয়স্ক আশ্রমজনেরা। তাঁরাও শ্রোতা হয়ে যেতেন। নিঃশব্দে বসে সেই অভিনব ক্লাস শুনতেন। তাঁদের মধ্যে প্রায়ই থাকতেন প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কয়েকজন শিক্ষক।

গুরুদেবের পড়ানোর পদ্ধতি ছিল আলাদা। তাঁর কাছে আমরা শেলি, কিট্স্, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, প্যাটমুর প্রমুখ কবিদের কবিতা পড়েছিলাম। কত ধৈর্যের সঙ্গে হাসিমুখে তিনি আমাদের মতো অবাচীন পড়ুয়াদের অত কঠিন কঠিন কবিতা পাখিপড়ার মতন করে পড়াতেন, বোঝাতেন! এক-একটা লাইন বাংলায় কবিতার মতন করে আমাদের বলতেন। সেই বাংলা তর্জমা থেকে এক-একটি শব্দ ইংরেজিতে আমাদের এক-একজনকে বারবার বলিয়ে নিতেন। সেইসব শব্দ জুড়ে ইংরেজি কবিতাটি কখন একটি মালার মতো গাঁথা হয়ে যেত। বারবার এইভাবে ইংরেজি-বাংলা করতে করতে কখন যে

গৌরপ্রাঙ্গণে (শান্তিনিকেতন) ক্লাস নিচ্ছেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের এই ক্লাসে অবশ্য বড়রাও পাঠ নিতে আসতেন গৌরপ্রাঙ্গণের এই বিশেষ জায়গাটি উটজ নামে পরিচিত। ছবিটি তোলা হয়েছিল ১৯২১ সালে। আমরা শ্রীক্ষেমেন্দ্রমোহন সেনের সৌজন্যে এটি পেয়েছি

কবিতাটি আমাদের মুখস্থ হয়ে যেত, বুঝতেই পারতাম না। সেই ক্লাসকে তখন আর নীরস বলে মনে হত না। মনে হত, বিভাষার ভয় কাটিয়ে শব্দ জুড়ে জুড়ে আমরা যেন ওয়ার্ড-মেকিং গেম খেলছি।

এই ক্লাসের কিছু কিছু উদাহরণ তো দেওয়া দরকার, কী বলো! ওয়ার্ডসওয়ার্থের দি সলিটারি রিপার পড়াচ্ছেন। 'রিপার' শব্দটির মানে জানি কি না দেখে নিয়ে এক-একটি শব্দ ধরে এগোতে লাগলেন। একটা লাইনে আছে 'বিহোল্ড হার সিঙ্গল ইন দি ফিল্ড'। জিজ্ঞেস করলেন, দেখার ইংরেজি কী? আমরা কেউ বললাম লুক, কেউ বললাম সি। বললেন, আর কী জানো? চুপ করে ভাবছি। সূত্র ধরিয়ে দিলেন, ছয় অক্ষরের শব্দ, প্রথম অক্ষর বি। তখনও ধরতে পারছি না দেখে বললেন, শেষের অক্ষর ডি। আমরা তবু যে-তিমিরে সেই তিমিরে। তখন বললেন, বি-র পর ই। আমরা তখনও মনে-মনে হাতড়াচ্ছি। গুরুদেব কিন্তু বিরক্ত হলেন না, হাত তুলে কিছু ধরবার ভঙ্গি করে বললেন, 'ধরো' শব্দের ইংরেজি

কী ? এতক্ষণে আমরা ধরতে পারলাম, প্রায় সমস্বরে বলে উঠলাম, 'বিহোল্ড'। অর্থাৎ দেখা। এর পর 'হার' মানে তো সবাই জানে, 'সিঙ্গল' শব্দটা নিয়ে পড়লেন। বললেন, 'একা'র ইংরেজি কী-কী হতে পারে ? প্রায় সবাই বললাম, 'এলোন'। আর কী হতে পারে বলো। এটাও ছয় অক্ষরে—প্রথমে 'এস', পরে 'আই, সবশেষে 'ই'। আমরা মুখ-চাওয়াচাওয়ি করছি, তখন আরও খোলসা করলেন—গান করার ইংরেজি কী ? সবাই বলে উঠলাম, 'সিঙ'—ব্যস, 'একা'র আর-একটি ইংরেজি প্রতিশব্দ পাওয়া গেল—'সিঙ্গল'। এইভাবে তিনি অসীম ধৈর্যের সঙ্গে আমাদের দিয়ে দরকারি শব্দটা বলিয়ে নিতেন। এত করেও যখন দেখতেন কেউ বলতে পারছে না তখন নিজেই বলে দিতেন।

মনে আছে, ওয়ার্ডসওয়ার্থের আর-একটি কবিতা 'দি পারফেক্ট উয়োম্যান' পড়াতে পড়াতে 'শি ওয়াজ এ ফ্যানটম অব ডিলাইট'—এই পঙ্ক্তির ফ্যানটম শব্দটি কতভাবে আমাদের বুঝিয়েছিলেন। এক কথায় এর মানে সুস্পষ্ট হয় না, তাই অনেকভাবে বোঝালেন, শেষে শব্দটি বলে দিলেন।

একে একে পড়ালেন প্যাটমুরের দি টয়, জর্জ হার্বার্টি-এর লাভ, ব্রাউনিঙের দি লস্ট লিডার, শেলির ওড টু দ্য ওয়েস্ট উইণ্ড, টেনিসনের ডোরা, কিট্সের ওড টু অটাম ইত্যাদি কবিতা। তাঁর পড়ানোর গুণে আমরা যেন কবিতাগুলোর সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা আনন্দ-বেদনার সমভাগী হয়ে পড়তাম। দি সলিটারি রিপার কবিতাটি পড়লে এখনও চোখের সামনে গুরুদেবের সেই অন্তরঙ্গ ক্লাসের স্মৃতিছবি ভাসে, তার সঙ্গে পাহাড়ি অঞ্চলের সেই একাকিনী কৃষক-কন্যাটির মুখ। শস্য কাটতে কাটতে গান গাইছে সে, তার বিষণ্ণ গানের সুর দিকদিগন্তে ছড়িয়ে পড়ছে। নাইটিঙ্গেল ও কোকিলের সুরেলা সংগীতের চেয়েও সেই গান কবির কানে মধুরতর লেগেছিল।

দি টয় কবিতাটিও মনে গেঁথে আছে। পিতার উপেক্ষায় বেদনাহত মাতৃহারা শিশু অশ্রুসিক্ত চোখে একাকী নিজের শয্যায় ঘুমিয়ে পড়েছে। অনুতপ্ত কবি নিঃশব্দ পায়ে পুত্রের শয্যাপার্শ্বে এসে দাঁড়ালেন। ছেলেটির হাতের কাছে একটি ছোট্ট বাক্স, যার মধ্যে আছে তার প্রিয় কটি জিনিস—লাল রঙের গুটিকয় পাথর, একটা কাঁচের টুকরো, কয়েকটি ঝিনুক আর দুটি মুদ্রা। তুচ্ছ জিনিসগুলিই সেই অবহেলিত শিশুর কাছে সাত রাজার ধন। শিশুপুত্রের সজল মুদ্রিত চোখের উপর কবির চোখের জলও বর্ষিত হল।

গুরুদেব আমাদের শেলির ওয়েস্ট উইণ্ড পড়াচ্ছেন শুনে উঁচু ক্লাসের ছাত্রী মিনুদি বাবলিদি চোখ কপালে তুলে বলতেন, 'তোরা ওয়েস্ট উইণ্ড পড়ছিস ? বাব্বা, ও তো কলেজে পড়ায়।' কিন্তু গুরুদেবের পড়ানো ও শেখানোর গুণে আমাদের একটুও শক্ত লাগত না।

একদিনের কথা মনে পড়ছে, একটি কবিতায় দুটি অন্ত্যমিল ছিল—সিঙ্ক আর লিঙ্ক। কবিতাটি বাংলায় বলে আমাদের দিয়ে লিঙ্ক শব্দটি বলানোর চেষ্টা করলেন। বাংলায় বুঝিয়ে দিলেন—একটার সঙ্গে একটা জোড়া, যেমন ট্রেনের একটা বগি আর-একটা বগির সঙ্গে শিকল দিয়ে জোড়া থাকে। বলে দু-হাতের আঙুলে-আঙুলে জড়িয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। শব্দটি আমাদের অজানা, তাই কেউ বলতে পারছি না। তখন বললেন, চার অক্ষরের শব্দ—প্রথম অক্ষর এল্। তবু আমরা নিরুত্তর। তখন বললেন, সিঙ্ক-এর সঙ্গে মিল দিয়ে। না-জানা শব্দটি আমাদের মুখ থেকে এবার আপনা থেকেই বেরিয়ে গেল—লিঙ্ক।

এমনই ধৈর্য ও পরিশ্রম দিয়ে তিনি আমাদের মতো অ-মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজি পড়াতেন। সকলের মন টেনে রাখতেন, কারও অন্যমনস্ক হবার জো ছিল না। সবার মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার ভাব আসত—যেন ধাঁধার উত্তর দিতে হবে, কে আগে দিতে পারে।

ক্লাস কামাই করলে অসন্তুষ্ট হতেন। এই প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনার কথা বলি।

একদিন আমরা দল বেঁধে ক্লাস করতে যাচ্ছি, পথে রথীদার (রথীন্দ্রনাথ) সঙ্গে দেখা। তিনি আমাদের দুই সহপাঠী কানাইলাল সরকার ও শান্তিদেব ঘোষকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাওয়া হচ্ছে ? ওরা বলল, পড়তে। রথীদা বললেন, আজ আর তোমাদের দুজনকে পড়তে যেতে হবে না। কাল আশ্রমে গান্ধীজি আসছেন সে-খেয়াল আছে ? যাও, পদ্মফুল, পদ্মপাতা, দেবদারু-পাতা যত পারো যোগাড় করে আনো, অতিথিশালা সাজাতে হবে। ওরা কিন্তু-কিন্তু করছে, ক্লাসে না গেলে গুরুদেব রাগ করবেন। রথীদা ওদের অভয় দিলেন। সে তোমাদের ভাবতে হবে না, আমি বাবামশাইকে বলে দেব কেন তোমরা আজ ক্লাস করনি।

আমরা মেয়েরাই সেদিন শুধু ক্লাসে গেলাম। ছেলেরা ফুল-পাতার যোগাড়ে গেল। গুরুদেব ওদের কথা জিজ্ঞেস করলেন না বলে আমরাও আগ বাড়িয়ে কিছু বললাম না।

পরদিন যথারীতি সবাই আবার ক্লাসে গেছি। সামনে-পিছনে কোন্ মোড়ায় কে বসছি না-বসছি এসব নিয়ে গুরুদেব মাথা ঘামাতেন না। সেদিন কিন্তু ঘামালেন। তাঁর সামনের দিকের মোড়ায় আমাদের, মানে মেয়েদের বসতে ইঙ্গিত করলেন। নিজে চেয়ার ঘুরিয়ে এমনভাবে বসলেন যে, কানাই আর শান্তি তাঁর চোখের আড়ালে পড়ে গেল। পড়াবার সময় যা বলাবার আমাদের দিয়ে বলাচ্ছেন, আমাদেরই এটা-ওটা জিজ্ঞেস করছেন, ছেলেরা যেন অচেনা অবাঞ্ছিত। ওরা কোনো-কিছু পড়া বললেও না-শোনার ভান করছেন।

এইভাবে দু'দিন কাটল। ছেলেরা দমে গেল। ব্যাপার গুরুতর। সেদিন ক্লাস কামাই করায় অভিমান করেছেন। পরদিন ওরা বেলফুলের এক বিশাল গোড়েমালা নিয়ে গুটি-গুটি হাজির। মালা দেখে মিষ্টি-মিষ্টি করে বললেন, ঘুষ দিতে এসেছিস ? জানিস বেল-মালা আমি ভালবাসি, তাই বুঝি ? মিনি-মাগনার মাস্টার বলে বুঝি ক্লাসে না এলেও চলে ? খবর দেওয়াও দরকার মনে করিস না !

ওরা কাঁচুমাচু হয়ে বলল, আমাদের তো রথীদা ফুল-পাতা আনতে পাঠিয়েছিলেন। আমরা তো আসছিলামই সেদিন, তা উনি বললেন, আমি বাবামশাইকে বলে দেব।

তাই নাকি ? তা রথী তো আমাকে কিছু বলেনি ! ভুলে গেছে বোধহয়। তা তোরাও তো একফাঁকে এসে আমায় বলে যেতে পারতিস। তাহলে তোদেরও মিছিমিছি এই ঘুষ দিতে হত না, আমাকেও নিতে হত না।

ব'লে খুশি-খুশি মুখে মালাটি পরলেন। ছেলেদের মুখে হাসি ফুটল। তার সঙ্গে আমাদেরও।

ক্লাস শেষ হলে বসত গল্পের আসর। নাতনি নন্দিনীকে গল্প শোনাতে হত। নন্দিনীর সঙ্গে তারই সমবয়সী আর-একজন শ্রোতাও থাকত। সে অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ অধিকারীর পুত্র। অ-সমবয়সী অনেকেও গুরুদেবের সেই

অপূর্ব গল্প-বলার আসরে হাঁ-করা শ্রোতা হয়ে যেতেন। তাঁদের মধ্যে থাকতেন প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দবাবু, দিনদা, কিরণবালা সেন, লাবণ্য দেবী প্রমুখ। ক্লাসের পর আমরাও এক-একদিন গল্পলোভী হয়ে থেকে যেতাম। গল্প-বলার ধরনটিও ছিল তাঁর একেবারে নিজস্ব। গলার স্বরে, বলার ভঙ্গিতে, গল্পের পুরুষ-প্রকৃতি সব যেন জীবন্ত হয়ে উঠত। আশ্রমিক পরিবেশে অনুজ্জ্বল মায়াবী আলোয় তখন তাঁকে দেখে মনে হত যেন প্রাচীন ভারতের এক ঋষি তাঁর নানাবয়সী শিষ্য-শিষ্যাদের নীতিগল্প শোনাচ্ছেন। মুখে-মুখে-বলা গুরুদেবের এই গল্পগুলোই পরে 'সে' নামে বই হয়ে বেরিয়েছিল।

আমাদের ইংরেজি পড়ানোর কথা গুরুদেবের খুব মনে ছিল। পরে কখনো-সখনো সেই ক্লাসের কথা তুলে হাসতে-হাসতে বলতেন, তোদের যে একবার পড়িয়েছিলুম, মনে আছে? কিছু কি উন্নতি হয়েছিল তাতে? না সব ভুলে গিয়েছিস! সেইসব কবিতার সূত্র দু-একটি লাইন আবৃত্তি করে শোনালে ভুলিনি দেখে খুব খুশি হতেন।

যেসব ইংরেজি কবিতা আমাদের পড়িয়েছিলেন, সেগুলি যার-যার খাতায় লিখে রাখতে বলেছিলেন। লিখব বলে আমরা কেউ-কেউ নতুন খাতা বানিয়েছিলাম। আমাদের একজনের আগ্রহে তার খাতার প্রথম পাতায় লিখে দিয়েছিলেন—

ভেবেছিনু মনে গণি' গণি' লব তারা
গণিতে গণিতে রাত হয়ে যায় সারা
বাছিতে বাছিতে কিছু না পাইনু বেছে।
আজ বুঝিলাম না চাহিয়া যদি চাই
এক দৃষ্টিতে একসাথে সব পাই
কে পায় সিন্ধু বিন্দু তাহার সেঁচে॥

কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদও নিজের হাতে লিখে দিয়েছিলেন—

Once I had started counting stars
With the wish to own them
Till I lost my night and my stars
Now I know how to find all at once
By never claiming them
For who can aspire to possess the sea
By ladling out its water drop by drop.

'আমি যে ইংরেজি পড়িয়েছিলুম, কিছু কি উন্নতি হয়েছিল তাতে?'—এখন হলে গুরুদেবের এ প্রশ্নের উত্তরে তাঁকে বলতাম, লেখাপড়া কতটুকু শিখেছি জানি না, কিন্তু আপনার সেই পড়ানো থেকে আমরা এক দুর্লভ শিক্ষা লাভ করেছি। কঠিন কবিতা কীভাবে পড়াতে হয়, কীভাবে নিজে না বলে পড়ুয়াদের দিয়ে বলিয়ে নিতে হয়, তাদের বলতে সাহায্য করতে হয়—পড়ানোর সেই আশ্চর্য পদ্ধতি আপনিই আমাদের শিখিয়েছেন।

ধাঁধা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথ একবার একটি ছোট্ট মেয়েকে তার জন্মদিনে তিনটি মজাদার ধাঁধা উপহার দিয়েছিলেন। সেই ধাঁধা তিনটি রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই এখানে উদ্ধৃত করি—

১। **তিন অক্ষরের কথা**। প্রথম ও শেষ অক্ষর ছেড়ে দিলে কান থাকে না। শেষ দুটো অক্ষর ছেড়ে দিলে মান থাকে না। সমস্তটা ছেড়ে দিলে প্রাণ থাকে না।

২। **চার অক্ষরের কথা**। প্রথম দুটো অক্ষর একটি প্রাণী, শেষ দুটো অক্ষর তার বন্ধন। সমস্ত কথাটার মানে হচ্ছে বাঁধা পড়লে সেই প্রাণীর অবস্থা।

৩। **তিন অক্ষরের কথা**। তার প্রথম অংশটাকে ইংরেজি শব্দ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তারো যা মানে, বাকি অংশটারও সেই মানে, সমস্ত কথাটারই সেই একই মানে।

একটি খামের মধ্যে পুরে শান্তিনিকেতন থেকে এই ধাঁধা তিনটি কবি পাঠিয়েছিলেন ১৯২৫ সালের ২৫ এপ্রিল তারিখে। বালিকার জন্মদিনের আবদার সামলাতে রবীন্দ্রনাথকে এই ধাঁধাগুলি বানাতে হয়েছিল বৃদ্ধ বয়সে। কবি অবশ্য নিজেকে কখনোই বৃদ্ধ মনে করতেন না আর তাই তো চিঠিতে লিখেছেন, "রবিবাবু তোমাদেরই মত ছোট ছেলে-মেয়েদের বন্ধু।"

রবীন্দ্রনাথের দেওয়া এই তিনটি ধাঁধার মধ্যে প্রথম দুটি ধাঁধার উত্তর বালিকাটি ও তার ফুলদিদি দিতে পেরেছিল। কিন্তু তৃতীয় ধাঁধার উত্তর দিতে পারেনি কেউ। পারেননি তাদের বাবাও। রবীন্দ্রনাথ ৩০ এপ্রিলের চিঠিতে সেই ধাঁধার উত্তরটি লিখে পাঠিয়ে দেন।

এই তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর কী হবে—তোমরা এখন বলো। ১৫৪ পৃষ্ঠায় উত্তরগুলি দেওয়া হল। কিন্তু আগেই উত্তর না-দেখে তোমরা বরং নিজেরাই চেষ্টা করো উত্তর খুঁজে নিতে।

সেদিনের উৎসব

সুনীলকুমার নন্দী

নাতনির আবদারে হাই তুলে দাদু কন,
আমাদের ছেলেবেলা, কবেকার কথা ভাই—
ধুলোবালি ঝেড়েঝুড়ে যদি তুলে আনি, আজ
মনে হবে হয়তো সে ম্যাজিকের রোশনাই।

মনে আসে মেঘভিজে জবুথবু সন্ধ্যায়
প্রথমেই কী বলো তো, রুপোলি ইলিশ না ?
দশ আনায় গোটা মাছ, ওজনে তা সের দুই—
এখন যা পেতে হলে হতে হয় বাদশা।

সর্ষের তেল ছিল টাকা প্রতি চার সের,
চার টাকা মন-দরে ঢালাও বালামচাল,
আট আনা আমের ঝুড়ি, চার আনার রাজভোগ
বাজি ফেলে খেতে গিয়ে খেয়েছি বিষম টাল।

জমে গেছে দাদুভাই, আষাঢ়ের গপ্প—
নাতনির ঠাট্টায় ফিরে আসে সংবিৎ,
বহুদূর থেকে যেন টেনে-আনা কণ্ঠে
দাদু কন, আষাঢ়ের গপ্পই ঠিক, ঠিক—

এই জেনে ঘুম দাও, সেদিনের উৎসব
যেহেতু এ-দুর্দিনে মেলানো অসম্ভব।

এক রাজা তাঁর দুই রানি

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

এক রাজা তাঁর দুই রানি তাঁর তিনজনা রাজকন্যা
চিলছাদে ঠাঁই নিয়েছিলেন ভরা ভাদ্রের বন্যায়।
ছাদ ঠেলে জল উঠল হুহু, পালং হল নৌকো—
তিন মেয়ে চিল-চেঁচিয়ে ওঠে ও বাবা, কী ঢেউ গো—
ঘোমটা ঠেলে ধমকে ওঠেন দুই রানি থাম্, চুপ কর!
কে কোনখানে শুনবে গলা, জুটবে তখন খুব বর!
জলের তোড়ে পালং তখন ছুটছে তেড়ে দিক্‌হীন—
কোন্‌টা কী দেশ হয় না দিশা, কোন্‌মুখো বা দক্ষিণ!
কান ঘেঁষে তীর কাল্‌চে বাতাস, ধোঁয়ায় ধোঁয়া চারধার—
উশখুশিয়ে ওঠেন রাজা কই রে হুঁকোবরদার ?
দুই রানি রাগ পোষেন বসে—নেই দাসী, দেয় পানটা।
তিন মেয়ে বক-লাফিয়ে ওঠে ও মা গো, কী ঠাণ্ডা!
ঠাণ্ডা, তো ওই সুজনিগুনোয় বাঁধলে তো হয় ছত্রী!
বাঁধবে যে সে পড়বে ছুটে অমনি ? ডাকা মাত্রে ?
বাজল ক'টা সেও বোঝা দায়! করছে গা-টা ঝিম্‌ঝিম্।
কমখানি তো যাচ্ছি না পথ! ঠিক আছে তো ইঞ্জিন ?
ফুল কেটে ঢেউ হুড়িয়ে পড়ে দু'পাশ পিছু সামনা—
সইত, কেবল আসত ক'টা গরমাগরম রান্না,
জ্বলত ক'টা ঝাড়বাতি, আর চলত গানের টেপ্‌টা,
তিন মেয়ে—ওই দেখ্‌সে—বলে পড়ল চিঁড়েচেপটা—
দেখব কী ?—ওই ফরসা আকাশ ? ঘরবাড়ি ? ওই পথঘাট ?
ওই দুটো লোক শুঁটকোমতন, আর-একজনা হোঁতকা ?
দুই রানি চোখ ঘুরিয়ে দেখেন, ওমা, এ কোন্ রাজ্যি!
ডঙ্কা দেও না—আমরাও তো সাগর ঠেলে আসছি!
হাই তুলে মুখ ফেরান রাজা—ওই তো আমার প্যায়দা!
চিনছ না ? ওই মন্ত্রী নিজে আসছে ছুটে জ্যায়দা ?
কী জ্বালা! ফের এখ্‌খুনি রাজসভায় না হয় ছুটতে!

তিন মেয়ে ফুরফুরিয়ে ওঠে উঃ! কী দারুণ ফুর্তি—

ছবি জয়ন্ত ঘোষ

পানু কানু দুই ভাই

মনোজ বসু

পানু বণিক ও কানু বণিক, দুই ভাইয়ের দোকান। বাবা মারা যাবার পর দুই ভাই দোকানের মালিকানা পেয়েছে। পানু ওজনে কম দেয়। কানুর ঠিক উল্টো, তার ওজনে বেশি জিনিস চলে যায়। এই নিয়ে দুই ভাইয়ে বকাবকি। পানু বলে, "তুমি বোকা। একদিন তোমায় পথের ফকির হতে হবে বুদ্ধির দোষে। আমাকেও তোমার সঙ্গে ফকির বানিয়ে ছাড়বে।"

কানু বলে, "ওজনে কম দেওয়া তো চুরি। উচিত দাম নিয়ে খদ্দের ঠকানো চোরের কাজ। আমি ওসবের মধ্যে নেই। ফলে পথের ফকির হই, আর না খেয়ে মরি, সে-ও ভি আচ্ছা।"

এই সব নিয়ে দিনেরাত্রে দু-ভাইয়ের ঝগড়া। দুত্তোর বলে, অবশেষে ভাইয়ে ভাইয়ে ভাগাভাগি হয়ে গেল। কানু বলল, "আমার ভাগের যা দেবে, কম দাও আর বেশি দাও, নগদ টাকায় দিতে হবে। নিজের ভাগে তুমি দোকানের যাবতীয় মালপত্র নিয়ে নাও গে। তোমারই লাভ। যেমন তোমার অভ্যাস, মালপত্র বিক্রি করে উচিত-দামের অন্তত দেড়গুণ টাকা তুমি ঘরে তুলবে।"

পানু হেসে উঠে বলল, "বলেছ ঠিক। তোমার অংশ যদি জিনিসপত্রে দিয়ে দিই, বিক্রি করে তুমি অর্ধেক দামও আদায় করতে পারবে না।"

বন্দোবস্ত শেষ পর্যন্ত তাই হল। নিজ অংশে কানু নগদ টাকা নিয়ে নিল। কানু এই গাঁয়েই থাকবে না। এখানে থেকে সে-ও যদি দোকান করে, ভাইয়ে-ভাইয়ে প্রতিযোগিতা হবে। তা সে চায় না। সমস্ত টাকা থলি-ভরতি করে নিয়ে সে দূরের গ্রামের দিকে রওনা দিল।

যাচ্ছে, যাচ্ছে, যাচ্ছে। দিন গিয়ে সন্ধ্যা, তারপর রাত্রি। এই তো বিপদ, কাছাকাছি কোনো জনপদ নেই, জঙ্গলের ধারে গিয়ে পড়েছে। জন্তু-জানোয়ারের ভয়ে সে এক গাছের উপর চড়ে পড়ল। গামছা দিয়ে ডালের সঙ্গে সর্বাঙ্গ আচ্ছা করে বেঁধে ফেলল। ঘুম এসে গেলে যাতে মাটিতে পড়ে না যায়।

নীচে হঠাৎ কলরব। কানুর ঘুম ভেঙে গেল। নাকিসুরের কথাবার্তা। অতএব সন্দেহ নেই, ভূত-পেত্নি সব এসে জমেছে। একজন বলছে, "এমনি সময়ে এখানে কাল একটা মড়া মিছিল করে নিয়ে যাবে। পুষ্পনগরের খুব বড় সওদাগরের এক ছেলে। ওদের গ্রামে তারপরেই বেশ বড় ফিস্টি হবে ঐ ছেলের শ্রাদ্ধের ব্যাপারে।"

কানুর ঘুম ভেঙে গেল। উৎকর্ণ হয়ে সে নীচের কথাবার্তা শুনছে। ভূত বলছে, "এই জঙ্গলের ওপারেই সেই পুষ্পনগর ওখানকার সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী ধনীরামের বড় বিপদ। তার একমাত্র ছেলে আজ চারদিন ধরে অবিরত রক্তবমি করছে। বড় বড় ডাক্তার এসেছেন, তাঁরা নানান শলাপরামর্শ করছেন, ওষুধপত্তর দিচ্ছেন। কিন্তু কিছুতে কিছু হচ্ছে না, একফোঁটা ওষুধও পেটে তলাচ্ছে না। যা-কিছু মুখে দেওয়া, সঙ্গে-সঙ্গে বমি হয়ে বেরিয়ে যায়। রক্তের ধারা আরও প্রবল হয়। ছেলে নেতিয়ে পড়েছে. এখন-তখন অবস্থা। লক্ষণ দেখে বুঝছি, কালকের দিনটাও টিকবে না।"

আর-একটি তখন বলে,"মানুষ কী বোকা রে! কোনো-কিছুরই খবর রাখে না। সামান্য একটা শিকড়ে রক্ত ওঠা এক্ষুনি বন্ধ হয়ে যায়। আর সে-শিকড় এদেশ-সেদেশ খুঁজে বেড়াতে হবে না

আর-এক ভূত বলে উঠল, "এই গাছেরই তো শিকড়। মুখে ঠেকাতে না ঠেকাতে রক্ত পড়া বন্ধ, অসুখ আরোগ্য। শিকড়ের একটা টুকরো হাতে বেঁধে দেবে, ব্যস, চিরকালের মতো নিশ্চিন্ত আমাদের পায়ের নীচের এত সামান্য একটা জিনিস, অথচ আশ্চর্য ব্যাপার দ্যাখো, তার গুণাগুণও মানুষ জানে না।"

এক পেত্নি এককোণে বসে ছিল। মুখ বেঁকিয়ে সে বলে, "কিছু না কিছু না, ওদের কেবল মুখের দেমাকই সর্বস্ব। নিজেদের এককড়া মুরোদ নেই। একটা কাঠবিড়ালি কি একটা নেংটি ইঁদুরের যে জ্ঞানবুদ্ধি আছে, মানুষের তা নেই।"

ইত্যাকার সব কথাবার্তা ওদিকে ডালের উপর কানু কেবলই ছট্‌ফট্ করছে, কতক্ষণে সকাল হবে, ছুটে চলে যাবে পুষ্পনগরে সে ধনীরামের বাড়ি, এই গাছের শিকড় খুঁড়ে নিয়ে গিয়ে ছেলে বাঁচাবে।

সকাল হল অবশেষে। ভূতপেত্নির নামগন্ধ কোনো দিকে নেই।

"আমার এগারো
বছরের ক্ষুদে ফুটবলার
খেলোয়াড় একদিন
ও হবে বিশ্বের সেরা
ফারোয়ার্ড প্লেয়ার—"

বোর্নভিটাভরা বর্ষগুলি

যার জন্যে এরা একদিন আপনাকে জানাবে তাদের কৃতজ্ঞতা।

বাড়ন্ত বাচ্চারা, অন্য আর সব মল্টেড পানীয়ের মধ্যে বোর্নভিটা-ই কেন সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে? কেন দু'পুরুষ ধরে মা বাবারা জোরের সঙ্গেই বলেন। তাদের বাচ্চাদের অন্য কোন পানীয়তে কাজ হবে না?

এশুধু এটির মজাদার স্বাদের জন্যে নয়। এমন কি ক্যাডবেরিস্ নামটির জন্যেও নয়। এর কারণ অন্য কিছু। বিশেষ কিছু। এ হ'ল বোর্নভিটা, যে পানীয়ের গুণ বলে, তুমি বেড়ে চলো।

রাত ফুরিয়ে যায়, সেই সঙ্গে তারাও সব একেবারে হাওয়া। কানু গাছ থেকে নেমে পড়ল। চারিদিকে দেখেশুনে গাছের ছোট্ট একটুকরো শিকড় নিয়ে ছুটল ধনীরামের বাড়ির উদ্দেশে।

লোকারণ্য বাড়ির মধ্যে। কান্নাকাটি পড়ে গেছে রোগীকে ঘিরে অবিরত রক্তবমি করছে সে। ধনীরামকে কানু বলল, "ছেলের জন্যে তো অজস্র ব্যয় করেছেন। আপনি অনুমতি করলে আমি সামান্য একটু শিকড় রোগীর মুখে দিই।"

ধনীরাম প্রশ্ন করে, "তুমি কি ডাক্তার?"

কানু বলল, "আজ্ঞে না। আমি লোক অতি সামান্য। রোগের খবর কানে গেল, সেই থেকে ওষুধটুকু মুখে দেবার জন্য ছটফট করছি।"

ধনীরাম বলল, "ছেলে যদি বাঁচে, তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকব আমি। টাকাকড়ি সাধ্যমতো তো দেবই।"

লোকজনকে সরিয়ে দিয়ে শিকড়ের টুকরো কেটে রোগীর মুখে দেওয়া হল। আশ্চর্য, রক্ত পড়া সঙ্গে-সঙ্গ বন্ধ। একটুকরো শিকড় হাতে বেঁধে দেওয়া হল। বাইরে আর কিছুমাত্র রোগলক্ষণ নেই। ছেলে সম্পূর্ণ সুস্থ। তড়াক করে সে উঠে বসল। এতদিন যমের সঙ্গে লড়ালড়ি হয়েছে, এখন ছেলের দিকে তাকিয়ে কে বলবে সে-কথা? ধনীরাম ছুটে এসে কানুকে বুকে তুলে নিল। বলে, "তুমি আমার আর-এক ছেলে। বিষয় আশয় আমার যা কিছু আছে, ছেলের সঙ্গে তুমি তার সমান অংশীদার। আমি এই দশজনের সামনে কথা দিলাম। এক মাসেই রেজিস্ট্রি দলিল বানিয়ে দেব। তুমি হবে ব্যবসায়ের প্রধান ভাগিদার, আমার ছেলে তোমারই কথামতো কাজ করে যাবে।"

মাস-ছয়েক গেল। কানু বিনে একা পানুর দোকানের যায়-যায় অবস্থা। এবং কানুর জয়জয়কার, পানুর কানে সে-খবরও গেল। একদিন সে পুষ্পনগরে কানুর কাছে এসে উপস্থিত। বলে, "দাদা, কোন্ কায়দায় তুমি এতবড় ব্যবসা জাঁকিয়ে তুললে? আমায় সব খুলে বলো। নইলে ছেলেপুলের হাত ধরে পথে-পথে আমায় ভিক্ষে করতে হবে।"

কানু বলল, "আমার কোনো কৃতিত্ব নেই। ভূতে আমার উপায় বলে দিয়েছে।"

সবিস্তারে শুনে নিয়ে পানু ফিরে চলল। পথের উপর সেই জঙ্গল। রাত্রি বলে পানু একটা গাছের মাথায় চড়ে বসল। কান পেতে অপেক্ষা করছে, ভূতের মুখে আজকে না-জানি কোন্ নতুন কথা শোনা যায়।

এসেছে ভূত-পেত্নিরা। এক ভূত বলছে, "আমরা এখানে বসে যত কিছু গল্প করি, বাইরে সব চাউর হয়ে যায়। মানুষের নিজের ক্ষমতা নেই, আমাদের কাছে শুনে শুনে দেশের মধ্যে তারা মাতব্বর হচ্ছে, টাকা রোজগার করছে। আজ থেকে সেটা হতে দিচ্ছিনে। ভাল করে খুঁজে দ্যাখো, আশপাশে কোথাও কেউ লুকিয়ে আছে কি না।"

পানু দো-ডালার ফাঁকে প্রাণপণে মাথা গুঁজে আছে, যাতে কেউ না দেখতে পায়। কিন্তু ভূতের নজর এড়ানো গেলেও ভূতের পুরুত ব্রহ্মদৈত্য মশায় দেখে ফেলেছেন। বড় বেলগাছের মগডালে ছিলেন তিনি, একখানা পা মাটিতে নামিয়ে নেমে পড়লেন। পানু যে গাছের উপর, পাকা ফল ছিঁড়ে আনার মতো সেই গাছ থেকে পানুকে বাঁ হাতের মুঠোয় ছিঁড়ে ছুঁড়ে দিলেন ভূতেদের মধ্যে। ভূতেরা মুণ্ড ছিঁড়বে না কী করবে, পানু তো ইতিমধ্যে চোঁ-চাঁ দৌড়। দৌড়ের রকম দেখে ভূত-পেত্নিদের রাগ চলে গিয়ে তারা তো হেসেই খুন। মাঝে-মাঝে নাকি সুরে ধঁর-ধঁর করছে।

পানু দৌড়ের জোর আরও বাড়িয়ে দিল

ছবি শুভাপ্রসন্ন

কে ফার্স্ট

বিমল মিত্র

জীবনে কে ফার্স্ট হয় আর কে-ই বা লাস্ট হয়, তা কি কেউ বলতে পারে ? এমন দেখা গেছে, একজন ছেলে প্রথম জীবনে স্কুলের পরীক্ষায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কেবল ফার্স্ট হয়ে-হয়েই একটার পর একটা ক্লাসে উঠেছে।

কিন্তু পরের জীবনে আবার তাকেই দেখেছি সে যে কেবল লাস্টই হয়ে গিয়েছে তাই-ই নয়, মানুষের ভিড়ের চাপের তলায় পড়ে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

অনেক খুঁজে খুঁজে যখন তাকে আবিষ্কার করেছি, তখন দেখে অবাক হয়েছি যে, একদিন স্কুলের পুরস্কার বিতরণের সভায় এই এরই গলায় সোনার মেডেল পরিয়ে দিয়ে সভার সভাপতি বলেছিলেন, "তুমি জীবনের শেষ পরীক্ষাতেও প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হও, আমি এই আশীর্বাদই করি।"

দুঃখের বিষয়, সভাপতির সেদিনকার সেই ভবিষ্যদ্বাণী একেবারেই ফলেনি। সেই ছেলেটি জীবনের শেষ পরীক্ষায় ফার্স্ট তো হতে পারেইনি, এমন কী শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পর্যন্ত না হয়ে একেবারে ফেল হয়ে গিয়েছে। তখন আর তাকে কেউই চেনে না। অখ্যাত গ্রামের এক প্রান্তে অখ্যাততর অবস্থায় অতি দীনহীন হয়ে দিন কাটাচ্ছে।

ছোটবেলার কথাই বলি

আমাদের স্কুলের ফার্স্ট বয় সুনন্দ ছিল বড়লোকের ছেলে। তাদের বংশের টাকা আর ঐশ্বর্যের খ্যাতি পাড়ার সব লোকের জানা ছিল। তাই স্কুলের হেড্ মাস্টারমশাই থেকে নিচু ক্লাসের মাস্টারমশাই, সবাই সুনন্দকে একটু বেশি খাতির করতেন।

তখনকার দিনে আমরা সবাই পাড়ার স্কুলেই পড়তাম। এখনকার মতো বাসে চড়ে নাম-করা ইংরিজি স্কুলে পড়বার রেওয়াজ ছিল না। আমরা বাড়ি থেকে হেঁটে-হেঁটে স্কুলে যেতাম। যারা টালিগঞ্জ কি ভবানীপুর থেকে আমাদের স্কুলে পড়তে আসত, তারাও ট্রামে বা বাসে না চড়ে সোজা রাস্তা দিয়ে হেঁটে-হেঁটে আসত। ছেলেধরাদের কোনো উৎপাত ছিল না তখন কলকাতায়।

কিন্তু সুনন্দ আসত তার গোপালদার সঙ্গে।

সুনন্দর বাবা-মা তাকে কখনও একলা রাস্তায় বেরোতে দিতেন না।

সুনন্দ কিন্তু সঙ্গে কাউকে নিয়ে স্কুলে আসতে পছন্দ করত না।

তার বাবা বলতেন, "গোপাল তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ইস্কুলে যাবে।"

সুনন্দ বলত, "কিন্তু অন্য ছেলেদের সঙ্গে তো কেউ আসে না। তারা তো একলা-একলাই ইস্কুলে আসে।"

সুনন্দর বাবা বলতেন, "তা আসুক, তাদের কেউ কাজের লোক নেই বলে তারা একলা ইস্কুলে আসে আর একলা ইস্কুল থেকে বাড়ি ফেরে। কিন্তু তোমার জন্যে তো গোপাল আছে। গোপাল তোমাকে সঙ্গে করে ইস্কুলে নিয়ে যাবে, আর ইস্কুল থেকে ফেরবার সময়ে সে-ই তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরবে।"

সুনন্দর এটা ভাল লাগত না। সে চাইত অন্য ছেলেদের মতো সে-ও একলা-একলা ইস্কুলে যাবে, আর একলা-একলা বাড়ি ফিরবে—

আরও একটা ব্যাপারে সুনন্দর আপত্তি ছিল।

দুপুরে টিফিনের সময় গোপাল সুনন্দর জন্যে জলখাবার আনত। জলখাবার মানে এক গ্লাস দুধ আর কখনও বা দুটো রসগোল্লা, কিংবা কোনো-কোনো দিন দুটো বড় সন্দেশ।

আমরা যারা গরিব-বাড়ির ছেলে, তারা চানাচুর বা ডালপুরি আলুর দম কিনে খেতুম। আমাদের বাবা-মায়েরা আমাদের এক আনা কি দু আনা পয়সা দিতেন। আবার কেউ তাও পেত না তারা এর-ওর-তার কাছ থেকে চেয়েচিন্তে খেত।

আমরা দূরে দাঁড়িয়ে গোপালের খাওয়া দেখতুম।

টিফিনের সময়ে স্কুলের গেট বন্ধ হয়ে যেত। গেটের বাইরে ঘুগনিদানা, ডালপুরি, আলুর দম এই সব জিনিসের ফেরিওয়ালারা বসে থাকত। আমরা গেটের রেলিঙের ভিতর দিয়ে হাত বাড়িয়ে এই সব জিনিস কিনতুম।

কিন্তু সুনন্দর বাবা বড়লোক ছিলেন বলে তার টিফিনের খাবার
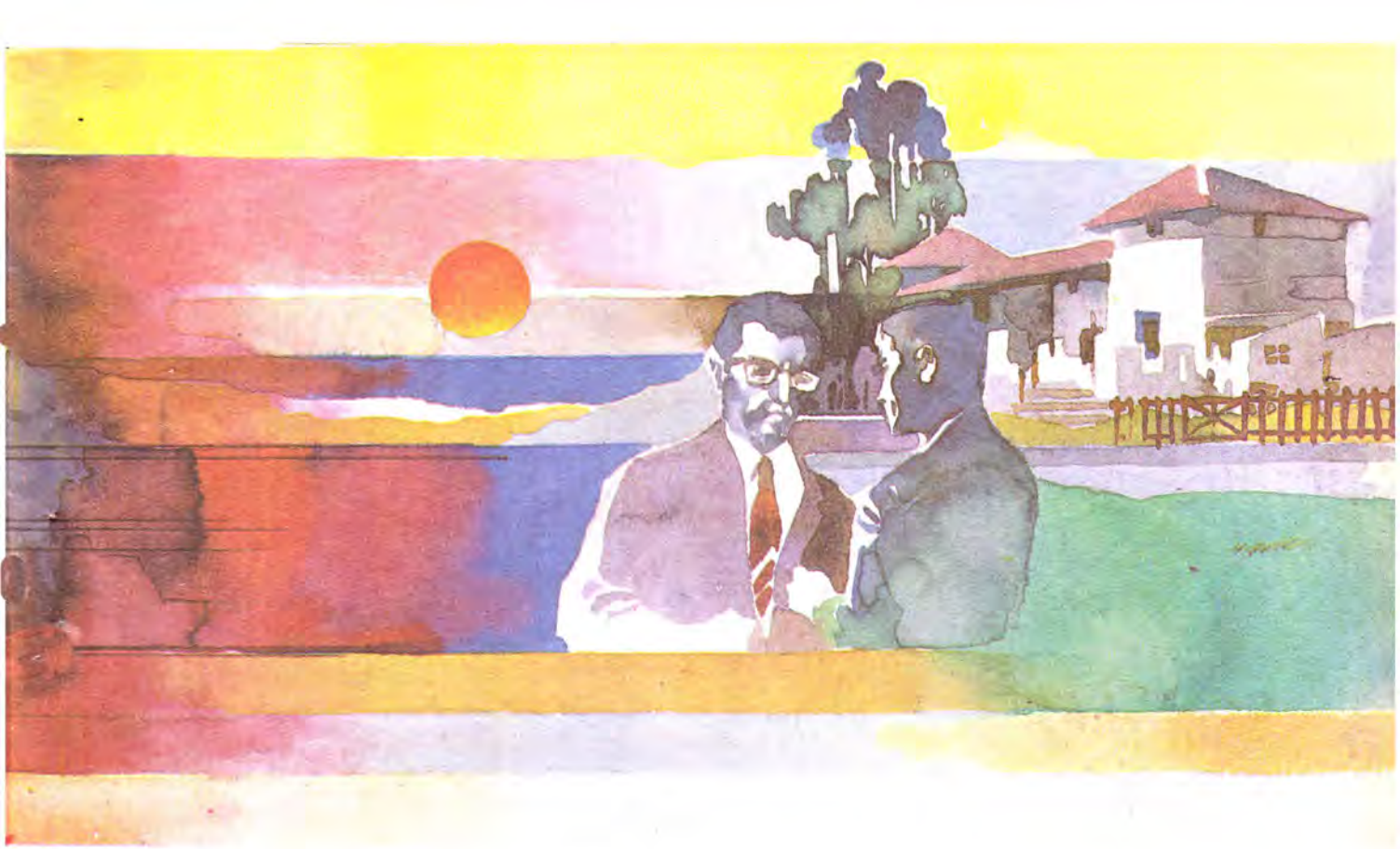
আনত গোপাল। গোপাল যাতে জলখাবার নিয়ে সুনন্দকে দিতে পারে, সেই জন্যে গেট খুলে দিত স্কুলের দরোয়ান। সুনন্দর খাওয়া হয়ে গেলে আবার গেট খুলে দিতে হত, যাতে গোপাল খালি দুধের গ্লাস আর রসগোল্লা আর সন্দেশের খালি কৌটো নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে।

সুনন্দ গোপালের হাত থেকে জলখাবার নিয়ে খেত বটে, কিন্তু যতটা পারত লুকিয়ে চুকিয়ে। ভাবটা এমন, যেন সে একটা পাপ করছে।

আমরা বলতুম, "কেন রে সুনন্দ, অত লজ্জা কেন তোর ?"

সুনন্দ বলত, "দ্যাখ্ না ভাই, বাবা কী-রকম লজ্জায় ফেলে আমাকে। আমি যত বলি যে, আমার জন্যে খাবার-টাবার পাঠাতে হবে না, আমার খিদে পায় না, তত ওই সব জিনিস দিয়ে গোপালকে পাঠাবে।"

শুধু খাবার পাঠানোও নয়, স্কুলে আসবার সময় আর স্কুল থেকে ফেরবার সময়ও তাই। তাতেও সুনন্দর আপত্তি! সুনন্দর ধারণা ছিল, সে তখন বেশ সাবালক হয়েছে, সে একলা-একলাই স্কুল থেকে যাতায়াত করতে পারবে!

কিন্তু তার বাবা-মা ছাড়তেন না। বলতেন, "না, রাস্তায় কত দুষ্টু বদ্‌মায়েস লোক থাকে, তারা তোমাকে মারতে পারে, কিম্বা বই-খাতা কেড়ে নিতে পারে। গোপাল যাবে তোমার সঙ্গে।"

কিন্তু সত্যিই লজ্জা করত সুনন্দর।

ভবানীপুরের বাড়ি থেকে যখন সুনন্দ বেরোত, তখন গোপালও পেছন-পেছন বেরোত। কিন্তু পাছে কোনো লোক তার সঙ্গে গোপালকে দেখতে পায়, সেই জন্যে সুনন্দ দৌড়ে-দৌড়ে অনেক দূরে চলে যেত।

তখন ভাবনায় পড়ত গোপাল। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলত, খোকনবাবু, ও খোকনবাবু, অত দৌড়ো না, গাড়ি চাপা পড়বে, একটু আস্তে চলো, আমার সঙ্গে-সঙ্গে চলো।"

কিন্তু কে কার কথা শোনে!

সুনন্দ তখন ছোট্ট, আর গোপালের তখন বয়েস হয়েছে। সে ছোট্ট সুনন্দর সঙ্গে দৌড়ে পেরে উঠবে কেন?

গোপাল যত ছুটত, সুনন্দ ততই আরও জোরে ছুটত।

পেছন থেকে গোপাল চেঁচাত, "ও খোকনবাবু, অত ছুটো না, পড়ে যাবে, পড়ে গেলে হাত-পা ভেঙে যাবে!"

কিন্তু গোপালের কথা শুনতে সুনন্দর বয়ে গেছে।

রাস্তা দিয়ে তখন কত সাইকেল চলছে, কত ঠেলাগাড়ি চলছে, কত গাড়ি চলছে, তাদের যে-কোনো একটাতে খোকনবাবু চাপা পড়তে পারে। গোপালের কেবল সেই ভয়ই করত। যদি সে-রকম কিছু হয়, তখন কী হবে?

বাড়িতে গোপালের তেমন কিছু কাজ থাকত না। সুনন্দর একটা বড় ভাই ছিল। সে ক'বছর আগে একটা ভারী অসুখে হাসপাতালে মারা গিয়েছিল। তাকেও গোপাল মানুষ করেছিল। কিন্তু সে-শোক গোপাল তখনও সামলাতে পারেনি। সুনন্দর বাবা-মা হয়তো সেই ছেলের মৃত্যুশোক ভুলতে পেরেছিলেন, কিন্তু তার কথা মনে পড়লে গোপালের চোখে এখনও জল টলটল করে ওঠে। সেজন্যে সে কাউকে কিছু বলে না, কিন্তু চোখে জল এলে সে আড়ালে কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ মুছে ফেলে। তারপর কাউকে দেখতে পেলেই আবার হেসে ওঠে।

কবে একদিন পাঁচ বছর বয়সে নিজের দেশ ছেড়ে এই বাড়িতে সে এসে পড়েছিল। তার পর থেকেই এ-বাড়িটা তার নিজের বাড়ি হয়ে গিয়েছে। তার মনে হয় এ-বাড়িটাই তার নিজের বাড়ি, এ-বাড়ির লোকেরাই তার নিজের বাপ-মা। এ-বাড়িতে যদি কেউ বেশি চিনি খরচ করে তো তার গায়ে লাগে! তার নিজের মনেই সে বলে ওঠে, "ওমা, আমার চিনি সব নষ্ট করে ফেললে!"

এ-বাড়ির লোকের হাত থেকে যদি তুচ্ছ একটা কাচের গ্লাস মেঝের ওপর পড়ে ভেঙে যায়, তো কর্তা-গিন্নির মনে কিছু ব্যথা বাজুক আর না-বাজুক, গোপালের বুকের ভেতরটা হায়-হায় করে ওঠে!

বলে, "একটা গেলাসের কি দাম কম গো, কত পয়সা খামোখা নষ্ট হয়ে গেল!"

সেই গোপালকে আমরা রোজ দেখতুম। একটা কাপড় মালকোঁচা দিয়ে কোমরে জড়ানো, গায়ে একটা হাফ-হাতা ফতুয়া। হাতে একটা বড় কাঁসার গ্লাস, আর একটা অ্যালুমিনিয়ামের ঢাকনা দেওয়া কৌটো। তার ভেতরে দুটো রসগোল্লা আর নয়তো সন্দেশ থাকত।

সেই খাবারটুকু সুনন্দকে খাইয়ে গোপাল যেন পরম তৃপ্তি পেত।

সুনন্দ রোজ একঘেয়ে খাবার খেতে আপত্তি করত। আমাদের মতো তারও ঘুগনিদানা খেতে ইচ্ছে করত, ডালপুরি খেতে ইচ্ছে করত। কিন্তু তা খাওয়ার উপায় ছিল না। ও-সব খেলে নাকি শরীর খারাপ হবে। এই-ই ছিল গোপালের আপত্তি।

সুনন্দ আমাদের কাছ থেকে যদি ও-সব খাবার চেয়েচিন্তে কোনোদিন খেত তো বলত, "তোরা যেন ভাই গোপালদাকে বলে দিসনি। সে তাহলে বাবাকে বলে দেবে।"

আসলে বাবা-মা নয়, ভয় তার ওই গোপালদাকে। গোপালই ছিল আসলে সুনন্দর গার্জিয়ান।

আর শুধু কি তাই? গোপাল চাইত না যে, সুনন্দ আমাদের মতো গরিব ছেলেদের সঙ্গে মেশে। আমাদের সঙ্গে মিশলেই নাকি সুনন্দ খারাপ হয়ে যাবে!

অথচ, আশ্চর্যের কথাটা এই যে, সংসারে গোপালের নিজের বলতে কেউ কোথাও ছিল না। কবে একদিন ছোটবেলায় হয়তো তার বাপ-মা ছিল, কিন্তু তাদের সে নিজের চোখে দেখেনি। আর দেখলেও তাদের কথা আর তার মনেও নেই। জীবনের বানের স্রোতে ভাসতে ভাসতে সে এসে ঠেকে গিয়েছিল এই সুনন্দদের সংসারে। আর তখন থেকেই সে এ-বাড়ির আপনজন হয়ে গিয়েছিল। আর সুনন্দর কাছে সেই গোপাল একদিন হয়ে গিয়েছিল গোপালদা।

সুনন্দ বলত, "জানিস, গোপালদাটা বড্ড বজ্জাত।"

আমরা জিজ্ঞেস করতুম, "কেন?"

সুনন্দ বলত, "আরে, বাড়িতে আমি যদি পড়শোনা না করি, তো মাস্টারমশাই এলেই তাকে বলে দেবে।"

আমরা জিজ্ঞেস করতুম, "কী বলে দেবে?"

সুনন্দ বলত, "গোপালদা চায় মাস্টারমশাই আমাকে বকুক। তাই মাস্টারমশাই এলেই গোপালদা বলবে, 'মাস্টারমশাই, খোকনবাবু মোটে লেখাপড়া করেনি আজ, কেবল ছাতে উঠে ঘুড়ি উড়িয়েছে, আপনি ওকে খুব বকে দিন।'"

আমরা জিজ্ঞেস করতুম, "তোর মাস্টারমশাই কী বলেন?"

"মাস্টারমশাই আর কী বলবেন, একটু হাসেন। হেসে বলেন, 'আচ্ছা, তোমার খোকনবাবুকে আমি খুব বকে দেব, তুমি এখন যাও।'"

স্কুল থেকে বাড়ি ফেরবার সময়ও গোপাল এসে হাজির হত। সুনন্দকে সে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে যাবে!

কিন্তু গোপালকে দেখলেই সুনন্দ বাড়ির দিকে দৌড় দিত। আর তার পেছন-পেছন গোপালও দৌড়ত।

সুনন্দর পায়ের জোরের সঙ্গে গোপাল পারত না। গোপাল তার পেছন-পেছন দৌড়তে দৌড়তে বলত, "খোকনবাবু, আস্তে আস্তে চলো, দৌড়িও না, গাড়িচাপা পড়বে!"

কিন্তু তা শুনতে সুনন্দর বয়ে গেছে।

গোপাল বলত, "তোমার মাস্টারমশাইকে বলে দেব! খোকনবাবু, ও খোকনবাবু!"

আমরা দূর থেকে দেখতুম কে ফার্স্ট হয় দৌড়ে। গোপাল না সুনন্দ? কে?

কিন্তু প্রত্যেকবারই ফার্স্ট হত সুনন্দ। আর সুনন্দর সঙ্গে দৌড়ের বাজিতে গোপাল হেরে যেত।

এই রকমই বরাবর। একেবারে নিচু ক্লাস থেকে একেবারে সবচেয়ে উঁচু ক্লাস পর্যন্ত বরাবর সুনন্দ ফার্স্ট হত আর লাস্ট হত গোপাল। গোপালকে হারিয়ে দিয়ে সুনন্দ যেন একটা পরম আনন্দ পেত!

আর আমরাও আনন্দ পেতুম গোপালকে হারতে দেখে!

তাই গোপালকে দেখলেই আমরা তাকে খ্যাপাতুম। বলতুম, "দুয়ো! হেরে গেল, দুয়ো!"

আমাদের কথায় গোপাল মাঝে-মাঝে রেগেও যেত। বলত, "তোমাদের সঙ্গে মিশে-মিশেই তো আমার খোকনবাবু এত দুষ্টু হয়েছে!"

কিন্তু আমরা তার কথায় কান দিতুম না। আমরা আরও জোরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গোপালকে খ্যাপাতুম। বলতুম, "দুয়ো! গোপাল হেরে গেল, দুয়ো!"

এরপর আমরা স্কুল থেকে পাশ করে কে কোথায় ছিটকে বেরিয়ে গেছি, তার ঠিক নেই। মানুষমাত্রেরই জীবনে একবার-না-একবার জোয়ার আসে। সেই জোয়ারে কেউ ওপরে ভেসে ওঠে, আবার কেউ বা তলিয়েও যায়। তখন একজন অন্য একজনের খবর রাখবার সময় পায় না।

কিন্তু এত দিন পর যদি হঠাৎ পুরনো সেই বন্ধুদের কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যায়? তাহলে কী হয়?

তা তাই-ই এবার হল।

আমার সঙ্গে আকস্মিকভাবেই হঠাৎ অন্য এক জায়গায় সুনন্দর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

সে তখন ওড়িশার বালেশ্বর জেলার চাঁদিপুর-এর রেস্ট্-হাউসে উঠেছে। কী একটা সরকারি তদন্তের কাজে সে উঠেছে ওখানে। আর আমি গিয়েছি ওখানকার একটা সাহিত্যসভায় ভাড়া খাটতে সে ওখানকার ডেপুটি কালেক্টার।

তাকে দেখে আমারও যত আনন্দ, আমাকে দেখে তারও তত আনন্দ। অনেক খবর-বিনিময় হল। একসঙ্গে চায়ের টেবিলে বসে কথা বলতে বলতে হঠাৎ সুনন্দর চোখ দুটো ছলছল্ করে উঠল

বললে, "জানিস ভাই, আমি আজ লাস্ট্ হয়ে গেছি।"

"লাস্ট্ হয়ে গেছিস মানে? কিসে লাস্ট?"

সুনন্দ বললে, "লাইফের রেসে, জীবনের ঘোড়দৌড়ে আমি আজ লাস্ট হর্স।"

"কেন? কী করে?"

সুনন্দ বললে, "ভাই, তোরা তো জানিস দৌড়ে গোপালদাকে আমি বরাবর হারিয়ে দিতুম। আমি হতুম ফার্স্ট, আর সে হত লাস্ট। তোরা গোপালদাকে দুয়ো দিতিস।"

বললাম, "হ্যাঁ, সে তো অনেক দিন আগের কথা।"

সুনন্দ বললে, "গেল রোববারে সেই গোপালদা আমাকে লাস্ট করে দিয়ে নিজে ফার্স্ট হয়ে গেল।"

তবু ব্যাপারটা যেন স্পষ্ট হল না।

সুনন্দ স্পষ্ট করে দিয়ে বললে, "জানিস, আমার বাবা-মা মারা যাওয়াতেও আমি এত কষ্ট পাইনি। শুক্রবার দিনও কিছু বোঝা যায়নি। শনিবার দিন তার ঘরে গিয়ে ডাকলুম। তবু জবাব পেলুম না। তারপর গায়ে হাত দিতেই দেখি গোপালদা দৌড়চ্ছে। আমাকে হারিয়ে দিয়েই একেবারে ফার্স্ট হয়ে গেল। আর আমিই হয়ে গেলুম লাস্ট্। অথচ আগে আমিই বরাবর ফার্স্ট হতুম, আর গোপালদা লাস্ট। আজকে আমাকে কে দুয়ো দেবে? তোরা তো কেউ নেই, আমাকে আজ দুয়ো দেবে কারা?"

বলতে বলতে সুনন্দ রুমাল দিয়ে চোখ দুটো মুছতে লাগল

ছবি আশিস সেনগুপ্ত

ফুটকি

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

কলকাতা একেবারে যাচ্ছেতাই হয়ে গিয়েছে। যখন কলেজে পড়তাম, তখনও দেখেছি বাজারে কাটা-পোনা আট আনা করে সের 'কিলো' বলে কোনো কথা আমরা জানতাম না। ইলিশ মাছ কলকাতার লোক বেশি খেত না। তার দাম আরও কম, চার আনা সের। যুদ্ধের পর জিনিসের দাম প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে লাগল। যেদিন প্রথম একটাকা দরে বাজার থেকে মাছ নিয়ে এল, সেদিন আমাদের পুরনো ঠাকুর গালে হাত দিয়ে বললে, "শুনছেন দাদাবাবু, এবার আর গরিব লোকেরা খেতে পাবে না।" তখন কিন্তু একটা জিনিস শস্তায় পাওয়া যেত। শীত পড়তে আরম্ভ করলেই গড়িয়াহাটের বাজারে হরিণের মাংস আসত। সবাই বলত সুন্দরবন থেকে শিকারিরা নিয়ে আসে। আমি হরিণের মাংস তেমন পছন্দ করি না। একদিন পচিয়ে রেখে দাও, তারপর খড়টড় দিয়ে সিদ্ধ করো, খেতেও এমন-কিছু আহামরি নয়। কেমন যেন শুকনো শুকনো আর বালি-বালি খেতে। সবাই আনন্দ করে খেত বলে আমি কিছু বলতাম না। খুব অল্প একটু পাতে নিতাম। মা একদিন রেগে গিয়ে বললেন, "তোমার আবার ভুলেও কিছু ভাল লাগতে নেই। সবাই আনন্দ করে খাচ্ছে, আর উনি মুখ প্যাঁচা করে বসে আছেন।" শুনে ইস্কুলে শোনা গল্পের কথা মনে পড়ল। সেই যে ইতিহাসের স্যার ক্লাসে সম্রাট অশোকের গল্প বলেছিলেন। অশোক সবরকম মাংস খাওয়া ছেড়েছিলেন, দুটি ছাড়া, হরিণ আর ময়ূর। সম্রাট অশোক তো অনেক ভাল জিনিস খেতে পারতেন। শিককাবাব-টাবাব পর্যন্ত বোধহয় পাওয়া যেত। কিন্তু কোন্ দুঃখে তিনি হরিণ আর ময়ূরের মাংস খাবেন? হরিণ তবু পদে আছে, কিন্তু ময়ূরের মতো নোংরা জিনিস কেউ খায়? তাদের পোকা-মাকড় কিছুতেই অরুচি নেই। সাপ পেলে তো তাদের ভোজ।

শীতকালে রবিবার হলেই আমার ভয় হত। আবার বুঝি বাজার থেকে হরিণের মাংস নিয়ে আসে। এক রবিবার সবে সাড়ে আটটা বেজেছে, উপরের বারান্দা থেকে দেখলাম কিষান বাজার থেকে ফিরেছে। কিষান আমাদের কাজের লোক। তার বাড়ি বিহারে। বাড়ির ভারী কাজ কিছু থাকলে তার ডাক পড়ে। কিষান ধামা থেকে কী সব বার করছে। এক আঁটি মটরশাক, বেগুন, দুটো বড় মুলো, টম্যাটো, মাছের ঝুড়ি থেকে বেরোল বড় এক টুকরো পোনামাছ, আর, হরিণের মাংস নয়, তার বদলে এতক্ষণ দেখতে পাইনি, কিষানের পায়ের কাছে একটা ছোট হরিণের বাচ্চা। কিষান ভাল মানুষ, তাকে হয়তো দোকানি বুঝিয়েছে, মাংস খুঁজছ কেন, তার চেয়ে ছোট বাচ্চাটাকেই নিয়ে যাও, খুব টাটকা মাংস পাবে, আর চামড়া দিয়ে ক'জোড়া চটি হবে ভেবে দেখেছ? কিষান খুব খুশি হয়ে হরিণটাকে বাড়ি নিয়ে এল। হরিণের বাচ্চা দেখে বাড়িতে কীরকম শোরগোল হতে পারে, আগে বুঝতে পারিনি।

রান্নাঘরের বারান্দায় গোলমাল বাড়ছে দেখে সবাই বেরিয়ে এল। খুকু তার দাদাকে জিজ্ঞেস করল, "এটা কী জন্তু রে! আয় দাদা, খুব সাহস করি, খুব হিংস্র নয় তো?" তার দাদা বলল, "তোর যা বুদ্ধি! বইয়ের পাতায় হরিণের ছবি দেখিসনি? তুই তো আবার বই খুলতেই চাস্ না।" গোলমাল শুনে খুকুর মা খুন্তি হাতে বেরিয়ে এসেছিলেন। খুকুর দাদা খুব মাংস খেতে ভালবাসে। সে তার মাকে বলল, "আজ খুব ভাল করে রান্না কোরো, অনেক মাংস খাব।" তার মা শুনে রেগে গেলেন। তিনি সমস্ত জীবন ধরে রান্না করছেন, কিন্তু কখনও কেউ তাঁকে জ্যান্ত হরিণের বাচ্চা রাঁধতে বলেনি। "রাতদিন খাই খাই করছিস, যেন কখনও কিছু খেতে পাস না। যাও, অঙ্ক নিয়ে বোসো গে, রবিবার হয়েছে তো কী হয়েছে?" মায়ের খাস দাসী সুখী প্রথমটায় এদিকে আসেনি। ভেবেছিল এলেই বাড়তি কাজ করতে হবে। হঠাৎ হরিণটাকে দেখে বলল, "ওমা, এটা কী? কোথায় যাব গো।" বলে কোথাও গেল না, যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানেই ধপাস্ করে বসে পড়ল। হঠাৎ গোলমাল থেমে গেল। খুকুর মা'র জন্য নয়, তাঁকে কেউ ভয় করত না। দেখলাম কিষান কখন উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে। সে একটা বড় দড়ি হাতে করে এসে সুখীকে বলল, "তুম হঠ যাও।" এই বলে হরিণের গলার ছোট দড়িটা খুলে একটা বড় দড়ি বেঁধে দিল। টিপ্‌কলের সামনে গিয়ে হরিণটাকে ভাল করে স্নান করিয়ে দিল

প্রাণ জুড়োতে জুড়ি নেই
ছোট বড়র তফাৎ নেই
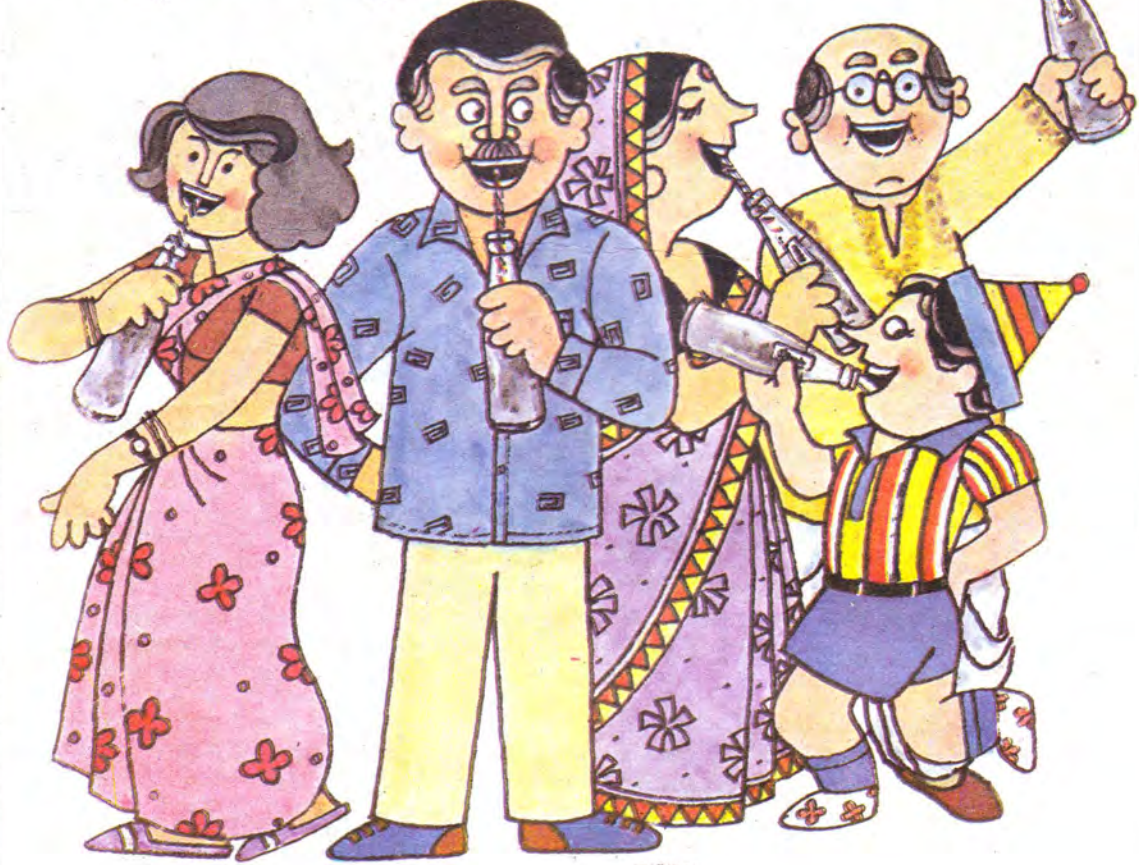
Spencer's

খুকুর দাদাকে বলল, "খোকাবাবু, তুমি একে কিচ্ছু ঢিল-উল মারবে না।" এই বলে হরিণটাকে তার নিজের খাবার থেকে একমুঠো ভিজে ছোলা দিল। এতক্ষণ ভাবছিলাম, হরিণের জন্য একটা ভাল সংস্কৃত নাম রাখলে কেমন হয়, এমন সময় নীচ থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, "ওমা, দেখেছ হরিণটার গায়ে কী রকম ফুট্‌কি ফুট্‌কি।" ব্যস, ওর নাম 'ফুটকি' হয়ে গেল।

ফুটকিকে প্রথম প্রথম সবারই খুব ভাল লাগত। পরেও যে খারাপ লাগত তা নয়, কিন্তু একটু অসুবিধা দেখা দিতে লাগল। আমরা খেয়ালই করিনি যে, ফুটকি আস্তে-আস্তে বড় হবে। ঠিক আস্তে-আস্তে নয়, তাড়াতাড়ি বড় হতে লাগল। আমরা সকালে আর রাত্রে ভিতরের একতলার বারান্দায় খেতাম। ফুটকি যখন ছোট ছিল, তাকে বারান্দায় রেলিংয়ের সঙ্গে বেঁধে রাখা হত। সে বারান্দার ধাপে দু'পা তুলে দিয়ে টেবিলের দিকে মুখ বাড়িয়ে দিত। সবই তার পছন্দ। মুলো, বাঁধাকপির তরকারি, বেগুন, লাউ, শশা, দই। মাছ মাংস অবশ্য দেওয়া হত না। আর একটু বড় যখন হল, তখন ফুটকির মাথা আমাদের টেবিলের মাথা ছুঁই-ছুঁই করত। মাঝে-মাঝে বিরক্তি লাগত। বলতে হত, "এই ফুটকি, সরে যা। আমার প্লেটে মুখ দিবি না।" একদিন খুকুর দিকে মুখ বাড়িয়ে ফোঁস করে তার ঘাড়ের উপর নিশ্বাস ফেলছে। খুকু চিৎকার করে তাড়াতাড়ি টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল। বলল, "ওমা, খেয়ে ফেলল।" এরপর ফুটকির শিং বড় হতে লাগল। শিং নিয়ে কখনও-কখনও বাইরের লোকের দিকে তেড়ে যেতে লাগল। বাড়ির লোকদের কিছু বলত না। ছেলেবেলায় গল্প পড়েছিলাম এক ভদ্রমহিলার পোষা হরিণ ছিল। বাড়িতে একদিন দু'চারজনকে খেতে বলেছেন। তাদের মধ্যে একজন মেমসাহেবও আছেন। মেমসাহেব সেজেগুজে মাথায় একটা বড় লাল গোলাপফুল পরে এসেছেন। হরিণের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হাউ সুইট।" হরিণ গোলাপফুলকে খাবার জিনিস মনে করে তাঁর গায়ে দু'পা তুলে দিয়ে গোলাপটিতে মুখ দিতে গিয়েছে। ভদ্রমহিলা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। যদি আমাদের বাড়িতেও সেরকম হয়?

ফুটকির প্রায় সব অভ্যাসই সহ্য হয়ে আসছিল। এমন সময় সে নতুন নতুন কাণ্ড করতে লাগল। একদিন পাঁচটার সময় আপিস থেকে বাড়িতে ফিরে দেখি খুব গোলমেলে অবস্থা। ফুটকিকে পাওয়া যাচ্ছে না। কাজের লোকজনও কেউ বাড়িতে নেই। খুকু কাঁদছে। খুকুর মা'র মেজাজ এত খারাপ যে, আমার জলখাবার তৈরি করতে ভুলে গিয়েছেন। স্পষ্ট বলে গিয়েছিলাম, আজ বিকেলে এসে ডালপুরি খাব। ডালপুরি খেতে আমি খুব ভালবাসি। ময়দা মাখবার তোড়জোড় হচ্ছিল, তারপর কাজ আর এগোয়নি। অনেক জিজ্ঞাসা করে বুঝতে পারলাম কী হয়েছে। ফুটকি তার দু'একদিন আগে লাফিয়ে গেট ডিঙিয়ে যেতে শিখেছে। কখন বেরিয়ে গিয়েছে কেউ দেখতে পায়নি। বাড়ির প্রায় সবাই তাঁকে খুঁজতে বেরিয়েছে। তখন রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে দোতলা বাস কেবল চলতে আরম্ভ করেছে। ট্রাম, লোকের ভিড়, সাইকেল, সবই কম ছিল, তাহলেও বিপদ ঘটতে কতক্ষণ।

বেশিক্ষণ দেরি করতে হয়নি। সন্ধ্যার পর সবাই চেঁচাতে-চেঁচাতে ফুটকিকে বাড়ি নিয়ে এল। আসলে ফুটকি বাড়ি থেকে বেরিয়েই ঘাবড়ে গিয়েছিল। ট্রাম, বাস, গাড়ি, বেঁটে ছাতি হাতে মহিলা, সবাই যে এত ভয়ঙ্কর, সে-কথা আগে বুঝতে পারেনি। তার বাড়ি থেকে পালাবার উৎসাহ কিছুদিনের জন্য চলে গিয়েছিল। কিন্তু সেদিনকার অভিজ্ঞতার কথা ভুলতেও তার বেশি সময় লাগল না। বারে বারে এই ব্যাপার ঘটতে লাগল। বাড়ির লোক সবাই হরিণের পেছনে দৌড়ে-দৌড়ে অধৈর্য হয়ে গেল, এক কিষান ছাড়া। একদিন তাকে অনেক চেষ্টা করে পাড়ার লোকজনের সাহায্যে ধরে নিয়ে আসা হল। সেই শেষবার। ফুটকি দেখলাম একটু জখম হয়েছে, কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে। নাকের একপাশ কালো হয়ে আছে। পিঠের একটা জায়গা থেকে ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত পড়ছে। একটু খুঁড়িয়ে চলছে। কিষান তাকে ধরে নিয়ে গেল। গায়ে ডেটল-টেটল দিয়ে কী সেবা-শুশ্রূষা করল জানি না। একবার কান মলে দিল, তারপর খেতে দিল।

এরকম করে আর কতদিন চলে। সেদিন রাত্রে আমাদের খেতে দেরি হয়ে গেল। খাবার পর আমাদের মিটিং বসল। হরিণটা কাউকে দিয়ে দিলে হয় না? কে পুষবে? খুকুর দাদা বলত খুকু কখনও বুদ্ধিমতীর মতো কথা বলে না, কিন্তু সেদিন বলেছিল। খুকু বলল, "অত ভাবছ কেন? ওকে চিড়িয়াখানায় দিয়ে দাও। এখানে একা-একা থাকতে হয়, ওখানে অনেক হরিণ আছে, তাদের সঙ্গে থাকতে পারবে। আর অমন খোলা মাঠ, ভালই থাকবে। কিষান থাকবে না বটে, তবে খাবারের কষ্ট হবে না।"

আমাদের সবার মনেই বোধহয় এ-কথা ছিল, কিন্তু এই নিষ্ঠুর নির্বাসনের কথা খুকু বলে ফেলল বলে মনে-মনে আরাম পেলাম। তা-ই ঠিক হল অবশেষে। পরের দিন চিড়িয়াখানায় চিঠি লিখলাম। হয়তো আশা ছিল যে, তারা কোনো উত্তর দেবে না। সরকারি ব্যাপারে এ-রকম হয়। কিন্তু চারদিন পরে লোকের হাতে যে চিঠি এল, তার বাংলা এই রকম হরিণটা পেলে তারা খুশি হবে। আরও ছ'সাতদিন পরে দুপুরবেলা একটা বড় কালো গাড়ি এসে হরিণটাকে নিয়ে গেল। বিকেলে বাড়ি এসে শুনলাম ফুটকি বিশেষ গোলমাল করেনি। বাড়ি থেকে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে, ভাবতেই পারেনি হয়তো।

দিন আগেকার মতো চলতে লাগল। কিন্তু ঠিক আগেকার মতো নয়। খুকু গম্ভীর হয়ে গেল। দাদার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি কমে গেল। খাবার সময় কথাই বলে না। একদিন শুধু বলল, "ধরো এমন যদি হয়, ফুটকির ওখানে ভাল লাগছে না?" খুকুর দাদা খুকুর সঙ্গে কখনও একমত হয় না। কিন্তু একথা শুনে কোনো প্রতিবাদ করল না। সুখী শুধু বলল, "গিয়েছে, আপদ গিয়েছে। ভাত, ডাল, তরকারির খোসা কী না খেত। আর ছিষ্টি নোংরা করত।" খুকুর মা হঠাৎ রেগে গেলেন। বললেন, "সুখী, তুই চুপ করবি? সব কথার মধ্যে তোর থাকবার দরকার কী?" কিষান সুখীর দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইল, কিছু বলল না।

মুশকিল হল কিষানকে নিয়ে। বাড়িতে মা'র অনেক পাখি ছিল। একটা কাকাতুয়া, একটা টিয়াপাখি, দুটো ময়না, দুটো শালিখ, একটা কোকিল। তাদের দেখাশোনার ত্রুটি হতে লাগল। টিয়ার ছোলা কখনও কম পড়ত না, চেঁচামেচি বিশেষ ছিল না। কাকাতুয়া তো সবসময়ই চেঁচায়। কোকিলের খাঁচা একটু দূরে টাঙানো থাকত। টেলিফোন বাজলেই সে তার নিজের ভাষায় সাড়া দেবার চেষ্টা করত। কেউ কেউ খুশি হয়ে বলত, "তোমাদের বাড়িতে দেখছি চিরকাল বসন্ত।" কিষানের কাজে এইবার ভুল হতে লাগল। পাখিদের খাঁচা আগেকার মতো পরিষ্কার থাকে না। টিয়ার বাটিতে জল ফুরিয়ে যায়। হলুদ-জলে ময়নার আর সপ্তাহে তিনদিন স্নান হয় না।

খুকু বলল, "একদিন চিড়িয়াখানায় গিয়ে দেখে আসি ফুটকি কেমন আছে।" ফুটকি যা যা ভালবাসত, সেইসব খাবারদাবার মনে করে নিয়ে যাওয়া হল। খুকু ফ্লুরির যে কেক ভালবাসে, সেই কেক কিনে তার থেকে খুব ছোট একটা টুকরো ভেঙে নিল ফুটকির জন্য। কিন্তু চিড়িয়াখানায় হরিণদের রেলিংয়ের সামনে গিয়ে খুকু আর খুকুর দাদা অবাক। অত হরিণের মধ্যে ফুটকিকে কী করে চিনবে। তবু দু'জনে গলা ফাটিয়ে 'ফুটকি, ফুটকি' বলে চেঁচাতে

লাগল। অবশেষে একটা হরিণ, বোধহয় সেটাই দলের মধ্যে সবচেয়ে লোভী, এসে খুকুর হাত থেকে টুকরো ছোট কেকটা নিয়ে খেয়ে ফেলল। আর-এক টুকরোর জন্য খুকুর হাত চেটে দিল। খুকু তার দাদাকে বলল, "দেখলি আমাকে কেমন চিনতে পারল! হাসতে জানলে ঠিক মানুষের মতো করে হাসত।" খুকুর দাদা বলল, "আর দু'হাত তুলে তোকে নমস্কার করত না?" তারপর পনেরো মিনিটের জন্য দু'জনের কথা বন্ধ হয়ে গেল। প্রথমবার এইরকম হওয়ার পর তিন সপ্তাহ পরে ওরা আবার গেল। খুকু এবারে কেকের একটা বড় টুকরো সঙ্গে নিয়েছিল। ফুটকিও তো অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। সেদিন দু'জনে অনেকক্ষণ ফুটকি ফুটকি বলে ডাকাডাকি করল। কিন্তু তাদের কাছে কোনো হরিণ এগোল না। তাদের পিছন থেকে ঢ্যাঙা-ঢ্যাঙা লোকগুলো কমলালেবুর খোসা, আধখাওয়া সিগারেট, চকোলেট-মোড়কের রাংতা হরিণদের দিকে ছুঁড়ে দিতে লাগল। দু'জনে মন ভারী করে বাড়ি ফিরে এল।

শেষ ধাক্কা আসতে তখনও বাকি ছিল। হঠাৎ একদিন শুনলাম কিষান বাড়িতে নেই। শেষ রাত্রে কাউকে কিছু না-বলে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে। শুনলাম তার হাতে কোনো পয়সা ছিল না, কাজেই দেশে যাওয়ার প্রশ্ন উঠল না। কলকাতায় তার কোনো বন্ধুও নেই। রবিবার সকালে খবরের কাগজ নিয়ে সবে বসেছি, এমন সময় গুপি এক পেয়ালা চা নিয়ে এসে দাঁড়াল। একটু পরে কাগজ থেকে মুখ তুলে দেখি গুপি সেই রকমই দাঁড়িয়ে আছে। তার এ-ভঙ্গি আমি চিনি। "কিছু বলবে গুপি?"

গুপি একটু চুপ করে থেকে বলল, "দাদাবাবু, কিষানকে পাওয়া গেছে।"

আমি বললাম, "কোথায় পেলে তাকে? উপরে তাকে ডেকে নিয়ে এসো।"

গুপি মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, "সে তো এখানে নেই।"

"তবে কোথায়? আসতে বললে না কেন বাড়িতে?"

কিষান একটু বেশি খেত। নানারকম খাবারের শখও ছিল। মাইনের টাকা পনেরো দিনের মধ্যেই খেয়েদেয়ে ফুরিয়ে যেত। তখন আগাম টাকা নিত। সে-টাকার কথা কেউ কখনও তুলতও না। তা ছাড়া বাড়ির অন্যান্য কাজের লোকের কাছ থেকেও দু'চার টাকা ধার চাইত। এ নিয়ে কখনও-কখনও অশান্তি হত। গুপিকে বললাম, "ওকে বলো গিয়ে, আগাম টাকা যা নিয়েছে, সে আর ফেরত দিতে হবে না, আর তোমাদের কাছে যা নিয়েছে সে আমি দেখব।"

গুপি চুপ করে থাকল। আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায় দেখলে তাকে? কোথাও কি চাকরি করছে বেশি মাইনের?"

গুপি বলল, "কাছেপিঠেই আছে। গোলপার্কের কাছে।"

"কার বাড়ি?"

"আজ্ঞে বাড়ি নয়। ওখানে একটা ছোট খাটাল আছে কিনা. সেখানে তাকে দেখলাম। একটা মোষের বাচ্চাকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে। তাকে বললুম, করছিস কী এখানে, বাড়ি চল্। তোর মাইনের আগাম টাকা, ধার—কিছুর জন্য ভাবতে হবে না। দাদাবাবু, গোরু-মোষ কি মানুষের কথা বুঝতে পারে?"

একটু ভেবে বললুম, "দু'একটা কথা বুঝতে পারে বোধহয়, কিন্তু কেন?"

"কী বলব আপনাকে, যখন কিষানকে বোঝাচ্ছিলাম, বাচ্চাটার মা গলায় কীরকম রাগী-রাগী শব্দ করল। কিষান আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল, বাচ্চাটার কান চুলকে দিতে লাগল। পিছন ফিরবার আগে আমার দিকে তাকিয়ে ইশারায় যা বলতে চাইল, তার একটাই মানে হয়—ভাগ এখান থেকে!"

ছবি আশিস সেনগুপ্ত

দুঁদে দামুর জীবনখাতা

লীলা মজুমদার

বটুর ছোটকাকা সর্বদা বলেন তাঁর বড়দার বন্ধু দামুজ্যাঠামশাই নাকি দুর্ধর্ষ পুলিশি গোয়েন্দা। তাঁর দাপটে তেত্রিশ বছর ধরে বর্ধমানে আর কেষ্টনগর এলাকায় বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খেয়েছে। বাড়ির কাছে এরকম একটা অসমসাহসিক পুরুষ বাস করাও নাকি মোটা জীবন-বিমার সমান। শুনে বটুর ছোট ভাই লাটু অবাক! জীবন-বিমা করলে তো টাকা পায়। বটু বলল, "অতই যদি সাহস হবে তো জ্যাঠামশাইদের তাসের আড্ডা ভাঙলে উনি আমাকে কেন বলেন, টর্চ নিয়ে আমাকে একটু গলিটা পার করিয়ে দে তো বাবা। সাহসী না আরো কিছু!"

ছোটকাকার মুখটা একটু লাল হয়ে উঠল। "যাকে-তাকে পুলিশের বিশিষ্ট সুবর্ণ-পদক দেওয়া হয় না, বুঝলি!"

বটু বলল, "তা দেওয়া হবে না কেন? তুমিই তো বলো ফি বছর সাহিত্যের পুরস্কারগুলো যাকে-তাকে দেওয়া হয়। বলোনি, তোমার কবিতার বইটা নাকি না-পড়েই ডাস্টবিনে ফেলে দেয়?"

খুব চটে গেলেন ছোটকাকা। ফরসা মুখটা টকটকে লাল হয়ে উঠল। কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন ঠিক তখুনি বড়জ্যাঠাদের তাসের আড্ডায় কে যেন ফটাস্ করে এক হাত তাস টেবিলের ওপর ফেলে চেঁচিয়ে উঠল, "মার দিয়া কেল্লা! বাকি সব দান আমার!" থমথমে চুপচাপ। তারপর শোরগোল! তারপর সভাভঙ্গ হল। একগাল হাসতে-হাসতে দামুজ্যাঠা বেরিয়ে এসেই বললেন, "কোথায় গেলি বটু? আমাকে একটু গলিটা পার করে দে তো বাপ।"

বটু বলল, "আমার বুড়ো-আঙুলে ব্যথা। আমি পারব না। ছোটকাকা যাক।" ছোটকাকা ততক্ষণে হাওয়া।

লাটু বলল, "পাঁচ মিনিটের তো হাঁটা। চলে যান না। আমি গেটের বাইরে দাঁড়াচ্ছি।"

দামুজ্যাঠা ওর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, "নিদেন ঐ তেঁতুলতলাটা পার করে দে, বাপ। আর বাড়ি পৌঁছে দিলে তোদের রাবড়ি আর সরভাজা খাওয়াব, আর এমন একটা গল্প বলব যে, চুলদাড়ি খাড়া হয়ে উঠবে।"

বটু লাফিয়ে উঠল, "ঠিক তো? ওরে লাটু, শিগগির আয়, দামুজ্যাঠা গল্প বলবেন।" সঙ্গে সঙ্গে লাটুও খাড়া। তখন সবে আটটা, রাতের খাওয়া ন'টায়।

অদ্ভুত এক গল্প ফাঁদলেন দামুজ্যাঠা। দুজনার হাতে দু'গেলাস ঘোলের শরবত ধরিয়ে দিয়ে যে-ঘটনার কথা বললেন, তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু যাঁর গলায় দু'রকম রঙের দুটো সুতোয় বাঁধা দু'রঙের দুটো মাদুলি আর ডান হাতের কনুইয়ের ওপরে রুপোর চেন দিয়ে ঝোলানো কী-সব বিচিটিচির মতো দেখতে জিনিস, তিনি যে সহজে মিথ্যা কথা বলবার সাহস পাবেন না, এ

বিষয়ে ওদের মনে কোনো সন্দেহ রইল না। অবিশ্যি তখনও পর্যন্ত রাবড়ি আর সরভাজার দেখা নেই!

দামুজ্যাঠা গোড়ায় বললেন, "কাছাকাছি এসে বোস্। যদি নার্ভাস লাগে, বিষম খেতে পারিস।" সঙ্গে-সঙ্গে লাটুর মুখের শরবত ভুল-নল দিয়ে নেমে একাকার কাণ্ড বাধাল। যাই হোক, ওর পিঠ চাপড়েটাপড়ে চাঙ্গা করে, দামুজ্যাঠা শুরু করলেন…

"গোড়াতেই বলে রাখি, এটা কিছু আমার বানানো গল্প নয়। বরং বলতে পারিস আমার জীবনখাতার দেড়টা পাতা। মাত্র দেড়টা পাতা! তার চেয়ে কত লম্বা লম্বা পার্ট মুখস্থ করে পুজোর সময়ে নাটক করে বাহবা পেয়েছি! কিন্তু এ-গল্প মনে করতে গিয়েও কপাল ঘামছে! জানিস বোধহয়, অসামাজিক সমাজে আমার নাম দুঁদে দামোদর! ও-নাম শুনলে, এদিকে এহেন গুণ্ডা বা মাস্তান নেই যে শিউরে উঠে, জিব কেটে, কানের লতিতে চুন না লাগায়!"

লাটু আশ্চর্য হয়ে বলল, "কেন, চুন লাগায় কেন?"

বটু বিরক্ত হল, "আঃ, তুই বড় বোকা। কানের লতিতে চুন লাগালে যে পান খেয়ে মুখপোড়াদের জ্বলুনি সেরে যায়!"

বটু বলল, "অ। আচ্ছা, বলুন জ্যাঠামশাই, তাপ্পর কী হল।"

দুঁদে দামু বললেন, "অত হাল্কাভাবে ব্যাপারটাকে নিচ্ছিস দেখে অবাক হচ্ছি। এদিকে তো ভিতুর একশেষ! গল্প আরম্ভ হবার আগে থেকেই বিষম খাচ্ছিস। তা শোন্। সারা বছরের মধ্যে বর্ষাকালটা সবচেয়ে খারাপ তা জানিস তো?"

লাটু বলল, "মোটেই না। ভূগোল-স্যার বলেছেন বর্ষা না হলে ধানও হয় না, কাঁঠালের গায়ে জল না পড়লে কাঁঠালও মিষ্টি হয় না।…"

দামুজ্যাঠা রেগে গেলেন, "না শুনতে চাস্ তো বললেই হয়।"

বটু ব্যস্ত হয়ে উঠল, "না, না, জ্যাঠামশাই, আমরা শুনতে চাই।"

"তাহলে আর ব্যাঘাত দিসনে। আমি অন্য অর্থে বলেছি বর্ষাকাল সবচেয়ে খারাপ। এখানে খারাপ মানে ভয়াবহ। জল পেয়ে প্রকৃতির বিকট দিকটা চাগিয়ে ওঠে। মানুষের কষ্টের শেষ থাকে না। বন্যা, ধস, ভাঙন, পথেঘাটে জল দাঁড়িয়ে যাতায়াতের অসুবিধা, ডাকাডাকি করলেও কেউ শুনতে পায় না। পাড়াগাঁয়ে আর ছোট শহরে একেকটা বাড়ি যেন একেকটা দ্বীপ হয়ে যায়। তার চারদিকে উদ্দাম জলরাশি। ঢোকাও যেমন কষ্টকর, বেরুনোও তেমনি। এই সময় ঐসব অঞ্চলে বেআইনি তৎপরতাও তাই বেজায় বেড়ে যায়। কেউ সাহায্য করতে আসবে না, আসতে পারবে না জেনে দুষ্কৃতকারীরা নির্ভয়ে তাদের দুষ্কর্ম করে যায়। শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ হন্যে হয়ে আমার শরণাপন্ন হলেন। 'একটা যা হয় কিছু করো, দুঁদে, নইলে শেষ পর্যন্ত সরকার হয়তো স্রেফ অকেজো বাজে-খরচ বলে গোটা পুলিশ বিভাগকেই তুলে দেবেন। তখন তোমার চেয়ে আমাদের আরও বেশি ক্ষতি হবে!' এই অবধি শুনে আমার মনে ভারী একটা আত্মপ্রত্যয় জাগল। এঁরা তাহলে স্বীকার করছেন যে, পুলিশ বিভাগে আমার গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি। তার পরে আরেকটু খুলে বললেন, 'আমাদের ক্ষতি বেশি, কারণ আমরা বেশি মাইনে পাই। কিন্তু কাজের বেলা তোমার কাছে আমাদের ভূমিকা তুচ্ছ। এ-যাত্রাটা বাঁচিয়ে দাও। তার জন্য তোমাকে কখনও অনুতাপ করতে হবে না।'

"আমিও মওকা বুঝে বললাম, 'দেখুন, আমার আর আট বছরের সার্ভিস বাকি আছে। এই গোটা সময়টা আমাকে যদি কেষ্টনগরে পোস্টিং দেন, তাহলে একেবারে শেকড় থেকে পাপ উপড়ে ফেলার একটা ব্যবস্থার চেষ্টা করতে পারি। তবে, স্যার, এই গন্ধমাদন তো চট করে তোলা যায় না। কিন্তু যতদূর বুঝছি এর কেন্দ্রবিন্দু হল গিয়ে ঐ কেষ্টনগর অঞ্চলটা। আমার বাপের ভিটে। ওখানকার

বজ্জাতি আমি হাড়ে-হাড়ে চিনি।

"মোটকথা, সেই ইস্তক এখানে আছি। এবং বেশ সম্মানের সঙ্গেই কাজ করেছি। আমার পুরনো খেলার সাথীদের একদল সঙ্গে-সঙ্গে দিল্লিতে কি বোম্বাইতে, একজন কুয়েটে পর্যন্ত হয় মামারবাড়ি, কিম্বা শ্বশুরবাড়ি, কিম্বা সংসারত্যাগী হয়ে চলে গেছে। বাকিদের দিয়ে আমি আমার নিজের একটা ছোট দল করেছি। তারাও নিয়মিত রোজগার পেয়ে বেঁচে গেছে, আমিও দরকারের সময়ে নাড়ি-নক্ষত্র জেনে আসার বন্ধু পাই। জানিস তো, এর ফলে সোনার পদকও পেয়ে গেছি। এদিককার অসামাজিক কার্যকলাপ অর্ধেকের বেশি কমে গেছে। আসছে বছর অবসর নেব। শুনছি, মহা ঘটা করে ফেয়ারওয়েল দেবে। পাখি-দেখার বাইনোকুলার উপহার দেবে। তোদেরও দেখতে দেব।

"এত সবের বদলে ঐ একটাই ক্ষতি হয়েছে। সূর্য ডোবার পর কোনো গাছতলা দিয়ে যাতায়াত করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তা তোরা যখন আছিস, তখন একা যাবার দরকারটাই বা কী, তাই বল। —ওগো, কোথায় গেলে? বটু-লাটুর রাবড়ি আর সরভাজা দিয়ে গেলে না?"

ভিতর থেকে জ্যাঠাইমার রাগত গলা শোনা গেল, "কোত্থেকে দেব? তাস খেলতে যাবার আগে নিজেই তো সব সাবাড় করে গেলে!"

দামুজ্যাঠা ভারী লজ্জা পেলেন। "তাই তো। আমি ভাবছি বুঝি কিছু আছে। যাক গে, তার বদলে গল্পের সবচেয়ে লোমহর্ষণ জায়গাটা বলি শোন।

"খুব সহজে এ-জায়গাটাকে এতখানি পাপমুক্ত করা যায়নি কপালের দুটো চক্ষু ছাড়াও কুড়িটা আঙুলের আগায় কুড়িটা চোখ নিয়ে চলাফেরা করতাম। তাই ক্রমে বুঝলাম এখানে দুষ্কৃতকারী আর ভাল মানুষ আলাদা করা এত শক্ত, কারণ দুষ্কৃতকারীরাও ভালমানুষ সেজে হেথা-হোথা চাকরিবাকরি, দোকান-ব্যবসা করে, দিব্যি একটা সততার মুখোশ তৈরি করে, তার আড়ালে দুষ্কর্ম চালায়।

"এরপর টপাটপ সব ধরা পড়তে লাগল। বিশেষ করে ঘোর বর্ষায় ওরা একটু অসাবধান হয়ে পড়ত। ভালমানুষ সেজে ভদ্রলোকের বাড়িতে কোনো অছিলায় ঢুকে পড়ে, যা কিছু ভাল জিনিস সব সরাত। পুরুষরা তখনও বাড়ি ফেরেনি। মেয়েরা চ্যাঁচালেও শোনা যেত না, গেলেও প্রায় অন্য কোনো বাড়ি থেকে সাহায্যকারীদের আসা-যাওয়া করার সাধ্য ছিল না। এই সময় ব্যাপারটা ঘটেছিল। শহরের শেষে মোড়ের মাথায় বড় বটগাছতলাটা ছাড়িয়েই খগেন সরকারের বাড়ি। সবাই জানত, তেজারতি করে তিনি বেশ টাকা করেছেন। যদিও বাইরে থেকে বোঝার উপায় ছিল না। বন্ধু লোক, তাই আমি নিজেও একটু চোখ রাখতাম। খগেনবাবু না-ফেরা অবধি বাড়িতে খালি কতকগুলো ছোট ছেলেমেয়ে আর দু-তিনজন গিন্নি।

"সেদিন বটগাছের তলায় পৌঁছেছি, এমন সময় আকাশ কালো করে ঝমঝম বৃষ্টি। দাঁড়িয়ে পড়লাম। ভাবলাম এখান থেকে নজর রাখলে সবচেয়ে ভাল হয়। হঠাৎ কানে এল খট্ খট্ খট্ করে কড়ানাড়ার শব্দ। ভিতর থেকে বৌদি ভয়ে ভয়ে বললেন, 'কে?' বাইরে থেকে একটা লোক বলল, 'মাঁ, আঁমি! দঁরজাঁ খুঁলুন।' বৌদি বললেন, 'কে আমি?' 'আঁমি গোঁ মাঁ, আঁমি!' ভিতর থেকে বৌমাদের ভয়ার্ত চিৎকার, 'খুলবেন না মা, নাকিসুরে কথা বলছে। ভূত ছাড়া কিছু হতে পারে না।'

"বাইরের লোকটা কাতরভাবে বলল, 'না গোঁ মাঁ, আঁমি রাঁসবিহারী। বাঁবুর ফিঁরতেঁ দেঁরি হঁবে, তাঁই এই মঁদু আর গাঁওয়া-ঘি পাঁঠিয়েছেঁন।' দঁরজা খুঁলুঁন। জিঁনিস দিঁয়ে বাঁড়ি যাই।'

"তবু বৌমারা বলে, 'ভূত! ভূত!' রাসবিহারী বলে, 'নাঁ,

বৌদিদি, ছোঁটবেঁলা থেঁকে আঁমি খোঁনা। দোঁকানের রাঁসবিহারী আমি। বাঁবু এঁলে শুঁধোবেন! মঁদু আঁর গাঁওয়া-ঘি এঁনেছি, মাঁ।'

"লোকটার বজ্জাতি দেখে আমি থ। ভূত সেজে গেরস্তর বাড়ি এসে, কয়েকটি মহিলা আর ছেলেপুলের ওপর হামলা করছে। শেষ পর্যন্ত মধু আর গাওয়া-ঘির জয় হল। হুড়কো খোলার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমিও হতভাগাটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। সর্বাঙ্গ চটে জড়িয়ে এসেছে, ভিজে চুপ্পুড়। ঝাঁপিয়ে পড়েই ঘাড়ে বুদ্দুম্ করে এক রদ্দা কষালাম। কষাবার সঙ্গে-সঙ্গে আমার মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। চোখে অন্ধকার দেখলাম। মনে হল একটা বাতাসের দেয়ালের ওপর রদ্দা মারলাম। মরিয়া হয়ে হাতড়াতে লাগলাম। ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে কিছু নেই। অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম বোধহয়। মুখে বৃষ্টির জলের ঝাপটা লাগতে সঙ্গে-সঙ্গে উঠে বসলাম। লণ্ঠন হাতে বৌদিদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছেন। বললেন, 'মস্করা করার জায়গা পেলে না, ঠাকুরপো? বড়বৌমা যে আরেকটু হলেই খুন্তি তাতিয়ে মুখে ছ্যাঁকা দিতে যাচ্ছিল! তোমার আবার ফিটের ব্যামো কে জানত!'

"ঠিক সেই সময়ে মেঘ কেটে গেল, বিষ্টি থেমে গেল, চারদিকে জোছনা ফুটফুট করতে লাগল। চেয়ে দেখি, কেউ কোথাও নেই, কিচ্ছু নেই! না রাসবিহারী, না ভিজে চট, না মধু, না গাওয়া-ঘি। কী বলব বাপ, একেবারে তাজ্জব বনে গেলুম! ঠিক সেই সময়, বিকট শব্দের সঙ্গে হুড়মুড় করে বুড়ো বটগাছটা মুখ থুবড়ে, পথ জুড়ে, পড়ে গেল। সেই ইস্তক সূর্য ডোবার পর আমি গাছতলা দিয়ে একা কখনও যাই না।"

বটু বলল, "অবসর নিলে ঢের সময় পাবেন। তখন আপনার জীবনখাতাটার সবটা লিখে ফেলবেন। সাহিত্য-পুরস্কার কে ঠেকায়, দেখব।"

ছবি দেবাশিস দেব

বকোদর দাঁ

বিমল কর

বনমানুষের চোয়াল আর বড়লোকের খেয়াল, এই দুটো জিনিসকেই আমি ভয় করি। আমার বন্ধু ত্রিষ্টুপ সামন্ত হল বড়লোক। ক'পুরুষের বড়লোক বলতে পারব না, তবে চার-পাঁচ পুরুষের তো হবেই। কলকাতা শহরে এগারোটা বাড়ি, তিনটে বস্তি, সাত-আটটা দোকান, আরও কত কী তাদের ছিল। এখন অবশ্য নেই। শরিকি ভাগাভাগিতে ত্রিষ্টুপের ভাগে গোটা দুই বাড়ি, মধ্যমগ্রামের কাছে কিছু জমি আর নিউ মার্কেটে একটা দোকান মাত্র পড়েছে। সেটাই বা কম কিসের।

ত্রিষ্টুপকে আমি ভয় পাই তার খেয়ালের জন্যে। বড্ড খেয়ালি। ওর খেয়াল দেখলে মনে হবে পাগল। তবে এমন বন্ধু দুটো পাওয়া যায় না।

এই ত্রিষ্টুপই আমাকে তাদের টেগোর ক্যাসেল স্ট্রিটের ভুতুড়ে বাড়িতে একবার বনমানুষের চোয়াল দেখিয়েছিল। অমন ভয়ংকর জিনিস আমি জীবনে দেখিনি। সত্যি বলতে কী, সেই বীভৎস জিনিসটা দেখার পর রাত্রে ঘুমোতে পারতাম না ক'দিন।

কিন্তু এসব পুরনো কথা। এখন আর চোয়াল নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার করে না, কারণ বয়েস অনেক বেড়ে গিয়েছে আমাদের ; আর ত্রিষ্টুপদের সেই বাড়িও এখন তার হাতে নেই।

ত্রিষ্টুপ কিন্তু আমার সঙ্গে লেগে আছে। ছেলেবেলায় যেমনটি আঁকড়ে থাকত, এখনও তাই।

ত্রিষ্টুপ আমায় আচমকা বলল, "তোকে একবার দেওঘর যেতে হবে।"

"দেওঘর ! কেন ?"

"বকোদর দাঁ বলে একটা লোককে ধরে আনতে হবে। লোকটাকে খুব দরকার।"

বকোদর দাঁ ! কে বকোদর দাঁ ? এমন নাম জীবনে শুনিনি। কী করে লোকটা ? পেঁড়া তৈরি করে, না পাণ্ডাগিরি করে ? কিসের দরকার তার সঙ্গে ?

ত্রিষ্টুপ বলল, "লোকটার কাছে আগুনে পোড়া ঘায়ের দৈব ওষুধ আছে। লোকটাকে আমার দরকার। আমার কম্পানি থেকে একটা ওষুধ বার করব। মলম

এখানে বলা দরকার, ত্রিষ্টুপ অনেক রকম ব্যবসা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আসছে আজ আট-দশ বছর। কোনোটাই লাগাতে পারেনি। দু' একটা কোনোরকমে টিঁকে আছে, বাকিগুলো ডুবে গিয়েছে। হালে ত্রিষ্টুপ একটা ছোট ধরনের ওষুধ-বিষুধের ব্যবসা চালু করেছিল। জোয়ানের আরক, মাথা ধরার মলম, অম্লনাশের বড়ি—এইসব তৈরি হত তার ওষুধের কারখানায়। বিক্রিও হচ্ছিল দু একটা ওষুধ।

ত্রিষ্টুপ বলল, "আগুনে পোড়ার যন্ত্রণা তো জানিস না ভাই, চোখে দেখা যায় না। আর সে যে কী ঘা, দেখলে আঁতকে উঠবি। আমি এই ঘায়ের ওষুধ বার করব কম্পানি থেকে। শস্তায় বিক্রি করব। আমার বাবা আমায় স্বপ্ন দিয়েছেন। তুই বকোদরকে এনে দে।"

"কে বলল তোকে বকোদরের কথা?"

"ছোটমামা বলছিল।"

"তা তুই নিজে যা, আমায় পাঠিয়ে লাভ কী?"

"আমিও যাব। আমার যেতে দু' চার দিন দেরি হবে। এর মধ্যে তুই লোকটাকে বাগিয়ে রেডি করে ফেলবি। হুট্ করে আমি গিয়ে যদি বলি, চলুন মশাই, কলকাতা চলুন, আগুনে পোড়ার ওষুধ তৈরি করে বাজারে বেচব, লোকটা ঘাবড়ে যাবে। কলকাতার লোককে বাইরের মানুষরা চট করে বিশ্বাস করে না।"

আমি বললাম, "তুই এসব দৈব ওষুধ বিশ্বাস করিস? বকোদরের ওষুধে যদি হিতে বিপরীত হয়?"

"তুই কিস্যু বুঝিস না। হিতে বিপরীত এমনি ওষুধেও হতে পারে," ত্রিষ্টুপ বলল। "দৈব ওষুধ মানে আকাশ থেকে দেবদেবীরা ওষুধটা হাতে দিয়ে যায়নি, মানিক। আমরা মুখে বলি দৈব। আসলে এসব ওষুধ হল সাধারণ গাছগাছড়া, চুন মধু নুন, এই তোর যত সহজ জিনিস দিয়ে তৈরি করা। একসময় পাড়ায়-পাড়ায় ডাক্তারখানা ছিল না, পেনিসিলিন টেরামাইসিন ছিল না, লোকে টোটকা দিয়ে রোগ সারাবার চেষ্টা করত। কবিরাজি ওষুধ খেত। দৈব হল নামে, আসলে অনেককাল আগে কেউ হয়তো আগুনে পোড়ার একটা ওষুধ বার করেছিল বা জানত। সে আবার কাউকে শিখিয়ে গেছে। এইভাবে জিনিসটা চলে আসছে। যে জানে, সে হয় কাউকে শিখিয়ে যায়, না হয় শেখায় না। ...তা তোর অত কথার দরকার কী, তুই বকোদরকে ধরে আন্।"

ত্রিষ্টুপের কথায় দেওঘরে গিয়ে দেখি বকোদর দাঁ বলে কাউকে কুণ্ডার লোক চেনে না।

ত্রিষ্টুপদের একটা ভাঙাচোরা বাড়ি ছিল কুণ্ডায়। সেখানেই উঠেছিলাম। দেখাশোনার জন্যে একটা মালি ছিল বাড়িতে, আর-কেউ থাকত না সেখানে। মালি নিজের ধান্ধায় ঘুরে বেড়াত। তার আবার পানের দোকান ছিল বাজারের দিকে। বেটার টিকি দেখতে পেতাম না।

গোটা একটা দিন বকোদরের খোঁজখবর করে যা বুঝলাম, তাতে মনে হল, ত্রিষ্টুপ ভুল শুনেছে, বকোদর বলে কেউ কস্মিনকালেও কুণ্ডায় ছিল না, নেই। আমি অবশ্য আগুনে পোড়ার টোটকার ওষুধের কথা কাউকে বলিনি। বলা নিষেধ ছিল। ত্রিষ্টুপ বলেছিল, লোকটা যেন জানতেই না পারে আমাদের উদ্দেশ্য কী! একেবারে ইনোসেন্ট হয়ে আলাপ করবি বুঝলি?"

দু' দিন কেটে গেল, বকোদর দাঁয়ের কোনো হদিস পেলাম না। বুঝতে পারলাম, বৃথা আশা। ত্রিষ্টুপের পথ চেয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। আসুক সে, তারপর যা হয় করা যাবে।

তিনদিনের দিন একজন আমায় বললে, "আপনি একবার রিখিয়ায় গিয়ে খোঁজ করতে পারেন। সেখানে খাঁ বলে একটা লোক থাকে। দাঁ নয়, খাঁ। একেবারে পাগলা। লোকটা কুকুর বেড়াল পাখি নিয়ে বাস করে। সন্নিসি ধরনের মানুষ। গিয়ে দেখুন একবার।

রিখিয়া কম দূর নয়। পরের দিন সকালে টাঙ্গা ভাড়া করে রিখিয়া গেলাম। মানুষজন একরকম না-থাকার মতন। খোঁজখবর করে একটা বাড়িতে গিয়ে দেখি, সাদা চুল, সাদা দাড়ি, পরনে গেরুয়া লুঙ্গি, খালি-গা একটা লোক আমগাছের ছায়ায় বসে খাতা খুলে কী যেন লিখছে। আমায় দেখে একজোড়া বাঘা কুকুর চেঁচাতে লাগল। ভাগ্যিস আমি ফটকের বাইরে ছিলাম। অবশ্য ফটকটা যেরকম ভাঙাচোরা পলকা দেখলাম, তাতে কুকুর দুটো তেড়ে এলে ফটক তাদের ঠেকাতে পারত না।

লোকটা আমায় দেখে উঠে এল ফটকের কাছে।

আমি বললাম, "আপনি কি খাঁবাবু?"

"না। আমি দাঁবাবু।"

"দাঁবাবু! আমি তো আপনাকেই খুঁজছি।"

"তবে যে বললেন খাঁবাবু?"

"ভুল হয়ে গেছে।... আমি দাঁবাবুই বলেছিলাম, দেওঘরে একজন বললে খাঁ।"

"উঁহু, দাঁ। বৈশাখ থেকে আশ্বিন দাঁ; কার্তিক থেকে চৈত্র খাঁ। ছ' মাস, ছ' মাস।"

আমি অবাক হয়ে লোকটির মুখ দেখতে লাগলাম। রসিকতা করছে নাকি বকোদর? রসিক পাগল। বললাম, "এ কি উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন?"

"ঠিক ধরেছেন।... আমি বৈশাখ থেকে আশ্বিন চিত হয়ে ঘুমোই, কার্তিক থেকে চৈত্র উপুড় হয়ে।... তা মশাই বাইরে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন! ভেতরে আসুন।"

ফটক খুলে ধরল বকোদর। আমি ভেতরে গেলাম। আমায় নিয়ে বকোদর আমতলায় গিয়ে বসল। দুটো কুকুর আমাদের পেছনে পেছনে গাছতলা পর্যন্ত এল। ওরা অবশ্য বকোদরের হুকুমে ঘেউঘেউ কম করছিল।

আমতলায় চমৎকার ছায়া, বাতাসও দিচ্ছিল। পাখি ডাকছে আশপাশে।

"তা মশাইয়ের পরিচয়?" বকোদর বলল, "আমার কাছে এসেছেন কেন?"

পরিচয় দিলাম ছোট করে। বললাম, "আমার এক বন্ধু আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসতে চান। কেন তা আমি জানি না।"

মিথ্যে করেই বললাম কথাটা, কেন না ত্রিষ্টুপ আমায় বলেছিল চট্ করে মতলবটা জানাস না।

বকোদর কিছু যেন ভাবল, তারপর বলল, "আমি কিছুদিন ধরে মায়ের গান লিখছি। মায়ের গান বোঝেন?"

"মানে শ্যামাসঙ্গীত?"

"ঠিক। নিজেই গাই।... এই রিখিয়ায় কেষ্ট ঘোষ বলে এক ভদ্রলোক বেড়াতে এসেছিলেন। বুকের রোগ। তিনি আমায় বলেছিলেন, দশ বারোটা গান বেছে নিয়ে রেকর্ড-বাজনা করবেন। ভদ্রলোকদের রেকর্ড-বাজনার ব্যবসা।... কলকাতার মানুষদের মুখই হল সব। ভদ্রলোক আর কোনো খবরই দিলেন না।"

"আমার বন্ধু রেকর্ডের ব্যবসা করেন না।"

"তা হলে? কী করেন তিনি?"

"একরকম কিছুই করে না।... তবে ব্যবসাপত্র আছে। বড়লোকের ছেলে! আমায় একটু জল খাওয়াবেন?"

"বসুন।" বলে বকোদর উঠে গিয়ে কাকে যেন হাঁক মেরে ফিরে এল। "আনছে।"

আমি তাঁর খাতাখানা দেখছিলাম। বললাম, "আপনি কিছু লিখছিলেন?"

"হ্যাঁ। গান। এটা আমার গানের খাতা, হিসেবের খাতা। এই যে এদিক থেকে গান লেখা, পরপর। আর উলটে নিয়ে এ পাশ থেকে দেখলে দেখবেন হিসেব।"

"হিসেব ? মানে আপনি সব ব্যাপারেই ওই অর্ধেক-অর্ধেক ?"

"ঠিক।... তবে হিসেব মানে টাকাপয়সার হিসেব নয় মশাই। ও জিনিস আমার নেই। দুটো ধান-চাল আলুটা বেগুনটা জোটে, তাতেই চলে যায়। এ হল আমার অপোগণ্ডদের হিসেব।" বকোদর হাসল, "কাল ঝুমরির আবার চারটে বাচ্চা হল। জুঁইফুলের মতন সাদা। ছিল তেত্রিশ, মরে-ধরে এখন হল সাঁইত্রিশ। লিখে রাখতে হবে না ? নামগুলোও তো মনে থাকে না।"

"ঝুমরির মানে—"

"আমার বেড়ালের। ঝুমরির মা এখনও বেঁচে। বাবাটা মারা গেছে। খুড়তুতো জেঠতুতো মিলিয়ে ঝুমরিরাই ওই সাঁইত্রিশ হল। তারপর ওই তো দেখছেন, দুই সেপাই আমার, একটাকে বলি হেবো, অন্যটাকে গেবো। তা ওদেরও চার-পাঁচজন আছে। তারপর ধরুন আমার বিহঙ্গরা।"

"বিহঙ্গ ?"

"পাখি মশাই ! বাড়ির ভেতরে-বাইরে সব মিলিয়ে তারাও আঠারো-বিশ। টিয়া, সীতারাম, মুনিয়া, ময়না। আপনি জলটা খেয়ে নিন।"

তালগাছের মতন লম্বা একটা লোক জল এনেছিল। রোগা টিঙটিঙ করছে, গায়ের রঙ আলকাতরার মতন কালো। ওই চেহারায় মস্ত এক গোঁফ, আধহাত জুলফি। খালি-গা লোকটার বুকের হাড়পাঁজরা গোনা যায়।

জল কিন্তু যেমন ঠাণ্ডা তেমনি মিষ্টি। পেট ভরে জল খেলাম। লোকটা চলে গেল।

আমি বললাম, "আপনার সঙ্গে থাকে ?"

"হ্যাঁ। এই ছ' মাস ও থাকে। ও ছিল জল্লাদ। দুমকায় বাড়ি। বিহারের অর্ধেক জেল থেকে ওর ডাক আসত ফাঁসি দেবার সময়। বেটার কপাল খারাপ। চারটে ক্রিমি এসে বাসা বাঁধল ওর পেটে। এক-একটা ক্রিমি দু' আড়াই হাত। দুটোকে বার করতে পারলুম—বাকি দুটো পারলুম না। পাপের ফল। ক্রিমিতেই ওকে মেরে ফেলল। এখন ওকে দেখলে কে বলবে ও এককালে জল্লাদ ছিল। ওর নাম মুসিয়া।"

জীবনে জল্লাদ দেখিনি। ওই নাকি জল্লাদের চেহারা ! এক ক্রিমিতেই জল্লাদ কাত। গা কেমন ঘিনঘিন করছিল। লোকটা জল্লাদ বলে, না পেটে দুটো জ্যান্ত ক্রিমি আছে বলে, কে জানে ! বললাম, "এই লোকটাও ছ' মাস থাকে ?"

বকোদর বললে, "হ্যাঁ, বৈশাখ থেকে আশ্বিন। বাকি ছ' মাস থাকে খুশিয়া। ওর ভাই। সেটা যেমন বেঁটে, তেমনই ঘাড়ে-গর্দানে।"

"আপনার দেখছি সবই ছ' মাসের হিসেব ?"

"হ্যাঁ, হিসেবে গোলমাল হয় না আমার। এই এখন আমি বকোদর দাঁ, আশ্বিনের পর হব দামোদর খাঁ।... তা মশাই, আপনি কোন্ মতলবে এসেছেন বলুন তো ? ক্রিমি সারাতে না আগুনে পোড়ার ওষুধ নিতে ?"

বললাম, "ধরুন ওষুধ নিতে।"

"তাহলে এক নিশ্বাসে একবারই আমি একুশটা জিনিসের নাম করব। যদি মনে রাখতে পারেন, ওষুধ পেয়ে গেলেন। নয়তো পেলেন না।" বলে বকোদর সত্যিই এক নিশ্বাসে ঝড়ের মতন কী বলে গেল।

আমি বোকার মতন তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম !

ছবি প্রণবেশ মাইতি

ধাঁধা-মজা-হেঁয়ালি

সত্যসন্ধ

প্রথম ধাঁধা ॥ চারজন প্রতিবেশী। একজন ডাক্তার, একজন অধ্যাপক, একজন ইঞ্জিনিয়ার, একজন ব্যারিস্টার। এঁদের পদবী হল সেনগুপ্ত, সেনশর্মা, দাশগুপ্ত, দাসশর্মা। বলা ভাল, পদবীগুলো পরপর বলা হয়নি, এলোমেলোভাবে বলা।

নীচে চারটি তথ্য দেওয়া হল। এই তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করে বলতে হবে, কার কোন্ পদবী।

(ক) দাসশর্মা ও ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে সেনশর্মার সম্পর্ক ভাল নয়। (খ) দাশগুপ্তর সঙ্গে ডাক্তারের নিবিড় বন্ধুত্ব। (গ) ব্যারিস্টার ভদ্রলোক সেনশর্মার আত্মীয়। (ঘ) অধ্যাপকের সঙ্গে সেনগুপ্ত ও ডাক্তারের বন্ধুত্ব রয়েছে।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ রথের মেলা থেকে একটা কাকাতুয়া কিনে এনেছিলেন এক ভদ্রলোক। দোকানদার বলেছিল, "মিথ্যে বলব না বাবু, এ খুব দামি জাতের, যা শুনবে তা-ই বলবে।"

ভদ্রলোক কাকাতুয়াকে কথা শেখাতে চাইলেন। কিন্তু কাকাতুয়া কোনো কথাই বলে না। পাখির ডাক্তার দেখালেন। তিনি পরীক্ষা করলেন পাখিটাকে। তারপর বললেন, দোকানদার মিথ্যে বলেনি। কী করে হয়?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ নীচের ছবিতে দ্যাখো, চার রকমের তাসের চিহ্ন ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে। এক-একটা চিহ্ন—হরতন, রুইতন, ইশকাপন, চিড়িতন—চারটে করে। পুরো চৌখুপিটাকেই এমনভাবে চার ভাগে দাগ টেনে ভাগ করতে হবে যে, এক-এক ভাগে থাকবে এক রকমের সব কটি চিহ্ন। শুধু তাই নয়, ভাগ চারটিও হবে সমান মাপের।
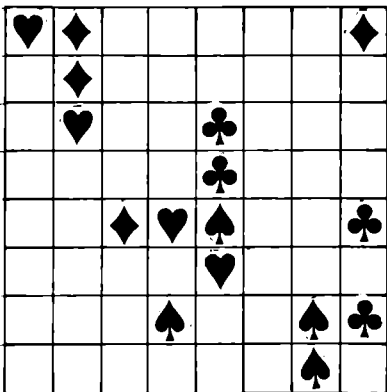
চতুর্থ ধাঁধা ॥ এখানে কয়েকটি তথ্য দেওয়া হল। তথ্যগুলো পড়ে নাও আগে। প্রশ্নটা পরে বলছি।

একটি কলেজের ছাত্র-সংসদ-নির্বাচনে প্রধান চারটি পদে ভোটে জয়ী হয়েছে চারজন। এর মধ্যে দু'জন ছেলে, দু'জন মেয়ে।

একটি মেয়ের নাম প্রমিতা। যে-ছেলেটি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে, সে সম্পাদকের থেকে বেশি ভোট পেলেও, সাহিত্য-সম্পাদকের থেকে কম ভোট পেয়েছে। বন্দনা বা কল্যাণ, এই দু'জনের কেউই সহ-সভাপতি নয়। জ্যোতির্ময়ের থেকে বেশি ভোট পেয়েছে সহ-সভাপতি। সভাপতির পদে যে জিতেছে, তার নাম বন্দনা নয়, কল্যাণও নয়। সাহিত্য-সম্পাদক, যার নাম প্রমিতা নয়, জ্যোতির্ময়ের থেকে বেশি ভোট পেয়েছে। বন্দনা সম্পাদক নয়। প্রমিতা জ্যোতির্ময়ের থেকে বেশি ভোট পেয়েছে। সাহিত্য সম্পাদক হয়েছে একজন মেয়ে। প্রমিতা সভাপতি নয়। জ্যোর্তিময় পেয়েছে কল্যাণের থেকে বেশি ভোট। এবার বলো, কে কোন্ পদে জিতেছে?

পঞ্চম ধাঁধা ॥ চার অক্ষরের চেনা একটা ইংরেজি শব্দ, প্রথম অক্ষরটা বসাও—

—ENY

ষষ্ঠ ধাঁধা ॥ এই ধাঁধাটার নাম হতে পারে, উনিশ-বিশ। ব্যাপারটা হল, ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সব কটি সংখ্যা ছবিতে-দেখানো ত্রিভুজ দুটিতে দু-বার দু-রকমভাবে বসাতে হবে। একটা ত্রিভুজে সংখ্যাগুলো এমনভাবে বসবে যাতে কিনা এক-একটা বাহুর যোগফল হয় ১৯। অন্যটাতে এমনভাবে ফের ১ থেকে ৯ বসবে যাতে কিনা এক-একটা বাহুর যোগফল হয় ২০। দু-ক্ষেত্রেই ১ সংখ্যাটা যেখানে রয়েছে, সেখানেই থাকবে। নাও, এবার বাকি সংখ্যাগুলো নিজে বসাও।
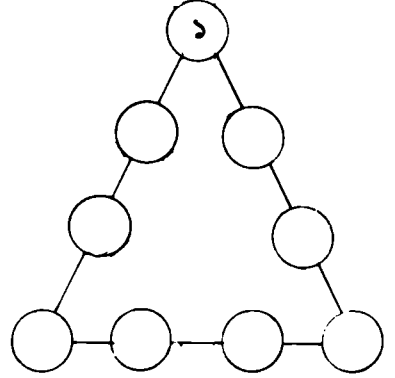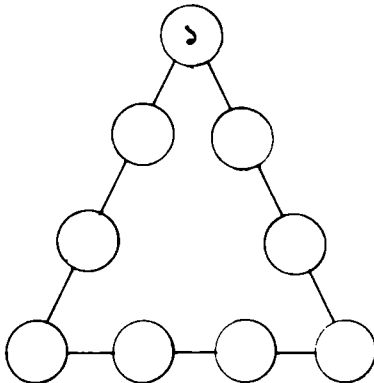
সপ্তম ধাঁধা ॥ ষোলটা দেশলাই-কাঠি দিয়ে নীচের ছবির মতন পাঁচটা বর্গক্ষেত্র তৈরি করো। এর মধ্য থেকে মাত্র দুটো কাঠিকে এমনভাবে সরিয়ে ফের বসাতে হবে যাতে কিনা চারটে বর্গক্ষেত্র—একই মাপের—মাত্র থাকে, আবার বর্গক্ষেত্রগুলো একে অন্যকে ছুঁয়ে থাকে।
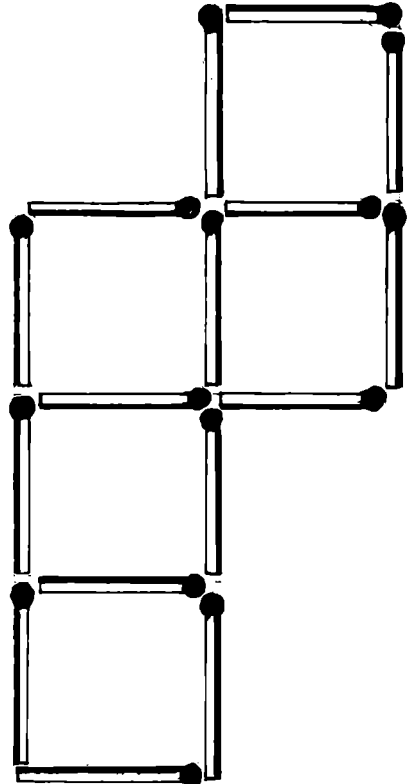
অষ্টম ধাঁধা ॥ নীচে যে-দু'অক্ষরের শব্দ দেওয়া রয়েছে, তার সঙ্গে আরও দুটো অক্ষর যোগ করে শব্দটাকে আরও ছোট করতে হবে। পারবে?

ক্ষুদ্র

(সমাধান ৩০২ পৃষ্ঠায়)

বুলামাসি ও বেড়াল

বলরাম বসাক

এক যে ছিল বুলামাসি। তার ছিল একগাল হাসি। সেই হাসি দেখে পাড়ার আটষট্টিটা বেড়াল ভীষণ মুগ্ধ। হুলো-হুলি, পুষি-ফুঁসি, মেনি-পেনি, কেলো-কালী, পেঁচামুখী, বেজিমুখী, তুলতুলি, হুলহুলি, খাড়া-লেজি, বাঁকা-লেজি, ঝাঁটা-গুঁফি, ডোরাকাটি, নীলনয়না, সবুজ-আঁখি, ভাঁটা-চোখি, বাঘা-মুখী, বাঁদরমুখী, ভোঁদড়মুখী, ইত্যাদি। তার উপর কোনোটি শান্তশিষ্ট লেজবিশিষ্ট, কোনোটি দুষ্টু-দুষ্টু, কোনোটি মিষ্টি-মিষ্টি, কোনোটি ক্যাবলামদন, কোনোটি ভ্যাব্‌লাবদন, কোনোটি পাজি বেড়াল, কোনোটি ভিজেবেড়াল ইত্যাদি ইত্যাদি যত রকমের বেড়াল আছে, সব ক'টা বুলামাসির পাড়ায় বাস করে। অর্থাৎ ঝগড়াঝাঁটি করে। খামচাখামচি খেলে। রাতদুপুরে অঁ অঁ শব্দে চিৎকার করে খেয়াল গায়। লাফালাফি খেলে। চোর-চোর খেলে। লেজ-খোঁজাখুঁজি খেলে। খেলতে খেলতে কান্নাকাটি, হাসাহাসি সব কিছুই করে। ইঁদুর, আরশোলা, চামচিকে, ইলিশ, রুই, কই, পুঁটি, দুধভাত, পরোটা, পাউরুটি, ঝাঁটা, লাঠি, লাথি, ঢিল ও খুন্তির ঘা রোজই খাচ্ছে, যখন যেটা জুটছে।

সক্কালবেলা বুলামাসি যখন বাজার থেকে ফেরে, তখন আটষট্টিটা বেড়াল অনেক দূর থেকেই জুলজুল করে তাকায়। বুলামাসির মুখখানা ভাল করে দেখে। গালে হাসি আছে কি? হাসছে কি?

না হাসছে না। ধুত, তাহলে কোনো লাভ নেই।

বুলামাসি যদি হাসে, বেশ গোলমতন একগাল হাসি, এ-কান থেকে সে-কান পর্যন্ত, তা হলে তো কথাই নেই। আটষট্টিটা বেড়াল তক্ষুনি ছুটে আসবে বুলামাসির রান্নাঘরের পেছনটায়, উঠোনে। সেখানে সমবেত হয়ে একসঙ্গে মুখ দিয়ে অর্কেস্ট্রা বাজাবে। *ম্যাঁ-ম্যাঁ-ও মিঁ-মিঁ-উঁ। মিঁ-ইঁ-ইঁমিঁ-ইঁ-ইঁ। ম্যাঁ-ম্যাঁ-ম্যাঁ মিঁ-উঁ-উঁ। মিঁ-উঁ-উঁ মিঁ-আঁ-ওঁ। ম্যাঁ-মাঁ-ওঁ মিঁ-উঁ-উঁ। মিঁ-উঁ-উঁ ম্যাঁ-আঁ-ওঁ। ম্যাঁ-আঁ-ওঁ মিঁ-আঁ-উঁ। মিঁউঁ—*

সমবেত কণ্ঠে এই মিউজিকটি যে বাজানো হয় তাতে 'ধনধান্যে পুষ্পেভরা'র সুর পাওয়া যাচ্ছিল বলে অনেকের মনে হয়েছিল। ভুলটি ভাঙিয়ে দিল বুলামাসির বোন চিনুমাসি। "ওটা তোদের এই অঞ্চলের বেড়ালদেরই একটি নিজস্ব গান। গানটি হল

ইলশে-পাতুড়ি রান্নার তরে আছেন যিনি এ রান্না-ঘরে,
মধুর চেয়েও মধুর সে-যে, একগাল তার হাসি,
সকল মাসির রানি সে যে মোদের বুলামাসি।"

"ডাকাত, খুনি ধরতে পারে না পুলিশগুলো, বেড়াল ধরলেও তো পারে," ইত্যাদি গজ্‌গজ্ করতে করতে বুলামাসি এক ধামা মুড়ি মাছভাজা-তেলে মেখে বেড়ালদের দিকে ঠেলে দিয়ে বলে, "নে খা, আজ এই খেয়ে বিদেয় হ।"

আটষট্টি বেড়ালের মধ্যে সাতষট্টি বেড়াল আর-কিছু জুটবে না বুঝে, 'আমরা কেমন ভাল বেড়াল, জাদুসোনা, মিষ্টিসোনা...' এই রকম একটা ভাব-সাব করে গুটিগুটি সরে পড়ে। নড়ে না শুধু একটি। নাম তার ভোম্বল। রান্নাঘরের দেয়াল ঘেঁষে চুপ করে বসে থাকে। সুযোগ পেলেই ভাজা মাছ নিয়ে হাওয়া। অবশ্য ভোম্বল ঠ্যাঙানিও কম খায়নি বুলামাসির হাতে। হাতপাখা, খুন্তি, ঝাঁটা, ঝুলঝাড়ুনি, ছাতার বাঁট, জুতো, স্কেল, প্লাস্টিকের দড়ি, মেসোমশাইয়ের জামা
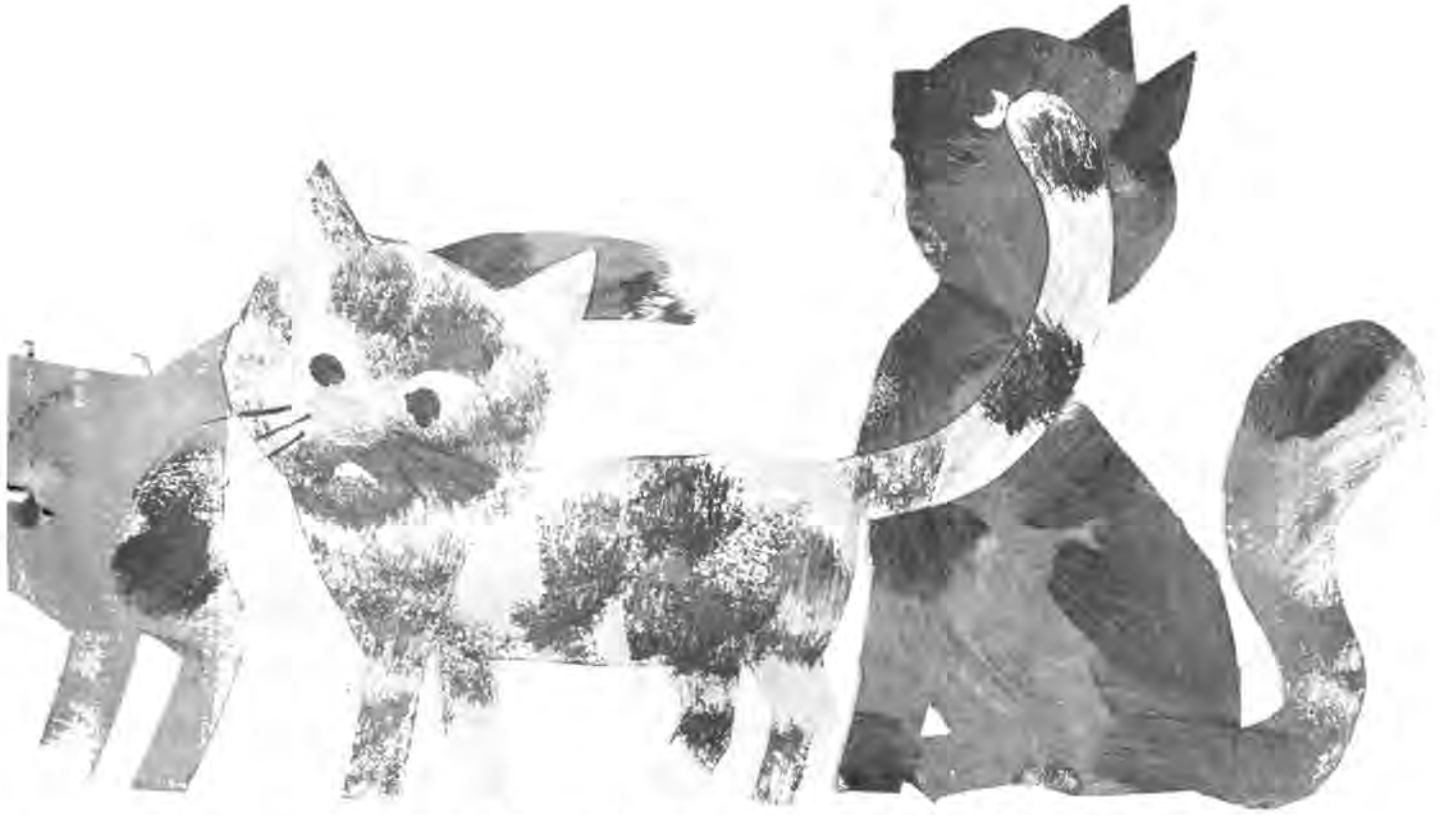
রাখার হ্যাঙ্গার, প্রত্যেকটি দিয়েই বুলামাসি যখনই ওটাকে কাছে পেয়েছে পিটিয়ে দেখেছে, বেচারার কোনো শিক্ষা হয় না।

কোনো অস্ত্রে কাজ হয় না দেখে একবার একটা অদ্ভুত ধরনের অস্ত্র নিয়ে বুলামাসি তেড়ে গিয়েছিল ভোম্বলের দিকে। অদ্ভুত অস্ত্রটা কী হতে পারে অনুমান করো দেখি। ফজলি আমের আঁটি। টালা থেকে বেলামাসি পাঠিয়ে দিয়েছিল, "বুলা রে, খেয়ে দ্যাখ্, জাত-ফজলি আম।"

বুলামাসি তাই আমের খোসা ছাড়িয়ে, অ্যাত্তো বড় আস্ত আমটা সাবাড় করতে করতে যখন দেখল, আঁটিখানা বেরিয়ে পড়ো-পড়ো, তখন তার মনে হল, আহা রে, দুধ দিয়ে খেলে তোফা হত। কিন্তু আঁটি হাতে রান্নাঘরে ঢুকে দেখে, ভোম্বলবাবাজি দুধ খাচ্ছে, চুকু-চুকু-চুকু। আর যায় কোথা, অমনি লম্বা ফজলি আমের আঁটি নিয়েই বুলামাসি হা-রে-রে-রে করে ভোম্বলের পেছনে ছুটল। ভোম্বলবেচারি অমন অদ্ভুত অস্ত্র কোনোদিন দেখেনি। তাই ঘাবড়ে গিয়ে পালানোর সহজ রাস্তা রান্নাঘরের জানালাটার কথা ভুলে গিয়ে ছুট লাগাল দালানে। দালান থেকে পাশের ঘরে। তারপর আবার দালানে। তারপর আবার পাশের ঘরে। তারপর বারান্দায়। ততক্ষণে আমের খোসায় পা পড়ে গেল বুলামাসির। তাইতে পা পিছলে আলুর দম হয়ে গেল হাঁটুর কাছটায়। পনেরোটা দিন পড়ে থাকতে হল বিছানায়।

গড়িয়াহাট মার্কেট, লেক মার্কেট, যদুবাবুর বাজার, নিউ মার্কেট, বাগরি মার্কেট, অর্ধেক কলকাতার এই বিখ্যাত বাজারগুলোতে ওই একটা জিনিসই পাওয়া গেল না। বেড়াল ধরার কল। যাকেই বুলামাসি জিজ্ঞেস করল, "বেড়াল ধরার কল আছে কি?" শুনবামাত্র প্রত্যেকে কাঠের তৈরি সবচে' বড় ইঁদুরের কল বের করে বলল, "এতে চলবে কি?"

শেষ পর্যন্ত বুলামাসিকে লেকমার্কেটের এককোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল অনেকক্ষণ। আচমকা একগাল হেসে ফেলল। তক্ষুনি একটা দোকানে এসে দুটো কাঠের তৈরি ইঁদুরের কল কিনল। কুড়িটাকা দিয়ে একটা ইয়া বড়। আর দু'টাকা দিয়ে একটা এইটুকুনি ছোট কল। ভোম্বলকে ধরবার একটা চমৎকার মাস্টার প্ল্যান। প্রথমে ছোট কলটা দিয়ে নেংটি ইঁদুর জ্যান্ত ধরা হবে। তারপর? জ্যান্ত ইঁদুরটাকে বড় কলটার ভেতর বেঁধে রেখে ফাঁদ পাতা হবে। সবাই জানে, নেংটি ইঁদুর জ্যান্ত পেলে কোনো বেড়ালই মাথা ঠিক রাখতে পারে না। তার উপর ভোম্বল যে রকম দুঃসাহসী বেড়াল, নেংটি ইঁদুর জ্যান্ত দেখবামাত্র কলের ভেতর হুড়মুড় করে ঢুকে পড়বে, বলেই বুলামাসির দৃঢ় বিশ্বাস।

পরোটা ভাজা হল। ইঁদুরের ছোট্ট কলের ভেতর একটুকরো পরোটা বেঁধে ফাঁদ পাতা হল। কলটাকে হাঁ করিয়ে খাটের তলায় রাখা হল। একদিন গেল। দু'দিন গেল। নেংটি ইঁদুর ধরা পড়েনি। বরং ভোম্বল ছোট্ট কলটাকে উল্টে ফেলে পরোটার টুকরোখানা বের করার ব্যর্থ চেষ্টা করে গেছে। বুলামাসি দমবার পাত্রী নয়। আপেলের টুক্‌রো বেঁধে ছোট্ট কলটার ভেতর ফাঁদ পাতা হল। পনেরোদিনের মধ্যেও কোনো নেংটি ইঁদুর ধরা পড়েনি। ছোট্ট কলটা খাটের তলায় হাঁ করেই রইল। আরও পনেরোদিনের মধ্যে নেংটি ইঁদুর ধরা পড়ত কি

না এবং তার আরও পনেরো দিনের মধ্যে ভোম্বল ধরা পড়ত কি না তা আর জানা সম্ভব হল না। কারণ ইতিমধ্যে একটা চিঠি এসে গেছে। বুলামাসির বোনের মেয়ে টুম্পা চিঠি লিখেছে, "বুলামাসি, আমার পরীক্ষা শেষ হয়েছে। তাই আসছে রবিবার তোমার বাসায় একটা দিন থাকব। ইলিশমাছ আর পানতুয়া খাব।" ইত্যাদি।

ইঁদুর-ধরা, ভোম্বল-ধরা আপাতত স্থগিত রেখে বুলামাসি ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ঘর-দালান-বারান্দা পরিষ্কার, ঝুলঝাড়ুনি দিয়ে ঝুল পরিষ্কার, বিছানার চাদর পাল্টানো, জানালা-দরজার পর্দা পাল্টানো, লেপ তোশক রোদে দেওয়া, খাটটা নড়বড় করছে দেখে মিস্ত্রি ডেকে সারানো, রেকর্ড প্লেয়ারটা চলছিল না, সেটাকে চালু করানো, রেডিওটা কিট্‌কিট্ করছিল, সেটাকে সারানো, টিভিটা বিজবিজ করছিল, সেটাকে সারানো, এই সব কাজ শেষ করতে না করতেই রবিবারটা অনেকখানি এগিয়ে এল। তাইতে বুলামাসি খেপে উঠল। মেসোমশাইকে হুঙ্কার দিয়ে মনে করিয়ে দিল, এখনও কুকারটা সারানো হল না। এখনও স্টোভটা দাউ-দাউ করে জ্বলে ওঠে। এখনও গ্যাস সিলিণ্ডার এসে পৌঁছল না, এখনও একটা ইমারজেন্সি লাইটের ব্যবস্থা হল না। লোডশেডিং হলে কী হবে? টুম্পাকে মশা কামড়াবে। রবিবার আসতে না আসতেই মেসোমশাই বুলামাসির আরেকটা হুঙ্কার শুনলেন, "কেন এখনও ইলিশমাছ বুক করা হল না, কেন এখনও পানতুয়ার অর্ডার দেওয়া হল না?"

শেষে রবিবার ভোররাতে বুলামাসি নিজেই চলে গেল ৮৩ নং বাসে করে ফলতায়। গোটা চারেক টাট্‌কা গোল গঙ্গার ইলিশ কিনে একগাল হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরল।

হ্যাঁ, বলাই বাহুল্য, ইলিশমাছের দমভাত, পেটিভাজা, ঝাল, পাতুরি, মুড়িঘণ্ট, ইলিশ-ডিমের তেঁতুল-চাটনি, বুলামাসির এতগুলো রান্না প্লাস পানতুয়া, সব ভোম্বল সাবাড় করে ফেলল কোন্ সুযোগে ঢুকে।

টুম্পা মহাদুঃখে বাড়ি চলে গেল। আর বুলামাসির যে কী শোকাকুল অবস্থা তা আর লেখা গেল না। যাই হোক ঐ ঘটনার পর বুলামাসি সাতটা দিন ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেছিল। অমন গোমড়া মুখ দেখে সাতষট্টিটা বেড়াল পাড়া থেকে কিছুদিনের জন্য হাওয়া হয়ে গেছিল। ভোম্বলও বুলামাসির বড় একটা কাছেপিঠে আসেনি, কেবল দূর থেকে শুনেছে বুলামাসির চিৎকার, "তোকে আমি পাড়াছাড়া করে ছাড়বই।"

কিন্তু কী করে ভোম্বলকে পাড়াছাড়া করবে বুলামাসি? ভোম্বলকে যে ধরাই যাচ্ছে না। ধরতে গেলে আঁচড়ে-কামড়ে জখম করে দিচ্ছে। তা ছাড়া অনেক রকম চেষ্টাই তো করেছে বুলামাসি। ওই তো ইঁদুরের কলদুটো পড়ে রয়েছে। না-না পড়ে নেই। বুলামাসি ইতিমধ্যে কলদুটো এক মুদির দোকানে দিয়ে তার বদলে একটা চটের বস্তা নিয়ে এসেছে। আর নিয়ে এসেছে বাজার থেকে একটা ইলিশমাছ। "দেখা যাক্ এবার তোকে ধরতে পারি কি না।" বলেই বুলামাসি রান্নাঘরে বসে অনেকক্ষণ ধরে মাছ কুটল, ভাজল, ঝাল রাঁধল, ঝোল রাঁধল, আর আড়চোখে দেখল, হ্যাঁ, ভোম্বল রান্নাঘরে পা টিপে-টিপে ঢুকল, তারপর দেয়াল ঘেঁষে বসল। বুলামাসির রান্না হয়ে গেলে মাছের টুকরোগুলো থালায় সাজিয়ে ফেলল। তারপর বস্তার মুখটার একটা প্রান্ত বাঁ হাতে তুলে ধরে বস্তাটাকে হাঁ করিয়ে রাখল। ডানহাতে মাছের থালাটা বস্তাটার মুখের সামনে রেখে বলল, "আয় ভোম্বল, পেট ভরে মাছ খাবি তো আয়, আ আ।"

ভোম্বল কিছুক্ষণ বস্তার দিকে তাকিয়ে থাকল। একটু পরে থালার ওপর গুটিগুটি চলে এল। একটুকরো মাছ বেশ মন দিয়ে খেতে শুরু করল। আর বুলামাসিও তক্ষুনি থালাটা আস্তে-আস্তে করে টেনে বস্তার মধ্যে আর্ধেকটা ঢুকিয়ে দিল। থালার সাথে সাথে ভোম্বলও বস্তার মুখের কাছাকাছি চলে এল। দ্বিতীয় টুক্‌রোটা যখন ভোম্বল চাখতে শুরু করল, বুলামাসি তখন থালাটা বস্তার আরেকটু ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ভোম্বলেরও দুটো পা বস্তার ভেতরে ঢুকে গেল। ভোম্বল যখন তৃতীয় টুক্‌রোটার দিকে মন দিল, তখন বুলামাসি থালাটা আরও ভেতরে ঠেলে দিল। ক্রমে-ক্রমে ভোম্বলের অর্ধেকটা শরীর বস্তার ভেতরে ঢুকে গেল। চতুর্থটার বেলায় থালা আরেকটু ঢুকল। ভোম্বলেরও শরীর ঢুকল চার ভাগের তিন ভাগ। পঞ্চমটার বেলায় থালা আরেকটু ঢুকিয়ে দিতেই ভোম্বলও আস্ত ঢুকে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে "আর দেরি নয়, আর দেরি নয়..." বলে গান গেয়ে উঠল বুলামাসি। তাড়াতাড়ি থালা আর ভোম্বলসুদ্ধ বস্তার মুখটা বন্ধ করে দড়ি দিয়ে বেশ করে বেঁধে ফেলল। চটপট একটা রিকশা ডেকে, বস্তাটা নিয়ে তাতে উঠে বসে, রিকশাওয়ালাকে বলল, "কুড়ি মাইল দূরে জলদি চলো, এক-এক মাইল এক-এক টাকা।"

ওদিকে বস্তার মধ্যে ভোম্বল গজরাচ্ছে, 'অঁ-অঁ' করে চেঁচিয়ে উঠছে, রাস্তার লোক চমকে-চমকে উঠছে, আর তক্ষুনি রিকশাওয়ালা ধমক খাচ্ছে, "কেয়া আস্তে আস্তে চালাতা হায়? গায়েমে জোর নেহি হায়?"

যাই হোক্, অনেক মাইল দূরে, মনে হয়, নরেন্দ্রপুর কিংবা সোনারপুরে ভোম্বলকে ছেড়ে দেওয়া হল। বস্তা থেকে এক লাফে বেরিয়ে আসার সময় ভোম্বল বুলামাসির বাঁ হাতখানা আঁচড়ে দিয়েছিল। তবু বুলামাসির তখন একগাল নয়, দুইগাল হাসি।

কিছুদিন পর টুম্পাকে নিজে নেমন্তন্ন করে নিয়ে এল বুলামাসি। ফলতা থেকে টাটকা গোল ইলিশ এল, এল পোড়া অশ্বত্থতলার পানতুয়া। রান্নাঘরে প্রতিটি আইটেম ফের তৈরি হতে লাগল নির্বিঘ্নে। বুলামাসির কী আনন্দ! "টুম্পা রে, এবারে তুই নিশ্চিন্তে ইলিশমাছ আর পানতুয়া খাবি।" বলার সঙ্গে-সঙ্গে বাইরে একটা রিকশার শব্দ। জানালা দিয়ে উঁকি মারতেই দেখা গেল, রিকশায় বসে এক বয়স্ক ভদ্রমহিলা। তার পায়ের কাছে চটের বস্তা। বস্তার মুখটা খুলে দিতেই একটা বেড়াল লাফিয়ে নামল রাস্তায়। তক্ষুনি পাড়ার ছেলেগুলি চেঁচিয়ে উঠল, "ও কি ডালডাপিসি, ও কী হচ্ছে? সোনারপুর থেকে এসে বেড়াল ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছ।"

"ও তোদেরই বেড়াল, আমাদের পাড়ায় এসে বড্ড জ্বালাচ্ছিল!"

বুলামাসি দেখল, বেড়ালটা সোজা তার বাড়ির দিকেই আসছে। আর কেউ নয়, স্বয়ং ভোম্বল। এসে পাঁচিলের উপর উঠে বসল। ফ্যাঁচ করে একটা হাসি ছুঁড়ে দিল। মিউ-স্বরে মিউজিক বাজাল *মিঁ-মিঁ-উঁ মিঁ ম্যাঁ-উঁ ম্যাঁ-ও-ম্যাঁ ম্যাঁ-ম্যাঁ-ওঁ ম্যাঁ-ম্যাঁ-ওঁ ম্যাঁ-ওঁ-ম্যাঁ মিঁ-ইঁ-ইঁ-ইঁ-ইঁ...*

অর্থাৎ, সকল মাসির রানি সে যে মোদের বুলামাসি।

ছবি প্রণবেশ মাইতি

হাঁসের ছানা মধুমালা

এক ছিল হাঁস-মা। ডিম ফুটে ছানা বেরুলে কী নাম রাখবে, সে যখন তা-ই ভাবছে, ডিমটা তখন গড়িয়ে গেল···
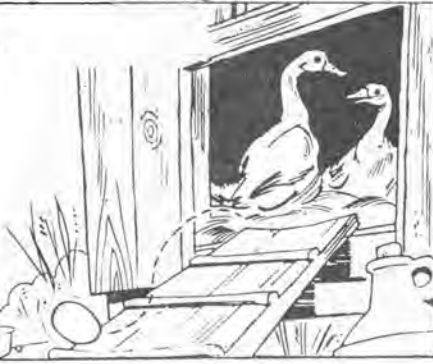
গড়াতে-গড়াতে গড়াতে-গড়াতে, খামার ছাড়িয়ে···

গাড়ির তলায় চাপা পড়তে-পড়তে বেঁচে গিয়ে···
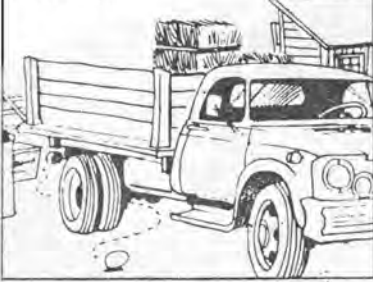
পৌঁছল গিয়ে এক আস্তাবলে।

ডিম নেই দেখে হাঁস-মা তো ওদিকে মহা হুলুস্থুলু বাধিয়ে দিয়েছে···

ডানা ঝাপটে ডাকছে, "মধুমালা মধুমালা!" হ্যাঁ, হাঁস-মা ঠিক করেছিল যে, ডিম ফুটে ছানা বেরুলে ওই নামই রাখবে···

কিন্তু কোথায় মধুমালা ডিম তখনও গড়িয়ে চলেছে!

গড়াতে-গড়াতে গিয়ে থেমেছে বাঘা-কুত্তার লেজের মধ্যে।

বাঘা তখন ঘুমুচ্ছিল।

তার লেজের ওম পেয়ে ডিম ফুটে তো মধুমালা বেরিয়ে পড়ল।

তারপরে কী হল বলো তো?

মধুমালাকে ভাল করে দেখে নিয়ে বাঘা
চেঁচাল, ঘেউ ঘেউ !

কাছেই ছিল এক পুষি বেড়াল। সে তো
'ঘেউ ঘেউ' শুনে ভীষণ ভয় পেয়ে তক্ষুনি
গাছে উঠে পড়েছে। আর সেখান
থেকে বলছে, মিউ মিউ !

'মিউ-মিউ' ডাকটা কানে যেতে হাঁসের ছানা
মধুমালাও অমনি মিউ-মিউ করে ডাকতে
লেগে গেছে !

মধুমালা ততক্ষণে পুকুর-পাড়ে চলে
এসেছে। সেখানে ব্যাঙের ডাক শুনে
সে-ও ডাক ছাড়ল গ্যাঙর গ্যাং !

তারপরে কী হল বলো তো ?

তারপর রাত কাটল। সূর্য উঠল। আর তখন...

সবাই তো ভয়ে অস্থির। ভিড় করে সবাই দেখতে চলেছে, ব্যাপারটা কী!

সম্পূর্ণ উপন্যাস

শিমুলগড়ের খুনে ভূত

সমরেশ বসু

ছবি : অনুপ রায়

গোগোল বুঝতে পারছে, বাবা-মা'তে একটা বিষয় নিয়ে বেশ আলোচনা চলছে। আর এটা চলছে গত দু'দিন ধরে। দু'দিন আগে সেই যে এক মামা এলেন, আর বাবা মা'র সঙ্গে কী সব কথাবার্তা বললেন, তারপর থেকেই বাবা-মা'তে আলোচনা চলছে। বাবার সকালবেলা অফিসে যাবার আগে আলোচনা চলছে। আবার অফিস থেকে সন্ধের আগে বাড়ি ফিরে এলেই মা'র সঙ্গে বাবার সেই একই আলোচনা চলছে। আলোচনা মানে, কোনো একটা ব্যাপার নিয়ে বাবা-মা'র মতের মিল হচ্ছে না। আর এই ব্যাপারটা শুরু করে দিয়ে গেছেন সেই মামা।

গোগোল এখন বেশ বুঝতে শিখেছে, ওর মামার বাড়ির বংশ বিরাট। এক-এক সময় মনে হয়, গোটা বাংলাদেশটা জুড়েই যেন ওর মামাদের বংশ ছড়িয়ে আছে। কেবল পশ্চিমবাংলায়, তা নয়। এখন যেটা বাংলাদেশ হয়ে গেছে, মামাদের একটি পরিবার নাকি এখনও সেখানে রয়েছে। পশ্চিমবাংলায় এ পর্যন্ত গোগোল দু'জায়গায় মামার বাড়িতে গেছে। মা নিজেই এক-এক সময় হেসে বলেন, "আমার বাবার বাড়ির বংশ যেন রাবণের গোষ্ঠী।"

গোগোল না জিজ্ঞেস করে পারেনি, "রাবণের গোষ্ঠী কী মা ?"

মা হেসে বলেছেন, "যে গোষ্ঠীর শেষ নেই। বিশাল আর বিরাট। তা'বলে যেন ভেবো না, রাবণের গোষ্ঠী বলতে আমি রাক্ষসের গোষ্ঠী বলছি। আসলে আমাদের বাবার বাড়ির বংশটা এত বড়, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী মিলে নানান জায়গায় ছড়িয়ে আছে। আজকাল তো আর একান্নবর্তী পরিবার বলতে গেলে নেই। সবাই যে যার কাজে, নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। আলাদা আলাদা বাড়ি করেছে। কেউ-কেউ পুরনো সেই আদি বাড়িতেই আছে। তবে এটাও মনে রেখো, কেবল আমার বাবা-ঠাকুর্দাদের কথাই বলছিনে। তুমি যে দুই মামার বাড়ি গেছ, তাঁরা কেউ কিন্তু আমার নিজের আপন দাদা নন। কেউ মামাতো দাদা, কেউ পিসতুতো দাদা। তাঁরা হলেন সম্পর্কে দাদা। আর আমাদের নিজেদের বাবা-ঠাকুর্দার বংশটা তো আলাদা। তুমি আমার আপন দাদা-ভাইদেরও কয়েকজনকে দেখেছ। আর এটাও জানো, আমরা তেরোজন ভাইবোন। আমার জ্যাঠতুতো ভাইবোন হল ষোলজন। এরকম সব জ্ঞাতি-গোষ্ঠী মিলিয়ে হিসেব করলে, তোমার মামার সংখ্যা অগুনতি। আর তাঁদের অনেকেই ছড়িয়ে আছেন সারা ভারতবর্ষে।

গোগোল বলেছিল, "জানি তো। দিল্লিতে একবার এক মামার বাড়ি গেছলাম !"

মা চোখ পাকিয়ে বলেছিলেন, "সে-কথা আমি কখনও ভুলি ? রাজধানী এক্সপ্রেসে আসতে গিয়ে কী কাণ্ডটাই না তুমি করেছিলে। এমন জ্বালানে ছেলে যদি একটাও হয়।"

এ-সব কথা উঠলেই, গোগোল লজ্জা পেয়ে যায়। সত্যি, রাজধানী এক্সপ্রেসে কী ভয়ংকর কাণ্ডটাই না ঘটেছিল ! তায় আবার সেবার বাবা সঙ্গে ছিলেন না। গোগোল মা'র সঙ্গে ফিরছিল। কিন্তু গোগোলই বা কী করবে ? ও তো নিজের থেকে কোনো কাণ্ড বাধায়নি ! ও কি জানত, ট্রেনের মধ্যে ওর চোখের সামনেই, একজনকে আর-একজন রিভলভার দিয়ে গুলি করে মারবে ? তারপরেই তো কোথা থেকে গোয়েন্দা অশোক ঠাকুর এসে গেলেন। খুনির দল গোগোলকে ট্রেন থেকে নামিয়ে নিয়ে গেছল। সে এক ধুন্ধুমার কাণ্ড !

যাই হোক, মামার বাড়ির কথা বলতে গিয়ে মা আর একটি কথা বলেছিলেন। গোগোলের সে-কথা মনে আছে। মা বলেছিলেন, "আমাদের যে আসল পৈতৃক বাড়ি, সেটা আমি ছেলেবেলায় একবার দেখেছিলাম। বাব্বা ! সে এক বিরাট লঙ্কাপুরী। শুনেছি, প্রায় দেড়শো বছরের পুরনো বাড়ি। বলতে গেলে, প্রায় একটা গ্রাম জুড়ে সেই বাড়ি। কত যে তার মহল। আসলে আমার বাবার চার-পাঁচ পুরুষ আগের বংশ ছিল নাকি রাজবংশ। বাড়ি, মন্দির, আবার বাড়ির মধ্যেই পুকুর, গাছপালা, বাগান। সব জঙ্গলে ভরে গেছে। কোথাও কোথাও বড় বড় থাম, ছাদ দেয়াল ভেঙে পড়েছে। দেখলে ভয় লাগে।"

গোগোল জিজ্ঞেস করেছিল, "সেখানে কেউ থাকেন ?"

মা বলেছিলেন, "থাকেন বই কী। সেই বিশাল পুরীতে কে যে কোথায় থাকেন, আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। দেখে মনে হচ্ছিল পালিয়ে আসতে পারলে বাঁচি। যেন একটা প্রকাণ্ড গোলকধাঁধা। আমি ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে গেছলাম। কাদের ঘরে যেন আমাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। আর বাবা আমাকে বলেই রেখেছিলেন, আমি যেন ঘর থেকে একদম না বেরোই।"

গোগোল চোখ বড় করে জিজ্ঞেস করেছিল, "কেন ? ভূত ছিল বুঝি ?"

মা হেসে বলেছিলেন, "ছেলেবেলায় তো আমার চোখে ওটা একটা ভুতুড়ে পুরী বলেই মনে হয়েছিল। বাবা অবশ্য ভূতের ভয়ের কথা বলেননি। বলেছিলেন, সেই বিশাল লঙ্কাপুরীতে আমি যদি একবার হারিয়ে যাই, আমাকে নাকি খুঁজে পাওয়াই দায় হবে। সে-কথা শুনে, আমি আর ঘর থেকেই বেরোইনি।"

গোগোল অনেক পুরনো ভাঙাচোরা বাড়ি দেখেছে। কিন্তু মা যেরকম বাড়ির কথা বলেছিলেন, সেরকম বাড়ি ও দেখেনি। ভাবতে চেষ্টা করেছিল। তবে লঙ্কাপুরীর মতো বাড়ি কেমন হয়, সেটা ও ভেবে ঠিক করতে পারেনি। রামায়ণ বইয়ে লঙ্কাপুরীর ছবি দেখেছে। সে তো একরকমের অদ্ভুত সুন্দর বাড়ি। রঙচঙে রাজপ্রাসাদের মতো। মা যে-লঙ্কাপুরীর মতো বাড়ির কথা বলেছিলেন, সেটা তো আদ্যিকালের পুরনো। ভাঙাচোরা খসা বিশাল পোড়ো বাড়ি। মহলের পর মহল বাড়ি কেমন হয়, তাও ওর ধারণায় ছিল না।

দু'দিন ধরে বাবা মা-তে যে আলোচনা চলছে, তার কারণ সেই বাড়িটাই। আগে নাকি বীরভূমের রামপুরহাট স্টেশনে নেমে, গোরুর গাড়িতে করে সেই গ্রামের বাড়িতে যেতে হত। এখন মোটরগাড়ি চলার রাস্তা হয়ে গেছে। সেটাকে হাইওয়ে বলে। রাস্তাটা চলে গেছে বিহারের সাঁওতাল পরগনার দিকে। ইলেকট্রিকের লাইনও গিয়েছে। অবশ্য সেই গ্রামে এখনও নাকি কেউ ইলেকট্রিক নেয়নি।

গোগোল এসব কথা জানতে পেরেছে সেই মামার মুখ থেকে, যিনি দু'দিন আগে ওদের বাড়িতে এসেছিলেন। আসবার কথা জানিয়ে তিনি আগেই চিঠি দিয়েছিলেন। গোগোল সে-কথা মা'র মুখে শুনেছিল। মা বলেছিলেন, "তোমাকে যে আমাদের সেই বিরাট ভুতুড়ে বাড়ির কথা বলেছিলাম, সেখান থেকে একজন আসছেন। নাম যোগদানন্দ মুখোপাধ্যায়। আমি অবশ্য ওঁকে চিনিনে। ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে সেই একবার গেছলাম। ওঁকে দেখেছি বলেও মনে পড়ে না। লিখেছেন, সম্পর্কে উনি আমার দাদা। কেন যে আসছেন, চিঠিতে সে-কথা খুলে কিছুই লেখেননি। কী নাকি জরুরি কাজের কথা আছে। অনেক কষ্টে আমাদের ঠিকানা যোগাড় করেছেন। তবে, উনি নাকি বছরে দু'চারবার কলকাতায় আসেন, সে-কথাও চিঠিতে লিখেছেন। কী জরুরি কাজের কথা হতে পারে, কিছুই বুঝতে পারছিনে।"

তারপরেই দু'দিন আগে সেই যোগদানন্দ মুখোপাধ্যায় এসেছিলেন। সেদিনটা ছিল রবিবার। উনি এসেছিলেন সকালবেলা। সকালবেলাই একজন লোক কী করে এত দূর থেকে কলকাতায় পৌঁছলেন ? বাবা-মা দুজনেই খুব অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু তখনই কিছু জিজ্ঞেস করেননি। রবিবারের তখন মাত্র সকাল সাড়ে আটটা। বাবা গোগোলকে নিয়ে আন্টির বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। ছুটির দিনে বাবার ওটা একটা কাজ। গোগোলকে পৌঁছে দিয়ে বাবা গাড়ি চালিয়ে চলে যান বাজার করতে। বাজার সেরে, দু' একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করেন। তার মধ্যে গোগোলের পড়া শেষ হয়ে যায়। ফেরার পথে বাবা ওকে নিয়ে আসেন।

সেই সকাল সাড়ে আটটায় কলিংবেল বেজে উঠেছিল। বঙ্কিমদা গিয়ে দরজা খুলে দিয়েছিল। মা আর গোগোল তখন বসবার ঘরে। বাবা তাঁর ঘরে জামা পরছিলেন। বঙ্কিমদা এসে বলেছিল, "একজন ভদ্দরলোক এসেছেন। নামটা কী বলছেন, আমি বুঝতে পারছি না। জগানন্দ না কী বলছেন। আর মুখোপাধ্যায়।"

মা প্রথমে হেসে উঠেছিলেন। তারপরেই খুব ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "সে কী, উনি এত সকালেই এসে পড়েছেন ? তুই যা, আমি দেখছি।"

বঙ্কিমদা যোগদানন্দকে জগানন্দ বলেছিল। গোগোলের সেই চিঠির কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। মা নিজেই দরজার কাছে গিয়ে বলেছিলেন, "আসুন। আমার নাম সুনীতি।"

"অ ! তুমিই সুনীতি বটে ?"

ভদ্রলোকের কথার উচ্চারণে এমন একটা টান ছিল, গোগোল কখনও শোনেনি। "বটে" শব্দটাকে উনি উচ্চারণ করেছিলেন, "বট্যা"। ওঁর চেহারাটা ছিল বেশ লম্বা-চওড়া। মোটেই নাদুসনুদুস গোলগাল নয়। রীতিমত শক্ত পেটানো গড়ন। একটু যেন চোয়াড়ে ধরনের। মাথার চুল বলতে গেলে খোঁচা-খোঁচা। গোঁফজোড়াও সেইরকম। দুয়েতেই বেশ কিছু পাক ধরেছিল। নাকটা চোখা, কিন্তু মোটা। চওড়া চোয়াল। একটা মোটা কাপড়ের পাঞ্জাবি ছিল ওঁর গায়ে। ধুতিটাও মোটা। আর মালকোঁচা-সাঁটা ধুতিটা বেশ একটু উঁচুতে তোলা। পায়ে ছিল পাঁশুটে রঙের রবারের জুতো। অনেকটা নিউকাটের মতো দেখতে। বাঁ হাতের মোটা কব্জিতে ছিল একটা ঘড়ি।

মা তাঁকে প্রণাম করেছিলেন। তিনি মা'র মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন, "জয়স্তু।"

মা বলেছিলেন, "আসুন, ভেতরে এসে বসুন।"

যোগদানন্দ হেসে বলেছিলেন, "হঁ, বসব বই কী। বসব, কথা বলব।" বলতে বলতে তিনি একটা সোফায় বসেছিলেন। বসবার ঘরটার চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখেছিলেন। আবার বলেছিলেন, "কী প্রকাণ্ড বাড়ি! আর কী উঁচু! অথচ সবাই যেন খোপের মধ্যে থাকে। ঘরের মধ্যে ঢুকলে আর কিছু বুঝবার উপায় নাই, কোথা এসে ঢুকলাম। তা, ইটি কে বটে?" তিনি গোগোলের দিকে তাকিয়েছিলেন।

মা বলেছিলেন, "আমার ছেলে।"

"বাঃ, বেশ ফুটফুটে সোন্দর ছেলে।" যোগদানন্দ গোগোলের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন।

মা গোগোলকে বলেছিলেন, "প্রণাম করো গোগোল। ইনি তোমার একজন মামা।"

গোগোল যোগদানন্দকে প্রণাম করেছিল। তিনি গোগোলের চিবুকে মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন, "বেশ বেশ। শুনেছি, ছেলে তো তোমার একটিই বটে?" তিনি মা'র দিকে তাকিয়েছিলেন।

মা বলেছিলেন, "হ্যাঁ।"

"বেশ বেশ।" যোগদানন্দ মাথা ঝাঁকিয়ে হেসে বলেছিলেন, "একটি দুটিই ভাল। আমাদিগের পাঁড়াগাঁয়ে সব অশিক্ষিত চাষাভুষা লোক। তাদিগের ঘরে যেয়ে দেখ, আট-দশটা বেটা বেটি। লেখাপড়া শেখাবে কী, খাওয়াতেই পারে না। আমরাও একরকম চাষাভুষাই বলতে পারো। তা সে যাক গা যাক, তোমার—"

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই বাবা বাইরের ঘরে এসেছিলেন। মা বাবাকে বলেছিলেন, "ইনিই আমার দাদা যোগদানন্দ মুখোপাধ্যায়।"

বাবা প্রথমে দু হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করেছিলেন। তারপরে মা'র দিকে একবার দেখে, কাছে গিয়ে যোগদানন্দকে প্রণাম করেছিলেন। যোগদানন্দ বাবার মাথায়ও হাত দিয়ে বলেছিলেন, "জয়স্তু। শুনেছি বটে, তুমি খুব বড় চাকরি করো। খুব আনন্দের কথা।"

বাবা যেন একটু লজ্জা পেয়ে হেসেছিলেন। বলেছিলেন, "না না, তেমন কিছু নয়। কলকাতায় ওরকম চাকরি অনেকেই করে।"

যোগদানন্দ বলেছিলেন, "সে তো কলকাতায় কত লোকে কত কী করছে। আমরা দেখছি আমাদের ভগ্নীপতি কী করছে। কী বল সুনীতি, আঁ? তবে, তোমাকে আমি কখনো দেখি নাই। সুনীতিকে খুব ছেলেবেলায় একবার দেখেছি, মাধবকাকা নিয়ে গেছলেন। তা আমার বয়স তখন আঠারো-কুড়ি হবে।"

গোগোল জানে, ওর দাদামশায়ের নাম ছিল মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বাবা জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আপনি এত সকাল-সকাল কোন্ ট্রেনে এলেন?"

যোগদানন্দ বলেছিলেন, "আমি আজ আসি নাই। কালকেই

এসেছি। আমার বড় ছেলে কলকাতায় মেসে থাকে, আইন পড়ে। কাল এসে তার ওখানেই ছিলাম। কখনো-সখনো কলকাতায় এলে, ছেলের মেসেই উঠি। এবার এসেছি তোমাদের সঙ্গে দেখা করতেই। বিশেষ কিছু কথা আছে। সব কথা তো আর চিঠিতে লেখা যায় না। তোমাদের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে, আমি আজ আবার বিকেলের গাড়িতেই ফিরে যাব।"

বাবা গোগোলের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, "গোগোল, তুমি তোমার আন্টিকে টেলিফোনে জানিয়ে দাও, আমি একটু বিশেষ কাজে আটকে গেছি। আজ আর তোমাকে নিয়ে যেতে পারছিনে। টেলিফোন করে তুমি তোমার ঘরে যাও, একটু পড়াশোনা করে নাও। আমরা কথা বলি।"

গোগোল বাবার ঘরে চলে গিয়েছিল। আন্টিকে টেলিফোন করে সব জানিয়েছিল। কিন্তু যোগদানন্দমামা লোকটিকে ওর অদ্ভুত লাগছিল। উনি কোনোদিন এ-বাড়িতে আসেননি। মাকে ছেলেবেলায় একবার দেখেছেন। বলতে গেলে বাবা মা, কাউকেই উনি চেনেন না। অথচ তাঁদেরই সঙ্গে বিশেষ জরুরি কথা বলতে এসেছেন। উনি কী বলতে এসেছেন, গোগোলের তা জানবার খুবই কৌতূহল হচ্ছিল। কিন্তু বাবা ওকে ওর ঘরে গিয়ে পড়া করতে বলেছিলেন। ঠিকই বলেছিলেন। বড়দের কথার মধ্যে ছোটদের থাকতে নেই! তবে এমন কোনো কোনো ব্যাপার থাকে, যা জানবার খুবই ইচ্ছে হয়।

গোগোল ওর ঘরে গিয়ে পড়ার টেবিলে বসেছিল। কিন্তু পড়ার দিকে ওর মোটেই মন ছিল না। ওর ঘরের দরজা খোলা ছিল। যোগদানন্দমামার গলা বেশ চড়া। মাঝে মাঝেই তার কথা ভেসে আসছিল। গোগোল যেটুকু শুনতে পাচ্ছিল, তাতে বোঝা যাচ্ছিল, যোগদানন্দমামা বাবা-মা'কে তাঁদের গ্রাম, পুরনো বাড়ির সম্পর্কে কিছু বোঝাতে চাইছিলেন। গ্রামটা এখনও সেইরকমই আছে। তাঁদের প্রকাণ্ড বাড়ি ক্রমেই আরও ভেঙে পড়ছে। কিন্তু হাইওয়ে হয়ে, আর বিদ্যুৎ এসে এখন সব ওলটপালট হতে চলেছে। এ-সব কথা ছাড়াও, গোগোল আর যে-সব কথা শুনেছিল, তার মধ্যে এরকম কথাও ছিল, নিজের স্বার্থেই মা'র নাকি একবার সেখানে যাওয়া উচিত। অনেক টাকার ব্যাপার। সবাই যখন সুযোগ নিতে যাচ্ছে, তখন সুনীতিই বা তার দাবি ছাড়বে কেন? ঐ ভাঙা পোড়ো বাড়ি আর জমির দাম এখন অনেক টাকা। সুনীতির নিজের নামে যা আছে, তাতে সে লাখ টাকার ওপর পাবে। বাবা-মা কী বোঝাতে চেয়েছিলেন, গোগোল শুনতে পায়নি। যোগদানন্দমামার কথাই

শুনেছিল যে, তিনি সুনীতিদের ভালর জন্যই এসব বলছেন। এতে লোভের কোনো কথা নেই। এ হল হকের ধন। কেন সুনীতি ছাড়বে? সরকারি ব্যাপার হলে টাকা কম হত। এটা বেসরকারি একটা প্রকল্প। হাইওয়ে হয়েছে, বিদ্যুৎ এসেছে। তাই জমি বাড়ি ঘরের দামও বেড়েছে। সুনীতি ন্যায্য টাকাই পাবে।

বাবা মা বোধহয় আরও কিছু বলেছিলেন। যোগদানন্দমামার হাসি শোনা গেছল। তিনি বলেছিলেন, "তোমরা গেলে কি আর পোড়ো ঘরে না-খেয়ে থাকবে? তোমরা আমার বোন ভগ্নীপতি। আমার অতিথি হয়েই দু'চার দিন কাটিয়ে আসবে। এমন তো নয় যে, আমাদিগের পূর্বপুরুষদের দৈত্যপুরী সবই ভেঙে পড়েছে। এখনও পুব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে বিস্তর আস্ত-আস্ত ভাল ঘর আছে। জ্ঞাতিগুষ্টির লোকজনও কম নাই।"

যোগদানন্দমামার কথার মধ্যে কয়েকবার "ক্যানে" শব্দটা শোনা গেছল। তিনি প্রায় সাড়ে দশটা অবধি কথা বলেছিলেন। তারই মধ্যে মা তাঁকে খাবার খাইয়েছিলেন। গোগোল তা টের পেয়েছিল। তিনি চলে যাবার আগে মা গোগোলকে ডেকেছিলেন। গোগোল আবার প্রণাম করেছিল। বাবা-মা বা গোগোল, কারও প্রণামের বেলাতেই তিনি 'না না থাক থাক,' সে-রকম কিছু বলেননি। গোগোলকে বলেছিলেন, "বাবা-মা যদি আমাদিগের দেশে যায়, তুমিও এসো। আসল মামার বাড়ি কেমন, দেখতে পাবে।"

যোগদানন্দ মামা চলে যাবার আগে মা-বাবা দুজনকেই আবার বলেছিলেন, "যা বলে গেলাম, তাই করো। দেরি না-করে, একবার চলে এসো। জানি, তোমাদিগের কোনো অভাব ভগবান রাখেন নাই। তা বলে নিজের হকের জিনিস ছাড়বে ক্যানে? আমি যতজনের সঙ্গে পেরেছি, কথাবার্তা বলেছি। চিঠি-চাপাটি দিয়েছি। দলিল টলিল সব আমার হাতে আছে। কার নামে কী আছে, আর কাকে কে কী দিয়ে গেছে, সে সব কাগজপত্তরও আমি রেখে দিয়েছি।"

মা যোগদানন্দমামাকে দুপুরে খেয়ে যেতে বলেছিলেন। অনেক কাজ আছে বলে তিনি বিদায় নিয়ে চলে গেছলেন। তিনি চলে যাবার পর, বাবা হাতের ঘড়ি দেখে বলেছিলেন, "এখন আর বাজারে গিয়ে কিছু পাব?"

মা বলেছিলেন, "রবিবারের বাজারে এত বেলায় কিছুই পাবে না। ওবেলা বরং যেও।"

গোগোল জিজ্ঞেস করেছিল, "উনি কি আমাদের নেমন্তন্ন করতে এসেছিলেন?"

বাবা বলেছিলেন, "তা একরকম তা-ই বলা যায়।"

মা গম্ভীর মুখে বলেছিলেন, "যত সব ঝামেলা। আমার একটুও যাবার ইচ্ছে নেই।"

বাবা কিছু না-বলে হেসেছিলেন। গোগোলকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুমি খেলতে যাবে না?"

রবিবারে সেই সময়ে গোগোলের বন্ধুরা নীচে খেলায় জুটে গেছল। বাবার কথা শুনে ও বুঝতে পেরেছিল, মা'র সঙ্গে বাবা কিছু কথা বলতে চান। ওর সেখানে না থাকাই উচিত। ও ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে নেমে গিয়েছিল।

॥ দুই ॥

রবিবারের পর আজ মঙ্গলবারও সন্ধ্যাবেলায় বাবা-মা'তে কথাবার্তা চলছে। যোগদানন্দমামা চলে যাবার পর থেকেই বাবা-মা'তে এরকম আলোচনা চলছে। আলোচনা যে যোগদানন্দমামার কথা নিয়েই, গোগোল তা বুঝতে পেরেছে। গোগোল বাবা-মা'র কোনো কথা যে শোনেনি, তা নয়। কিছু-কিছু কথা ওর কানে এসেছে। মা বলতে চান, হতে পারে বীরভূমের সেই

গাঁয়ে তাঁর পৈতৃক বাড়ি, কিন্তু তিনি সেখানকার কাউকেই চেনেন না। তাঁর জ্ঞাতি-সম্পর্কে দাদা যোগদানন্দকেও এই প্রথম দেখলেন। যোগদানন্দ কেন যেচে তাঁর ভুলে-যাওয়া বোনের উপকার করতে চান, মা তা বুঝে উঠতে পারছেন না। ভুলে যাওয়াই বা কেন ? মা তো সেখানে সকলের কাছেই অচেনা। মা'র মনে নানারকম সন্দেহ আর ভয়।

বাবার কথা অন্যরকম। বাবা বলতে চান, "ব্যাপারটা দেখতে-জানতে দোষ কী ? আমরা তো আর চুরি করতে যাচ্ছিনে। গুপ্তধনের সন্ধানেও যাচ্ছিনে। যোগদানন্দবাবু যা বলে গেলেন, সেটা একবার যাচাই করে দেখাই যাক না। ওঁর যদি কোনো খারাপ মতলব থাকে, সেখানে গেলেই তা জানা যাবে। উনি তো আর একলা সেখানে নেই। আরও অনেকেই আছেন। তারপর ওখানে গিয়ে যদি দেখা যায়, ব্যাপারটার মধ্যে গোলমেলে কিছু আছে, আমরা চলে আসব।"

বাবার কথায় মা সায় দিতে পারছেন না। মা'র কাছে ব্যাপারটা একটা উটকো ঝামেলার মতো লাগছে। সাতজন্মে যাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নেই, তাদের কাছে যাবার তাঁর ইচ্ছে নেই। তা ছাড়া, মা'র আরও ভয় হল, বিষয় সম্পত্তি ব্যাপারটা মোটেই ভাল নয়। বাপের বাড়ির সম্পত্তি থেকে মা কোনোদিন টাকা পাবার কথা ভাবেননি। ভাবতেও চান না, তা সে যত টাকাই হোক।

গোগোল বাবার শেষ কথা শুনেছে। মা'র কথায় বাবা মোটেই রাগ করেননি। বাবা বলেছেন, "এ নিয়ে তোমাকে আমি জোর করতে চাইনে। তুমি যা ঠিক করবে, তাই হবে। আমি বেশি কিছু বললে, তোমার মনে হতে পারে, আমি টাকার লোভ করছি।"

মা বোধহয় বাবার কথায় মনে দুঃখ পেয়েছেন। অবাকও হয়েছেন। বলেছেন, "তুমি টাকার লোভ করবে, এ-কথা আমি ভাবতে পারি ?"

বাবা হেসে বলেছেন, "ভাবতেও তো পারো।"

মা বেশ রেগেই বলেছেন, "যাও, তোমার সঙ্গে এ নিয়ে আমি আর কোনো কথা বলতে চাইনে।"

বাবা আবার হাসতে-হাসতে বলেছেন, "আহা, রাগ করছ কেন নীতি ! ও কথাটা আমি তোমাকে ঠাট্টা করে বলেছি। যাই হোক, ও সব নিয়ে আমরা আর কিছু ভাবব না।"

গোগোল মা'কে আর কিছু বলতে শোনেনি। ও ভাল বুঝতেও পারেনি, যোগদানন্দমামা ঠিক কী বলতে এসেছিলেন। কেবল এটুকুই বুঝেছে, বীরভূমের এক গ্রামে মা'র আসল পৈতৃক বাড়ি। সে-কথাও মা'র কাছে আগেই শুনেছে। সেই বাড়ি নিয়ে যোগদানন্দমামা এমন কিছু বলেছেন, যা থেকে মা অনেক টাকা পেতে পারেন। মা তা চান না। মা'র মনে কেমন একটা ভয় আর অবিশ্বাস আছে। যে-বাড়ির সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই, সে-বাড়িতে তিনি তাঁর কোনো দাবি রাখতে চান না। তা ছাড়া, যাঁদের তিনি চেনেন না, তাঁদের কাছে যেতেও মা রাজি নন। কিসের টাকা, আর কেমন করে মা তা পাবেন, গোগোল কিছুই আন্দাজ করতে পারেনি। আর বাবার ইচ্ছেটা হল, আসলে ব্যাপারটা কী, একবার দেখে আসতে ক্ষতি কী ?

মঙ্গলবার সন্ধের পরে, মা'র সঙ্গে কথা বলে, বাবা বেরিয়ে গেলেন। গোগোলের খুব জানতে ইচ্ছে হল, আসল ব্যাপারটা কী ? ও বাইরের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল, মা আপনমনে কাঁটা দিয়ে উল বুনছেন। ভেবেছিল, মা ওকে দেখতে পাননি। ও পড়ার টেবিলে ফিরে যাচ্ছিল। মা ডাকলেন, "শোনো গোগোল।"

গোগোল বাইরের ঘরে এল। মা জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কিছু বলছিলে ?"

গোগোলের মনে কৌতূহল ছিল। ও মিথ্যে কথা বলল না। বলল, "হ্যাঁ।"

"কী বলো তো ?"

গোগোল আগেই মা'কে দিয়ে কাঁড়িয়ে নিতে চাইল, "তুমি রাগ করবে না তো ?"

মা হেসে বললেন, "না, রাগ করব না।"

গোগোল নিশ্চিন্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "যোগদানন্দমামা কী বলে গেলেন, আর তোমাতে-বাবাতে কী কথা হচ্ছে, আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে। আমার খুব জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

মা গোগোলের কথা শুনে চুপ করে রইলেন। আপনমনে বুনতে-বুনতে একটু ভাবলেন। তারপরে বোনা রেখে, মা বললেন, "এ সব বড়দের কথা। তুমি সব বুঝবে না। তবে তোমার যখন খুবই জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, একটু বুঝিয়ে বলি। যোগদানন্দদাদা বলছেন, বীরভূমে আমাদের সেই বাড়ির সামনে এখন হাইওয়ে হয়ে গেছে। ইলেকট্রিক এসেছে। কলকাতার একটা বড় কোম্পানি আমাদের সেই বাড়ির অনেকটা অংশ কিনে একটা কারখানা বানাতে চাইছে! যোগদানন্দদাদা বলছেন, সেই বাড়িতে আমার নামেও অনেকটা অংশ আছে। কোম্পানি বাড়ি-জমি কিনলে, আমিও নাকি অনেক টাকা পাব। এই হল ব্যাপার। এসব বলছেন যোগদানন্দদাদা। আমি তো আসলে কিছুই জানিনে। ওখানে কাউকে চিনিনে। আমার কাছে তো এমন কোনো কাগজপত্র নেই, সত্যি জানতে পারব যে, আমারও ওখানকার জমি-বাড়িতে অংশ আছে। কোথায় কাদের মাঝখানে গিয়ে পড়ব, কে জানে! আমার ওসব ঝামেলায় যেতে ইচ্ছে নেই। তোমার বাবার ইচ্ছে, সত্যি ব্যাপারটা কী, একবার দেখে আসবেন। হয়তো তোমার বাবা ঠিক কথাই বলছেন। কিন্তু আমার কেমন ভয় করে।"

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "কেন তোমার ভয় করে ?"

মা বললেন, "ওসব তুমি বুঝবে না। বিষয়-সম্পত্তি টাকা-পয়সা বড় খারাপ জিনিস। কার কী মতলব আছে, কেউ বলতে পারে ? আমরা তো বেশ আছি। কী দরকার ওসব ঝামেলায় যাবার ? তোমরা যা খুশি তাই করতে পারো। আমি তো আর তোমাদের কাছে কিছু চাইতে যাচ্ছিনে। যাই হোক, তোমার জানতে ইচ্ছে হয়েছিল, তাই বললাম। ওসব নিয়ে তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। পড়তে যাও।"

মা ঠিকই বলেছেন। ওসব নিয়ে গোগোলের ভাববার কিছুই ছিল না। কিন্তু ও বলল, "আমার সেই লঙ্কাপুরীটা খুব দেখতে ইচ্ছে করে।"

মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কোন্ লঙ্কাপুরী ?"

"তুমি সেই তোমাদের যে বিরাট বাড়িটার কথা বলেছিলে, সেইটা।"

মা বললেন, "সেটা তো শ্মশানের মধ্যে যেন একটা বিরাট পুরনো রাজপুরী। সেখানকার কথাই হচ্ছে। সেখানে গিয়ে তুমি কী দেখবে ? ভূত ?" মা হেসে ফেললেন। আবার বললেন, "সেখানে কিছুই দেখবার নেই।"

মা এক কথায় গোগোলের ইচ্ছেটাকে নাকচ করে দিলেন। কিন্তু গোগোলের আসল কৌতূহল, সেই বাড়িটা দেখবে। ভূত কি সত্যি আছে ? গোগোল জানে না। ভূতের কথা ভাবলেই অবশ্য ভয় করে। কেন না, সে যে কী জিনিস, না দেখতে পেলেও সে নাকি হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। আর ঘাড় মটকায়। ভয় তো করবেই। আবার সেই ভূত দেখার জন্যই মনে কেমন একটা ভারী কৌতূহলও হয়। তা সে হাওয়ায় ভেসে ফিস্‌ফিস্ করুক, আর ভয়ংকর চেহারা নিয়েই দেখা দিক। গোগোলের যে সত্যিই একবার দেখতে ইচ্ছেও করে। জরাইকেলায় অজগরের কাণ্ডকেও তো অনেকে ভুতুড়ে ব্যাপার মনে করেছিল। প্রকাণ্ড অজগর যে একটা ছোটখাটো মানুষকে তিন চার দিনে গিলে খেয়ে ফেলতে পারে, এটা কারও মাথায় আসেনি। সবাই ভেবেছিল, ভূতে লোপাট করে নিয়ে গেছে। তা ছাড়া, ভয়ংকর ডাকাতদের থেকেও কি ভূত আরও ভয়ংকর হয় ? গোগোল বুঝতে পারে না, ভূত নিয়ে ওর যেমন ভয় আছে, তেমনি কৌতূহলও খুব আছে। কিন্তু কে আর ওকে ভূত দেখাচ্ছে ? মা'দের সেই বাড়িটার সম্পর্কে কত কথাই শুনেছে। লঙ্কাপুরী, দৈত্যপুরী, শ্মশানের মাঝে পুরনো রাজপুরী। একবার দেখতে ইচ্ছে হয় না ?

গোগোল পড়তে বসে এসব একটু ভাবল। তারপরে পড়ায় মনোযোগ দিল।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলাতেই অবাক কাণ্ডটা ঘটল। সন্ধ্যাবেলা পড়তে বসলেও, বাবা যখন বাড়ি ফেরেন, ও ঠিক কান রাখে। বাবা ঠিক সময়ে বাড়ি ফিরলে ওর মন ভাল হয়ে যায়। মা-বাবার গলা শুনতে পায়। কিন্তু পরের দিন বাবা বাইরের ঘরে ঢুকেই বললেন, "নীতি, আজ রামপুরহাটে আমাদের কোম্পানির এজেন্টকে ট্রাংককলে খবর দিয়ে দিয়েছি। বলে দিয়েছি, সে যেন আগামীকালই যোগদানন্দবাবুকে গিয়ে জানিয়ে দেয়, আমরা পরশু ভোরের ট্রেনে রওনা হচ্ছি। আর, রামপুরহাট থেকে সেই গ্রামে যাবার জন্য যেন আমাদের একটা গাড়ির ব্যবস্থা রাখে।"

পড়ার টেবিলে বসে গোগোল বাবার কথাগুলো শুনল। প্রথমে যেন কিছু বুঝেই উঠতে পারল না। রামপুরহাটের এজেন্টকে ট্রাংককল করা, আর যোগদানন্দবাবুকে খবর দেওয়া মানে ? আশ্চর্য! গোগোল কি বোকা হয়ে গেল ? মানে তো বাবার কথাতেই পরিষ্কার। "পরশুদিন ভোরের ট্রেনেই রওনা হচ্ছি" মানেই বীরভূমের সেই গ্রামে যাওয়া হচ্ছে! আর সেই গ্রামে যাবার জন্য একটা গাড়ির ব্যবস্থাও রাখতে বলা হয়েছে। কিন্তু বাবা-মা'তে এ যাওয়াটা ঠিক হল কখন ? কিছুই টের পায়নি। এও যেন একটা ভৌতিক কাণ্ড

গোগোল মা'র গলা শুনতে পেল, "এটাও বলে দিয়েছ তো, সেই গ্রামে না থাকতে পারলে আমাদের জন্য যেন রামপুরহাটে থাকবার কোনো ব্যবস্থা রাখে ?"

বাবার গলা শোনা গেল, "হ্যাঁ, সে-কথাও বলে দিয়েছি। এজেন্ট বলেছে, কোনো অসুবিধে হবে না। রামপুরহাটে থাকবার ভাল ব্যবস্থাই রাখা হবে। আমি অফিস থেকে এক সপ্তাহের ছুটি নিয়েছি। আর কোনো কাজ না হোক, এজেন্টের গাড়িতে করে, বক্রেশ্বর, তারাপীঠ, মাসানজোর, এই জায়গাগুলোয় বেড়িয়ে তো আসা যাবে। সময়টাও খারাপ নয়। এখনও একটু ঠাণ্ডার আমেজ আছে। অল্প-স্বল্প গরম জামাকাপড় নিয়ে নিও। ওদিকে বোধহয় ঠাণ্ডা একটু বেশিই থাকবে।"

গোগোল যত শুনছিল, ততই মনে-মনে উত্তেজিত হচ্ছিল। তা হলে শেষ পর্যন্ত যাওয়া হচ্ছে! সেই লঙ্কাপুরী না দৈত্যপুরীতে ? নাকি শ্মশানের রাজপুরীতে ? ভেবে গোগোলের পড়াশোনা মাথায় ওঠার যোগাড়। ঠিক তখনই মা ঢুকলেন ওর ঘরে। জিজ্ঞেস করলেন, "গোগোল, তোমার উইকলি টেস্টের আর বাকি কত ?"

গোগোল অবাক হয়ে বলল, "সে তো গত সপ্তাহেই শেষ হয়ে গেছে। ফার্স্ট টার্ম পরীক্ষার আর এক মাস বাকি আছে।"

মা বললেন, "বাঁচা গেল। আগামীকাল ক্লাস-আন্টিকে আমি একটা চিঠি লিখে দেব, নিয়ে যাবে। এক সপ্তাহের ছুটির দরখাস্ত সেটা। আমরা পরশু দিন ভোরের ট্রেনে বীরভূমের সেই গ্রামে যাচ্ছি।"

গোগোলের মুখে হাসি, চোখে খুশির ঝিলিক। বলল, "মা, আমি বাবার সব কথা শুনতে পেয়েছি।"

মা মুখ গম্ভীর করে থাকতে পারলেন না। চলে যেতে-যেতে হেসে বললেন, "তা আর শুনতে পাবে না ? লেখাপড়ার নাম নেই, খালি ওসব কথায় তোমার মন পড়ে থাকে।"

সত্যি কি তাই ? গোগোল তো নিজের পড়াই করছিল। বাবার

কথাগুলো ওর কানে ভেসে এলে ও কী করবে ? মা অবশ্য ওরকম বলেই থাকেন। মা'র সব সময় ভয় আর ভাবনা, গোগোল পড়াশোনা ঠিকমতো করছে কি না। বাবাও ভাবেন, তবে মা'র মতো এত বলেন না।

মা ঘর থেকে চলে যেতেই গোগোল লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠল। দেওয়ালে টাঙানো ব্রুস লি-র রঙিন ছবিটার দিকে একবার দেখল। তারপর ক্যারাটের ভঙ্গিতে, কয়েকবার হাত-পা ছুঁড়ল শূন্যে। ছুঁড়েই দরজার দিকে তাকিয়ে থেমে গেল। মা দেখলে রেগে যাবেন। কিন্তু গোগোল যে কী খুশি হয়েছে, তা বোঝাবে কেমন করে ? ও আবার পড়ার টেবিলে গিয়ে বসল। অথচ, বেচারি গোগোল ! ও কী করবে ? ওর চোখের সামনে ভাসছে এক কাল্পনিক দৈত্যপুরী। আর ভূতের গল্পের বইয়ের ছবিতে দেখা যত ভূতের সব বিকট মূর্তি।

গোগোল কি এবার সত্যি আসল ভূতের দেখা পাবে ?

॥ তিন ॥

শুক্রবার গোগোলরা রামপুরহাট স্টেশনে পৌঁছুল প্রায় বেলা সাড়ে বারোটায়। সঙ্গে ছিল দুটো মাঝারি আকারের স্যুটকেস্। একটি টিফিন কেরিয়ার। আর তোয়ালে টুথপেস্ট ব্রাশ ইত্যাদির জন্য একটি ছোট ব্যাগ। তার মধ্যেই জলের বোতল। দূরে আর কাছে, যেখানেই যাওয়া হোক, মা একটু কিছু খাবার আর পানীয় জল সঙ্গে নেন।

ট্রেন থেকে নামতেই, প্রায় বাবার বয়সী এক ভদ্রলোক সামনে এসে দাঁড়ালেন। ছিপছিপে রোগা। নীল স্যুট পরা। সাদা শার্টের গলায় পরেছেন লাল টাই। চুলের মাঝখানে সিঁথি। চোখে চশমা। দু'হাত তুলে বাবাকে নমস্কার করে হেসে বললেন, "নমস্কার স্যার। ট্রেনটা সময়মতোই এসেছে। পথে কোনো কষ্ট হয়নি তো ?"

বাবাও হেসে, দু'হাত কপালে তুলে নমস্কার করে বললেন, "এই যে মিঃ চৌধুরী, এসে গেছেন ? না, ট্রেনে কোনো কষ্ট হয়নি। তবে একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। এখান থেকে সেই গ্রামটা কত দূর ?"

মিঃ চৌধুরী বললেন, "শিমুলগড়ের কথা বলছেন তো স্যার ? বেশি দূরে নয়, বত্রিশ কিলোমিটার। নতুন হাইওয়ে দিয়ে যেতে আধ ঘণ্টার বেশি সময় লাগবে না। হাইওয়ে থেকে, এক কিলোমিটার ভেতর দিকে—লাল মাটির শক্ত কাঁকুরে রাস্তা। গাড়ি অনায়াসেই চলে যাবে।"

গোগোল দেখছিল, স্টেশনটা মোটামুটি বেশ বড়ই। ওর মনে হয়েছিল, হয়তো স্টেশনটা হবে খুবই ছোট। প্ল্যাটফর্ম থাকবে ফাঁকা। কিন্তু দেখা গেল, যাত্রীর ভিড় বেশ। প্রচুর হকার ; খাবার আর চায়ের চলমান স্টল। রেলওয়ে কেটারিংয়ের খাবার-ঘরও আছে। বাবা তাঁর পাঞ্জাবির হাতা সরিয়ে ঘড়ি দেখে বললেন, "তা হলে আমরা দুপুর দেড়টা নাগাদ নিশ্চয়ই পৌঁছে যাব।"

মিঃ চৌধুরী খুব অমায়িক হেসে বললেন, "এখুনি কোথায় যাবেন স্যার ? এখানে একটা বাংলোয় আমরা সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। এখন সেখানে গিয়ে চান-টান করে খেয়ে একটু বিশ্রাম করে নেবেন। তারপরে যাবেন। আপনার আত্মীয় যোগদানন্দ মুখার্জিকে আমি সেইরকমই বলে রেখেছি।"

বাবা মা'র দিকে তাকালেন। তারপরে হঠাৎই যেন বাবার মনে পড়ে গেল। তিনি মা আর গোগোলের সঙ্গে মিঃ চৌধুরীর পরিচয় করিয়ে দিলেন। মাকে বললেন, "মিঃ চৌধুরী আমাদের কোম্পানির এ অঞ্চলের এজেন্ট।"

মিঃ চৌধুরী মা'কে দু'হাত তুলে নমস্কার করলেন। মা'ও করলেন। গোগোল কপালে হাত তুলে নমস্কার করতে যাচ্ছিল। মিঃ চৌধুরী গোগোলের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে হ্যাণ্ডশেক করে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন আছ ? এটা অবশ্য আমার দেশ নয়। তবে এই লাল মাটির দেশটা তোমার হয়তো ভালই লাগবে। আমার তো খুব ভাল লাগে।"

গোগোলদের স্যুটকেস্ দুটোর সামনে একজন কুলি দাঁড়িয়ে ছিল। সে-ই ট্রেনের কামরা থেকে স্যুটকেস্ দুটো নামিয়েছে। মা-বাবা দু'জনে কিছু বলাবলি করলেন। মিঃ চৌধুরী গোগোলকে ছেড়ে বাবা-মা দুজনকেই বললেন, "কোনো কিন্তু-কিন্তু করবেন না। গাড়িটা এখানে এমন অসময়ে আসে, আমি ইচ্ছে করেই আপনাদের চান-খাওয়া বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছি। সেই কোন্ ভোরে বেরিয়েছেন ভাবুন তো ! চলুন, আর এখানে দাঁড়িয়ে কোনো কথা নয়।" মিঃ চৌধুরী কুলিকে স্যুটকেস্ দুটো তুলে নিতে বললেন। আর নিজেই ছোট ব্যাগটা হাতে নিতে গেলেন।

মা তাড়াতাড়ি বাধা দিলেন। ব্যাগটা হাতে নিয়ে হেসে বললেন, "ওটা আমি নিচ্ছি।"

মা ছোট ব্যাগ আর টিফিন কেরিয়ার এক হাতে তুলে নিলেন। গোগোলরা যে-ট্রেনে এসেছে, সেটা তখনও প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিল। মিঃ চৌধুরী বাইরে যাবার গেটের পথ দেখিয়ে এগিয়ে গেলেন। কুলি স্যুটকেস্ দুটো দু হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে চলল। স্টেশনটা মোটেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয়। নানা রকমের গরিব লোক এখানে-সেখানে জড়ো হয়ে বসে আছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার গেরুয়া পোশাক-পাগড়িপরা সাধু। তাদের মোটেই রেলের যাত্রী বলে মনে হচ্ছিল না।

স্টেশনের বাইরের চত্বরটাও নোংরা। চত্বরের ভেতরে লাইন দিয়ে সাইকেল-রিকশা দাঁড়িয়ে ছিল। লোকের ভিড়ও কম নেই। গাড়ি মাত্র একটাই দাঁড়িয়ে ছিল। একটা ভ্যান আর ট্রাক দাঁড়িয়ে ছিল। একপাশে। মিঃ চৌধুরী ড্রাইভারকে ডাকতেই সে নেমে এল। পিছনের কেরিয়ার খুলে দিল। কুলি স্যুটকেস্ দুটো তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। বাবা তাকে ভাড়া দেবার আগেই মিঃ চৌধুরী মানিব্যাগ বের করে দিতে যাচ্ছিলেন। বাবা ব্যস্ত হয়ে বাধা দিয়ে বললেন, "না না মিঃ চৌধুরী, ওটা আপনি দেবেন না। আমি দিচ্ছি।"

বাবা কুলিকে ভাড়া মিটিয়ে দিলেন। মিঃ চৌধুরী বললেন, "এটা আর এমন কী ব্যাপার স্যার। আপনারা তো এসব ছোটখাটো জায়গায় তেমন আসেনই না। আমরা আপনাদের কোনো সেবাই করতে পারি না।"

* ঘন ফেনা; মোলায়েম ত্বক আর সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি

* দীর্ঘস্থায়ী মনমাতানো গন্ধ

লাবণ্যের ছোঁয়া... প্রতিটি সাবানেই

প্রিক্স
টয়লেট সোপ

Prix
Toilet Soap

* ত্বকের প্রয়োজনীয় সবরকম তেলের পরিচর্যা... ...হাজার ফুলের সুরভী বয়ে আনে

অ্যাসকো-র আর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

SAA/ASC/5A BEN

হয়তো খাওয়াদাওয়াও বেশ ভাল হবে। কিন্তু গোগোলের একদম এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না। ওকে শিমুলগড়ের সেই পুরনো দৈত্যপুরীই টানছে। এরকম ভাল বাড়িতে তো অনেক জায়গাতেই থাকা হয়েছে। ভুতুড়ে শ্মশানপুরীতে তো কখনও থাকতে হয়নি। ও মনে-মনে বেশ উৎকণ্ঠা নিয়ে বাবা-মা'র দিকে তাকাল। তাঁরা কী বলেন, শোনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল।

মা'র দিকে তাকিয়ে বাবা হেসে বললেন, "মিঃ চৌধুরীর প্রস্তাবটা তো ভালই, তাই না সুনীতি ? অবশ্য যদি শিমুলগড়ে থাকতে সত্যি তেমন কোনো অসুবিধে হয়।"

মা বললেন, "আমার তো মনে হয়, শিমুলগড়ে থাকতে অসুবিধে হবেই। বাথরুম-টাথরুমের কী ব্যবস্থা আছে, থাকবার ঘর, বিছানা কী রকম জুটবে, কিছুই বুঝতে পারছি না। কিন্তু···" মা যেন একটু অস্বস্তিতে হেসে মিঃ চৌধুরীকে দেখিয়ে বললেন, "এখানে কয়েকদিনের থাকতে হলে ওঁদের অসুবিধেয় ফেলা হবে না ?"

"আপনি আমাদের অসুবিধের কথা বলছেন, ম্যাডাম ?" মিঃ চৌধুরীর দু'চোখ যেন কপালে উঠল। তারপরে হেসে বিগলিত হয়ে বললেন, "কী যে বলেন, ম্যাডাম। আপনারা এখানে এক মাস থাকলেও আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না বরং আপনারা এখানে থাকলে আমরা খুব খুশি হব। মনে করব, এটা আমাদের একটা মস্ত সৌভাগ্য।"

মিঃ চৌধুরীর কথা শুনে এবার গোগোলের পিত্তি জ্বলে গেল। ভদ্রলোক যে কেন বাবাকে এত তোষামোদ করছেন, ও কিছুই বুঝতে পারছে না। কোম্পানির এজেন্ট হলেই কি অফিসারকে এরকম তোষামোদ করতে হয় ? বাবা বললেন, "আগে শিমুলগড়ে যাই। সেখানে কী ব্যবস্থা, সব দেখা যাক। তারপরে ঠিক করা যাবে, আমরা কোথায় থাকব।"

মা বললেন, "সেই ভাল। আমিও তো ঠিক জানিনে, যোগদানন্দদাদা কী ব্যবস্থা করেছেন। সব দেখেশুনেই ঠিক করা যাবে।"

গোগোল বাবা-মা'র কথা শুনে একটু স্বস্তি পেল। কিন্তু মিঃ চৌধুরী যেন ঠিক খুশি হতে পারলেন না। বললেন, "জোর করার তো কিছু নেই, স্যার। আপনারা যা ভাল বুঝবেন, তাই করবেন। তবে আমি বলেই রাখলাম, শিমুলগড়ে থাকার কোনোরকম অসুবিধে বুঝলে, সোজা এখানে চলে আসবেন। কোনো সংকোচ করবেন না। আরও একটা কথা বলে রাখি, স্যার। দোতলায় আপনারা দুটো ঘর ব্যবহার করতে পারেন। সেরকম ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি।"

"আপনাকে অনেক ধন্যবাদ মিঃ চৌধুরী।" বাবা বেশ খুশি হয়ে বললেন, "মনে হয় দরকার হবে না। হলে, আমরা দুটো ঘর ব্যবহার করব।"

এই সময়েই রাম অবতার একটা ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল। ট্রে রাখল সেন্টার টেবিলের ওপর। দেখা গেল, কেবল চায়ের পট আর কাপ-ডিশ নেই। একটা প্লেটে বিস্কুট, আর একটা প্লেটে বড় বড় সন্দেশ ভরতি। তিন গ্লাস জল। দেখে বাবা যেন একটু অস্বস্তি বোধ করে হেসে বললেন, "এখন আবার এসব বিস্কুট মিষ্টি আনালেন কেন ? এক কাপ চা-ই যথেষ্ট। একটু পরেই তো আমরা দুপুরের খাবার খাব।"

মিঃ চৌধুরীর সব ব্যাপারটাই গোগোলের কাছে বাড়াবাড়ি মনে হল। মিঃ চৌধুরী হাত জোড় করে বললেন, "এ আর এমন কী বেশি হল, স্যার ? সেই কোন্ সকালে বেরিয়েছেন। তা ছাড়া মাস্টার গোগোল তো কিছু খাবে ?"

গোগোল বলল, "আমি বর্ধমান স্টেশনে সকালের জলখাবার অনেক খেয়েছি।"

"বটে ?" মিঃ চৌধুরী যেন ঠাট্টা করে হাসলেন। বললেন, "সে তো তোমার কখন হজম হয়ে গেছে। এখন মিষ্টি আর বিস্কুট খাও। আর চা হয়তো তুমি খাবে না। তোমার জন্য দুধ আনতে বলি ?"

গোগোল প্রায় ঝেঁজেই কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই মা বললেন, "না না, এখন দুধ-টুধ দিতে হবে না। ইচ্ছে হলে, গোগোল একটু মিষ্টি খেয়ে জল খেয়ে নেবে। আপনার আর এসব নিয়ে ভাবতে হবে না।"

মিঃ চৌধুরী নীল কোটের হাতা সরিয়ে ঘড়ি দেখে বললেন, "যাবার আগে আপনাকে দু'একটা কথা বলে যাই, স্যার। যে-গাড়িতে আপনারা স্টেশন থেকে এলেন, সেই গাড়িই আপনাদের শিমুলগড়ে নিয়ে যাবে। গাড়ি এখানেই থাকবে। ড্রাইভারের নাম নিতাই দাস। ও এখানকারই ছেলে। শিমুলগড় ওর চেনা জায়গা। ও আপনাদের সঙ্গেই গাড়ি নিয়ে থাকবে।"

"তা হলে, আমরা যদি শিমুলগড়ে থাকি, নিতাইয়েরও একটা থাকবার ব্যবস্থা করতে হবে।" বাবা চিন্তিত হয়ে বললেন।

মিঃ চৌধুরী হেসে বললেন, "ওর জন্য কিছু ভাববেন না। ও ওর থাকবার ব্যবস্থা নিজেই করে নেবে। আর আমি যোগদানন্দবাবুকে বলে রেখেছি, তিনি যেন আজ বিকেল তিনটে থেকে বাড়ির বাইরে এসে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করেন। তা নইলে আপনাদের পক্ষে চিনে, ভেতরে গিয়ে ওঁর আস্তানা খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।"

রাম অবতার ইতিমধ্যে কাপে চা ঢেলে দিয়েছিল। বাবা বললেন, "অনেক ধন্যবাদ মিঃ চৌধুরী। আপনাকে আর আটকাব না। অনেক সময় নষ্ট করে দিয়েছি। আপনি আপনার কাজে যান।"

"কী যে বলেন, স্যার।" মিঃ চৌধুরী গদগদ হেসে বললেন, "সময় আমার একটুও নষ্ট হয়নি। তা হলে আমি এখন যাই। কিন্তু বলা রইল স্যার, শিমুলগড়ে অসুবিধে হলে এখানে চলে আসতে কোনোরকম সংকোচ করবেন না।"

মিঃ চৌধুরী বেরিয়ে গেলেন। গোগোল যেন মনে একটু শান্তি পেল। ও সন্দেশের প্লেটের দিকে তাকাল। মনে হল, সত্যি খিদে পাচ্ছে।

॥ চার ॥

বিকেল সাড়ে তিনটে। গাড়ি হাইওয়ে থেকে ডান দিকে লাল মাটির কাঁকুরে রাস্তায় মোড় নিল। আশেপাশে অনেকগুলো বড়-বড় গাছ। এক রকমের গাছ নয়, নানা রকমের; বড় গাছগুলোর নাম জানা নেই গোগোলের। গাড়ি ডান দিকে মোড় নিতেই, চারপাশে ভাঙাচোরা বাড়ির ইঁটের ঢিবি দেখা গেল। নিতাই বলল, "এখান থেকেই শিমুলগড়ের শুরু। আমরা শুনেছি, এখানে নাকি বড় সিং-দরজা ছিল। এখন সব ভেঙে পড়েছে। এই যে সব ইঁটের ঢিবি দেখছেন, সবই রাজবাড়ির ভাঙা পাঁচিলের। শিমুলগড়ের রাজবাড়ি মানে একটা গোটা গ্রাম। সবটাই নাকি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল।"

গোগোল তখন দেখছিল, বড়-বড় গাছের ফাঁকে দু'তিনটে পুরনো মন্দির। মন্দিরগুলোর দেওয়ালের পলেস্তারা কবেই খসে পড়েছে। ছোট ছোট ইঁটগুলো যেন দাঁত খিচোনোর মতো বেরিয়ে পড়েছে। আর এক-এক জায়গায় হাড়ল গর্তগুলোকে দেখাচ্ছে সুড়ঙ্গের মতো। মন্দিরগুলোর মাথা থেকে সারা গায়েই অশ্বত্থের শিকড় যেন সাপের মতো জড়িয়ে ধরেছে। দেখলেই বোঝা যায়, মন্দিরগুলোতে পূজাপাট কিছুই হয় না।

নিতাই আস্তে-আস্তে গাড়ি চালাচ্ছিল। তার কথা শুনে বাবা বললেন, "শিমুলগড় যেন মোগল আমলের কেল্লার মতো। কেল্লার ভেতরেই যেমন বাড়িঘর সব থাকে, সেইরকম। শিমুলগড়ের ভেতরে দোকানপাট-হাট-বাজারও ছিল নাকি ?"

নিতাই বলল, "তা জানিনে স্যার। কোনোদিন শুনিনি।"

মা বললেন, "আমার তা মনে হয় না। শিমুলগড়ের রাজবাড়ি

তো কেল্লা ছিল না। তবে শুনেছি, আমার বাবার অনেক আগের পূর্বপুরুষরা সেপাই-বরকন্দাজ পুষতেন। হাতিঘোড়াও ছিল।"

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "সেই সেপাই বরকন্দাজ হাতিঘোড়া সব কোথায় গেল?"

"বোকার মতো কথা বোলো না গোগোল।" মা ধমকের সুরে বললেন, "সে সব তো প্রায় একশো দেড়শো বছর আগের কথা। কোথায় আবার যাবে? অবস্থা খারাপ হলে সব যেমন আস্তে-আস্তে নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি সব বিদেয় হয়ে গেছে। এখন কি আর শিমুলগড়ে সেই রাজারা আছেন যে ওসব থাকবে?"

গাড়িটার গতি আরও কমে এল। বাঁ দিকে দেখা গেল, বিশাল বড় আর মোটা-মোটা থাম অনেকগুলো দাঁড়িয়ে আছে। থামের গায়ের পলেস্তারা খসে পড়েছে সেই মন্দিরগুলোর মতোই। কিন্তু মাথার ওপরের ছাদ ধসে পড়েছে অনেকটা। স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে পুরনো ইঁটের পাহাড়। ভিতরের দিকটা অন্ধকারমতো। তবু তার মধ্যেই দেখা যাচ্ছে দরজা-খোলা ঘর। আসলে দরজার কাঠের চৌকাঠ-পাল্লা বলে কিছুই নেই। ভিতরে কি মানুষ আছে? গোগোল ভাবল। থামগুলোর সামনেই লম্বা কয়েক ধাপ সিঁড়ি কেমন করে অনেকটা আস্ত রয়েছে, কে জানে।

বাঁ দিক থেকে চোখ ফেরাতেই ডান দিকে চোখে পড়ল আর-এক মস্ত দোতলা বাড়ি। একতলা দোতলায়, বাঁ দিকের বাড়িটার মতোই, রয়েছে বড়-বড় থাম। কিন্তু ছাদ ধসে পড়েনি। পলেস্তারা খসে পড়েছে বেশির ভাগ দেওয়ালেরই। আর খিচোনো দাতের মতো ছোট-ছোট ইঁট বেরিয়ে পড়েছে। নীচের সিঁড়ি, ছাদ আঁটা বারান্দা, ভিতরের ঘরগুলোর দরজা-জানালাও সব আছে। কিন্তু দোতলার চেহারা দেখলে ভয় লাগে। দুটো প্রকাণ্ড থামের ওপরদিক খানিকটা ভেঙে পড়েছে। আর তার ওপর ভর করা ছাদের অংশ যেন হুমড়ি খেয়ে পড়বার মতো। অশ্বত্থের চারা দোতলার সবখানেই গজিয়ে উঠেছে। ওপরের বারান্দার লোহার রেলিং নেই কয়েক জায়গায়।

গোগোল অবাক হয়ে দেখল, নীচের এবড়ো-খেবড়ো বারান্দায়, চেয়ারে একজন বৃদ্ধ মানুষ বসে আছেন। বৃদ্ধ মানুষটির গায়ে একটা চাদর জড়ানো। হাতে একটা বই। তার মানে, ওই বাড়িটার নীচের তলায় লোকজনের বাস আছে? বৃদ্ধ ভদ্রলোকের চোখে চশমা। তিনি একবার মুখ তুলে গোগোলদের গাড়িটার দিকে তাকালেন। কিন্তু মোটেই অবাক হলেন না, বা তাঁর কোনো রকম কৌতূহলও দেখা গেল না। একবার মুখ তুলে দেখেই আবার চোখ নামিয়ে নিলেন।

নিতাই তখনও গাড়িটা খুব আস্তে চালিয়ে নিয়ে চলেছে সামনের দিকে। লাল কাঁকুরে রাস্তার দু' ধারেই ছড়িয়ে আছে নামা মাপের ইঁটের টুকরো। ছোটখাটো ইঁটের ঢিবি। আর সেগুলোকে দু'পাশে সরিয়ে রেখেই যেন রাস্তাটা করে রাখা হয়েছে।

তারপরেই গোগোলের চোখে পড়ল, সামনে একটা স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে। মাথার ওপরে কী ছিল, বোঝা যায় না। একটা অশথের বড়সড় চারা মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। স্তম্ভটার বাঁ দিকে, পুরনো স্তূপের মধ্যে আর-একটা স্তম্ভের একটুখানি উঁকি দিচ্ছে। গাড়িটা সেই স্তম্ভের পাশ দিয়ে সোজা গেল। গোগোল সামনে তাকিয়ে দেখল, আর-একটা প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি। কিন্তু সে-বাড়িটার সামনে কোনো থাম নেই। দেওয়ালের পলেস্তারা কমই খসেছে। তবে গোটা বিশাল বাড়িটার গায়ে শ্যাওলা পড়ে যেন একটা কালচে দৈত্যপুরীর মতো দেখাচ্ছে। এক-এক জায়গার দেওয়ালে সাপের মতো আঁকাবাঁকা ফাটল ধরেছে। কেবল মাত্র কয়েক জায়গার দেওয়ালে হালকা লালচে রঙ দেখা যাচ্ছে। ওই রঙটাই কি বাড়িটার আসল রঙ ছিল?

গোগোল দেখল, সামনের বাড়িটার দোতলা-একতলায় কোনো বারান্দাও নেই। অথচ পুরনো রঙচটা দরজা-জানালার কিছু কিছু খোলা। দোতলায় অবশ্য কোনো দরজাই নেই। কেবল জানালা আছে। নীচের একতলায় দরজা-জানালা দুই-ই আছে। খোলা দরজা-জানালা দিয়ে, ঘরের ভিতর দিকে দিনের আলোও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু লোক কোথায়? কথাটা মনে হতেই, গোগোলের চোখ পড়ল দোতলার একটা খোলা জানালার দিকে। জানালার লোহার শিকের ফাঁকে একটা অদ্ভুত মুখ ও দেখতে পেল। মাথা-ভরতি ধূসর চুলের জটা। আর সেই রঙেরই মুখ। মুখটা যেন হিজিবিজি-কাটা। কিন্তু চোখ দুটো গোল, গর্তের মধ্যে ঢোকানো। গোল জুলজুলে চোখ দুটো গোগোলদের গাড়িটার দিকেই দেখছে। শুধু মুখটাই দেখা যাচ্ছে। শরীরের আর কোনো অংশ চোখে পড়ছে না। মুখটা কোনো পুরুষের না স্ত্রীলোকের, গোগোল কিছুই বুঝতে পারল না। কেবল গর্তে ঢোকানো গোল চোখ দুটোর চাউনি দেখে, ওর গাটা কেমন ছমছম্ করে উঠল।

গাড়িটা খুবই আস্তে চলছিল বলে গোগোল দোতলার জানালার সেই মুখ দেখতে পেল। গাড়িটা আর কয়েক গজ এগোতেই, দোতলা আড়ালে পড়ে গেল। বাঁ দিকে একটা একতলা বাড়ির একটা অংশে তাকাতে গিয়েই, গোগোলের দৃষ্টি টেনে নিয়ে গেল ডান দিকের একটা মন্দিরের দিকে। পিছনে ফেলে আসা মন্দিরগুলোর মতো এ-মন্দিরটা তেমন জরাজীর্ণ নয়। দেওয়ালের গায়ে এখনও কিছু পোড়া ইঁটের নকশা রয়েছে। বাকি অনেকটাই খসে পড়েছে। বেরিয়ে পড়েছে ছোট-ছোট পুরনো ইঁট। তবু মন্দিরটা প্রায় আস্ত আছে। উঁচু বাঁধানো দাওয়ায় ফাটল চোখে পড়ে। মন্দিরের লাগোয়া আবার একটা প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। বাড়িটার সামনের দিক বোধহয় অন্য দিকে। অনেক জায়গায় পলেস্তারা খসে পড়লেও, বাড়িটা যেন আস্তই দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িটার কাছে দুটো বড়-বড় গাছও মাথা তুলে আছে। সেই গাছের ফাঁকে, একটু দূরে, আর-একটা পুরনো বাড়ির চিলেকোঠা দেখা যায়।

গোগোলের মনে হল, বিশাল বড় বড় পুরনো বাড়ির গোলকধাঁধার মধ্যে ওরা ঢুকে পড়েছে। বাবাও ঠিক তখনই বলে উঠলেন, "সত্যি এক দৈত্যপুরীর মধ্যেই যেন আমরা ঢুকে পড়েছি। রূপকথার পাষাণপুরীর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। লোকজনও তো দেখছিনে।"

মা বললেন, "যোগদানন্দদাই বা কোথায় গেলেন।"

ড্রাইভার নিতাই গাড়িটা বাঁ-দিকের একতলা বাড়ির দিকে ঘোরাল। বলল, "সাহেব এখানেই গাড়িটা দাঁড় করিয়েছিলেন। এখান থেকে ভেতরে ঢুকেছিলেন।"

গোগোল দেখল, সামনের দোতালা বাড়ি, আর বাঁ-দিকের একতলা বাড়িটার মাঝখান দিয়ে একটা লাল সরু পথ চলে গেছে। সেই সরু পথ দিয়ে গাড়ি ঢুকবে না। নিতাই গাড়ি দাঁড় করাল। আর ঠিক তখনই দেখা গেল, যোগদানন্দমামা সেই গলির ভিতর থেকে হনহন্ করে বেরিয়ে আসছেন। সেই রকমই উঁচু করে পরা ধুতির ওপরে একটা ফতুয়া তাঁর গায়ে। পায়ে জুতো বা স্যাণ্ডেল কিছু নেই। কিন্তু বাঁ-হাতের কব্জিতে ঘড়ি বাঁধা আছে। তাঁর গুঁফো মুখে হাসি। গাড়ির সামনে এসে বললেন, "অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে এই মাত্তর আমি একটু ভেতরপানে গেছেলাম। রামপুরহাটের চৌধুরীবাবু আমাকে সব বল্যে গেছেন। এসো, এসো, নেমে এসো।"

গোগোল বসে ছিল গাড়ির সামনের আসনে। ও পিছন ফিরে বাবা-মায়ের দিকে দেখল। বাবা গাড়ির দরজা খুলতেই গোগোল তাড়াতাড়ি দরজা খুলে আগে নামল। নেমেই সামনের দোতলার জানালার দিকে চোখ তুলে তাকাল। কিন্তু জানালায় তখন আর সেই ধূসর জটা-চুল, হিজিবিজি কাটা মুখ আর গোল জুলজুলে চোখ

দুটো নেই।

বাবা-মা গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালেন। যোগদানন্দমামা বললেন, "মেয়ে জামাই নাতি এল, আসল লোকেরা তাদিগে দেখতে পেল না।"

"আসল লোক কারা?" বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

যোগদানন্দমামা বললেন, "ক্যানে, সুনীতির প্রপিতামহ প্রপিতামহীরা তো শিমুলগড়েই দেহরক্ষা করেছেন। তাঁরা তো আর বাইরে যেঁয়ে বাস করেন নাই। তবে ওর ঠাকুমা-ঠাকুর্দাও মাঝেমধ্যে এখানে যাওয়া-আসা কইরতেন। সুনীতি তাঁদিগে দেখেছ ত?"

মা বললেন, "ছেলেবেলায় কলকাতায় দেখেছি। তেমন ভাল মনে নেই।"

"থাকবে কী করে?" যোগদানন্দমামা হেসে বললেন, "তোমার ঠাকুর্দা রানিগঞ্জের কোলিয়ারিতে বড় চাকরি কইরতেন। তারপর রানিগঞ্জ থেক্যে কোম্পানির কলকাতা অফিসে বদলি হন। সেই থেক্যে কলকাতাতেই থাকতেন। বাপ-মাকে দেইখতে আইসতেন শিমুলগড়ে। নগদ টাকাকড়ি বাপকে দিতেন বটে, তবে দরকার ছিল না। চাষ-আবাদ তো কম ছিল না। সুনীতির প্রপিতামহ বেশ বড় অংশের ভাগিদার ছিলেন। তাঁর ছেলেমেয়েও কম ছিল। নাতি বলতে তো একমাত্তর সুনীতির বাবা। আর সুনীতির নিজের দাদা বা ভাই বলতে কেউই নাই। যারা আছে, সব আমার মতন জ্ঞাতি দাদা-ভাই। শিমুলগড়ের মুখুজ্যেরা ছড়িয়ে আছে গোটা ভারতবর্ষে। তা হলেই বুইঝত্যে পারছ, সুনীতি কতটা অংশের ভাগিদার? দলিলপত্তর সব..." তিনি হঠাৎ থেমে গিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে আর লজ্জা পেয়ে বললেন, "দ্যাখো আমার কী জ্ঞানগম্যি! তুমাদিগে এখানে দাঁড় করিয়ে রাজ্যের কথা পেড়ে বস্যেছি। চলো, চলো, ভিতরে চলো। এস গ ভাগ্নে। অনেক কিছু দেখেছ। রাবণের গুষ্টির এমন লঙ্কাপুরী দেখেছ?"

যোগদানন্দমামা গোগোলের একটি হাত ধরে, গলির দিকে পা বাড়ালেন। বাবা-মা আসতে লাগলেন পিছনে-পিছনে। গোগোল দেখল, একতলা বাড়িটা অনেকটা লম্বা। সারি-সারি থাম, আর অর্ধবৃত্তাকার খিলানের ভিতরে চওড়া বারান্দা। বারান্দার ভিতরে সারি-সারি ঘরের দরজা। কতগুলো থাম আছে, গোগোলের পক্ষে গোনা সম্ভব ছিল না। বেশির ভাগ থাম আর খিলানেরই পলেস্তারা খসে গেছে। কয়েক জায়গায় ছাদ হুমড়ি খেয়ে ভেঙে পড়ব-পড়ব করছে। কারণ থাম ভেঙে গেছে। ভিতরের দিকে কোনো দরজা খোলা, কোনোটা বন্ধ। একটা লোকও দেখা যাচ্ছে না। বারান্দা ধুলোয় ভরা। কোথাও কোথাও ফেটে চৌচির। ভিতরের ঘরগুলোর অবস্থা যে কেমন, তা বোঝা যাচ্ছে না। গোগোল জিজ্ঞেস করল, "এ-বাড়িতে কেউ নেই?"

যোগদানন্দমামা বললেন, "না বাবা, কেউ নাই। বাড়িটার যা অবস্থা, কখন কুথায় হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে, কেউ বইলতে পারে না। এ-বাড়িটাকে আগে বলা হত বার-মহল। আর এই যে দেখছ চত্বরটা, এটা হল এ-মহলের চক-মেলানো উঠোন। বাকি বাড়িগুলোর হল অন্দরমহল। সব মিলিয়ে এটা একটা মহল। বুইঝতে পারলে কিছু?"

গোগোল চারদিকে তাকিয়ে দেখল, ও আবার একটা গোলকধাঁধার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। সামনের মস্ত চত্বরের সামনে আর ডান দিকে দুটো বিরাট দোতলা বাড়ি। ডান দিকের বাড়িটার দোতলার ছাদ অনেকটা ধসে পড়েছে। নীচের তলাটাও পোড়ো ভাঙাবাড়ির মতো। থামগুলো ক্ষয়ে গেছে, ইঁট বেরিয়ে পড়েছে। দরজা-জানালাগুলোর কোনোটা বন্ধ, কোনোটা খোলা। সবই রঙচটা জরাজীর্ণ। সামনের বাড়িটার সারা গায়ে শ্যাওলা ধরলেও প্রায় আস্ত দাঁড়িয়ে আছে। কোনো-কোনো জায়গার দেওয়ালে, নতুন করে সিমেন্টের পলেস্তারার জোড়াতালি। দোতলার রেলিঙে কাপড়ও শুকোচ্ছে। থাম বারান্দা সবই মোটামুটি পরিচ্ছন্ন। এমনকী ইলেকট্রিকের তারও রয়েছে। অথচ লোকজন চোখে পড়ছে না একটাও। গোগোল যোগদানন্দর কথায় মাথা নেড়ে বলল, "না, বুঝতে পারছিনে।"

যোগদানন্দমামা হাহা করে হাসলেন। পিছন ফিরে একবার বাবা মায়ের দিকে তাকালেন। বললেন, "লোকে কথায় বলে সাতমহলা বাড়ি। আর শিমুলগড়ের এ-বাড়িতে আছে আটটা মহল। একুশটা বিরাট বাড়ি। তার মধ্যে ভিতরে আসবার পথেই দেখেছ কয়েকটা বাড়ি। সামনের দিকে দুটো বাড়ি একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। আবার এর মধ্যেই তুমি দেইখতে পাবে, বাগান-পুকুরও আছে।"

গোগোল তখনও সোজাই চলেছে যোগদানন্দমামার সঙ্গে। সামনের বাড়িটা ডান দিকে। বাঁ-দিকে একটা লম্বা পাঁচিল। নোনা-ধরা ইঁটের পাঁচিলের অনেক জায়গায় ভেঙে পড়েছে। মাঝখানে চার-পাঁচ ফুট চওড়া গলি। ডান দিকে বাড়ি, বাঁ দিকে পাঁচিল। গলিটা বেশ খানিকটা লম্বা। গলি শেষ হল একটা পুকুরের সামনে। পুকুরটা খুব বড় না। আবার ছোটও না। পুকুরের চারপাশেই রয়েছে কয়েকটা বড় গাছ। দু'দিকে দুটো পাকাঘাট। কিন্তু ঘাট ভাঙা-চোরা, অজস্র ফাটলে ভরতি। গোগোলের মনে হল, বিশাল বড়-বড় ইমারতের ধাঁধা থেকে হঠাৎ যেন বেরিয়ে এল অন্য এক পরিবেশে। আসলে কিন্তু তা নয়। পুকুরটার চারপাশে বড়-বড় কয়েকটা গাছ থাকলেও একদিকে রয়েছে বড় একটা বাগান। ফুলের নয়, ফলের বাগান। গোগোল ফলের গাছগুলো চিনতে পারল। বিরাট বড়-বড় আমগাছই বেশি। পেয়ারা জামরুল ছাড়াও রয়েছে তালগাছ। এতখানি ভিতরে ঢুকে, এই প্রথম দেখা গেল, শেষবেলার রোদ এখনও রয়েছে। বাঁ দিকে এখনও চলেছে সেই লম্বা পাঁচিল। পুকুরের দু'দিকে দুটো বিরাট দোতলা বাড়ি। কোনো বাড়িই আস্ত নেই। ছাদ ধসে পড়ছে, পলেস্তারা খসে পড়েছে দেওয়ালের, আর বিরাট বিরাট ফাটলের হাঁ-মুখগুলো দেখলে ভয় লাগে। কোনো বাড়িরই থাম বারান্দা কিছু নেই। দেখলেই বোঝা যায়, এটা দুটো বিশাল বাড়িরই পিছন দিক। ভাঙাচোরা পাঁচিলের গায়ে রয়েছে দরজা। সেই দরজা থেকে পায়ে-হাঁটা পথের দাগ নেমে এসেছে ঘাটের দিকে।

গোগোল দেখল, একটা ঘাটে একটি বউ ঘাটের নীচে পৈঠায় বসে অনেক থালা-বাসন মাজছে। তার মাথায় ঘোমটা ছিল না। সে গোগোলদের দিকে দেখেই তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টেনে দিল। পুকুর জুড়ে পানা না-থাকলেও, অনেক জায়গাতেই সবুজ পানা ভাসছে। আর একটা ঘাটে একটি বউ জলে গলা অবধি ডুবিয়ে, হাত দিয়ে পানা সরাচ্ছিল। অন্য ঘাটে যে বাসন মাজছিল, তার সঙ্গে হেসে হেসে কী কথা বলছিল। সেও গোগোলদের দেখে, তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিল। আর মাথায় ঘোমটা টেনে দিল।

গোগোল এরকম দৃশ্য গ্রামের পথেই দেখেছে। কিন্তু এরকম বিশাল দৈত্যপুরীর গোলকধাঁধার মধ্যে পুকুর বাগান দেখে অবাক লাগছে। বাগানের ফাঁকে, দূরে, আর-একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। পুকুরটা পেরিয়ে যাবার পরে আবার গলি। ডান দিকে বাড়ি, বাঁ-দিকে সেই পাঁচিল। গলিটা পেরিয়েই ওরা এসে পড়ল আর-একটা বিরাট চত্বরের সামনে। বাঁধানো চত্বরটার জায়গায়-জায়গায় নতুন করে বালি-সিমেন্টের জোড়াতালি দেওয়া হয়েছে। এখানে চত্বরের ডান দিকে বেশ খানিকটা খাস-জমি। জমির ওপারে একটা মন্দির। এখনও অনেকটা আস্ত। যদিও নকশা করা পোড়া ইঁট খসে পড়েছে অনেক, আর জায়গাগুলোতে দাঁত-খিঁচোনো ছোট-ছোট ইঁট বেরিয়ে পড়েছে। মন্দিরের মাথায় একটা ত্রিশূল। সেখানে রোদ রয়েছে। দরজা বন্ধ। মন্দিরের উঁচু দাওয়ায় একটা লোক শুয়ে আছে। মন্দিরের পিছনেই একটা বড়

একতলা ভাঙা বাড়ি।

বিশাল চত্বরের বাঁ দিকে একটা বাড়ি। সামনে একটা বাড়ি। পিছনের বাড়িটা যে পুকুরের ধারের সামনের দিক, তা দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু পিছনের বাড়িটার সামনের দিক যেন একটা ধ্বংসস্তূপের মতো। থামগুলো ভেঙে পড়েছে। দোতলার বারান্দার ছাদ নেই। কিন্তু ঘরের দরজা-জানালাগুলো রয়েছে।

সামনের মুখোমুখি বাড়িটার নীচে থাম আছে সারি সারি। তার মধ্যে কয়েকটা যেন পলেস্তারা খসে বিপজ্জনক ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। দোতলাটার অবস্থা মোটামুটি ভাল। কেবল রেলিং-ঘেরা লম্বা-চওড়া বারান্দাটা যেন ঢেউ খেলছে উঁচু-নিচু। বাড়িটার নীচে ওপরে লোকজন কাউকে চোখে পড়ছে না।

বাঁ-দিকেও থাম-আঁটা লম্বা-বারান্দা নীচের তলা। ওপরতলায় কোনো থাম নেই। অবস্থা অনেকটা সামনের মুখোমুখি বাড়িটার মতোই। কিন্তু যোগদানন্দমামা যেখানে দাঁড়ালেন, সেখানে খানিকটা অংশ, কয়েকটা থাম, সবই চুনকাম-করা, পরিচ্ছন্ন। থামগুলোর গায়ে বালি-সিমেন্টের পলেস্তারা। কিছুটা অংশের সিঁড়ির ধাপগুলোও বালি-সিমেন্টে সারানো। বাঁ কোণে একটা ইলেকট্রিকের পোস্টের সঙ্গে একতলায় তারের যোগাযোগ। কোথা থেকে যে ইলেকট্রিকের তার এসেছে, গোগোল বুঝতে পারল না। আরও একটা নতুন জিনিস চোখে পড়ল। চত্বরে ধান শুকোচ্ছে খানিকটা জায়গা জুড়ে। আর যেদিকটায় সবুজ ঘাসে ছাওয়া খোলা জায়গা, সেদিকের চত্বরের ধার ঘেঁষে রয়েছে একটা মস্ত ধানের গোলা।

গোগোল এই প্রথম দেখল, পাঁচ-ছ বছরের একটি মেয়ে, সিঁড়ির সামনে, থামের কাছে এসে দাঁড়াল। যোগদানন্দমামা বললেন, "আমি থাকি এ-বাড়ির এই অংশে।" তিনি বাবা-মায়ের দিকে ফিরে ডাকলেন, "এসো, উঠে এসো।"

মেয়েটি গোগোলদের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। তারপরেই ছুটে ভিতরে চলে গেল। যোগদানন্দমামা তখনও গোগোলের হাত ছাড়েননি। গোগোল তাকাল বাবা-মায়ের দিকে। তাকিয়েই বুঝল, বাবা-মায়ের চোখেমুখে কেমন একটা গাম্ভীর্য আর অশান্তির ভাব। তাঁরা যোগদানন্দমামার সঙ্গে কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে এলেন।

গোগোল দেখল, বারান্দাটা মোটেই ফাটা-চটা নয়। কোথাও চৌকো পাথর। আবার কোথাও সিমেন্ট-বালি দিয়ে বাঁধানো। সবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ডান দিকে পাঁচিল তোলা। সামনের বড় ঘরটার বড়-বড় দুটো দরজা খোলা। যোগদানন্দমামা সেই ঘরে ঢুকলেন। তখনও দিনের আলো কিছুটা আছে। বাবা-মা'ও সেই ঘরে এসে ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন। বারান্দায় পায়ের জুতো স্যাণ্ডেল খুলে রাখলেন।

ঘরটার মেঝে মার্বেল পাথরের। কিন্তু মার্বেল পাথর সব জায়গায় নেই। যেখানে যেখানে নেই, সেখানে সিমেন্ট-বালি দিয়ে বাঁধানো।' তবে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সাদা দেওয়ালও পরিষ্কার। দেওয়ালে রয়েছে কয়েকটা ছবি আর ক্যালেণ্ডার। ঘরের একপাশে একটা পুরনো খাট। খাট বিছানার ওপরে বেড-কভার পাতা। আর-একপাশে মোটা বেতের সোফা চারটি। মাঝখানে একটা টেবিল। যোগদানন্দমামা বাবা-মায়ের দিকে ফিরে ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললেন, "আহা, জুতো-টুতো খুইলতে গেলে ক্যানে? আমি উসব মানি না।"

বাবা বললেন, "ঠিক আছে, খুলে ফেলেছি যখন, থাক। পরে দেখা যাবে।"

এই সময়েই, বাঁ দিকের লাগোয়া ঘর থেকে একজন মহিলা বেরিয়ে এলেন। তিনি যে মায়ের থেকে বয়সে বেশ কিছু বড়, তা দেখলেই বোঝা যায়। তিনি বেশ ফরসা। লালপাড় শাড়ি পরেছেন। পায়ে আলতার দাগ। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। নাকে

নাকছাবি। ঠোঁটে পান খাওয়ার লাল দাগ। মাথায় অল্প একটু ঘোমটা টানা। একটু-একটু হাসছেন। যোগদানন্দমামা তাঁকে বললেন, "এই হচ্ছে আমাদের উপিনকাকার মেয়ে আর জামাই। এটি তাদিগের একমাত্তর মেয়ে।"

মহিলা এগিয়ে এসে মায়ের হাত ধরলেন, "এসো এসো। কখনও তুমাদিগে দেখি নাই, কেবল শুনেছি তুমাদিগের কথা। আমি তুমার বউদিদি।"

মা একটু হেসে তাঁর বউদিকে প্রণাম করলেন। বাবা এগিয়ে যেতেই, মহিলা কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে বললেন, "থাক থাক নন্দাই ভাই, তুমাকে আর পেন্নাম কইরতে হবে না। আমাদের কত ভাগ্যি, তুমাদের দেখা পেলাম। বোসো, চেয়ারে বোসো।"

গোগোলকে কেউই কিছু বলল না। কিন্তু মায়ের দেখাদেখি মহিলাকে ও প্রণাম করল। তিনি তৎক্ষণাৎ ওকে দু'হাতে কোলের কাছে জড়িয়ে ধরে, চিবুকে হাত ছুঁইয়ে ঠোঁটে চুমো খাবার শব্দ করলেন। বললেন, "বা! বা বা, কী সোন্দর বিটা! কলকাতা শহরে মানুষ হলেও সহবত জানে বটে।"

যোগদানন্দমামা বললেন, "জাইনবে না? বাবা মা কেমন দেইখতে হবে তো?" বলে গোগোলকে বললেন, "ইটি তোমার মামিমা। চিনু কুথা গেল?"

গোগোল ইতিমধ্যে দেখে নিয়েছে, ঘরে ইলেকট্রিক আলো আর পাখা রয়েছে। মাথার ওপরে ছাদে অনেক বালি সিমেন্টের সারানোর দাগ। আর বিরাট-বিরাট কাঠের কড়ি-বরগা। মামিমা বললেন, "চিনুই তো আমাকে ভিতরে যেইয়ে খবর দিল। আইসবে এখুনি। তা হ্যাগো সুনীতি, তুমাদিগের সঙ্গে কোনো মালপত্তর নাই?"

"তাই তো বটে?" যোগদানন্দমামার যেন এতক্ষণে খেয়াল হল। অবাক হয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা জামাকাপড় আনো নাই?"

বাবা-মা দুজনের দিকে দুজনে তাকালেন। দুজনেই একটু-একটু হাসছেন। বাবা বললেন, "আছে, গাড়িতে রেখে এসেছি।"

যোগদানন্দমামা আরও অবাক হয়ে ভুরু কোঁচকালেন। একবার মামিমার দিকে দেখলেন। তারপরে বললেন, "গাড়িতে রেখে চলে এলে? ই আবার কেমন কথা বটে? যাই, আমি তাহলে নিয়ে আসি। কোথা··· ইয়ে···আমাদিগের গোবরাটা কোথা গেল?"

বাবাও ব্যস্ত হয়ে বললেন, "শুনুন, যোগদানন্দদাদা, ব্যস্ত হবেন

না। ওসব তো পরেও আনা যাবে। আসলে আপনাকে একটা কথা বলা দরকার। কিছু মনে করবেন না।"

যোগদানন্দমামা প্রায় বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বাবা-মায়ের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার বলো তো?"

বাবা মায়ের দিকে একবার তাকালেন। মামিমাকেও একবার দেখে নিলেন। তারপরে একটু কেসে নিয়ে বললেন, "আমাদের এখানে রাখতে গেলে, আপনিই অসুবিধেয় পড়ে যাবেন। তাই বলছিলাম, যে কাজে এসেছি, সে-কাজটা আমরা করেই যাব ঠিক। তবে, গাড়ি যখন একটা আছে, আমরা রোজ রামপুরহাট থেকে যাতায়াত করব।"

যোগদানন্দমামা প্রথমে কেমন হতভম্ব হয়ে গেলেন। তারপরে হেসে বললেন, "তোমরা কী ভেবেছ, আমি বুঝেছি। তোমরা ভেবেছ, এখানে থাকতে তুমাদিগের কষ্ট হবে? চলো, এখুনি তুমাদিগে আমার ঘর দরজা সব দেখিয়ে আনছি।"

মা লজ্জা পেয়ে হেসে বললেন, "তা কেন বলছেন? আসলে সত্যি কথা বলতে কী, এখানে বাথরুম-টাথরুমের তো অসুবিধে হবেই। সেইজন্যেই…"

"বাথরুমের অসুবিধা হবে?" যোগদানন্দমামা যেন খুবই অবাক হয়ে গেলেন। মামিমার দিকে তাকিয়ে একবার দেখলেন। তারপরে হেসে বললেন, "অবশ্য তুমাদিগের কলকাতার মতন বাড়িঘরদোর তো এখানে নাই। সেরকম বাথরুমও এখানে পাবে না। তবে একবারটি নিজের চোখে সব দেখে নাও, দ্যাখো যদি গরিব দাদার বাড়ির সব ব্যবস্থা পছন্দ হয়, তবেই থাকবে। জোর করে তো আর রাইখ্‌তে পারব না বটে। চলো, সব দেখেশুনে নেবে।"

মায়ের কথা গোগোলের ভাল লাগেনি। মা অবশ্য খারাপভাবে কিছু বলেননি। তবু ওর কেমন ভাল লাগল না। যোগদানন্দমামার কথা শুনে, মা বাবার দিকে তাকালেন। আরও যেন লজ্জা পেয়ে গেলেন। বললেন, "আমি আসলে আমাদের নিয়ে আপনাদের অসুবিধের কথা ভেবেই…"

যোগদানন্দমামা বাধা দিয়ে বললেন, "আমাদের অসুবিধের কথা পরে ভাববে। এখন নিজের সুবিধা-অসুবিধাটা দেখে নেবে চলো। তুমিও চলো।" তিনি বাবার দিকে তাকালেন।

"এসো, আমি নিয়ে যাই।" মামিমা মায়ের হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন।

ব্যাপারটা সত্যি অস্বস্তিকর। গোগোল বাবার মুখ দেখেই বুঝতে পারল। বাবাকেও যেতে হল। সঙ্গে যোগদানন্দমামা। তিনি গোগোলকে ডেকে নিয়ে গেলেন, "এসো, বাড়ির ভিতরে এসো।"

মামিমা খোলা দরজা দিয়ে পাশের ঘরে ঢুকলেন। সে-ঘরটাও বেশ বড়। ঘরের মেঝে তেমনি মার্বেল পাথরের। দু'চার জায়গায় পাথরের বদলে বালি-সিমেন্টের শান বাঁধানো। খোলা জানালা দিয়ে ঘরে তখনও দিনের আলো আসছে। পরিচ্ছন্ন ঘর। এ-ঘরে একটা মস্ত খাট জুড়ে বিছানা রয়েছে। উঁচু খাটের বাটামের সঙ্গে মশারি গুটিয়ে রাখা। সেই ঘরেই শাড়ি-পরা চিনু দাঁড়িয়ে ছিল। মামিমা তখন ডান দিকে ফিরে মায়ের হাত ধরে চলেছেন পাশের একটা ঘরে। সে-ঘরটা একটু ছোট। ঘরের বাইরে চওড়া আর লম্বা বারান্দা। সামনের দিকের মতো থাম নেই। বারান্দার ডানপাশে একটা ঘর। মামিমা সেই ঘরটায় গিয়ে ঢুকলেন। আসলে সে-ঘরটাই বাথরুম। রীতিমত বড় একটা ঘর শুধু নয়। দুটো ঘর পাশাপাশি।

সামনের ঘরটায় রয়েছে টিউবওয়েল, চৌবাচ্চা। দেওয়ালে জামা-কাপড় রাখবার কাঠের ব্রাকেট। প্লাস্টিকের পরিষ্কার বালতি, মগ। দেওয়ালে লাগানো সাবানদানিতে সাবান। তোয়ালে ঝুলছে ছোট একটা আলনায়। পাশের ঘরের ভেজানো দরজাটা খুলতেই দেখা গেল, স্যানিটারির প্রিভি। শুকনো খটখটে পরিচ্ছন্ন। সেখানেও রয়েছে বালতি চৌবাচ্চা, মগ ইত্যাদি। দুটো ঘরেই উঁচুতে জানালা রয়েছে। জানালার পাল্লায় কাঁচ লাগানো। গোগোলদের কলকাতার বাথরুম অন্যরকম বটে। কিন্তু এত বড় নয়। মামিমা দেওয়ালের সুইচে হাত দিয়ে পটাপট আলো জ্বালিয়ে দিলেন। শিমুলগড়ের দৈত্যপুরীর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এত বড়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাথরুমের কথা যেন ভাবাই যায় না। তায় আবার ইলেকট্রিকের আলো!

মা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। মামিমা তার আগেই বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন। বাথরুমের দরজার মুখোমুখি বারান্দায় ছিল আর একটা ভেজানো দরজা। সেটা খুলে দিতেই দেখা গেল মাঝারি মাপের একটা ঘর। বারান্দার দিকেই মস্ত বড় একটা জানালা। দরজা-জানালা দিয়ে আলো এসে পড়ল ঘরে। সেই ঘরের একদিকে রয়েছে মস্ত বড় একটা খাট। বোধহয় চার-পাঁচজন অনায়াসে শুতে পারে। পরিষ্কার বিছানা, বালিশ, পাশবালিশ সাজানো। বাটামের সঙ্গে সাদা নাইলনের মশারি গুটিয়ে রাখা রয়েছে। আর-এক দিকে রয়েছে অদ্ভুত ধরনের দেখতে চওড়ামতো একটা দেরাজ-আলমারি। তার সঙ্গে একটা মস্ত আয়না। গোগোল নিজের পা থেকে মাথা পর্যন্ত পুরোপুরি সেই আয়নায় দেখতে পাচ্ছে। মামিমা মায়ের দিকে ফিরে বললেন, "হ্যাঁ গো সুনীতি, পছন্দ হচ্ছে? এই ঘরখানিতে তুমাদিগের থাকবার ব্যবস্থা করেছি। একটা দরজা খুললে বাইরের ঘর। আর একটা দরজা খুললে, ভেতরবাড়ি। বারান্দার দরজা খুলে বাথরুমে যেতে পারবে, আবার অন্দরেও যেতে পারবে।"

"আর খাবার ঘরটি দেখালে না যে?" যোগদানন্দমামা বললেন, "টেবিল-চেয়ারের ব্যবস্থা আছে, সেটাও দেখিয়ে দাও!"

বাবা মায়ের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন। বললেন, "আর কিছু দেখাতে হবে না। অনেক হয়েছে।"

মা লজ্জা পেয়ে হেসে বললেন, "চারদিক দেখে ভেতরে যে এমন ব্যবস্থা থাকতে পারে, তা বোঝাই যায় না।"

"ভুলে যাচ্ছ ক্যানে গো সুনীতি, হাজার হলেও, মুখুজ্যেদের শিমুলগড় হল তোমার বাপের বাড়ি।" যোগদানন্দমামা বললেন, "ব্যবস্থা রাখতে জানলে এর মধ্যেও রাখা যায়। এ সব আমার ছেলেরাই করেছে। আরও দু-এক ঘর এরকম ব্যবস্থা রেখেছে। চারদিকের ভাঙাচোরা অবস্থার মধ্যেও, মুখুজ্যেরা এখনও যারা এখানে আছে, খেয়ে পরে চলে যায়। তবে হ্যাঁ, জমি-জিরেতের ধান ফসল পাওয়া যায় বটে এখনও। কিন্তু তাতেই কেবল চলে না। চাকরির টাকা থাকলে ভালভাবে থাকা যায়। ঝি-চাকর কৃষাণ পোষ্য তো কম নেই। তোমরা একটা কাজের জন্য এসেছ বটে। নিজের বোন-ভগ্নীপতিকে একটু আদর যত্ন করে রাখতে সাধ হয় না? আসলে তো এ তোমার বাপের বাড়িই। দু'চার দিন এখানেই কষ্ট করে থেকে যাও।"

মা বললেন, "আমি তো কষ্টের কিছু দেখছিনে।"

মায়ের কথা শুনে গোগোল যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তা হলে আর রামপুরহাটে ফিরে যেতে হবে না। ও বাবার মুখের দিকে তাকাল। বাবা বললেন, "তা হলে গাড়ি থেকে জিনিসপত্র সব নামিয়ে নিয়ে আসি।"

"তুমি একলা যেতে পারবে না। আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।" যোগদানন্দমামা চিনুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ রে চিনু, গোবরাকে ডেকে দে, মালপত্তরগুলান নিয়ে আসবে।"

চিনু কিছু বলবার আগেই, বারান্দার দরজার সামনে এসে দাঁড়াল একটা লোক। কালো, বেঁটে, খালি-গা। প্রায় লেংটির মতো উঁচু করে কাপড় পরা। এক মাথা রুক্ষু চুল। চোখ দুটো দেখাই যায় না। কিন্তু হাসতে গিয়ে তার সব দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে।

বলল, "ডাকতে হবে না আঁজ্ঞা, আমি হেথায় আছি। আপনারা আসেন, আমি গাড়ির কাছে যাঁইচি।"

তার মানে ওই লোকটার নামই গোবরা। এ দৈত্যপুরীতে, গোগোল একলা লোকটাকে দেখলে নিশ্চয় ভয় পেয়ে যেত। যেমন কালো কুচকুচে বেঁটে চেহারা, তেমনি অদ্ভুত চোখ দুটো। চোখের সাদা অংশ বলে কিছু কি নেই ওর ? কেবল দুটো কালো তারা ? সে হাসিমুখে, হাতজোড় করে কয়েকবার কপালে ঠেকিয়ে চলে গেল। বাবা বেরিয়ে গেলেন যোগদানন্দমামার সঙ্গে। মামিমা চিনুকে বললেন, "উ কী রে, পিসে-পিসিকে প্রণাম করলি না ? ভাইকে নিয়ে একটু বাইরের দিকে যা।" চিনু খুব লজ্জা পেয়ে গেল। মা আর মামিমা—দুজনকেই প্রণাম করল। তারপর গোগোলকে ধরে বাইরের ঘরে নিয়ে গেল। ঘর থেকে থাম-আঁটা বারান্দায়। জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম গোকুল নাকি ?"

গোগোল হেসে বলল, "গোকুল না, গোগোল।"

চিনু হেসে উঠে বলল, "আমি শুনছি গোকুল।"

এমন সময় দোতলার ছাদ যেন আচমকা কেঁপে উঠল। সেই সঙ্গে একটা বিকট শব্দ। শব্দটা কোনো মানুষের গলার নয়। যেন কোনো যন্ত্রবিশেষ খটখটে টিনের চালার ওপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বেশ খানিকক্ষণ ধরে শব্দটা হল। গোগোল চমকে উঠে চিনুর একটা হাত চেপে ধরল। জিজ্ঞেস করল, "ওটা কিসের শব্দ ?"

গোগোল যে বেশ ভয় পেয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। চিনু গোগোলকে জড়িয়ে ধরে বলল, "ওটা একটা ভামের কীর্তি।"

"ভাম ? ভাম কী ?" গোগোলের চোখে-মুখে তখনও ভয়ের ছায়া।

চিনু হেসে বলল, "ভাম একরকমের জন্তু। ওপরে তো কেউ নাই, ভামটা দিনের বেলাও ওরকম বিকট শব্দ করে। ভয় পাবার কিছু নাই।"

কোনো জন্তু যে ওরকম শব্দ করতে পারে, গোগোলের জানা ছিল না। চিনুর কথাও যেন পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারল না। বলল, "জন্তু ? ভূত নয় ?"

চিনু মাথা নেড়ে বলল, "না, ভূত নয়। ওটা একটা ভাম, আমরা জানি। ভামটা খুব পাজি। ওটাকে মারবার অনেক চেষ্টা করা হয়েছে, ধরা যায় নাই। ওরা হাঁস, পায়রা, ছোট ছাগলছানাও খেয়ে ফেলে। আর ওইরকম বিকট শব্দ করে।"

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "এখানে কি ভূত আছে ?"

"তা আছে।" চিনু এমনভাবে বলল, যেন ভূত মানুষের মতোই কোনো জীব, "তবে সব বাড়িতে নাই, কতগুলান বাড়িতে আছে।"

গোগোল চোর ডাকাত আর খুনি দেখেছে। ভূত কখনও দেখেনি। ও উত্তেজিত কৌতূহলে ফেটে পড়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কখনও দেখেছ ?"

চিনু হেসে বলল, "ভূত দেখলে কি আর চেনা যায় ? ওরা তো সবরকম বেশ ধরতে পারে। মানুষ গোরু ছাগল পাখি শেয়াল হায়না, অনেকরকম। এই ধরো, ভূত যদি তোমাকে দেখা দিতে চায়, সে হয়তো আমার মতো বেশ ধরেই তোমার সামনে আসবে। তুমি কিছুই বুঝতে পারবে না। কিন্তু সে যদি তোমার ক্ষতি করতে চায়, তা হলে কঙ্কাল থেকে শুরু করে, যে-কোনো ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে আসতে পারে। আর জানবে, ভূতের কোনো ছায়া পড়ে না।"

গোগোল চিনুর এসব কথা শুনে মোটেই তেমন অবাক হল না। কারণ ভূতের সম্পর্কে এরকম আজগুবি অনেক গল্প ও বইয়ে পড়েছে। সে-সব গল্প ওর মোটেই বিশ্বাস হয়নি। এখনও হল না। কিন্তু সে-কথা ও চিনুকে বলল না। তবে এ দৈত্যপুরীর বিশাল ভুতুড়ে বাড়িগুলিতে যদি ভাম নামে কোনো জন্তু এরকম আচমকা বিকট শব্দ করে, তা হলেই মুশকিল। আর রাত্রে যদি ওরকম শব্দ হয়, ও দু'চোখের পাতা এক করতে পারবে না।

॥ পাঁচ ॥

পরের দিন সকালবেলা গোগোল সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। সকাল তখন ন'টা বাজে। জলখাবার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। বাইরের ঘরে বাবা মা যোগদানন্দমামার সঙ্গে বসে ছিলেন। আরও একজন বুড়ো ভদ্রলোকও ছিলেন। ডিগডিগে রোগা লম্বা, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা। সঙ্গে একটা মোটা ছড়ি। মাথার সাদা চুল খোঁচা-খোঁচা। চশমার কাঁচগুলোর ভিতরে চোখ দুটো প্রকাণ্ড বড় দেখাচ্ছে। তাঁরা সকলেই অনেক পুরনো দলিলের কাগজপত্র দেখছিলেন। নানা কথা বলছিলেন। চিনুদি নাকি ভোরবেলাই স্কুলে গেছে। সে গোগোলের থেকে তিন চার বছরের বড়। ক্লাস টেনে পড়ে। শিমুলগড়ের পশ্চিমে স্কুলবাড়ি। বারো মাসই নাকি ভোরে স্কুল হয়। এ-বাড়িতে গোগোলের আরও তিন দাদা আছেন। তাঁরা কেউ এখানে থাকেন না। দু'জন বিদেশে চাকরি করেন। একজন কলকাতায় পড়েন। বাড়িতে থাকেন শুধু মামা, মামিমা আর চিনুদি।

বাবা গাড়িটা রামপুরহাটে ফেরত পাঠাননি। ড্রাইভার নিতাইও তাই থেকে গেছে। গতকাল রাত্রে সে বাইরের ঘরে শুয়েছিল। গোগোল ঘুম থেকে উঠে তাকে দেখতে পায়নি। ও বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিল, বিরাট উঠোনের রোদে একটি বউ ধান শুকোতে দিচ্ছে। একটা চার-পাঁচ বছরের নেংটি পরা ছেলে, হাতে লাঠি নিয়ে পায়রা তাড়া করছে। গতকাল গোগোল এত পায়রা লক্ষ করেনি। এখন দেখছে, দু'পাশের বিরাট বাড়ির খোপে-খোপে অনেক পায়রা। ভাঙা ছাদের আলসেয়, সামনের সবুজ ঘাস গজানো পোড়োয়, পোড়োর ওপারে মন্দিরের মাথায়ও পায়রা। কিছু পায়রা কেবলই ছড়ানো ধানের ওপর এসে বসছিল।

মা গোগোলকে সাবধান করে দিয়েছেন, ও যেন একলা কোথাও না যায়। কিন্তু ওর চুপচাপ একলা থাকতে মোটেই ভাল লাগছিল না। শিমুলগড়ের চারদিকটাই ওকে টানছিল। বাঁ দিকের হুমড়ি খেয়ে পড়া বিরাট বাড়িটার দোতলার বারান্দা ঢেউ খেলছে। যতবার সেদিকে ওর চোখ পড়ছে, দেখেছে একটা অদ্ভুত মুখ উঁকি মারছে। ওটা মানুষের মুখ, না আর কিছু ধরাই মুশকিল। রেলিঙের আড়ালে, দেওয়ালের গা থেকে উঁকি মারছে। গোগোল তাকালেই মুখটা আড়ালে সরে যাচ্ছে। দোতলায় ওঠার সিঁড়িটা কোন্ দিকে গোগোল বুঝতে পারছে না। কিন্তু ইচ্ছে করছে, ওপরে উঠে একবার দেখে আসবে, কেউ বিটকেল হনুমানের মুখোশ পরে ওর সঙ্গে দুষ্টুমি করছে কি না। তা ছাড়া পোড়োর ওপারে মন্দিরের ভিতর থেকে একটু আগেই, ঘোমটা-ঢাকা মুখে লম্বা একটি বউ বেরিয়ে এল। তার চোখ-মুখ কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। গায়ের কাপড়টা ছিল ময়লা সাদা। সে মন্দিরের দরজার কড়া দুটো দড়ি দিয়ে বেঁধে পিছন দিকে চলে গেল। মন্দিরের ভিতরটাও ওর দেখতে ইচ্ছে করছিল।

এমন সময় একটি ছেলে বাঁ দিকের বাড়ির পাশ থেকে এগিয়ে এল। এসে দাঁড়াল গোগোলের সামনেই, বারান্দার নীচে। দেখে মনে হল, ও গোগোলেরই সমবয়সী হবে। কিন্তু ও পরে আছে ধুতি। ফরসা খালি গায়ে পৈতে। একমাথা রুক্ষ কালো চুল। বড় বড় চোখ। মুখখানি বেশ মিষ্টি। পরিচয় নেই, তবু সে গোগোলের দিকে তাকিয়ে হাসল। গোগোল হাসবে কি না বুঝতে পারল না। কিন্তু ছেলেটিকে দেখে ওর ভাল লাগল। জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কী ?"

"কৃপাসিন্ধু মুখোপাধ্যায়।" ছেলেটি পরিষ্কার উচ্চারণ করে বলল, "সবাই আমাকে কৃপা বলে ডাকে। তোমার নাম গোগোল ?"

গোগোল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী করে জানলে ?"
কৃপা বলল, "চিনুদি ভোরবেলা ইস্কুলে যাবার সময় বলেছে।"
গোগোল পিছন ফিরে একবার ঘরের মধ্যে দেখল। কেউ ওকে দেখছেন না। ও বারান্দা থেকে নীচে নামল। জিজ্ঞেস করল, "তুমি স্কুলে পড়ো না ?"
কৃপা বলল, "হ্যাঁ পড়ি। আমাদিগের ইস্কুল সাড়ে দশটায়। তোমরা বাড়ি বিক্রি করতে এসেছ ?"
গোগোল মাথা নেড়ে বলল, "আমি ওসব কিছু বুঝিনে। আমি বেড়াতে এসেছি।"
কৃপা অবাক হেসে বলল, "এ শ্মশানপুরীতে কেউ বেড়াতে আসে নাকি ? এখানে কী দেখবে ?"
গোগোল বলল, "আমি এরকম জায়গা আগে কখনও দেখিনি। এত বড়-বড় ভাঙা বাড়ি। শ্মশানপুরী বলছ কেন ? তুমি তো এখানেই থাকো।"
কৃপা বলল, "আমরা গরিব মানুষ, কোথায় যাব ? শ্মশানপুরী ছাড়া কী ? সব ভাঙাচোরা খাঁখাঁ করছে। ভূতের বাড়ি সব। তবে এখন এখানে সব অদ্ভুত কাণ্ড চলছে। অনেক বাড়ি বিক্রি হয়ে যাবে তো। তাই সবাই সবাইকে শত্রু ভাবছে আর সন্দেহ করছে।"
গোগোলের এ-সব কথা ভাল না লাগলেও জিজ্ঞেস করল, "কেন ?"
কৃপা বড়দের মতো বলল, "সবাই ভাবছে, কে কাকে ঠকিয়ে কারখানা-কোম্পানির কাছ থেকে বেশি টাকা নিয়ে নেবে। ওই যে ঘরের মধ্যে দেখছ, যোগদাকাকা, বটুকজ্যাঠা, এরা লোক ভাল না।"
"ছিঃ, বড়দের সম্পর্কে এরকম কথা বলতে আছে ?" গোগোল বিরক্ত হয়ে বলল, "বড়দের বিষয়ে তোমার না ভাবাই উচিত। তাঁরা খারাপ হলে তোমার কী করার আছে ?"
কৃপা এবার ছেলেমানুষের মতোই বলল, "আমার ভয় লাগে, কখন কী গোলমাল লেগে যায়।"
"গোলমাল মানে ঝগড়া-বিবাদ ?"
"তা ক্যানে ? মারামারি খুনোখুনিও হয়ে যেতে পারে। আমার বাবা তো তাই বলছিল। এসব জায়গা মোটে ভাল না।" বলতে-বলতে কৃপার চোখ দুটো বড় হয়ে উঠল। বলল, "জানো, দু'তিন বছর আগে, দুর্গামহলের সামনে যোগদাকাকাকে মাথার পেছনে টাঙ্গি দিয়ে মেরেছিল। মাথাটা এতখানি ফাঁক হয়ে গেছল। খুব জোর বেঁচে গেছে।"
গোগোল জিজ্ঞেস করল, "কে মেরেছিল ?"
"তা কে জানে ?" কৃপা হাত উলটে বলল, "তখন তো সন্ধের পর আঁধার ছিল। দেখতে পায় নাই। যোগদাকাকাকে রামপুরহাটে হাসপাতালে নিয়ে গেছল। দারোগা পুলিশ এসেছিল। কাউকে ধরতে পারে নাই।"
কৃপার কথা শুনে গোগোল বুঝতে পারল, শিমুলগড়ের দৈত্যপুরী সহজ জায়গা নয়। কৃপার ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। ও যে বলছে, এখানে অদ্ভুত সব কাণ্ড চলছে, তা হয়তো সত্যি। তবু ও জিজ্ঞেস করল, তবে তুমি তোমার যোগদাকাকাকে খারাপ লোক বলছ কেন ?"
কৃপা বলল, "যোগদাকাকা নাকি অনেকের চাষের জমি ঠকিয়ে নিয়েছে। এখন তো যোগদাকাকা রাত-বিরেতে একলা বেরোয় না। সঙ্গে লোক থাকে, আর বন্দুকও থাকে।"
কৃপার কথাগুলো শুনে গোগোল একটু ভাবল। কিন্তু যোগদানন্দমামার সম্পর্কে খারাপ কিছু ভাবতে ওর ভাল লাগছে না। জিজ্ঞেস করল, "দুর্গামহলটা কোথায় ?"
"পাকা রাস্তা থেকে যেখান দিয়ে তোমাদের গাড়ি এসেছে। সেইখানে দুর্গামহল।
গোগোল জিজ্ঞেস করল, "পুলিশ কারোকে ধরতে পারল না কেন ?"
"তা কী করে জানব ?" কৃপা গোগোলের কথা শুনে হেসে ফেলল, "পুলিশ তো ঘরে-ঘরে যেয়ে সকলের সঙ্গে কথা বলছে।"
গোগোল আবার জিজ্ঞেস করল, "যোগদানন্দমামা কারোকে সন্দেহ করেননি ?"
"তা জানি না।" কৃপা মাথা নেড়ে বলল, "এখন সবাই বলে, যোগদাকাকাকে খুনে-ভূত মেরেছিল।"
"খুনে-ভূত ! ভূত আবার খুনি হয় নাকি ?"
"তা হবে না ক্যানে ? ভূত খুনও করতে পারে। তবে ভূত যে টাঙ্গি দিয়ে মারতে পারে, তাতেই সবাই অবাক। ভূত তো ঘাড় মটকেই মারে। ওরা লোহা ছোঁয় না।"
আবার সেই আজগুবি ভুতুড়ে গল্প। গোগোল জিজ্ঞেস করল, "আজ অব্দি ভূত কারোকে ঘাড় মটকে মেরেছে ?"
"হ্যাঁ।" কৃপা ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, "আমি দেখি নাই। শুনেছি কালিকামহলের বুড়ি সোনামাকে (প্রপিতামহী) ভূতে নাকি ঘাড় মটকে মেরেছিল। তখন আমার জন্ম হয় নাই।"
গোগোল কৃপাসিন্ধুর সরল সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। খুনে-ভূতের কথা শুনে ওর কেমন ধাঁধা লেগে যাচ্ছে। অথচ বিশ্বাসও করতে পারছে না। কৃপার কথা শুনে আরও বুঝতে পারল, সব মহলেরই আলাদা আলাদা নাম আছে। কৃপা হঠাৎ ভয় পেয়ে বলল, "আমি যা বললাম, তা যেন বলে দিও না। এসব তোমাকে বলেছি জানলে আমার বাবা আমাকে আর আস্ত রাখবে না।"
গোগোল মাথা নেড়ে বলল, "না, আমি কারোকে কিছু বলব না।"
কৃপাকে কথাটা বলতে গিয়েই, গোগোলের হঠাৎ আবার বাঁ দিকের দোতলার দিকে নজর পড়ল। দেখল সেই অমানুষিক মুখটা দেখা দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল। গোগোল জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, ওই দোতলায় কি কেউ থাকে ?"
কৃপা দোতলার দিকে দেখে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "থাকে। পাগলা কালিয়া আর তার মা থাকে।"
গোগোল বলল, "তারা তো মানুষ। কিন্তু আমি একটা বিচ্ছিরি মুখ দেখতে পেয়েছি। যেন কালো পোড়া হনুমানের মতো বড় একটা মুখ। উঁকি দিয়ে দেখছে, আবার সরে যাচ্ছে।"
"ওটা তো পাগলা কালিয়ার মুখ।" কৃপা হেসে বলল, "সম্পর্কে সেও আমার কাকা হয়। তুমি ঠিক বলেছ, ওর মুখটা ওরকমই দেখতে। ওকে কোথাও বেরোতে দেওয়া হয় না। মাঝে-মাঝে ও খেপে গেলে খুব চিৎকার করে। গোঙা তো, কথা বলতে পারে না। জন্ম থেকেই নাকি ওইরকম। যখন খেপে যায় আর জন্তুর মতো চেঁচায়, তখন ওর মা ওকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে। ছাড়া থাকলে, বেরিয়ে এসে যাকে পায়, তাকে আঁচড়ে কামড়ে দেয়।"
গোগোলের গায়ের মধ্যে কেমন করে উঠল। একে ওইরকম মুখ, তায় আবার হিংস্র। ভাবলেই ভয় লাগে। গোগোল ঠিক করল, আর ওদিকে তাকাবে না। কৃপা বলল, "চলো, তোমাকে একটা জিনিস দেখাব।"
গোগোল জিজ্ঞেস করল, "কী ?"
কৃপা হেসে বলল, "খারাপ কিছু নয়, মজার জিনিস। এই মাতঙ্গীমহলের পেছনেই।"
গোগোলের কৌতূহল হল। ও একবার ঘরের দিকে দেখে জিজ্ঞেস করল, "দেরি হবে না ?"
"না। আমি তো একটু পরেই ইস্কুলে যাব।"
গোগোল কৃপার সঙ্গে পশ্চিমে গেল। বাঁয়ে ডাইনে ভাঙাচোরা বাড়ির অলিগলি দিয়ে, একটা বাড়ির ভাঙা বারান্দায় উঠল। কোনো খোলা চত্বর নেই। রোদও নেই। ছায়া-ছায়া, ঠাণ্ডা বাতাস যেন

পাক খাচ্ছে। পাল্লাবিহীন দরজার ভিতরে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকল দুজনে। ভিতরটা আরও ঠাণ্ডা, আর প্রায় অন্ধকার। কৃপা গোগোলের একটা হাত ধরে, আরও দুটো ঘরের ভিতর দিয়ে নিয়ে গেল। তারপরে ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। সিঁড়ির বাঁক ঘুরতেই, ওপর দিকে দিনের আলো দেখা গেল। কৃপা থমকে দাঁড়াল। পায়ের কাছে বেশ বড় একটা সাপের খোলস পড়ে আছে। কৃপা বলল, "এখনও গরম পড়েনি, সাপ খোলস ছাড়তে আরম্ভ করেছে।"

"এখানে সাপ আছে?"

"এখানে সাপ থাকবে না তো কোথায় থাকবে?" কৃপা হেসে বলল, "ভাঙা ইঁটের পাঁজায় আর দেয়ালের ফাটলে সাপ তো থাকেই।"

গোগোলের গা'টা শিরশির করে উঠল। কৃপা ওকে নিয়ে উঠে এল একেবারে ওপরের চিলেকোঠায়। চিলেকোঠার ভিতরে সিঁড়ির মাথা-ঢাকা বাঁধানো চাতালের ওপরে আঙুল দিয়ে দেখাল। মোটামুটি আলো থাকা সত্ত্বেও গোগোল প্রথমে তেমন কিছু দেখতে পেল না। তারপরেই কিছু নড়ে উঠল। তখনই গোগোল দেখতে পেল, বেশ কতগুলো গোল অপলক চোখ। হঠাৎ নড়ে উঠল কয়েকটা পাখা। শব্দ করল ঝটপটিয়ে। গোগোল তৎক্ষণাৎ কিছু বুঝতে না পেরে দু'পা পেছিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, "ওগুলো কী?"

"প্যাঁচা।" কৃপা হেসে বলল, "একসঙ্গে সাত-আটটা প্যাঁচা এখানে থাকে। দুটো বাচ্চাও এখন আছে।"

গোগোল প্যাঁচা দেখেছে। কিন্তু এতগুলো একসঙ্গে দেখেনি। চিড়িয়াখানা ছাড়া এত কাছে থেকেও দেখেনি। ওর চোখের সামনে প্যাঁচাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠল। সাপের মতো অপলক আর অদ্ভুত চোখগুলো যেন ওদেরই দেখছে। একবারই ওরা নড়ে উঠেছিল। এখন একেবারে চুপচাপ। সব গায়ে গায়ে জড়াজড়ি করে আছে। কিছু ভাঙা ইঁটের টুকরো, পুরনো ভাঙা লোহার বাসন আর খড়ের ছোট গাদার মধ্যে ওরা রয়েছে। মাঝে-মাঝে ঠিক মানুষের মতো ঘাড় বাঁকাচ্ছে। গোগোল জিজ্ঞেস করল, "কামড়ে দেবে না?"

"ওরা তো এখন আমাদের ভাল দেখতেই পাচ্ছে না।" কৃপা বলল, "দিনের আলোয় প্যাঁচা দেখতে পায় না। এগুলান হল লক্ষ্মীপ্যাঁচা। আঁধার হলেই শিকার করতে বেরোবে।"

গোগোল নিজের কাছেই বোকা বনে গেল। দিনের বেলা যে প্যাঁচা দেখতে পায় না, ও জানে। ওদের অপলক চোখ আর গোল একটু থ্যাবড়ামতো মুখ দেখলে মানুষের মতো মনে হয়। মুখ গলা বুক সাদা। মাথার ওপর থেকে পিঠের দিকে হালকা পাঁশুটে। তীক্ষ্ণ বাঁকানো ঠোঁট নেমে এসেছে চোখের কাছ থেকেই। ওদের ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাটা বেশ মজার।

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "হুতোম প্যাঁচা আছে এখানে?"

কৃপা বলল, "হুতোমগুলান গাছের বড় ফোকরের মধ্যে থাকে। আমি দেখেছি। তোমাকে দেখাব। এখন চলো। ইস্কুলে যেতে দেরি হয়ে যাবে।"

গোগোল চিলেকোঠা থেকে বেরিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বিশাল ছাদটা খেলার মাঠের মতো। অনেক জায়গায় বড়-বড় ফাটল ধরেছে। এগোতে ভয় হয়। আলসে অনেক জায়গায় ভেঙে পড়েছে। গোগোলের মনে হল বিরাট আর বিশাল উঁচু বাড়ি। আস্ত ভাঙা সব চারদিকে ঘিরে আছে। মাঝে-মধ্যে কোথাও-কোথাও দাঁড়িয়ে আছে গাছপালা। মন্দিরের মাথা। অনেক দূরে মাঠ আর গাছপালা দেখে মনে হয়, ওদিকে গ্রাম আছে। হাইওয়েটা যে কোন্ দিকে, বোঝা যায় না।

গোগোল কৃপার সঙ্গে নীচে নেমে এল। আসতে-আসতে জিজ্ঞেস করল, "তুমি তখন বলছিলে, ভূতের বাড়ি সব। সত্যিকারের ভূত আছে নাকি?"

"আছে তো।" কৃপা ঠিক চিনুদির মতোই বলল।

"আমাকে দেখাতে পারো?"

"সব সময় দেখা যায় না। তোমার ভাগ্যে থাকলে দেখতে পাবে। তবে ওসব না দেখাই ভাল।"

"কেন?"

"ভূত-পেত্নিদের ভালমন্দ বোঝা যায় না। মন্দ হলে কী করবে, কে জানে!"

"তুমি কখনও দেখেছ?"

"দেখেছি।"

"কীরকম দেখতে?"

"আমি মানুষের ছায়ার মতন দেখেছি। চোখের সামনে দিয়ে হুশ করে চলে যায়, তারপরে আর দেখা যায় না। খালি ধুলো আর গাছের শুকনো পাতা ওড়ে।"

গোগোল কৃপার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। মনে হয় না, একটুও বানিয়ে বলছে। ওরা দুজনেই তখন আবার যোগদানন্দমামার বাড়ির চত্বরে এসে পড়েছে। গোগোল বলল, "আমাকে একটু দেখাবে?"

কৃপা একটু ভেবে বলল, "তুমি ভরদুপুরে বেরোতে পারবে? তা হলে তোমাকে চণ্ডিকামহলের নাচবাড়িতে নিয়ে যাব।"

গোগোল একটু ভাবল। দুপুরে নিশ্চয় ওকে কেউ বেরোতে দেবেন না। ও জিজ্ঞেস করল, "দুপুরে তোমার স্কুল আছে না?"

"আজ তো শনিবার, হাফ ছুটি।"

"আমাকে বোধহয় বেরোতে দেবেন না।"

"তুমি চিনুদিকে বলে রেখো। ও তোমাকে ঠিক বের করে নিয়ে আসবে।"

কৃপা বলল, "আমি বলে রাখব।"

গোগোলের চোখ দুটো চকচক করে উঠল। ঠিক বলেছে কৃপা। চিনুদি ইচ্ছে করলে, ওর সঙ্গে যাওয়া যাবে।

"এখন যাচ্ছি।" বলে কৃপা চলে গেল।

॥ ছয় ॥

বেলা প্রায় দুটো বাজে। গোগোল চিনুর সঙ্গে বসে, বাইরের বারান্দায় লুডো খেলছিল। নিতাই একটা মাদুর পেতে ঘুমোচ্ছিল একপাশে। একেবারে ভরদুপুর। দৈত্যপুরীর চারদিক নিঝুম, খাঁ খাঁ করছে। কৃপা এসে দাঁড়াল বারান্দার নীচে। এখন ও পরে আছে

জিনের একটা কালো হাফপ্যান্ট আর হলদে হাফশার্ট। কিন্তু খালি পা। গোগোল আর চিনুর দিকে তাকিয়ে হাসল। চিনু গোগোলকে ইশারা করে উঠে দাঁড়াল। গোগোলও উঠল। দু'জনেই নেমে গেল। তিনজনে এক সঙ্গে ধান ছড়ানো চত্বর পেরিয়ে, চলল সামনের পোড়োর ওপারে মন্দিরের দিকে।

সকালে-সন্ধেয় যে ঠাণ্ডার আমেজ থাকে এখন তা নেই। কোথাও সামান্য একটু শব্দও নেই। এমন নিঝুম দুপুর গোগোল কখনও দেখেছে বলে মনে পড়ে না। বিশেষ করে, এমন দৈত্যপুরীর নিঝুম দুপুর। মাঝে-মাঝে হুশ করে একটু হালকা বাতাস বয়ে যাচ্ছে। ঠিক যেন মানুষের দীর্ঘশ্বাসের মতো। বাতাসের শব্দকে কোনোদিন এমন মানুষের নিশ্বাসের মতো মনে হয়নি। আবার নিশ্বাসটাই কখনও-কখনও ফিস্‌ফিস্ কথার মতো যেন শোনাচ্ছে। গোগোল একা থাকলে ভাবত, সত্যি ওর আশেপাশে বুঝি মানুষ আছে। অথচ চোখে দেখা যায় না। এই প্রথম ওর মনে হল, চারদিকে কেমন একটা ভৌতিক পরিবেশ।

গোগোল চলেছে চিনুর পাশে-পাশে। কৃপা এককদম এগিয়ে। ওরা মন্দিরের পিছনে এল। একটা গোটা একতলা লম্বাচওড়া মস্ত বাড়ি যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। সেই বাড়িটার সামনের চত্বর ছোট। বিস্তর ইঁট ছড়ানো। ঘাস গজিয়েছে কোথাও কোথাও। আর সব দিক থেকে কতগুলো থাম, ভাঙা, ছাদ-ধসা বড়-বড় বাড়ি ওদের চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। ছায়াভরা, ঠাণ্ডা। কোনোদিকে যাবার পথ নেই।

গোগোলের তা মনে হলেও, কৃপা এগিয়ে গেল একটা সরু গলির দিকে। গলিটা পুরনো ভাঙাচোরা ইঁটের স্তূপ। কৃপা তার ওপর দিয়েই এগিয়ে গেল। চিনুরও খালি পা। ওর চুল খোলা আর শাড়ি জামা পরা। ইঁটের স্তূপে ওঠবার আগে, ও গোগোলের একটা হাত চেপে ধরল। দু'পাশে ভেঙে-পড়া দেওয়াল। খসে-পড়া জানালা। দরজা একটাও নেই। দু'পাশের ভাঙা ঘরগুলোর ভিতরে অন্ধকার। গোগোল একবার ওপরের দিকে তাকাল। একটা ছাদ এমন হুমড়ি খেয়ে আছে, যেন এখুনি মাথার ওপর ভেঙে পড়বে।

গলিটা পেরিয়ে ওরা এসে পড়ল বিরাট একটা চত্বরে। চারদিকেই বিশাল ভাঙাচোরা ইমারত। নোনাধরা ভাঙা ইঁটের পাঁজা। চত্বরটার নানা জায়গায় বড় বড় ফাটল। ঘাস ছাড়াও, ছোট ছোট জংলি গাছের ঝাড় গজিয়েছে এখানে-সেখানে। ডান দিকের একতলা থামওয়ালা বাড়িটা দেখে ঠাকুর-দালান মনে হয়। তার পিছনেই বিরাট একটা ঝাড়ালো গাছ। একটা কাকপক্ষীও চোখে পড়ে না। কৃপা প্রায় ফিসফিস করে বলল, "এটাই চণ্ডিকা-মহল।"

গোগোল চারদিকে তাকিয়ে দেখল। তিনদিকেই শ্যাওলা ধরা, পলেস্তারা খসা, ধসে পড়া বিশাল দোতলা বাড়ি। দক্ষিণমুখো বাড়িটার থামগুলো দাঁড়িয়ে আছে। সামনের ছাদ পড়েছে ধসে। ইঁটের স্তূপের ওপর রোদ পড়েছে। পশ্চিমের আর উত্তরের ইমারতের পিছন দিক। চিনু বলল, "চত্বরের দিকে অন্দরমহল।"

কৃপা দক্ষিণের বাড়ি আর ঠাকুর-দালানের মাঝখানে সরু গলির দিকে পা বাড়াল। বাড়িয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে গিয়ে থমকে গেল। যেন খুব অবাক হয়ে, ভয় পেয়ে চুপিচুপি গলায় বলল, "উ কী রে চিনুদি, তুই খোলা চুলে এসেছিস?"

চিনুও চমকে উঠে, দু'হাত দিয়ে খোলা চুল মুঠি পাকিয়ে ধরল। প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল, "একদম ভুলে গেছি।" বলে ও খোলা চুল পাকিয়ে শক্ত করে খোঁপার মতো বাঁধল।

গোগোল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "চুল খোলা রাখলে কী হয়?"

চিনু চোখ বড় করে, ঠোঁটে আঙুল চেপে তেমনি গলা নামিয়ে বলল, "গোগোল, এখানে আস্তে কথা বলো। এ সব জায়গায় ঘোর দুপুরে মেয়েদের খোলা চুলে আসতে নাই। ওদের নজর লেগে যায়।"

ওদের মানে ভূত-পেত্নিদের। গোগোল ভূতের গল্পের বইয়ে ওসব পড়েছে। জায়গা আর সময় বিশেষে ও সব নাম নাকি মুখে আনতে নেই। তা হলেই ওদের নজর লেগে যায়। এমন কী, ঘাড় মটকেও দিতে পারে। ওসবে গোগোলের বিশ্বাস নেই। তবে এই ঘোর দুপুরে, চণ্ডিকা-মহলে এসে, পরিবেশটা সত্যি যেন কেমন ভৌতিক মনে হচ্ছে। বিশেষ করে, হঠাৎ হালকা বাতাস যেন মানুষের নিশ্বাসের শব্দ শোনাচ্ছে, তেমনই চিনু আর কৃপার ফিসফিস কথাগুলোও আবহাওয়াটাকে বদলে দিচ্ছে। অথচ কৃপা যখন মাতঙ্গী মহলের এক চিলেকোঠায় প্যাঁচা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল তখন এরকম মনে হয়নি। গলা নামিয়ে চিনুকে জিজ্ঞেস করল, "এখানে জোরে কথা বললে কী হবে?"

চিনু চোখ বড় করে ফিসফিসিয়ে বলল, "ওরা রেগে যেতে পারে।"

কৃপা হাত তুলে ইশারা করে ওদের ডাকল। চিনু গোগোলের হাত ধরে কৃপার পিছনে পিছনে গেল। দক্ষিণমুখো বাড়ি আর ঠাকুর-দালানের মাঝখানের সরু গলি দিয়ে কৃপা এগিয়ে গেল। গোগোলও গেল চিনুর সঙ্গে। জংলি ঝোপঝাড়, ইঁটের টুকরো ছড়ানো গলির পথে। ঠিক এ-সময়েই ওদের পিছনে প্রচণ্ড একটা শব্দ হল। তিনজনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর এই প্রথম গোগোলের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। চিনু গোগোলের হাত জোরে চেপে ধরল। তিনজনেই পিছনে ফিরে তাকাল। প্রচণ্ড শব্দের পর তখনও ঝুরঝুর করে কিছু ভেঙে পড়ার শব্দ হচ্ছে। দেখা গেল, দক্ষিণমুখো বাড়িটার ছাদভাঙা ইঁটের স্তূপের থেকে ধুলো উড়ছে। আর ছোট-ছোট ইঁটের টুকরো নীচে পড়ছে। কৃপা চুপি-চুপি গলায় বলল, "ছাদের একটা চাংড়া ভেঙে পড়েছে।"

"কী করে পড়ল?" গোগোলও ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞেস করল, "ওখানে কেউ উঠেছে?"

কৃপা মাথা নেড়ে বলল, "তা কী করে জানা যাবে? তবে ভাঙা ছাদ তো। ওরকম আপনিই ভেঙে পড়ে।"

চিনু বলল, "কৃপা, নাচঘরের দিকে আর যাবি? ভেবে দ্যাখ্। নাচঘরের দিকে পা বাড়াতেই ছাদটা কেমন আচমকা ভেঙে পড়ল। আমার ভাল মনে হচ্ছে না।"

কৃপা বলল, "কিছু হবে না। তা হলে আসবার গোড়াতেই কিছু ঘটত। চলে আয়।"

কৃপার সাহস দেখে গোগোল ভরসা পেল। তিনজনেই এগিয়ে গেল। খানিকটা গিয়েই ওরা এসে পড়ল একটা পোড়োতে। পোড়োর এখানে-ওখানে কয়েকটা গাছ। বাঁ দিকে একটা লম্বা একতলা বাড়ি। সামনে লম্বা পাঁচিল ঘেরা একটা দোতলা বাড়ি। সবই জরাজীর্ণ, ভাঙাচোরা। কৃপা পাঁচিলের পাশ দিয়ে পুব দিকে এগিয়ে গেল। অনেকটা লম্বা পাঁচিল। অনেক জায়গায় ভেঙে পড়েছে। পাঁচিল পুব দিকে গিয়ে, উত্তর দিকে গিয়েছে। কৃপা সেই দিকে গেল। পুব দিকে একটা সবুজ পানাভরা পুকুর। ভাঙা ঘাট। গাছপালা আরও বেশি। উত্তর দিকে আরও খানিকটা গিয়ে কৃপা দাঁড়াল। পাঁচিলের গায়ে একটা ভাঙা দেউড়ি। ভিতরের চত্বরে ঘাস, চোরকাঁটা আর বেঁটে জংলিঝাড়ে ছাওয়া। একটা দোতলা বাড়ি। সামনেটা অর্ধবৃত্তাকার। সিঁড়িগুলোও সেইরকম। থাম দিয়ে ঘেরা। দোতলার সামনের দিকটাও নীচের মতো। কিন্তু থাম নেই। লোহার রেলিংয়ে ঘেরা, অর্ধবৃত্তাকার খোলা বারান্দা। গোটা বাড়িটা প্রায় আস্ত দেখাচ্ছে। শ্যাওলা-ধরা কিম্ভূত চেহারার বাড়িটার পলেস্তারা অনেক জায়গায় খসে পড়েছে। দরজা জানালাগুলো কোনোটা বন্ধ, কোনোটা খোলা। কৃপা পিছন ফিরে ঘাড় ঝাঁকিয়ে ইশারা করল তারপর দেউড়ির ভিতরে ঢুকল।

গোগোলও চিনুর সঙ্গে ঢুকল।

গোটা বাড়িটাই পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। খুব উঁচু আর সোজা তিনটি দেবদারু গাছ এদিকে-ওদিকে মাথা তুলে আছে। একটা দেবদারুগাছে পাতা প্রায় নেই। ডালপালাগুলো ন্যাড়া। কয়েকটা শকুন বসে আছে উঁচু ডালে। গোগোলের মনে হল, শকুনগুলো মুখ নিচু করে ওদের দেখছে। কৃপা বাড়িটাকে ডান দিকে রেখে এগিয়ে চলেছে। চিনু গোগোলের কানের কাছে মুখ ঠেকিয়ে ফিসফিস করে বলল, "এটা নাচঘর-বাড়ি।"

"এখানে কেউ থাকে?" গোগোলও ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল।

"চিনু মাথা নেড়ে বলল, "মানুষ কেউ থাকে না।"

রোদ থেকে তিনজনেই পিছনের ছায়ায় এল। এদিকে পাঁচিল খানিকটা একেবারে ভেঙে পড়েছে। সেই লম্বা একতলা বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। ভেঙে পড়া পাঁচিলের দিকে তাকিয়ে গোগোলের মনে হল, লোকজনের যাতায়াতের একটা সরু রেখার ছাপ রয়েছে। কৃপা তো এদিক দিয়েও আসতে পারত? তা হলে লম্বা পাঁচিলের পাশ দিয়ে, এতটা হেঁটে, সামনে দিয়ে ঢুকতে হত না। দেখা গেল নাচঘর-বাড়ির পিছনেও রয়েছে বারান্দা। থাম-টাম কিছু নেই। ছোট চৌকো বারান্দা। বারান্দার ওপরে, সামনেই দরজাটা খোলা। ভিতরে অন্ধকার। কৃপা এখানে কেন দাঁড়াল? ও জিজ্ঞেস করবার আগেই একটা বিচ্ছিরি গলার হ্যা-হ্যা হাসি বাড়ির ভিতর থেকে ভেসে এল। হাসিটা যেন বুকের হাড় কাঁপিয়ে দিল। চিনু গোগোলকে একেবারে গায়ের কাছে টেনে নিল। কৃপাও ওদের গায়ের কাছে দাঁড়িয়ে। গোগোল দেখল কৃপা বোতাম-খোলা জামার ফাঁকে পৈতেটা একহাতে চেপে ধরল।

কেউ যেন হেসে উঠেই থেমে গেল। গোগোল নীচের ঘরের অন্ধকারে দেখল। তারপর ওপরের দিকে তাকাল। এ কি ভূতের হাসি? নীচের থেকে, না ওপর থেকে ভেসে এল? গোগোল বুঝতে পারল না। ও কৃপা আর চিনুর মুখের দিকে দেখল। দু'জনের মুখেই ভয় আর উত্তেজনার ছায়া। যেন ওরা আরও কিছুর অপেক্ষা করছে। গোগোল আবার ওপরের দিকে তাকাল। রেলিং বা বারান্দায় কিছু নেই। রঙচটা বড়-বড় জানালার পাল্লাগুলো সব বন্ধ।

আবার আচমকা একটা শব্দ ভেসে এল। কাঁচের গেলাস বা বোতল ভেঙে পড়ার ঝনঝন্ শব্দ। চিনু চমকে উঠে গোগোলকে আরও শক্ত করে চেপে ধরল। আবার তৎক্ষণাৎ একটি মেয়ের চাপা গলার অস্পষ্ট কথা ভেসে এল। সে হাসছে না কাঁদছে, নাকি রেগে কথা বলছে, কিছুই বোঝা গেল না। গোগোল মাথা তুলে ওপরের দিকে তাকাল। একটা জানালার পাল্লা একটু খোলা। ও তাকাতেই একটা মুখ চকিতে সরে গেল। ও বলে উঠল, "চিনুদি, জানালায় একটা লোকের মুখ দেখতে পেলাম!"

কৃপা আর চিনু ওপর দিকে মুখ তুলে তাকাল। খোলা জানালার পাল্লাটা বাতাসে একটু-একটু নড়ছে। কৃপা ফিসফিসিয়ে বলল, "ওইরকমই দেখা যায়।"

গোগোল ওপর থেকে চোখ নামিয়ে নীচের ঘরের ভিতর দিকে তাকাল। ভিতরটা অন্ধকার হলেও ও যেন দেখল, একটা ছায়ামূর্তি একপাশ থেকে আর-একপাশে সরে গেল। অন্ধকারে মানুষকেই ওরকম দেখায়। কথাটা ও কৃপা-চিনুকে বলবে কি না ভাবছে। তখনই পিছন দিকে শোনা গেল, শুকনো পাতার ওপর দিয়ে কেউ এদিকে হেঁটে আসছে। উত্তর দিক থেকে শব্দটা আসছে। ওদিকে গাছপালাও আছে।

তিনজনেই পিছন দিকে তাকাল। শব্দটা ক্রমেই এগিয়ে আসছে। চিনু এবার কৃপার একটা হাতও চেপে ধরল। শব্দটা এখনও ভেঙে পড়া পাঁচিল থেকে একটু দূরে, আড়াল থেকে এগিয়ে আসছে। এ-সময়েই হঠাৎ ওপরের জানালার পাল্লাটা জোরে শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। তিনজনেই ওপর দিকে মুখ তুলে তাকাল। আর ঠিক তখনই শুকনো পাতার ওপর পায়ের শব্দও থেমে গেল। আবার সব নিঝুম।

গোগোল কিছুতেই কৌতূহল চাপতে পারল না। ও চিনুর হাত ছাড়িয়ে ছুটে গেল ভাঙা পাঁচিলের বাইরে। উত্তর দিকে তাকিয়ে দেখল, কেউ নেই। যে শুকনো পাতার ওপর দিয়ে হেঁটে আসছিল, সে কোনো গাছের আড়ালে লুকিয়ে নেই তো? বড় গাছগুলো লক্ষ করে গোগোল পা বাড়াতে গেল। কৃপা এসে তখনই ওর হাত চেপে ধরল। ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কোথা যাচ্ছ?"

"যে লোকটা আসছিল, সে বোধহয় কোনো গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে।" গোগোল উত্তেজিত হয়ে বলল।

কৃপাও উত্তেজিত হয়ে বলল, "তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ওরা কি লুকোয়? ওরা হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। চলে এসো।"

গোগোল বাধ্য হয়ে ফিরে এল। কিন্তু ওর মনে নানারকম সন্দেহ হতে লাগল। সত্যি কি ব্যাপারগুলো ভূতের কাণ্ড? পুরুষের হাসি, মেয়ের চাপা স্বর, কাঁচের বোতল ভাঙার শব্দ, ওপরের জানালায় মুখ, শুকনো পাতার ওপর পায়ে হাঁটার শব্দ, সবই ভুতুড়ে কাণ্ড? গোগোল নীচের একতলা ঘরের ভিতরে, অন্ধকারে তাকিয়ে ছিল। আবার দেখল, একটা ছায়া সরে গেল। চিনু বলল, "কৃপা, আর নয়, তাড়াতাড়ি ফিরে চল্।"

"বাড়িটার ভেতরে ঢুকে দেখলে হয় না?" গোগোল জিজ্ঞেস করল।

কৃপা আর চিনুর চোখ কপালে উঠল। চিনু গোগোলের হাত চেপে ধরে বলল, "খবরদার গোগোল, ও-কথা মুখেও এনো না। এ-বাড়ি যে কী বাড়ি, তোমার জানা নাই। তাই এত বড় কথা বলছ। আর এক দণ্ডও নয়, কৃপা, শিগগিরি চল্।"

গোগোল বলল, "চিনুদি, আমি নীচের ঘরে একটা মূর্তিকে চলে বেড়াতে দেখেছি।"

"ঐরকম আমরাও দেখেছি।" কৃপা বলল, "এখন চলো, আমরা এদিক দিয়ে চলে যাই।"

হঠাৎ একরাশ ধুলো আর শুকনো পাতা ওদের তিনজনের গায়ে মাথায় এসে পড়ল। চিনু আর কৃপা তাকাল ওপর দিকে। গোগোলের মনে হল, ধুলো আর শুকনো পাতা পিছনের ভাঙা পাঁচিলের দিক থেকে এসে পড়ল। ও সেদিকে তাকাল। আর মনে হল, চকিতেই যেন একটা ছায়া ভাঙা পাঁচিলের কাছ থেকে সরে গেল। ও আবার চিনুর হাত ছাড়িয়ে সেদিকে ছুটে গেল। চিনু আর্ত চাপা স্বরে ডেকে উঠল, "গোগোল!"

গোগোল ভাঙা পাঁচিলের বাইরে গিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। ডাইনে বাঁয়ে, কোনোদিকেই কেউ নেই। সামনের লম্বা একতলা বাড়িটার দরজা-জানালা সব বন্ধ। এত তাড়াতাড়ি কি সেখানে কেউ ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিতে পারে? অসম্ভব। গোগোল নিজের মনেই বলল। এ কি সবই ভূতের ভোজবাজি? এ সময়েই আবার সেই বুক-কাঁপানো পুরুষের গলার হ্যা-হ্যা হাসি ভেসে এল। কৃপা এসে গোগোলের হাত চেপে ধরল। ও ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, "এখানে কী করছ?"

"আমার মনে হল, এদিকে একটা মানুষের ছায়া চট করে সরে গেল," গোগোল বলল, "কিন্তু এসে আর কাউকে দেখতে পাচ্ছিনে।"

কৃপা গোগোলকে টেনে নিয়ে ভাঙা পাঁচিলের ওপারে যেতে যেতে বলল, "ওদের কি ওভাবে দেখা যায় নাকি? ওরা ওইরকমই দেখা দিয়ে চলে যায়। চলো, আমরা এবার পালাব।"

চিনুও গোগোলের একটা হাত ধরল। কৃপা নাচঘর-বাড়ির অন্য

দিক দিয়ে চলতে আরম্ভ করল। হ্যা-হ্যা হাসিটা তখন থেমে গিয়েছে। এদিকেও পাঁচিল অনেক জায়গায় ভেঙে মাটিতে মিশেছে। আর পাঁচিলের বাইরে গাছপালা অনেক বেশি। এ পাশে বাড়িটার প্রত্যেকটি দরজা বন্ধ। দুটো জানালা খোলা। দোতলার কয়েকটা জানালাও খোলা। ওরা তিনজনেই এগিয়ে চলেছে সামনের দেউড়ির দিকে।

ঠিক এ সময়েই একটি শিশুর সরু গলার কান্না শোনা গেল কান্নার শব্দ ভেসে এল গাছের ওপর থেকে। ওরা তিনজনে সেদিকে তাকাল। আর তৎক্ষণাৎ একটি স্ত্রীলোকের চাপা কান্নার স্বরও ভেসে এল। এই শব্দটা এল যেন দোতলার কোনো ঘর থেকে। ওরা তিনজনেই হাত ধরাধরি করে ছিল। চিনু সবাইকে নিয়ে ছুটতে আরম্ভ করল। খাঁখাঁ নিঝুম দুপুরে সেই দুরকম কান্নার স্বরে গোগোলেরও গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। কিন্তু ওর নজর তখন একটা গাছের উঁচু ডালে। শিশুর সরু গলার গোঙানি কান্না ওখান থেকেই ভেসে আসছে। দেখল, একটা বড় গাছের উঁচু ডালে কয়েকটা শকুন বসে আছে। তার মধ্যে যে একটা গৃধিনী, গলার লাল ঝোলা দেখে বোঝা গেল। গোগোলের মনে হল, বাচ্চার কান্নাটা আসলে গৃধিনীর ডাক। কিন্তু স্ত্রীলোকের কান্নাটা?

গোগোলের দাঁড়াবার উপায় ছিল না। ওর দু' হাত কৃপা আর চিনু ধরে ছিল। ওদের সঙ্গে ওকেও ছুটতে হচ্ছিল। কিন্তু ওর নাকে একটা গন্ধ ভেসে এল। গন্ধটা যে গাঁজার ধোঁয়ার, তা ও জানে। ওদের ফ্ল্যাটবাড়ির সিকিউরিটি গার্ডদের দু'জন গাঁজা খায়। গন্ধটা ওর চেনা। কিন্তু এই ভুতুড়ে পোড়ো বাড়ির কোথা থেকে এই বিচ্ছিরি গন্ধ ভেসে আসছে, সে-কথা ও জিজ্ঞেস করতে পারল না। দুটো কান্নার স্বরই তখনও দৈত্যপুরীর খাঁখাঁ দুপুরে আতঙ্ক ছড়িয়ে চলেছে। ওরা তিনজনেই দেউড়ির বাইরে এসে পড়ল। তবু চিনু আর কৃপা থামল না। সামনের পানা-ঢাকা পুকুরের পাশ দিয়ে ছুটতে লাগল। কান্নার স্বর তখনও একটু-একটু শোনা যাচ্ছে।

পুকুরের পার ছাড়িয়ে, ভাঙাচোরা বাড়ির অলিগলি দিয়ে ওরা ছুটে বেরিয়ে এল দুর্গামহলের কাছাকাছি গোগোলের চোখে পড়ল, ওদের গাড়িটা রয়েছে একটা পোড়ো বাড়ির ছায়ায়। লোকজন কেউ কোথাও নেই। কৃপা আর চিনু দাঁড়াল। তিনজনেই হাঁফাচ্ছে। ঘেমেও উঠেছে। চিনু ওর শাড়ির আঁচল দিয়ে গা-মাথার ধুলো আর শুকনো পাতা ঝেড়ে নিল। গোগোল আর কৃপার গা-মাথাও ঝেড়ে দিল। আর বলল, "বাড়িতে যদি জিজ্ঞেস করে আমরা কোথায় গেছিলাম, তা হলে বলব, দুর্গা-মহলে এসে আমরা গাড়ি চলার পাকা রাস্তা দেখতে গেছলাম।"

গাড়ি চলার পাকা রাস্তা মানে হাইওয়ে। গোগোল বলল, "নাচবাড়িতে আমি গাঁজার গন্ধ পেয়েছিলাম।"

কৃপা এতক্ষণে হাসল। বলল, "উখানে উরকম অনেক গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু তুমি কি সত্যি নাচবাড়ির ভিতরে ঢুকতে পারতে?"

গোগোল জবাব দিতে গিয়ে থমকে গেল। সেখানকার ছবিটা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। মাথা নেড়ে বলল, "না। কিন্তু তোমরা ঢুকলে আমার সাহস হত।"

"ওরকম সর্বনেশে সাহস আমাদের নাই।" চিনু বলল, "জানো, ও বাড়িটাকে বলা হয় পাপের বাড়ি। ও বাড়িতে কয়েকটা খুন হয়েছে।"

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "কবে?"

কৃপা আর চিনু দুজনেই হেসে উঠল। চিনু বলল, "সে তো অনেককাল আগের কথা। যখন ও-বাড়িতে নাচগান আর জলসা হত। আমার বাবাও তা দেখেন নাই। ঠাকুর্দা নাকি একটু-আধটু দেখেছিলেন। তাও তাঁর ছেলেবেলায়।"

"কিন্তু ভূত দেখা হল না।" গোগোল আপসোস্ করে বলল।

কৃপা অবাক হয়ে বলল, "সে কী! তুমি যে দোতলার জানালায় একটা মুখ দেখতে পেয়েছিলে? আর পাঁচিলের ধারে একটা ছায়া? উগুলানই তো তারা।"

গোগোলের মনে সন্দেহ থাকলেও, কিছু বলতে পারল না। কৃপা জিজ্ঞেস করল, "দোতলার জানালার মুখটা দেখতে কেমন, মনে আছে?"

"মাত্র তো দু-এক সেকেণ্ডের মধ্যে দেখেছি।" গোগোল বলল, "ব্যাটাছেলে, ফরসা রোগা মুখ, চুলগুলো কেমন ছাই-ছাই। লোকটা বোধহয় হাসছিল। দাঁতগুলো মুলোর মতো লম্বা মনে হচ্ছিল। আর চোখ দুটো প্যাঁচার মতো গোল, লালমতো।"

চিনু চোখ বড় করে বলল, "এর পরেও তুমি বলছ, ওদের দেখ নাই?"

কৃপা বলল, "তা বাদে উই শব্দগুলান? হাসি কান্না, শুকনো পাতার উপর হেঁটে আসা?"

গোগোল ভাবল, কথাগুলো মিথ্যা নয়। ওর ভয়ও করছিল। জিজ্ঞেস করল, "ওই নাচঘর-বাড়িতেই শুধু ভূত আছে?"

কৃপা বলল, "তা ক্যানে? শিমুলগড়ের অনেক বাড়িতেই আছে। আত্মাগুলান বেশির ভাগ ভাল। উৎপাত করে না। এখনও দু'চার দিন আছ তো। হয়তো আরও দেখতে পাবে।"

"আচ্ছা, ওরা আমাদের গায়ে ওরকম ধুলো আর শুকনো পাতা ছুঁড়ে মারল কেন?" গোগোল জিজ্ঞেস করল।

চিনু গম্ভীর মুখে চোখ ঘুরিয়ে বলল, "ওটা হল ওদের ইশারা। এবার তোমরা চলে যাও।"

"যদি না আসতাম?" গোগোলের চোখে কৌতূহল।

কৃপা বলল, "না এলে, হয়তো মাথায় ছাদ ভেঙে পড়ত! চণ্ডিকামহলের বড় বাড়ির ছাদের চাংড়া যেমন ভেঙে পড়েছিল।"

গোগোল মনে মনে শিউরে উঠল। তা হলে আর দেখতে হত না। গোটা শরীরটা থেঁতলে যেত।

তিনজনেই মাতঙ্গী-মহলের দিকে চলল। গোগোলের মাথায় ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানাগুলো পাক খেতে লাগল।

॥ সাত ॥

পরদিন সকালেই যে কারখানা কোম্পানির লোকজন আসবে, গোগোল তা রাত্রেই শুনেছিল। শিমুলগড়ের সাত-আট শরিকঘরের সবাই কোম্পানির লোকদের সঙ্গে কথা বলতে আসবেন। বৈঠক হবে দুর্গামহলের এক বাড়ির বাইরের বারান্দায়। সেখানেই যে-যার দলিলপত্র সঙ্গে নিয়ে আসবেন। রবিবার দিনটা ঠিক হয়েছে, কারণ, শরিকদের তিনজন কলকাতায় চাকরি করেন। তাঁরা প্রত্যেক সপ্তাহে শনিবার শিমুলগড়ে আসেন। আবার সোমবার ভোরবেলা চলে যান।

সকালবেলা যোগদানন্দমামা বাবা-মা'কে নিয়ে দুর্গামহলে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এমন সময়ে একজন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। বয়স যোগদানন্দমামার মতোই হতে পারে। তবে বেঁটেখাটো। মাথায় টাক। ধুতি-জামা তেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয়। এসে বললেন, "যোগদা, তুমি কি বটুকদার খবরটা পেয়েছ?"

ইতিমধ্যে গোগোলকে বলা হয়েছিল, যোগদানন্দকে যেন ও যোগমামা বলে ডাকে। যোগমামা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "না তো? বটুকদার কী হয়েছে পঞ্চু?"

পঞ্চুবাবু বললেন, "কাল রাতে বটুকদাকে কে বা কারা ফাবড়া ছুঁড়ে মেরেছে। তার মাথা ফেটে গেছে। ঘাড়ের একটা হাড়ও বোধহয় ভেঙেছে। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হচ্ছে।"

গোগোলের মনে পড়ল, বটুক মুখুজ্যে গতকাল সকালে যোগমামার বাইরের ঘরে এসে বসেছিলেন। কৃপা বলেছিল, যোগমামা আর বটুক মুখুজ্যে নাকি লোক খারাপ। যোগমামা চোখ

কপালে তুলে বললেন, "সে কী ! কত রাতে ? কোথায় ফাবড়া ছুঁড়ে মেরেছে ?"

পঞ্চুবাবু বললেন, "তা তখন নাকি রাত সাড়ে দশটা এগারোটা হবে। বটুকদার শিবামহলের একটু দূরেই, অন্নপূর্ণামহলে যাবার পোড়োর কাছে মারা হয়েছে। চিৎকার শুনে বটুকদার বড় ছেলে বাতি নিয়ে ছুটে যায়। সে কারুকে দেখতে পায় নাই। বটুকদা পোড়োয় পড়ে ছিল। মাথা থেকে রক্ত পড়ছিল। বটুকদার হাতে একটা টর্চলাইট ছিল। ফাবড়াটাও পড়েছিল কাছেই।"

মামিমা ঘোমটা মাথায় দিয়ে সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, "সর্বনাশ ! ই তো খুন করার মতলব মনে হচ্ছে

গোগোল দেখল, বাবা মা'র মুখে কেমন ভয় আর অস্বস্তির ছাপ। যোগমামা অবাক হয়ে বললেন, "তা বটুকদা অত রাতে উদিকে কোথা যাচ্ছিলেন ?"

পঞ্চুবাবু বললেন, "তা কে বলবে ? বটুকদা তো কথা বলতে পারছে না।"

ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন যোগমামার বাইরের ঘরে এসে জুটলেন। সকলের মুখেই এক কথা। যোগমামা বললেন, "দেখ তো কী কাণ্ড ! কারখানা-কোম্পানির লোকজন বোধহয় এতক্ষণে এসে পড়েছে। বাড়ি জমি মাপজোক হয়ে গেছে। সকলে মিলে বসে আজ একটা মোটামুটি হিসাব-নিকাশ হয়ে যাবার কথা। গোড়াতেই শুভ কাজে বাধা।"

"শুভ কি অশুভ কাজ, তা-ই বা কে বলতে পারে ?" একজন বয়স্ক চশমা-চোখে লোক বললেন, "আমি তো ক'দিন ধরে সন্ধের মুখে ঘর থেকে বেরোতেই পারছি না। বেরোলেই কোথা থেকে বড় বড় ঢেলা এসে গায়ের কাছে পড়ছে। বৈঠকখানার বাইরে বসে যে বই পড়ব, তারও উপায় নাই। যখন-তখন ইঁট-পাটকেল এসে পড়ছে। মাথায় পড়লে মাথা ফেটে যেত।"

আর একজন বললেন, "যাক, এখন আসল কথা হল, বটুকদাকে হাসপাতালে পাঠাবার জন্য এঁদের গাড়িটা কি পাওয়া যাবে ?" বলে তিনি বাবাকে দেখালেন।

বাবা নিজেই ব্যস্ত হয়ে বললেন, "নিশ্চয়ই। এখুনি নিয়ে চলে যান। আমি ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি। আর একটা কাজ করবেন। বটুকদাকে যাঁরাই নিয়ে যান, তাঁরা যেন থানায় একটা খবর দেন। পুলিশের তদন্ত হওয়া দরকার।"

বাবার কথা শুনে সবাই নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। সেই চশমা-চোখে বয়স্ক ভদ্রলোক বললেন, "পুলিশের তদন্তে কি আর কেউ ধরা পড়বে ? দেখা যাবে, এও খুনেভূতের কাণ্ড। তবে, থানায় খবর দিতেই হবে। পুলিশের আসা দরকার।"

যোগমামা বললেন, "যারা কোম্পানির লোকের সঙ্গে বসবে, তারা যেন কেউ হাসপাতালে বা থানায় না যায়। আমরা কোম্পানির লোকের সঙ্গে কথা বলব। বটুকদার দলিল নিয়ে পরে কথাবার্তা হবে।"

পঞ্চুবাবু বললেন, "আর রামহরিকাকার ব্যাপারে কী হবে ? তিনি তো শয্যাশায়ী।"

"তাঁকে নিয়েই তো হয়েছে মুশকিল।" যোগমামা বললেন, "তাঁর তো নিজের সাতকুলে কেউ নেই। উইলও করেননি। শুনেছি, কার নাম নাকি লিখে রেখেছেন, যাকে সর্বস্ব দিয়ে যাবেন। আর সেটা তিনি কোম্পানির লোক ছাড়া কারুকে দেখাবেন না। এখানে আমাদের কিছু করার নাই। কোম্পানির লোক অন্নপূর্ণামহলে তাঁর ঘরে গিয়ে দেখা করবে।"

এই সময়েই গোগোলের চোখ পড়ল বাইরের চত্বরে। দেখল কৃপা সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

কৃপার নজর ঘরের দিকেই। গোগোলের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ও বেরিয়ে গেল। কৃপা বলল, "খবর সব শুনেছ ?"

"শুনেছি।" গোগোল বলল, "বটুকবাবুকে নাকি কাল রাত্রে কী একটা ছুঁড়ে মারা হয়েছে। তাঁর মাথা ফেটে গেছে, ঘাড়ের হাড়ও ভেঙে গেছে।"

কৃপা বলল, "হ্যাঁ, ফাবড়া ছুঁড়ে মেরেছে।"

"সেটা কী জিনিস ?"

"বাঁশের তৈরি একরকমের শক্ত ছোট লাঠি।" কৃপা বলল, "ফাবড়া সবাই ছুঁড়তে পারে না। খুনেরাই পারে। ফাবড়া ছুঁড়ে মানুষ খুনও করা যায়।"

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "এও কি খুনে ভূতের কাণ্ড ?"

কৃপা বলল, "কী করে বুঝবে বলো ? যোগদাকাকাকে যখন মাথার পেছনে টাঙ্গি দিয়ে মেরেছিল, তখনও কেউ ধরা পড়েনি। বটুকজ্যাঠা যে ক্যানে অত রাতে বার হয়েছিল, তাও বোঝা যাচ্ছে না। কয়েক ঘরে বিজলি-বাতি এলেও অত রাতে এখানে কেউ বার হয় না। আমার বাবা একটা কথা বলছিল।"

গোগোল কৃপার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। কিন্তু কৃপা কিছু না বলে যোগমামার বাইরের ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখছিল। বলল, "আমার বাবা ওইখানে রয়েছে।"

গোগোলও ঘরের দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, "কে তোমার বাবা ?"

"পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়।" কৃপা বলল, "ওই যে, মাথায় টাক।"

গোগোল বলে উঠল, "যোগমামা যাঁকে পঞ্চু বলে ডাকছিলেন

"হ্যাঁ।"

"তোমার বাবা এসেই তো প্রথম বটুকবাবুর খবর দিলেন।" গোগোল বলল, "কিন্তু তোমার বাবা কী বলেছিলেন, বললে না তো ?"

কৃপা গলার স্বর নিচু করে বলল, "বাবা বলছিল, বটুকজ্যাঠা বোধহয় অন্নপূর্ণামহলে যাচ্ছিল। শিবামহল থেকে অন্নপূর্ণামহলে যেতে হলে যে-পোড়ো পেরিয়ে যেতে হয়, সেই পোড়োতেই বটুকজ্যাঠাকে ফাবড়া ছুঁড়ে মারা হয়েছিল।"

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "অন্নপূর্ণামহলে গেলে কী হত ?"

কৃপা কিছু বলবার আগেই দেখা গেল, বটুকবাবুকে চাদর জড়িয়ে কয়েকজন কাঁধে করে নিয়ে আসছে। কৃপা আর গোগোল সরে দাঁড়াল। বটুকবাবুকে যারা নিয়ে আসছিল, তারা যোগমামার ঘরের সামনে দাঁড়াল। গোগোল দেখল, বটুকবাবুর মাথায় রক্তমাখা

ন্যাকড়া জড়ানো। দুজনের কাঁধের ওপরে তাঁর মাথাটা একপাশে কাত হয়ে আছে। চোখ বোজা। দেখে মনে হয়, তাঁর জ্ঞান নেই। যোগমামার ঘর থেকে সবাই বেরিয়ে এলেন। কৃপার বাবা পঞ্চুবাবু বললেন, "কথাবার্তা হয়ে গেছে। বটুকদাকে গাড়িতে নিয়ে তোলো। হাসপাতালে যাবার পথে একজন নেমে গিয়ে, থানায় খবর দেবে।"

বাবা ইতিমধ্যেই ড্রাইভার নিতাইকে বলে রেখেছিলেন। যারা বটুকবাবুকে কাঁধে করে নিয়ে এসেছিল, তারা চলে গেল। যোগমামা বললেন, "আমরাই বা আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকি ক্যানে? কারখানা কোম্পানির লোকেরা এতক্ষণে দুর্গামহলে এসে গেছে। আমরা চলে যাই।"

সকলেই তাঁর কথায় সায় দিলেন। যোগমামা মাকে আর বাবাকেও ডাকলেন, "চলো সমীরেশ, তুমি আর সুনীতিও চলো। দেখা যাক, কাজ কদ্দুর এগোয়। জে. এল. আর. ও. সাহেবকেও বলা আছে। উনিও নিশ্চয় এতক্ষণে এসে গেছেন। কথা আছে, উনি সব রেকর্ড নিয়ে আসবেন।"

চশমা চোখে সেই বয়স্ক ভদ্রলোক বললেন, "তিনি না এলে তো কোনো কাজই হবে না। তাঁর অফিসের রেকর্ডই তো আসল।"

"অবশ্য সে-সব কাজ আমি অনেকখানি এগিয়ে রেখেছি।" যোগমামা বললেন, "কথাবার্তাও হয়েছে। কারখানা-কোম্পানির লোকের সঙ্গেও ওঁয়ার কথা হয়েছে।"

মা এগিয়ে এলেন গোগোলের কাছে। গম্ভীর মুখে বললেন, "শোনো গোগোল, তুমি এখান থেকে কোথাও এক পা যাবে না। যদি কোথাও যাও, চিনুদির সঙ্গে যাবে। চিনুকে আমি বলে রেখেছি।"

গোগোল ভাল ছেলের মতো ঘাড় কাত করে বলল, "আচ্ছা।"

যোগমামার সঙ্গে সবাই দুর্গামহলের দিকে পুবে চলে গেলেন। বিশাল চত্বরে ধান শুকোতে দেওয়া হয়েছে। গোবরা আর দুজন কৃষাণ, ধানের বড় গোলার ছায়ায় দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কী সব বলাবলি করছিল। দুটি বউও তাদের কথা শুনছিল। এ সময়েই পশ্চিমের দোতলা থেকে জন্তুর তীক্ষ্ণ গর্জন ভেসে এল। গোগোল ভয় পেয়ে চমকে সেদিকে তাকাল। কৃপা বলল, "কালিয়া পাগলটা আজ খেপেছে।"

গোগোল এমন ভয় পেয়েছিল, ওর বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে। কিন্তু কালিয়াকে ও দেখতে পেল না। একজন মহিলার চড়া ধমকের স্বর শোনা গেল, "চুপ! চুপ কর। নইলে পিটিয়ে শেষ করব।"

কৃপা বলল, "কালিয়ার মা ধমকাচ্ছে।"

কালিয়ার সেই জন্তুর মতো চিৎকার থামছে না। কালিয়ার মায়ের গলাও চড়ছে। তারপরে মনে হল, কালিয়াকে বোধহয় সত্যি পেটানো হচ্ছে। ওর সেই বুক-কাঁপানো চিৎকার ক্রমেই যেন দূরে সরে যাচ্ছে। কৃপা বলল, "উয়ার মা উয়াকে এবার দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখবে। আর পাগলটা যদি বেরিয়ে আসে, যাকে পাবে, তাকেই আঁচড়ে-কামড়ে দেবে।"

"বেরিয়ে আসতে পারবে কি?" গোগোল সভয়ে জিজ্ঞেস করল।

কৃপা বলল, "বলা যায় না। এক-এক দিন তো ছুটে বেরিয়ে আসে। তবে উয়ার মা খুব শক্ত আছে। মনে হচ্ছে, ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছে।"

গোগোলেরও তাই মনে হল। কালিয়ার চিৎকারটা যেন ভিতরে কোথায় চাপা পড়ে যাচ্ছে। গোগোল আবার আগের কথাটাই জিজ্ঞেস করল, "এবার বলো, বটুকবাবু অন্নপূর্ণামহলে গেলে কী হত?"

কৃপা আবার গলার স্বর নিচু করে বলল, "বোধহয় রামহরিঠাকুর্দার কাছে যেত। সে তো খুব বুড়া হয়ে গেছে। হাঁটাচলা করতে পারে না। চোখেও ভাল দেখতে পায় না।"

গোগোলের মনে পড়ল, কিছুক্ষণ আগে কৃপার বাবা পঞ্চুবাবুর সঙ্গে যোগমামার কথাবার্তা। তাঁরা রামহরিঠাকুর্দার কথা বলাবলি করছিলেন। রামহরিঠাকুর্দা দুর্গামহলে যেতে পারবেন না। কোম্পানির লোকেরাই তাঁর কাছে যাবেন। তিনি তাঁর জমি বাড়ির টাকা কাকে দিয়ে যাবেন, কেউ জানে না। তিনি নাকি কাগজে কী লিখে রেখেছেন, সেটাই কোম্পানির লোককে দেখাবেন। তবে তিনি কোনো উইল করেননি। যোগমামা না পঞ্চুবাবু, কে যেন বলছিলেন। গোগোল সে-কথা কৃপাকে বলল। কৃপা শুনে অবাক হয়ে বলল, "তুমি এ-কথা শুনেছ? তা হলে তো সবই বুঝেছ।"

"কী বুঝব?" গোগোল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

কৃপা তেমনি নিচু স্বরে, একটু বেশ উত্তেজিত হয়ে বলল, "রামহরিঠাকুর্দার তো কেউ নাই, অন্নপূর্ণামহলের জমিবাড়ির বিক্রির টাকা অনেক-অনেক! সকলের থেকে ওঁয়ারই বেশি টাকা পাবার কথা। কিন্তু ঠাকুর্দা কাকে টাকা দিয়ে যাবে, সেটা নিয়েই সবার মাথাব্যথা। বটুকজ্যাঠা সেটা জানবার জন্যেই বুড়ার ঘরে বোধহয় যেতে চেয়েছিল।"

"সেটা তো তিনি অন্য সময়ও জানতে পারতেন?" গোগোল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "অত রাত করে যাচ্ছিলেন কেন?"

কৃপা মাথা নেড়ে বলল, "বাবা সে-কথা কিছু বলে নাই। আমি শুনলাম, বাবা মাকে বলছিল, উ মতলবেই বটুকজ্যাঠা অন্নপূর্ণামহলে যাচ্ছিল, আর তাইতেই ফাবড়ার বাড়ি এসে লেগেছে।"

কৃপার কথা থেকে গোগোল কিছুই বুঝতে পারল না। বটুকবাবু বেশি রাত্রে অন্নপূর্ণামহলে রামহরিঠাকুর্দার কাছে যাচ্ছিলেন বলেই ফাবড়া ছুঁড়ে মারা হয়েছিল? তার মানে কী? গোগোল কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল। কৃপা ফিসফিস করে বলল, "চিনুদি আসছে। এখন আর এসব কথা নয়।"

গোগোল মুখ ফিরিয়ে দেখল। চিনুদি সিঁড়ি দিয়ে চত্বরে নেমে ওদের কাছে এগিয়ে এল। ওর মুখ গম্ভীর। একটু যেন ভয়ও পেয়েছে। কাছে এসে বলল, "কী যে সব ঘটছে, আমার একটুও ভাল লাগছে না। বটুকজ্যাঠাই বা ক্যানে যে অত রাতে অন্নপূর্ণামহলে যাচ্ছিল, কে জানে! এ নিশ্চয় নিশির ডাক।"

"নিশির ডাক মানে?" গোগোল জিজ্ঞেস করল।

চিনু বলল, "নিশি মানে খারাপ আত্মা। স্বপ্নের ঘোরে ডেকে নিয়ে যায়। নিয়ে গিয়ে ঘাড় মটকে মেরে ফেলে।"

গোগোল বলল, "ঘাড় তো মটকায়নি। ফাবড়া ছুঁড়ে মেরেছে।"

"একই কথা।" চিনু বলল, "যে-ভাবেই হোক, বটুকজ্যাঠাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। এখন প্রাণে যদি বেঁচে যায়, তা হলেই মঙ্গল।"

গোগোল কৃপার দিকে তাকাল। কৃপা কোনো কথা বলছে না। চুপচাপ শুনছে। গোগোলের তখন খুব ইচ্ছে করছে, সেই পোড়োটা একবার দেখে আসবে, যেখানে বটুকবাবুকে ফাবড়া ছুঁড়ে মারা হয়েছিল। ও বলল, "চিনুদি, সেই পোড়োটা আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।"

"যে-পোড়োয় বটুকজ্যাঠাকে মেরেছিল?" চিনু জিজ্ঞেস করল।

গোগোল মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "হ্যাঁ।"

চিনু ভুরু কুঁচকে একটু ভাবল। কৃপার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "যাবি কৃপা?"

কৃপা বলল, "ক্যানে যাব না? চল্।"

চিনু ধানের গোলার দিকে তাকিয়ে গলা তুলে বলল, "অই

গোবরাদা, শোন্। মা যদি আমাকে খোঁজ করে, বলিস্ আমি গোগোলকে নিয়ে একটু ঘুরে আসছি।"

গোবরা ঘাড় কাত করে শব্দ করল, "হি।"

তিনজনেই পশ্চিম দিকে চলল। বেশ কয়েকটা বিশাল ভাঙা অট্টালিকার ভিতরের অলিগলি দিয়ে, ওরা এসে দাঁড়াল একটা বড় বাড়ির চত্বরের সামনে। সেখানে ঠাকুর-দালান, মুখ থুবড়ে পড়া বিশাল বাড়ির দক্ষিণে প্রায় আস্ত একটা একতলা বাড়ি। অনেক জায়গায় সিমেন্ট-বালির কাজ করা। একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নও বটে। এখানেও ধান শুকোচ্ছে। একদিকে বড়-বড় দুটো ধানের গোলা। দু'তিনজন বউ-পুরুষ কাজ করছে। ইলেকট্রিকের পোস্টও রয়েছে। চিনু বলল, "এটা বটুকজ্যাঠার বাড়ি। জেঠিমা খুকুদিরা নিশ্চয় কান্নাকাটি করছে।"

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "সেই পোড়োটা কোথায়?"

কৃপা পশ্চিমের ভেঙে পড়া একটা বিশাল বাড়ি দেখিয়ে বলল, "উয়ার পিছনে। ঠাকুর-দালানের পাশ দিয়ে যেতে হবে।" বলে ও চিনুকে জিজ্ঞেস করল, "চিনুদি, তুই কি এখন বটুকজ্যাঠার বাড়ি ঢুকবি?"

চিনু মাথা নেড়ে বলল, "না। কান্নাকাটি শুনতে আমার ভাল লাগে না।"

কৃপা ভাঙাবাড়ি আর ঠাকুর-দালানের কোণ বরাবর এগিয়ে গেল। চিনু গোগোল গেল ওর পিছু পিছু। ঠাকুর দালান ডান দিকে রেখে, বাঁ দিকের বিরাট ধসে পড়া বাড়িটা ঘেঁষে, ওরা এসে পড়ল একটা খোলা জায়গায়। কৃপা বলল, "এই সেই পোড়ো।"

গোগোল ভেবেছিল, যোগমামার বাড়ির উত্তর দিকে, মন্দিরের সামনে যেরকম ঘাসে ছাওয়া পোড়ো আছে, এটাও সেই রকমই হবে। কিন্তু দেখল, তা নয়। পোড়োটার চারপাশে বোধহয় পাঁচিল ছিল। তার সবটাই ভেঙে পড়েছে। খোলা জায়গাটার চারদিকে ছড়ানো ভাঙাচোরা ইঁট। দক্ষিণে কয়েকটা গাছ। গাছের আড়ালে একটা ভাঙা মন্দির। মন্দিরের পিছনে মাথা উঁচু করে আছে অর্ধেক ভেঙে পড়া একটা বাড়ির চিলেকোঠা। পশ্চিমে আর উত্তরেও দুটো বাড়ি। পশ্চিমের বাড়িটার অর্ধেকই প্রায় ধসে পড়েছে। তার ফাঁক দিয়ে, একটা চত্বর দেখা যাচ্ছে। চত্বরের পশ্চিমে আর-একটা থামওয়ালা বড় বাড়ি দেখা যাচ্ছে। দেখে মনে হয়, বাড়িটা আস্ত আছে। তবে পলেস্তারা খসে পড়েছে অনেক জায়গায়। বট অশথের চারা গজিয়েছে দোতলার রেলিঙে, ছাদের আলসেয়। কৃপা সেদিকে হাত তুলে দেখিয়ে বলল, "উইটা হচ্ছে অন্নপূর্ণামহল।"

গোগোল সেদিকে একবার মুখ তুলে দেখল। তারপরে পোড়োটার চারদিকে চোখ বুলিয়ে, উত্তরের গাছপালা, মন্দির, উঁচু ভাঙা চিলেকোঠার দিকে তাকাল। কৃপার বাবার কথা যদি ঠিক হয়, বড়কবাবু এ পোড়ো দিয়েই অন্নপূর্ণামহলে যেতে চেয়েছিলেন। চিনু প্রায় ফিসফিস্ করে বলল, "এখানে এলে আমার নাচবাড়ির মতো লাগে।"

"লাগবেই তো।" কৃপা বলল, "আমি এ শিবামহলের পিছনে উয়াদের অনেকবার দেখেছি।"

গোগোল বুঝল, উয়াদের মানে ভূতদের। জায়গাটা দেখে ওরও কেমন একটা অস্বস্তি লাগছে। কোথাও একটা লোক নেই। এই সকালেও, সব কেমন নিঝুম। একটা পাখিও ডাকছে না। কিন্তু ওর এখন অন্নপূর্ণামহলে যেতে ইচ্ছে করছে। জিজ্ঞেস করল, "অন্নপূর্ণামহলটাও কি এরকম?"

"না। অন্নপূর্ণামহল এরকম না।" কৃপা বলল, "উখানে অন্নপূর্ণার মন্দির আছে, মন্দিরে অন্নপূর্ণার মূর্তি আছে। নিত্য পুজো হয়। উখানে কোনো উৎপাত নাই।"

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "চিনুদি, অন্নপূর্ণামহলে যাবে?"

"হ্যাঁ, চলো।" চিনু বলল, "এ পোড়োয় দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে অন্নপূর্ণামহলে যাওয়াই ভাল।"

কৃপা চলল আগে আগে। গোগোল আর চিনু ওর পিছনে। ওরা দক্ষিণের আর পশ্চিমের ভাঙা বাড়ির সরু গলির ভিতর দিয়ে এসে পড়ল বিশাল এক চত্বরের ধারে। গোগোল এই প্রথম দেখল, চত্বরটা পুরোপুরি সমান নয়। একটা যোগচিহ্নের মতো, চত্বরটা চার ভাগে বিভক্ত। যোগচিহ্নের মতো বিরাট দাগটা প্রায় এক ফুটের মতো উঁচু। মাঝখানে খানিকটা জায়গা গোল রেখায় ঘেরা। এক ফুট উঁচু আর প্রায় সেইরকম চওড়া রেখার পলেস্তারা খসে ছোট-ছোট ইঁট দাঁতের মতো বেরিয়ে পড়েছে। বাঁ দিকে দক্ষিণে চোখে পড়ে বিরাট একটা বাগান। বাগানের পরে, গাছের ফাঁকে উঁচু-নিচু লাল মাটি। তার পরেই হাইওয়েটা দেখে গোগোল অবাক হয়ে গেল। বলল, "হাইওয়েটা এখান থেকে দেখা যায়?"

কৃপা বলল, "হ্যাঁ। ইদিক পানে বাগান কেবল এ মহলেই আছে। বাগানের ওপারে পাঁচিল ছিল, ভেঙে গেছে।"

পুবমুখো থামওয়ালা প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি। সবটাই প্রায় আস্ত। তবে পলেস্তারা খসে পড়েছে থামের আর দেওয়ালের অনেক জায়গা থেকে। দোতলাতেও থাম আঁটা। থামগুলোর মাঝখানে লোহার রেলিং। একটা নয়, জোড়া বাড়ি রয়েছে উত্তরের গায়ে। কৃপা সেদিকেই গেল। পুব দিকে উঁচু পাঁচিল, অনেকটা জেলখানার মতো। তারও অনেক জায়গা ভেঙে পড়েছে। পাঁচিলটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে রয়েছে একটা মন্দির। মন্দিরের উত্তর দিকে নিচু লম্বা একতলা বাড়ি। কৃপা জোড়াবাড়ি পেরিয়ে, বাঁদিকে মোড় নিল। ডান দিকে অনেকটা খোলা জায়গা। বেশ খানিকটা এগিয়ে যাবার পরে, বাড়ি যেখানে শেষ হয়েছে, তার ধারেই একটা পুকুর। ভাঙা বাঁধানো ঘাটে দুটি বউ স্নান করছে। গোগোলের থেকেও একটি ছোট ছেলে পুকুরের জলে, ঘাটের সামনে সাঁতার কাটছে। ডানদিকের খোলা জায়গার পশ্চিমে কয়েকটা পুরনো ঘর। সামনে কোনো দরজা নেই। অনেকটা মোটর-গারাজের মতো দেখতে। কৃপা বলল, "ওগুলো ছিল ঘোড়ার আস্তাবল। পুকুরের ওপারে যে বড় একতলা বাড়িটা দেখছ, ওটা কাছারিবাড়ি।"

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "অন্নপূর্ণার মন্দিরটা কোথায়?"

কৃপা হাত তুলে পুব দিকে দেখিয়ে বলল, "উই দিকে।"

গোগোল মুখ ফিরিয়ে দেখল, পুবের পাঁচিলের শেষে। মন্দিরটা ওর আগেই চোখে পড়েছিল। জিজ্ঞেস করল, "ওখানে যাবে না?"

"এখন তো মন্দিরের দরজা বন্ধ।" কৃপা বলল, "সেই ভোরে পুজো হয়ে গেছে। আবার সন্ধেবেলা হবে।"

চিনু বলল, "তবু চল, একবার মন্দিরের দাওয়ায় কপাল ঠেকিয়ে আসি। শিমুলগড়ে এখন তো অন্নপূর্ণাই জাগ্রত ঠাকুর।"

তিনজনেই সামনের সবুজ মাঠের ওপর দিয়ে পুব দিকে গেল। মন্দিরটা পুরনো হলেও, এখনও কিছু পোড়া ইঁটের কাজ রয়েছে। মন্দিরের মাথায় কয়েক জায়গায় ফাটল ধরেছে। অশথের চারাও গজিয়েছে। দাওয়াটা বেশ উঁচু। গোগোল স্যাণ্ডেল পায়ে দাওয়ার সিঁড়িতে উঠতে যাচ্ছিল। চিনু ওর হাত ধরে ফেলল। বলল, "খালি পায়ে ওঠ।"

গোগোল স্যাণ্ডেল খুলে রেখে দাওয়ায় উঠল। চারদিকে খোলা দাওয়া। মাঝখানে মন্দির। দাওয়ার চারদিকেই ছড়ানো ভাঙাচোরা ইঁট। মন্দির-চত্বরে ঢোকবার মুখে চারটে থাম দাঁড়িয়ে আছে। গোগোল দাওয়ার ওপর দাঁড়িয়ে, থামের দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ওখানে থামগুলো কিসের?"

কৃপা বলল, "ওখানে নহবতখানা ছিল। ভেঙে গেছে। আর

উত্তর দিকে যে দেখছ একতলা বাড়িটা, উটি অন্নপূর্ণার রান্নাবাড়ি। এখন তো আর পুজো হয় না। আগে যখন হত, তখন ওখানে ভোগ রান্না হত। পুরোত, পাচক সব উ বাড়িতে থাকত। পুজোর সময় নাকি হাজার হাজার লোক পাত পেড়ে প্রসাদ খেত।"

গোগোল মন্দিরের দাওয়ার চারপাশটা ঘুরে দেখল। লম্বা পাঁচিলটা এদিকে বাঁক নিয়ে মন্দিরটাকে ঘিরেছে। শেষ হয়েছে, উত্তরে ঘুরে, একতলা বাড়ির পিছনে। গোগোলের ধারণা হল, পাঁচিলের ওপাশে পুবেই সেই পোড়োটা রয়েছে। যেখানে বটুকবাবুকে গতকাল রাতে ফাবড়া ছুঁড়ে মারা হয়েছিল। কিন্তু মন্দিরের ভিতরটা না দেখতে পেয়ে গোগোল একটু হতাশ হল। জিজ্ঞেস করল, "অন্নপূর্ণার মূর্তি কেমন?"

"চতুর্ভুজা, সিংহবাহিনী।" কৃপা বলল, "তবে আসল মূর্তিটা তো এখানে নেই। আছে বড় বাড়ির দোতলায়। সেটা অষ্টধাতুর তৈরি। বেশ বড়। এখানে এখন মাটির মূর্তি আছে।"

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "আসলটা এখানে নেই কেন?"

"চুরি হয়ে যায় যদি?" চিনু বলল, "আসলটার দাম তো অনেক।"

তিনজনেই আবার ফিরে এল সেই বড়বাড়ির চত্বরে। এমন সময় ওপর থেকে একজন বয়স্ক মহিলার গলা শোনা গেল, "তোরা কে রে?"

গোগোল দেখল, একজন বিধবা বয়স্কা মহিলা দোতলার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। কৃপা বলল, "আমি কৃপা গো পিসিঠাকরুন।"

মহিলা হেসে বললেন, "হ্যাঁ, তোকে আর যোগর মেয়ে চিনুকে চিনতে পারছি বটে উ ছেলাটি কে?"

"আমার পিসতুতো ভাই।" চিনু বলল, "কলকাতা থেকে এসেছে

পিসিঠাকরুন ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললেন, "অ তা, বটুকের খবর কিছু জানিস তোরা?"

কৃপা বলল, "হাসপাতালে নিয়ে গেছে।"

পিসিঠাকরুন বললেন, "কেন যে এরা রাত-বিরোতে বেরোয়। শুনেছি, খুব নাকি চোট লেগেছে। এখন মা অন্নপূর্ণা বাঁচিয়ে রাখুন, তা হলেই ভাল।"

পিসিঠাকরুন রেলিংয়ের কাছ থেকে সরে গেলেন। গোগোল জিজ্ঞেস করল, "উনি কে?"

"রামহরি ঠাকুর্দার ভায়ের মেয়ে।" চিনু বলল, "উনি খুব অল্প বয়সে বিধবা হয়েছেন। সংসারে কেউ নেই। রামহরি ঠাকুর্দার দেখাশোনা করেন, এ-বাড়িতেই থাকেন।"

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "আর কে কে থাকে এ-বাড়িতে?"

"আর কেউ থাকে না।" চিনু বলল, "বাজার-হাট করা থেকে শুরু করে বাসন-কোসন মেজে দেয় এক গরিব চাষির বউ। দু'বেলা কাজ করে দিয়ে চলে যায়।"

গোগোলরা তিনজনেই আবার মাতঙ্গীমহলের দিকে ফিরে চলল।

॥ আট ॥

পরের দিন ভরদুপুরে গোগোল একলা বসে ছিল বাইরের বারান্দায়। বসে বসে চিনুদির দেওয়া একটা ছোটদের গল্প-সংকলন পড়ছিল। চিনুদি আজ ঘুমিয়ে পড়েছে। ড্রাইভার নিতাইও ঘুমোচ্ছে বারান্দার এক পাশে। চিনুদি ঘুম থেকে উঠলে লুডো খেলা হবে। কৃপার আসার কথা আছে। কখন আসবে, কে জানে।

গোগোল বই থেকে মুখ তুলে মাঝে-মাঝে পশ্চিমের বাড়ির দোতলার দিকে দেখছিল। কালিয়া পাগল সেই এক খেলাই খেলছিল। মুখ তুলে গোগোলকে দেখছিল। গোগোল তার দিকে

তাকালেই মুখ আড়ালে সরিয়ে নিচ্ছিল।

শিমুলগড়ে গোগোলদের আজকের দিনটাই শেষ। আগামীকাল সকালে বাবা-মায়ের সঙ্গে রামপুরহাটে ফিরে যাবে। এখানকার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। বাবা মা আর যোগমামার কথা থেকে ও বুঝেছে, কারখানা-কোম্পানির কর্তৃপক্ষ এর পরে বাবা-মায়ের সঙ্গে কলকাতাতেই দেখা করবেন। গোগোলরা রামপুরহাট থেকে সোজা কলকাতায় ফিরবে না। কাছে-পিঠে দু এক জায়গায় বেড়িয়ে, কলকাতায় ফেরা হবে।

যোগমামা আজ সকাল দশটায় খেয়েদেয়ে বেরিয়ে গিয়েছেন। জে· এল· আর· ও· অফিসে নাকি কী জরুরি কাজ আছে। বলে গিয়েছেন, সেখানে কাজ মিটিয়ে, বটুকবাবুকে হাসপাতালে দেখে, বিকেল নাগাদ ফিরে আসবেন। গতকাল বটুকবাবুর ব্যাপারে পুলিশ এসেছিল। কিন্তু পুলিশের তদন্তে কিছুই ধরা পড়েনি। বটুকবাবুর বাড়ির লোকেরা নাকি কিছুই জানত না তিনি কেন রাত্রি সাড়ে দশটা এগারোটার সময় বেরিয়েছিলেন। তাঁকে বেরোতেও কেউ দেখেনি। পুলিশ অনেককেই নানা কথা জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। কেউই সঠিক কিছু বলতে পারেনি। কৃপার বাবা পঞ্চুবাবু পুলিশকে ঘুণাক্ষরেও বলেননি, বটুকবাবুর অন্নপূর্ণামহলে যাবার মতলব ছিল। অথচ তিনি সেটাই বিশ্বাস করতেন। বটুকবাবুর কোনো শত্রু আছে কি না, সে-কথাও কেউ বলতে পারেনি। পুলিশ গ্রেপ্তার করার মতো কাউকে পায়নি। বরং হতাশ হয়ে বলে গিয়েছে, এরকম ভুতুড়ে ব্যাপারে পুলিশ কারও বিরুদ্ধে মামলাও করতে পারবে না।

গোগোলের মনে অবশ্য একটা খটকা থেকেই গিয়েছিল। চিনুদি বলেছিল, বটুকবাবু নিশির ডাকে, স্বপ্নের ঘোরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু স্বপ্নের ঘোরে বেরোলে কেউ কি টর্চলাইট সঙ্গে নিয়ে বেরোয়? গোগোল জানে, এ-সবের জবাব ও কোনোদিনই পাবে না। আগামীকাল সকালে তো চলেই যাবে। তবে এই দৈত্যপুরী শিমুলগড়ের ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানাগুলো ওর মনে বেশ কিছুদিন তোলপাড় করবে।

গোগোল বই থেকে মুখ তুলে, পশ্চিমের দোতলার দিকে তাকাল। কালিয়া মুখ তুলে ওকেই দেখছিল। গোগোল তাকালেই, চট করে মুখটা আড়ালে সরিয়ে নিল। সত্যি পাগল। ও আবার বইয়ের দিকে চোখ নামাতে যেতেই ওর নজর পড়ল উত্তরের মন্দিরের দিকে। তৎক্ষণাৎ ওর গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল। দেখল, মন্দিরের পিছনে, ভাঙা বাড়ির পাশ থেকে, একটা কালো লম্বা মূর্তি চোখের পলকে পশ্চিম দিকে চলে গেল। ভূত? ঘোর-দুপুরে চারদিক খাঁখাঁ করছে। এ সময়ে, ওই রকম আপাদমস্তক কালো লম্বা মূর্তি যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল।

গোগোল স্থির থাকতে পারল না। পশ্চিমে যাবার ভাঙাচোরা বাড়িগুলোর অলিগলি ওর মোটামুটি চেনা হয়ে গিয়েছিল। ও বইটা ফেলে রেখে, দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে, ভাঙা পাঁচিলের পাশ ঘেঁষে, পশ্চিম দিকে ছুটল। বড় বড় ভাঙা অট্টালিকার অলিগলি দিয়ে এসে পড়ল শিবামহলে। এসেই থমকে দাঁড়াল। দেখল, উত্তর দিকের গাছপালা, ভাঙা বাড়ির পাশ দিয়ে, সেই কালো লম্বা মূর্তি ছুটে বেরিয়ে গেল। গোগোল তার পিছনটা দেখতে পেল। ওর চোখে পড়ল সেই পোড়োটা, যেখানে বটুকবাবুকে ফাবড়া ছুঁড়ে মারা হয়েছিল। ও এক মুহূর্ত ভাবল। তারপরে ছুটল উত্তর দিকে। কয়েকটা গাছপালার ছায়ায় এসে, ওর চোখে পড়ল, পাঁচিল ঘেরা অন্নপূর্ণার মন্দির। কালো মূর্তিটা কোথায় গেল?

গোগোল পাঁচিলের গা ঘেঁষে উত্তর দিকেই গেল। পাঁচিল বাঁক নিয়েছে পশ্চিম দিকে। ও সেদিকেই গেল। তারপরেই অন্নপূর্ণার একতলা রান্নাবাড়ির পিছন দিক। বাড়িটার গা ঘেঁষে পশ্চিমে এগিয়ে গেল। বাড়িটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে পৌঁছেই থমকে দাঁড়াল। দেখল সেই লম্বা কালো মূর্তি ভাঙা নহবতখানার থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে, অন্নপূর্ণামহলের দিকে দেখছে। মূর্তির পিছন দিকটা থেকে গোগোল বুঝতে পারল না, মূর্তিটা সত্যি কুচকুচে কালো কি না। নাকি কালো ব্যাণ্ডেজ দিয়ে আপাদমস্তক মুড়েছে? মূর্তিটা কিন্তু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নেই'। যেন বাতাসে একটু একটু দুলছে। আরও লক্ষ করে দেখল, মূর্তিটার বাঁ বগলে যেন ছোট কালো একটা পুঁটলির মতো কী রয়েছে।

মূর্তি হঠাৎ পিছন ফিরে তাকাল। গোগোল চট করে মুখ সরিয়ে নিয়ে এল। শিরদাঁড়াটা কেঁপে উঠল। মূর্তিটা ওকে দেখতে পায়নি তো? পেলে নিশ্চয়ই এদিকে আসবে। তাহলে? গোগোল ডান দিকে একটা বিশাল মোটা গাছ দেখে, ওর আড়ালে গা ঢাকা দিল। সেখান থেকে নহবতখানার ভাঙা থাম দেখা যায়। দেখল, কালো মূর্তি যেন বাতাসের ঝাপটায় উড়ে চলে গেল বড় বাড়ির থামের আড়ালে। তার মানে, মূর্তিটা অন্নপূর্ণামহলের রামহরি ঠাকুর্দার বাড়িতে ঢুকল।

গোগোল কী করবে? অন্নপূর্ণামহলের বড় বাড়িতে ঢুকবে? কিন্তু মূর্তিটা যদি দেখতে পায়? গোগোলের প্রাণে যত ভয়, কৌতূহলে মনটাও ততই অস্থির হয়ে উঠছে। মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থেকে, ও আর স্থির থাকতে পারল না। ছুটে গেল পাশের জোড়াবাড়ির কাছে। তারপর পা টিপে টিপে বড় বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে পাথরের বারান্দার দিকে দেখল। মূর্তিটাকে দেখা যাচ্ছে না। ও দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা থামের আড়ালে দাঁড়াল। আর তখনই চোখে পড়ল, কালো মূর্তি ডান দিকের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে।

গোগোলের বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করছে। ও প্রাণপণে নিশ্বাস চাপবার চেষ্টা করছে। মূর্তিটা শব্দ পেলেই সর্বনাশ! যখন দেখল, মূর্তি ওপরে অদৃশ্য হয়ে গেল, ও পা টিপে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠল। কিন্তু সোজা উঠে যেতে সাহস পেল না। মূর্তিটা যদি দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে, নির্ঘাত দেখে ফেলবে। ও মাথা নিচু করে, হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। বারান্দায় ওঠার দু'ধাপ আগে খুব আস্তে আস্তে মাথা তুলল। বিরাট লম্বা থামওয়ালা বারান্দা। দেখল, কালো মূর্তি বারান্দার মাঝামাঝি একটা ঘরের খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল।

গোগোল একটুও নড়ল না। হামাগুড়ি দেওয়া অবস্থায় প্রায় মিনিটখানেক কাঠ হয়ে থাকল। এ সময়ে একটা গোঙানির শব্দ স্পষ্টই শুনতে পেল। ও তাড়াতাড়ি উঠে সোজা এগিয়ে গেল। ঠিক খেয়াল করতে পারল না, কালো মূর্তি কোন্ দরজার ভিতরে ঢুকেছিল। একটা একটা করে তিনটি দরজা পেরিয়ে, ও একটা খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘোর দুপুরে ঘরের মধ্যে সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ও দেখল, একটা খাটের ওপর, পিসিঠাকরুনের মুখ কাপড় দিয়ে বাঁধা হয়েছে। মূর্তি তখন পাটের দড়ি দিয়ে তাঁর হাত পিছমোড়া করে বাঁধছে। পিসির চোখ দুটো ভয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। গলা থেকে খুব আস্তে গোঙানির শব্দ বেরোচ্ছে।

পিসিঠাকরুনের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা হয়ে যাবার পরেই, কালো মূর্তি হাতের কাছে পুঁটলি থেকে আর-একটা দড়ি বের করল। দ্রুত তাঁর পা দুটো কষে বেঁধে ফেলল। তারপর তাঁকে পাঁজাকোলা করে তুলে, ঘরের এক কোণে রেখে দিয়ে, হাতদুটো পাখির ডানার মতো ছড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত যেন বাতাসে দুলতে লাগল।

গোগোল বুঝতে পারল না, কালো মূর্তির উদ্দেশ্য কী? তার ডানা ছড়ানো দোলানি দেখলে, তাকে মানুষ বলে একেবারেই মনে হয় না। একটা অদ্ভুত হিংস্র প্রাণীর মতো মনে হয়। পিসিঠাকরুনের সামনে কয়েক মুহূর্ত থেকেই মূর্তি এগিয়ে গেল ভিতরের একটা খোলা দরজার দিকে। সেখানে দাঁড়িয়ে, ঘরের

মধ্যে মুখ বাড়িয়ে দেখল। দেখেই পিছন ফিরে তাকাল। গোগোল চকিতে সরে গেল। কয়েক সেকেণ্ড পরে, আবার জানালা দিয়ে দেখল। মূর্তি তখন আর সেখানে নেই।

গোগোল পা টিপে ঘরের মধ্যে ঢুকল। পিসিঠাকরুন ভয়ার্ত চোখে ওর দিকে তাকালেন। ও ঠোঁটে আঙুল রেখে, শব্দ না করতে ইশারা করল। এগিয়ে গেল পাশের ঘরের দরজার দিকে। দরজার মোটা চৌকাঠের পাশ থেকে সাবধানে ভিতরে উঁকি দিল। দেখল বড় একটা খাটে একজন বৃদ্ধ মানুষ শুয়ে আছেন। মনে হল, তিনি ঘুমোচ্ছেন। মূর্তি ঘরের এদিকে ওদিকে ঘুরছে। একটা আলমারির পাল্লা খোলার চেষ্টা করল। খুলতে পারল না। পরে গিয়ে একটা টেবিলের ওপরে কাগজপত্র নেড়েচেড়ে দেখল। কিছু কাগজ তুলে পড়েও দেখল। কালো মূর্তি তাহলে পড়তেও পারে? কিন্তু সে দেখছে কী করে? তার মুখ-চোখ সবই তো কালো কাপড়ে মোড়া। পা থেকে মাথা পর্যন্ত, দু হাত, সবই মোড়া। ওটা যে তার গায়ের চামড়া, পালক নয়, গোগোল এখন তা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

কালো মূর্তি খাটের কাছে ফিরে এল। ঘুমন্ত বৃদ্ধের শিয়রের কাছে এসে, আস্তে আস্তে বালিশের তলায় কালো হাত ঢোকাল। বের করে নিয়ে এল এক গোছা চাবি। আবার গেল আলমারির কাছে। একটা একটা করে চাবি ঘুরিয়ে, শেষ পর্যন্ত আলমারির পাল্লা খুলে দেখল। ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হল। বৃদ্ধ জেগে উঠে ঘড়ঘড়ে স্বরে বললেন, "কে? সুধা?"

কোনো জবাব পেলেন না। সুধা কি পিসিঠাকরুনের নাম? কালো মূর্তি তখন আলমারি থেকে বের করেছে ছোট একটা কাঠের বাক্স। বাক্সটা টেবিলের ওপর রেখে, আবার একটা একটা করে চাবি দিয়ে খোলবার চেষ্টা করতে লাগল। বৃদ্ধ ঘড়ঘড়ে স্বরে তখন ডেকে চলেছেন, "সুধা, অ সুধা, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি? একবার এ ঘরে আয় তো মা।"

এই বৃদ্ধই কি রামহরি ঠাকুর্দা? তিনি কি চোখে দেখতে পান না? কালো মূর্তি তখন কাঠের বাক্স খুলে ফেলেছে। ভিতর থেকে সে বের করল সোনার অলঙ্কার। কিন্তু নিল না। রেখে, ঘেঁটে ঘেঁটে একটা কাগজ বের করল। কাগজটা বের করে পড়ল, আর জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল। ভঙ্গিটা দেখে মনে হল, সে যা খুঁজছিল, সেটা পেয়েছে! কাগজটা বগলে চেপে, খাটের দিকে ফিরল। মূর্তি সোনার গহনা একটাও নিল না। তারপরে ওকে অবাক করে দিয়ে, কালো মূর্তি তার বুকের কাছে হাত দিয়ে, একটা জায়গা ফাঁক করল। বগল থেকে সে-কাগজটা সেই ফাঁকের মধ্যে ঢোকাল। বের করে নিয়ে এল সেই রকমই একটা কাগজ আর কলম।

বৃদ্ধ তখন তাঁর ঘড়ঘড়ে গলা আর একটু তুলে ডেকেই চলেছেন, "সুধা, অ সুধা···।"

কালো মূর্তি এগিয়ে এল খাটের কাছে। তার তখন কোনো দিকে নজর নেই। সে রামহরিঠাকুর্দাকে দেখছে। গোগোলের মনে হল, মূর্তির চোখের কাছে মাকড়সার জালের মতো কিছু লাগানো। ওই জালের ভেতর দিয়ে সে দেখতে পাচ্ছে। সে খাটের বিছানায়, রামহরিঠাকুর্দার মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ল। বৃদ্ধ আঁতকে উঠে বললেন, "কে তুমি? কী চাও? সুধা! অ সুধা!"

গোগোলের বুক কাঁপিয়ে এই প্রথম কালো মূর্তির গলা শোনা গেল। ফ্যাসফ্যাসে অদ্ভুত বিকৃত স্বরে সে বলল, "আমি তোমার বাবার আত্মা। যা বইলছি, তাই করো।" বলেই দুই কালো হাতে রামহরিঠাকুর্দার ঘাড় ধরে টেনে তুলে বসিয়ে দিল। তাঁর গলা দিয়ে আঁক করে একটা শব্দ বেরোল। মূর্তি কাগজটার ভাঁজ খুলে, সামনে এগিয়ে দিল। জোর করে কলম ধরিয়ে দিল হাতে। আবার সেইরকম ভয়ংকর বিশ্রী গলায় বলল, "এখানে সই করো।"

"কিসে সই করব?" রামহরি ঠাকুর্দার গলা ভয়ে কাঁপছে, "এটা কী কাগজ?"

মূর্তি সেই স্বরে বলল, "যে-কাগজই হোক, সই করো তাড়াতাড়ি।"

রামহরি এবার ভয়ে কেঁদে উঠলেন, আর গোঙানো স্বরে বললেন, "না না, আমি কোনো কাগজে সই করব না।"

"আলবত কইরবে।" মূর্তি সেই স্বরে শাসিয়ে বলে, রামহরি ঠাকুর্দার ঘাড় ধরে এমন ঝাঁকুনি দিল, পাকাচুল মাথাটা যেন খসে পড়বে। আবার শাসিয়ে বলল, "সই করো, না হলে শেষ করে দেব।"

রামহরিঠাকুর্দা ঘাড়ের ঝাঁকুনিতে যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলেন। আর গোঙানো কান্নার স্বরে বললেন, "আমি যে ভাল দেখতে পাই না।"

কালো মূর্তি চেষ্টা করেও, গলার স্বরটা আগের মতো রাখতে পারল না। তার স্বাভাবিক স্বরের একটু আভাস ফুটে উঠল। বলল, "খুব দেইখতে পাও। এ নব্বুই বছর বয়সে, দু মাস আগে যেমন সই করেছিলে, সেইরকম সই করো।"

গোগোলের বুকের মধ্যে ছাঁত করে উঠল। গলাটা কি চেনা-চেনা লাগছে? রামহরিঠাকুর্দা ছেলেমানুষের মতো কেঁদে উঠলেন। বললেন, "অই গ মা অন্নপূর্ণা! আমাকে রক্ষা করো মা।"

"কেউ তোমাকে রক্ষা কইরতে পারবে না।" কালো মূর্তির গলা আবার সেই ফ্যাসফ্যাসে অদ্ভুত বিকৃত শোনাল, "বাঁইচতে চাও তো তাড়াতাড়ি সই করো। করো, করো, আমার আর সময় নাই।"

কালো মূর্তির লম্বা কালো হাতদুটো উঠে গেল রামহরিঠাকুর্দার গলায়। তাঁর গলা দিয়ে আবার আঁক করে শব্দ হল। প্রায় দম বন্ধ স্বরে বললেন, "মেরো না আমাকে, দোহাই তোমার। আমি সই করে দিচ্ছি।"

"হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি করো।" কালো মূর্তি বলল, "এখানে করো।"

রামহরিঠাকুর্দা ঝুঁকে পড়লেন। গোগোল পিছন থেকে ঠিকমতো কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তবে তিনি যে সই করছেন, সেটা বোঝা যাচ্ছে। কালো মূর্তি তাঁর হাত থেকে কাগজ আর কলম নিয়ে নিল। ফিরে গেল সেই টেবিলের কাছে। কাঠের বাক্সের ঢাকনা খুলে, কাগজটা তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। চাবি দিয়ে বাক্স বন্ধ করে, আবার তুলে রাখল আলমারিতে। আলমারিটাও পাল্লা বন্ধ করে, চাবি লাগিয়ে দিল। কলমটা ঢোকাল বুকের কাছে, সেই ফাঁকের মধ্যে। তারপরে আবার ফিরে এল রামহরিঠাকুর্দার কাছে। এবার সে গোগোলকে চমকে দিয়ে একেবারে স্বাভাবিক স্বরে বলল, "জ্যাঠা, তুমি ভেবেছিলে, সব টাকা রামকৃষ্ণ আশ্রমে দিয়ে যাবে আমরা থাকতে তা হতে দেব না, বুঝলে? আর ভেবো না, তুমি এ জীবনে কোনোদিন মুখ খুলতে পারবে।"

গোগোল তখন থরথর করে কাঁপছে। একটু আগেই গোগোলের এই স্বর একবার একটু চেনা-চেনা লেগেছিল। এখন আর চিনতে একটুও বাকি রইল না। কিন্তু ওকথা বলার মানে কী, "ভেবো না, তুমি এ জীবনে কোনোদিন মুখ খুলতে পারবে।" ও দম বন্ধ করে দেখল, কালো মূর্তি রামহরিঠাকুর্দাকে চিত করে শুইয়ে দিল। বলল, "অনেক কাল বেঁচেছ, আর বাঁচবার দরকার নাই।"

গোগোল এবার স্পষ্ট দেখল, কালোমূর্তি রামহরিঠাকুর্দার গলা টিপে ধরল। তাঁর গলা দিয়ে সামান্য একটা শব্দ বেরোল। তারপরেই তিনি দু একবার হাত পা ছুঁড়লেন। গোগোল বুঝতে পারছে, কালোমূর্তি তাঁকে গলা টিপে মারছে। ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "উঃ! না না···"

কালো মূর্তি চমকে মুখ তুলে দেখল। দেখেই তার মুখ দিয়েও বেরিয়ে এল, "তুমি!" বলেই রামহরিঠাকুর্দাকে ছেড়ে সে দরজার দিকে পা বাড়াল। গোগোল তৎক্ষণাৎ পিছন ফিরে, পাশের ঘরে ছুটে গেল। দাঁড়াল না এক মুহূর্ত। বারান্দায় বেরিয়ে, দৌড়ে সিঁড়ি

দিয়ে নামতে লাগল। পিছনে শুনতে পাচ্ছে দ্রুত পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। ও বারান্দা থেকে উঠোনে লাফ দিয়ে পড়ে, কোন্ দিকে যাবে, হঠাৎ কিছু ঠিক করতে পারল না। মুখ ফিরিয়ে দেখল, কালো মূর্তি বারান্দায় এসে গিয়েছে। গোগোল দক্ষিণের বাগানের দিকে প্রাণপণে ছুটল। পিছনে কালো লম্বা মূর্তির পায়ের শব্দও ছুটে আসছে।

গোগোলের লক্ষ্য তখন হাইওয়ের দিকে। কিন্তু খালি পায়ে ওর লাগছে। তবু ও প্রাণের ভয়ে ছুটতে লাগল। হঠাৎ একটা বড় ইটের টুকরো ওর কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। মাথায় লাগলে নির্ঘাত মৃত্যু! বাগানটা যেন শেষ হতে চায় না। বড় বড় ইটের টুকরো দমাদ্দম আশেপাশে এসে পড়তে লাগল। বুঝতে পারছে না, পায়ের তলায় কাঁটা ফুটেছে কি না। জ্বালা করছে। কিন্তু ও সেসব গ্রাহ্য না করে ছুটতে লাগল। বাগানটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তখনই একটা ইটের টুকরো ওর বাঁ পায়ে আঘাত করল। ও প্রায় মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছিল। কোনোরকমে সামলে, ইটের আঘাতের পরোয়া না করে, লাল কাঁকুরে মাটির এবড়ো খেবড়ো জায়গায় এসে পড়ল। হাইওয়েটা এখন একেবারে সামনে। কিন্তু এই ভরদুপুরে হাইওয়েটাও যেন ফাঁকা, খাঁখাঁ করছে। ও হাইওয়েতে পড়েই বাঁয়ে পুবদিকে ছুটতে লাগল। এখন আর পিছনে পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে না। ইটের টুকরোও এসে পড়ছে না। ও একবার পিছন ফিরে দেখল। কারোকে দেখা যাচ্ছে না। তবুও থামল না। ও বুঝে গিয়েছে, কালোমূর্তি এক ভয়াবহ খুনি। কোন্ দিক থেকে হঠাৎ এসে পড়বে, কিছুই বলা যায় না।

এ সময়েই পিছন দিক থেকে গোঁ গোঁ শব্দ ভেসে এল। গোগোল আর ছুটতে পারছে না। দেখল একটা বড় ট্রাক আসছে। ও দাঁড়িয়ে পড়ল। ট্রাকটা বেশ জোরে এগিয়ে আসছে। ও হাত তুলে ট্রাকটাকে দাঁড়াতে ইশারা করল। কিন্তু দাঁড়াবে কি না বুঝতে পারল না। তবুও বারেবারে হাত তুলে থামাবার চেষ্টা করল। ট্রাকটার গতি কমে এল। গোগোলের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। শিখ ড্রাইভার অবাক ও বিরক্ত মুখ বাড়িয়ে হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল, "কী চাই?"

গোগোল হাতজোড় করে কোনোরকমে হিন্দিতে বুঝিয়ে বলল, "আমি খুব বিপদে পড়েছি। একটা খুনি আমাকে তাড়া করেছে। আপনি আমাকে একটু থানায় পৌঁছে দিন।"

শিখ ড্রাইভারের পাশে যে বসে ছিল, সে বোধহয় ট্রাকের ক্লিনার। ড্রাইভার তার সঙ্গে কী কথা বলল। তারপরে জিজ্ঞেস করল, "কোন্ থানায় তুমি যাবে?"

"কাছে যে থানা আছে, সেখানেই যাব।"

ড্রাইভার বলল, "রামপুরহাট ছাড়া কোনো থানা এখানে নেই।"

"তাহলে আমি সেখানেই যাব।" গোগোল বলল।

ড্রাইভার ক্লিনারকে কিছু বলল। ক্লিনার বাঁ দিকের দরজা খুলে, নীচের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। গোগোল সেই হাত ধরে উঠে পড়ল। ট্রাক ছেড়ে দিল। ওকে বসতে দেওয়া হল দুজনের মাঝখানে। ক্লিনার ওর আপাদমস্তক দেখে হিন্দিতে বলল, "আরে, তোমার পা থেকে রক্ত পড়ছে।"

গোগোল মুখ নিচু করে দেখল, ডান পায়ের তলা থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। বোধহয় কাঁটাই ফুটেছে। ওর চোখে তখন জল এসে পড়েছে। বলল, "খুনিটা আমাকে তাড়া করছিল। এত জোরে ছুটছিলাম, আমার কোনো খেয়াল ছিল না।"

ট্রাকটা খালি বলেই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে। গোগোলের মনে তখন নতুন দুশ্চিন্তা জাগল। কালোমূর্তিটা বাবা-মাকে কিছু করবে না তো? এখন ওর মনে হচ্ছে, বটুকবাবুকে এই মূর্তিই ফাবড়া ছুঁড়ে মেরেছে। বটুকবাবুই বা কেন অন্নপূর্ণামহলে যেতে চেয়েছিলেন? তাঁরও কি কালোমূর্তির মতো একই মতলব ছিল?

মাত্র পঁচিশ মিনিটের মধ্যে ট্রাক ড্রাইভার গোগোলকে থানার সামনে নামিয়ে দিল। গোগোল থানার মধ্যে ঢুকে, একটা ঘরের সামনে দাঁড়াল। তখন ও খোঁড়াচ্ছে। ঘরের দরজার সামনে একজন বন্দুকধারী সেপাই দাঁড়িয়ে ছিল। ভিতরে টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে ছিলেন পুলিশের ইউনিফর্ম পরা এক অফিসার। আর একজন

সাদা শার্ট প্যান্ট পরা। দুজনেই কথা বলছিলেন। সেপাই গোগোলকে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই, অফিসার ওর দিকে মুখ তুলে তাকালেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কী চাই?"

"ভেতরে আসব?" গোগোল অনুমতি চাইল।

অফিসার মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, "এসো।"

গোগোল ভেতরে ঢুকে বলল, "আমি শিমুলগড় থেকে আসছি। আর সেখানে একটা খুন হতে দেখেছি।"

"খুন?" অফিসার ভুরু কুঁচকে অবাক হয়ে বললেন, "তুমি তো দেখছি হাঁপাচ্ছ। বেঞ্চিতে বোসো। কী ব্যাপার বলো তো? কাদের বাড়ির ছেলে তুমি? কী নাম তোমার?"

গোগোল বলল, "সব বলছি। আমাকে একটু খাবার জল দেবেন?"

অফিসার মাথা ঝাঁকিয়ে, ডান দিকে ফিরে বললেন, "সেপাই, এক গেলাস খাবার জল নিয়ে এসো।"

গোগোল বেঞ্চিতে বসল। একজন সেপাই পাশের ডান দিকের ঘর থেকে এক গেলাস জল নিয়ে এল। গোগোলকে দিল। গোগোল ঢক ঢক করে গেলাস শেষ করল। সেপাই জিজ্ঞেস করল, "আর দেব?"

"না।" গোগোল মাথা নেড়ে, অফিসারের দিকে তাকাল। ও ওর নাম-পরিচয় দিল। বাবা-মায়ের সঙ্গে কলকাতা থেকে আসার কথাও বলল। তারপরে কালোমূর্তিকে প্রথম দেখার পর থেকে যা যা ঘটেছে, সবই জানাল।

অফিসার আর সাদা প্যান্ট-শার্ট পরা ভদ্রলোক, দুজনেই অবাক চোখে নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করলেন। সাদা পোশাক পরা ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "কালোমূর্তির গলার স্বর শুনে তুমি যার নাম করলে, তা কি ঠিক?"

গোগোল বলল, "আমি একটুও ভুল করিনি।"

অফিসার আর সাদা পোশাকের ভদ্রলোক আবার দুজনে দুজনের দিকে তাকালেন। অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার বাবা মা তাহলে এখন শিমুলগড়ে সেই বাড়িতেই আছেন?"

"হুঁ।" গোগোলের স্বর কান্নায় ও ভয়ে রুদ্ধ হয়ে গেল।

সাদা পোশাকের ভদ্রলোক বললেন, "কাঁদছ কেন? তোমার তো এখন আর কোনো ভয় নেই।"

গোগোল নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল, "বাবা-মা'র জন্য আমার ভয় লাগছে। আমারও ওখানে ফিরে যেতে ভয় লাগছে। আপনারা কেউ আমার বাবা-মা'কে খবর দিলে, তাঁরা এখুনি রামপুরহাটে ফিরে আসবেন।"

সাদা পোশাকের ভদ্রলোক মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, "কথাটা একরকম ঠিকই। ইন্সপেক্টর, আমি পোশাকটা বদলে আসছি। শুঁড়িকুয়ার কেসের প্রাথমিক তদন্ত তো হয়ে গেছে। আজ আর আপনার ওখানে যাবার দরকার নেই। আপনিও আমার সঙ্গে শিমুলগড়ে চলুন। ওখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হবার ভয় নেই। একটা জিপে জনাচারেক আর্মড ফোর্স নিয়ে গেলেই হবে।"

গোগোল যাঁকে অফিসার ভেবেছিল, চেয়ার ছেড়ে এবারে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ঠিক আছে স্যার। আপনি ঘুরে আসুন। আমি এদিকের ব্যবস্থা দেখছি।"

সাদা পোশাকের ভদ্রলোক ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

জিপের সামনে ড্রাইভারসহ তিনজনের সঙ্গে গোগোল গাদাগাদি করে বসে ছিল। জিপের পিছনে চারজন সশস্ত্র পুলিস। সাদা পোশাকের ভদ্রলোক যে থানার অফিসার-ইন-চার্জ, এখন গোগোল তা জানে। উনি এখন কোমরের বেল্টে রিভলভার ঝুলিয়ে, ইউনিফর্ম পরে আছেন। দ্বিতীয়জন সাব-ইন্সপেক্টর।

আধ ঘন্টার মধ্যেই জিপ শিমুলগড়ের দুর্গামহলে পৌঁছে গেল। গোগোল ওদের গাড়িটা দেখতে পেল। সেখানে কোনো লোকজন নেই। ও· সি· আর সাব-ইন্সপেক্টর গোগোলকে নিয়ে নামলেন। বন্দুকধারী পুলিশরাও নামল। গোগোল ও· সি·-র পাশে পাশে মাতঙ্গীমহলের দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে যোগমামার বাড়ির কাছেই দেখা গেল, বেশ কিছু লোকের ভিড়। পুলিশ আসতে দেখেই সবাই সচকিত হয়ে উঠল। তাদের মধ্যে কৃপাই প্রথম চিৎকার করে বলল, "উই তো, গোগোল আসছে।"

গোগোলের বাবা আগে ছুটে এলেন। গোগোল দেখল, বাবা যেমন উত্তেজিত, চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ তেমনি। বেশ রেগে গোগোলকে জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় গেছলে তুমি?"

"ও থানায় গেছল।" ও· সি· বললেন, "ওকে এখন বকবেন না। এখানে কী হয়েছে বলুন তো?"

কৃপার বাবা পঞ্চুবাবু এগিয়ে এসে বললেন, "বড়বাবু, সর্বনাশ হয়ে গেছে। যোগদাদা কোথায় গেছলেন। সেখান থেকে একটু আগে ফিরে, নিজের বন্দুকের গুলি নিজের মাথায় মেরে, মারা গেছেন।"

ও· সি· অবাক হয়ে বললেন, "হাতের পাখি এমনি করে পালিয়ে গেল?" তিনি গোগোলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "গোগোল, তুমি সেই খুনে কালো ভূতের গলার স্বর ঠিকই চিনতে পেরেছিলে। সেটা বুঝতে পেরেই যোগদানন্দ মুখুজ্যে নিজের মাথায় গুলি মেরে মরেছে।"

ও· সি·র কথা শুনে কেউ কিছুই বুঝতে পারল না। সবাই গোগোলের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। বাবা তখন গোগোলের একটা হাত ধরে রেখেছিলেন। ও· সি· পঞ্চুবাবুর দিকে ফিরে আবার বললেন, "এ কেসটা পরে দেখছি। এখন একবার অন্নপূর্ণামহলে যেতে হবে। আপনারাও কয়েকজন চলুন। গোগোলও চলো।"

ইতিমধ্যে কৃপা এসে দাঁড়িয়েছে গোগোলের পাশে। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করতে পারছে না কেবল বড় বড় চোখে হাঁ করে গোগোলকে দেখছে। ও· সি· সাব-ইন্সপেক্টর আর দুজন বন্দুকধারী পুলিশের সঙ্গে একটা দল অন্নপূর্ণামহলের দিকে চলল। সেখানে গিয়ে দেখা গেল, কেউ নেই। গোগোলের সঙ্গেই ও· সি· আর ইন্সপেক্টর বড় বাড়ির দোতলায় উঠলেন। গোগোলের দেখিয়ে দেওয়া ঘরে দেখলেন, পিসিঠাকরুন তখনও সেই হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছেন। ও· সি· লোকজনদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "একজন কেউ এই মহিলার হাত পা মুখ খুলে দিন।"

গোগোল তখন নিজেই এগিয়ে গিয়েছে রামহরিঠাকুর্দার ঘরে। তিনি তাঁর খাটে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে ছিলেন। ও· সি· এগিয়ে গেলেন। সাব-ইন্সপেক্টরের পিছনে পিছনে আরও কয়েকজন ঢুকলেন। ও· সি· রামহরি-ঠাকুর্দার গায়ে হাত দিলেন। চোখের পাতা খুলে দেখলেন। একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "নেই, বেঁচে নেই। গলা টিপেই ওঁকে মারা হয়েছে। নাক মুখ থেকে রক্তও বেরিয়েছে।"

এই সময়ে পিসিঠাকরুনের হাউমাউ কান্না শোনা গেল, "সে কী ভয়ংকর কালো ভূতের মূর্তি গ! এসেই আমার হাত-মুখ বেঁধে ফেলল। যোগর বাড়ির কলকাতার সেই ছেলেটা সব দেখেছে। ভূতটা আমার জ্যাঠাকে কিছু করে নাই তো?" বলতে বলতে তিনি পাশের ঘরে এলেন।

অনেকেই ঢুকে এল সেই ঘরে। পিসিঠাকরুন রামহরিঠাকুর্দার গায়ে হাত দিয়েই মড়াকান্না জুড়ে দিলেন। ও· সি· ধমক দিলেন, "আস্তে।" তারপর গোগোলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এই আলমারি?"

"হ্যাঁ।" গোগোল বলল, "চাবির গোছা ঠাকুর্দার শিয়রে রাখা আছে।" ও· সি·র কথামতো পিসিঠাকরুন চাবির গোছা নিয়ে

আলমারি খুললেন। বের করলেন কাঠের বাক্স। সেটা খোলার পরে, ও· সি· গোগোলকে জিজ্ঞেস করলেন, "দ্যাখো তো, এই কাগজটা নাকি ?"

গোগোল দেখে বলল, "হ্যাঁ, এই একটা কাগজই তো রয়েছে। আর একটা সেই কালো মূর্তি নিয়ে নিয়েছিল।"

"সেটা হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে।" ও· সি· বললেন এবং পিসিঠাকরুনকে নির্দেশ দিলেন, আবার সব যেমন ছিল, তেমনি রেখে দিতে।

পিসিঠাকরুন তাই করলেন। ও· সি· বললেন, "চাবিটা আমাকে দিন।"

সাব-ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করলেন, "ডেডবডির কী হবে স্যার ?"

"ময়না তদন্তে পাঠাতেই হবে।" ও· সি· বললেন, "যোগদানন্দ মুখুজ্যের বডিও পাঠাতে হবে। এখন চলুন, আমরা যোগদানন্দ মুখুজ্যের বাড়িতেই যাই।"

গোগোলের সঙ্গে বাবাও ছিলেন। যোগমামার বাড়ি এসে, আগেই তাঁর শোবার ঘরে ঢুকলেন সবাই। গোগোল দেখল, যোগমামা ধুতি জামা পরা অবস্থায় খাটের ওপর পড়ে আছেন। এখনও তাঁর হাতের কাছে বন্দুকটা পড়ে আছে। মাথার কাছে রক্তে বিছানা ভেসে গিয়েছে। মামিমা কাঁদছিলেন। চিনুও কাঁদছিল। ও· সি· সব দেখেশুনে, বাইরের ঘরে এসে বসলেন। বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, "বসুন মিঃ চ্যাটার্জি।"

মা এগিয়ে এলেন। বাবা মাকে ও· সি·র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ও· সি· মাকেও বসতে বললেন। ঘরে তখন বেশ কিছু লোক জমা হয়েছে। ও· সি· বললেন, "মিঃ চ্যাটার্জি, আপনার ছেলে খুবই দুঃসাহসের কাজ করেছে। বোধহয় ভগবানই ওকে বাঁচিয়েছে। নইলে কালোমূর্তি ভূতের হাত থেকে আজ ওর বাঁচবার কথা নয়। তবে আপনার ছেলে সত্যি সাহসী আর বুদ্ধিমান।" বলে তিনি গোগোলকে হাত বাড়িয়ে নিজের কাছে টেনে নিলেন। তারপর গোগোলের কাছ থেকে শোনা সমস্ত ঘটনা সকলের সামনে বললেন।

সবাই নির্বাক। অবাক চোখে গোগোলের দিকেই সবাই তাকিয়ে ছিল। ও· সি· আবার বললেন, "গোগোল তার যোগমামার গলার স্বরটা চিনতে ভুল করেনি। যোগদানন্দবাবুকে সেই ভয়ে আর লজ্জাতেই নিজের জীবনটাও শেষ করতে হল। যাই হোক, এখানে তো আপনাদের কাজ মিটে গেছে। আপনারা আজই রামপুরহাটে ফিরে যান। আমরা থাকতে-থাকতেই আপনারা বেরিয়ে পড়ুন। তারপরে যা করবার, আমরা করছি।"

গোগোল তখন মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। ওর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল কৃপা। কৃপা ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞেস করল, "তোমরা এখুনি চলে যাবে ?"

"হ্যাঁ।" গোগোল ওর একটা হাত ধরল।

কৃপা বলল, "তোমার সঙ্গে আমি থাকলে সব দেখতে পেতাম।"

গোগোল বলল, "তোমাকে আমি তোমার বাবার নামে এখানে চিঠি লিখব।"

কৃপার চোখদুটো খুশিতে বড় হয়ে উঠল। কিন্তু আবার ছলছল করেও উঠল। মাত্র দু'তিন দিনের মধ্যে গোগোলেরও কৃপাকে খুব ভাল লেগেছিল। এখানে আর-একদিন থাকবার উপায় থাকলে, ও কৃপার সঙ্গে চণ্ডিকামহলের নাচবাড়িতে ভূতের আড্ডায় যেত। এবার আর তা হল না। ভবিষ্যতে হবে কিনা, কে জানে।

রোগা-মোটা

সুশীল রায়

মোটা বলে, কেন অত রাতদিন নিন্দে,
রোগা হলে থাকতে কি খুবই নিশ্চিন্তে?
আমাদের অবিনাশ রোগা হিলহিলে,
তাকে নিয়ে কেন তবে অত হাসছিলে ?
বেশ, আমি কমাবই আমার ওজন,
অনেক কমিয়ে দেব আহার ভোজন।
ভাবি, কম করে খাব, তবু ওই খিদে
কিছুতে কমে না বলে ভারী অসুবিধে।
বেশ বড় মাপ হলে ল্যাংড়ার আম
বিশ-বাইশের কমে পাইনে আরাম।
মোরগ-মসাল্লাম খুব খাসা চিজ
আস্ত মুরগি দিয়ে মস্ত সাইজ
না-করে কারোর সাথে কোনো রেষারেষি
যদি খেতে পারতাম একটার বেশি !
একবার বাজি রেখে পুরো করে আশ
শরবত পান করি তিরিশ গেলাশ !
এসব ব্যাপার দেখে লাগে নাকি তাক,
তোদের ব্যাপার দেখে আমিও অবাক।
খাই বটে হাতরুটি দু'-চার ডজন
বেশ, আমি কমাবই আমার ওজন।

ছবি অহিভূষণ মালিক

ভুতুড়ে পাঞ্জাবি

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

আলিগড়ি ছাঁটের নকশাদার এই সাদা পাঞ্জাবিটা কিনেছিলুম কলকাতার ফুটপাথ থেকে। ফেরিওয়ালা বলেছিল, "লিয়ে লিন বাবু! একটুখানি লাট খেয়ে গেছে বটে, এক্কেবারে লতুন মাল। কাচিয়ে লেবেন, দেখবেন কেমন পালিশ দিচ্ছে!"

থাকি মফস্বল শহরে। চেহারায় নিশ্চয় মফস্বলি ছাপ ফুটে আছে। তাই লোকটা হয়তো ঠকাচ্ছে ভেবে একটুখানি গাঁইগুঁই করেছিলুম। "নতুন বলে তো মনে হচ্ছে না হে গন্ধটাও যেন কেমন ঠেকছে।"

ফেরিওয়ালা জিভ কেটে কপালে থাপ্পড় মেরে বলেছিল, "আপনার সঙ্গে আমি তঞ্চকতা করতে পারি? আর গন্ধের কথা বলছেন? একটুখানি সেণ্ট্ ছড়িয়েছি।"

"সে কী!" আমার সন্দেহ বেড়ে গিয়েছিল।" সেণ্ট ছড়িয়েছ কেন?"

ফেরিওয়ালা একগাল হেসে বলেছিল, "আজ্ঞে, মারোয়াড়ির গোডাউনের মাল। বুঝলেন না? গোডাউনে পোকায় কেটে দেবে বলে পোকামারা বিষ এস্প্রে করেছিল। সেই পুজোর সময় মেটেবুরুজের ওস্তাগরবাড়ি থেকে তৈরি হয়ে এসেছে। আর ফেরেশ থাকে মাল? আমরা লাটদরুন কিনে এনে বেচছি। লিয়ে লিন, শস্তা করে দেব।"

এত ব্যাখ্যার পর আর সন্দেহ থাকা উচিত নয়। আর শস্তা মানে অবিশ্বাস্য শস্তা। এ বাজারে মাত্র পনেরো টাকায় এমন নকশাদার সুন্দর পাঞ্জাবি পাওয়া ভাগ্যের কথা।

কিন্তু তখন যদি জানতুম···

থাক। সে-কথা পরে। ফিরে এসে পাঞ্জাবিটা নিজেই যত্ন করে কাচলুম। নিজেই ইস্তিরি করলুম। লন্ড্রিতে দেওয়া মানে তো পাঁচ-সাতটা দিনের ধাক্কা। পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়ানোর জন্য তর সইছিল না আমার।

সত্যি, দারুণ ফিট করে গেল গায়ে। আমার বোন টিংকু বড় খুঁতখুঁতে স্বভাবের মেয়ে। সেও তারিফ করে বলল, "অপূর্ব! দাদা, তোকে উত্তমকুমার-উত্তমকুমার লাগছে!"

শুধু টিংকু নয়, বাড়ির সবাই একবাক্যে বলল, এতকাল পরে আমি এই প্রথম টাকাকড়ির সদ্ব্যবহার করতে পেরেছি। এমনকী, পিসিমা সন্দেহ প্রকাশ করলেন, "হ্যাঁ রে, ভুল করে পঁয়ত্রিশ বলতে পনেরো বলেনি তো ?" আর তাই নিয়ে পিসেমশাইয়ের সঙ্গে পিসিমার তর্ক বেধে গেল। পিসেমশাইয়ের মতে, ফুটপাথের ওরা সবাই জোচ্চোর। এই পাঞ্জাবিটা লাটদরুন কিনেছে। গড়ে পাঁচটাকার বেশি দাম পড়েনি এবং নির্ঘাত দশটা টাকা লাভ করেছে। দরাদরি করলে আদ্ধেক দামে দিয়ে দিত।

তবে উনি প্রশংসাও করলেন। "আসলে পাঞ্জাবি কোনো কথা নয়। সুপুর চেহারাটাই এমন যে, যা পরে দেখতে সুন্দর লাগে।"

অমনি ঠাকুমা আমার একটা হাত খপ করে ধরে কড়ে আঙুল কামড়ে দিয়ে বললেন, "বালাই ষাট ! ঠুকতে নেই। এমনিতে ছেলেটা বরাবর রোগা !"

বেড়াতে বেরুচ্ছিলুম, তার মানে বন্ধুদের চোখ ট্যারা করে দিতে যাচ্ছিলুম আর কি ! মা আজ আদুরে গলায় বললেন, "সকাল-সকাল বাড়ি ফিরবি, সুপু ! দেরি করিসনে !"

অতগুলো মুগ্ধ চোখের সামনে দিয়ে যখন বেরুলুম বাড়ি থেকে, তখন আমি আর সেই সুপু নই, উত্তমকুমারের ডামি। একেবারে ফিল্মস্টার যেন। আর আশ্চর্য, রাস্তায় সবাই আমার দিকে তাকাচ্ছিল। কবরেজমশাইয়ের রোয়াকে প্রবীণদের আড্ডা। তাঁদেরও চোখ পড়ল আমার—মানে, আমার গায়ের পাঞ্জাবিটার দিকে। কান্ত ভট্চাজ ডেকে বললেন, "তোমার জামাটা তো বেশ ! কোথায় বানালে ?"

বলে দিলুম, "লখনউ গিয়েছিলুম। সেখানকার দর্জি বানিয়ে দিয়েছে।"

"তাই বলো !" ভট্চাজমশাই শ্বাস ছেড়ে বললেন, "তাই ভাবছি, এ-মুল্লুকে এমন দর্জি কোথায় ?"

বিশেষজ্ঞের চোখে তাকিয়ে রইলেন উনি। কবরেজমশাই মন্তব্য করলেন, "ভালই। তবে প্যান্টের সঙ্গে কেন পরলে বাবু ? ধুতি ছাড়া কি পাঞ্জাবি মানায় ?"

ভট্চাজমশাই বললেন, "উঁহু, চুস্ত্ পাজামার সঙ্গে পরা উচিত। যার সঙ্গে যা ফিট করে।"

বোসদাদু হাই তুলে বললেন, "বরং স্রেফ পাজামার সঙ্গে পরলেও পারতে। পাজামা নেই ?"

"আছে।" বলে কেটে পড়লুম ওখান থেকে। এতক্ষণ টিটোদের রোয়াকে আমাদের আড্ডা জমে উঠেছে। হনহন করে সেদিকে চলতে থাকলুম।

দূর থেকে চোখে পড়ল, রোজকার মতো জোরালো একটা তর্ক বেধেছে। কিন্তু কাছাকাছি যেতেই ওদের চোখে পড়ে গেলুম। সঙ্গে-সঙ্গে তর্কটা থেমে গেল। গোল গোল চোখে ওরা কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে আমাকে দেখল। তারপর একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "শাবাশ গুরু !"

ফাজিল শানু লাফ দিয়ে এসে আমার চারপাশে চরকির মতো কয়েক পাক ঘুরে বলল, "গুরু ! এ তুমি কী করলে ?"

বললুম, "কী করলুম মানে ?"

"মেরে যে বেরিয়ে গেলে গুরু ! উরেব্বাস !" বলে শানু আমার পাঞ্জাবিতে টুঁ মেরে শোঁকার ভঙ্গি করল। "ওরে, সুপু সেন্ট মেখেছে, শুঁকে দ্যাখ্ !" সে চেঁচামেচি জুড়ে দিল। সবাই আমার পাঞ্জাবি শুঁকতে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

চটে গিয়ে বললুম, "কী করছিস তোরা ? আমি সেন্ট মাখিনি।"

শানু বলল, "মাখিসনি ? ওই কুকুরটাকে শোঁকা। সেও বলবে সেন্ট মেখেছিস

এতক্ষণে আমি সুগন্ধ টের পেলুম। সত্যি তো, দারুণ সেন্টের গন্ধ ভুরভুর করছে। অথচ আমি পাঞ্জাবিটাতে সেন্ট ছড়াইনি। মনে পড়ে গেল, এটা কেনার সময় ঠিক এমনি গন্ধ পেয়েছিলুম বটে, কিন্তু সে তো এমন কড়া ছিল না। কাচার পর হয়তো ওই ধরনের সেন্টের এটাই জাদু।

আমার বন্ধুরা এ নিয়ে তুমুল ঠাট্টা-তামাশা জুড়ে দিল। কিন্তু স্বীকার করতে বাধ্য হল, পাঞ্জাবিটা দারুণ হয়েছে। আমার চেহারাও নাকি অসাধারণ খুলে গেছে। গর্বে খুশিতে আমি একেবারে টইটুম্বর হয়ে গেলুম।...

আমাদের বাড়ির পেছনে একটা বাগান আছে। পরদিন সকালে পিসেমশাই বললেন, "সুপু, কাল অত রাতে বাগানে তুমি কী করছিলে ?"

অবাক হয়ে বললুম, "আমি ? না তো !"

পিসেমশাই রগচটা মানুষ। বললেন, "আমি কানা না অন্ধ ? স্পষ্ট দেখলুম, তুমি গুনগুন করে গান গেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ। জ্যোৎস্না একেবারে দিনবরাবর। তাই তোমাকে ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছিলুম জানালা থেকে। আর তুমি বলছ, না তো ! স্বীকার করলে আমি কি তোমার মাথা কেটে নেব ?"

আরও অবাক হয়ে বললুম, "অসম্ভব।"

পিসেমশাই আরও চটে গিয়ে বললেন, "দ্যাখো সুপু, আমি অনিদ্রার রুগি, কিন্তু আমার এই চোখদুটো রাতবিরেতে অন্ধকারেও সব দেখতে পায়। আমার আইসাইট প্রচণ্ড।"

পিসিমা বললেন, "খামোকা তক্ক করা তোমার অভ্যেস। কী ভাবে চিনলে ও সুপু কি না ?"

"কেন ? ওই পাঞ্জাবি !" পিসেমশাই আমার ঘরের দেয়ালে হুকে ঝোলানো পাঞ্জাবিটার দিকে আঙুল তুলে বললেন, "তার ওপর সেন্ট !" তারপর এগিয়ে গিয়ে নাক ঠেকিয়ে শুঁকলেন। ওঁকে উত্তেজিত দেখাল। "এই তো সেই সেন্ট ম'ম' করছে !"

ঘাবড়ে গিয়ে বললুম, "আপনি ভুল করছেন না তো ?"

"আমি ভুল করব ? তুমি জানো, আমি পুলিশের চাকরি করতুম ? আমার পঞ্চেন্দ্রিয় অতি প্রখর।"

পিসিমা ভেংচি কেটে বললেন, "সেজন্যেই রাতবিরেতে ঘুমোও না। আর সবখানে চোর দ্যাখো। স্বভাব যাবে কোথায় ?"

ব্যাপারটাকে বিশেষ পাত্তা দিইনি ঠিক এই কারণেই। একে রিটায়ার্ড দারোগা, তার ওপর অনিদ্রার রোগী উনি। কিন্তু সেদিনই রাতদুপুরে উনি চেঁচামেচি হুলুস্থুলু বাধিয়ে বসলেন। ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে অগাধ জ্যোৎস্না ঝকঝক করছে। আর ঠিক এই সময়টাতেই চলেছে লোডশেডিং। বেরিয়ে গিয়ে শুনি, পিসেমশাই বলছেন, "এ দস্তুরমতো অপমান করা। এর মধ্যে চক্রান্ত আছে। আর কুটুম্বিতেয় কাজ নেই। এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ব।"

বাবা ও মা ওঁকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন। পারছেন না। গিয়ে বললুম, "ব্যাপার কী ?"

পিসেমশাই আমার দিকে তাকিয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। মা তেড়ে এলেন, "সুপু ! তোর লজ্জা করে না গুরুজনের সঙ্গে ইয়ার্কি করতে ? ছিঃ ! জানিস উনি অনিদ্রায় ভোগেন..."

বাধা দিয়ে বললুম, "কী হয়েছে বলবে তো ?"

বাবা গর্জন করলেন, "শাট আপ ! যত ইতর মস্তানদের সঙ্গে মিশে তুমি গোল্লায় গেছ। বসে-বসে খালি অন্নধ্বংস, চাকরিবাকরির চেষ্টাচরিত্র নেই। আর গুরুজনদের পেছনে লাগা

আমি হতভম্ব। বললুম, "আমি তো কিচ্ছু জানি না।"

"জানো না ? ব্রজদা বলছেন, বাগান থেকে তাঁকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছ। জানলার সামনে এসে বিশ্রীরকমের যতসব অঙ্গভঙ্গি করেছ। এমন কী, কালোয়াতি করে গান পর্যন্ত গেয়েছ !"

"আমি ?"

"হ্যাঁ, তুমি।" বলে বাবা রাগের চোটে ঘরে ঢুকে গেলেন।

পিসেমশাই বাবার কথার সঙ্গে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বরে বললেন, "সেই পাঞ্জাবিটা পরে আজও একই কাণ্ড। ক্লিয়ার চাঁদের আলোয় ধপধপে ক্লিয়ার পাঞ্জাবি! নাঃ, আমি কালই চলে যাব।"

বেগতিক দেখে অগত্যা ক্ষমাটমা চেয়ে ওঁকে শান্ত করতেই হল। কিন্তু মাথামুণ্ডু কিছু ভেবেই পাচ্ছিলুম না, কে এমন সাদা পাঞ্জাবি পরে বাগানে ঘোরাঘুরি করে বেড়ায়, কালোয়াতি গান গায় আর জানালায় গিয়ে পিসেমশাইকে ভয় দেখায়!

পরের রাতে আমি জেগে রইলুম। ঠাকুমার ঘরে ঠাকুর্দার স্মৃতির প্রতীক দেয়ালঘড়িতে ঢংঢং করে বারোটা বাজল। আমি জানালার সামনে বসে বাগানের দিকে চোখ রেখেছি। জ্যোৎস্না ধুধু করছে বাগানে। শনশন করে বাতাস বইছে। ঘরের দরজা ভেজিয়েই রেখেছি, যাতে সময়মতো ঝটপট বেরিয়ে পড়তে পারি। সেই সময় খুট করে একটা শব্দ হল ঘরের ভেতর। বাইরের জ্যোৎস্নার আভা ঘরের ভেতরটাকে একটু স্পষ্ট করেছে। ঘুরেই দেখতে পেলুম, দেয়ালের হুক থেকে পাঞ্জাবিটা কেউ যেন নামিয়ে নিল। শূন্যে ভাসছে পাঞ্জাবিটা, যেন কেউ গায়ে পরছে। অথচ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।

এই বিদঘুটে দৃশ্য দেখেই গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেছে। সুইচ টিপে আলো জ্বালানোর কথাও মাথায় নেই—অবশ্য রোজ রাতে এ সময় লোডশেডিং থাকে।

আমার চোখের সামনে পাঞ্জাবিটা এগিয়ে গেল দরজার দিকে। দরজা ফাঁক হয়ে গেল। তারপর পাঞ্জাবিটা অথবা পাঞ্জাবিপরা অশরীরী—বেরিয়ে গেল। আমার গলায় স্বর পর্যন্ত বেরুল না। আতঙ্কে নিঃসাড় হয়ে রইলুম।

তারপরই বাগানের দিকে চাপা স্বরে গুনগুনিয়ে কালোয়াতি সুর শুনতে পেলুম। জানালা দিয়ে দেখতে পেলুম, পাঞ্জাবিটা উজ্জ্বল সাদা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটু পরেই সেটা ঘুরতে ঘুরতে পিসেমশাইয়ের ঘরের জানালার সামনে গেল। অমনি পিসেমশাইয়ের গর্জন শুনতে পেলুম, "অ্যাই সুপু! সাবধান! গুলি ছুঁড়ব বলে দিচ্ছি। আবার? তবে রে…"

পিসেমশাইয়ের কাছে রিভলভার আছে জানতুম না। গুলির শব্দ শোনা গেল। সেই সঙ্গে পিসিমার আর্তনাদ, "এ তুমি কী করলে গো-ও-ও-ও!"

সে এক তুলকালাম কাণ্ড। এতক্ষণ আমার মাথায় জ্ঞানবুদ্ধি ফিরে এল। সিঁটিয়ে বসে ছিলুম। উঠতে গেছি, দেখি ঘরের দরজা দিয়ে পাঞ্জাবিটা ঢুকল। আমি পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলুম বারান্দায়। ততক্ষণে লণ্ঠন জ্বলছে। বাবা আর মাকে দেখলুম টর্চ নিয়ে খিড়কি দিয়ে বেরুতে। বেশ বুঝলুম, পুত্রের ডেডবডি দেখতেই যাচ্ছেন। পিসিমা পিসেমশাইয়ের সঙ্গে ঘরের ভেতর যেন যুদ্ধ করছেন। পিসেমশাই চেঁচাচ্ছেন, "ছাড়ো! ছাড়ো! গুলি পোরা আছে!"

বাবা ও মা হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসে আমাকে দেখেই থমকে দাঁড়ালেন। মা ঝাঁপিয়ে পড়লেন আমার ওপর "সুপু রে" বলে চিক্কুর ছেড়ে। বাবা ধমক দিয়ে বললেন, "ব্যাপারটা কী বলবি হতচ্ছাড়া?"

মা কান্নাজড়ানো গলায় বললেন, "খিড়কি তো বন্ধ ছিল দেখলে তাহলে সুপু বাগানে গিয়েছিল কোন পথে?"

"সেজন্যেই তো ওঁদেরকে জিজ্ঞেস করছি, এই রহস্যের অর্থ কী?"

অর্থ তো আমার কাছেও পরিষ্কার নয়। তাই বললুম, "আমি কেমন করে জানব? ওই এক্স-পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞেস করুন, কোন্ এক্স-কালোয়াতকে গুলি করেছেন!"

এরপর ওই ভুতুড়ে পাঞ্জাবি আর পরা দূরের কথা, ঘরে রাখার সাহস হবে এমন বীরপুরুষ তো দেখি না কোথাও! সকালে কথাটা মা-পিসিমা-ঠাকুমা মিলে তুললেন। সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব নিলেন, ওই অলক্ষুনে জামাটা পুড়িয়ে ফেলা হোক। কিন্তু প্রবল আপত্তি তুলল টিংকু। "বা রে! দাদার পনেরোটা টাকা এমনি-এমনি যাবে! তার চেয়ে ওটা কাউকে দান করলেই তো হয়।"

দোনামনা করে বললুম, "যাকে দেব, তার বাড়িতে যদি গণ্ডগোল হয়? সে তো সব টের পেয়ে ফেরত দিয়ে যাবে। পুড়িয়ে ফেলার সাহস পাবে বলে মনে হয় না পাছে কালোয়াত ভদ্রলোক ক্ষতিটতি করেন।"

টিংকু চোখ টিপে হাসল। "চেপে যা না! আমিই ওটার ব্যবস্থা করে ফেলব।"

টিংকু পাঞ্জাবিটা ভাঁজ করে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে সে ফিরে এসে একচোট হাসল। বললুম, "হাসছিস যে? কার বারোটা বাজিয়ে এলি, শুনি?"

টিংকু আগের মতো চোখ টিপে শুধু বলল, "চেপে যা!"

দিনকতক পরে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হল। রহমত খাঁ কাবুলি তার জোব্বা শার্টের ওপর সাদা নকশার একটা পাঞ্জাবি পরে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে যথারীতি লাঠি। লাঠির ডগায় চিবুক রেখে সে গুনগুন করে কালোয়াতি সুর ভাঁজছে। আরে, এ তো সেই কালোয়াতি সুর। একটা নেড়ি কুকুর যেতে যেতে আমার মতোই থমকে দাঁড়াল। তারপর সন্দিগ্ধ চোখে রহমত খাঁয়ের দিকে তাকিয়ে ঘেউ করে উঠল। সুর কেটে যাওয়ায় খাপ্পা হয়ে রহমত খাঁ লাঠি তুলে বলল, "বাগ্! বাগ্ কুত্তা কাঁহেকা!" তারপর আমাকে দেখতে পেয়ে সেলাম দিয়ে হাসল।

বললুম, "তোমার পাঞ্জাবিটা তো খুব সুন্দর খাঁসাহেব!"

রহমত খাঁ হাসতে-হাসতে বলল, "আপনার বহিন টিংকুদিদি হামাকে দিয়েসে বাবুজি টিংকুদিদি বহুত বালো দিদি আসে।"

হাসি চেপে বললুম, "পাঞ্জাবিটা কোনো গোলমাল করছে না তো?"

"গুলমাল!" রহমত খাঁ কাবুলি চোখ বড় করে তাকাল। "হামি রহমত খাঁ পাঠান আসি—হামার সাথ গুলমাল করবে? তব্ শুনিয়ে বাবুজি! খোখিদিদি যখন হামাকে পিরহানটো দিল, তখুনি হামি দেখে শোচ করলাম কী, আরে! ইয়ে তো কলকাত্তাকা কাল্লু খাঁ কাওয়ালের পিরহান আসে!"

অবাক হয়ে বললুম, "বলো কী খাঁসাহেব? দেখেই চিনে ফেললে?"

"হাঁ-আ," খাঁসাহেব হা হা করে হাসল। "আতরের খুশবোতে মালুম হয়ে গেল। ইয়ে আতর ঔর পিরহান কাল্লু কাওয়ালের। বহুত খরচ করনেওয়ালা আদমি ছিল কাল্লু, নয়া পোশাক বেচে দিয়ে ভি রুপেয়া লিত। তো কাল্লু হামার কাছে শও রুপেয়া ধার করেসিল। তারপর মরে গেল। হামি রুপেয়া না পেলাম, না সুদ পেলাম। তো দেখিয়ে, খোদাকা মর্জি! থোড়াসা উসুল হইয়ে গেল।"

সবই বুঝলুম। কিন্তু সন্দেহটা থেকে যাচ্ছে। বললুম, "তাহলে কোনো গোলমাল করছে না কাল্লু খাঁ কাওয়ালের জামা? ধরো…রাতবিরেতে…"

বাধা দিয়ে লাঠি ঠুকে কাবুলি অট্টহাসি হেসে বলল, "গুলমাল করবে কী বলসেন বাবুজি! শও রুপেয়া ধার আর তিনশো রুপেয়া সুদ। হামাকে দেখলেই তো ভেগে যাবে—জিন্দা হো, কী বুত হো! হাঁ—কাল্লুর বুত ভি সব ছোড়কে ভেগে যাবে।"

হ্যাঁ—স্বীকার করতে হয়, আপদেবিপদে টিংকুর মাথাটা ভালই খোলে।…

ছবি দেবাশিস দেব

বুমবাইয়ের রাঙাজেঠু

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

বুমবাই যে এখন কী করবে ঠিক বুঝতে পারছে না। আজও পিওন বলল, না খোকাবাবু, তোমার কোনো চিঠি নেই। সে রাঙাজেঠুকে এত সুন্দর করে একটা চিঠি লিখেছে, চিঠিতে সে ইচ্ছেবাবুর ছবি পর্যন্ত এঁকে দিয়েছিল, লিখেছিল, "জেঠু, এবারে আমাদের মামাবাড়ি যাওয়া হয়নি। পুজোর ছুটি শেষ হলে প্রত্যেকবারই তুমি একবার আসো, তাও এলে না। আমার খুব মন খারাপ। এবারে আমি ক্লাস সিক্সে উঠেছি। সিক্সে ওঠা কত বড় কথা, নিশ্চয়ই তুমি বোঝো। আমাকে আর সকালে উঠে স্কুলে যেতে হবে না। এখন আমার দুপুরে স্কুল। বড়দিনের ছুটি চলছে। আমার সময় কাটছে না।"

এর আগেও বুমবাই তার জেঠুকে চিঠি দিয়েছিল। সে চিঠিটা জেঠু পায়নি। সে তখন আরও ছোট। কী করে বুঝবে যে, কাউকে চিঠি লিখতে হলে নাম-ঠিকানা দিতে হয়। সে শুধু খামের উপর লিখেছিল, 'আমার জেঠু গায়ে তাঁর সমুদ্রের গন্ধ।' এমন একটা চিঠি যে জেঠু ছাড়া আর কারও কাছে যেতে পারে তা সে বুঝতে পারেনি। কিন্তু ক্লাস সিক্সে ওঠার জন্য তাকে চিঠি লেখা শিখতে হয়েছে।

চিঠিটা লিখে ওর মনে হয়েছিল, কেমন যেন কোথাও খুঁত আছে। সেজন্য পাশে ছবি এঁকে দিয়েছে। ছবিটা ইচ্ছেবাবুর! বুনো ওলের মতো মাথা, বাঁকা তেঁতুলের মতো ঠ্যাং। সঙ্গে সে একটা ওরাংওটানের লেজ এঁকে দিয়েছিল। জেঠু যেন বুঝতে পারে, বুমবাই শুধু ক্লাস সিক্সেই ওঠেনি, সে এখন একজন মস্ত বড় শিল্পী। এত বড় খবরে জেঠুর মতো এত বেশি খুশি আর কেউ হতে পারে, পৃথিবীতে এমন কাউকে সে জানে না। সেই জেঠু, যিনি এসেই সারা পৃথিবীর গল্প জুড়ে দিতেন, জাহাজের গল্প, নাবিকদের গল্প, আর সেই জাদুকর বসন্তনিবাস থেকে ম্যাণ্ডেলা, কেউ বাদ যেত না। বড়দিনের ছুটিতে জেঠু কাছে থাকলে কী মজাটাই না হত। ম্যাণ্ডেলার পালকের টুপি, হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো, এমন কত না মজার গল্প। সে ভাবল, জেঠুকে আর-একটা চিঠি লিখলে কেমন হয়!

জেঠু এলে মা কেমন আড়ালে মুখ গোমড়া করে থাকে। মা'টা যে কী! জেঠু ভাল-মন্দ খেতে ভালবাসেন। দেশের বাড়িতে লাউশাক থেকে শাপলার শুক্তোনি, এমন কী কচি আম দিয়ে টকের ডাল কী করে রাঁধতে হয়, তাও মা'কে শিখিয়ে দিয়েছিলেন জেঠু। বলেছিলেন, "বউমা, রোজ-রোজ ছেলেকে ডিম-টোস্ট দেবে না। সকালে কাঁঠাল-বিচি সেদ্ধ দিয়ে গরম ভাত দেবে। তাতে শরীরের পুষ্টি হয়।" এসব কথা শুনে আড়ালে মা'র কী হাসি!

বুমবাই জানে, মা'টা তার এইরকমই। জেঠুর কিছুই পছন্দ নয়।

জেঠু একবার এসে বাড়িতে ঢুকেই হায়-হায় করে উঠেছিলেন—এ কী চেহারা হয়েছে ছেলেটার ! বাবার এক কথা, "কী করব বলো, কিছু খেতে চায় না। ডাক্তার দেখছে। কিছু হচ্ছে না। খেতে বসলেই ওর নাকি বমি পায়। কত টনিক, পিল খাওয়াচ্ছি—কোনো কাজ হচ্ছে না।"

জেঠু গুম হয়ে বসে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর বের হয়ে গেলেন। ফিরলেন দুপুরে। কোঁচরে যত বনজঙ্গলের গাছপাতা জড়ো করে হাজির। মা'কে বললেন, "শিল-নোড়া আছে তো ? থাকলে দয়া করে দাও।"

এমন একটা হাল-ফ্যাশানের নতুন শহরে যে এসব লাগে না, জেঠু কী করে বুঝবেন। তবু মা গিয়ে নিনিদের ফ্ল্যাট থেকে শিলনোড়া চেয়ে আনলেন। তখন জেঠু বললেন, "কাজের মেয়েটাকে বলো মিহি করে বাটতে।"

বাবা অফিস থেকে এলে জেঠু বললেন, "ছেলেটাকে কি তোরা মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছিলি ?"

বাবা অবাক জেঠুর কথায় ! জেঠুর তখনও কড়া মেজাজ। "তোরা তো টনিক পিল খেয়ে বড় হোসনি ! সকালে উঠে দু-চামচ চিরতার জল দিতে তোদের এত কষ্ট ! অগ্নিমান্দ্য বলে একে। কালোমেঘের পাতা নিয়ে এলাম। বেটে বড়ি করে খাওয়া। দেখবি তখন ভাতের থালা ছেলের পিছু ঘুরছে না, ছেলেই তোমার ভাতের থালার পিছু ঘুরছে।"

হলও তাই। বাপ্‌ রে। ক'দিন যেতে-না-যেতেই সে কী রাক্ষুসে খিদে। যাবার সময় চিরতা আর একঠোঙা ধনে কিনে দিয়ে বলেছিলেন, "ভিজিয়ে রাখবে। সকালে উঠে এক ঝিনুক চিরতার জল চিত করে ফেলে খাওয়াবে। এমনিতে তো খাবে না।" সেখানেও শেষ নয়। চিরতা ভেজাবার পাত্রটির খোঁজ করলেন। মা স্টিলের বাটি নিয়ে এলে খেপে লাল। "দুটো বাচ্চার মা তুমি, চিরতা কিসে ভেজাতে হয়, জানো না ? পাথরের বাটি-টাটি নেই ?"

থাকবে কোত্থেকে। পাথরের বাটি সংসারের কাজে লাগে, মা জানেনেই না। জেঠু নিজেই বেনাচিতির বাজার থেকে সাদা পাথরের বাটি কিনে দিয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং এমন মানুষ বাড়ি এলে যে বিড়ম্বনা বাড়বে, মা তা ঠিক টের পান। এবার পুজোর ছুটিতে জেঠু আসেননি বলে মা হাঁফ ছেড়ে যেন বেঁচেছেন। "যাক, তেনার তবু দয়া হয়েছে। বুঝতে পেরেছেন, ছুটি শেষ হলেই ভাইপোর পরীক্ষা। আজগুবি সব গল্প বলে ভাইপোটির মাথা চিবিয়ে খেতেন, তার থেকে রক্ষে পাওয়া গেছে।"

বুমবাইর যে কী রাগ হয় না তখন মায়ের উপর ! হাত-পা ছুঁড়ে বলবে, "তুমি কক্ষনো আমার জেঠুর নিন্দেমন্দ করবে না। জেঠু আসে বলেই তো কত রকমের আমরা খাবার খেতে পাই। ইলিশ-ভাতে কখনও করতে জানতে ? জেঠু এসেই তো শিখিয়ে দিল।"

মা'র তখন এক কথা। "ও আমরা সব জানি। করেটা কে ! একটা লোক পাওয়া যায় না। তোমরা কী বুঝবে। রান্নার বই কিনেছি, করে খাওয়াব।"

জেঠু সম্পর্কে নিন্দেমন্দ হলে বোন ঝুপিটাও দাদার পক্ষ নেয়। ভাই-বোন মিলে বলবে, "জেঠু আসবে। একশোবার আসবে। দাঁড়াও না, জেঠুকে একটা চিঠি লিখেছি আসতে, যদি না আসে, আবার চিঠি দেব।"

মা'ও তখন খেপে যান। "হ্যাঁ, আসুক আর জ্বালাক। বউমা, এই দ্যাখো, গিমেশাক নিয়ে এলাম, বেশ অল্প তেলে মুচমুচে করে বেগুন দিয়ে ভাজবে। আমি যে ঘি-টা এনেছি, ওটা সবার পাতে-পাতে দেবে। ভাতটা কিন্তু গরম হওয়া চাই।" অর্ডারের পর অর্ডার।

তারপরই মা'র কেমন আরও মাথা গরম হয়ে যায়। "আরে বাবা, দেশে কে কী খেয়ে বড় হয়েছে, মনে করে বসে থাকলে চলে ! সংসারে তখন কত লোকজন। তোমার বাবার তো ছ'সাতজন মামাই ছিল। তাদের বউরা, তাদের ছেলেমেয়ে, সব মিলে ত্রিশ-চল্লিশজন বসে খেত। অভাব ছিল না কিছুর। সেদিনকার যা, তা হয়েছে। তোমার বাবা তো মামাবাড়িতেই মানুষ। আর সেই সুবাদে বছর-বছর আমাকে জ্বালাতে আসে তোমার জেঠু।"

বুমবাই জানে, জেঠু বাবার মামাতো ভাই। জেঠুর দুই ছেলে। একজন বাইরে। সেই কোন মার্কিন মুল্লুক বলে একটা দেশ আছে, সেখানে স্কলারশিপ নিয়ে চলে গেছে। জেঠু এলেই বাবার এক কথা, "দেখছ তো, দাদারা তোমার কত বড় হয়েছে। বারো ক্লাসে তোমার বাবুলদা তো অঙ্কে একশোতে একশো পেয়েছে।"

জেঠুর তখন ধমক, "ধুস, ওটা কোনো খবর ! বুঝলি বুমবাই, সেই যে ম্যাণ্ডেলা, সে এবারে কোথায় গেছে জানিস ?"

"কোথায় গেছে ?"

"একটা জাহাজে। বুড়ো একটা লোক দ্বীপে আটকা পড়ে আছে। তাকে উদ্ধার করতে হবে তো

মা তখন রান্নাঘর থেকে গজগজ শুরু করবেন। "হয়ে গেল ! পড়াশোনা মাথায় উঠল ! এখন সারাদিন চলবে ম্যাণ্ডেলার সব আজগুবি অভিযানের কথা। কী যে জ্বালা হয়েছে আমার।" জেঠু একটু কানে কম শুনতে পান বলে রক্ষা।

মা'র গজগজ চলছেই। "পালকের টুপি না ছাই। আরে, মানুষ কখনও পালকের টুপি পরে উড়ে যেতে পারে ? ছেলেটাও হয়েছে তেমনি। জেঠু যা বলবে, সব ঠিক। জেঠু মিছেকথা বলতে পারে না। জাদুকর বসন্তনিবাস বলে কেউ থাকতেই পারে। পালকের টুপি পেলে সেও যেন উড়ে যেতে পারত।"

বাড়িতে অনেকক্ষণ হল বুমবাইর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। কী করছে ! মা ডাকলেন, "বুমবাই, কী করছিস ?"

সাড়া নেই।

আবার রান্নাঘর থেকে মা ডাকলেন, "কী রে, সাড়া দিচ্ছিস না কেন ?"

তখন ঝুপি এসে চুপিচুপি বলল, "মা, জানো, দাদা না জেঠুকে চিঠি লিখছে।"

"চিঠি লিখছে ! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি।" বলেই ছুটে বের হয়ে বসার ঘরে ঢুকে মা যা দেখলে, তাতে একদম হাঁ। মূর্তিমান জেঠু নিজেই হাজির। জানলায় দাঁড়িয়ে ডাকছেন, "বুমবাই, দরজা খোল্‌ ! এই যে বউমা, চলে এলাম।"

বউমা আর কী করেন ! মাথায় সামান্য ঘোমটা তুলে দরজা খুলে দিয়েই অবাক। হাতে বিশাল একটা হাঁড়ি। মালসা দিয়ে ঢাকা। ঝুপি লাফিয়ে দাদার ঘরে ছুটে চলে গেছে। "ও দাদা, শিগগির আয়, জেঠু এসে গেছে !"

বুমবাই ভাবল, মিছে কথা ! সে বলল, "আমার সঙ্গে ইয়ার্কি হচ্ছে ! দাঁড়া, বাবা আসুক, যদি না বলেছি…"

আর তখনই প্রায় স্বপ্ন দেখার মতো সে দেখতে পেল, সেই লম্বা দীর্ঘকায় মানুষটি হাজির। গায়ে ফতুয়া। পায়ে পাম্পশু। হাঁটুর নীচে কোনোরকমে কোঁচাটি ঝুলছে।

"ও জেঠু, আমার জেঠু" বলে বুমবাই ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলে তিনি একটু সরে দাঁড়ালেন। বললেন, "দাঁড়া।" বলে বউমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এটা ভিতরে নিয়ে রাখো। পারবে তো ? খুব ভারী। দেখো আবার রাখতে গিয়ে যেন ভেঙে-টেঙে না যায়।"

বুমবাই বলল, "কী আছে ওতে ?"

"কটা কইমাছ। অঘ্রান-পৌষে কইমাছ খেতে খুব সুস্বাদু। নিয়ে এলাম, পুকুর থেকে তোলা। খেলে বুঝবি, কী জিনিস !"

ও-সব দেখার সময় নেই বুমবাইর। সে ফ্যানটা ছেড়ে দিয়ে বলল, "তুমি বোসো। আমি নিয়ে যাচ্ছি।"

"পারবি না বাবা। ট্যাক্সিঅলাই পারেনি।" তারপর বউমার পলকা শরীরের কথা ভেবে বলেন, "দাঁড়াও, আমিই রেখে আসছি।"

এমন একটা বিশাল হাঁড়িতে যে শুধু কইমাছ নেই, আরও কিছু আছে, বুঝতে বউমাটির কষ্ট হল না। আর যখন সেটি রান্নাঘরে রেখে বের হয়ে এল মানুষটি, মালসা তুলে বউমার মাথায় হাত। বিঘতপ্রমাণ সব অতিকায় মাছ। এ মাছ কুটবে কে ? একটা মাছ তো লাফিয়ে বউমার নাকে এসে গোঁত্তা খেল। জল থেকে লাফিয়ে প্রথমে নাকে গোঁত্তা, পরে হাঁটাহাঁটি। মাছটা ধরতে গিয়ে মালসার নীচে রাখতেই হয়। ওটা যে ঢেকে রাখার নিয়ম, বউমাটি তা জানবে কী করে ! আর ধরতে গিয়ে আরও বিপদ। ততক্ষণে জল থেকে লাফিয়ে টপাটপ সব ঘরময় হয়ে যাচ্ছে। একটাকেও ধরতে পারছে না। কানকো দিয়ে হাতে আঁচড়ে দিতেই রক্তপাত শুরু হয়ে গেল। আর তখন মাছগুলোও স্বাধীন হয়ে গেছে। খলবল করছে, আর হাওয়ায় উড়ে এসে মেঝেতে পড়ছে। কাজের মেয়েটা ছুটে এসে বলল, "ও বাবা, কী করেছ হাতটা বউদি !"

বউমা ধমক লাগাল,"চুপ কর তো ! ওঃ, কী যে করি ! সারা ঘর হয়ে গেল। তুলতে পারছিস না ? হাবার মতো দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিস !"

"তুমি পারছ ?"

"কাঁটা মারছে। ওঃ, কী জ্বলছে হাত !"

একটা কই কখন কোন ফাঁকে হাঁটতে-হাঁটতে বসার ঘরে এসে হাজির।

কাজের মেয়েটি বলল, "কর্তাবাবুকে ডাকি !"

"চুপ ! এসেই বলবেন, তোমরা আজকাল বউমারা কী যে হলে ! সামান্য কইমাছের কাছে তোমরা এমন জব্দ।"

বুমবাই বলছিল, "আচ্ছা জেঠু, ম্যাণ্ডেলা এখন বড় হয়ে গেছে না ?"

তখন রান্নাঘরে হুলুস্থুলু কাণ্ড। বসার ঘর থেকে কেউ সেটা টের পাচ্ছে না। দু' হাতে সাপটে ধরছে বউমা এক-একটা কইমাছ। আর কানকোর আঁচড় খেয়েই ছেড়ে দিচ্ছে। কেবল বলছে, "মাগো ! কী জ্বালা করছে হাত।" খুব নিচু গলায়। শুনলে তিনি তো এক্ষুনি ছুটে আসবেন। আর দশটি অনুযোগ শোনাবেন। কার ভাল লাগে !

জেঠু বলল, "মুশকিল কী জানিস, ম্যাণ্ডেলা বড় হবে কী করে ! ও তো ওর বাবাকে এখনও খুঁজে পায়নি।"

বুমবাইর কাছে জেঠুর এমন কথা বড়ই অকাট্য যুক্তি মনে হয়। সে বলল, "সত্যি, বাবাকে খুঁজে না পেলে বড় হবে কী করে।" আর তখনই কী যেন পায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। সেন্টার টেবিলের নীচে একটা কইমাছ। কার্পেটের গা বেয়ে উঠে আসছে।

সঙ্গে-সঙ্গে জেঠুর গলা সপ্তমে চড়ে গেল ! "ও বউমা, কইমাছ এখানে কেন !" বলে মাছটার মুখের দিক থেকে হাতটা এগিয়ে মাথাটা চেপে ধরে মুঠোয় ভরে রান্নাঘরে দিয়ে আসতে গেল। ভিতরে গিয়ে হাঁ। সারা ঘরময় মাছগুলি নির্বিঘ্নে হেঁটে বেড়াচ্ছে। কাজের মেয়েটা রাশি-রাশি ডেটল ঢালছে বউমার হাতে। আর পাখার হাওয়া করছে। বউমা কিন্তু 'আঃ, উঃ' কিছু করছে না। দাঁত চেপে হাত ঝাড়ছে কেবল।

বুমবাই ঝুপি দু'জনেই পেছনে এসে দেখছে, কষ্টে মার চোখে জল এসে গেছে।

জেঠু উবু হয়ে প্রথমে মালসাটা দিয়ে হাঁড়িটা ঢেকে দিলেন। বললেন, "বউমা, ছেলেরা ভালমন্দ কী আর খাবে ! সামান্য কটা কইমাছের কাছেই তুমি এমন জব্দ। দেখি হাতটা ! ইস, কী করেছ ! সরো দেখি।" বলে উবু হয়ে বসলেন। "এই দ্যাখো, মাথার দিক থেকে হাত দেবে। দ্যাখো। দেখছ তো, কীভাবে ধরছি ? মাথাটা চেপে ধরলেই ঠাণ্ডা।" বলে মালসা তুলে মাছটা রাখলেন। আবার মালসাটি ঢেকে অন্য একটি মাছ এবং এই করে করে সব কটিকে

আবার হাঁড়িতে রেখে, মা'র সামনে হাতটা খুলে দেখালেন। "কই, হাতে কোনো আঁচড় লেগেছে ?"

সেবার বুমবাই আর ঝুপির ভাতে-সেদ্ধ কই, কইমাছের পাতুরি, ইত্যাদি সব খাওয়া হল ঠিকই, তবে মাকে কিছু করতে হয়নি। মা তো দু' হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে সেই যে বিছানা নিলেন, আর উঠলেন না। সঙ্গে এ. টি. এস.। কাজের মেয়েটা কইমাছ কাটতে জানে না। তেমন ধারালো বঁটিও বাড়িতে নেই। কাটাপোনা ছাড়া অন্য মাছ আনার নিয়ম তো এ-বাড়িতে নেই। বাবা নিনিদের বাড়ি থেকে বঁটি ধার করে আনলেন। জেঠু নিজে কীভাবে কইমাছ কাটতে হয় বাবাকে বসে বসে শেখালেন। পাতুরি দিয়ে গরম ভাত বেড়ে জেঠুই খাবার টেবিলে রেখে ডাকলেন, "ওঠো বউমা, খেয়ে নাও।" বাবা মা'র মাছ বেছে দিলেন। এবং চামচ দিয়ে মাকে বাবা ভাতও খাইয়ে দিলেন।

যাবার দিন জেঠু বললেন, "বেশ কাটল বুমবাই। কতদিন নিজের হাতে রান্নাবান্না করে খাইনি। এই খাওয়ার মধ্যে কত যে আনন্দ কেউ বোঝে না।"

জেঠু চলে যাবার সময় বুমবাই একটা কথাও বলতে পারল না। কেবল ভ্যাক করে কেঁদে ফেলল। জেঠু ট্যাক্সিতে উঠে হাত নেড়ে বললেন, "আবার যখন আসব, তখন তোদের মোচার ঘণ্ট করে খাইয়ে যাব। বাঙালির এমন সুন্দর খাওয়া-দাওয়া ভুলে গেলে চলে

বুমবাইর কেন জানি মনে হল, জেঠু নিজেই বোধ হয় সেই জাদুকর। জেঠু যখন এত পারেন, তখন তাঁকে ঠিক একটা পালকের টুপিও দিতে পারেন। আবার এলে পালকের টুপিটা জেঠুর কাছ থেকে চেয়ে নিতে হবে।

চুম্‌কির মা পদ্মমণি

নবনীতা দেবসেন

এক দিঘিতে এক যক্ষিবুড়োর বাস ছিল। সে বুড়ো যখন-তখন মানুষ ধরে যক্ষপুরীতে নিয়ে যেত। আর যক্ষপুরীতে গিয়ে কি মানুষ বাঁচে? মানুষ ভয়েই মরে যায়। যক্ষিবুড়ো তখন তাকে ফেলে দেয়, সে আবার পুকুরের জলে ভেসে ওঠে, পদ্মফুল হয়ে। পুকুরটাকে সবাই খুব ভয় পেত। যদিও সেই পুকুরে খুব সুন্দর-সুন্দর পদ্মফুল ফুটত, পদ্মবন হয়েছিল সারা পুকুর ঢেকে, তবু কেউ নামত না জলে। তারই নীচে লুকিয়ে থাকত যে যক্ষিবুড়ো!

একবার এক অন্য গাঁয়ের কচি বউ, পদ্মমণি, জল আনতে গেছে। সঙ্গে তার ছোট্ট মেয়েটি চুমকিও যাচ্ছে। পথে দ্যাখে, পদ্মবনে লাল সাদা কত পদ্ম ফুটে আছে। চুম্‌কি তো ছোটো, সে যক্ষিবুড়োর কথা জানে না। আর পদ্মমণিও একে নতুন বউ, তায় অন্য গাঁয়ের লোক, সেও যক্ষিবুড়োর কথা শোনেনি। এই পথে সে আগে কখনও যায়নি, পদ্মবনও চোখে পড়েনি তার। ফুলের শোভায় মুগ্ধ হয়ে চুম্‌কি বললে, "মা, আমাকে একটা পদ্মফুল দেবে?"

পদ্মমণি বললে, "দাঁড়া, দিচ্ছি।"

এই বলে, কাঁখের কলসিটি ঘাটে নামিয়ে রেখে, পদ্মমণি-বউ জলে দু'পা নেমেছে, আর যেই পদ্মফুলের ডাঁটিটি ছুঁয়েছে, অমনি জলের ভেতরে যক্ষিবুড়ো বললে, "কে আমার ফুলে হাত দেয়? তবে রে!" বলে এক হ্যাঁচকা টানে চুম্‌কির মা'কে সেই সাতাশ বাঁও জলের তলায় নীলপাথরের দেওয়াল ঘেরা শুক্তি-শামুকের মেঝেয় তৈরি যক্ষপ্রাসাদে টেনে নিয়ে গেল। চুম্‌কি দেখলে, তার মা জলের মধ্যে পদ্মফুলের মধ্যে যেন আরেকটি পদ্মফুল হয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল।

কিন্তু পদ্মমণি-বউ মোটেই ভিতু মেয়ে ছিল না। সে যক্ষিবুড়োর প্রাসাদে গিয়েও ভয় পেল না। তার কেবলই মনে হতে লাগল, চুম্‌কি ঘাটে বসে আছে, আমাকে যেমন করে হোক ফিরে যেতেই হবে। ভয় না পেয়ে মনে-মনে সে দুর্গতিনাশিনী মহাশক্তিকে প্রার্থনা জানাল। "হে মা শক্তি, আমাকে শক্তি দাও, বুদ্ধি দাও, আমি যেন যক্ষকে জব্দ করে গাঁয়ে ফিরতে পারি। আমার চুম্‌কি নিশ্চয় কত কাঁদছে।"

যক্ষ তো এদিকে একটা মানুষকে তখনও জ্যান্ত থাকতে দেখে খুবই খুশি। এতদিনে একটা কাজের লোক মিলেছে বটে! পদ্মমণিকে যক্ষিবুড়োর সব কাজ করে দিতে হয়। তার অত বড় প্রাসাদটা কে গুছোয়, কে পরিষ্কার করে! অত ধনরত্ন কে ঝাড়ে, কে মোছে, কে তোলে, কে-ই বা রাখে। তার ওই লম্বা দাড়ি, কে-ই বা তার জট ছাড়ায়, কে-ই বা তাতে তেল-আতর মাখায়?

পদ্মমণি-বউকে রাঁধতে হয়, বাড়তে হয়, ঝাড়তে হয়, মুছতে হয়, কাচতে হয়, কুচতে হয়। বউ ঘুরে-ঘুরে সব করে, আর মনে-মনে কাঁদে, আর শক্তি-মায়ের কাছে শক্তি চেয়ে সাহসে বুক বাঁধে।

যক্ষিবুড়ো মোটে লোক ভাল নয়। সেই দিঘিতে যত মাছ, সবই যক্ষিবুড়ো একাই ধরে-ধরে খায়। মাছেরা তার ভয়ে নীচের দিকে নামেই না! আর পদ্মমণিকে কেবল গুগলি-শামুক আর পদ্মডাঁটার চচ্চড়ি ছাড়া কিছুই খেতে দেয় না। কিন্তু পদ্মমণি আস্ত জ্যান্ত গোলগাল নড়ন্তচড়ন্ত গুগলি-শামুকগুলোকে মেরে খেতে পারে না। তার মনে খুব মমতা কিনা! সে তাদের আবার চুপি-চুপি জলে ছেড়ে দিয়ে, রোজ-রোজ কেবলই পদ্মডাঁটার চচ্চড়ি দিয়ে পদ্মবীজের ভাত খায়। গুগলি-শামুকেরা সবাই তাই পদ্মমণিকে খুব ভালবাসে।

পদ্মমণি একদিন খুব কাঁদছে। সাহস করে বেঁচে থাকলে কী হবে, পালাবার তো কোনো পথ নেই। যক্ষিবুড়ো নীলপাথরের দুর্গে আগল আটকে বেরোয় রোজ। যক্ষিবুড়ো কক্ষনো ঘুমোয় না। কী হবে? শুনে শামুক বললে, "পদ্মমণি, আর কেঁদো না। এবার তোমার ছুটি হবে। মানুষের সাত বচ্ছরে যক্ষদের একদিন, আবার সাত বচ্ছরে একরাত। কাল থেকে শুরু হবে সেই রাত্তির। বুড়ো ঘুমিয়ে পড়বে। দুর্গের দরজা খুলে, তুমি তখন ডাঙায় পালিয়ে যেও। সাঁতার কেটে ভেসে উঠো, আমরাই তোমায় ঘাটে পৌঁছে দেব, পদ্মবনের ডালপালা সরিয়ে, পথ কেটে দেব।"

পদ্মমণির কী আনন্দ। সময় আর কাটে না। কালকেই সে বাড়ি যাবে। তখন এল সবচেয়ে বুড়ো শামুকটি— যে গুগলি-শামুকদের রাজা। সে এসে বললে, "বউমা, তুমি যাবার সময়ে যক্ষিবুড়োর প্রাণ-পুঁটুলিটা আছড়ে ভেঙে দিয়ে যেও কিন্তু, নইলে সাত বচ্ছর পরেই সে জেগে উঠে খপ্ খপ্ করে আবার মানুষ ধরবে!

পদ্মমণি জিজ্ঞেস করলে, "যক্ষিবুড়োর প্রাণ-পুঁটুলি কোথায় থাকে?"

"একটা শঙ্খের মধ্যে। তাতে ফুঁ দিলেই সেটা বেরিয়ে পড়ে ভেঙে যাবে, আর যক্ষের ঘুমও ভেঙে যাবে। কিন্তু ঘুম ভাঙলেও আর তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না সে।"

পদ্মমণি বললে, "তা না হয় ভাঙলুম, কিন্তু যদি যক্ষিবুড়ো উঠে এসে ফের আমাকে ধরে ফেলে?"

"উঠবে কেমন করে? তার প্রাণশক্তি থাকবে না তো! এর পর সে আস্তে-আস্তে বিছানার সঙ্গে মিশে শৈবাল হয়ে যাবে, আর জেগে উঠে পৃথিবীর ক্ষতি করতে পারবে না।"

শামুকবুড়োর কথা শুনে এবারে পদ্মমণির বিশ্বাস হল। মহাশক্তি-ঠাকরুনকে মনে-মনে নমস্কার করে সে চলল যক্ষিবুড়োর প্রাণপুঁটুলির খোঁজে। দ্যাখে, তাকের ওপর এই বড় এক পঞ্চমুখী শঙ্খ। তুলে নিয়ে শক্ত পাথুরে মাটির ওপর গিয়ে যেই না ফুঁ দেওয়া, প্রবল শব্দে অমনি শাঁখ বেজে উঠল, আর টুক করে কী একটা জিনিস বেরিয়ে পাথরে পড়ে গিয়ে শতটুকরো হয়ে গেল।

সেই শব্দে যক্ষিবুড়ো আধখানা উঠে বসে, আবার ধুপ করে বিছানায় পড়ে চোখ বুজে ফেলল। ব্যাস্! তখন মনের আনন্দে শামুক গুগলি শাঁখ ঝিনুকরা সবাই লেজ ধরাধরি করে গোঁফ নেড়ে-নেড়ে শুঁড় নাচিয়ে-নাচিয়ে গান ধরল—

পদ্মমণি লক্ষ্মী
মরল বুড়ো যক্ষি।"

দিঘির তলার দেশে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল।

ওদিকে চুমকির বড় দুঃখ। তার মা নেই। চুমকি যখন খুব ছোট মেয়ে, আরও ছোট্ট, এই অ্যাত্তোটুকুনি, তখন চুম্‌কির মা পদ্মপুকুরে ফুল তুলতে গিয়ে আর ফেরেননি। গাঁয়ের লোক বলে, নিশ্চয় ঐ জলের মধ্যে দুষ্টু যক্ষ আছে। নইলে চুম্‌কির মা'কে ধরে নিয়ে গেল কে ? সে গেল কোথায় ? গাঁ সুদ্ধু মানুষেরই মনে দুঃখু। একা কি চুম্‌কির ?

এখন চুমকি বড় হয়েছে। এই তো আশ্বিন মাসে পুজোর সময়ে যখন পুকুর ভর্তি পদ্মফুল, তখনই চুম্‌কির জন্ম। সেদিন চুম্‌কির জন্মদিন। দুপুরবেলায় বাবা খেতে, ঠাকুদ্দাদা খেতে, ঠাম্মা দাওয়ায় বসে কাঁথা সেলাই করতে-করতে দেয়ালে হেলান দিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছেন। চুমকি তার ছাগলছানা ছুট্‌কির সঙ্গে খেলতে-খেলতে আস্তে-আস্তে অনে—ক দূরে, সে-ই পদ্মপুকুরের পাড়ে চলে এল। তার মা'র জন্যে মন কেমন করছে। জন্মদিন কিনা !

ঝাঁঝাঁ করছে ভরদুপুরের সাদাটে রোদ্দুর। ছুট্‌কির চকচকে কালো গা থেকে যেন গলা-মোম ছিটকে পড়ছে। চুম্‌কি এগিয়ে গিয়ে পুকুরঘাটে বসল। কেউ তো আসে না এই ঘাটে, তবু ঘাটলা কী পরিষ্কার। একটু শ্যাওলা নেই। একটু ধুলো নেই, কাদা নেই, যেন কেউ ধুয়েমুছে রেখেছে। চুম্‌কি বসল বড় বটগাছের দায়ায়। একটি বটফল পড়ে নেই, একটা বটপাতা ঝরে নেই। এই পাশে কী সুন্দর চকচকে সবুজ ঘাস হয়ে রয়েছে। ঠিক যেন ছুট্‌কির জন্যেই ভগবান তৈরি করে রেখেছেন। ছুট্‌কি লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নেচেকুঁদে মনের আনন্দে ঘাস খাচ্ছে।

জলটাও কী পরিষ্কার। ঘাটের কাছে টলটলে কালো জলের নীচে রং-বেরঙের গুগলি শামুক পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, কাদা নেই। পদ্ম তো জন্মায় কাদায়, তার নাম তাই পঙ্কজ। চুম্‌কি অবাক হয়ে ভাবল, এত পরিষ্কার জলে পদ্ম হল কেমন করে ! এর মধ্যে আমার মা হারিয়েই বা গেলেন কেমন করে ? এত পরিষ্কার জলে ? ভাবতে ভাবতে চুম্‌কি জলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে অন্যমনে একটা শামুকের খোল তুলে আনলে। রামধনু রঙের শামুকের খোলটি, তার বুকের মধ্যিখানে যেন হালকা একটা গোলাপফুলের পাপড়ি পাতা, এমন নরম গোলাপিরঙের ছোপ। কী সুন্দর ! শামুক নেই ভেতরে ? কী মনে হল, যেমন শঙ্খ কানে ধরলে সমুদ্রের আওয়াজ শোনা যায়, তেমনি শামুক কানে ধরলে পুকুরের মনের কথা শোনা যায় কি না কে জানে ! যেমন মনে হওয়া, তেমনি কাজ। চুম্‌কি কানে চেপে ধরল শামুকের খোলটা। আর ওমা, শামুকের খোলের ভেতরে কার যেন গলা ! আরে, শামুক কথা কইছে যে ! খুব মিষ্টি গলাতে শামুক তাকেই বলছে "চুমকিবানি মা কোথায় জানে না !"

চুম্‌কি তো অবাক ! সে বলে ওঠে "—ওমা ! এ শামুক যে কথা বলে ! ও ছুট্‌কি, দেখে যা ! শামুক কী বলছে শোন্ !" বলে, আর শামুকটা ছুট্‌কির কানে চেপে ধরে। কিন্তু ছুট্‌কি দেখতে যত সুন্দর, তার মাথায় তত বুদ্ধি নেই। সে কিছুই শুনলও না, দেখলও না, মনের আনন্দে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে ঘাস খেতেই লাগল, ঘাস খেতেই থাকল।

তখন চুম্‌কি কী করে ? আবার কানে লাগাতেই শুনতে পেল শামুক বলছে "পদ্মবনের মধ্যমণি, চুম্‌কির মা পদ্মমণি !"

চুম্‌কি বলে উঠল, "কই ? কই ? কোথায় আমার মা ? আমি একটু দেখব। আমাকে একবারটি দেখাও না শামুকভাই ! আমার মা'কে যে অনেকদিন দেখিনি আমি !"

শামুক বললে, "সাত বচ্ছর ভরল,
যক্ষিবুড়ো মরল !"
—জলের ধারে, পদ্মাসনে,
'মা' জপ্‌বে একটি মনে।

অমনি চুম্‌কি এক পায়ের ভেতর দিয়ে অন্য পা গলিয়ে বাবু হয়ে পদ্মাসনে বসে পড়ল, যেমন করে তার দাদু বসেন পুজো করতে। আর চোখ বুজে "মা, মা, মা, মা," নাম জপ করতে লাগল। জপ করতে-করতে তার মনে হল যেন সামনে এক পরমা সুন্দরী এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর গায়ের কাপড়টি জল-শপ্‌শপ্ ভিজে, সর্বাঙ্গে পদ্মফুলের সুবাস, আর পদ্মপাপড়ির আভা।

"কে গো তুমি ? আমার মা ?" চুম্‌কি চোখ খুলে ফেলে। দ্যাখে, সত্যিই তো ! সামনে ঠিক মা'র মতনই দেখতে একজন বউ।

পদ্মমণি দু'হাত বাড়িয়ে বললে, "চুম্‌কি সোনা, কেমন আছিস ধন ? তোর বাবা কেমন আছেন ?"

চুম্‌কি তো অমনি মাকে জড়িয়ে ধরেছে। "মাগো, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে ?"

"সাত বচ্ছর আমি জলের তলায় যক্ষপুরীতে শুধু মনের বলে বেঁচে ছিলুম।"

"আমার জন্যে মন কেমন করত না ?"

পদ্মমণি-মা তখন চুম্‌কিকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললে, "করত বই কী সোনা, তাই তো আমি ফিরে এসেছি। আমাকে যক্ষিবুড়ো ধরে নিয়ে গিয়েছিল যক্ষপুরীতে। মানুষের সাত বছরে যক্ষের একদিন। সে আমাকে এতদিন চক্ষের আড়াল করত না। এতক্ষণে তাদের দিন ফুরিয়ে রাত হয়েছে। জন্মের শোধ সে এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। আমিও অমনি পালিয়ে এলুম তোমার কাছে !"

চুম্‌কি ভয়ে ভয়ে বলল, "তা ঘুমোক। মা, তুমি এবার আমার সঙ্গে বাড়ি যাবে তো ?"

মা বললে, "নিশ্চয়ই। ভিজে কাপড়টা ছাড়তে হবে না ?"

চুম্‌কি তখন ঠিক ছুট্‌কির মতন লাফাতে লাফাতে বাড়ি গিয়ে ঠাম্মাকে ঠেলে ঘুম থেকে তুলে দিলে। দিয়ে বললে, "বা-ব্বাঃ, দেখালে বটে ঠাম্মা ! চশমা-চোখে, ছুঁচ-হাতে ঘুম ? ওঠো, ওঠো, দ্যাখো আমার সঙ্গে কে এসেছে। একটা শুকনো শাড়ি দাও দিকিনি।"

চুম্‌কির ঠাম্মা সেই শুনে মেঝেয় কাঁথা-সেলাই নামিয়ে রেখে, ডানহাতে চালশে-চশমাটি খুলে, বাঁ হাত দিয়ে চোখের ওপর ছায়া করে যেই উঠোনের ঝাঁঝাঁ রোদ্দুরে চুম্‌কির খোঁজে তাকিয়েছেন, অমনি— আঃ হা, চোখটি যেন জুড়িয়ে গেল। এমন সাত রাজার ধন মানিকটিকে চুম্‌কি কোথায় কুড়িয়ে পেল ?

"এই বউটিকে অবিকল আমার হারানো বউমা পদ্মমণির মতন দেখতে। এসো মাগো, বোসো মাগো, তোমাকে দেখে চক্ষু দুটি জুড়োই মাগো।"

"আরে, এই তো তোমার বউমা পদ্মমণি। এক্ষুনি মা'কে পদ্মপুকুরের ঘাটে কুড়িয়ে পেয়েছি।"

পদ্মমণি তখন ভিজে কাপড়েই ঘোমটা টেনে, "মা, ভাল আছ তো ?" বলে পেন্নাম করলে।

ঠাম্মার তো আনন্দে গেঁটে বাত-টাত সেরে গেছে। তিনি বউ কোলে করে নাচতে লেগেছেন।

হারানো বউ ফিরে এল।
চুমকিরানি মা পেল ॥
আসুক ঘরের লক্ষ্মী।
ঘুমোক বুড়ো যক্ষি ॥

ছবি প্রণবেশ মাইতি

ছোড়দির সর্দি

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সাতদিন ধরে সর্দিতে ভারী কষ্ট পাচ্ছে ছোড়দি,
ব্যাপারটা ক্রমে হচ্ছে ঘোরালো, কথাটায় তাই জোর দি'।
কোথায় আছেন বদ্যিমশাই, এক্ষুনি তাঁকে ডাক্ তো,
হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো—দিদি ক্রমাগত ঝাড়ছেন তাঁর নাক তো।
কিন্তু তেনাকে ডাকবার পরে হল এক দুর্দৈব,
সে-কাহিনী আমি এখন এখানে আদ্যোপান্ত কইব।
ওষুধ দিলেন বদ্যি, এটাকে খেতে হবে ঠিক সাতটায়,
খাবার পরেও সর্দি হয়তো জ্বালাবে একটু রাতটায়।
হ্যাঁচ্চোটা বাপু জটিল ভীষণ, হ্যাঁচ্চোটা বড় ছোঁয়াচে,
ঝোলভাত খাও, রান্নাটা হবে কাঠ-কয়লার স্লো-আঁচে।
এই বলে তিনি বিদায় নিলেন, বোঝালেন সবই পষ্ট,
ভিজিটের কথা বলে করব না সময় অযথা নষ্ট।

বদ্যি যেতেই হরেন্দ্রকাকা বারণ করেন চেঁচিয়ে,
মিছিমিছি তোরা সহজ রোগটা জটিল করলি পেঁচিয়ে।
খা তো বাপু তুই ডিমভাজা দিয়ে খানিক তপ্ত খিচুড়ি
সঙ্গে একটু ইলিশ-পাতুরি— থাকবে না ভয় কিছুরই।

হঠাৎ যদি

রত্নেশ্বর হাজরা

আমড়াতলায় রোদ পোহাচ্ছে বাঘ,
একটুও নেই রাগ।
শাকভাজা খায়, মিষ্টিও খায়, মাংসে
একটুও নেই রুচি।
স্নান করে রোজ সাবান মেখে, শুচি।

গলার মধ্যে ঐ যে গরর-গর্
বলছে বোধহয় : ওম্।
ল্যাজটা শুধু একটু নড়ে, সটান পিঠের লোম।
এইটুকু যা বন্য।
মুখের মধ্যে দুধের গন্ধ, আমের গন্ধ
আর কিছু নেই অন্য।
সবটাই ঠিক, বুঝলি ! তবু বাঘ আসলে বাঘ !
হঠাৎ যদি হালুম করে !
দৌড়ো তবে, ভাগ্ !

নাক ডাকে

আশা দেবী

নাক ডাকে, কেন ডাকে,
কাকে ডাকে ভাই রে ?
ভেবে-ভেবে সেই কথা
মনে সুখ নাই রে।
ডাকে নাকি মামাকে,
নাকি শ্যামা-রামাকে,
অথবা কি পুঁটিরাম সরদার ?
সেই কথা ভেবে-ভেবে
মনে-মনে রেগে-রেগে
মাথা ভরা টাক হল বড়দার ॥

ছবি অহিভূষণ মালিক

এই দাদাভাই

সরল দে

এই দাদা, তুই কোথায় যাবি,
কোথায় যাবি, জলদাপাড়া ?
জলদি উঠি পিঠের ওপর,
এই দাদাভাই, দাঁড়া দাঁড়া ।
গণ্ডারেরা জলদাপাড়ায়
কেমন করে খড়্গ নাড়ায়
দেখেই আসি, বলছি এত,
তুই তবুও দিস না সাড়া !

এই দাদা, তুই কোথায় যাবি,
কোথায় যাবি, দিঘা পুরী ?
তুই যদি এক চলন্ত বট
আমি তবে বটের ঝুরি ।
জড়িয়ে গলা রইব ঝুলে,
আমায় ফেলে যাস না ভুলে,
সাগরতীরে কুড়োই আমি
নানারঙের ঝিনুক নুড়ি ।

এই দাদাভাই, এক পা আমার
নেই, তবে এই একটা আছে ।
যাই না দূরে, একলা আমি
ঘুরে বেড়াই ধারে কাছে ।
কিন্তু আমার ইচ্ছে-ফুলের
ফুটছে কুঁড়ি মনের গাছে !

রামে-ভীমে

সাধনা মুখোপাধ্যায়

কৃষ্ণের নাতি যিনি
তিনি অনিরুদ্ধ,
কাহার পৌত্র বলো
গৌতম বুদ্ধ ।
ভীমের দাদুর নাম
শুধালেই ক্রুদ্ধ
হলে পরে হবে মহা-
ভারত অশুদ্ধ ।

তমসা নদীর তীরে
পুষ্পের গন্ধে
মহাকবি লিখলেন
রামায়ণ ছন্দে ।
কিশোর রামের ধনু
অপার আনন্দে
লেগে গেল তপোবনে
উৎপাত বন্ধে ।
রাক্ষস লাফ দেয়
গাছ থেকে ঝুপঝুপ
বাল্মীকি-রামায়ণে
ছন্দ অনুষ্টুপ

হাতিমপুরের লাটিম

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

হাতিমপুরের ছাতিমগাছে
লাটিম বেঁধে দিল কে ?
আয় রে সবাই, তাকে ধরে
গাঁট্টা মেরে আসি গে ।

একে তো ভাই ছাতিমগাছ,
হাতিমপুরে আবার,
তারই ডালে লাটিম বাঁধা
সাধ্যি কার বাবার ?

তবুও তো আজ দেখে এলাম
লাটিম ঝোলে ডালে—
গেরাম থেকে লোক এসেছে
দেখতে, পালে পালে ।

কেলেঙ্কারি, কেলেঙ্কারি—
বলছে পাড়ার বুড়ো,
রাতবিরেতে ঝুলিয়ে গেছে—
খবর উড়ো-উড়ো ।

যে বেঁধেছে, শাস্তি তাকে
পেতেই হবে ভারী,
ঘুচিয়ে দেব গাঁট্টা মেরে
এমন বাড়াবাড়ি !

সম্পূর্ণ উপন্যাস

মিশর-রহস্য

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

সাইকেল চালানো শেখার জন্য সন্তুকে এখন ভোরবেলা বালিগঞ্জ লেকে আসতে হয়। ওদের পাড়ার পার্কটা মেট্রো রেলের জন্য খুঁড়ে ফেলা হয়েছে, সেখানে এখন খেলাধুলো করার উপায় নেই।

ভোরবেলাতেই বালিগঞ্জ লেকে বেশ ভিড় থাকে। বহু বয়স্ক লোক আসেন মর্নিং ওয়াক করতে। অল্পবয়েসি ছেলেমেয়েরা দৌড়য়। অনেকে রোয়িং করে। কালীবাড়ির উল্টো দিকের গ্রাউণ্ডটায় ফুটবলের কিক প্র্যাকটিস হয়। লেকের পেছন দিকটায় যেখানে লিলিপুল আছে, সেখানকার রাস্তাটা অনেকটা নির্জন। ঐ জায়গাতেই দু'তিনটে দল সাইকেল শেখে।

সাড়ে পাঁচটার সময় সন্তু বেরিয়ে পড়ে বাড়ি থেকে। সঙ্গে থাকে রকুকু। সন্তুর নিজের সাইকেল নেই। কুনালদের বাড়িতে একটা পুরনো সাইকেল ছিল। কুনালের বাবা ডাক্তার, তাঁর চেম্বারের কম্পাউণ্ডারবাবু এই সাইকেলটা ব্যবহার করতেন। কম্পাউণ্ডারবাবু চাকরি ছেড়ে দেশে চলে গেছেন তিন-চার মাস আগে, সাইকেলটা নিয়ে যাননি। কুনাল সেই সাইকেলটা নিয়ে কিছুদিন প্যাড্‌ল করতে করতে চালানো শিখে গেছে। সেই দেখাদেখি সন্তুরও সাইকেল শেখার শখ হয়েছে।

কুনালকে ডাকতে হয় না, সে তৈরি হয়েই থাকে। কিন্তু মুশকিল হয় বাপিকে নিয়ে। বাপিদের বাড়িতে সবাই খুব দেরি করে ওঠে। ওদের বাড়ির সামনে গিয়ে অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করলেও কেউ সাড়া দেয় না। সন্তু আর কুনাল যখন রাস্তা থেকে বাপির নাম ধরে ডাকতে থাকে, তখন রকুকুও ঘেউঘেউ করতে শুরু করে দেয়।

শেষ পর্যন্ত বাপি চোখ মুছতে মুছতে দোতলার বারান্দায় এসে বলে, "এক মিনিট দাঁড়া, বাথরুম থেকে আসছি।"

তারপরেও বাপি পনেরো মিনিট কাটিয়ে দেয়। লেকে পৌঁছতে-পৌঁছতে রোদ উঠে যায়।

খুব ছেলেবেলায় সন্তু ট্রাইসাইকেল চালিয়েছিল, কিন্তু দু' চাকার সাইকেল চালানো খুব শক্ত ব্যাপার। একটু-একটু ভয়ে গা-শিরশির করে। সাইকেলটায় ওঠার পর কুনাল আর বাপি তাকে দু'দিকে ধরে থেকে ঠেলতে থাকে। তারপর দু'জনে নির্দেশ দেয়, জোরে প্যাড্‌ল কর, সামনে তাকিয়ে থাক্, শরীরটা হাল্‌কা কর, এত স্টিফ হয়ে আছিস কেন ?

কুনাল আর বাপি হঠাৎ একসময় তাকে ছেড়ে দিলেই সন্তুর চোখে সমস্ত পৃথিবীটাই যেন দুলতে থাকে, হাত দুটো লগবগ করে। সন্তু চেঁচিয়ে ওঠে, "এই, এই, পড়ে যাব, ধর, ধর !"

ওরা দু'জন হাসতে-হাসতে দৌড়ে এসে আবার ধরে ফেলে।

এই রকম দু'দিন ধরে চলছে। আজ তৃতীয় দিন। আজ সন্তুর অনেকটা ভয় কেটে গেছে। সাইকেলে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা আর আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে না। বাপি আর কুনাল মাঝে-মাঝে ছেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, আজ এখানে আরও চারটে দল এসেছে, এক দলের সঙ্গে আর-এক দলের যে-কোনো সময় ধাক্কা লেগে যেতে পারে। উল্টোদিকে অন্য কোনো দলকে দেখলেই সন্তু নার্ভাস হয়ে যাচ্ছে।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ছোটাছুটি করার পর একসময় বাপি সন্তুর পিঠে চাপড় মেরে বলল, "এইবার তুই নিজে চালা, সন্তু। এই কুনাল, ছেড়ে দে !"

সন্তুর আর হাত কাঁপল না, সে সোজা সাঁ-সাঁ করে বেরিয়ে গেল। দারুণ আনন্দ হচ্ছে সন্তুর, চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে, 'শিখে গেছি ; শিখে গেছি !' চিৎকার করার বদলে সন্তু ক্রিং ক্রিং করে বেল বাজাতে লাগল।

কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আবার সব বদলে গেল। আবার হাত কাঁপছে, হ্যাণ্ডেলটা এদিক-ওদিক ঘুরে যাচ্ছে, পায়ে যেন জোর কমে গেছে। সন্তুর ধারণা হল, সে একা-একা অনেকটা দূরে এসে গেছে, কুনাল আর বাপি দৌড়ে এসে তাকে ধরতে পারবে না। কী হবে ? এই রে, এই রে, সাইকেলটা হেলে যাচ্ছে

পেছন থেকে বাপি চেঁচিয়ে বলল, "ভাল হচ্ছে, চালিয়ে যা সন্তু, সামনের দিকে তাকিয়ে—"

ঠিক এই সময়ে বাঁ দিকের রাস্তা দিয়ে আর-একটা দল এসে পড়ল। এখন পাশ কাটাতে না-পারলেই মুখোমুখি কলিশান। সন্তু মোটে সোজা চালাতে শিখেছে, এদিক-ওদিক ঘুরতে জানে না। কুনাল বলেছিল, সাইকেলে সব সময় বাঁ দিকে টার্ন নেবার চেষ্টা করবি, ডান দিকে হঠাৎ টার্ন নেওয়া ডিফিকাল্ট। কিন্তু এখানে বাঁ দিকে টার্ন নিতে গেলে যে সোজা লেকের জলে নেমে যেতে হবে।

উল্টোদিকের দলটা সন্তুর একেবারে কাছে এসে চেঁচিয়ে সাবধান করে দিল, "বাঁ দিক চেপে··· বাঁ দিক চেপে !"

সন্তু আর কিছু চিন্তা না করে ডান দিকে ঘুরিয়ে দিল হ্যাণ্ডেল। পরের মুহূর্তটা সে চোখে কিছু দেখতে পেল না। কী যেন ওলোট-পালোট হয়ে গেল পৃথিবীতে। একটা গাছে ধাক্কা খেয়ে সন্তু ছিটকে পড়ে গেল, তারপর সাইকেলটাও পড়ল তার ঘাড়ের ওপর।

কোনোরকম ব্যথা বোধ করার আগেই সন্তু ভাবল, চোখ দুটো ঠিক আছে তো ? পায়ের হাড় ভেঙে গেছে ?

রকুকু ছুটে আসছিল সন্তুর পেছন পেছন। সাইকেলটা পড়ে যেতে দেখে সে ভয় পেয়ে একটু দূরে সরে গিয়ে ঘেউ-ঘেউ করে ডাকতে লাগল।

সাইকেলটা সরিয়ে সন্তু উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেও পারল না। একজন মর্নিং ওয়াকার সাইকেলটা তুলে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, "খুব লেগেছে নাকি, খোকা ? আমার হাত ধরে ওঠবার চেষ্টা করো।"

ততক্ষণে কুনাল আর বাপি এসে পৌঁছে গেল সেখানে।

কুনাল বলল, "এই ওঠ্, তোর কিচ্ছু হয়নি !"

বাপি বলল, "জলে না নামিলে কেহ শেখে না সাঁতার/ সাইকেল শেখে না কেহ না খেলে আছাড় !"

মর্নিং ওয়াকার ভদ্রলোক বললেন, "না হে, ওর বেশ ভালই লেগেছে মনে হচ্ছে, হাঁটুর কাছে রক্ত বেরোচ্ছে !"

কুনাল বলল, "আমার ওর থেকে ঢের বেশি রক্ত বেরিয়েছিল। সাইকেল শিখবে, আর একবারও রক্ত বেরুবে না ?"

ভদ্রলোকটি আবার হাঁটা শুরু করে দিলেন।

কুনাল আর বাপি দু'হাত ধরে সন্তুকে টেনে তুলল। কুনাল বলল, "সাইকেলটা টাল খেয়ে গেছে শুধু, আর কিছু হয়নি ভাগ্যিস !"

সন্তু মাঝে-মাঝে ফুলপ্যান্ট পরলেও সাইকেল চালাবার জন্য পরে এসেছে শর্টস আর গেঞ্জি। তার একটা হাঁটুর নুন-ছাল উঠে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে ফোঁটা ফোঁটা। সেখানে খানিকটা জ্বালা করলেও আসল ব্যথা হচ্ছে সন্তুর বাঁ পায়ের গোড়ালিতে।

এক পা চলার চেষ্টা করেই সন্তু উঃ করে চেঁচিয়ে উঠল। যন্ত্রণায় প্রায় চোখে জল এসে গেল তার।

বাপি বলল, "কী রে, তুই এত সব বিপদের মধ্যে অ্যাডভেঞ্চার করতে যাস, আর সামান্য একটু পায়ের ব্যথায় কেঁদে ফেললি ?"

সন্তু বলল, "ভীষণ লাগছে, মাটিতে পা ফেলতে পারছি না।"

কুনাল বলল, "জোর করে হাঁটার চেষ্টা কর, একটু বাদে ঠিক হয়ে যাবে !"

সন্তু বলল, "যদি ফ্র্যাকচার হয়ে থাকে ?"

কুনাল বলল, "ধ্যাত, অত সহজে ফ্র্যাকচার হয় না।"

রকুকু আবার এর মধ্যে সন্তুর পা চেটে দিতে চায়। সন্তু কুনালকে বলল, "ওর গলার চেনটা বেঁধে নে।"

এর পরে আর সাইকেল চালাবার প্রশ্ন ওঠে না। কুনাল সাইকেলটা ঠিক করে নিল। বাপির কাঁধে ভর দিয়ে সন্তু হাঁটতে লাগল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। তার সত্যি খুব কষ্ট হচ্ছে। সে দাঁতে দাঁত চেপে আছে, কোনো কথা বলছে না।

খানিকক্ষণ চলার পর বাপি বলল, "কী রে, তুই যে এখনও ল্যাংচাচ্ছিস ? জোর করে বাঁ পাটা ফেলার চেষ্টা কর।"

সন্তু ধরা গলায় বলল, "কিছুতেই পারছি না। হাড় ভেঙে গেছে নিশ্চয়ই।"

বাপি হাসতে হাসতে বলল, "যাঃ, তা হলে কী হবে ? তুই তো আর কোনো অ্যাডভেঞ্চারে যেতে পারবি না। তোর কাকাবাবুর একটা পা তো, ইয়ে, মানে ডিফেকটিভ। তুইও যদি খোঁড়া হয়ে যাস, তা হলে তো তোকে আর উনি সঙ্গে নেবেন না !"

কুনাল বলল, "এই বাপি, ওরকম নিষ্ঠুরের মতন কথা বলিস না। ওর পা আবার ঠিক হয়ে যাবে।"

সন্তুর মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। বাপি তো ঠিকই বলেছে। সে খোঁড়া হয়ে গেলে তো কাকাবাবুকে আর কোনো সাহায্য করতে পারবে না ! তার জীবনের সব কিছু শেষ হয়ে গেল ?

খানিকটা পথ পার হবার পর কুনাল জিজ্ঞেস করল, "একটা রিকশায় উঠবি, সন্তু ?"

সন্তু দু'দিকে মাথা নাড়ল। বাড়ির সামনে রিকশা থেকে নামলে

মা ভয় পেয়ে যাবেন। আগেই মাকে কিছু বলার দরকার নেই। বিমানদার দাদা ডাক্তার, তাঁকে দেখিয়ে নিতে হবে একবার।

সন্তুদের বাড়ির কাছেই বিমানদাদের বাড়ি। বিমানদা পাইলট, তিনি বাড়ি নেই, নিউ ইয়র্কে গেছেন। বিমানদার দাদাও নার্সিং হোমে চলে গেছেন জরুরি কল পেয়ে। দুপুরবেলা তিনি বাড়িতে খেতে আসেন, সেইসময়ে সন্তুকে আবার আসতে হবে।

কাছেই একটা স্টেশনারি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন কাকাবাবু, কী যেন কিনছেন। ক্রাচ না নিয়ে কাকাবাবু হাঁটতে পারেন না, তবু প্রত্যেক দিন সকালে তাঁর মর্নিং ওয়াকে বেরুনো চাই।

সন্তু প্রথমে কাকাবাবুকে দেখতে পায়নি। বাপি তার কাঁধে চাপ দিয়ে বলল, "এই সন্তু, দ্যাখ..."

সন্তু মুখ ফিরিয়ে দেখল কাকাবাবু তার দিকেই চেয়ে আছেন। সন্তুকে খোঁড়াতে দেখে তিনি মিটিমিটি হাসছেন, মুখে কিছু বললেন না!

অন্য যে-কোনো বাড়ির বাবা-কাকারা তাঁদের বাড়ির ছেলেকে এইরকম অবস্থায় দেখলে দারুণ ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। হাঁ-হাঁ করে ছুটে এসে বলতেন, "অ্যাঁ, কী হয়েছে? কী করে পড়লি? হাড় ভেঙে গেছে?" ইত্যাদি ইত্যাদি। কাকাবাবু সন্তুকে ঐ অবস্থায় দেখে পাত্তাই দিলেন না।

এমন কী, একটু বাদে বাড়ি ফিরেও কাকাবাবু মাকে কিছুই বললেন না।

সন্তু নিজের ঘরে গিয়ে চুপ করে বসে রইল। এখন দু'তিন ঘন্টা তার পড়ার সময়, ঘর থেকে না বেরুলেও চলবে। ব্যথাটা ক্রমশই বাড়ছে, বাঁ পায়ের গোড়ালির কাছটা বেশ ফুলে গেছে। একটু আয়োডেক্স মালিশ করলে হত। আয়োডেক্সের একটা টিউব ছিল যেন বাড়িতে কোথায়, কিন্তু দরকারের সময় তো সেসব কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না। মায়ের কাছেও চাইতে সাহস পাচ্ছে না। সন্তু জানে, মা জানতে পারলে এক্ষুনি কোনো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবেন, তারপর এক্স-রে, তারপর আরও কত কী! পায়ে প্লাস্টার করিয়ে শুইয়ে রাখবেন এক মাস। ঐ প্লাস্টার জিনিসটা সন্তু একদম পছন্দ করে না! এক মাস বিছানায় শুধু-শুধু শুয়ে থাকা... অসহ্য!

বিমানদার দাদা অবনীদা নিজে খেলাধুলো করেন। তিনি নিশ্চয়ই একটা সহজ ব্যবস্থা করে দেবেন। মা সকালের দিকে অনেকটা সময় স্নান আর রান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, সহজে টের পাবেন না।

বেলা এগারোটা আন্দাজ সন্তু বারান্দায় খটখট শব্দ পেয়ে বুঝল কাকাবাবু আসছেন তার ঘরে। পড়ার টেবিল থেকে সন্তু মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

দরজার সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে কাকাবাবু ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে, বাড়িতে কারুকে কিছু বলিসনি তো? পা যদি ভেঙে গিয়ে থাকে, তা হলে কি এমনি-এমনি সারবে?"

সন্তু কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না।

কাকাবাবু ঘরের মধ্যে ঢুকে এসে ক্রাচ দুটো নামিয়ে রাখলেন। তারপর বললেন, "এদিকে আয়, হাঁটবার চেষ্টা কর, দেখি কতদূর কী হয়েছে!"

কাকাবাবু গুরুজন হয়ে তার পায়ে হাত দেবেন, এটা ভেবে সন্তু আপত্তি জানাতে যাচ্ছিল। কিন্তু আপত্তি জানিয়েও কোনো লাভ নেই।

সন্তু এক পায়ে লাফাতে লাফাতে চলে এল কাকাবাবুর কাছে। কাকাবাবু বসে পড়ে সন্তুর বাঁ পাটা দু' হাতে ধরলেন। সন্তুর গা শিরশির করছে। ঐখানটায় হাত দিলেই ব্যথা।

কাকাবাবু বললেন, "হুঁ, বেশ ফুলেছে দেখছি!"

তারপর পা'টা বেশ জোরে চেপে ধরে সন্তুর চোখে চোখ রেখে

বললেন, "শোন, যতই ব্যথা লাগুক, চ্যাঁচানো চলবে না কিন্তু। দেখি কী রকম তোর মনের জোর। মন শক্ত করেছিস তো? এক...দুই...তিন!"

কাকাবাবু স্যাট করে সন্তুর গোড়ালিটা ঘুরিয়ে দিলেন। সন্তুর মুখখানা মস্ত বড় হাঁ হয়ে গেল, তবু সে কোনো শব্দ করল না। মনে হল যেন কাকাবাবু তার পায়ের হাড় ভেঙে দিলেন মট্‌ করে।

কাকাবাবু বললেন, "যা, ঠিক হয়ে গেছে, আর কিছু হবে না।"

সন্তু প্রকাণ্ড বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে বলল, "ঠিক হয়ে গেছে?"

কাকাবাবু বললেন, "মট্‌ করে একটা শব্দ পেলি না? তাতেই তো হাড় আবার সেট হয়ে গেল। তোর গোড়ালিটা একটু ঘুরে গিয়েছিল।"

উঠে দাঁড়িয়ে কাকাবাবু বললেন, "আমি অনেককাল পাহাড়ি লোকেদের মধ্যে কাটিয়েছি তো। সেখানে তো ডাক্তার পাওয়া যায় না, ওরা এইরকমভাবে চিকিৎসা করে। আমি ওদের কাছ থেকে শিখেছি।"

সন্তুর চোখ অটোমেটিক্যালি কাকাবাবুর পায়ের দিকে চলে গেল।

কাকাবাবু বললেন, "তুই ভাবছিস তো আমার পা'টা কেন এইভাবে সারাতে পারিনি? আমার পায়ের ওপর এই অ্যাত্তো বড় একটা পাথরের চাঁই এসে পড়েছিল, এখানকার হাড়গোড় একেবারে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। পা'টা যে কেটে বাদ দিতে হয়নি তাই যথেষ্ট। তুই এবারে একটু হাঁটার চেষ্টা করে দ্যাখ্‌ তো!"

আশ্চর্য ব্যাপার, পায়ে এখনও ব্যথা আছে যদিও, তবু সন্তু দু'পা ফেলে হাঁটতে পারছে।

কাকাবাবু বললেন, "আমার মনে হচ্ছে ঠিক হয়ে গেছে। তবু

একবার বিমানের দাদার কাছে গিয়ে দেখিয়ে নিস।"

গরমের ছুটি, তাই স্কুল-কলেজ বন্ধ। সারাদিন সন্তু বাড়িতেই বসে রইল। পায়ের ব্যথা ক্রমশই কমে যাচ্ছে আর সন্তুরও মন ভাল হয়ে উঠছে। বিকেলে অবনীদার চেম্বারে যাবার পর তিনি ওর পা দেখে বললেন, "কই, কিছু হয়নি তো। একটু-আধটু মচ্‌কে গেলে চিন্তার কী আছে ? বাড়িতে গিয়ে মাকে বলো একটু চুন-হলুদ গরম করে ওখানটায় লাগিয়ে দিতে।"

পরদিন ভোরবেলা সন্তুর ঘরের দরজায় খটখট শব্দ হল। দরজা খুলে সন্তু দেখল কাকাবাবু দাঁড়িয়ে আছেন।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল, আজ আর সাইকেল শিখতে যাবি না ?"

সন্তু আকাশ থেকে পড়ল। সাইকেল ? সাইকেল শেখার চিন্তা তো সে মন থেকে একেবারে মুছে ফেলেছে। ঐ অপয়া সাইকেলটার জন্যই তো কাল তাকে অত কষ্ট পেতে হল। কী হয় সাইকেল শিখে ? এটা গাড়ির যুগ। আর একটু বড় হয়ে সন্তু গাড়ি চালানো শিখবে।

সন্তু বলল, "আমি আর সাইকেল শিখব না, কাকাবাবু !"

কাকাবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন ? সাইকেল কী দোষ করল ? তুই পড়ে গেছিস, সেটা তো সাইকেলের দোষ নয়। কিছু একটা শিখতে শিখতে মাঝপথে ছেড়ে দেওয়া মোটেই ঠিক নয়।"

সন্তু তবু গাঁইগুঁই করে বলল, "পায়ে এখনও একটু-একটু ব্যথা, যদি আবার লেগেটেগে যায় ?"

কাকাবাবু বললেন, "আবার লেগে গেলে আবার সারবে। সাইকেল শেখাটা ভয় পেয়ে একবার ছেড়ে দিলে আর শেখা হবে না। যা, যা, বেরিয়ে পড় ! সাইকেলটা একবার শিখে নিলে দেখবি ভবিষ্যতে কত কাজে লাগবে !"

সন্তু ভেবেছিল, আজ বেশ অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকবে। কাকাবাবুর তাড়নাতে তাকে বেরিয়ে পড়তেই হল। কুনালের বাড়ির দিকে যেতে-যেতে সে ভাবল, কাকাবাবু সাইকেল শেখার ওপর এত জোর দিচ্ছেন কেন ? এবারে যেখানে যাওয়া হবে, সেখানে কি সাইকেল চালানো দরকার হবে ?

সন্তুর মন বলছে, শিগগিরই কোথাও যাওয়া হবে। লম্বা, ফর্সামতন একজন বুড়ো লোক প্রায়ই আসছেন কাকাবাবুর কাছে। লোকটি ঠিক সাহেব নন, আবার ভারতীয় বলেও মনে হয় না। লোকটি কাকাবাবুকে কোথাও নিয়ে যেতে চান। সন্তু একদিন শুনতে পেয়েছিল, বুড়ো লোকটি ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে বলছেন, "ইউ কাম··· আই উইল মেক অল অ্যারেঞ্জমেন্টস্।

কাকাবাবু বলেছিলেন, "দাঁড়ান, যাওয়াটা ওয়ার্থহোয়াইল হবে কি না আগে চিন্তা করে দেখি !"

লোকটি যে কোথায় যাওয়ার কথা বলছেন, সেটা সন্তু বুঝতে পারেনি। লোকটি কি কাশ্মিরি ? কিংবা কাবুলের লোক ?

॥ ২ ॥

দিদির বন্ধু স্নিগ্ধাদির বর সিদ্ধার্থদা কলেজে পড়ানোর কাজ ছেড়ে ফরেন সার্ভিসে যোগ দিয়েছেন। এখন বাইরে-বাইরে থাকেন। সেই যে সেবার কাশ্মিরে কনিষ্কর মুণ্ডু উদ্ধার করার ব্যাপারে সিদ্ধার্থ অনেক সাহায্য করেছিলেন, তারপর থেকে আর অনেকদিন সিদ্ধার্থদার সঙ্গে সন্তুর দেখাই হয়নি। সিদ্ধার্থদারা কয়েক বছর কাটালেন বেলজিয়ামে, তারপর সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন কানাডায়। আবার যেন কোথাও বদলি হয়েছেন, সেই ফাঁকে বেড়াতে এসেছেন কলকাতাতে।

স্নিগ্ধাদি একদিন এসেছিলেন সন্তুদের বাড়িতে। দিদি তো এখানে নেই, দিদি এখন ভূপালে। মায়ের সঙ্গে অনেক গল্প করার পর স্নিগ্ধাদি সন্তুকে নেমন্তন্ন করলেন তাঁদের বাড়িতে।

সিদ্ধার্থদা আবার শখের ম্যাজিশিয়ান। খাওয়া-দাওয়ার পর সিদ্ধার্থদা ম্যাজিক দেখাতে লাগলেন কয়েকটা। সন্তু অনেক ম্যাজিকের বই পড়েছে, সিদ্ধার্থদার সব কটা ম্যাজিকই সে ধরে ফেলতে পারত। কিন্তু ম্যাজিকের আসরে ওরকম করা উচিত নয় বলে সে চুপ করে রইল শেষকালে একটা তাসের ম্যাজিকে

সিদ্ধার্থদা একটুখানি ভুল করে ফেলায় সন্তু আর হাসি চাপতে পারল না!

সিদ্ধার্থদা বললেন, "এই, তুমি হাসলে কেন? দেখবে, তোমার জামার পকেট থেকে আমি একটা মুর্গির ডিম বার করে দেব?"

স্নিগ্ধাদি বললেন, "আহা, তোমার যা পচা-পচা ম্যাজিক, সন্তু ঠিক ধরে ফেলেছে!"

সিদ্ধার্থ ভুরু কুঁচকে সন্তুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "সন্তু মানে? দা গ্রেট অ্যাডভেঞ্চারার? আমি তো ওকে চিনতেই পারিনি, অনেক বড় হয়ে গেছে!"

ম্যাজিক দেখানো বন্ধ করে সিদ্ধার্থদা সন্তুকে কাছে ডেকে নানান গল্প শুরু করে দিলেন। এক সময় তিনি বললেন, "জানো সন্তু, কানাডায় আমাদের এমব্যাসির ছেলেমেয়েদের জন্য একদিন 'সবুজ দ্বীপের রাজা' সিনেমাটা দেখানো হল। তুমি আর কাকাবাবু যে একেবারে আন্দামানে জারোয়াদের মধ্যে চলে গিয়েছিলে, আমি তো জানতুমই না! তুমি তো সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড করেছিলে। আমি একেবারে থ্রিল্‌ড!"

সন্তু লাজুক-লাজুক মুখ করে রইল।

সিদ্ধার্থদা জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর আর কোথাও গিয়েছিলে?"

সন্তু তাদের অভিযানের কাহিনী শোনাতে লজ্জা পায়। সে বলল, "এই, আরও দু'এক জায়গায়..."

সিদ্ধার্থদা বললেন, "আমার এবার পোস্টিং কোথায় জানো তো? ইজিপ্টে। কাকাবাবুকে বলো না, সেখানে একবার চলে আসতে? সেখানেও তো কত রহস্যময় ব্যাপার আছে, পিরামিড, স্ফিংকস, মরুভূমি..."

স্নিগ্ধাদি বললেন, "হ্যাঁ, চলে এসো, বেশ মজা হবে, আমরাও থাকব।"

সন্তু বলল, "শুধু আমি যেতে চাইলেই তো হবে না। কাকাবাবু অন্য একটা কাজ নিয়ে এখন ব্যস্ত আছেন।"

কয়েকদিন আগে কাকাবাবু চলে গেছেন দিল্লিতে। সন্তুকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো উচ্চবাচ্যই করেননি। যাওয়ার দিন সন্তুই নিজে থেকে জিজ্ঞেস করেছিল, "কাকাবাবু, আমাকে নিয়ে যাবেন না?"

কাকাবাবু বলেছিলেন, "না রে, তুই গিয়ে কী করবি? আমি যাচ্ছি সরকারি কাজে। প্লেনে যাব, প্লেনে আসব, কোনো অসুবিধে তো নেই!"

কিন্তু সন্তুর সন্দেহ হয়েছিল, দিল্লি থেকে কাকাবাবু আরও কোথাও যাবেন। সেই ফর্সা, লম্বা বৃদ্ধ লোকটি এয়ারপোর্টে যাওয়ার সময় তুলে নিতে এসেছিলেন কাকাবাবুকে। সন্তুর বেশ মন খারাপ হয়েছিল।

সন্তুর আবার মন খারাপ হয়ে গেল, যখন শুনল যে, স্নিগ্ধাদির বোন রিনিও এবারে ওঁদের সঙ্গে যাবে ইজিপ্টে। রিনি সন্তুর চেয়ে মাত্র এক বছরের ছোট, এ-বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। সে দিদি-জামাইবাবুর সঙ্গে ছুটি কাটাতে যাচ্ছে। রিনি সন্তুর আগেই ফরেন কান্ট্রিতে যাচ্ছে? সন্তু এ-পর্যন্ত বিদেশ বলতে শুধু নেপাল ঘুরে এসেছে। অবশ্য নেপালও খুব সুন্দর জায়গা। সন্তুর আবার যেতে ইচ্ছে করে।

রিনি বলল, "সিদ্ধার্থদা, ইজিপ্ট থেকে গ্রিস তো খুব দূরে নয় আমাকে একবার গ্রিস ঘুরিয়ে আনবেন তো?"

সিদ্ধার্থদা বললেন, "হ্যাঁ, গ্রিস তো ঘুরে আসাই যায়। ইচ্ছে করলে আমরা রোমেও যেতে পারি। আমার রোম দেখা হয়নি।"

গ্রিস, রোম, এইসব নাম শুনলে সন্তুর রোমাঞ্চ হয় আলেকজাণ্ডার, জুলিয়াস সিজার এইসব নাম মনে পড়ে

সন্তু তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এল।

সামনে অনেকদিন ছুটি, সন্তুর আর সময়ই কাটতে চায় না কুনাল চলে গেছে ওর মামাবাড়ি ভাগলপুরে। বাপিও দার্জিলিং যাবে-যাবে করছে। খেলাধুলো জমছে না। বাড়িতে যত বই ছিল সবই সন্তুর পড়া, নতুন বই আর যোগাড় করা যাচ্ছে না।

কিছু একটা করতে হবে তো। একদিন দুপুরবেলা খবরের কাগজ পড়তে পড়তে সন্তু ঠিক করল, সে একা-একাই এবার থেকে

এক-একটা রহস্য সমাধানের চেষ্টা করবে। কাকাবাবুর যদিও অনেকের সঙ্গেই চেনাশুনো, তবু কাকাবাবুও তো বিশেষ কারুর সাহায্য নিতে চান না।

ক'দিন ধরেই কাগজে একটা খবর বেরুচ্ছে। তিলজলায় একটা পুকুরে এক সপ্তাহের মধ্যে দুটি ছেলে ডুবে গেছে। কিন্তু তাদের মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি। কেউ জলে ডুবে গেলে কিছুক্ষণ বাদে তার মৃতদেহটা ভেসে উঠবেই। পুকুরটা বেশি বড় নয়। অথচ পোর্ট কমিশনার্সের পেশাদার ডুবুরিরাও কয়েক ঘণ্টা ধরে চেষ্টা করে ছেলে দুটির কোনো চিহ্ন দেখতে পায়নি।

ছেলে দুটিকে ডুবে যেতে অনেকেই দেখেছে। ঘটনা দুটিই ঘটেছে বিকেলবেলা। গরমের দিনে এই সময় অনেকেই ঐ পুকুরে স্নান করতে আসে। ওই ছেলে দুটি জলে নামল, আর উঠল না, তা হলে ওরা গেল কোথায়? অনেকে বলছে, ওই পুকুরের তলায় নিশ্চয়ই গুপ্ত সুড়ঙ্গ আছে। অনেক কালের পুরনো পুকুর, সেই নবাবি আমলের। পেশাদার ডুবুরিরা অবশ্য কোনো সুড়ঙ্গের কথা বলেনি। এতদিন ঐ পুকুরে অনেকেই স্নান করছে, কারুর কিছু হয়নি; হঠাৎ এক সপ্তাহের মধ্যেই দুটি ছেলে অদৃশ্য হয়ে গেল কী করে?

সন্তু মনে-মনে এই কেসটা টেক আপ করে নিল।

তিলজলা জায়গাটা কোথায়? সন্তু কোনোদিন ঐ নামের জায়গায় যায়নি, তার চেনা কেউ ওখানে থাকেও না। তিলজলা কী করে খুঁজে পাওয়া যায়? কুনাল ওর সাইকেলটা সন্তুর কাছে রেখে গেছে। ইচ্ছে করলে সন্তু এখন সাইকেলে কলকাতার যে-কোনো অঞ্চলে চলে যেতে পারে।

রাস্তার মোড়ে একটা বই-পত্রপত্রিকার স্টল আছে। সেই স্টলের মালিক গুপিদা বেশ ভালমানুষ ধরনের। সন্তু ক্লাস সিক্সে পড়ার

সময় থেকেই এই স্টল থেকে ম্যাগাজিন, কমিক্‌স, গল্পের বই কেনে। গুপিদা তাকে চেনেন।

সন্তু সেই স্টল থেকে কলকাতার একটা ম্যাপ কিনে পাশের দেয়ালে মেলে ধরল। কিন্তু তাতেও সে তিলজলা খুঁজে পায় না। কী ব্যাপার, তা হলে কি তিলজলা কলকাতার মধ্যে নয়, বাইরে কোথাও?

গোল-গোল নিকেলের ফ্রেমের চশমার ফাঁক দিয়ে গুপিদা চেয়ে ছিলেন সন্তুর দিকে। চোখাচোখি হতেই তিনি বললেন, "ভাল, নিজের শহরটাকে ভাল করে চেনা উচিত প্রত্যেকেরই।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "গুপিদা, তিলজলা জায়গাটার নাম খুঁজে পাচ্ছি না কেন?"

গুপিদা বললেন, "পাচ্ছ না? পিকনিক গার্ডেনস দ্যাখো, তার পাশেই পাবে।"

সন্তু অবাক। পিকনিকের জন্য বাগান, সেখানে সবাই পিকনিকের জন্য যায়? সন্তু তো এরকম কোনো জায়গার নামই শোনেনি।

গুপিদা ওর হাত থেকে ম্যাপটা নিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, "এই দ্যাখো ভবানীপুর, এই হাজরা মোড়, এই হল বালিগঞ্জ ফাঁড়ি, তারপর এই বণ্ডেল রোড ধরে সোজা গেলে রেল-লাইনের লেভেল ক্রসিং পাবে, তার ওপারে···।

বেলা এখন চারটে। সঙ্গে আর কারুকে নিলে হত। বাপিকে ডাকবে? কিন্তু বাপির এইসব ব্যাপারে কোনো উৎসাহ নেই। থাক, সন্তু একাই যাবে। সাইকেলটা না নিয়ে যাওয়াই ভাল। লোকের চোখে পড়ে যাবে। সন্তু হাঁটতে শুরু করে দিল।

বালিগঞ্জ ফাঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছে গেল সহজেই। লোককে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল বণ্ডেল রোড কোন্‌টা। কতদিনই সন্তু একলা-একলা রাস্তা দিয়ে হাঁটে। কিন্তু আজকে একেবারে অন্যরকম লাগছে। আজ সন্তু এমন একটা কাজ নিয়ে যাচ্ছে, যার কথা পৃথিবীতে আর কেউ জানে না। সন্তুর কি মুখ দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে? রাস্তার প্রায় সবাই তার দিকে তাকাচ্ছে কেন?

লেভেল ক্রসিং পার হয়ে অন্য দিকে চলে এল সন্তু। যেন কলকাতা নয়, যেন অন্য একটা নতুন জায়গায় বেড়াতে এসেছে সে। যদিও জায়গাটাতে নতুনত্ব কিছু নেই, ভাঙা, ঘিঞ্জি রাস্তা, বাস আর সাইকেল-রিকশা চলছে।

খানিকদূর এগোবার পর আর-একটা সমস্যা মাথায় এল সন্তুর। কোন্ পুকুরে ছেলেদুটো ডুবে গিয়েছিল, তা কী করে বোঝা যাবে? তিলজলাতে কি একটাই পুকুর আছে? পিকনিক গার্ডেনস তার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে? কত বড় বাগান? সেখানেও নিশ্চয়ই পুকুর থাকবে! ঘটনাটা কি সেখানেই ঘটেছিল?

সন্তু একটা সাইকেল-রিকশা ডেকে উঠে পড়ল।

চালক জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাবেন?"

সন্তু বলল, "পিকনিক গার্ডেনে।"

সাইকেল-রিকশার চালক একটু বিরক্তভাবে বলল, "অ্যাঁ? এটাই তো পিকনিক গার্ডেন।"

সন্তু রাস্তার চারপাশে বাড়িগুলোর দিকে তাকাল। কোনো বাগান তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। পুকুর কোথায়?

সন্তুর মনে হল, ইনভেস্টিগেটর হতে গেলে আগে সব রাস্তা-টাস্তাগুলো ভাল করে চেনা দরকার। এবার থেকে সে নিয়মিত কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "এখানে একটা পুকুর আছে?"

চালক বলল, "একটা কেন, অনেক গণ্ডা পুকুর আছে। কোথায় যাবেন সেটা বলুন না। ঠিকানা কী?"

সন্তু বলল, "ঠিকানাটা মনে নেই, আমার পিসিমার বাড়ি, কাছেই একটা পুকুর আছে···ঐ যে যে-পুকুরে দুটো ছেলে ডুবে গেছে···"

চালক আর বাক্যব্যয় না করে প্যাড্‌ল ঘোরাল।

একটু বাদেই বড় রাস্তা ছেড়ে সাইকেল-রিকশাটা ঢুকল একটা মাঝারি রাস্তায়। কয়েকবার ডান-দিক বাঁ-দিক ঘুরে সেটা এসে থামল একটা পুকুরের সামনে।

চালক জিজ্ঞেস করল, "এবারে চেনা লাগছে?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, ঐ তো ঐ কোণের বাড়িটা!"

ভাড়া পেয়ে সাইকেল-রিকশার চালক চলে গেল উল্টো দিকে। কোনো কারণ নেই, তবু সন্তুর বুকটা এত ঢিপঢিপ করছে। এই সেই পুকুর, যার মধ্যে রহস্যময় কিছু আছে, যে দুটো ছেলেকে টেনে নিয়েছে, আর ফিরিয়ে দেয়নি।

পুকুরটা বেশ বড়ই। কালো রঙের জল। মাঝখানটায় কিছু কচুরিপানা রয়েছে, তাতে সুন্দর হালকা-নীল রঙের ফুলও ফুটেছে। পুকুরটার তিনদিকেই বাড়ি, একটা দিক ফাঁকা। সেখানে খানিকটা ঝোপঝাড়ের মতন হয়ে আছে, তারপর খানিকটা দূরে একটা কারখানা।

সন্তু ভেবেছিল যে, এখানে অনেক লোকজন দেখতে পাবে। পুলিশ, দমকল, খবরের কাগজের ফোটোগ্রাফার···। কিন্তু কেউই নেই। খবরের কাগজ পড়লে মনে হয়, এই জায়গাটা বুঝি ভিড়ে-ভিড়াক্কার হয়ে গমগম করছে! একটা লোকও স্নান করছে না পুকুরে। রাস্তা দিয়ে দু'চারজন লোক যাচ্ছে, কিন্তু কারুর কোনো কৌতূহল আছে বলেও মনে হয় না।

পুকুরটার জলের দিকে তাকিয়ে মিনিট পাঁচেক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সন্তু। কাকাবাবু হলে কী করে এই রহস্যটার সমাধান করতেন? খবরের কাগজ পড়লে মনে হয়, ডুবুরিরা কিছু খুঁজে পায়নি বলে পুলিশ হাল ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু ছেলেদুটো তো জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে না!

যে-জায়গায় কোনো ঘটনা ঘটে, সে-জায়গাটা কাকাবাবু নিজের চোখে দেখতে যান সব সময়। খবরের কাগজ পড়েই তো তিনি সুন্দরবনের নদীতে খালি-জাহাজটা দেখতে গিয়েছিলেন। এখানে এসে কি কাকাবাবু জলে নেমে পড়তেন? পায়ের জখমের জন্য কাকাবাবুর সাঁতার দিতে অসুবিধে হয়। তাহলে? কাকাবাবু নিশ্চয়ই সন্তুকে বলতেন জলে নামতে।

সন্তু ভাল সাঁতার জানে। কিন্তু অচেনা জায়গায় এই রকম একটা পুকুর, কালো মিশমিশে জল, এখানে নামার কথা ভাবতেই সন্তুর ভয়-ভয় করছে। কাকাবাবু সঙ্গে থাকলে কক্ষনো ভয় করে না। খোঁড়া পা নিয়ে কাকাবাবু নিজে কত সাংঘাতিক বিপদের দিকে এগিয়ে যান, শুধু মনের জোরে।

একটা লোকও এই পুকুরের জলের ধারেকাছে নেই। সবাই ভয় পেয়েছে? একটা পুকুরের জলে ভয়ংকর কী থাকতে পারে? খবরের কাগজে লিখেছে, ডুবুরিরা জল তোলপাড় করে কিছুই দেখতে পায়নি। কোনো গোপন সুড়ঙ্গের মধ্যে একটা কোনো অদ্ভুত জন্তু লুকিয়ে আছে?

শুধু-শুধু জলের দিকে তাকিয়ে থেকে কোনো লাভ নেই। ফিরে যাবে? কিছুই করা গেল না? প্রথম কেস হাতে নিয়েই সন্তু হেরে যাবে? যদিও কেউ জানে না, তবু সন্তুর লজ্জা লাগছে।

পুকুরের চারপাশটা অন্তত একবার ঘুরে দেখা দরকার। রাস্তার ঠিক উল্টো দিকটায় যেখানে ঝোপঝাড় রয়েছে, সেখানে কি কোনো ঘাট আছে? ছেলে দুটো ডুব-সাঁতারে ওপারে গিয়ে ঐ ঝোপের মধ্যে যদি লুকিয়ে থাকে, তাহলে অনেকেই ভাবতে পারে ওরা ডুবে গিয়ে আর ওঠেনি। মজা করার জন্য ছেলেদুটো এরকম করতেও পারে।

সন্তু পুকুরের পাড় ধরে হাঁটতে লাগল। তিনদিকে তিনটে ঘাট আছে, তার মধ্যে একটা ঘাট বেশ বড়, থাক-থাক্ ইঁটের সিঁড়ি, দু'পাশে বসবার জায়গা।

যে-দিকটায় ঝোপঝাড়, সেই দিকটা বেশ নোংরা। বোধহয় কারখানার লোকেরা তাদের আবর্জনা এই দিকে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলে। ভাঙা কাচ, চায়ের খুরি, ময়লা ন্যাকড়া ছড়িয়ে আছে অনেক। অনেক বড়-বড় ঘাস গজিয়ে গেছে এখানে। একটা বা দুটো ছেলে ইচ্ছে করলে অনায়াসেই এই ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে।

এই জায়গাটার মাটি থসথসে, কাদা-কাদা। চার-পাঁচদিন আগেও যদি কেউ এ-দিকটায় এসে থাকে তাহলে তার পায়ের চিহ্ন এখনও পাওয়া যাবে। একটা বেশ বড় গর্তও রয়েছে, কেউ মাটি কেটে নিয়ে গেছে। সন্তু এদিক-ওদিক তীক্ষ্ণ নজর রেখে হাঁটতে লাগল। হঠাৎ সে দেখতে পেল, এক জায়গায় একটা হলদে রঙের জামা পড়ে আছে। জামাটা দেখে খুব পুরনো বলে মনে হয় না। সন্তুর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এখানে একটা জামা এল কী করে?

জামাটার খানিকটা রয়েছে ঝোপের মধ্যে, খানিকটা জলে ডুবে আছে। সন্তু পা টিপে-টিপে এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে জামাটা তুলতে যেতেই এক কাণ্ড হল।

পায়ের তলার নরম মাটি ধসে গিয়ে সন্তু হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল জলে। ভাল সাঁতারু হয়েও সে ভয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। তার মনে হল, কুমিরের চেয়েও সাংঘাতিক কোনো জন্তু এক্ষুনি তাকে কামড়ে দেবে!

সে-রকম কিছুই হল না। প্রথম পড়ার ঝোঁকে সন্তু চলে গেল অনেকখানি জলের মধ্যে। পুকুরটা খুব খাড়া আর পিছল, পা রাখা যায় না। ডুবজল থেকে উঠে আসবার পর দাঁড়াবার চেষ্টা করেও তার পা হড়কে যেতে লাগল বারবার। তারপর সে সাঁতরে পারের কাছে এসে এক গোছা ঘাস মুঠো করে ধরল, অমনি সেখানকার মাটিও খসে পড়ল।

কয়েকবার এরকম চেষ্টা করার পর সন্তু উঠে এল ওপরে। জামা প্যান্ট একেবারে জবজবে ভিজে, জুতো কাদায় মাখামাখি। মাথায় শ্যাওলা জড়িয়ে গেছে। জামার পকেটে দু'খানা দু'টাকার নোট ছিল, সে দুটি বুঝি গেছে একেবারে।

একটা গোলমাল শুনে সন্তু মুখ তুলে তাকাল। পুকুরের ওপারে রাস্তার ধারে একদল লোক জমেছে, সবাই সন্তুকেই দেখছে আর কী যেন বলাবলি করছে। তারপর তারা দৌড়ে আসতে লাগল এদিকে।

তারা কাছাকাছি আসতেই সন্তু শুনতে পেল, কয়েকজন চেঁচিয়ে বলছে, 'মরা ছেলে ফিরে এসেছে! মরা ছেলে ফিরে এসেছে! সুড়ঙ্গ দিয়ে পাতালপুরীতে চলে গিয়েছিল!'

এ-কথা শুনে সন্তুর চোখ বড়-বড় হয়ে গেল। এই রে, এরা কি ভেবেছে, জলে-ডোবা দু'জন ছেলের মধ্যে সে একজন? তিন-চার দিন পর কেউ জলের তলা থেকে ফিরে আসতে পারে? এ কি রূপকথা নাকি?

লোকগুলো সন্তুকে ঘিরে ধরে এমন চ্যাঁচামেচি করতে লাগল যে, সন্তু কোনো কথাই বলতে পারল না। অনেকেরই ধারণা, সন্তু সেই ডুবে-যাওয়া ছেলেদের একজন। কয়েকজন অবশ্য সন্দেহ প্রকাশ করল যে, এর পায়ে জুতো রয়েছে কেন? জুতো পরে তো কেউ সাঁতার কাটতে নামে না। তাদের কথায় বিশেষ কেউ পাত্তা দিচ্ছে না। একজন বেশ গলা চড়িয়ে বলল, "আমিই তো প্রথম দেখেছি, মাঝপুকুরে ভুশ করে জল ঠেলে উঠল, তারপর সাঁতরে-সাঁতরে এই দিকে চলে এল।

ক্রমশই বেশি ভিড় জমছে। মজা দেখবার জন্য পাড়ার ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা বাড়ির বউরাও ছুটে আসছে। কেউ বলল, 'ওর মুখ শুকিয়ে গেছে, ওকে দুধ খাওয়াও!' কেউ বলল, 'পুলিশে খবর দাও!' কেউ বলল, 'খবরের কাগজের ফোটোগ্রাফারকে ডাকো।'

ছোটদের খেলার সময়ের আনন্দ অনন্য...

খেলার সময়-
দারুণ সময়

এক্ষুনি যাচ্ছি

তুলতুলে পায়ে
চল সারাদিন

©

TIM

AMY

CAT

বাড়ন্ত বাচ্চাদের জন্যে
এক মজাদার জুতো

বিশ্বজোড়া নাম। সারা পৃথিবীর বাচ্চাদের কাছে বাবলগামারস্ জুতো একটি দারুণ আকর্ষণ। নানা রঙে হরেক সাইজে। সোয়েড, চামড়া ও ক্যানভাসে পাওয়া যাচ্ছে জুতো এবং স্যাণ্ডাল।

ছোটদের কথা ভেবেই—বাবলগামারস্ তৈরী।
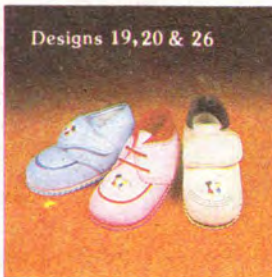
Bata

অগ্রণী BSC-র দোকানেও পাওয়া যায়

একজন বয়স্কমতন ভারিক্কি চেহারার লোক সন্তুর একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "এই যে খোকা, তুমি সন্ধেবেলা এখানে কী করছিলে ? কোথা থেকে এলে ?"

সন্তু উত্তর দিতে পারল না।

লোকটি বলল, "মিস্টিরিয়াস ব্যাপার। তিন দিন ধরে এই পুকুরের জল কেউ ছোঁয় না, অথচ একটা ছেলে জল থেকে উঠে এল ?"

সন্তু এবারে কোনোক্রমে বলে উঠল, "আমি পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলুম !"

বয়স্ক লোকটি বিকট গলায় হ্যা-হ্যা করে হেসে উঠল।

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা গড়াল অনেক দূর। সন্তুকে ওরা কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। পাতালপুরীতে সন্তু কী দেখেছে, তা বলবার জন্য খোঁচাতে লাগল অনেকে। এর মধ্যে এসে পড়ল পুলিশ। সন্তুকে নিয়ে চলল থানায়।

সন্তু এসেছিল গোয়েন্দাগিরি করতে, তাকে থানায় যেতে হল চোরের মতন।

থানায় বড়বাবু ভিড় হটিয়ে একা সন্তুকে নিয়ে গেলেন নিজের ঘরে। বড়বাবুর গায়ের রঙ খুব ফর্সা, মাথায় অল্প-অল্প টাক, দেখলে মনে হয় সিনেমার পুলিশ। তিনি ভুরু নাচিয়ে বললেন, "নাও, লেট মি হিয়ার ইওর সং ! তুমি জামা-প্যান্ট-জুতো পরে পুকুরে ডুব দিয়েছিলে কেন ?"

সন্তু বলল, "বলছি, আগে এক গেলাস জল খাব !"

সন্তুর গলা একেবারে শুকিয়ে কাঠ। কত দুর্গম জায়গায় কত রকম বিপদ কাটিয়ে বেরিয়ে এসেছে সে। কিন্তু আজ কলকাতা শহরের মধ্যেই সে যে বিপদে পড়েছে, তার সঙ্গে আগের কোনো কিছুরই তুলনা হয় না! লোকগুলো যদি তাকে মারতে শুরু করত ? থানায় এসে সে অনেক নিরাপদ বোধ করছে।

জল খাবার পর সন্তু মুখ তুলতেই বড়বাবু বললেন, "নাও, মাই বয়, আমি সত্যি কথা শুনতে চাই, নাথিং বাট দা ট্রুথ..."

বড়বাবুর কথার মাঝখানেই সন্তু বলল, "আপনি সেপশাল আই· জি· মিঃ আর· ভট্টাচার্য কিংবা ডি· আই· জি· ক্রাইম মিঃ বি· সাহাকে একবার ফোন করবেন ?"

কথা বলতে-বলতে থানার বড়বাবুর মুখখানা হাঁ হয়ে গেল। তিনি ভুরু নাচাতে ভুলে গেলেন।

সেই রকম অবস্থায় প্রায় এক মিনিট থেমে থেকে তিনি বললেন, "কাদের নাম বললে ? স্পেশাল আই· জি· কিংবা ডি· আই· জি· ? এঁদের ফোন করব কেন ?"

সন্তু বলল, "ওঁরা দু'জনেই আমার কাকাবাবুকে চেনেন। আমাকেও চেনেন। পুলিশ কমিশনারও একদিন আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন।"

বড়বাবু হাঁক দিলেন, "বিকাশ ! বিকাশ !"

আর-একজন পুলিশ অফিসার উঁকি মারতেই বড়বাবু বললেন, "ওহে বিকাশ, এ ছেলেটি যে বড়-বড় কথা বলে ! লম্বা-লম্বা পুলিশ অফিসারদের নাম করছে।"

সন্তু বলল, "আপনারা হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করবেন না। আমার পরিচয়টা জানলে আপনাদের সুবিধে হবে। সেইজন্য আমি ওঁদের ফোন করতে বলছি।"

বিকাশ নামের কালো, লম্বা চেহারার পুলিশ অফিসারটি বলল, "তোমার গল্পটা কী আগে শুনি ?"

সন্তু বলল, "ঐ পুকুরটায় নাকি দুটো ছেলে ডুবে গেছে, তাদের আর পাওয়া যায়নি, সেইজন্য আমি পুকুরটা দেখতে এসেছিলুম।"

"তারপর জামা-জুতো পরে জলে নেমে গেলে ?"

"ইচ্ছে করে নামিনি। পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলুম।"

বড়বাবু বললেন, "তা তো হতেই পারে। পা পিছলে কি কেউ জলে পড়ে যেতে পারে না ?"

বিকাশ বলল, "স্যার, বাইরে অনেক লোক ভিড় জমিয়ে আছে। হৈ-হল্লা করছে। তারা এত সহজ গল্প বিশ্বাস করবে না !"

বড়বাবু রেগে উঠে বললেন, "তাদের জন্যে কি রোমহর্ষক গল্প বানাতে হবে ? মহা মুশকিল এ-ছেলেটি বড় বড় পুলিশ অফিসারদের নাম করছে, যদি সত্যিই তাঁদের সঙ্গে চেনা থাকে ? ফোন করো ! ফোন করো ! ওহে খোকা, কী নাম তোমার ?"

সন্তু বলল, "আমার কাকার নাম রাজা রায়চৌধুরী। তাঁর নাম বলুন। আমাকে সন্তু নামে উনি চিনবেন।"

ফোনে ঐ দু'জনের মধ্যে একজনকে পাওয়া গেল। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে বড়বাবুর মুখের চেহারাটাই বদলে যেতে লাগল। চোখ দুটো হল গোল-গোল আর ভুরুদুটো উঠে গেল অনেকখানি।

তিনি বলতে লাগলেন, "অ্যাঁ ? কী বলছেন স্যার ? বিখ্যাত ? অ্যাডভেঞ্চার করে ? ওদের নিয়ে বই লেখা হয়েছে ? না স্যার, আমি বই-টই বিশেষ পড়ি না, বই পড়ার সময় পাব কখন ! হ্যাঁ। ছেলেটি আমার সামনেই বসে আছে...আপনাকে দেব, কথা বলবেন ?"

স্পেশাল আই· জি· সাহেব টেলিফোনে হাসতে-হাসতে বললেন, "কী হে সন্তু, তিলজলার পুকুরে ডুব দিতে গিয়েছিলে কেন ? ওখানে কি গুপ্তধন আছে নাকি ?"

সন্তু লাজুকভাবে বলল, "না, মানে এমনিই। পুকুরের ধার দিয়ে হাঁটছিলুম, হঠাৎ পা পিছলে..."

"হঠাৎ ঐ পুকুরটার ধার দিয়েই বা হাঁটতে গেলে কেন ? তুমি কি একা-একাই গোয়েন্দাগিরি শুরু করেছ নাকি ?"

"না, এমনিই বেড়াতে এসেছিলুম এদিকে..."

এরপর বড়বাবু থেকে শুরু করে থানার সমস্ত লোক দারুণ খাতির করতে লাগল সন্তুকে। বাইরের ভিড় হটিয়ে দেওয়া হল। সন্দেশ-রসগোল্লা-শিঙাড়া এসে গেল সন্তুর জন্য। সন্তু খেতে চায় না, তবু ওঁরা ছাড়বেন না।

তারপর পুলিশের গাড়ি সন্তুকে পৌঁছে দিয়ে এল তাদের বাড়ির কাছাকাছি।

সন্তুর মনটা তবু খুব খারাপ হয়ে রইল। লজ্জাও করছে খুব। প্রথমবারেই এরকম ব্যর্থতা। ছি ছি ছি !

বাড়িতে পৌঁছেই সন্তু দেখল একজন অপরিচিত লোক বসে আছেন তাদের বসবার ঘরে। বাবা তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন।

ভিজে জামা-কাপড় যাতে কেউ দেখতে না পায় তাই সন্তু পাশের বারান্দা দিয়ে সুট করে উঠে যাচ্ছিল ওপরে, পায়ের আওয়াজ পেয়ে বাবা হাঁক দিয়ে বললেন, "কে রে ? সন্তু নাকি ? এদিকে আয়...শুনে যা !"

"আসছি," বলেই সন্তু এক দৌড়ে চলে গেল ওপরে। তাড়াতাড়ি জামা-প্যান্ট বদলে আবার নীচে নেমে এল।

বাবা বললেন, "কোথায় ছিলি এতক্ষণ ? এই ভদ্রলোক তোর জন্য কখন থেকে বসে আছেন ! দ্যাখ, রাজা তোর নামে চিঠি পাঠিয়েছে।"

সন্তু তাড়াতাড়ি কাকাবাবুর চিঠিটা নিয়ে খুলল। চিঠিটা এসেছে দিল্লি থেকে। কাকাবাবু লিখেছেন

স্নেহের সন্তু,

একটা কাজের জন্য দিল্লি এসেছিলাম। দু' চারদিনের মধ্যেই ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরশু থেকে খুব জ্বরে পড়ে গেছি। বেশ কাবু করে দিয়েছে। কাজটা শেষ না করে ফিরে যেতে চাই না। ভেবেছিলাম এবার তোর সাহায্যের কোনো দরকার হবে না। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, তোকে সঙ্গে আনাই উচিত ছিল। দিন দশেকের জন্য কলকাতা ছেড়ে এলে কি তোর

পড়াশুনোর ক্ষতি হবে ? দাদা আর বৌদিকে জিজ্ঞেস করবি । যদি কোনো অসুবিধে না থাকে, তাহলে আগামীকালই চলে আসতে হবে । যে ভদ্রলোকের হাতে এই চিঠি পাঠাচ্ছি, তিনিই প্লেনের টিকিট পৌঁছে দেবেন । দিল্লি এয়ারপোর্টে তোকে রিসিভ করার জন্য লোক থাকবে । দাদাকেও আলাদা চিঠি দিলাম । ইতি

কাকাবাবু

পুনশ্চ তোর একটা পাসপোর্ট করানো হয়েছিল, মনে আছে ? সেটা সঙ্গে নিয়ে আসবি ।

চিঠিটা পড়তে পড়তেই সন্তু আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল । এতক্ষণের মনখারাপ আর লজ্জা এক নিমেষে কোথায় উধাও হয়ে গেল ।

বাবার দিকে তাকাতেই বাবা বললেন, "হ্যাঁ, চলে যা ! অসুখে পড়েছে, একা-একা আছে ! কী অসুখ সে-কথাও লেখেনি !"

আগন্তুকটি বললেন, "আমি তাহলে টিকিটের ব্যবস্থা করে রাখছি । কাল বিকেলের ফ্লাইটে..."

ওপরে এসে সন্তু কাকাবাবুর চিঠিখানা যে কতবার পড়ল তার ঠিক নেই । অতি সাধারণ চিঠি, তবু দুটো জিনিস বোঝা গেল না । কাকাবাবু কোন্ কাজে দিল্লি গেছেন ? আর পাসপোর্ট নেবার কথা লিখলেন কেন ? দিল্লি যেতে পাসপোর্ট লাগবে কেন ?

॥ ৩ ॥

প্লেনে চড়া সন্তুর পক্ষে নতুন কিছু নয়, তবে আগে কখনও সে একা কোথাও যায়নি । এয়ারবাস-ভর্তি লোক, একজনও সন্তুর চেনা নয় । বেশ কয়েকজন বিদেশীও রয়েছে ।

সময় কাটাবার জন্য সন্তু একটা বই এনেছে সঙ্গে, কিন্তু বই পড়ায় মন বসছে না । সে যাত্রীদের লক্ষ করছে । বিমানটা আকাশে ওড়ার খানিক পরেই অনেকে সিটবেল্ট খুলে ঘোরাঘুরি শুরু করেছে । কারুর কারুর ভাবভঙ্গি দেখলে মনে হয় প্লেনে চড়া তাঁদের কাছে একেবারে জলভাত । মিনিবাসে চেপে রোজ অফিসে যাবার মতন প্লেনে চেপে রোজ দিল্লি বা বোম্বে যান ।

কয়েকদিন আগেই শ্রীনগরে একটা প্লেন হাইজ্যাকিং হয়েছে । এয়ারপোর্টে বাবা এসেছিলেন সন্তুকে পৌঁছে দিতে, তিনি বারবার ঐ কথা বলছিলেন । বাবা ভয় পাচ্ছিলেন, হঠাৎ যদি প্লেনটা হাইজ্যাকিং হয়ে কোনো বিদেশে চলে যায়, তাহলে সন্তু একা-একা কী করবে !

সন্তুর কিন্তু হাইজ্যাকিং সম্পর্কে মোটেই ভয় নেই । বরং মনে-মনে একটু ইচ্ছে আছে, সেরকম একটা কিছু হলে মন্দ হয় না ! এখন সে যাত্রীদের মুখ দেখে বোঝবার চেষ্টা করছে, এদের মধ্যে কেউ কেউ কি হাইজ্যাকার হতে পারে ? বাথরুমের কাছে তিনটে ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, ওদের মধ্যে দু'জনের মুখে দাড়ি, একজন পরে আছে একটা চামড়ার কোট । ওরা যে-কোনো মুহূর্তে রিভলভার বার করতে পারে । চোখের দৃষ্টিও বেশ সন্দেহজনক !

আধঘণ্টার মধ্যেও কিছুই হল না । সন্তু জানলা দিয়ে বাইরে দেখতে লাগল । পাতলা-পাতলা মেঘ ছাড়া আর কিছুই দেখবার নেই । মেঘের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছি ভাবলেই মনটা কী রকম যেন হাল্কা লাগে ।

সন্তু একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ মাইক্রোফোনে কিছু একটা ঘোষণা হতেই সে দারুণ চমকে উঠল । তাহলে কি এবারে শুরু হল নাটক ?

না, সেসব কিছু না । যাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে সবাইকে সিটবেল্ট বেঁধে নিজের নিজের জায়গায় বসতে । বাইরে ঝড় হচ্ছে ।

সন্তু মুখ ফিরিয়ে সেই সন্দেহজনক চরিত্রের তিনটি ছেলেকে দেখতে পেল না ! জানলা দিয়ে তাকালেও বাইরে ঝড় বোঝা যায় না ।

শেষ পর্যন্ত প্লেন হাইজ্যাকিংও হল না, ঝড়ের জন্য কিছু বিপদও ঘটল না । বিমানটি নিরাপদে এসে পৌঁছল দিল্লিতে ।

প্লেন থেকে নেমে সন্তু লাউঞ্জে এসে দাঁড়াবার একটু পরেই পাইলটের মতন পোশাক-পরা একজন লোক এসে বলল, "এসো আমার সঙ্গে ।"

সন্তু একটু অবাক হল । লোকটিকে সে চেনে না । লোকটি তার নামও জিজ্ঞেস করল না । কিন্তু লোকটি এমন জোর দিয়ে বলল কথাটা যে, অমান্য করা যায় না । সন্তু চলল তার পিছু-পিছু ।

লোকটি একেবারে এয়ারপোর্টের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে সন্তু বলল, "আমার সুটকেস ? সেটা নিতে হবে যে !"

লোকটি বলল, "হবে । সব ব্যবস্থা হবে ।"

বাইরে আর-একজন লোককে আঙুলের ইশারায় ডেকে সেই পাইলটের মতন পোশাক-পরা লোকটি বলল, "একে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে বসাও, আমি ওর সুটকেসটা পাঠিয়ে দিচ্ছি !"

সন্তু এবারে বলল, "দাঁড়ান, আপনারা কার কাছ থেকে এসেছেন ? আমার নাম কি আপনারা জানেন ?"

প্রথম লোকটি এবারে মুখ ঘুরিয়ে চার দিকটা দেখে নিয়ে বলল, "নাম-টাম বলার দরকার নেই । তোমাকে তোমার কাকাবাবুর কথামতন পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে । চট করে গাড়িতে গিয়ে বসে পড়ো ।"

কাকাবাবুর কথা শুনে সন্তু আর আপত্তি করল না । দ্বিতীয় লোকটির সঙ্গে গিয়ে একটা ফিয়াট গাড়িতে উঠে বসল । একটুক্ষণের মধ্যেই সুটকেসটা দিয়ে গেল একজন, গাড়িটা স্টার্ট নিল ।

অনেকদিন আগে কাশ্মির যাওয়ার পথে সন্তুরা দিল্লিতে নেমেছিল একদিনের জন্য । সেবারে দিল্লি ভাল করে দেখা হয়নি । দিল্লিতে কত কী দেখার আছে । কিন্তু এখন রাত হয়ে গেছে, রাস্তার দু'পাশে বিশেষ কিছু চোখে পড়ছে না ।

গাড়িতে যে লোকটি সঙ্গে চলেছে, সে একটাও কথা বলেনি সন্তুর সঙ্গে । বাঙালি কি না তাও বোঝা যাচ্ছে না ।

সন্তু নিজে থেকে যেচে কথা বলতে পারে না অপরিচিত লোকের সঙ্গে । সে-ও চুপ করে রইল । কিন্তু একটু যেন অস্বাভাবিক লাগছে । সে এয়ারপোর্টে পৌঁছতে না পৌঁছতেই যেন তাড়াহুড়ো করে নিয়ে আসা হল তাকে । পাইলটের মতন পোশাক পরা লোকটা কী করে চিনল সন্তুকে ? সে কেন বলল, কোনো নাম বলার দরকার নেই ?

অনেক রাস্তা ঘুরে, একটা আলো-ঝলমলে পাড়ার মধ্যে একটা পাঁচতলা বাড়ির সামনে থামল গাড়িটা । গাড়ির চালক নিজে না নেমে বলল, "আপ উতরিয়ে !"

সন্তু গাড়ি থেকে নামতেই গাড়িটা ভোঁ করে চলে গেল । সন্তু চেঁচিয়ে উঠল, "আরে, আমার সুটকেস !"

বাড়ির ভেতর থেকে একজন লোক বেরিয়ে এসে বলল, "আপ অন্দর আইয়ে !"

সন্তু বলল, "হামারা সুটকেস লেকে ভাগ গিয়া

লোকটি হেসে বলল, "ফিক্‌র মাত কিজিয়ে, সুটকেস পৌঁছ জায়েগা!"

লোকটির হাসির মধ্যে যথেষ্ট ভরসা আছে । তাই সন্তু আর কিছু না বলে চলে এল ওর সঙ্গে । লিফ্টে পাঁচতলায় পৌঁছে লোকটি একটা ঘরের বন্ধ দরজায় টোকা মারল ।

দরজা যিনি খুললেন, তাঁকে দেখে সন্তুর মুখটা খুশিতে ভরে গেল । যাক, তা হলে তাকে ঠিক জায়গাতেই আনা হয়েছে । আর সুটকেসের জন্য চিন্তা করতে হবে না ।

ছিপছিপে লম্বা লোকটির নাম নরেন্দ্র ভার্মা। দিল্লিতে সি· বি· আই-এর একজন বড়কর্তা। কাকাবাবুর অনেক দিনের বন্ধু। সন্তুকেও ইনি ভালই চেনেন। এই তো গত বছরেই ত্রিপুরায় ইনি এসেছিলেন কাকাবাবুকে সাহায্য করতে। নরেন্দ্র ভার্মা কলকাতায় লেখাপড়া করেছেন বলে বাংলা মোটামুটি ভালই জানেন।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "এসো, সনটু! কেমুন আছ? রাস্তায় গোলমাল হয়নি তো কিছু? টায়ার্ড?"

সন্তু মাথা নেড়ে বলল, "না, একটুও টায়ার্ড নই। আপনি ভাল আছেন তো?"

নরেন্দ্র ভার্মা ভুরু কুঁচকে বললেন, "ভাল কী করে থাকব? তোমার আংক্‌ল দিল্লিতে এসে এমুন ঝোন্‌ঝাট বাধাল, অথচ আমি কিছুই জানি না! আমাকে আগে কোনো খবরই দেয়নি! এসব কী বেপার বলো তো?"

সন্তু আকাশ থেকে পড়ল। সে তো কিছুই জানে না।

ঘরের চার দিকে চোখ বুলিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু কোথায়?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "এখানে নেই। সেইফ জায়গায় আছে। আচ্ছা সনটু, তুমি বলো তো, আ ক্যাট হ্যাজ নাইন লাইভ্‌স। তোমার এই কাকাবাবুর কখানা জীবন?"

"কেন, কী হয়েছে আবার?"

"আরে ভাই, ডেল্‌হিতে আসবার আগে আমাকে একটা চিট্‌ঠি দিল না, এখানে এসে ভি খবর দিল না। আমি খবর পেলাম মার্ডার অ্যাটেম্‌ট্‌ হবার পর!"

"অ্যাঁ? মার্ডার অ্যাটেম্‌ট? কার ওপর?"

"তোমার কাকাবাবুর ওপর! আবার কার? কেন, তোমাকে চিট্‌ঠি লেখেননি?"

"চিঠিতে তো লিখেছেন, ওঁর জ্বর হয়েছে!"

"হাঁ হাঁ, তা তো লিখবেনই। আসল কথা লিখলে তোমার মা-বাবা বহোত দুশ্চিন্তা করতেন তো! এবারে বড় রকম ইনজুরি হয়েছে, খুব জোর বেঁচে গেছেন!"

"আমি কাকাবাবুর সঙ্গে এক্ষুনি দেখা করতে চাই।"

"তা হবে না। তোমার কাকাবাবুই বলেছেন, তোমাকে সাবধানে রাখতে। কারা হঠাৎ মারল তা তো বোঝা গেল না। তোমার কাকাবাবুর অনেক এনিমি, তবে কে হঠাৎ দিল্লিতে এসে মারতে যাবে? রায়চৌধুরী আমাকে বলল, তোমাকেও সাবধানে রাখতে। তোমার ওপর অ্যাটেম্‌ট হতে পারে। রায়চৌধুরীর উপর ভি ফিন্‌ অ্যাটাক হতে পারে···।"

সন্তুর কাঁধে হাত রেখে নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "বেশি চিন্তা কোরো না। এখন ভাল আছেন তোমার কাকাবাবু। এবারে বলো তো, কী কেস নিয়ে এসেছেন দিল্লিতে?"

সন্তু বলল, "আপনি জানেন না, আমি জানব কী করে? আমায় তো কিছুই বলেননি।"

"গভর্নমেন্টের কোনো কেস হলে আমি ঠিকই জানতুম। সে সব কিছু না। শুনলাম কী, একজন আরবের সঙ্গে তোমার কাকার খুব দোস্তি হয়েছে।"

"আরব?"

"হ্যাঁ। মিড্‌ল ইস্টের কোনো দেশের লোক। লোকটাকে আমি দেখিনি এখনও। রায়চৌধুরীও কিছু ভাঙছে না আমার কাছে। বলছে, ই সব তোমাদের গভর্নমেন্টের কিছু বেপার নয়।"

"কলকাতাতেও কাকাবাবুর কাছে একজন লোককে আসতে দেখেছি। যাকে দেখে সাহেবও মনে হয় না। ভারতীয়ও মনে হয় না।"

"প্রোবাব্‌লি দ্যাট ইজ আওয়ার ম্যান। লোকটাকে ধরতে হবে। কোন্‌ চক্করে ফাঁসিয়ে দিয়েছে তোমার কাকাবাবুকে।"

সন্তুর ভুরু কুঁচকে গেছে। দিল্লিতে এসে কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা হবে না, এটা সে চিন্তাই করতে পারেনি।

সে জিজ্ঞাসা করল, "নরেনকাকা, আমি কি এখানেই থাকব নাকি?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "না, একঘণ্টা বাদ তোমাকে আর-এক গেস্টহাউসে নিয়ে যাওয়া হবে। দেখতে হবে কি, তোমায় কেউ ফলো করছে কি না। অন্য গেস্টহাউসে তোমার সুটকেস পেয়ে যাবে।"

"কাকাবাবুর সঙ্গে একবার টেলিফোনে কথা বলা যায় না?"

"আজ অসুবিধে আছে। কাল হবে। আজ রাতটা ঘুমোও।"

ঘণ্টাখানেক বাদে সন্তুকে আবার আর-একটি গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হল অন্য একটি বাড়িতে। এটা একটা মস্ত বড় গেস্টহাউস। অনেক লোকজন। নরেন্দ্র ভার্মা নিজে সন্তুকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন একটি ঘরে। সেখানে আগে থেকেই তার সুটকেস রাখা আছে।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তোমার রাতের খাবার এই ঘরেই এসে যাবে। আর কিছু লাগলে বেল বাজিয়ে ডাকবে বেয়ারাকে। পয়সার চিন্তা কোরো না। আর, আজ রাতটা একলা বাইরে যেও না!"

নরেন্দ্র ভার্মা চলে যাবার পর সন্তু বিছানার ওপর কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। একটা অচেনা জায়গায় সে একদম একা। কাকাবাবু চিঠি পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনলেন, অথচ কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা হল না।

গতকাল প্রায় এই সময় সন্তু তিলজলার কাছে একটা থানায় বসে ছিল, আর আজ সে দিল্লিতে একটা গেস্টহাউসে। আগামীকাল আবার কী হবে কেউ বলতে পারে না।

রাত্তিরটা এমনিই কেটে গেল। ভাল ঘুম হয়নি সন্তুর, সারা রাত প্রায় বিছানায় শুয়ে ছটফট করেছে। ভোরের আলো ফুটতেই সে বেরিয়ে এল বাইরে।

এখনও অনেকেই জাগেনি। বাড়িটার সামনের বাগানে অনেক রকম ফুল। গেটের বাইরে খুব চওড়া একটা রাস্তা। খুব সুন্দর একটা সকাল, কিন্তু সন্তুর মনটা খারাপ হয়ে আছে।

সন্তু বড় রাস্তাটায় খানিকটা হেঁটে বেড়াল। বেশি দূর গেল না। দিল্লির রাস্তা সে কিছুই চেনে না।

নরেন্দ্র ভার্মা এলেন ন'টা বাজার খানিকটা পরে। সন্তু তখন নিজের ঘরে বসে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে। এখানে ব্রেকফাস্টে অনেক কিছু দেয়, ফলের রস, কর্নফ্লেক্স-দুধ আর কলা, টোস্ট আর ওমলেট, আর একটা সন্দেশ।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "কী সন্তু, ইউ আর ইন ওয়ান পিস? কেউ তোমাকে গুলি করেনি কিংবা কিডন্যাপ করার চেষ্টাও করেনি?"

সন্তু বলল, "কেউ আমার সঙ্গে একটা কথাও বলেনি!"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "চলো, তৈয়ার হয়ে নাও। রাজা তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছেন।"

সন্তুর তৈরি হয়ে নিতে পাঁচ মিনিটও লাগল না।

দিনের আলোয় দিল্লি শহরটাকে ভালভাবে দেখল সন্তু। রাস্তাগুলো যেমন বড়-বড়, তেমনি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। দু'পাশে বড়-বড় বাড়ি। দিল্লির নাম শুনলেই সন্তুর মনে পড়ে লালকেল্লা আর কুতব মিনারের কথা। কিন্তু সে-দুটো দেখা যাচ্ছে না। তবে একটা প্রকাণ্ড, গোলমতন বাড়ি দেখে সন্তু চিনতে পারল। ছবিতে অনেকবার দেখেছে, ওটাই পার্লামেন্ট ভবন।

নরেন্দ্র ভার্মার গাড়ি এসে থামল একটা নার্সিং হোমের সামনে। তিনতলার একটা ক্যাবিনের দরজা খুলতেই কাকাবাবুর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

সন্তু দেখল, কাকাবাবুর পেট আর বাঁ হাত জড়িয়ে মস্ত বড় ব্যাণ্ডেজ। মুখে কিন্তু বেশ হাসিখুশি ভাব। ক্যাবিনটা বেশ বড়, হোটেলের সুইটের মতন। সামনের দিকে বসবার জায়গা, দুটি সোফা ও দুটি চেয়ার রয়েছে, পেছন দিকে খাট আর একটা ছোট টেবিল। কাকাবাবু বসে আছেন একটা সোফায়, অন্যটিতে বসে আছেন একজন লম্বামতন লোক। সন্তু চিনতে পারল, এই লোকটিকেই কলকাতায় তাদের বাড়িতে কয়েকদিন আসতে দেখেছে। এঁরা দু'জনে মনোযোগ দিয়ে কী যেন আলোচনা করছিলেন। সন্তুদের দেখে থেমে গেলেন।

কাকাবাবু সন্তুকে ডেকে বললেন, "আয় সন্তু, কাল রাত্তিরে তোর একা থাকতে খারাপ লাগেনি তো?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "দু'জন গার্ড পোস্টেড ছিল ওর ঘরের দিকে নজর রাখার জন্য, সন্তু তা টেরই পায়নি।"

সন্তু বেশ অবাক হল। সত্যি সে কিছু বুঝতে পারেনি তো!

কাকাবাবু বললেন, "আর কিছু হবে না। আমাকে কোনো উট্‌কো ডাকাত মারতে এসেছিল বোঝা যাচ্ছে। এটা কোনো দলের কাজ নয়।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "উট্‌কো? উট্‌কো কথাটার মানে কী আছে?"

কাকাবাবু বললেন, "এই, সাধারণ একটা কেউ।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তোমাকে গুলি করে পালাল, ঘর থেকে কিছু জিনিসপত্র নিল না, এ কি সাধারণ ডাকাত?"

অপরিচিত লোকটি মাথা নিচু করে বসে ছিলেন। এবারে মুখ তুলে বললেন, "আই ফিল গিল্‌টি!"

কাকাবাবু ইংরিজিতে বললেন, "না, না, আপনার কোনো দায়িত্ব নেই। আমি তো নিজের ইচ্ছেতেই এসেছি!"

তারপর সন্তুদের দিকে ফিরে বললেন, "তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন···এঁর নামটা মস্ত বড়, সবটা বললে মনে থাকবে না, সবাই এঁকে আল মামুন বলে ডাকে। ইনি একজন ব্যবসায়ী।"

ভদ্রলোক সন্তুর দিকে মাথা নাড়িয়ে বললেন, "গুড মর্নিং, হাউ ডু ইউ ডু ?"

তারপরই হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আই মাস্ট গো ! মিস্টার রায়চৌধুরী, আই উইল গেট্ ইন টাচ উইথ ইউ !"

বেশ তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেলেন। স্পষ্ট মনে হল, ওঁর মুখে যেন একটা ভয়ের ছাপ।

নরেন্দ্র ভার্মা কাকাবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি করলেন, তারপর তিনিও বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, তুই অমনভাবে তাকাচ্ছিস কেন ? এই ব্যাণ্ডেজটা দেখতেই এত বড়, আসলে বিশেষ কিছু হয়নি। পাঁজরা ঘেঁষে একটা গুলি চলে গেছে, কিন্তু পাঁজরা-টাজরা ভাঙেনি কিছু। ব্যাটারা কেন যে এরকম এলোপাথাড়ি গুলি চালায় ! টিপ করতেই শেখেনি !"

সন্তু একদৃষ্টিতে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে আছে। পেটে গুলি লেগেছে, তা নিয়েও কাকাবাবু ঠাট্টা ইয়ার্কি করতে পারেন !

নরেন্দ্র ভার্মা তক্ষুনি ফিরে এসে বললেন, "আমার লোক লাগিয়ে দিয়েছি, তোমার পাখি কোন্ বাসায় থাকে তা ঠিক জেনে আসবে।"

কাকাবাবু হাসলেন।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "এবারে সব খুলে বলো তো রাজা ! তুমি আমার ওপরেও ধোঁকা চালাচ্ছ ? আমাদের না জানিয়ে ও লোকটার সঙ্গে তোমার কিসের মামলা ?"

কাকাবাবু সে-রকমই হাসতে হাসতে বললেন, "আরে সেরকম কিছু না। এর মধ্যে কোনো ক্রাইম বা ষড়যন্ত্র বা বড় ধরনের রহস্যের ব্যাপার নেই। ওই লোকটা একটা অদ্ভুত কথা বলেছিল, তাই আমি কৌতূহলী হয়ে চলে এসেছি দিল্লিতে।"

নরেন্দ্র ভার্মা বলল, "ক্রাইম কিছু নেই ? তবে গুলিটা চালাল কে ?"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা অবশ্য আলাদা ব্যাপার। আমি যেজন্য দিল্লিতে এসেছি তার সঙ্গে এর হয়তো কোনো সম্পর্ক নেই। আবার থাকতেও পারে। আচ্ছা, আমি সব বুঝিয়ে বলছি, সুস্থির হয়ে বোসো।"

সন্তুর দিকে ফিরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুই জানিস, হিয়েরোগ্লিফিকস কাকে বলে ?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ !"

কাকাবাবু আর নরেন্দ্র ভার্মা দু'জনেই অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকালেন।

কাকাবাবু বললেন, "অ্যাঁ ? তুই জানিস ? বল তো কাকে বলে ?"

সন্তু বলল, "হিয়েরোগ্লিফিক্স হচ্ছে একরকম ছবির ভাষা। মিশরের পিরামিডে কিংবা অন্য-সব স্মৃতিস্তম্ভে ছবি এঁকে এঁকে অনেক কথা লেখা হত !"

"অনেকটাই ঠিক বলেছিস। এ তুই কোথা থেকে শিখলি ?"

"একটা কমিক্সে পড়েছি।"

"তা হলে তো কমিক্সগুলো যত খারাপ ভাবতুম তত খারাপ নয় !"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তুমি যে শব্দটা বললে, আমি নিজেই তো তার মানে জানতুম না।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে তুমিও কমিক্স পড়তে শুরু করে দাও ! আচ্ছা, এবার তাহলে ঘটনাটা গোড়া থেকে বলি। এই যে আল মামুন নামে ভদ্রলোককে দেখলে, ইনি কলকাতায় গিয়ে আমার সঙ্গে কয়েকবার দেখা করেছিলেন। একটা ব্যাপারে আমার সাহায্য চান। উনি কয়েকটা লম্বা-লম্বা হলদে কাগজ নিয়ে গিয়েছিলেন, তাতে লাল রঙের অনেক ছোট-ছোট ছবি আঁকা। দেখলে মনে হয়, যে এঁকেছে, তার আঁকার হাত খবই কাঁচা, এবং খুব সম্ভবত একজন বুড়ো লোক। আল মামুন বলেছেন, ঐ ছবিগুলো এঁকেছেন তাঁর এক আত্মীয়।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "সেই ছবিগুলো, ঐ যে কী নাম বললে, সেই ভাষায় লেখা ?"

সন্তু বলল, "হিয়েরোগ্লিফিক্স !"

কাকাবাবু হাহা করে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, "কয়েক হাজার বছর আগে লুপ্ত হয়ে গেছে এই ভাষা। এখন কি আর এই ভাষায় কেউ লেখে ? লিখলেও বুঝতে হবে সে-লোকটি পাগল।"

নরেন্দ্র ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, "ছবিগুলো তোমার কাছে নিয়ে যাবার মানে কী ? তুমি কি ঐ ভাষার একজন এক্সপার্ট ?"

কাকাবাবু বললেন, "তা বলতে পারো। এক সময় আমি ঐ নিয়ে চর্চা করেছি। তোমার মনে নেই, নরেন্দ্র, বছর দশেক আগে আমি টানা ছ'মাস ইজিপ্টে ছিলাম ? মিশরের সব হিয়েরোগ্লিফিক্সের পাঠ আজও উদ্ধার করা যায়নি। অনেকেই চেষ্টা করছেন। আমি কিছু-কিছু পড়তে পারি। এ সম্পর্কে আমার লেখা কয়েকটা প্রবন্ধও বিদেশী কাগজে বেরিয়েছে।"

নরেন্দ্র ভার্মা জানতে চাইলেন, "ঐ আল মামুন কোন্ দেশের লোক ?"

"ইজিপশিয়ান। ব্যবসা-সূত্রে প্রায়ই আসতে হয় এদেশে। এখান থেকে উনি চা, সেলাইকল, সাইকেল, এইসব জিনিস নিয়ে যান নিজের দেশে।"

"তা একজন ব্যবসায়ীর এরকম ইতিহাসে উৎসাহ ?"

"সেটাও একটা মজার ব্যাপার। ঐ ভদ্রলোক প্রাচীন মিশরের ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই জানেন না। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম ছবিগুলো বোধহয় ইজিপ্টের কোনো পিরামিডের দেয়াল থেকে কপি করা। কিন্তু তা-ও নয়। আল মামুন কোনো দিন পিরামিড চোখেও দেখেননি !"

"অ্যাঁ? ইজিপ্টের লোক অথচ পিরামিড দেখেনি !"

"এতে আশ্চর্য হবার কী আছে ? ভারতবর্ষের সব লোক কি তাজমহল দেখেছে ? হিমালয়ই বা দেখেছে ক'জন ? আল মামুন দূর থেকে হয়তো একটা দুটো পিরামিড দেখে থাকতে পারেন। কিন্তু ভেতরে কখনও যাননি। উনি বলছেন যে, এই দিল্লিতেই ওঁর এক আত্মীয় থাকেন, ছবিগুলো তিনি এঁকেছেন।"

নরেন্দ্র ভার্মা বিরক্ত হয়ে বললেন, "ধেত্ ! কী তুমি সব ছবি-টবির কথা বলছ, কোন্ বুড়ো কী এঁকেছে, তাতে আমি কোনো আগ্রহ পাচ্ছি না !"

কাকাবাবু বললেন, "সেইজন্যই তো তোমাকে আগে এসব বলতে চাইনি।"

"কিন্তু এর সঙ্গে তোমাকে মার্ডার করার সম্পর্ক কী ? মানে বলছি কী, তোমাকে হঠাৎ কেউ মারতে এল কেন ?"

"সম্পর্ক একটাই থাকতে পারে। আল মামুন ঐ ছবিগুলোর অর্থ করে দেওয়ার জন্য আমাকে এক লক্ষ টাকা দিতে চেয়েছিলেন।"

নরেন্দ্র ভার্মা হু-ই-ই করে শিস দিয়ে উঠে বললেন, "এক লাখ টাকা ? কয়েকটা ছবি পড়ে দেবার জন্য ? কী আছে ঐ ছবির মধ্যে ? তুমি মানে বুঝেছিলে ?"

"আগে আর-একটা ব্যাপার শোনো। আল মামুনের ওই যে আত্মীয়, তাঁর নাম মুফ্‌তি মহম্মদ। তিনি খুব ধার্মিক ব্যক্তি, তাঁর অনেক শিষ্য আছে। তাঁর বয়েস নাকি সাতানব্বই, শরীর বেশ শক্তসমর্থ। শুধু গত বছর থেকে তাঁর কথা বন্ধ হয়ে গেছে। একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারেন না। তাঁকে চিকিৎসার জন্য আনা হয়েছে দিল্লিতে।"

"সাতানব্বই বছর বয়েস ? তাঁর আবার চিকিৎসা ?"

"এটা দেখা যায় যে, সন্ন্যাসী-ফকিররা অনেক দিন বাঁচেন

তাঁদের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। সাধক মুফতি মহম্মদের শুধু কথা বন্ধ হয়ে গেছে।"

"সাতানব্বই বছর বয়সে তিনি ছবি আঁকছেন ?"

"আল মামুনের মুখে যা শুনেছি, উনি লিখতে জানেন না। আগে কখনও ছবিও আঁকেননি। মুসলমান সাধকেরা কেউ ছবি আঁকেন না। ইনি ছবি আঁকছেন ঘুমের ঘোরে।"

"অ্যাঁ ? কী গাঁজাখুরি গল্প শুরু করলে রাজা ?"

"আর-একটু ধৈর্য ধরে শোনো, নরেন্দ্র ! আমি যা শুনেছি, তা-ই বলছি। ধর্মীয় গুরু বলে মুফতি মহম্মদকে হাসপাতালে রাখা হয়নি, রাখা হয়েছে আলাদা একটা বাড়িতে। এক-একদিন মাঝরাতে ঘুমের মধ্যে উঠে বসে ঐ ছবিগুলো আঁকছেন।"

"হলদে কাগজে, লাল কালিতে ? ঘুমের মধ্যে তিনি সে-সব পেলেন কোথায় ?"

"লাল কালি নয়, লাল পেন্সিল। উনি যে ঘরে থাকেন, তার পাশের ঘরের টেবিলে অনেক রকম কাগজ আর পেন্সিল থাকে। সেটা আল মামুনের অফিস-ঘর। মুফতি মহম্মদ সাহেব ঘুমের মধ্যেই পাশের ঘরে উঠে এসে, বেছে বেছে হলদে কাগজ আর লাল পেন্সিলে ছবিগুলো আঁকছেন। ছবিগুলো যে হিয়েরোগ্লিফিক্সেরই মতন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিছু কিছু পরিষ্কার অর্থ পাওয়া যায়।"

"কী মানে বুঝলে ?"

"সেটা এখন বলা যাবে না। খুব গোপন ব্যাপার। সাধক মুফতি মহম্মদের অনেক শিষ্য এই দিল্লিতেই আছেন। আল মামুন তাঁদের কিছু জানাতে চান না। গুরুদেব কী লিখছেন সেটা তিনি নিজে আগে জেনে নিতে চান।"

"সেইজন্য দিতে চান এক লাখ টাকা ? উনি কি ভাবছেন, এটাই গুরুর বিষয়-সম্পত্তির উইল ?"

"গুরুর উপদেশও অনেকের কাছে খুব মূল্যবান।"

"তুমি তবে এক লাখ টাকা পেয়ে গেছ, আর টাকার লোভেই দুশমন তোমাকে গুলি করতে এসেছিল ?"

"সেই টাকা পাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। ঐ কাগজে কী লেখা হয়েছে, তা আমি আল মামুনকে বলিনি এখনও !"

"বলোনি ? ওকেও বলোনি কেন ?"

কাকাবাবু মুচকি-মুচকি হাসতে লাগলেন।

নরেন্দ্র ভার্মা আবার জিজ্ঞেস করলেন, "এক লাখ টাকা দিতে চায়, তবু ওকে তুমি দু'চারটা ছবির মানে বলে দাওনি ?"

কাকাবাবু বললেন, "না। ওকে কিছু বলিনি, তার কারণ আমি আল মামুনের কোনো কথা বিশ্বাস করিনি।"

সন্তু এতক্ষণ প্রায় দম বন্ধ করে শুনছিল, এবারে সে একটা বড় নিশ্বাস ফেলল। টাকার লোভে কাকাবাবু কোনো কাজ করবেন, তা সে বিশ্বাসই করতে পারে না।

কাকাবাবু আবার বললেন, "ওই ছবির ভাষা থেকে আমি যা বুঝেছি, তা এখনকার কোনো ব্যাপারেই নয়। অন্তত সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার একটা ঘটনার কথা বলা হচ্ছে। তাও শেষ হয়নি। আমি পেয়েছি মাত্র চারখানা হলদে কাগজ। এর পরে যেন আরও আছে। সেইজন্য আমি আল মামুনকে বলেছিলুম। আমি গুরু মুফতি মহম্মদকে নিজের চোখে দেখতে চাই। সেইজন্যই আমার দিল্লি আসা।"

নরেন্দ্র ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, "দেখা হয়েছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "না। সেইটাই তো বুঝতে পারছি না। এতদিন দিল্লি এসে বসে রইলুম, তবু আল মামুন সেই ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন না। কখনও বলেন যে, ওঁর গুরুর মেজাজ ভাল না থাকলে বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করতে চান না। আবার কখনও বলেন যে, অন্য শিষ্যরা সব সময় ঘিরে থাকে. সেইজন্য সুযোগ হচ্ছে না।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তোমার ঐ আল মামুন কোথায় থাকে আমি আজই জেনে যাচ্ছি। আমি ওকে ফলো করার জন্য লোক লাগিয়ে দিয়েছি। এবারে বলো, তোমার ওপর যে-লোকটা গুলি চালাতে এসেছিল, সে লোকটা কেমন ? সেও কি পরদেশী ? তার মুখ তুমি নজর করেছিলে ?"

কাকাবাবু, বললেন, "হ্যাঁ, মুখ দেখেছি, কিন্তু একপাশ থেকে। আমার ধারণা সে একটা ভাড়াটে খুনি। কেউ তাকে টাকা দিয়ে বলেছে আমাকে সাবাড় করে দিতে। দ্যাখো, আমার ওপর অনেকের রাগ আছে। কত পুরনো শত্রু আছে। তাদেরই কেউ দিল্লিতে আমায় চিনতে পেরে খতম করে দিতে চেয়েছে। ও ঘটনায় গুরুত্ব দেবার কিছু নেই !"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তুমি কী বলছ, রাজা ? একটা লোক তোমাকে খতম করে দিতে এসেছিল, আর তাতে কোনো গুরুত্ব নেই ? তাজ্জব ! লোকটা যদি আবার আসে ? শুনেছ সন্তু, তোমার কাকাবাবু কেমন ছেলেমানুষের মতন কথা বলেন !"

কাকাবাবু হেসে ফেলে বললেন, "আরে, ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে তো কোনো কাজই করা যায় না।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "লোকটা কি রাত্তিরবেলা ঘরের মধ্যে এসে গুলি করেছিল ?"

কাকাবাবু বললেন, "তখন রাত বেশি না, এগারোটা হবে বড়জোর। হোটেলের ঘরে বসে আমি পড়াশুনো করছিলাম। ঘরের পাশেই একটা ছোট বারান্দা, তার দরজাটা খোলা। একটা শব্দ হতেই চোখ তুলে দেখি যে, বাইরে থেকে বারান্দায় একটা লোক লাফিয়ে উঠে এল। তার হাতে রিভলভার। আমারও বালিশের তলায় রিভলভার থাকে, তুই জানিস। কিন্তু আমি বসে ছিলাম বালিশটা থেকে বেশ দূরে। হাত বাড়িয়ে সেটা নেবার সময় পেলাম না। লোকটা এসেই কোনোরকম কথাবার্তা না বলে রিভলভারটা তুলল আমার কপাল লক্ষ করে। যদি ঠিক টিপ করে গুলি চালাত, তা হলে আমি সেই মুহূর্তে শেষ হয়ে যেতাম। তখন বাঁচার একটাই উপায়। আমি প্রচণ্ড জোরে একটা চিৎকার করে বললুম, "ব্লাডি ফুল ! লুক বিহাইণ্ড !"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "কপালের সামনে রিভলভারের নল দেখেও তুমি চিৎকার করতে পারলে ? তোমার নার্ভ আছে বটে !"

কাকাবাবু বললেন, "আমি আগেও অনেকবার এই রকম চেঁচিয়ে সুফল পেয়েছি। হঠাৎ খুব জোরে শব্দ হলে পাকা-পাকা শিকারিদেরও টিপ নষ্ট হয়ে যায়। এখানেও তাই হল। আমার ধমক শুনে লোকটার হাত কেঁপে গেল একটু, তার গুলি লাগল আমার পাঁজরায়। আমি সাঙ্ঘাতিক আহত হবার ভান করে ঝাঁপিয়ে পড়লুম বিছানায়। সঙ্গে-সঙ্গে বালিশের তলা থেকে আমার রিভলভারটা বার করে এনেছি। লোকটাকে আমি তখন গুলি করতে পারতুম। কিন্তু আমি দেখতে চাইলুম লোকটা এর পর কী করে ! কোনো জিনিসপত্তর নিতে চায় কি না। লোকটা কিন্তু আর কিছু করল না। সে ভাবল বোধহয় যে, একটা গুলি চালিয়েই তার কাজ শেষ হয়ে গেছে। আবার টপ করে বারান্দা ডিঙিয়ে পালিয়ে গেল।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "হাঁ, ভাড়াটে খুনি বলেই মালুম হচ্ছে। দিল্লিতে এরকম অনেক আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার সন্দেহ হচ্ছে, যে ওকে ভাড়া করেছিল, সে ওকে পুরো টাকা দেয়নি। এত কাঁচা কাজের জন্য ওর পাঁচ টাকার বেশি পাওয়া উচিত নয়।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "লোকটা সাকসেসফুল হয়নি বলে তোমার আফসোস হচ্ছে মনে হচ্ছে !"

কাকাবাবু আবার জোরে হেসে উঠলেন। নরেন্দ্র ভার্মাও হাসতে

লাগলেন।

এই সময় বাইরের রাস্তায় একটা হৈচৈ আর দুমদাম শব্দ হতে লাগল। সন্তু চলে এল জানলার কাছে।

কী যেন একটা কাণ্ড হয়েছে রাস্তায়। লোকজন ছোটাছুটি করছে। একটা বাসে আগুন লেগে গেছে।

নরেন্দ্র ভার্মা উঠে এসে উঁকি দিয়ে বললেন, "ওঃ ! এমন কিছু নয়। বাস বোধহয় একটা লোক চাপা দিয়েছে, তাই পাবলিক রেগে গিয়ে বাসটাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ! এসব তোমাদের ক্যালকাটাতে আগে হত, এখন আমদানি হয়ে গেছে দিল্লিতেও !"

॥ ৪ ॥

সেদিন দিল্লি শহরের অনেক রাস্তাতেই খুব গণ্ডগোল, মারামারি চলল। পরের দিন কারা যেন ডেকে বসল হরতাল। বাস, ট্যাক্সি, অটো রিকশা সব বন্ধ। সকালের দিকে কয়েকটা প্রাইভেট গাড়ি বেরুলেও লোকেরা বন্ধ করে দিল ইট-পাটকেল মেরে। দিল্লির চওড়া-চওড়া রাস্তাগুলো একেবারে ফাঁকা।

এত বড় একটা ব্যস্ত শহরকে দিনের বেলা একেবারে শুনশান দেখলে কেমন অদ্ভুত লাগে !

আগের রাত্তিরে সন্তু ফিরে এসেছিল গেস্ট হাউসে। সকাল থেকে সে ছটফট করছে। কী করে সেই নার্সিংহোমে কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাবে ? গাড়ি বন্ধ বলে নরেনকাকাও আসতে পারবেন না। সন্তু যে রাস্তা চেনে না। না হলে সন্তু হেঁটেই চলে যেতে পারত।

বেলা এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর সন্তু আর থাকতে পারল না, বেরিয়ে পড়ল। সন্তু জানে, হরতালের দিন রাস্তা দিয়ে হাঁটলে কেউ কিছু বলে না। কয়েকটা সাইকেলও চলছে।

বেশিদূর যেতে হল না, একটু পরেই একটা পুলিশের গাড়ি এসে থামল সন্তুর পাশে। ড্রাইভারের পাশ থেকে নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "উঠে পড়ো সন্টু একেলা কোথা যাচ্ছিলে ?"

একটু বাদেই ওরা পৌঁছে গেল নার্সিং হোমে।

কাকাবাবু খুব উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে ছিলেন। ওদের দেখেই ব্যস্ত হয়ে বললেন, "এসেছ আমি ভাবছিলাম যে কী করে আসবে শোনো নরেন্দ্র, রফি মার্গ কোথায় ? এখান থেকে হেঁটে যাওয়া যায় ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "রফি মার্গ ? সে তো এখান থেকে অনেক দূর। এটা চিত্তরঞ্জন পার্ক আর রফি মার্গ সেই কনট প্লেসের কাছে। হেঁটে যাওয়া অসম্ভব !"

কাকাবাবু বললেন, "নেপোলিয়ন কী বলেছিলেন জানো না ? অসম্ভব বলে কিছু নেই তাঁর ডিক্‌শনারিতে।"

"সেটা নেপোলিয়নের বেলা সত্যি হতে পারে। কিন্তু সকলের পক্ষে নয়। কী ব্যাপার, তুমি রফি মার্গ পর্যন্ত হেঁটে যেতে চাও নাকি ?"

"হ্যাঁ। আর দেরি করে লাভ নেই। চলো, বেরিয়ে পড়া যাক।"

কাকাবাবু উঠে পড়তে যাচ্ছিলেন, নরেন্দ্র ভার্মা বাধা দিয়ে বললেন, "আরে, ঠারো, ঠারো ! হঠাৎ রফি মার্গ হেঁটে যেতে হবে কেন সেটা শুনি !"

কাকাবাবু বললেন, "আল মামুন ফোন করেছিল একটু আগে।"

"তোমার এ-ঘরে তো ফোন নেই ?"

"দোতলায় আছে। সেখানে নেমে গিয়ে আমি ফোন ধরেছি।"

"এখনও তোমার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, এই অবস্থায় সিঁড়ি দিয়ে নেমে অন্যায় করেছ। যাই হোক, তারপর কী বলল, টেলিফোনে ?"

"গুরু মুফতি মহম্মদ আবার ঘোরের মাথায় ছবি আঁকতে শুরু করেছেন। আজ আর ওখানে কোনো লোকজন নেই। আমরা এখন গেলে দেখতে পারি।"

"এই যে শুনেছিলুম উনি মাঝরাতে ছবি আঁকেন ?"

"মাঝরাতেই যে আঁকবেন, তার কোনো মানে নেই। হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে আঁকতে শুরু করেন। শুনলুম যে, উনি কাল সারা রাত ঘুমোননি, বিছানার ওপর ঠায় বসেছিলেন, ঘুমিয়েছেন সকাল আটটায়। চলো, চলো, আর দেরি করে লাভ নেই।"

"শোনো রাজা, নেপোলিয়ান যাই-ই বলুন, তোমার পক্ষে এখন যাওয়া অসম্ভব। ডাক্তার তোমাকে সিঁড়ি দিয়ে নামতেই বারণ করেছেন। আর তুমি ক্রাচ নিয়ে অতদূর যেতে চাও ?"

"আরে ডাক্তারদের কথা সব সময় মানলে চলে না। আমি ভাল আছি বেশ। অনায়াসে যেতে পারব

"পাগলামি কোরো না, রাজা। আমাদের মতন লোকেরই হেঁটে যেতে তিন-চার ঘণ্টা লাগবে। আর তুমি ক্রাচ নিয়ে কতক্ষণে পৌঁছবে ? পুলিশের গাড়িটা ছেড়ে দিলাম··· ঠিক আছে টেলিফোনে আর-একটা গাড়ি আনাচ্ছি, সেই গাড়িতে যাব।"

কাকাবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "উঁহু, তা চলবে না। সে-কথা আগেই ভেবেছিলাম। আল মামুনকে আমি বলেছিলাম, আজ তো গাড়িঘোড়া চলছে না, যেতে গেলে পুলিশের সাহায্য নিতে হবে। আল মামুন তীব্র আপত্তি করে বলেছে,না, পুলিশের গাড়িতে যাওয়া কিছুতেই চলবে না। ও-বাড়ির সামনে পুলিশের গাড়ি থামলেই সকলের চোখে পড়ে যাবে। মুফতি মহম্মদের মতন সম্মানিত মানুষের কাছে পুলিশ এসেছে, এ-কথা জানলে তাঁর শিষ্যরা চটে যাবে খুব

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তাও একটা কথা বটে। পরদেশী নাগরিক, ঝটাকসে ওদের কাছে পুলিশের গাড়ি যাওয়া ঠিক নয়। তা হলে কী উপায়

"হেঁটেই যেতে হবে। শুধু-শুধু দেরি করছ কেন ?"

"রাজা, তুমি বুঝতে পারছ না, ক্রাচ নিয়ে হেঁটে পৌঁছতে তোমার কম সে কম চার ঘণ্টা লেগে যাবে। ততক্ষণ কি তোমার ঐ বুঢ়াবাবা বসে বসে ছবি আঁকবেন ?"

কাকাবাবু এবারে ব্যাপারটা বুঝলেন। মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল। এ তো আর পাহাড়ে ওঠা নয়, শুধু-শুধু একটা শহরে চার-পাঁচ ঘণ্টা হাঁটার কোনো মানে হয় না !

একটু চুপ করে থেকে কাকাবাবু বললেন, "আর একটা উপায় আছে, কোনো ডাক্তারের গাড়ি যেতে পারে, তাই না ? ডাক্তারের গাড়ি কিংবা হাসপাতালের গাড়ি নিশ্চয়ই আটকাবে না ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "হাঁ, তা হতে পারে। দেখি কোনো ডাক্তারের গাড়ি যোগাড় করা যায় কি না।"

সন্তু বলল, "সাইকেলেও যাওয়া যায়। আমি দেখলুম রাস্তায় সাইকেল চলছে।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক বলেছিস ! তা হলে দেখলি তো সাইকেল শেখারও উপকারিতা আছে। এক-এক সময় কত কাজে লাগে। ডাক্তারের গাড়ি যদি যোগাড় করা না যায়, তাহলে তুই আর নরেন্দ্র সাইকেলে চলে যেতে পারবি। পায়ের জন্য আমি তো আজকাল আর সাইকেল চালাতে পারি না।"

নরেন্দ্র ভার্মা নীচ থেকে ঘুরে এসে বললেন, "এখন তো একটাও ডাক্তারের গাড়ি নেই। তবে একটা অ্যাম্বুলেন্স ভ্যান একটু বাদেই ফিরবে।"

কাকাবাবু অস্থিরভাবে বললেন, "একটু বাদে মানে কতক্ষণ বাদে ? দ্যাখো, না হয় দুটো সাইকেলই যোগাড় করো।"

শেষ পর্যন্ত তাই-ই করতে হল। নানান জায়গায় টেলিফোন করেও কোনো ডাক্তারের গাড়ি বা অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া গেল না। সবাই বলেছে, আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টার মধ্যে আসতে পারে। কাকাবাবু অত দেরি করতে রাজি নন। নার্সিং হোমের দরোয়ানদের কাছ থেকে দুটো সাইকেল যোগাড় হল, তাই নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সন্তু আর নরেন্দ্র ভার্মা।

এ রকম ফাঁকা রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে আরাম। হরতালের দিন কলকাতার রাস্তায় ছেলেরা ফুটবল খেলে, কিন্তু দিল্লিতে সে-রকম কিছু দেখা যাচ্ছে না। রাস্তায় মানুষজন খুব কম

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "সেই কলেজ-জীবনের পর আর সাইকেল চালাইনি। তোমার কাকাবাবুর পাল্লায় পড়ে কত কী যে করতে হয় আমাকে ! অবশ্য, খারাপ লাগছে না। আচ্ছা সন্টু, একটা সত্যি কথা বলবে ?"

"হ্যাঁ, বলুন।"

"একটা বুড়া সাধু কী সব ছবি আঁকছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কি কোনো মানে আছে ? আমরা কি বুনো হাঁস তাড়া করছি না ?"

"সব ব্যাপারটা আমি এখনও বুঝতে পারছি না, নরেনকাকা !"

"চলো, গিয়ে দেখা যাক !"

সাইকেলে রফি মার্গ পৌঁছতেই এক ঘন্টার বেশি লেগে গেল। নরেন্দ্র ভার্মা দিল্লির সব রাস্তা খুব ভাল চেনেন, তাই ঠিকানা খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না।

এই রাস্তার সব বাড়িই অফিসবাড়ি বলে মনে হয়। তারই মধ্যে একটি ছোট, হলদে রঙের দোতলা বাড়ি। ছোট হলেও বাড়িটি দেখতে খুব সুন্দর, সামনে অনেকখানি ফুলের বাগান।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "এই রাস্তা দিয়ে কতবার গেছি, কিন্তু এ-বাড়িতে যে ইজিপশিয়ানরা থাকে, কোনো দিন জানতেই পারিনি। দিল্লিতে যে কত কিসিমের মানুষ থাকে !"

গেটের সামনে একজন দরোয়ান বসে আছে। তার কাছে আল মামুনের নাম করতেই সে দোতলায় উঠে যেতে বলল।

সারা বাড়িটা একেবারে নিস্তব্ধ, কোনো মানুষ আছে বলে মনেই হয় না। দোতলাতেও সিঁড়ির মুখে কোলাপ্সিব্‌ল গেট। ওরা সেখানে এসে দাঁড়াতেই আল মামুন একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ওদের কোনো রকম শব্দ করতে নিষেধ করলেন। তারপর ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, "হোয়ার ইজ মিঃ রায়চৌধুরী ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "গাড়ি যোগাড় করা যায়নি বলে তিনি আসতে পারেননি।"

আল মামুনের মুখে একটা হতাশার চিহ্ন ফুটে উঠল। তিনি বললেন, "আপনাদের তো ডাকিনি। আপনাদের দিয়ে কোনো কাজ হবে না। আপনারা ফিরে যান।"

এই কথা বলে আল মামুন পেছন ফিরতেই নরেন্দ্র ভার্মা গেটের মধ্য দিয়ে হাত ঢুকিয়ে আল মামুনের একটা হাত চেপে ধরলেন। তারপর খুব আস্তে অথচ দৃঢ় গলায় বললেন, "আমি ভারত সরকারের প্রতিনিধি। মিঃ রায়চৌধুরী আমাকে আর তাঁর ভাইপোকে পাঠিয়েছেন এখানে কী ঘটছে, তা দেখে গিয়ে রিপোর্ট করবার জন্য। এই হরতালের দিনেও আমরা কষ্ট করে এমনি-এমনি ফিরে যাবার জন্য আসিনি। গেট খুলুন।"

নরেন্দ্র ভার্মা এমনিতে হাসিখুশি মানুষ। কিন্তু এক-এক সময় তাঁর মুখখানা এমন কঠিন হয়ে যায় যে, দেখলে ভয় লাগে।

আল মামুন আর দ্বিরুক্তি না করে গেট খুলে দিলেন। তারপর বললেন, "জুতো খুলে ফেলুন !"

খালি পায়ে একটা টানা বারান্দা পেরিয়ে এসে ওরা ঢুকল একটা মাঝারি সাইজের ঘরে। সে-ঘরে খাট-বিছানা পাতা, কিন্তু বিছানাতে কেউ নেই। বিছানার ঠিক পাশেই অন্য একটা ঘরে যাওয়ার দরজা।

আল মামুন ওদের ইশারা করলেন সেই দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে।

অন্য ঘরটিতে রয়েছে একটা টেবিল আর কয়েকখানা চেয়ার। একটা চেয়ারে বসে আছেন একজন খুবই লম্বা মানুষ, পরনে একটা কালো রঙের আলখাল্লা। তাঁর মাথার চুল ধপধপে সাদা উলের মতন, আর মুখভর্তি সাদা দাড়ি পাতলা তুলোর মতন। হাতে একটা লাল ফেল্ট পেন, টেবিলের ওপর একটা বড় হলদে কাগজে তিনি ছবি আঁকছেন।

সত্যি, দেখলে মনে হয় যেন তিনি ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে আঁকছেন। চোখ দুটি প্রায় বোঁজা, হাতের কলমটা দিয়ে একটা দাগ কেটে থেমে যাচ্ছেন, তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ। আবার একটা দাগ কাটছেন।

সন্তু আর নরেন্দ্র ভার্মা প্রায় নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল এই দৃশ্য। একজন সাতানব্বই বছরের বৃদ্ধ চেয়ারে সোজা হয়ে বসে ছবি আঁকছেন, এ যেন বিশ্বাসই করা যায় না।

মুফ্‌তি মহম্মদ একবার হঠাৎ এই দরজার দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ দুটি খোলা, তবু তিনি ওদের দেখতে পেলেন কি না বোঝা গেল না। একটুও বিরক্ত হলেন না। বরং তাঁর মুখে যেন একটা পবিত্র ভাব ফুটে আছে। দেখলেই ভক্তি জাগে।

আবার মুখ ফিরিয়ে তিনি ছবি আঁকাতে মন দিলেন।

নরেন্দ্র ভার্মা সন্তুকে চোখের ইঙ্গিতে বললেন, "এবার চলো !"

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে খানিকটা আসতেই সিঁড়িতে ঠং ঠং শব্দ উঠল।

আল মামুন ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন। সিঁড়ির মুখের কোলাপ্সিব্‌ল গেট তিনি ভুল করে খোলা রেখে এসেছিলেন। তিনি গেট পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই ভেতরে ঢুকে এলেন ক্রাচ বগলে নিয়ে একজন মানুষ।

নরেন্দ্র ভার্মা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, "আনডন্টেড রাজা রায়চৌধুরী ! তাকে কেউ পেছনে ফেলে রেখে আসতে পারে না !"

কাকাবাবু হাসিমুখে বললেন, "তোমরা চলে আসার পরেই একটা অ্যামবুলেন্স পেয়ে গেলাম।"

তারপর তিনি আল মামুনকে জিজ্ঞেস করলেন, "খবর কী ? এখনও ছবি আঁকছেন ?"

ওরা তিনজনই এক সঙ্গে নাড়ল।

কাকাবাবু বললেন, "চলো। আমি একটু দেখি। ওঁর সঙ্গে আমার কথা বলা খুব দরকার।"

আল মামুন সজোরে মাথা নেড়ে বললেন, "নো নো নো, দ্যাট

ইজ আউট অব কোয়েশ্চেন। ওঁকে এই অবস্থায় কিছুতেই ডিসটার্ব করা যাবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার কথা বলাটা অত্যন্ত জরুরি। আপনারা বুঝতে পারছেন না, কারুর সঙ্গে কথা বলার জন্যই উনি ওই ছবিগুলো আঁকছেন ?"

আল মামুন বললেন, "কী করে কথা বলবেন আপনি ? ওঁর গলার আওয়াজ নষ্ট হয়ে গেছে, উনি কোনো উত্তর দিতে পারবেন না। আপনার ইংরিজি প্রশ্নও উনি বুঝবেন না।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "আমিও সেই কথা ভাবছিলুম। রাজা, উনি তোমার প্রশ্ন বুঝবেন কী করে ? আল মামুন যদি বুঝিয়েও দেন, তা হলেই বা উনি কী করে উত্তর দেবেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "উনি যে ভাষা বোঝেন, সেই ভাষাতেই আমি প্রশ্ন করব।"

জামার পকেট থেকে কাকাবাবু একটা ভাঁজ-করা কাগজ বার করলেন। তারপর দেখালেন সেটা খুলে। তাতেও কতকগুলো ছোট-ছোট ছবি আঁকা।

কাকাবাবু বললেন, "এই ছবির ভাষা তোমরা কেউ বুঝবে না, উনি হয়তো বুঝতে পারেন।"

কাকাবাবুকে নিয়ে আসা হল সেই ঘরে। সন্তু আর নরেন্দ্র ভার্মা দাঁড়িয়ে রইলেন দরজার কাছে। আল মামুন কাকাবাবুকে নিয়ে ঢুকলেন পাশের ঘরে।

কাকাবাবুর ক্রাচের শব্দ পেয়ে চোখ তুলে তাকালেন মুফ্‌তি মহম্মদ। আল মামুন বিনীত ভাবে কিছু বললেন তাঁকে। খুব সম্ভবত কাকাবাবুর পরিচয় দিলেন।

কাকাবাবু কপালের কাছে হাত ছুঁইয়ে বললেন, "সালাম আলেকুম।"

তারপর তাঁর ছবি-আঁকা কাগজটা ছড়িয়ে দিলেন টেবিলের ওপর।

মুফ্‌তি মহম্মদ এখন নিশ্চয়ই জেগে উঠেছেন পুরোপুরি। কেননা, সেই কাগজটা দেখেই তাঁর মুখে দারুণ অবাক ভাব ফুটে উঠল। একবার কাগজটার দিকে, আর একবার কাকাবাবুর মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন তিনি।

তারপর হাতছানি দিয়ে কাকাবাবুকে কাছে ডাকলেন। কাকাবাবু তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি তাঁর লম্বা ডান হাত রাখলেন কাকাবাবুর মাথায়, নিজে চোখ বুজে রইলেন একটুক্ষণ। ঠিক যেন তিনি কাকাবাবুকে আশীর্বাদ করছেন ভারতীয়দের প্রথায়।

একটু পরে হাতটা সরিয়ে নিয়ে লাল কলমটা তুলে ছবি আঁকতে শুরু করলেন।

কিন্তু তাঁর হাত যেন চলছেই না। খুব অলস ভাবে দাগ কাটছেন, বোঝা যায় তাঁর হাত কেঁপে যাচ্ছে। একটুখানি এঁকেই তিনি তাকাচ্ছেন কাকাবাবুর দিকে। কাকাবাবু ঘাড় নাড়ছেন।

মাত্র তিনটি ছবি কোনোক্রমে আঁকার পরেই তাঁর হাত থেকে কলমটা খসে পড়ে গেল মাটিতে। মুখখানা ঝুঁকে পড়ল বুকের ওপর, তারপর একেবারে নুয়ে টেবিলের ওপর পড়ে যাবার আগেই কাকাবাবু আর আল মামুন দু'দিক থেকে ধরে ফেললেন তাঁকে।

॥ ৫ ॥

কাকাবাবু আর সন্তুকে কড়া পুলিশ পাহারায় রাখা হয়েছে একটা সরকারি গেস্ট হাউসে। এর মধ্যে দু'বার হামলা হয়ে গেছে কাকাবাবুর ওপর। কাকাবাবুর বন্ধুরা সবাই বলছেন ওঁকে কলকাতায় ফিরে যেতে। এখানে থাকলে ওঁর জীবন বিপন্ন হতে পারে। কিন্তু কাকাবাবু সে-কথা কিছুতেই শুনবেন না।

সাধক মুফ্‌তি মহম্মদ সেদিন সেই চেয়ারে বসেই মৃত্যু বরণ করেছেন। শেষ সময়ে তাঁর মুখে কোনো যন্ত্রণার ছাপ ছিল না, বরং ফুটে উঠেছিল অপূর্ব সুন্দর হাসি। যেন তিনি খুব তৃপ্তির সঙ্গে এই জীবন শেষ করে চলে গেলেন।

সাধক মুফ্‌তি মহম্মদের অনেক শিষ্য এই দিল্লিতেই আছে। এই শিষ্যদের আবার দুটি দল। এক দলের নেতা আল মামুন, আর অন্য দলটির নেতা হানি আলকাদি নামে একজন। শিষ্যদের ধারণা, সাধক মুফ্‌তি মহম্মদের কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে তিনি তাঁর শেষ উইল ছবি দিয়ে লিখে গেছেন। শুধু রাজা রায়চৌধুরীই সেই ছবির মানে জেনেছে। রাজা রায়চৌধুরী বাইরের লোক, সে কেন এই গোপন কথা জানবে ? আল মামুন কেন রাজা রায়চৌধুরীকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল ? দ্বিতীয় দলের নেতা হানি আলকাদি অভিযোগ করেছে যে, আল মামুন নিজে নেতা হবার মতলবে সেই উইলের কথা অন্য কারুকে জানতে দিচ্ছে না।

কিন্তু মজা হচ্ছে এই, আল মামুনও রেগে গেছে কাকাবাবুর ওপর। বৃদ্ধ মুফ্‌তি মহম্মদের আঁকা ঐ ছবিগুলোর যে কী মানে, তা কাকাবাবু আল মামুনকেও বলেননি।

এমন কী, নরেন্দ্র ভার্মা বারবার জিজ্ঞেস করলেও কাকাবাবু মুচকি হেসে বলেছেন, "ধরে নাও, ঐ ছবিগুলোর কোনো মানে নেই। আমি অবশ্য একরকম মানে করেছি, সেটা ভুলও হতে পারে।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তুমি কী মানে বুঝেছ, সেটাই শুনি !"

কাকাবাবু বললেন, "উঁহু, সেটাও বলা যাবে না ! মুফ্‌তি মহম্মদ নিষেধ করে গেছেন।"

"অ্যাঁ ! উনি কখন নিষেধ করলেন তোমায় ? আমরা তো কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলুম !"

"কাছে দাঁড়িয়ে থাকলেই কি সব বোঝা যায় ? দেখলে না, আমি মুফ্‌তি মহম্মদকে লিখে কিছু প্রশ্ন জানালুম। উনিও ছবি এঁকে তার উত্তর দিলেন।"

"তুমি কী প্রশ্ন করেছিলে ?"

"আমি একটা মানে উল্লেখ করে জানতে চেয়েছিলুম, আপনি কি এটাই বোঝাতে চাইছেন ? উনি তার উত্তরে 'হ্যাঁ' বা 'না' কিছুই লিখলেন না। উনি লিখলেন, তুমি আগে নিজে যাচাই করে দেখো, তার আগে কারুকে কিছু বোলো না।"

"যাচাই করে দেখো, মানে ? অন্য কোনো পণ্ডিতের পরামর্শ নেবে ? না, তাও তো পারবে না। অন্য কারুকে বলাই তো নিষেধ।"

"এটা যাচাই করার জন্য আমাকে অনেক দূর যেতে হবে। ইজিপ্টে !"

সন্তু বলে উঠল, "পিরামিডের দেশে ?"

কাকাবাবু চোখ দিয়ে হেসে বললেন, "মনে হচ্ছে তোর এবারে বিদেশ ঘোরা হয়ে যাবে, সন্তু !"

সন্তুর মনে পড়ে গেল রিনির কথা। সিদ্ধার্থদাদের সঙ্গে রিনি কায়রো বেড়াতে গেছে। তখন সে-কথা শুনে সন্তুর হিংসে হয়েছিল। এবারে সে-ই কায়রোতে পৌঁছে রিনিদের চমকে দেবে। কাকাবাবু এইজন্যই পাসপোর্ট আনতে বলেছিলেন ?

নরেন্দ্র ভার্মা চিন্তিত ভাবে বললেন, "রাজা, এখন ইজিপ্টে গেলে তুমি যে একেবারে বাঘের মুখে গিয়ে পড়বে ! এখানেই তুমি দু'তিনবার বিপদে পড়েছিলে। দিল্লিতে যে এত ইজিপশিয়ান থাকে জানা ছিল না। ওখান থেকে আমাদের দেশে অনেকে পড়া-লিখা করতে আসে। বিজনেসের জন্যও আসে। আমি খবর নিয়ে জেনেছি, ঐ যে হানি আলকাদি নামের লোকটা, ওর অনেক গোঁড়া সাপোর্টার আছে। ওর পার্টি একবার একটা প্লেন হাইজ্যাক করেছিল। মুফতি মহম্মদের সিক্রেট তুমি যদি আগে ওদের কাছে ফাঁস না করো, তা হলে ওরা তোমাকে ছাড়বে না।"

কাকাবাবু বললেন, "বাঘের মুখে গিয়ে পড়তেই তো আমার ইচ্ছে করে। তুমি কি ভাবছ, পুলিশ-পাহারায় আমি এখানে বসে

থাকব ?”

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “ইণ্ডিয়া গভর্নমেন্ট তোমাকে এখন ইজিপ্ট পাঠাতে রাজি হবে না। ও দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের বেশ ভাল সম্পর্ক আছে, তুমি গিয়ে যদি এখন একটা গণ্ডগোল পাকাও

কাকাবাবু তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, “কিছু গণ্ডগোল পাকাব না। আমাকে গভর্নমেন্টেরও পাঠাবার দরকার নেই। আমি নিজেই যাব। তুমি বরং একটু সাহায্য করো, নরেন্দ্র। আজকের মধ্যেই আমাদের দু'জনের ভিসা যোগাড় করে দাও।”

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “আমি এখনও বলছি, তোমাদের ওখানে যাওয়া উচিত নয়।”

কাকাবাবু এবারে হেসে ফেলে বললেন, “তোমার হিংসে হচ্ছে বুঝি, নরেন্দ্র ? আমরা বেশ ইজিপ্টে মজা করতে যাচ্ছি, তোমার যাওয়া হবে না। কিন্তু তোমাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি না !”

“মজা ? তুমি ইজিপ্টে মজা করতে যাচ্ছ ? হানি আলকাদিকে আমি যতটা চিনেছি, সে একটা দুর্দান্ত টাইপের লোক !”

“আরে, দুর্দান্ত প্রকৃতির লোকদের খুব সহজে বাগ মানানো যায়। যাদের বাইরে থেকে নরম-সরম মনে হয়, তাদেরই মনের আসল চেহারাটা বোঝা শক্ত। দেখো না ওখানে কত মজা হয়। ফিরে এসে তোমাকে সব গল্প শোনাব।”

কাকাবাবু উঠে গিয়ে তাঁর হাতব্যাগ খুলে রিভলভারটা বার করলেন। সেটা নরেন্দ্র ভার্মার কোলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, “এটা তোমার কাছে জমা রইল। বিদেশে যাচ্ছি, সঙ্গে আর্মস নিয়ে যাওয়া ঠিক নয়।”

নরেন্দ্র ভার্মা চোখ কপালে তুলে বললেন, “হানি আলকাদির দলবল তোমার ওপর সাঙ্ঘাতিক রেগে আছে জেনেও তুমি কোনো হাতিয়ার ছাড়া অত দূরের দেশে যাবে ?”

কাকাবাবু নিজের মাথায় আঙুল দিয়ে টোকা মারতে মারতে ইয়ার্কির সুরে বললেন, “কাঁধের ওপর যে এই জিনিসটা রয়েছে, তার থেকে আর কোনো অস্ত্র কি বড় হতে পারে ?”

নরেন্দ্র ভার্মা এমন একটা মুখের ভাব করলেন, যেন তিনি বলতে চান, আঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না !

সন্ধেবেলা নরেন্দ্র ভার্মা চলে যাবার পর কাকাবাবু সন্তুকে বললেন, “শোন, এখানে খুব সাবধানে থাকবি। একা বাইরে বেরুবি না। ওরা যদি তোকে ধরে নিয়ে গিয়ে কোথাও আটকে রাখে, তা হলে আমার ওপর চাপ দেওয়া সহজ হবে।”

সন্তু মুখে 'আচ্ছা' বললেও তলার ঠোঁটটা এমন ভাবে কাঁপাল যাতে বেশ একটু গর্ব-গর্ব ভাব ফুটে উঠল।

সেটা লক্ষ করে কাকাবাবু বললেন, “বুঝেছি, তুই মনে মনে ভাবছিস তো, তোকে কে আটকে রাখবে ! তুই ঠিক পালাতে পারবি, তাই না ? তাতেই তো আমার বেশি চিন্তা। তোর মতন বয়েসি একটা ছেলেকে কেউ সহজে মারে না, কিন্তু তুই পালাবার চেষ্টা করলে নির্ঘাত গুলিটুলি ছুঁড়বে। এর আগে তুই যতবার পালাবার চেষ্টা করেছিস, ততবার বেশি বিপদে পড়েছিস, মনে নেই ?”

সন্তু বলল, “প্রত্যেকবার নয়। সেবারে ত্রিপুরায় যে আমি পালিয়েছিলুম, আর আমায় কেউ ধরতে পারেনি।”

কাকাবাবু বললেন, “আচ্ছা ঠিক আছে। মানলুম। কিন্তু এবারে দিল্লিতে আর কায়রোতে গিয়ে সব সময় আমার সঙ্গে থাকবি। একা-একা গোয়েন্দাগিরি করার চেষ্টা করবি না।”

সন্তুর মনে পড়ল, সে একা তিলজলায় রহস্যসন্ধান করতে গিয়ে কী কেলেঙ্কারিই না হয়েছিল। ভাগ্যিস কাকাবাবু সে-কথা জানেন না।

অবশ্য সন্তু তখনই ঠিক করল, তা বলে সে দমে যাবে না ভবিষ্যতে আবার সে ঐ রকম চেষ্টা করবে। সে একা-একা একটা রহস্যের সমাধান করে কাকাবাবুকে তাক্ লাগিয়ে দেবে।

পরদিন কাকাবাবু টেলিফোনেই অনেক কাজ সেরে ফেললেন। তার পরের দিনই তাদের ইজিপ্ট যাত্রা। নরেন্দ্র ভার্মা গোমড়া মুখে ওদের পৌঁছে দিতে এলেন এয়ারপোর্টে। ওরা ভেতরে ঢোকার আগের মুহূর্তে নরেন্দ্র ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন,"কী রাজা, এখনও কি মনে হচ্ছে তোমরা ওখানে মজা করতে যাচ্ছ?"

কাকাবাবু চোখ টিপে বললেন, "হ্যাঁ, দারুণ মজা হবে। ইশ, তুমি যেতে পারলে না!"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "আমি খোঁজ পেয়েছি হানি আলকাদিও আজ সকালে অন্য একটা প্লেনে ইজিপ্ট চলে গেছে। নিশ্চয়ই এমব্যাসি থেকে খবর পেয়েছে যে, তুমি ইজিপ্টের ভিসা নিয়েছ!"

কাকাবাবু সে-খবর শুনে একটুও বিচলিত না হয়ে বললেন, "তা তো যাবেই। নইলে মজা জমবে কেন? আল মামুন যায়নি? সে তো রাগ করে আমার সঙ্গে আর দেখাই করে না!"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তার খবর জানি না।"

কাকাবাবু বললেন, "যাবে, সেও নিশ্চয়ই যাবে। আচ্ছা নরেন্দ্র, ফিরে এসে সব গল্প হবে।"

এই তো ক'দিন আগেই সন্তু প্লেনে চেপে কলকাতা থেকে এসেছে দিল্লিতে। সেই প্লেনটা ছিল এয়ারবাস আর এটা বোয়িং। একটা শিহরন জাগছে সন্তুর বুকের মধ্যে। বিদেশ, বিদেশ! পিরামিডের দেশ। ক্লিওপেট্রার দেশ।

প্লেন আকাশে ওড়বার পরেই সন্তু সিটবেল্ট খুলে উঠে দাঁড়াল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় যাচ্ছিস?"

সন্তু মুখ খুলে কিছু বলার আগেই কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, বাথরুমে যাবার কথা বলবি তো? শুধু-শুধু মিথ্যে কথা বলতে হবে না। পুরো প্লেনটা ঘুরে দেখার ইচ্ছে হয়েছে দেখে আয়। চলন্ত প্লেনে তো আর তোকে কেউ কিডন্যাপ করবে না! এক যদি প্লেনটা কেউ হাইজ্যাক করে! তা যদি করেই, তা হলে আর কী করা যাবে!"

সন্তুর আসল উদ্দেশ্য হল যাত্রীদের মুখগুলো ভাল করে দেখা। চেনা কেউ আছে কি না। তার দৃঢ় বিশ্বাস, আল মামুনও এই প্লেনে রয়েছে। প্রথম থেকেই ঐ লোকটিকে সন্তু ঠিক পছন্দ করতে পারেনি। লোকটির সব সময় কী রকম যেন গোপন-গোপন ভাব। মনের কথা খুলে বলে না। আল মামুন প্রথমেই কাকাবাবুকে এক লক্ষ টাকার লোভ দেখিয়েছিল।

মুফতি মহম্মদ মরে যাবার পর আল মামুন খুব একটা দুঃখ পেয়েছেন এমন মনে হয়নি। তিনি কাকাবাবুকে বলেছিলেন যে, কাকাবাবু যদি সব ছবিগুলোর ভাষা শুধু আল মামুনকেই জানিয়ে দেন, তা হলে তিনি পাঁচ লক্ষ টাকা দেবেন।

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বলেছিলেন, "তা কী করে হবে? আপনার গুরুই যে বলতে বারণ করেছেন!"

না, প্লেনের যাত্রীদের মধ্যে একজনও চেনা মানুষ দেখতে পেল না সন্তু। কয়েকজন ভারতীয় যাত্রী রয়েছে, কিন্তু তারা কেউ বাংলায় কথা বলছে না।

তখনও সন্তু জানে না যে, তার জন্য একটা দারুণ বিস্ময় অপেক্ষা করছে।

খাবার দিচ্ছে দেখে সন্তু ফিরে এল নিজের জায়গায়। টেবিলটা খুলে পেতে নিল।

খেতে খেতে কাকাবাবু বললেন, "তুই হিয়েরোগ্লিফিক্‌সের মানে বলে আমায় চমকে দিয়েছিলি। পিরামিডগুলো কেন তৈরি হয়েছিল তাও তুই জানিস নিশ্চয়ই?"

সন্তু বলল, "রাজা-রানিদের সমাধি দেবার জন্য। ভেতরে অনেক জিনিসপত্তর রাখা থাকত, রাজা-রানিরা ভাবতেন যে, তাঁরা আবার বেঁচে উঠবেন!"

"সবচেয়ে পুরনো পিরামিড কতদিন আগে তৈরি হয়েছে বল তো?"

"সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে!"

"এটা আন্দাজে বললি, তাই না?"

ধরা পড়ে গিয়ে সন্তু লাজুক ভাবে হাসল।

কাকাবাবু বললেন, "খুব পুরনো পিরামিডগুলো খ্রীষ্টপূর্ব ২৬৮৬ থেকে ২১৬০ বছরের মধ্যে তৈরি হয়েছিল। তা হলে বলা যেতে পারে মোটামুটি সাড়ে চার হাজার বছর আগে। যাই হোক, পিরামিড তো অনেকগুলোই আছে। এর মধ্যে গিজার পিরামিড খুব বিখ্যাত। আর একটা আছে খুফু। এটা বিরাট লম্বা। এখন তো পৃথিবীতে মস্ত-মস্ত বাড়ি তৈরি হয়েছে। এক সময় নিউ ইয়র্কের এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং ছিল সবচেয়ে বড় বাড়ি, তারপর…"

"এখন শিকাগোর সিয়ার্স টাওয়ার সবচেয়ে বড়!"

"হুঁ, তাও জানিস দেখছি। কিন্তু ঐ খুফুর পিরামিড এখনও ঐ সব বড়-বড় বাড়ির সঙ্গে উচ্চতায় পাল্লা দিতে পারে। এবারে তোকে একটা ভূতের গল্প বলি শোন্! পিরামিডগুলোর আশেপাশে আরও অনেক গোপন সমাধিস্থান আছে মাটির নীচে। বাইরের থেকে সেগুলো বোঝাই যায় না। সাহেবরা একটা-একটা করে সেগুলো আবিষ্কার করেছে। সম্রাট খুফুর মায়ের নাম ছিল হেটেফেরিস। তাঁর সমাধিস্থানের কথা অনেকে জানতই না। একজন সাহেব সেটি আবিষ্কার করেন। সেখানে কোনো পিরামিড নেই, মাটির অনেক নীচে একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে ছিল সেই সমাধি। মমিগুলো যে কফিনের মধ্যে রাখে, তাকে বলে সারকোফেগাস। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, প্রথম যিনি সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে নামলেন, তিনি সেখানে অনেক কিছু দেখতে পেলেও সারকোফেগাসের মধ্যে রানি হেটেফেরিসের মমি দেখতে পেলেন না।

"কেউ মমিটা চুরি করে নিয়ে গেছে!"

"হ্যাঁ, পিরামিড থেকে অনেক মমি চুরি গেছে বটে, কিন্তু রানি হেটেফেরিসের সমাধিস্থানে তো কেউ আগে ঢোকেনি। তা ছাড়া, রাজা-রানিদের সমাধিস্থানে অনেক দামি দামি জিনিস থাকত। যেমন সোনার খাট, সোনার জুতো, মণিমুক্তো-বসানো পানপাত্র, আরও অনেক কিছু। প্রথম যিনি সেই সুড়ঙ্গ আবিষ্কার করেন, সেই চার্লস ব্রকওয়ে অনেক মূল্যবান জিনিস দেখতে পেয়েছিলেন, শুধু মমিটাই ছিল না। চোরেরা আর-কিছু নিল না, শুধু মমিটাই নিল? চোরেরা তো মমি নেয় বিক্রি করবার জন্যই!"

"তারপর?"

"এর এক বছর তিন মাস বাদে একদল পুরাতত্ত্ববিদ আবার ঐ সুড়ঙ্গে নামেন। তাঁরা কিন্তু সারকোফেগাসের মধ্যে রানি হেটেফেরিসের মমি দেখতে পান। তাঁরা সেই মমির ছবিও তুলেছিলেন। মিশর সরকারের অনুমতি ছাড়া মমি সরানো যায় না। তাই তাঁরা সেদিন আর কিছু করেননি। ওপরে পাহারা বসিয়ে রেখেছিলেন। পরদিন আবার সেখানে গিয়ে দেখা গেল সারকোফেগাসের মধ্যে মমি নেই! আবার অদৃশ্য হয়ে গেছে। তাই নিয়ে সে-সময় অনেক হৈচৈ হয়েছিল, পৃথিবীর বহু কাগজে খবরটা ছাপা হয়েছিল, এই নিয়ে বইও লেখা হয়েছে। চার্লস ব্রকওয়ে অবশ্য দ্বিতীয় অভিযাত্রী দলটির বক্তব্য একটুও বিশ্বাস করেননি।"

আরও কিছু শোনবার জন্য সন্তু কাকাবাবুর মুখের দিকে ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে আছে দেখে কাকাবাবু বললেন, "তোকে এমনি একটা রহস্যকাহিনী শোনালুম। আমরা যে-কাজে যাচ্ছি তার সঙ্গে রানি হেটেফেরিসের সমাধির খুব একটা সম্পর্ক নেই।"

খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। এঁটো প্লেট সরিয়ে নিয়ে গেল এয়ার-হস্টেসরা। তার একটু পরে একজন এয়ার-হস্টেস সন্তুর

কাছে এসে ইংরিজিতে বলল, "তোমার নাম তো সন্তু, তাই না? প্লিজ কাম উইথ মি! তোমাকে আর-একবার সিকিউরিটি চেক করা* হবে।"

সন্তু দারুণ অবাক হয়ে কাকাবাবুর দিকে তাকাল। এয়ার-হস্টেসটি কাকাবাবুকে বলল, "আই অ্যাম সরি স্যার, এই ছেলেটি সন্দেহজনকভাবে সারা প্লেন ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সেইজন্য ক্যাপ্টেন বললেন, ওকে একবার সার্চ করে দেখতে হবে! আমি ওকে একটু নিয়ে যাচ্ছি!"

কাকাবাবু বললেন, "গো অ্যাহেড!"

সন্তু একই সঙ্গে আশ্চর্য হল, রেগে গেল, আবার বেশ মজাও পেল। এরা তাকে হাইজ্যাকার ভাবছে নাকি? সঙ্গে একটা খেলনা পিস্তল থাকলেও এদের বেশ ভয় দেখানো যেত।

এয়ার-হস্টেসটি সন্তুকে নিয়ে এল ককপিটে। সেখানকার দরজা খুলে ভেতরে ঢোকা মাত্র একজন বলে উঠল, "হ্যাণ্ডস আপ!"

তারপরই হেসে উঠল হোহো করে!

সন্তুর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "বিমানদা!"

সন্তুদের পাড়ার যে বিমান পাইলট, সে-ই এই প্লেনের ক্যাপটেন। এরকম যোগাযোগ যে ঘটতে পারে, তা সন্তুর একবারও মনে হয়নি।

এয়ার-হস্টেস আর কো-পাইলটরা হাসছে সন্তুর ভ্যাবাচ্যাকা অবস্থা দেখে। এয়ার-হস্টেসটি বলল, "আমি যখন গিয়ে বললুম যে, ওকে সার্চ করা হবে, তখন এই ইয়াং জেন্টলম্যানটির মুখ একেবারে ভয়ে শুকিয়ে গিয়েছিল। পকেটে সত্যিই বোমা-পিস্তল কিছু আছে নাকি?"

বিমান অন্য সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল সন্তুর। তারপর জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবুও দেখলুম রয়েছেন। তোরা কোথায় যাচ্ছিস?"

সন্তু বলল, "ইজিপ্ট।"

বিমান বলল, "ইজিপ্ট? সেখানে তোরা কোন্ ব্যাপারে যাচ্ছিস? নিশ্চয়ই বেড়াতে নয়?"

সন্তু এবারে একটু ভারিক্কি ভাব করে বলল, "সেটা এখন বলা যাবে না!"

বিমান অন্যদের বলল, "জানো, এই যাঁকে কাকাবাবু বলছি, তিনি একজন ফ্যানটাসটিক পার্সন। পৃথিবীতে যে-সব মিস্ট্রি অন্য কেউ সল্‌ভ করতে পারে না, সেগুলো তিনি সল্‌ভ করার চেষ্টা করেন। যেমন ওঁর জ্ঞান, তেমনি সাহস!"

কো-পাইলট মিঃ কোহলি বললেন, "তাহলে আমরা সবাই তাঁকে একবার দেখতে চাই।"

বিমান বলল, "আর-একটা মজা করা যাক। সন্তুকে আমরা এখানে আটকে রাখি, তা হলে কাকাবাবু নিশ্চয়ই এক সময়ে এখানে ছুটে আসবেন।"

ককপিটে বসে অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়। প্লেনটা মেঘের রাজ্য দিয়ে যাচ্ছে বটে, তবু মাঝে-মাঝে চোখে পড়ে নীচের পৃথিবী। বিমান সন্তুকে বোঝাতে লাগল আকাশের মানচিত্র।

এক ঘন্টা কেটে গেল, তবু কাকাবাবু সন্তুর কোনো খোঁজ করলেন না। বিমান বলল, "চল্ রে, সন্তু আমিই কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসি।"

দূর থেকে দেখা গেল কাকাবাবু বুকের ওপর মাথা ঝুঁকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। ওরা কাছে যাবার পর কাকাবাবুকে ডাকতে হল না, তিনি মুখ তুলে, একটুও অবাক না হয়ে, স্বাভাবিক গলায় বললেন, "কী খবর, বিমান?"

বিমান জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি জানতেন আমি এই প্লেনে থাকব?"

কাকাবাবু বললেন, "না, তা জানতুম না! তবে জানাটা শক্ত কিছু

নয়। সন্তুকে নিয়ে যাবার পরই মনে পড়ল, প্লেন টেক অফ করার পর ঘোষণা করা হয়েছিল, ক্যাপটেন ব্যানার্জি এবং তাঁর ক্রু-রা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছে। তখন দুই আর দুইয়ে চার করে নিলুম!"

বিমান একটু হতাশ হয়ে বলল, "কাকাবাবু, আপনি কখনও চমকে যান না, বা অবাক হন না?"

কাকাবাবু বললেন, "কেন হব না? পৃথিবীতে অবাক হবার মতন ঘটনাই তো বেশি। তবে এত সামান্য ব্যাপারে ব্যস্ত হই না।"

"কাকাবাবু, মিশরে কী ব্যাপারে যাচ্ছেন, জানতে পারি?"

"অতি সামান্য ব্যাপার!"

"তার মানে এখন বলবেন না! ইশ্, আমাকে রিলিজ করছে আথেন্সে। যদি কায়রোতে নামতে পারতুম! দেখি যদি ম্যানেজ করে চলে আসতে পারি। কায়রোতে আপনারা কোথায় উঠবেন?"

"উঠবো তো ওয়েসিস হোটেলে। কিন্তু কায়রোতে আমরা দু'একদিনের বেশি থাকব না। মেমফিসে চলে যাব! সেখানে কোথায় উঠব তার ঠিক নেই।"

সন্তু বলল, "বিমানদা, তুমি সিদ্ধার্থদাকে চেনো তো? স্নিগ্ধাদির বর? ওরা এখন কায়রোতে আছেন। তুমি ইণ্ডিয়ান এমব্যাসিতে খোঁজ কোরো! সিদ্ধার্থদা ফার্স্ট সেক্রেটারি··· "

কাকাবাবু একটু ভর্ৎসনার চোখে তাকালেন সন্তুর দিকে।

॥ ৬ ॥

এয়ারপোর্টে যে সিদ্ধার্থ, স্নিগ্ধা, রিনি সবাই উপস্থিত থাকবে এটা অবশ্য সন্তুও জানত না। কাকাবাবু তো আশাই করেননি। এটা নরেন ভার্মার কীর্তি, তিনি কায়রোর ইণ্ডিয়ান এমব্যাসিতে টেলেক্স পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেটা দেখে সিদ্ধার্থ নিজেই এসেছে।

কায়রোতে প্লেনটা এক ঘন্টা থামে। বিমানও নেমে এসে একবার ওদের সকলের সঙ্গে দেখা করে চলে গেল।

রিনি সন্তুকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী রে, সন্তু, কলকাতায় যখন দেখা হল, তখন তো একবারও বললি না যে, তোরা এখানে আসবি?"

সন্তু গম্ভীর ভাবে বলল, "আমরা কখন যে কোথায় যাব, তার তো কোনো ঠিক থাকে না। আজ কায়রোতে এসেছি, পরশুই হয়তো আবার আমরা মস্কো চলে যাব!"

রিনি ঠোঁট উল্টে বলল, "ইশ্, আর চাল মারিস না! আমরা-আমরা করছিস কেন রে? তুই তো কাকাবাবুর বাহন! উনি ভাল করে হাঁটতে পারেন না, তাই তোকে সঙ্গে আনেন।"

কলকাতায় থাকতে রিনি কায়রো বেড়াতে আসছে শুনে সন্তুর ঈর্ষা হয়েছিল। এখন তার মনে হল, এইসব অবোধ মেয়ের সঙ্গে কথা বলার কোনো মানেই হয় না! সে মুখটা ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে।

সন্তুকে আরও রাগাবার জন্য রিনি বলল, "তুই সেই গল্পটা জানিস না? চাষের খেতে একটা গোরুর শিং-এ একটা মশা বসেছিল। একজন লোক সেই মশাটাকে জিজ্ঞেস করল, ওহে মশা, তুমি এখানে কী করছ? মশা বলল, আমরা হাল চাষ করছি! তুই হচ্ছিস সেই মশা! হি-হি-হি-হি!"

বেশ রাগ হয়ে গেলেও সন্তুর মনে হল, রিনি এই ধরনের কথা বলছে কেন? ও কি তিলজলার সেই কেলেঙ্কারির ব্যাপারটা জেনে গেছে?

সন্তু রিনির কাছ থেকে সরে গিয়ে কাকাবাবুর পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

সিদ্ধার্থদা কাকাবাবুর সুটকেসটা তুলে নিয়ে বললেন, "চলুন কাকাবাবু, বাড়িতে গিয়ে সব গল্প শুনব। আমার বাড়িটা খুব সুন্দর জায়গায়, আপনার পছন্দ হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার বাড়ি? না, সেখানে তো আমরা যাচ্ছি না!"

সিদ্ধার্থ নিরাশ হয়ে বলল, "সে কী? আমার বাড়িতে যাবেন না? কেন?

কাকাবাবু বললেন, "কিছু মনে কোরো না। আমি হোটেল বুক করেই এসেছি। আমি যে ব্যাপারে এসেছি, তাতে তোমার জড়িয়ে না পড়াই ভাল। তুমি তো সরকারি কাজ করো!"

তারপর তিনি সন্তুর দিকে ফিরে বললেন, "সন্তু, তুই গিয়ে ওদের সঙ্গে থাকতে পারিস। বিদেশে এসে কোনো চেনা লোকের কাছে তোর থাকতে ভাল লাগবে।"

সন্তু মুখের এমন ভাব করল যেন সে প্রশ্নই ওঠে না। বিশেষত রিনি ওরকম কথা বলার পর সে আর রিনির সঙ্গে একটা মিনিটও কাটাতে চায় না।

স্নিগ্ধা অনুযোগের সুরে বলল, "কাকাবাবু, আপনি যাবেন না? আমি আপনাদের জন্য চিংড়ির মালাইকারি রান্না করে রেখেছি। কত কষ্টে যোগাড় করলুম চিংড়ি···"

কাকাবাবু এবারে হাল্‌কা গলায় বললেন, "তুমি কী করে জানলে যে, ঐ আইটেমটা আমার সবচেয়ে ফেভারিট? ঠিক আছে, সন্ধেবেলা গিয়ে খেয়ে আসব! কিন্তু উঠতে হবে হোটেলেই।"

ওয়েসিস হোটেলটি বিশেষ বড় নয়। শহর ছাড়িয়ে একটু বাইরের দিকে। গরমকাল বলে এই সময়ে টুরিস্টদের ভিড় নেই, হোটেল প্রায় ফাঁকা। সিদ্ধার্থ, স্নিগ্ধা আর রিনি সন্তুদের ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে একটু পরে বিদায় নিয়ে চলে গেল। কথা হল যে, সন্ধেবেলা সিদ্ধার্থ আবার এসে ওদের নিয়ে যাবে বাড়িতে।

কাকাবাবু ঘর থেকেই দু'তিনটে টেলিফোন করলেন। তারপর তিনি বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে সন্তুকে বললেন, "তুই চান-টান করে নে। আজ দুপুরে আমরা ঘরেই খেয়ে নেব। দুপুরে যা চড়া রোদ ওঠে, বাইরে বেরুনোই যায় না।"

গরমে সন্তুর গা চ্যাটচ্যাট করছিল, সে ঢুকে গেল বাথরুমে। সেখানকার জানলা দিয়ে দেখল, রাস্তা দিয়ে ট্রলি বাস চলছে। ঐটাই যা নতুনত্ব, নইলে কায়রো শহরটাকে বিদেশ বিদেশ মনে হয় না, ভারতবর্ষের যে-কোনো বড় শহরেরই মতন। ইজিপ্ট দেশটা যদিও আফ্রিকার মধ্যে, কিন্তু এখানে কালো মানুষ নেই। বর্তমান ইজিপ্টের অধিবাসীরা জাতিতে আরব।

স্নান সেরে বেরিয়ে এসে সন্তু দেখল, কাকাবাবু তাঁর নোটবুকে কী সব লিখছেন। সন্তু চুল আঁচড়াতে শুরু করতেই দরজায় ঠক ঠক শব্দ হল। কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকালেন।

সন্তু দরজা খুলতেই একজন মাঝারি চেহারার লোক জিজ্ঞেস করলেন, "মিঃ রাজজা রায়চৌধারি হিয়ার?"

কাকাবাবু বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, "মান্টো? কাম ইন! কাম ইন!"

লম্বা লোকটি প্রায় ছুটে এসে কাকাবাবুকে জড়িয়ে ধরলেন। একেবারে দৃঢ় আলিঙ্গন। তারপর কোলাকুলির ভঙ্গি করে তিনি সরে দাঁড়ালেন।

এই গরমেও ভদ্রলোক একটা আলখাল্লার মতন পোশাক পরে আছেন। মাথায় ফেজ টুপি, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। দাড়ি-গোঁপ কামানো।

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, ইনি হচ্ছেন আলি সাদাত মান্টো, কায়রো মিউজিয়ামের কিউরেটর, আমার পুরনো বন্ধু।"

মান্টো ইংরিজিতে বললেন, "রায়চৌধারি, তুমি যে এই সময় কায়রোতে এসেছ, তা শুনে আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি প্রথমে। তুমি কী কাণ্ড করেছ? জানো, এখানকার সব কাগজে তোমার কথা বেরিয়েছে?"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি? তা হলে বেশ বিখ্যাত হয়ে গেছি বলো! কী লিখেছে কাগজে আমার সম্পর্কে?"

মান্টো একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে বললেন, "খুব গুরুতর অভিযোগ। এখানকার এক বিখ্যাত নেতা মুফতি মহম্মদ চিকিৎসা করাতে গিয়েছিলেন দিল্লিতে। সেখানে তিনি কয়েকদিন আগে হঠাৎ মারা যান। শেষ মুহূর্তে তিনি যে উইল করে যান, তুমি নাকি সেটা চুরি করেছ।"

কাকাবাবু অট্টহাসি করে উঠে বললেন, "ওরে বাবা রে, একেবারে চোর বানিয়ে দিয়েছে ?"

মান্টোর মুখ গম্ভীর। তিনি বললেন, "হাসির ব্যাপার নয়, রায়চৌধারি! এখানে হানি আলকাদি নামে একজন জঙ্গি নেতা আছে। সে দাবি জানিয়েছে যে, ভারত সরকারের ওপর চাপ দিয়ে তোমাকে এখানে ধরে আনাতে হবে। আর তুমি নিজেই এখানে চলে এসেছ ? তোমার কতটা বিপদ তা বুঝতে পারছ না ?"

কাকাবাবু তবু হাল্কা চালে বললেন, "উইল যদি আমি চুরি করেই থাকি, তা হলে ভারতবর্ষে বসে থেকে লাভ কী ? মুফতি মহম্মদের বিষয়-সম্পত্তি সব কিছু তো এদেশেই। তাই না ?"

"রায়চৌধারি, তুমি গুরুত্ব বুঝতে পারছ না। হানি আলকাদি অতি সাঙ্ঘাতিক লোক। তার দলের ছেলেরা খুব গোঁড়া, নেতার হুকুমে তারা যা খুশি করতে পারে।"

"মান্টো, তুমি কি বিশ্বাস করো যে, আমি কারুর উইল চুরি করতে পারি ?"

"না, না, না, আমি সে-কথা ভাবব কেন ? তোমাকে তো আমি চিনি ! তা ছাড়া মুফ্‌তি মহম্মদের উইল নিয়ে তুমি কী করবে ? আসলে কী হয়েছে বলো তো ?"

"তার আগে তুমি আমার দু'একটা প্রশ্নের উত্তর দাও ! মুফতি মহম্মদ লেখাপড়া জানতেন না, একথা ঠিক তো ?"

"হ্যাঁ, তা ঠিক। উনি কোনোদিন স্কুল-কলেজে যাননি, পড়তে বা লিখতে জানতেন না। তবে জ্ঞানী লোক ছিলেন।"

"উইল লেখার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। অনেকদিন ধরে ওঁর গলার আওয়াজও একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাহলে উইল তৈরি হল কী করে ?"

"তাও তো বটে ?"

"এ সম্পর্কে তোমাদের কাগজে কিছু লেখেনি ?"

"না, কিছু লেখেনি। তবে হানি আলকাদি অভিযোগ করেছে যে, আল মামুন নামে একজন ব্যবসায়ী তোমার সঙ্গে মুফতি মহম্মদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। তারপর তুমি ঐ কাণ্ডটা করেছ !"

"মান্টো, তোমাকে আমি আসল ঘটনাটা পরে বলব। তার আগে তুমি মুফতি মহম্মদ সম্পর্কে কী জানো আমাদের বলো তো ! তুমি কি ওঁকে চিনতে ?"

"হ্যাঁ, ইজিপ্টে তাঁকে কে না চেনে। ওঁর বয়েস হয়েছিল একশো বছর।"

"আমি শুনেছি সাতানব্বই।"

"তা হতে পারে। ওঁর জীবনটা বড় বিচিত্র। খুব গরিবঘরের সন্তান ছিলেন। ওঁর যখন সাত বছর বয়েস, তখন ওঁর বাবা আর মা দু'জনেই মারা যান। সাত বছর বয়েস থেকে উনি রাস্তায় ভিক্ষে করতেন। একটু বড় হয়ে ওঠার পর শুরু করেন কুলিগিরি। তারপর তিনি হলেন বিদেশী ভ্রমণকারীদের গাইড। ইংরেজ আর ফরাসিরা যখন বিভিন্ন পিরামিডের মধ্যে ঢুকে ভেতরের জিনিসপত্র আবিষ্কার করতে শুরু করেন, সেই সময়ে তিনি অনেক অভিযানে ওদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। লেখাপড়া না শিখলেও উনি ভাঙা ভাঙা ইংরিজি আর ফরাসি বলতে পারতেন। আর ওঁর গানের গলাও নাকি ছিল খুব সুন্দর। এই সময় ওঁর অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল ছিল। কিন্তু উনি ওখানেই থেমে থাকলেন না। গাইডের কাজ ছেড়ে দিয়ে উনি যোগ দিলেন একটা বিপ্লবী দলে। তখন ইজিপ্টের রাজা ছিলেন ফারুক। তুমি তো জানো, রাজা ফারুককে সরিয়ে দেবার জন্য এখানকার বিপ্লবীরা কত মরিয়া হয়ে উঠেছিল। মুফতি মহম্মদ হয়ে উঠলেন একটা প্রধান বিপ্লবী দলের নেতা।"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে ফিরে বললেন, "সন্তু, তুই রাজা ফারুকের নাম শুনেছিস ? রাজত্ব হারাবার পর এই ফারুক বলেছিলেন, এরপর পৃথিবীতে আর মোটে পাঁচজন রাজা থাকবে। তাসের চারটে রাজা আর ইংল্যাণ্ডের রাজা ! হ্যাঁ, মান্টো তারপর বলো !"

মান্টো বললেন, "রাজা ফারুককে যে রাজত্ব ছেড়ে পালাতে হয়, তার পেছনে মুফ্‌তি মহম্মদের দলের অনেকটা হাত ছিল। রাজা ফারুকের পর এলেন জেনারেল নেগুইব। অনেকে তখন দাবি তুলেছিল যে, মুফতি মহম্মদেরই উচিত এ দেশের প্রেসিডেন্ট হওয়া। মুফতি মহম্মদ নিজে তা কিছুতেই হতে চাননি, তিনি বলতেন যে, তিনি এক সময় রাস্থায় ভিক্ষে করতেন, রাস্তাতেই তাঁর স্থান। এর পর জেনারেল নাসের যখন প্রেসিডেন্ট হলেন, তখন মুফতি মহম্মদ ঘোষণা করলেন যে, নাসেরই সুযোগ্য ব্যক্তি, আর বিপ্লব আন্দোলন চালাবার দরকার নেই। রাতারাতি তিনি সব কিছু ছেড়ে ফকিরের পোশাক পরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। তারপর আর কোনোদিন তিনি বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেননি। মানুষকে সৎপথে চলার উপদেশ দিতেন, নিজেও খুব সাধারণভাবে দিন কাটাতেন। দেশের মানুষ তাঁকে একজন সর্বত্যাগী মহাপুরুষ হিসেবে শ্রদ্ধা করত।"

কাকাবাবু বললেন, "আমাদের দেশের শ্রীঅরবিন্দের মতন। উনিও আগে বিপ্লবী ছিলেন, পরে সাধক হয়ে যান। মুফতি মহম্মদ কি কোনো আশ্রম করেছিলেন বা ওঁর অনেক বিষয়সম্পত্তি ছিল ?"

মান্টো বললেন, "না, না, সেসব কিছু না। ওঁর অনেক ভক্তশিষ্য ছিল বটে। কিন্তু উনি নিজেকে বলতেন ফকির।"

"তা হলে একজন ফকিরের উইল নিয়ে এত মাথা-ফাটাফাটি কেন ? ফকিরের আবার উইল কী ? অথচ আল মামুন সেই উইলের জন্যই আমাকে পাঁচ লাখ টাকা দিতে চেয়েছিল। হানি আলকাদি আমার মুণ্ডু চাইছে। এটা তো বড় আশ্চর্য ব্যাপার !"

"তার কারণ আছে, রায়চৌধারি ! মুফতি মহম্মদ এক সময় একটা বড় বিপ্লবী দলের নেতা ছিলেন। হঠাৎ সেই দল ভেঙে দেন। একটা বিপ্লবী দল চালাতে গেলে প্রচুর টাকা আর অস্ত্রশস্ত্রের ভাণ্ডার রাখতে হয়। মুফতি মহম্মদের দলেও সেরকম টাকা পয়সা আর অস্ত্র ছিল। অনেকেরই প্রশ্ন, সেগুলো কোথায় গেল ? তিনি নিজে কিছুই ভোগ করেননি। এখনও কয়েকটা বিপ্লবী দল এদেশে আছে, তুমি জানো নিশ্চয়ই। এই তো সেদিন এই রকম একটা দলের লোকেরা প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতকে খুন করেছে। আমি তোমাকে চুপিচুপি বলছি, আমার ধারণা, ঐ হানি আলকাদির দলের লোকেরাই এই খুনটা করেছে। তাহলেই বুঝতে পারছ, ওরা কত সাঙ্ঘাতিক !"

"তুমি চিন্তা কোরো না, মান্টো। হানি আলকাদি আমাকে এখন খুন করবে না, যদি তার একটুও বুদ্ধি থাকে !"

"তুমি এত নিশ্চিত হতে পারছ কী করে জানি না। আচ্ছা, এবার বলো তো, মুফতি মহম্মদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী ? তুমি তাঁর উইল চুরি করেছ, এরকম কথা উঠছে কেন ?"

"তুমি বললে, মুফতি মহম্মদ লেখাপড়া জানতেন না। তুমি কি জানো, তিনি হিয়েরোগ্লিফিকস ভাষা জানতেন ?"

মান্টো যেন হতবাক হয়ে গেলেন কথাটা শুনে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন কাকাবাবুর দিকে। তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, "আমি নিজেই তো ঐ ছবির ভাষার পাঠোদ্ধার করতে পারি না। তবে, আমি তোমার কথা একেবারে অবিশ্বাস করতে পারছি না। মনে পড়ছে যেন, বছর চল্লিশেক আগে মুফতি মহম্মদ একটা পিরামিডের ভেতরের লিপির মানে এক সাহেবকে বুঝিয়ে দিয়ে

অবাক করে দিয়েছিলেন। তখন অবশ্য অনেকে ভেবেছিল, উনি আন্দাজে বলেছেন। উনি তা হলে ঐ ভাষায় উইল রচনা করে গেছেন ?”

“না। মুফতি মহম্মদ কোনো উইল করে যাননি। অন্তত আমি সে রকম কিছু জানি না। মৃত্যুর আগে উনি ওঁর শেষ একটা ইচ্ছে কাগজে ছবি এঁকে বুঝিয়ে যাচ্ছিলেন। সেটা আমি খানিকটা ধরতে পারি। ওঁর সেই শেষ ইচ্ছেটা এতই অদ্ভুত যে, আমি বেশ অবাক হয়েছিলুম। তাতে টাকা-পয়সার কোনো ব্যাপারই নেই। আমি ছবি এঁকে ওকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, আমি যা বুঝেছি তা সঠিক কি না। উনি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, তারপর ছবি এঁকে জানালেন যে, আমি আগে নিজে যাচাই না করে যেন কারুকে না বলি !”

“যাচাই করা মানে ? কী যাচাই করবে ?”

“সেটা যাচাই না করে তো বলা যাবে না। যাক, সে-সব পরে জানতে পারবে। এখন অন্য কথা বলা যাক। তোমার বাড়ির খবর কী ? বৌদি কেমন আছেন ? তোমার ছেলে-মেয়ে ক'টি হল ?”

দু'একটা সাধারণ কথার পর মান্টো আবার বললেন, “রাজজা রায়চৌধুরি, আমি তোমার সম্পর্কে সত্যি চিন্তিত। হানি আলকাদি তোমার ওপর রেগে আছে, আর তুমি এরই মধ্যে কায়রো এসে পড়েছ ! যদি টের পেয়ে যায়...”

কাকাবাবু বললেন, “আবার ওই কথা ! ছাড়ো তো ! শোনো, তোমাকে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব ভেবেছিলুম রানি হেটেফেরিসের মমি কি শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গেছে ?”

মান্টো চমকে উঠলেন। তারপর তাঁর চোখে শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠল। তিনি আস্তে আস্তে বললেন, “তুমি এটাও জানো! রানি হেটেফেরিসের মমি তাঁর সারকোফেগাসের মধ্যে এক-একবার দেখা গেছে, আবার উধাও হয়ে গেছে। সবাই বলত সেটা অলৌকিক ব্যাপার। বছর তিরিশেক ধরে অবশ্য সেই মমি আর দেখতে পাওয়া যায়নি। হঠাৎ তুমি এই প্রশ্ন করলে ?”

কাকাবাবু হেসে বললেন, “এমনিই। প্লেনে আসবার সময় সন্তুকে ঐ গল্পটা বলছিলুম কি না। তাই ভাবলুম, ও নিশ্চয়ই শেষটা শুনতে চাইবে। তিরিশ বছর ধরে রানির মমি আর দেখতে পাওয়া যায়নি ?”

মান্টো কিছু উত্তর দেবার আগেই দরজায় ঠকঠক শব্দ হল। একজন কেউ বলল, “রুম সার্ভিস। ইয়োর লাঞ্চ ইজ রেডি স্যার !”

সন্তু দরজা খুলতেই হোটেলের বেয়ারার বদলে তিনজন সশস্ত্র লোক তাকে ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকে এল। একজন দাঁড়াল দরজায় পিঠ দিয়ে। অন্য দু'জন লম্বাটে ধরনের রিভলভার তুলে ধরল ওদের দিকে।

মিউজিয়ামের কিউরেটার মান্টোর মুখখানা ভয়ে একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল। দিনদুপুরে হোটেলের কামরার মধ্যে যে এরকম গুণ্ডামি চলতে পারে, তা তিনি যেন কল্পনাই করেননি কোনোদিন। এরা এসেছে যখন, নিশ্চয়ই খুন করে ফেলবে ! এদের তিনজনেরই গায়ে খাকি জামা, একজনের গলায় একটা স্কার্ফ বাঁধা।

দরজায় ঠেস দেওয়া দলপতি ধরনের চেহারার লোকটি মান্টোকে বলল, “ইউ কিপ কোয়ায়েট। উই ডোন্ট ওয়ান্ট ইউ !”

কাকাবাবু একটুও বিচলিত না হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমরা কি হানি আলকাদির লোক ? সে কোথায় ?”

গলায়-স্কার্ফ-বাঁধা লোকটি চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, “আমরা এখানে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে আসিনি। হুকুম করতে এসেছি। প্রফেসার, পায়ে জুতো পরে নাও, আমরা তোমাকে নিয়ে যাব !”

কাকাবাবু বললেন, “প্রফেসার ? কে প্রফেসার ? আমি তো প্রফেসার নই। তোমরা ভুল জায়গায় এসেছ !”

লোকটি পকেট থেকে একটা ফোটো বার করে দেখিয়ে বলল, “না। আমাদের ভুল হয়নি। নাউ, গেট গোয়িং !”

কাকাবাবু বললেন, “হুঁ, পাকা কাজ ! শোনো, আমাকে ওরকম ভাবে হুকুম দেওয়া যায় না। আমার এখন এখান থেকে যাবার ইচ্ছে নেই। হানি আলকাদির সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই, তাকে এখানে ডেকে নিয়ে এসো, আমরা একটা জরুরি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব !”

একজন লোক রুক্ষ ভাবে কাকাবাবুকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, “আরে ল্যাংড়া, চল্ শিগগির !”

কাকাবাবুর চোয়াল কঠিন হয়ে গেল। চোখে জ্বলে উঠল আগুন। তিনি মুখ ঘুরিয়ে দেখলেন লোক তিনটিকে। তারপর তীব্র গলায় বললেন, “দিল্লিতে আমার ওপর তিনবার অ্যাটেম্প্ট হয়েছিল, এখানেও দিনের বেলা গুণ্ডামি করতে এসেছ। তোমরা ভেবেছ কী ? আমাকে চেনো না তোমরা !”

দু'হাতের ক্রাচ দুটো তুলে তিনি বিদ্যুৎ-গতিতে মারলেন দু'জন লোকের হাতে। তাদের হাত থেকে রিভলভার ছিটকে পড়ে গেল, দু'জনেই যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল। মান্টো ভয়ের চোটে মাটিতে বসে পড়লেন। সন্তু একটা রিভলভার তুলে নেবার চেষ্টা করতেই দরজায় ঠেস-দেওয়া তৃতীয় লোকটি শান্ত গলায় বলল, “স্টপ দ্যাট ফানি বিজনেস। আই উইল শুট টু কিল !”

কাকাবাবু সেই লোকটির একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, “করো তো গুলি, দেখি তোমার কত সাহস ! আমায় গুলি করলে তোমার নিজের মাথা বাঁচবে ? হানি আলকাদি আমাকে জ্যান্ত অবস্থায় চায়। আমাকে মেরে ফেললে সে কিছুই আর জানতে পারবে না !”

তৃতীয় লোকটি বলল, “হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, তোমাকে জ্যান্ত অবস্থাতেই নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তুমি যদি যেতে অস্বীকার করো তা হলে তোমার পায়ে গুলি করে তোমার আর-একটা পা'ও খোঁড়া করে দিতে কোনো অসুবিধে নেই। তুমি তাই চাও ?”

মাটিতে বসে থাকা অবস্থায় মান্টো বললেন, “রায়চৌধারি. প্লিজ মাথা গরম কোরো না ! ওরা যা বলে তাই-ই করো। ওদের কথা মেনে নাও !”

তৃতীয় লোকটি বলল, “প্রফেসার, তুমি ভালভাবে চলে এসো আমাদের সঙ্গে। তোমার কোনো ক্ষতি করা হবে না !”

কাকাবাবু বললেন, “সেটা ভদ্রভাবে আমাকে আগে অনুরোধ করলেই পারতে। ঘরে ঢুকে গুণ্ডার মতন রিভলভার ওঁচালে কেন ? তোমরা গুণ্ডা না বিপ্লবী ? তোমাদের দেশে আমি অতিথি হয়ে এসেছি, হানি আলকাদির উচিত ছিল নিজে এসে আমার সঙ্গে দেখা করা।

তৃতীয় লোকটি অনুচ্চ গলায় হেসে উঠে বলল, “তুমি সত্যি একজন অদ্ভুত লোক, তা স্বীকার করিছ। হানি আলকাদির নাম শুনলেই সবাই ভয় পায়, আর তুমি তাকে ধমকাচ্ছ !”

কাকাবাবু বললেন, “তাকে আমার ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। আমি একজন ভারতীয় নাগরিক, আমার গায়ে হাত তুললে এ-দেশের সরকার হানি আলকাদিকে ছাড়বে না।”

“এখন কথা কাটাকাটি করার সময় নেই। তুমি এক্ষুনি চলো আমাদের সঙ্গে।”

কাকাবাবু সন্তুর দিকে ফিরে বললেন, “কোনো ভয় নেই, সন্তু। আমি আজ রাত্তিরের মধ্যে যদি না ফিরি, তা হলে তোকে খবর পাঠাব। যদি কোনো খবর না পাস, তা হলে সিদ্ধার্থকে বলবি এখানকার হোম ডিপার্টমেন্ট-এ খবর দিতে।”

মান্টোকে বললেন, “আমার জন্য কিছু চিন্তা কোরো না, তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে !”

তৃতীয় লোকটি সন্তুদের বলল, “আমরা এখান থেকে চলে যাবার দশ মিনিটের মধ্যে ঘর থেকে বেরুবে না। পুলিশে খবর দিয়ে

কোনো লাভ নেই। তোমার আংকেলের খবর আমরা যথাসময়ে জানিয়ে দেব!"

ওরা বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজায় হুড়কো লাগিয়ে দিল।

মান্টো উঠে এসে সন্তুকে ধরে বললেন, "বাপ রে বাপ! তিন তিনটে রিভলভার! আমি আগে কক্ষনো এরকম দেখিনি। যদি একটা থেকে গুলি ফশকে বেরিয়ে আসত! তোমার আংকল কী সাংঘাতিক লোক! আমার এখনও পা কাঁপছে!"

কাকাবাবু যে ক্রাচ দিয়ে দুটো রিভলভারধারীকে হঠাৎ অমন মারতে শুরু করবেন, তা সন্তু এক মুহূর্ত আগেও বুঝতে পারেনি। কাকাবাবুর অমন রুদ্র মূর্তি সে দেখেনি কখনও আগে। এখনও তার বুক ধড়াস ধড়াস করছে।

এরই মধ্যে সন্তু ভাবল, এখন কী করা যায়? কাকাবাবুকে নিয়ে ওরা সিঁড়ি দিয়ে নামছে, টেলিফোন তুলে হোটেলের রিসেপশানিস্টকে সে-কথাটা জানিয়ে দিলে হয় না?

সন্তু সে-কথা মান্টোসাহেবকে বলতেই তিনি সন্তুর হাত চেপে ধরে বললেন, "খবর্দার, ওরকম কিছু করতে যেও না! ওরা যা বলে গেল, তা-ই শুনতে হবে। তুমি জানো না ওরা কত নিষ্ঠুর। ঘরে ঢুকেই কেন যে ওরা গুলি চালাতে শুরু করল না, তাতেই অবাক হয়ে যাচ্ছি। সেটাই ওদের স্টাইল। ওরা কারুকে কোনো কথা বলার সুযোগ দেয় না!"

সন্তুর গলা শুকিয়ে গেছে। সে জলের বোতল নিয়ে ঢকঢক করে অনেকটা জল খেয়ে নিল।

তারপর খানিকটা চাঙ্গা হয়ে নিয়ে বলল, "কাকাবাবু জানতেন, ওরা গুলি করবেন না। বুঝলেন না, সব জিনিসটাই রয়েছে কাকাবাবুর মাথার মধ্যে। উনি নিজে থেকে না বললে কেউ ওঁর কাছ থেকে জোর করে কথা বার করতে পারবে না!"

মান্টো বিরক্তভাবে বললেন, "হুঁঃ! কী যে ঝঞ্ঝাট! এসো, বিছানায় বসে থাকি, দশ মিনিট কাটুক। দিনের বেলা হোটেলের ঘর থেকে একজনকে ধরে নিয়ে গেল? ছি, ছি, ছি, কী যে হয়ে গেল দেশটা! দশ মিনিট বাদে আমাদের এই ঘর থেকে কে বার করবে যদি কেউ এসে দরজা খুলে না দেয়?"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা মিঃ মান্টো, আপনি হানি আলকাদিকে নিজের চোখে দেখেছেন কখনও?"

"না। দেখিনি, দেখতেও চাই না! তবে কাগজে ছবি দেখেছি অবশ্য!"

"আমার ভয় হচ্ছে। কাকাবাবুকে কেউ হুকুমের সুরে কথা বললে উনি কিছুতেই তা শুনতে চান না। সেইজন্য ওরা রাগের মাথায় যদি কাকাবাবুকে কিছু করে বসে!"

"তোমার কাকাবাবুর উচিত ছিল এরকম কাজের ভার না নেওয়া! মুফতি মহম্মদের শেষ ইচ্ছে কী ছিল, তা যাচাই করে দেখা ওঁর কী দরকার! আচ্ছা, ইয়াংম্যান, তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি জানো মুফতি মহম্মদের শেষ ইচ্ছে কী ছিল? আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে।"

সন্তু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "কাকাবাবু আমাকে কিছু বলেননি। তবে আমি অনেকটা আন্দাজ করেছি। কিন্তু মাফ করবেন, আমার আন্দাজটাও আমি আপনাকে এখন জানাতে পারব না!"

॥ ৭ ॥

কাকাবাবু ইজিপ্টে আগে এসেছিলেন, কায়রো শহর এবং কাছাকাছি অনেকগুলো জায়গা তাঁর বেশ চেনা। এরা তাঁর চোখ বাঁধেনি। হোটেলের বাইরে এসে একটা জিপগাড়িতে তুলেছে। পাশে কেউ রিভলভার উঁচিয়ে নেই। এরা বুঝেছে যে, এই মানুষটিকে অযথা ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ হবে না।

কায়রো শহর থেকে পাঁচ-ছ'মাইল দূরেই তিনটি পিরামিড পাশাপাশি। কাছেই জগৎ-বিখ্যাত স্ফিংকস। এখন টুরিস্ট সিজ্‌ন না হলেও স্ফিংকসের সামনে মোটামুটি ভিড় আছে। এই দুপুর-রোদের মধ্যেও। সেখানে রয়েছে অনেক উটওয়ালা আর ক্যামেরাম্যান। এরা টুরিস্টদের একেবারে কান ঝালাপালা করে দেয়।

কাকাবাবু লক্ষ করলেন, গাড়িটা এই জায়গার পাশ দিয়ে এগিয়ে চলল মেমফিসের দিকে। আগেকার তুলনায় এই রাস্তায় অনেক বেশি বাড়িঘর তৈরি হয়ে গেছে। মধ্যে-মধ্যে দু'একটা উঁচু-উঁচু সরকারি বাড়ি। আগে এ-রাস্তায় অনেক খেজুরগাছ ছিল, এখন আর চোখে পড়ে না।

মেমফিস বেশি দূর নয়। কায়রো থেকে দশ-বারো মাইল। সড়ক-পথে খানিকটা যাবার পরেই শুরু হয়ে যায় মরুভূমি। গাড়িটা কিন্তু মেমফিসের দিকে গেল না, ধুধু মরুভূমির মধ্যে ছুটতে শুরু করল।

কাকাবাবু ভাবলেন, আগেকার দিনে আরবসর্দাররা মরুভূমির মধ্যে তাঁবু খাঁটিয়ে থাকত দলবল নিয়ে। এখন আরবরা অনেক বড়লোক হয়ে গেছে, তারা এয়ার-কণ্ডিশানড বাড়িতে থাকে। হানি আলকাদি কি এখনও পুরনো কায়দা বজায় রেখেছে? নইলে এই মরুভূমির মধ্যে তাঁকে নিয়ে যাচ্ছে কোথায়? গাড়ির কোনো লোক একটিও কথা বলছে না। কাকাবাবুও তাদের কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

প্রায় ঘন্টাখানেক চলার পর দূরে দেখা গেল ভাঙা দেওয়াল-ঘেরা একটা প্রাচীন প্রাসাদ। তার অনেক ঘরই ভেঙে পড়েছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় সেখানে মানুষজন থাকে না। কিন্তু কাছে এলে দেখা যায়, একটা উঁচু পাঁচিলের আড়ালে দুটো উট বাঁধা আছে আর তিনখানা স্টেশান ওয়াগন।

জিপটা থামবার পর অন্যরা কিছু বলবার আগেই কাকাবাবু নিজেই নেমে পড়লেন। ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন চারদিকটা।

একজন কাকাবাবুকে বলল, "ফলো মি!"

খানিকটা ধ্বংসস্তূপ পার হবার পর ওরা এসে পৌঁছল একটা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পাথরের ঘরে। সেখানে খাট-বিছানা পাতা আছে। রয়েছে একটা ছোট টেবিল, কয়েকটা চেয়ার। দেওয়ালের গায়ে একটা কাঠের আলমারি, সেটা বন্ধ।

সঙ্গে যে লোকটি এসেছিল, সে কাকাবাবুকে বলল, "তুমি এইখানে বিশ্রাম নাও! তোমার কি খিদে পেয়েছে? তা হলে খাবার পাঠিয়ে দিতে পারি।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি বিশ্রাম নিতে চাই না, আমার জন্য খাবার পাঠাবারও দরকার নেই। আমি এক্ষুনি হানি আলকাদির সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

লোকটি বলল, "অল ইন গুড টাইম। ব্যস্ত হচ্ছ কেন? এখন বিশ্রাম নাও কিছুক্ষণ। আশা করি তুমি এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করবে না। এই মরুভূমির বালির ওপর দিয়ে তোমার ওই ক্রাচ নিয়ে তুমি এক মাইলও যেতে পারবে না!"

লোকটা দরজা খোলা রেখেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কাকাবাবু চোখ বুজে, কপালটা কুঁচকে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। লোকটা একটা নিষ্ঠুর সত্যি কথা বলে গেছে। একটা পা অকেজো বলে এখন আর চলাফেরার স্বাধীনতা নেই তাঁর। যে কাজের জন্য তিনি এসেছেন, তার জন্য দু'খানা জোরালো পা থাকা খুবই দরকারি। অনেকদিন বাদে তিনি ভাঙা পা'খানার জন্য দুঃখ বোধ করলেন।

একটু বাদে কাকাবাবু শুয়ে পড়লেন খাটে। দুপুরে খাওয়া হয়নি তাঁর, বেশ খিদে পাচ্ছে, কিন্তু এদের এখানে তিনি খেতে চান না। ভেতরে ভেতরে তাঁর এখনও খুব রাগ জমে রয়েছে। একবার রাগ হলে সহজে কাটতে চায় না।

শুয়ে পড়বার পর তিনি দেখলেন বালিশের পাশে দু'খানি বই। কৌতূহলের বশে তিনি প্রথমে একটি বই তুলে নিলেন। সেটি কমপ্লিট ওয়ার্কস অব শেক্সপিয়ার। কাকাবাবু দারুণ অবাক হলেন। এই মরুভূমির মধ্যে, একটা প্রায় ভগ্নস্তূপের মধ্যে শেক্সপিয়ারের কবিতা! অন্য বইটি দেখে আরও অবাক হলেন। সেটাও ইংরেজি কবিতা, 'সং অফারিংগ্‌স' বাই স্যার আর· এন· টেগোর!

কাকাবাবু বিহ্বলভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতার বইটা হাতে নিয়ে পাতা ওল্টালেন। বইখানি এমনি-এমনি এখানে পড়ে নেই। কেউ একজন মন দিয়ে পড়েছে। অনেক কবিতার লাইনের তলায় লাল কালির দাগ দেওয়া!

প্রায় আধ ঘন্টা বই দুটো নিয়ে নাড়চাড়া করবার পর একটা শব্দ শুনে কাকাবাবু মুখ তুলে তাকালেন।

দেওয়াল-আলমারিটার পাল্লা খুলে গেছে। সেটা আসলে একটা দরজা। তার পাশ দিয়ে নেমে গেছে মাটির নীচে সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে একজন লোক দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে।

লোকটিকে দেখে প্রথমেই কাকাবাবুর মনে হল সিনেমার নায়ক। অপূর্ব সুন্দর তার চেহারা। অন্তত ছ'ফুট লম্বা, চমৎকার স্বাস্থ্য, গৌর বর্ণ, টিকোলো নাক, মাথার চুল আধা-কোঁকড়ানো। মুখে সরু দাড়ি। সে পরে আছে একটা ব্লু জিন্‌স আর ফিকে হলদে টি শার্ট। সেই শার্টে একটা সিংহের মুখ আঁকা। তার কোমরে একটা বুলেটের বেল্ট, আর দু'পাশে দুটো রিভলভার। সে দুটোর বাট আবার সাদা। লোকটির বয়েস তিরিশ-বত্রিশের বেশি নয়।

লোকটিকে দেখে কাকাবাবুর হাসি পেয়ে গেল।

লোকটি অর্ধেক ঠোঁট ফাঁক করে হেসে নিখুঁত উচ্চারণে ইংরিজিতে বলল, "হ্যালো, মিঃ রায়চৌধুরী, গুড আফটারনুন। আশা করি তোমার এখানে আসতে কোনো অসুবিধে হয়নি?"

কাকাবাবু আস্তে-আস্তে বললেন, "তুমিই হানি আলকাদি?"

লোকটি সামনের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে 'হ্যাঁ' বলল। তারপর মেঝেতে নেমে এসে বলল, "ঘরের মধ্যে এখনও গরম, বাইরে কিন্তু চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে। চলো আমরা বাইরে গিয়ে বসি। তোমাকে আমরা ফাইনেস্ট ইণ্ডিয়ান টি খাওয়াব। সেই সঙ্গে ফিশ কাবাব! তোমরা বেঙ্গলিরা তো ফিশ ভালবাসো!"

কাকাবাবু বললেন, "ওসব প্লেজানট্রিস বন্ধ করো। আগে আমি তোমার কাছ থেকে কয়েকটা এক্সপ্লানেশান চাই। তুমি আমাকে এখানে ধরে আনিয়েছ কেন? আমি ভারতীয় নাগরিক, আমাকে বন্দী করার কী অধিকার আছে তোমার?"

হানি আলকাদি খুব অবাক হবার ভান করে বলল, "ধরে এনেছি? মোটেই না! তোমার কি হাত বাঁধা আছে? তোমাকে আমি নেমন্তন্ন করে এনেছি। তুমিই তো শুনলুম আমার দু'জন লোককে হাতে এমন মেরেছ যে, এক বেচারির কব্জি মুচকে গেছে!"

কাকাবাবু স্থির দৃষ্টিতে হানি আলকাদির চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "তোমাদের দেশে বুঝি রিভলভার উঁচিয়ে নেমন্তন্ন করাই প্রথা? আমি আগেও এখানে এসেছি, অনেক নেমন্তন্ন খেয়েছি, কোনোদিন তো এরকম দেখিনি?"

হানি আলকাদি লজ্জিত ভাব করে বলল, "আরে ছি ছি ছি, হোয়াট আ শেম! আমার লোকেরা এরকম বাড়াবাড়ি করে ফেলে! আমি মোটেও সেরকম নির্দেশ দিইনি। অবশ্য তোমার সব কথা শুনেটুনে ওরা একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। মিঃ রায়চৌধুরী, আমি সত্যি বলছি, আমরা এখানে অনেকেই ভারতীয়দের খুব পছন্দ করি। আমি তোমাদের রবীন্দ্রনাথ টেগোরের খুব ভক্ত। সবাই আমাকে বিপ্লবী বলে জানে, কিন্তু আমি একজন কবিও বটে। ছদ্মনামে আমার দুটো কবিতার বই বেরিয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "রবীন্দ্রনাথের কোনো ভক্ত কোমরে দুটো

পিস্তল ঝুলিয়ে রাখে, এটা দেখা আমার পক্ষে একটা নতুন অভিজ্ঞতা বটে। যাক গে যাক, আমি তোমার কাছে জানতে চাই···"

হানি আলকাদি এগিয়ে এসে কাকাবাবুর ক্রাচ দুটো তুলে ধরে বলল, "তুমি বড্ড রেগে আছ। এই নাও, বাইরে চলো, আকাশটা কী সুন্দর হয়ে আছে এখন, দেখলে তোমার মন ভাল হয়ে যাবে!"

অগত্যা কাকাবাবু বাইরে বেরিয়ে এলেন। সেখানকার ফাঁকা চত্বরে একটা টেবিল ও দুটি চেয়ার পাতা হয়েছে। কিছু লোকজন সেখানে খাবারদাবার আর চায়ের পট সাজিয়ে দিচ্ছে। আকাশটার একপ্রান্তে টকটকে লাল। তার পরের দিকটার মেঘে অনেক রঙের খেলা। বড় অপূর্ব দৃশ্য।

কাকাবাবু তবু বললেন, "শোনো হানি আলকাদি, আমার কতকগুলো প্রিন্সিপ্‌ল আছে। তোমার সঙ্গে বসে আমি খাবার কেন, এক গেলাশ জলও খাব না। কারণ তুমি খুনি। তুমি বিনা দোষে আমাকে হত্যা করবার জন্য একজনকে পাঠিয়েছিলে দিল্লিতে!"

হানি আলকাদি বলল, "তোমাকে হত্যা করতে? মোটেই না! তা হলে এটা দ্যাখো!" বলেই চেঁচিয়ে ডাকল, "মোসলেম! মোসলেম!"

অমনি একজন লোক বেরিয়ে এল পাশের একটা গলি থেকে। কাকাবাবু তাকে দেখেই চিনতে পারলেন। এই লোকটাই দিল্লিতে তাঁর আততায়ী হয়ে এসেছিল এক রাত্তিরে।

হানি আলকাদি অনেক দূরের একটা খেজুরগাছ দেখিয়ে সেই লোকটিকে কী যেন বলল আরবি ভাষায়। তারপর নিজের একটা রিভলভার দিল লোকটির হাতে।

লোকটি চোখ বন্ধ করে এক পাশ ফিরে গুলি করল। নিখুঁত লক্ষ্যভেদে উড়ে গেল খেজুরগাছের ডগাটা।

হানি আলকাদি যেন তাতেও খুশি হল না। লোকটির পাশে গিয়ে ধমক দিয়ে কী যেন বলতে লাগল। লোকটি আবার রিভলভার তুলে গুলি ছোঁড়ার জন্য তৈরি হল। ট্রিগার টিপতে যাবে এমন সময় হানি আলকাদি চেঁচিয়ে বলল, "ব্লাডি ফুল! লুক বিহাইণ্ড!" বলেই লোকটির কাঁধের ওপর একটা থাপ্পড় কষাল।

লোকটি তবুও গুলি ছুঁড়ল এবং এবারেও খেজুরগাছটার ডগার খানিকটা অংশ উড়ে গেল।

হানি আলকাদি হাসতে-হাসতে কাকাবাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "দেখলে ? দেখলে তো ? এই মোসলেম আমার বডিগার্ড। পৃথিবীতে যেখানেই যাই, ওকে সঙ্গে নিয়ে যাই। ওর মাথা ঠাণ্ডা। টিপ অব্যর্থ। তোমার কাছে ওকে পাঠিয়েছিলাম শুধু তোমাকে একটুখানি আঘাত দেবার জন্য। তোমাকে প্রাণে মেরে ফেলতে চাইলে ও ঠিকই মেরে আসত ! তখনও তোমার সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছু জানতুম না। তোমাকে একটু ভয় দেখিয়ে আমাদের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলুম।"

হঠাৎ কাকাবাবুর একটা হাত জড়িয়ে ধরে হানি আলকাদি খুবই অনুতপ্ত গলায় বলল, "তোমাকে আঘাত দিতে হয়েছিল বলে আমি ক্ষমা চাইছি। ঐ যে বললুম, তখন তোমার সম্পর্কে ভাল করে জানা ছিল না। আমরা ভেবেছিলুম, তুমি আল মামুনের একটা ভাড়াটে লোক !"

হানি আলকাদির এতখানি বিনীত ব্যবহার দেখে কাকাবাবু অভিভূত হয়ে গেলেন। কোমরে দু'দুটো পিস্তল থাকলেও লোকটি সত্যিই একজন কবি !

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, এবারে বুঝেছি। আমার অবশ্য বেশি আঘাত লাগেনি !"

"চলো, তা হলে কিছু খেয়ে নিই। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। তুমি নিশ্চয়ই জানো যে, ভাল জাতের ভারতীয় চা একটু ঠাণ্ডা হলেই বিস্বাদ হয়ে যায়।"

দু'জনে এসে বসলেন টেবিলে। হানি আলকাদি যত্ন করে কাকাবাবুর প্লেটে খাবার তুলে দিল। চা বানাল সে নিজেই। কাকাবাবু চা পান করতে করতে আকাশে সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখতে লাগলেন।

চা শেষ করে হানি আলকাদি একটা চ্যাপ্টা ধরনের সিগারেট ধরাল। তারপর কাকাবাবুর দিকে ডান হাত বাড়িয়ে বলল, "এবারে দাও !"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী ?"

"মুফতি মহম্মদের উইল ! তারপর আমার লোকেরা তোমাকে হোটেলে পৌঁছে দেবে।"

"যদি আমি না দিই ?"

"তা হলে তুমি আমাদের এখানেই সম্মানিত অতিথি হয়ে থাকবে। আমরা রোজ তোমাকে অনুরোধ করব। যাতে তুমি দিয়ে দাও ! কিংবা সেগুলো কোথায় আছে তুমি বলে দাও ! মিঃ রায়চৌধুরী, আমাদের গুরু মুফতি মহম্মদের সম্পদ আটকে রেখে তোমার কী লাভ ? তা তো তুমি নিজে ভোগ করতে পারবে না। তুমি কি তা ইজিপ্টের বাইরে নিয়ে যেতে পারবে ? সে সব দিন আর নেই !"

"শোনো হানি আলকাদি, তেমাদের গুরু মুফতি মহম্মদের কোনো সম্পদ ছিল কি ছিল না তা আমি জানি না। থাকলেও তা ভোগ করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই। তিনি তো ফকির ছিলেন শুনেছি, তাঁর সম্পদ সম্পর্কে তোমাদের এত আগ্রহ কেন ?"

"ফকির হবার আগে তিনি এক বিরাট বিপ্লবী দলের নেতা ছিলেন। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আর টাকা ছিল তাঁর দলের। সে-সব কোথায় গেল ?"

"তিনি তো বিপ্লবী দল ভেঙে দিয়েছেন প্রায় চল্লিশ বছর আগে। এতদিনেও তোমরা তার সন্ধান পাওনি ?"

"না। কেউ তা পায়নি। ওঁকে কেউ ঘাঁটাতে সাহস করত না। কিন্তু মৃত্যুকালে তিনি নিশ্চয়ই সব বলে দিয়ে গেছেন। সেই সন্ধানই আমরা জানতে চাই ! উনি যে ছবিগুলো এঁকেছিলেন, সেগুলো আমাদের দিয়ে দাও !"

"সেগুলো তো আমার কাছে নেই। আল মামুন সেগুলো শুধু আমাকে দেখতে দিয়েছে, আমাকে তো দেয়নি

"ইয়া আল্লা ! আমরা বরাবর ভেবেছি, সেগুলো তুমিই লুকিয়ে রেখেছ। আল মামুনের একটা লোককে আমরা ধরে এনে টর্চার করেছিলুম, সেও ঐ কথাই বলেছে !"

"না, তা নয়। ছবিগুলোতে কী লেখা আছে তা একমাত্র আমি জানি। ছবিগুলো আল মামুন নিজের কাছেই রেখেছে, কিন্তু ওতে কী লেখা আছে তা ও কিছুই জানে না। অবশ্য ও লণ্ডনে লর্ড পেমব্রোকের কাছে ছবিগুলো নিয়ে যেতে পারে, তিনি আমার চেয়ে অনেক ভালভাবে ওগুলো ডিসাইফার করে দিতে পারবেন।"

"মিঃ রায়চৌধুরী, তুমি কি জানো না, লর্ড পেমব্রোক মাত্র দু'সপ্তাহ আগে মারা গেছেন ? সুতরাং এখন পর্যন্ত শুধু তুমিই ওগুলোর অর্থ জানো ! দেরি করার সময় নেই। আজই আমরা সব কিছু জানতে চাই।"

"আল মামুনও ছবিগুলোর অর্থ জানতে চেয়েছিল। তাকে বলিনি। তা হলে তোমাদের বলব কেন ?"

এই প্রথম হানি আলকাদি রেগে উঠল। টেবিলের ওপর এমন জোরে একটা ঘুসি মারল যে, কাপ-প্লেটগুলো কেঁপে উঠল ঝনঝন করে। তার ফর্সা মুখখানা টকটকে লাল হয়ে গেছে।

সে বলল, "কী বলছ তুমি, আমাদের সঙ্গে ঐ পিশাচটার তুলনা ? আমরা বিপ্লবী, আমরা কেউ নিজেদের স্বার্থের কথা ভাবি না ! আর ঐ লোকটা, ঐ আল মামুন, ও তো একটা ঘৃণ্য লোভী মানুষ। ওর অনেক টাকা, তবু ওর টাকার আশ মেটে না। ও মুফতি মহম্মদকে দিল্লিতে চিকিৎসা করাতে নিয়ে গিয়েছিল শুধু এই লোভে যে, যদি মুফতি মহম্মদ শেষ পর্যন্ত ওকেই সব কিছুর সন্ধান বলে দেন ! ওকে আমি খুন করব নিজের হাতে।"

কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "সে তোমরা যা ইচ্ছে করো। এর মধ্যে আমাকে জড়াচ্ছ কেন ?"

হানি আলকাদি নিজের রাগ খানিকটা সামলে নিল। তারপর সেও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তোমাকে জড়াচ্ছি, তার কারণ, তুমিই এখন পর্যন্ত মুফতি মহম্মদের উইলের অর্থ জানো। তুমি যদি আমাদের বলতে না চাও, তা হলে আর কেউ যাতে জেনে না ফেলে, সেজন্য আমরা তোমার মুণ্ডুটা কেটে ফেলতে বাধ্য হব

কাকাবাবু বললেন, "ইউ আর ওয়েলকাম। আমার কাটা মুণ্ডু কোনো কথা বলবে না !"

হানি আলকাদি এবারে হঠাৎ কাকাবাবুর পায়ের কাছে বসে পড়ে বলল, "মিঃ রায়চৌধুরী, তুমি টেগোরের দেশের লোক, গান্ধীর দেশের লোক, তোমরা ভায়োলেন্সকে ঘৃণা করো, তা আমরা জানি। কিন্তু তোমরা তো আমাদের এদিককার দেশগুলোর অবস্থা জানো না ! সে যাই হোক, তোমার মুণ্ডু কাটার কথা আমি এমনিই রাগের মাথায় বলে ফেলেছি। তুমি আমাদের বলো বা না-ই বলো, আমরা তোমার কোনোই ক্ষতি করব না। তবু আমি কাতরভাবে তোমার সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমাদের দল এখন এমন অবস্থায় রয়েছে, প্রচুর টাকা ও অস্ত্রশস্ত্র না পেলে আমরা আর কাজ চালাতে পারব না ! সেইজন্যই মুফতি মহম্মদের উইলের ওপর আমরা এত আশা রেখেছি !"

কাকাবাবু হানি আলকাদির কাঁধ ধরে বললেন, "ওঠো, চেয়ারে বোসো ! শোনো, তোমাকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। তোমাকে আমি খোলাখুলি বলছি, মুফতি মহম্মদ শেষ উইল করেছিলেন কি না, তা আমি জানি না। সত্যিই জানি না !"

"মিঃ রায়চৌধুরী, তোমাকে আমি বিশ্বাস করছি। তা হলে বলো, ছবিতে এঁকে এঁকে উনি কী বুঝিয়েছিলেন ?"

"সেটা বলতে পারো এক ধরনের ছেলেমানুষি। একজন সাতানব্বই বছরের বৃদ্ধের শেষ কৌতুক। সেটা জেনে তোমার বা

আল মামুনের কোনোই লাভ হবে না। বরং আমার মতন যে-সব লোক ইতিহাসের ব্যাপারে কৌতূহলী, তাদেরই আগ্রহ হবে। মুফতি মহম্মদ আমাকে আদেশ করেছেন যে, সেটা আমি যাচাই করার আগে যেন কারুকে না বলি। সেটা যাচাই করার পর আমি তোমাকে বলব নিশ্চয়ই। কিন্তু তার আগে আমাকে তোমার কয়েকটা সাহায্য করতে হবে।"

"কী সাহায্য বলো ?"

"আমাকে একটা পিরামিডের মধ্যে ঢুকতে হবে। হয়তো একটা সমাধি-কুয়োর মধ্যেও নামতে হতে পারে। এজন্য গাইড চাই, উট চাই, আরও কিছু সরঞ্জাম চাই। তুমি যদি সে-সব ব্যবস্থা করে দাও, তা হলে আমি কথা দিচ্ছি, আমি যদি কোনো গুপ্ত সম্পদের সন্ধান জানতে পারি, তবে তা তোমাকেই আগে জানাব।"

হানি আলকাদি ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, "ইটস্ আ ডিল ! তুমি কবে রওনা হতে চাও বলো ? কাল সকালে ?"

কাকাবাবু বললেন, "তার আগে দু'একটা কাজ আছে। মেমফিসে ডাগো আবদাল্লা নামে পুরনো একজন গাইডকে আমি চিনতাম। সে যদি বেঁচে থাকে, তাকে আমার দরকার হবে। আর হোটেল ওয়েসিস থেকে আমার ভাইপো সন্তুকেও আনাতে হবে এখানে। তাকে আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, তুমি পৌঁছে দিতে পারবে ?"

হানি আলকাদি বলল, "তুমি এক্ষুনি চিঠি লেখো। দু'ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে। ডাগো আবদাল্লাও বেশ বহাল তবিয়তেই বেঁচে আছে। তাকে আমি আনিয়ে দিচ্ছি।"

তারপরই সে তার লোকজনদের হুকুম করল কাগজ আর কলম আনবার জন্য। সে-সব এসে গেলে কাকাবাবু চিঠি লিখতে শুরু করলেন !

স্নেহের সন্তু,

আমি ভাল আছি। এরা আমাকে বেশ যত্নে রেখেছে। হানি আলকাদি লোকটি মন্দ না, তার সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেছে। এরপর এখান থেকে আমরা একটা অভিযানে বেরুব, সেজন্য তোকে আসতে হবে এখানে। তোকে যা করতে হবে তা বলছি। এই চিঠি যে নিয়ে যাবে, সে কাল সকালে তোকে একটা উট ভাড়া করে দেবে। সেই উটে চেপে তুই মেমফিসে চলে আসবি। সেখানে স্টেপ পিরামিড আছে, চিনতে তোর অসুবিধে হবে না। অন্য পিরামিডের চেয়ে এর চেহারাটা একেবারেই আলাদা এর বাইরের গা দিয়ে ধাপে ধাপে সিঁড়ির মতন উঠে গেছে। তুই সেখানে এসে অপেক্ষা করবি। এখানকার লোক তোকে গিয়ে নিয়ে আসবে।

চিন্তার কিছু নেই। কাল সন্ধের মধ্যেই দেখা হবে।

ইতি কাকাবাবু

পুনশ্চ সিদ্ধার্থকে সঙ্গে আনবার কোনোই দরকার নেই। ওকে বুঝিয়ে বলবি, আমরা যে-কাজে যাচ্ছি, তাতে সরকারি লোকজনদের না জড়ানোই ভাল। মান্টোকে বলবি, আমি আর তিন-চারদিন পরে ওর সঙ্গে মিউজিয়ামে গিয়ে দেখা করব !

॥ ৮ ॥

বিমান বলল, "আরে সন্তু, তুই এত ঘাবড়াচ্ছিস কেন ? কাকাবাবু তো চিঠিতে লিখেছেন সিদ্ধার্থদাকে সঙ্গে নিয়ে না যেতে। আমাদের কথা তো বারণ করেননি। তাছাড়া আমি তো সেই সেন্সে ঠিক টেকনিক্যালি সরকারি লোক নই !"

সন্তু মুখ গোঁজ করে বলল, "যাই বলো বিমানদা, চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে কাকাবাবু আমাকে একলাই যেতে বলেছেন। অন্য কারুর সাহায্য নেবার দরকার হলে তা নিশ্চয়ই জানাতেন।"

বিমান বলল, "তুই কিছু বুঝিস না। বন্দী অবস্থায় কেউ অত কিছু লিখতে পারে ? ঐ যে কাকাবাবু লিখেছেন না 'এরা আমাকে খুব যত্নে রেখেছে', তার মানে কী বুঝলি তো ? দু'পাশে দু'জন লোক লাইট মেশিনগান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে !"

রিনি বলল, "আমি তো যাবই ! শুধু ছেলেরাই বুঝি একা-একা অ্যাডভেঞ্চার করবে !"

বিমান বলল, "নিশ্চয়ই যাবি ! আথেন্স থেকে হুড়োহুড়ি করে চলে এলুম, তার আগেই দেখি যত সব কাণ্ড ঘটে গেছে। আমি থাকলে কি আর ওরা কাকাবাবুকে ধরে নিয়ে যেতে পারত ?"

সিদ্ধার্থ জিজ্ঞেস করল, "তুমি থাকলে কী করতে, বিমান ? শুনলেই তো যে তিনজন লোক এসেছিল, উইথ আর্মস। কাকাবাবু দু'জনকে টিট করেছিলেন, কিন্তু থার্ড লোকটা ছিল সত্যিকারের টাফ্।"

বিমান বলল, "আমি থাকলে তাকে একখানা স্কোয়ার কাট ঝাড়তুম ! জিজ্ঞেস করো না সন্তুকে, সুন্দরবনে 'খালি জাহাজের রহস্য' সমাধান করতে গিয়ে আমি ক'টা লোককে শায়েস্তা করেছিলুম।"

সন্তুর এসব কথাবার্তা একদম পছন্দ হচ্ছে না। সে ছটফট করছে কখন বেরিয়ে পড়বে।

আগের দিন কাকাবাবুকে ধরে নিয়ে যাবার পর সন্তু আর মান্টোসাহেব এক ঘন্টার আগে ছাড়া পায়নি। দশ মিনিট পরে ওরা রিসেপশনে ফোন করেছিল, কেউ উত্তর দেয়নি। ফোনের লাইন কাটা ছিল। ওরা দরজায় ধাক্কা দিয়েছে, কেউ সাড়া দেয়নি। সে এক বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। শেষ পর্যন্ত এক ঝাড়ুদার দরজা খুলে দিয়েছিল।

মান্টোসাহেব একটু পরেই চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু সন্তু চুপচাপ বসে ছিল ঘরের মধ্যে। সেইরকমই ছিল কাকাবাবুর নির্দেশ।

সন্ধেবেলা সিদ্ধার্থ এসে সব শুনে হতবাক। এরই মধ্যে কাকাবাবুকে গুম করেছে ? দিনদুপুরে ? সিদ্ধার্থ তক্ষুনি একটা হৈচৈ বাধিয়ে তুলতে চেয়েছিল, কিন্তু সন্তু তাকে নিষেধ করেছে। আগেকার অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে যে, বিপদ দেখলে একেবারে ঘাবড়ে গেলে চলে না। কাকাবাবু বলে গেছেন কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। তার মধ্যে কোনো খবর না দিলে তারপর এখানকার গভর্নমেন্টকে জানাতে হবে। এখন চুপচাপ থাকাই ভাল।

সিদ্ধার্থ সন্তুকে তখন নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, তাতেও সন্তু রাজি হয়নি। কাকাবাবু খবর পাঠাবেন এই হোটেলেই। এখানেই সন্তুকে অপেক্ষা করতে হবে। সিদ্ধার্থ বলেছিল, "তুমি রাত্তিরে এই হোটেলে একলা থাকবে ? তা হতেই পারে না। আবার যদি হামলা হয় ?"

সে-সমস্যার সমাধান হয়ে গেল একটু পরেই। রাত আটটার সময় সেই হোটেলে এসে হাজির হয়ে গেল বিমান। আথেন্স থেকে সে অন্য একটা ফ্লাইট ধরে চলে এসেছে। ঠিক হল, বিমানই থাকবে সন্তুর সঙ্গে ঐ হোটেল-ঘরে।

প্রায় মাঝরাত্তিরে কাকাবাবুর চিঠি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল একজন লোক। মাঝবয়েসি, মোটাসোটা গোলগাল ধরনের চেহারা। মাথাভর্তি চকচকে টাক। দেখলে বিপ্লবী বলে মনেই হয় না।

ভদ্রলোক বললেন, তিনি একটি কুরিয়ার সার্ভিস এজেন্সির লোক। তাঁর এক মক্কেল এই জরুরি চিঠি পাঠিয়েছে, এবং তাঁকে বলা হয়েছে কাল সকালে একটা উট ভাড়া করে দেবার ব্যবস্থা করে দিতে। কাল ঠিক সাড়ে এগারোটায় উট তৈরি থাকবে স্ফিংকসের সামনে। এদিককার পার্টি যেন বাসে করে সেখানে ঠিক-সময়ে পৌঁছে যায়।

বিমান সেই লোকটিকে জিজ্ঞেস করেছিল, "আপনার মক্কেল কে ? কোথা থেকে এই চিঠিটা এসেছে ?"

ভদ্রলোক হেসে বলেছিলেন, "তা বলা যাবে না। বিজনেস সিক্রেট। গুড নাইট !"

চিঠি পড়েই সন্তু ঠিক করেছিল সে একাই যাবে। কিন্তু বিমান ঝামেলা বাধাল। সন্তুকে সে কিছুতেই একা ছাড়বে না। তা ছাড়া সে নিজেও অ্যাডভেঞ্চার করতে চায়। রিনিরও সেই একই আবদার।

সন্তু অনেকবার আপত্তি করার পর বিমান বলল, "আচ্ছা, ঠিক আছে ! তুই উটের পিঠে চেপে মেমফিস যাবি, আমরা বুঝি আর একটা উট ভাড়া করে তোর পাশাপাশি যেতে পারি না ! অন্য টুরিস্টরা যাবে না ? যে-কেউ ইচ্ছে করলে মেমফিসের পিরামিড দেখতে যেতে পারে।"

শেষ পর্যন্ত তাই ঠিক হল। স্ফিংকসের কাছে এসে সন্তু তার জন্য নির্দিষ্ট উটে চাপল, বিমান আর রিনি বসল আর-একটা ভাড়া-করা উটে।

স্ফিংকস আর কাছাকাছি পিরামিডগুলোতে সকালবেলাতেই অনেক টুরিস্ট এসেছে। সন্তু সতৃষ্ণভাবে একবার স্ফিংকসের দিকে তাকাল। তার ভাল করে দেখা হল না।

বিমান বলল "জানিস সন্তু, সন্ধেবেলা এখানে সনে-লুমিয়ের হয়। আলোর খেলাতে পুরনো মিশরের ইতিহাস দেখতে পাওয়া যায়।"

রিনি বলল, "আমাদের দিল্লিতে লালকেল্লায় যে-রকম আছে ?"

সন্তুর এসব কথায় মন লাগছে না। সে খালি ভাবছে, কখন কাকাবাবুর কাছে পৌঁছবে। সে শুনেছে, আরব গেরিলারা মানুষ খুন করতে একটুও দ্বিধা করে না।

উটের পিঠে চাপার অভিজ্ঞতাও সন্তুর এই প্রথম। সমস্ত শরীরটা দোলে। সামনে ধুধু করছে মরুভূমি। সন্তুর হঠাৎ যেন সব ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য মনে হল। সে স্বপ্ন দেখছে না তো ? সত্যিই কি সে উটের পিঠে চেপে মরুভূমি পার হচ্ছে ?

মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের কবিতা।

ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন
চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন !

পাশ থেকে বিমান বলল, "দেখবি কাল গায়ে কীরকম ব্যথা হয়। তখন উটে চড়ার মজাটা টের পাবি। বিছানায় শোবার বদলে সারা রাত ইচ্ছে করবে দাঁড়িয়ে থাকতে।"

রিনি জিজ্ঞেস করল, "আমরা কি আজই ফিরে আসব ?"

বিমান বলল, "এই রে, এরই মধ্যে ফেরার চিন্তা ? চল্ তা হলে এক্ষুনি তোকে ফিরিয়ে দিয়ে আসি।"

রিনি বলল, "মোটেই না ! আমি সে-কথা বলছি না। আমি বলছি, পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে ?"

বিমান বলল, "দু'ঘন্টাও লাগতে পারে, আবার সারাদিনও লেগে যেতে পারে। উটের যেরকম মেজাজ মর্জি হবে।"

রিনি জিজ্ঞেস করল, "এই সন্তু, তুই কথা বলছিস না কেন রে ? তুই গোমড়া মুখে রয়েছিস সকাল থেকে... "

গতকাল এয়ারপোর্টে রিনি যে সন্তুকে অপমান করেছিল তা বোধহয় সে নিজেই ভুলে গেছে। তারপর থেকেই সন্তুর আর কথা বলার ইচ্ছে নেই রিনির সঙ্গে।

সন্তুর উটটা যে চালাচ্ছে, তার বয়েস প্রায় সন্তুরই সমান। সে দু'চারটে ইংরিজি শব্দ মোটে জানে। সন্তু কিছু জিজ্ঞেস করলে 'ইয়েস মাস্টার, নো মাস্টার' বলে।

ওদের দুটো উট ছাড়া আর-কোনো টুরিস্ট যাচ্ছে না উটের পিঠে চেপে। অসহ্য গরম, রোদ একেবারে গনগন করছে। এত গরমেও কিন্তু একটুও ঘাম হয় না।

মাত্র আধ ঘন্টা চলার পরেই মনে হল দূর থেকে একটা বিশাল কালো রঙের ধোঁয়ার কুণ্ডলি তেড়ে আসছে ওদের দিকে। বিমান চেঁচিয়ে বলল, "এই রে, সর্বনাশ, ঝড় আসছে !"

সন্তুর উট-চালক মুখ ঘুরিয়ে বলল, "নো অ্যাফ্রেড মাস্টার ! নো ডেঞ্জার !"

দু'জন চালকই তাদের দুটো উটকে বসিয়ে দিল মাটিতে। সন্তুরা নেমে পড়ল চটপট। সবাই মিলে উটের পিঠের আড়ালে বসল। বিমান বলল, "ঝড়ের ধুলো একদিক থেকে আসে তো, তাই একটু আড়ালে বসলেই গায়ে কিছু লাগে না।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "ঘূর্ণিঝড় হয় না ?"

বিমান বলল, "তাও হয় মাঝে-মাঝে। তখন উপুড় হয়ে শুয়ে মুখ গুঁজে থাকতে হয় আর কান ঢাকা দিতে হয়।"

রিনি বলল, "কী দারুণ লাগছে ! ঠিক সিনেমার মতন। আজই ফিরে গিয়ে মা'কে একটা চিঠি লিখব।"

বিমান বলল, "তুই এখনও ভাবছিস আজই ফিরবি ? মেমফিসে তোকে একটা রেস্ট হাউসে রেখে আমি আর সন্তু যাব কাকাবাবুর কাছে।"

রিনি বলল, "আহা-হা, অত শস্তা নয়। আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে !"

এর পরেই মাথার ওপর দিয়ে ঝড় এসে গেল। অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক, কিছুই আর দেখা যায় না। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড শনশন শব্দ। ওরা কান ঢেকে মুখ নিচু করে রইল, আর কথা বলারও উপায় নেই।

সেই ঝড় যেন আর থামতেই চায় না। কতক্ষণ যে চলল তার ঠিক নেই। উট দুটো মাঝে-মাঝে ভ-র-র-র ভ-র-র-র করে জোরে নিশ্বাস ফেলছে, শুধু সেই শব্দ ঝড়ের শব্দ ছাপিয়েও শোনা যায়।

যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনই হঠাৎ ঝড় শেষ হয়ে গেল এক সময়। আকাশ একেবারে পরিষ্কার।

সন্তু উঠে দাঁড়িয়ে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখল। আগে মরুভূমিটা ছিল সমতল। এখন কাছাকাছি অনেকগুলো বালির পাহাড় তৈরি হয়ে গেছে। বেশি দূর পর্যন্ত আর দেখা যায় না।

বিমান বলল, "ঝড় হয়ে যাবার এই আর-এক মুশকিল। এই সব স্যাণ্ড ডিউনস পার হতে উটগুলের বেশি সময় লাগে।"

আবার ওরা চেপে বসল উটের পিঠে। আর কোনো ঘটনা ঘটল না। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে একঘেয়ে যাত্রা। তারপর দূরে দেখা গেল কয়েকটি পিরামিডের চূড়া, আর মেমফিস শহরের চিহ্ন।

বিমান বলল, "জানিস সন্তু, এই মেমফিস ছিল মিশরের প্রাচীন রাজধানী। সে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেকার কথা। তখনও আমাদের দেশে আর্য-সভ্যতার জন্ম হয়নি।"

সন্তু মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক দেখতে দেখতে বলল, "স্টেপ পিরামিড কোথায় ? ঐ তো, ঐ যে ! সত্যি, দেখলেই চেনা যায়।"

রিনি বলল, "ঐ পিরামিডটার ছবি অনেক বইতে দেখেছি। আচ্ছা বিমানদা, বেশির ভাগ বইতে ঐ পিরামিডটার ছবিই দেয় কেন ? আরও তো কত পিরামিড রয়েছে।"

বিমান বলল, "কারণ এই পিরামিডটাই সবচেয়ে প্রাচীন। একেবারে প্রথম তৈরি করা হয়েছিল।"

সন্তু উটওয়ালাকে ঐ পিরামিডের দিকে যেতে বলল।

স্টেপ পিরামিডের গায়ে ধাপে-ধাপে খাঁজ কাটা আছে। দূর থেকে সিঁড়ির মতন দেখালেও কাছে এলে বোঝা যায় ধাপগুলো অনেক উঁচু-উঁচুতে। সহজে বেয়ে ওঠার উপায় নেই।

ওরা উট থেকে নেমে দাঁড়াল। সেখানে আর কোনো লোক নেই।

উটওয়ালা দু'জন বলল, "গাইড কল মাস্টার ? ফিফটি পিয়াস্তা ! মি গিভ ফিফটি পিয়াস্তা !"

সন্তু বলল, "না, গাইডের দরকার নেই। আমাকে এখানে অপেক্ষা করতে হবে।"

রিনি বলল, "বাবা রে, একটাও মানুষজন নেই। আমাদের যদি এখানে মেরে পুঁতে রাখে, কেউ টেরও পাবে না।"

এতক্ষণ বাদে সন্তু রিনিকে বলল, "অতই যদি ভয়, তা হলে কে আসতে বলেছিল তোকে ?"

রিনি বলল, "বেশ করেছি !"

তারপর সে ছোট্ট একটা ক্যামেরা বার করে ছবি তুলতে লাগল।

বিমান বলল, "চিঠিটা জেনুইন ছিল তো ? আমি কাকাবাবুর হাতের লেখা চিনি না।"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, জেনুইন। তা ছাড়া এখানে আর কে বাংলাতে চিঠি লিখবে ?"

খানিকবাদে দূর থেকে একটা জিপ আসতে দেখা গেল।

সন্তু বলল, "ঐ আসছে !"

রিনি বলল, "মরুভূমিতে যদি জিপগাড়ি চলে, তা হলে আর উটে চড়বার দরকার কী ? আমার বিচ্ছিরি লেগেছে !"

জিপটা কাছে এসে থামতেই তার থেকে একজন বলশালী লোক নামল। লোকটি যত না লম্বা, তার চেয়ে বেশি চওড়া।

সে প্রথমেই সন্তুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "সোনটু ? সোনটু ? মি ডাগো আবদাল্লা। মি কাম ফ্রম রায়চৌধুরী। ইউ কাম উইথ মি !"

বিমান বলল, "তোমার কাছে রায়চৌধুরীর কোনো চিঠি আছে ?"

ডাগো আবদাল্লা মাথা নেড়ে জানাল, না।

বিমান বলল, "তা হলে আমরা কী করে বিশ্বাস করব !"

আচমকা যে-রকম মরুভূমিতে ঝড় উঠেছিল, ঠিক সেইরকমভাবে আচমকা একটা সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড ঘটল।

স্টেপ পিরামিডের আড়াল থেকে খুব জোরে ছুটে এল একটা স্টেশন ওয়াগন। বিকট শব্দ করে সেটা ব্রেক কষল ডাগো আবদাল্লার ঠিক পেছনে। চাপা পড়বার ভয়ে ডাগো একটা লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পাশের দিকে।

গাড়ি থেকে টপটপ করে নেমে পড়ল চারজন লোক। তাদের প্রত্যেকের হাতে রাইফেল। তাদের মধ্যে একজন অতিকায় চেহারার লোক প্রায় এক হাতেই সন্তুকে একটা বেড়ালছানার মতন উঁচুতে তুলে নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে দিল গাড়ির মধ্যে।

রিনি ভয়ে চিৎকার করে উঠল।

একজন লোক বিমানের দিকে ফিরে বলল, "ইউ গো ব্যাক।"

আর-একজন লোক মাটিতে পড়ে থাকা ডাগো আবদাল্লার পিঠের ওপর নিজের বুটজুতোসুদ্ধু পা তুলে দিয়েছে। কর্কশ গলায় সে বলল, "হেই ডাগো, ইউ ওয়ান্ট টু ডাই ?"

রাগে, অপমানে ডাগো আবদাল্লার মুখখানা অদ্ভুত হয়ে গেছে। মানুষটার অতবড় চেহারা, কিন্তু চারখানা রাইফেলের বিরুদ্ধে সে কী করবে। ডাগো যে জিপে এসেছে, তাতে রয়েছে শুধু একজন ড্রাইভার। তার দিকেও একজন রাইফেল উঁচিয়ে আছে।

ডাগোর পিঠে যে পা তুলে আছে, সে আবার জিজ্ঞেস করল, "ডাগো, তুই মরতে চাস ? আমি ঠিক পাঁচ গুনব।"

ডাগো ফিসফিস করে বলল, "নো, এফেন্দি!"

লোকটি পা'টা সরিয়ে নিয়ে পকেট থেকে একটা কাগজ বার করল। সেটা ডাগোর মুখের সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "এটা তোর মালিককে দিবি ! বলবি, বারো ঘন্টার মধ্যে উত্তর চাই !"

ডাগো আস্তে-আস্তে মাটি থেকে উঠল। দুটো রাইফেল তাক করা রয়েছে তার দিকে। চিঠিটা হাতে নিয়ে সে আস্তে আস্তে হেঁটে গিয়ে জিপে উঠল।

একজন হুকুম দিল, "স্টার্ট !"

জিপটা চলতে শুরু করার পরেও কিছুক্ষণ রাইফেলের নল তোলা রইল সেদিকে।

জিপটা চোখের আড়ালে চলে যাবার পর ওরা বিমান আর রিনির দিকে ফিরল। রিনি মুখে হাত চাপা দিয়ে আছে, তার সারা শরীর কাঁপছে। বিমান তাকিয়ে আছে অসহায় ভাবে। সন্তুকে নেবার জন্য দুটো দলের লোক এসেছে। এর মধ্যে কারা যে কোন্ দলের, তা সে বুঝতে পারছে না। তার নিজেরও কিছুই করার নেই। সুন্দরবনের ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করা আর আরব গেরিলাদের সঙ্গে লড়াই করা তো এক কথা নয়। এরা প্লেন ধ্বংস করে, ডিনামাইট দিয়ে গোটা বাড়ি উড়িয়ে দেয়।

রাইফেলের নল দোলাতে দোলাতে একজন বলল, "গেট গোয়িং ! গেট গোয়িং !"

রিনির হাত ধরে বিমান এক পা এক পা করে পিছিয়ে গেল। ওদের উটওয়ালা ততক্ষণে তার উটটাকে বসিয়ে ফেলেছে। বিমান রিনিকে নিয়ে চেপে বসল উটের পিঠে।

ওদের একজন এবার অকারণেই আকাশের দিকে রাইফেল তুলে একবার ট্রিগার টিপল। সেই আওয়াজে উট দুটোই দৌড় দিল তড়বড়িয়ে।

স্টেশান ওয়াগনটা সন্তুকে নিয়ে চলে গেল উল্টো দিকে।

ওদিকে হানি আলকাদি কাকাবাবুর অভিযানের সব বন্দোবস্ত করে ফেলেছে। উটের বদলে কাকাবাবু যাবেন গাড়িতে, তাতে সময় বাঁচবে। হানি আলকাদিও যাবে অন্য একটি গাড়িতে। কাকাবাবুর সঙ্গে তার শর্ত হয়েছে যে, হানি আলকাদি তার দলবল নিয়ে অপেক্ষা করবে গিজাতে। সেখান থেকে সে আর এগুতে পারবে না। কাকাবাবুর সঙ্গে শুধু যাবে সন্তু আর ডাগো আবদাল্লা। কাকাবাবু যদি চার ঘন্টার মধ্যে ফিরে না আসেন, তা হলে হানি আলকাদি তাঁর খোঁজ নিতে যাবেন।

সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কাকাবাবু একাই কাটিয়েছেন। হানি আলকাদির দেখা পাওয়া যায়নি। অন্য লোকজনও বিশেষ কেউ ছিল না মনে হয়। সন্ধের দিকে এক-এক করে সব আসতে লাগল। এরা বিপ্লবী হলেও দিনের বেলায় নিশ্চয়ই অন্য কাজ করে।

অন্ধকার হয়ে আসার পর কয়েকটা মশাল জ্বালা হল চত্বরে। কাকাবাবু বাইরেই চেয়ার পেতে বসে ছিলেন, এক সময় সেখানে হাতে একটা মশাল নিয়ে উপস্থিত হল হানি আলকাদি। আজ তাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। জলপাই-সবুজ রঙের পোশাক পরা, মাথার চুলে একটা রিবন বাঁধা। চোখ দুটো একেবারে ঝকঝক করছে।

হাসিমুখে সে বলল, "হ্যালো, প্রফেসার ! হাউ আর ইউ দিস ইভনিং ?"

কাকাবাবুও হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা অনেকেই আমাকে প্রফেসার বলো কেন ? আমি তো কখনও কোনো কলেজে পড়াইনি !"

হানি আলকাদি বলল, "ওঃ হো ! আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে, আমাদের এখানে অনেক কলেজেই আগে ইণ্ডিয়ান প্রফেসাররা পড়াতেন। সেইজন্য কোনো ডিগনিফাইড চেহরার ইণ্ডিয়ান দেখলেই আমাদের প্রফেসার মনে হয়। যাই হোক, তুমি একা-একা বিরক্ত হয়ে যাওনি তো ? আকাশের রং-ফেরা দেখছিলে ?"

"সূর্যাস্তের সময় এখানকার আকাশ সত্যি বড় অপূর্ব দেখায়। দুপুরে একবার ঝড় উঠেছিল, তারপর আকাশ আবার ঝকঝকে পরিষ্কার হয়ে গেল !"

"মিঃ রায়চৌধুরী, একটা কথা বলতে পারেন ? পৃথিবীর থেকে আকাশের রং আমার বেশি সুন্দর লাগে। আকাশে নীল, সাদা, লাল, সোনালি, রুপোলি, কালো, সব রং-ই দেখা যায়। কিন্তু সবুজ রং কখনও দেখা যায় না কেন ? আমি প্রায়ই এ-কথাটা ভাবি।"

কাকাবাবু জোরে হেসে ফেললেন। তারপর বললেন, "তোমাকে দেখার আগে তোমার সম্পর্কে কত কথাই শুনেছিলুম। তুমি নাকি সাঙ্ঘাতিক এক বিপ্লবী, ভয়ংকর নিষ্ঠুর। এখন তো দেখছি তুমি একটি স্বপ্ন-দেখা নরম স্বভাবের যুবক।"

হানি আলকাদি একটু লজ্জা পেয়ে বলল, "যারা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে জানে না, তারা কী করে বিপ্লবী হবে ?"

তারপর হাতঘড়ি দেখে বলল, "ইয়োর নেফিউ শুড বি হিয়ার এনি মিনিট। তুমি কি আজ রাত্তিরেই বেরিয়ে পড়তে চাও ?"

কাকাবাবু বললেন, "যতটা এগিয়ে থাকা যায়, ততটাই ভাল। কাল ভোর থেকে কাজ শুরু করা যেতে পারে।"

মশালটা বালিতে গেঁথে হানি আলকাদি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, "মুফতি মহম্মদ ছবির উইলে কী লিখে গেছেন, তা জানার জন্য আমার খুবই কৌতূহল হচ্ছে। তুমি তা বলবে না, না ?"

কাকাবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "আর-একটু ধৈর্য ধরো !"

এই সময় গাড়ির শব্দ হতেই দু'জনে উৎকর্ণ হয়ে উঠল। গাড়িটা হেডলাইট জ্বেলে এদিকেই আসছে। হানি আলকাদি বলল, "তোমার ভাইপো এসে গেছে !"

গাড়িটা থামতেই ডাগো আবদাল্লা ছুটে এল ওদের দিকে। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল।

অতবড় চেহারার একটি লোককে শিশুর মতন কাঁদতে দেখে কাকাবাবু প্রথমে অবাক হলেও সঙ্গে-সঙ্গে বুঝে গেলেন কী ঘটেছে।

হানি আলকাদি প্রায় লাফিয়ে উঠে তীব্র গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে ? ছেলেটাকে আনিসনি ?"

ডাগো আবদাল্লা বলল, "আমাকে যা খুশি শাস্তি দাও, এফেন্দি ! আমার চোখের সামনে থেকে ছেলেটাকে কেড়ে নিয়ে গেল। আমি কিছুই করতে পারিনি। ওদের চারটে রাইফেল ছিল।"

হানি আলকাদি চিৎকার করে বলল, "বেওকুফ, আগে বল কারা নিয়ে গেছে। তুই তাদের চিনেছিস ? কাদের এত সাহস যে আমার লোকের উপর হাত দেয় ?"

ডাগো আবদাল্লা বলল, "হ্যাঁ চিনি এফেন্দি। ওরাও আমাকে চিনেছে। আমার নাম ধরে ডাকল। ওরা আল মামুনের লোক !"

হানি আলকাদির সুন্দর মুখখানা এবারে রাগে একেবারে হিংস্র হয়ে উঠল। সে ডাগো আবদাল্লার চুলের মুঠি ধরে বলল, "সেই কুকুরটা তোর সামনে থেকে ছেলেটাকে নিয়ে গেল, তুই বেঁচে ফিরে এলি ? ওদের একটাকেও তুই খতম করেছিস ? আল মামুন ! আজ আমি ওকে শেষ করে দেব। নিজের হাতে ওকে একটু-একটু করে কাটব !"

ডাগোকে ছেড়ে দিয়ে হানি আলকাদি হাততালি দিয়ে নিজের লোকদের ডাকতে লাগল।

ডাগো বলল, "একটা চিঠি দিয়েছে। বলেছে, বারো ঘন্টার মধ্যে উত্তর চাই।"

কাকাবাবু আরবি ভাষা মোটামুটি জানেন। ওদের কথাবার্তা প্রায় সবটাই বুঝতে পারছিলেন। এবারে হাত বাড়িয়ে বললেন, "দেখি চিঠিটা।"

চিঠিখানা কাকাবাবুকে উদ্দেশ করে লেখা নয়। লিখেছে হানি আলকাদিকে। চিঠিটা এই রকম

আল মামুন নিজে হানি আলকাদির মতন একজন নগণ্য, নির্বোধ লোককে চিঠি লেখার যোগ্য মনে করে না। আল মামুন তার দলের একজন লোক মারফত জানাচ্ছে যে, মিঃ রাজা রায়চৌধুরীকে বন্দী করে রাখার কোনো অধিকার হানি আলকাদির নেই। মিঃ রাজা রায়চৌধুরী আল মামুনের লোক। আল মামুনের কাছেই তাঁকে ফিরিয়ে দিতে হবে। মুফতি মহম্মদের উত্তরাধিকারী আল মামুন, তার কথা সবাই মান্য করবে। যে আল মামুনের অবাধ্য হবে, সে শাস্তি পাবে। হানি আলকাদি যদি ১২ ঘন্টার মধ্যে আল মামুনের আদেশ না পালন করে, তা হলে সে কঠিন শাস্তি পাবে। মিঃ রাজা রায়চৌধুরীকে যেন জানিয়ে দেওয়া হয় যে, ১২ ঘন্টা পার হলে তাঁর ভাইপো খুন হবে, তার মৃতদেহ কেউ খুঁজে পাবে না। নির্বোধ হানি আলকাদি যেন আরও বেশি নির্বোধের মতন কাজ না করে।

চিঠিটা পড়ার সময় কাকাবাবু কোনো উত্তেজনার চিহ্ন দেখালেন না। শান্ত ভাবে চিঠিটা এগিয়ে দিলেন হানি আলকাদির দিকে।

হানি আলকাদি চিঠিটা পড়তে পড়তে যেন লাফাতে লাগল। পড়া হয়ে গেলে কাগজটা গোল করে পাকিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তার ওপরে লাথি কষাল কয়েকটা। সেই সঙ্গে সঙ্গে বলতে লাগল, "একটা আলুর বস্তার ইঁদুর ! বাঁধা কপির পোকা ! নর্দমার আরশোলা! ঐ আল মামুনটাকে আমি টিপে মেরে ফেলব ! আজ রাতে আমার ফোর্স নিয়ে গিয়ে ঐ বাঁদরের গায়ের উকুনটাকে আমি সবংশে শেষ করব।"

কাকাবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, "হানি আলকাদি, এখন চ্যাঁচামেচি করার সময় নয়, আমি তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই !"

হানি আলকাদি এগিয়ে আসতে-আসতে বলল, "তুমি চিন্তা কোরো না, রায়চৌধুরী, হানি আলকাদি যখন রেগে গেছে, তখন আল মামুন আজই খতম্ হবে। মরুভূমিতে বালি আজ আল মামুনের রক্ত শুষবে ! বাজপাখিরা আল মামুনের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে খাবে।"

কোমর থেকে সে এমনভাবে রিভলভার বার করল, যেন আল মামুন তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে, এক্ষুনি সে গুলি করবে।

এর মধ্যে অনেক লোক জড়ো হয়ে গেছে চারপাশে। তারা ডাগো আবদাল্লার কাছ থেকে ঘটনাটা শুনছে।

কাকাবাবু হানি আলকাদিকে জিজ্ঞেস করলেন, "শোনো, আল মামুনকে তো আমি ব্যবসায়ী বলেই জানতাম। কিন্তু তারও কি তোমার মতন দল আছে নাকি ? সে এত রাইফেলধারী পেল কোথায় ?"

"আছে একটা ছোট দল। সে এমন কিছু না। আমার দলে হাজার-হাজার লোক আছে। ওকে আমরা, এই দ্যাখো, এইরকম ভাবে একটা মুর্গির মতন জবাই করব !"

"তোমাদের দু'দলের কি আগে থেকেই ঝগড়া ছিল ?"

"ওর দলকে আমরা গ্রাহ্যই করি না। ওর দল ধর্মীয় গোঁড়ামি ছড়াতে চায়, আর আমার দল চায় দেশের সব মানুষের উন্নতি।"

এর আগে আমরা ওদের নিয়ে মাথা ঘামাইনি, কিন্তু আল মামুনের দল যদি আমার পথে বাধা সৃষ্টি করে, তা হলে আমি ওদের শেষ করে দেব। মুফতি মহম্মদের উত্তরাধিকারী ওকে কে করেছে ? আমিই মুফতি মহম্মদের আসল উত্তরাধিকারী।"

"আল মামুন বুদ্ধিমান লোক। আমার ভাইপো সন্তুকে সে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে, তুমি কী করে খুঁজে বার করবে ?"

"আমার হাত ছাড়িয়ে পালাবার ক্ষমতা আছে আল মামুনের ? আমি আগে ওর মাথার খুলিটা গুঁড়ো করে দেব !"

"তার আগেই যদি ওরা সন্তুকে মেরে ফেলে ?"

"তুমি অযথা চিন্তা কোরো না, রায়চৌধুরী..."

"হ্যাঁ, চিন্তা আমাকে করতেই হবে। তোমাদের দু'দলের ঝগড়ার মধ্যে আমি জড়িয়ে পড়তে চাই না। আল মামুন মাত্র বারো ঘন্টা সময় দিয়েছে ! তার শর্ত মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই !"

"অ্যাঁ ? কী বলছ তুমি ? ঐ শয়তানের দাঁতের ময়লাটা ভয় দেখালেই আমরা ভয় পেয়ে যাব ? তা হতেই পারে না !"

"মাত্র বারো ঘন্টা সময়। এর মধ্যেই সন্তুকে আমি ফেরত চাই। কোনো ঝুঁকি নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শোনো, আমি দুটো উপায় ভেবেছি। এক হচ্ছে, আমাকে ফেরত পাঠানো। আল মামুন

তার চিঠিতে শুধু আমাকেই ফেরত দিতে বলেছে। তুমি আমাকে ছেড়ে দাও

"মিঃ রায়চৌধুরী, তোমাকে আমি সাহসী মানুষ বলে ভেবেছিলুম। আল মামুনের হুকুম তুমি মেনে নেবে? তুমি কি ওর ক্রীতদাস? তোমাকে ও হাফ মিলিয়ান ইণ্ডিয়ান টাকা দিতে চেয়েছিল, তুমি তা নাওনি, সে খবরও আমি জানি!"

"শোনো হানি আলকাদি। ঐ সন্তু ছেলেটাকে আমি বড্ড ভালবাসি। ওর কোনো ক্ষতি হলে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। তোমার দলের এত শক্তি, তবু তোমরা আমার ভাইপোকে এখানে আনার ব্যবস্থা করতে পারলে না, মাঝপথ থেকে ওরা ছিনিয়ে নিয়ে গেল। ওকে বাঁচাবার জন্য আমাকে ফিরে যেতে হবে।"

"যদি তোমাকে না ছাড়ি? আল মামুনের হুকুম আমি কিছুতেই মানব না!"

"তোমাদের দুই দলের ঝগড়ার জন্য আমার ভাইপোটা মারা যাবে? হানি আলকাদি, তোমাকে দেখে আমি যা বুঝেছি, তুমি বীর, তুমি লড়াই করতে ভালবাসো, কিন্তু কোনো ছোট ছেলেকে নিশ্চয়ই তুমি কোনোদিন মারতে পারবে না! কিন্তু আল মামুন তা পারে।"

"তুমি দুটো উপায়ের কথা বলছিলে। দ্বিতীয়টা কী?"

"আল মামুনকে তুমি একটা চিঠি লেখো। সে যেমন তোমাকে ধমকিয়েছে আর গালাগালি দিয়েছে, সেই রকম তুমি যতখুশি ধমক আর গালাগালি দাও। সেই সঙ্গে লেখো যে, সন্তুকে আজ রাতের মধ্যেই এখানে ফেরত পাঠাতে হবে। মুফতি মহম্মদের শেষ ইচ্ছে যাচাই করতে গিয়ে যদি আমি কোনো ধন-সম্পদের সন্ধান পাই, তা হলে তুমি তার অর্ধেক আল মামুনকে দেবে! তুমি আরব যোদ্ধা, তোমার কথার দাম আছে। তুমি কথা দিলে নিশ্চয়ই তা রাখবে!"

"অসম্ভব! অসম্ভব অসম্ভব! মুফতি মহম্মদ বিপ্লবী নেতা ছিলেন। বিপ্লবী দলের জন্যই তিনি টাকাপয়সা সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর সেইসব জিনিস এখানকার বিপ্লবী দলই পাবে। আল মামুনটা কে? একটা অর্থলোভী শয়তান!"

"হয়তো টাকাপয়সা কিছুই নেই। তোমরা এমনি-এমনি ঝগড়া করছ!"

"নিশ্চয়ই আছে। থাকতে বাধ্য!"

"শোনো আমার সাহায্য যদি চাও, তা হলে আমার কথা মানতেই হবে। তুমি কি এটা বোঝোনি যে, আমি যদি নিজে থেকে বলতে না চাই, তা হলে আমাকে খুন করে ফেললেও আমি মুখ খুলব না!"

"আল মামুনকে টাকাপয়সার ভাগ দিলে আমার দলের লোকরা রেগে যাবে।"

"দলের লোকদের বোঝাও! সন্তুকে যদি বাঁচাতে না পারো, তা হলে তোমরা কিছুই পাবে না! সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ডাগো আবদাল্লার হাতে এক্ষুনি চিঠি লিখে স্টেপ পিরামিডের কাছে পাঠাও!"

হানি আলকাদির মুখখানা কুঁকড়ে গেছে। আল মামুনকে হত্যা করার বদলে তাকে টাকাপয়সার ভাগ দিতে হবে, এই ব্যাপারটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। তার মনের মধ্যে অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে।

কাকাবাবু তার পিঠে হাত দিয়ে বললেন, "শূন্যকে যদি দু'ভাগ করা যায়? মনে করো, মুফতি মহম্মদের ধনসম্পদ শূন্য। তার অর্ধেক আল মামুনকে দিতে তুমি আপত্তি করছ কেন?"

হানি আলকাদি পাশ ফিরে তার দলের একজন লোককে বলল, "এই, চিঠি লেখার কাগজ আর কলম নিয়ে এসো!"

॥ ৯ ॥

সন্তুর মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। তাকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে রাত তিনটের সময়। আল মামুনের লোকেরা তাকে যখন গাড়ির মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছিল, তখন একটা লোহার রডে লেগে তার মাথা ফেটে যায়। মাথার চুল একেবারে ভিজে গিয়েছিল রক্তে। আল মামুনের লোকেরা তা দেখেও তার কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা করেনি। ডাগো আবদাল্লা তাকে এখানে ফিরিয়ে আনবার পর হানি আলকাদি নিজে তার ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে, ওষুধ লাগিয়ে, ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছে।

সন্তু কিন্তু বেশ চাঙ্গাই আছে। ঐ আঘাতে সে একটুও কাবু হয়নি। কিংবা হলেও বাইরে তা প্রকাশ করছে না। বরং তার একটু আনন্দই হচ্ছে। দিল্লিতে পাঁজরায় গুলি খেয়ে কাকাবাবু কয়েকদিন ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ছিলেন, এখন সেও অনেকটা কাকাবাবুর সমান-সমান হল।

ভোরের আলো ফোটার আগেই কাকাবাবু বেরিয়ে পড়েছেন সন্তুকে নিয়ে। সঙ্গে শুধু ডাগো আবদাল্লা। সে-ই চালাচ্ছে গাড়ি। হানি আলকাদি তার কয়েকজন অনুচর নিয়ে যাচ্ছে অন্য গাড়িতে। সন্তু সুস্থ আছে দেখে কাকাবাবু আর দেরি করতে চাননি। কাজটা, তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চুকিয়ে ফেলতে চান।

গাড়িতে যেতে-যেতে কাকাবাবু সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, "সন্তু, তুই জানিস পিরামিডের মধ্যে কী করে ঢুকতে হয়? তোর কি ধারণা যে, পিরামিডের গায়ে একটা দরজা থাকে আর সেই দরজা খুলে

"প্রসাদ খেতে আমার খুব ভালো লাগে...
নাড়ু... কদমা সব... আর ভালো লাগে রাত্তির বেলা ঠাকুর দেখতে...
কত আলো... কত লোক... দিল্লী থেকে দিদিভাইরা আসবে...
সবাই মিলে অঞ্জলি দেব...
খুব মজা হবে।
পুজো আমার দারুণ
লাগে।"

বাংলার উৎসব আনন্দে... লক্ষ লক্ষ পরিবারে এক হয়ে মিশে আছে বোরোলীন পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে। ঘরে ঘরে তাই তার আশ্চর্য সমাদর।

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস
লিমিটেড
আশা মহল নিউ আলিপুর কলকাতা ৭০০ ০৮৮

ভেতরে ঢোকা যায় ?"

এই ব্যাপারটা সন্তুর জানা নেই। দরজা না থাকলে ভেতরে ঢোকা যাবে কী করে ?

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তোর কি ধারণা পিরামিডের ভেতরটা ফাঁপা ? ভেতরে সব ঘর-টর আছে ?"

সন্তু আরও অবাক হয়ে গেল ! ফাঁপা না হলে ভেতরে ঘর-টর থাকবে কী করে ? অনেক ছবিতেই সে দেখেছে যে, পিরামিডের মধ্যে মস্ত-মস্ত হলঘরের মতন, তাতে অনেক জিনিসপত্র, মূর্তি, পাথরের কফিন ইত্যাদি থাকে। তা হলে কাকাবাবু এরকম বলছেন কেন ?

কাকাবাবু দু'দিকে মাথা নেড়ে বললেন, "না রে, পিরামিডের গায়ে দরজা নেই। ভেতরটা ফাঁপাও নয়, ভেতরে ঘর-টর কিচ্ছু নেই। পিরামিডগুলো হচ্ছে সলিড পাথরের ত্রিভুজ।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তা হলে রাজা-রানিদের কবর কোথায় থাকত ?"

"সেগুলো বেশির ভাগই মাটির নীচে। শুধু রাজা-রানিদের সমাধি নয়, তাঁদের ব্যবহার করা অনেক জিনিসপত্রও সেখানে থাকত। এমনকী খাট-বিছানা পর্যন্ত। অধিকাংশই সোনার। ক্লিয়োপেট্রার শোবার খাট, চটিজুতো পর্যন্ত সোনার তৈরি ছিল। এই সব মূল্যবান জিনিসপত্র যাতে চোরে চুরি করে নিয়ে না যেতে পারে, তাই ঐ সব সমাধিস্থানের ঢোকার পথটাও খুব গোপন রাখা হত। পিরামিডের গা হাতড়ে কেউ সারাজীবন খুঁজলেও ভেতরে ঢোকার পথ পাবে না।"

"তাহলে সাহেবরা পিরামিডের ভেতরে ঢুকল কী করে ?"

"পিরামিডের ভেতরে না, পিরামিডের নীচে। অনেক দূরে একটা সুড়ঙ্গের মুখ থাকে। সেখান দিয়ে যেতে হয়। সাহেবরা এক-এক করে সেই সব সুড়ঙ্গের পথ খুঁজে বার করেছে। খুব কষ্ট করে ঢুকতে হয়। স্যার ফ্লিণ্ডার্স পেট্রি নামে একজন ইংরেজ এই সব আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত। এক-একটা পিরামিডের তলায় গিয়ে তিনি কত যে ধনরত্ন পেয়েছেন, তার ঠিক নেই। তবে স্যার ফ্লিণ্ডার্সও প্রথম দু'একটা সমাধিস্থানের ভেতরে ঢুকে দেখেছিলেন, তাঁরও আগে চোরেরা অন্য দিক থেকে সুড়ঙ্গ কেটে এসে ভেতরে ঢুকেছিল। আমার ধারণা, মুফতি মহম্মদ এই স্যার ফ্লিণ্ডার্সের দলে গাইডের কাজ করতেন। উনি অনেকদিন সাহেবদের কাছে প্রথমে মালবাহক কুলি, তারপর গাইডের কাজ করেছিলেন, তা তো শুনেছিস মান্টোর কাছে !"

"হ্যাঁ। তারপর গাইডের কাজ ছেড়ে বিপ্লবী হলেন।

"সাহেবরা পিরামিডের সুড়ঙ্গ দিয়ে ভেতরে গিয়ে সমস্ত সোনার জিনিস আর দামি-দামি জিনিস বিদেশে নিয়ে যাচ্ছে দেখে এ-দেশের অনেক লোক চটে গিয়েছিল। মুফতি মহম্মদ তো নিজের চোখেই দেখেছেন, সাহেবরা মিশরের সম্পদ লুট করছে। তাই তিনি বিপ্লবী দল গঠন করেছিলেন, এই সব আটকাবার জন্য। হয়তো তিনি নিজেও কোনো-কোনো সমাধিস্থান থেকে সোনাদানা তুলে নিয়ে গিয়ে সেসব তাঁর দলের কাজে লাগিয়েছেন।"

"উনি ছবি এঁকে-এঁকে সেই সব সোনা কোথায় লুকোনো আছে তাই বুঝিয়ে গেছেন, তাই না ?"

"না রে, আমি মিথ্যে কথা বলি না। আমি যে সবাইকে বলেছি যে, মুফতি মহম্মদের শেষ ইচ্ছাপত্রে টাকা-পয়সা, সোনাদানার কথা কিছু নেই, তা সত্যিই। উনি সেসব কিছু জানিয়ে যাননি।"

ডাগো আবদাল্লা মুখ ফিরিয়ে বলল, "গিজার বড় পিরামিড তো এসে গেছে, এফেন্দি। এবার কোন্ দিকে যাব ?"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "হানি আলকাদির গাড়ি কোথায় ?"

ডাগো বলল, "ওদের গাড়ি একটু আগেই পৌঁছে গেছে। সামনে থেমে আছে।"

"ওদের ঐখানেই থেমে থাকতে বলো। তুমি ডান দিকে চলো।"

আর-কিছুক্ষণ বাদে আর-একটি মাঝারি আকারের পিরামিডের কাছে এসে কাকাবাবুর নির্দেশে গাড়ি থামল।

গাড়ি থেকে নেমে কাকাবাবু চারদিকে তাকালেন। ধারেকাছে কোনো লোকজন দেখা যাচ্ছে না। তবে বালির ওপর একটা গাড়ির চাকার দাগ রয়েছে। হয়তো আগের দিন কোনো টুরিস্টের গাড়ি এসেছিল।

কাকাবাবু বললেন, "ডাগো, আমি এই পিরামিডের নীচে যাব।"

ডাগো কাকাবাবুর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। করুণ হয়ে এল তার মুখখানা। আস্তে আস্তে বলল, "আপনি যাবেন, এফেন্দি ?"

কাকাবাবু হাসলেন। তারপর সন্তুর দিকে ফিরে বললেন, "কেন ও এই কথা বলছে জানিস ? আগেরবার যখন আমি ইজিপ্টে এসেছিলাম, তখন ডাগো সব সময় আমার সঙ্গে-সঙ্গে থাকত। ওকে নিয়ে আমি অনেক সমাধিতে নেমেছি। তখন আমার দুটো পা'ই ভাল ছিল। ডাগো ভাবছে, এখন এই খোঁড়া পা নিয়ে আমি আর নীচে নামতে পারব না !"

কাকাবাবু ডাগোকে বললেন, "তুমি সঙ্গে থাকলে আমি নিশ্চয়ই পারব। আগেরবার আমরা এর মধ্যে একসঙ্গে নেমেছিলাম মনে নেই ?"

ডাগো বলল, "আপনার কষ্ট হবে, এফেন্দি !"

"তা হোক, তুমি কাজ শুরু করে দাও !"

গাড়ি থেকে কয়েকটা জিনিসপত্র নামানো হল। তিনটে শক্তিশালী টর্চ গুঁজে নেওয়া হল তিনজনের কোমরে। একটা ছোট ঝোলাব্যাগ কাকাবাবু চাপিয়ে দিলেন সন্তুর কাঁধে।

পিরামিড থেকে প্রায় পাঁচশো গজ দূরে ডাগো শুয়ে পড়ল এক জায়গায়। হাত দিয়ে বালি সরাতে লাগল। তারপর বেরিয়ে পড়ল একটা কাঠের পাটাতন। সেটা সরিয়ে ফেলতেই দেখা গেল একটা অন্ধকার গর্ত নেমে গেছে যেন পাতালে।

কাকাবাবু বললেন "কাঠের পাটাতনের বদলে এখানে আগে পাথর চাপা দেওয়া থাকত। তার ওপর অনেকখানি বালি ছড়িয়ে দিলে আর কারুর বুঝবার উপায় ছিল না। খুব সাবধানে নামবি কিন্তু সন্তু একটু পা পিছলে গেলেই অনেক নীচে গড়িয়ে পড়ে যাবি।

ঠিক হল, ডাগো যাবে সবচেয়ে আগে, মাঝখানে কাকাবাবু, সবশেষে সন্তু। ডাগো একটা মোটা দড়ি আলগা করে জড়িয়ে দিল তিনজনের কোমরে। এখানে ক্রাচ নিয়ে গিয়ে কোনো লাভ নেই বলে কাকাবাবু সে-দুটো রেখে গেলেন বাইরে।

সুড়ঙ্গটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে নীচের দিকে। দু'দিকের দেয়ালে দু'হাতের ভর দিয়ে বসে-বসে নামতে হয়। হাতের বেশ জোর লাগে।

সন্তু ভাবল, "নীচে নামবার কী অদ্ভুত ব্যবস্থা। অবশ্য হাজার হাজার বছর আগে এই ব্যবস্থাটাই বোধহয় সবচেয়ে সুবিধেজনক ছিল।

কাকাবাবুর যে দারুণ কষ্ট হচ্ছে তা বুঝতে পারছে সন্তু। ওঁর ভাঙা পা'টার ওপরেও জোর পড়ছে কিনা। মাঝে-মাঝে কাকাবাবু মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করছেন, "তুই ঠিক আছিস তো, সন্তু ?" কাকাবাবুর মুখ ভর্তি চন্দনের ফোঁটার মতন ঘাম।

ওপরের আলো খানিকটা মাত্র ভেতরে ঢোকে, তারপরেই ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। ডাগো কী কায়দায় যেন একটা টর্চ জ্বেলে বগলে চেপে আছে। আর মাঝে-মাঝে আরবি ভাষায় কী যেন বলে উঠছে হয়তো কোনো প্রার্থনামন্ত্র !

মিনিট দশেক পরে ওরা পৌঁছে গেল সমতল জায়গায়। ঘড়িতে দশ মিনিট কাটলেও মনে হয় যেন কয়েক ঘন্টা লেগে গেছে।

তিনটে টর্চের আলোয় দেখা গেল সেখানে একটি চৌকো ছোট

ঘর। ঘরটা একেবারে খালি। দেওয়ালেও কোনো ছবি নেই। ঘরের একটা দেওয়ালের নীচের দিকে একটি চৌকো গর্ত। তার মধ্যে দিয়ে একটা সরু পথ। সেই পথে খানিকটা যাবার পর আর-একটি দেওয়াল, সেই দেওয়ালের গায়ে একটি লোহার দরজা। দেখলেই বোঝা যায়, সেই দরজাটা নতুন বসানো হয়েছে, আগে অন্য কিছু ছিল।

দরজাটা ঠেলা দিতেই খুলে গেল। তারপরই একটি বিশাল হলঘর। এখানকার দেওয়ালে বড়-বড় ছবি আঁকা। কিন্তু জিনিসপত্তর কিছু নেই।

কাকাবাবু বললেন, "সব নিয়ে গেছে। আগেরবার এসেও অনেক কিছু দেখেছিলাম। তাই না, ডাগো ?"

ডাগো বলল, "হ্যাঁ, এফেন্দি। কিছুই থাকে না। চোরেরা সব নিয়ে নেয় বলে গভর্নমেন্ট এখন নিজেই তুলে নিয়ে গিয়ে মিউজিয়ামে রাখে।"

কাকাবাবু বললেন, "বেশি সময় নষ্ট করা যাবে না। ডাগো, সেই ল্যাবিরিন্থটা কোথায় ?"

ডাগো বিস্মিত ভাবে বলল, "সেটাতেও যাবেন ?"

"হ্যাঁ। সেটার জন্যই তো এসেছি।"

"আপনার আরও কষ্ট হবে। এক কাজ করি, এফেন্দি। আমি আপনাকে পিঠে করে নিয়ে যেতে পারি।"

"তার দরকার হবে না। তুমি পথটা খুঁজে বার করো। আমার জায়গাটা ঠিক মনে পড়ছে না।"

হলঘরটা পার হয়ে এক জায়গায় এসে ডাগো একটা চৌকো পাথরের স্ল্যাব সরাল। তার মতন শক্তিশালী লোক ছাড়া অতবড় পাথর সরাতে যে-সে পারবে না। তারপর একটা ছোট গোল জায়গা। সেখানে মেঝেতে শুয়ে পড়ে সে আবার একটা পাথরের পাটাতন সরিয়ে ফেলল। এখানে আবার আর-একটা সুড়ঙ্গ।

কাকাবাবু বললেন, "এইখানে আমাদের যেতে হবে, সন্তু।"

তারপর তিনি ডাগোকে বললেন, "আর তোমাকে যেতে হবে না। তুমি ফিরে যাও !"

দারুণ চমকে উঠে ডাগো বলল, "কী বলছেন, এফেন্দি ? আমি যাব না ? আমাকে বাদ দিয়ে আপনি এই বাচ্চাকে নিয়ে যাবেন কী করে ?"

"ঠিক পেরে যাব। তুমি বড় হলটায় অপেক্ষা করো, কিংবা ওপরেও উঠে যেতে পারো। আমরা ফেরার সময় তোমাকে ডাকব !"

"না, না, না, তা হয় না ! আপনাকে এখানে ফেলে রেখে গেলে হানি আলকাদি আমায় আস্ত রাখবে না !"

"হানি আলকাদির সঙ্গে আমার এই রকমই কথা আছে। আমি যা দেখতে যাচ্ছি, তা আমি দেখার আগে, অন্য কেউ জানতে পারবে না। মুফতি মহম্মদের এটা আদেশ। এই আদেশ তো সকলকে মানতেই হবে। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, ডাগো। তুমি আমাদের যা উপকার করলে, তার কোনো তুলনা নেই। তোমাকে ছাড়া আর কারুকে বিশ্বাস করে আমি এখানে আসতে পারতুম না।"

ডাগো মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল

সন্তুর কাঁধে হাত দিয়ে কাকাবাবু ঢুকে পড়লেন সেই ল্যাবিরিন্থের মধ্যে।

কাকাবাবু বললেন, "তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই, সন্তু। ভেতরটা খুব আঁকাবাঁকা। একটু অন্যমনস্ক হলেই মুখে গুঁতো লাগবে। আগেরবার আমার নাক ছেঁতলে গিয়েছিল। এখন কি বুঝতে পারছিস যে, আমাদের মাথার ওপরে রয়েছে একটা বিরাট পিরামিড ?"

সন্তুর বুক ঢিপঢিপ করছে। মাটির কত নীচে, জমাট অন্ধকার ভরা এক সুড়ঙ্গ। আর কি ওপরে ওঠা যাবে? যদি হঠাৎ একটা পাথর ভেঙে ফেরার পথ বন্ধ হয়ে যায়? ডাগো সঙ্গে থাকায় তবু খানিকটা ভরসা ছিল।

সন্তুর কাঁধ ধরে কাকাবাবুকে লাফিয়ে-লাফিয়ে আসতে হচ্ছে। সন্তু টর্চ জ্বেলে এগোচ্ছে খুব সাবধানে। একটুখানি অন্তর-অন্তরই সুড়ঙ্গটা বাঁক নিয়েছে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ভয় পাচ্ছিস নাকি রে, সন্তু?"

সন্তু শুকনো গলায় বলল, "না!"

"আমরা কোথায় যাচ্ছি, তা বুঝতে পারছিস?"

"না।"

"এক-একটা সমাধিস্থান খুব গোপন রাখা হত। কেন যে এত গোপনীয়তা তা জানা যায় না। হয়তো দামি জিনিসপত্র অনেক বেশি রাখা হত সেখানে। এটা সেইরকম একটা গোপন সমাধিতে যাবার পথ। কত কষ্ট করে এরকম সুড়ঙ্গ বানিয়েছে। হয়তো এই সমাধিতে যাবার আরও কোনো রাস্তা আছে, যা আমরা এখনও জানি না। রাজা-রানিরা কি এত কষ্ট করে যেতেন?"

"আমরা কোন্ সমাধিতে যাচ্ছি?"

"রানি হেটেফেরিসের গল্প তোকে বলেছিলুম, মনে আছে?"

"হ্যাঁ, সেই যে কফিনের মধ্যে যাঁর মমি খুঁজে পাওয়া যায়নি?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। লোকের ধারণা, এই জায়গাটা ভুতুড়ে। সেই মমিটাকে মাঝে-মাঝে দেখতে পাওয়া গেছে, আবার মাঝে-মাঝে সেটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। তোর ভূতের ভয় নেই তো?"

"অ্যাঁ? না!"

"মুফতি মহম্মদ নামে একজন বৃদ্ধ কী সব ছবি এঁকেছিলেন, তা দেখে আমাদের কি এত কষ্ট করে এত দূরে আসার কোনো দরকার ছিল, বল?"

সন্তু এ-কথার কী উত্তর দেবে! সে কিছুই বলল না।

কাকাবাবু আবার বললেন, "আমি এলুম কেন জানিস? ঐ যে মুফতি মহম্মদ নির্দেশ দিলেন, তুমি আগে নিজে যাচাই করে দেখো, সেইজন্যই আমার কৌতূহল হল। এটা যেন বৃদ্ধের এক চ্যালেঞ্জ!"

টর্চের আলো এবারে একটা ফাঁকা জায়গায় পড়ল। সুড়ঙ্গটা শেষ হয়ে গেছে! সুড়ঙ্গটা খুব বেশি লম্বা নয়।

ফাঁকা জায়গাটিতে কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরের দিকে। সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসার পর একটি বেশ বড় চৌকো ঘর।

কাকাবাবু বললেন, "এই হল রানি হেটেফেরিসের সমাধিস্থান। এক সময় নাকি এখানে অতুল ঐশ্বর্য ছিল। একজন রানির যত জিনিস ব্যবহারে লাগে, সেই সব কিছু। ওরা বিশ্বাস করত কিনা যে, রাজা-রানিরা আবার হঠাৎ একদিন বেঁচে উঠতে পারে। তখন সব কিছু লাগবে তো!"

ঘরটার ঠিক মাঝখানে একটি কারুকার্য-করা পাথরের কফিন আরও তিন-চারটে কফিন ছড়ানো রয়েছে এদিক-ওদিকে।

বড় কফিনটা দেখিয়ে কাকাবাবু বললেন, "এই হচ্ছে রানি হেটেফেরিসের সারকোফেগাস। আর আগে দেখা যাক, এর মধ্যে রানির মমি আছে কি না! যদি থাকে, তা হলে দারুণ একটা আবিষ্কার হবে।"

সারকোফেগাসের ওপরে রানির ছবি আঁকা। কাকাবাবুর সঙ্গে ধরাধরি করে সন্তু ঢাকনাটা সরিয়ে ফেলল।

ভেতরটা ফাঁকা!

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, "জানতুম।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "অন্য কফিনগুলো খুলে দেখব?"

"কোনো লাভ নেই। পৃথিবীর নানা দেশের মিউজিয়ামে মমিগুলো ভাল দামে বিক্রি হয়। চুরি যাবার ভয়ে সব মমি সেইজন্য ওপরে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।"

সন্তু টর্চের আলো ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখতে লাগল দেওয়ালগুলো। প্রত্যেক দেওয়ালেই অসংখ্য ছবি। এইগুলোই হিয়েরোগ্লিফিকস। বোধহয় রানির জীবনকাহিনী লেখা আছে। কত শিল্পী, কত পরিশ্রম করে ঐ সব ছোট-ছোট ছবি এঁকেছে। কাকাবাবুও ঘুরে-ঘুরে দেওয়ালওয়ালা পরীক্ষা করতে-করতে এক জায়গায় থমকে দাঁড়ালেন।

"এইবার, সন্তু, মুফতি মহম্মদের শেষ ইচ্ছের কথা তোকে জানাতে হবে। কারণ, তোর সাহায্য ছাড়া এর আর কিছু করার সাধ্য নেই। তুই দেখা মানেই আমার দেখা।"

সন্তু ছিল উল্টো দিকের দেওয়ালের কাছে। সে তাড়াতাড়ি এদিকে চলে এল।

"কাকাবাবু, আমি অনেকটা আন্দাজ করেছি। এই ঘরে ঢুকেই বুঝতে পেরে গেছি।"

"তুই বুঝতে পেরে গেছিস? কী বুঝেছিস শুনি?"

"রানি হেটেফেরিসের মমি এখানেই কোথাও লুকোনো আছে। আর সেই লুকোনো জায়গাতেই মুফতি মহম্মদ সোনা আর টাকাপয়সা লুকিয়ে রেখেছেন।"

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন সন্তুর দিকে। তারপর হেসে ফেলে বললেন, "অনেকটা ঠিকই ধরেছিস তো। তবে টাকাপয়সার কথা নেই এর মধ্যে। মুফতি মহম্মদের শেষ ইচ্ছের কথা জানলে অনেকে ভাববে পাগলামি। উনি ছবি এঁকে যা জানাতে চাইছিলেন, তা হল এই: উনি খুব সংক্ষেপে লিখেছিলেন, আমি তোকে বুঝিয়ে বলছি। উনি এক সময় সাহেবদের কাছে গাইডের কাজ করতেন। সেই সময়েই আল বুখারি নামে আর-একজন গাইডের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। আল বুখারি অনেকগুলো পিরামিডের নীচে এবং গোপন সমাধিস্থানে ঢোকার রাস্তাও আবিষ্কার করেছিল। কিন্তু সেইসব আবিষ্কারের কৃতিত্ব সাহেবরাই নিয়ে নিত। একজন সাহেবকে জব্দ করার জন্যই আল বুখারি মুফতি মহম্মদের সাহায্য নিয়ে রানি হেটেফেরিসের মমি এক জায়গায় লুকিয়ে রাখে। মজা করবার জন্য ওরা সেই মমিটাকে মাঝে-মাঝে বার করে এনে সারকোফেগাসের মধ্যে রেখে দিত, মাঝে-মাঝে আবার সরিয়ে ফেলত। সেই থেকে ভূতের গল্প রটে যায় এ রকম ব্যাপার মাত্র দু'তিনবারই হয়েছিল। কিন্তু লোকে বিশ্বাস করত যে, রানির মমি প্রত্যেক বছর একবার করে ফিরে আসে। যাই হোক, আল বুখারি একটা দুর্ঘটনায় মারা যায়, মুফতি মহম্মদ গাইডের কাজ ছেড়ে বিপ্লবীদের দলে যোগ দেন। সেই থেকে মমিটা লুকোনো অবস্থাতেই আছে। মৃত্যুর আগে মুফতি মহম্মদ জানিয়ে দিতে চান যে, সেটা কোথায় আছে। কিন্তু এর মধ্যে যদি অন্য কেউ সেই গোপন জায়গাটা জেনে ফেলে মমিটা সরিয়ে ফেলে থাকে, তা হলে মুফতি মহম্মদ মিথ্যেবাদী হয়ে যাবেন। সেইজন্যই তিনি আগে আমাকে যাচাই করে নিতে বলেছেন।"

"সেই লুকোনো জায়গাটা কোথায়?"

"সেটা তোকে খুঁজে বার করতে হবে। এই দ্যাখ, এই দেওয়ালের গায়ে মাঝে-মাঝে খাঁজ কাটা আছে। এই খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে তুই ওপরে উঠতে পারবি? তোর কাঁধের ব্যাগটাতে দ্যাখ শক্ত নাইলনের দড়ি, লোহার হুক এই সব আমি এনেছি, যদি কাজে লাগে ভেবে।"

সন্তু ব্যাগ খুলে জিনিসগুলো বার করল। তারপর বলল, "আমার ওসব লাগবে না, আমি এমনিই উঠতে পারব।"

খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে সন্তু দেওয়াল বেয়ে উঠে গেল ওপরে।

কাকাবাবু টর্চের আলো ফেলে বললেন, "ঐ যে রানির ছবি দেখছিস, এরপর ডান দিকে পরপর নটা ছবি গুনে যা! গুনেছিস

এইবারে দশ নম্বর ছবিটার ওপর জোরে ধাক্কা দে।"

সন্তু ধাক্কা দিল, কিন্তু কিছুই হল না।

কাকাবাবু বললেন, "আরও জোরে ধাক্কা দিতে হবে। আল বুখারি আর মুফতি মহম্মদ দু'জনেই গাঁট্টাগোঁট্টা জোয়ান ছিলেন নিশ্চয়ই। তা ছাড়া বহু বছর জায়গাটা খোলা হয়নি!"

সন্তু প্রাণপণ শক্তিতে দুম-দুম করে ধাক্কা দিতে লাগল। তাও কিছুই হল না।

কাকাবাবু একটুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, "দ্যাখ তো, ঐ এক থেকে দশ নম্বর ছবির মতন ছবি তোর মাথার কাছে ছাদেও আঁকা আছে কি না!"

"হ্যাঁ, আছে।"

"ঐখানে ধাক্কা দে!"

এবারে ছাদের সেই জায়গাটায় ধাক্কা দিতেই সন্তুর হাত অনেকখানি ভেতরে ঢুকে গেল। সেখানকার একটা পাথর ভেতরে সরে গেছে। সেখানে আরও ধাক্কা দিতে দিতে একজন মানুষ গলে যাবার মতন জায়গা হয়ে গেল।

"টর্চ জ্বালতে পারবি? দ্যাখ তো, ওখানে কী আছে!"

"মেজেনিন ফ্লোরের মতন জায়গাটা। ভেতরে একটা কফিন আছে।"

"ঐটাই খুলে দেখতে হবে। ভেতরে ঢুকতে পারবি তো? খুব সাবধানে।"

সন্তু মাথা গলাতেই নীচে বেশ জোরে একটা শব্দ হল। সন্তু চমকে গিয়ে আবার মাথাটা বার করে আনল। নীচের দিকে তাকিয়ে যা দেখল তাতে তার রক্ত হিম হয়ে গেল একেবারে।

যেখানে শব্দটা হয়েছিল, কাকাবাবু টর্চের আলো ঘুরিয়েছেন সেই দিকে। সেখানে একটা কফিনের ঢাকনা খুলে গেছে। তার মধ্য থেকে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াচ্ছে একটা মূর্তি। একটা মমি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

সেই মূর্তি দেখে টর্চসুদ্ধু কাকাবাবুর হাতটাও কেঁপে গেল একবার। তারপর তিনি অস্ফুট গলায় বললেন, "আল মামুন!"

সন্তুও এবার চিনতে পারল। কিন্তু আল মামুন এখানে আগে থেকেই এল কী করে? কাকাবাবু তো কারুকেই বলেননি যে, তিনি কোথায় যাবেন।

আল মামুনের গায়ে একটা সাদা কাপড় জড়ানো। সেটা খুলে ফেলে সে একটা লম্বা ছুরি বার করল। তারপর হিংস্র গলায় বলল, "বিদেশী কুকুর! নিমকহারাম! আমি কলকাতায় গিয়ে তোর সঙ্গে দেখা করেছি। আমি দিল্লিতে মুফতি মহম্মদের সঙ্গে তোদের দেখা করিয়ে দিয়েছি। আর তুই ঐ কুত্তা হানি আলকাদির দলে যোগ দিয়েছিস?"

কাকাবাবু অনেকটা আপন মনে বললেন, "একটাই ভুল করেছি আমি। মিউজিয়ামের কিউরেটর মাস্টার কাছে রানি হেটেফেরিসের কথা বলে ফেলেছিলাম। সে বুঝি তোমার দলে, আল মামুন? কিংবা জোর করে তার কাছ থেকে কথা আদায় করে ফেলেছ! তুমি এত কষ্ট করে এখানে এলে কেন আল মামুন! মুফতি মহম্মদের যদি লুকোনো টাকা-পয়সা কিছু থাকেই, তুমি তো তার অর্ধেক ভাগ পাবে!

"অর্ধেক! ঐ শয়তানটাকে আমি অর্ধেক দেব? আমি মুফতি মহম্মদের উত্তরধিকারী। আমি তার সম্পদের সন্ধান পেয়ে গেছি। এখন তোমাকে আর ঐ খোকাটাকে আমি এখানেই শেষ করে দিয়ে যাব। এই সম্পদের কথা পৃথিবীর আর কেউ জানবে না!"

"তুমি আমাদের খুন করবে? তুমি ধর্মভীরু লোক, এরকম একটা অন্যায় করলে তোমার বিবেকে লাগবে না?"

"কেউ দেখবে না, কেউ জানবে না, তাতে আবার বিবেকের কী আসে যায়!"

"আল মামুন, তোমার মতন খুনিদের আমি কিন্তু খুব কঠিন শাস্তি দিই!"

আল মামুন ছুরি তুলে এগিয়ে আসতেই কাকাবাবু মাটি থেকে নাইলনের দড়িটা তুলে নিলেন। সন্তু ভাবল, ওপর থেকে সে আল মামুনের মাথার ওপর লাফিয়ে পড়বে কি না!

কাকাবাবু দড়িটা নিয়ে শপাং করে চাবুকের মতন শব্দ করে বললেন, "আগেকার দিনে তলোয়ার আর চাবুকের লড়াইয়ের কথা শোনোনি?"

বলেই তিনি চাবুকের মতন সেই দড়ির এক ঘা কষালেন আল মামুনের মুখে।

লড়াইটা শেষ হতে এক মিনিটও লাগল না। লম্বা দড়ির সঙ্গে ছুরি দিয়ে আল মামুন লড়তে পারলই না মোটে। কাকাবাবু তাকে অনবরত মারতে লাগলেন। আল মামুনের হাত থেকে ছুরি খসে পড়ে গেল। যন্ত্রণায় চিৎকার করতে লাগল সে। কাকাবাবু দড়ির ফাঁস তার গলায় লাগিয়ে হ্যাঁচকা টান দিতেই সে মাটিতে পড়ে গেল। দড়ির বাকি অংশটা দিয়ে কাকাবাবু তার হাত-পা বেঁধে ফেললেন।

তারপর যেন কিছুই হয়নি এই ভঙ্গিতে হাত নেড়ে তিনি সন্তুকে বললেন, "যা, ভেতরটা দেখে আয়।"

সন্তুর পা কাঁপছিল। নিজেকে একটুখানি সংযত করে সে টর্চটা মুখে চেপে নিল, তারপর দু'হাতে ভর দিয়ে মাথাটা গলাল ভেতরে।

ঠিক সেই মুহূর্তে তার মনে পড়ল রিনির মুখটা। রিনি তাকে ঠাট্টা করেছিল। বলেছিল গরুর শিঙের ওপর বসে থাকা একটা মশা! এখন সে একা মুফতি মহম্মদের সম্পদ আবিষ্কার করতে যাচ্ছে। কলকাতার পিকনিক গার্ডেনসের সেই থানাটার কথাও তার মনে পড়ে গেল এক ঝলক। সেই দারোগা যদি তাকে এই অবস্থায় দেখতেন!

ভেতরে ঢুকে গিয়ে সন্তু উবু হয়ে বসে টর্চ জ্বালল। তার গা ছমছম করছে। কেন যেন তার ধারণা হল, এখানে একটা অজগর সাপ থাকতে পারে। কাশ্মিরের সেই শুকনো কুয়োটার মধ্যে

যে-রকম ছিল।

কিন্তু সে-সব কিচ্ছু নেই। একটা শুধু কফিন, আর এক পাটি চটি পড়ে আছে। আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে সে কফিনের ঢাকনা খুলল।

খুলেই বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল তার। সেখানে সত্যিই একটা মমি রয়েছে। সন্তু ভূতের ভয় পায় না, তবু তার হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপছে। কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছে না সে।

তার দৃঢ় বিশ্বাস এই মমির গায়ে জড়ানো ব্যাণ্ডেজের মধ্যেই কিংবা এর নীচে প্রচুর ধনরত্ন আছে। কিন্তু সেটা পরীক্ষা করে দেখার জন্য সে হাত তুলতেই পারছে না।

অতি কষ্টে সন্তু চোখ বুজে হাতটা ছোঁয়াল মমির গায়ে। এবারে তার কাঁপুনি থেমে গেল। ভাল করে মমিটা পরীক্ষা করল। কয়েকখানা হাড় ছাড়া আর কিছুই টের পাচ্ছে না। মমির তলাতেও কিছু নেই।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সন্তু বুঝে গেল, তার আশা ব্যর্থ হয়েছে। ধনসম্পদ লুকিয়ে রাখা থাকলে তা তো একটু-আধটু হবে না। অনেক হবার কথা। থাকলে ঠিকই টের পাওয়া যেত।

হতাশ ভাবে ফিরে এসে সন্তু গর্তটাতে মুখ বাড়িয়ে বলল, "কাকাবাবু, কিছু নেই!"

"মমি নেই?"

"হ্যাঁ, মমি আছে। রানির মমিই মনে হচ্ছে, কিন্তু টাকাপয়সা বা সোনা-টোনা একটুও নেই!"

"মুফতি মহম্মদ তো টাকাপয়সার কথা বলেননি! তোকে আর-একটা কাজ করতে হবে। দ্যাখ্ তো, ঐ ঘরের দেয়ালে বা ছাদে বা কফিনের গায়ে কোনো ছবি আঁকা আছে কি না?"

সন্তু দেখে এসে বলল, "হ্যাঁ, আছে। কফিনের ঢাকনার ভেতরের দিকে পাঁচটা ছোট ছোট ছবি আছে।"

কাকাবাবু ঝোলাব্যাগটা সন্তুর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "এর মধ্যে কাগজ-কলম আছে। তুই তো একটু-আধটু ছবি আঁকতে পারিস, খুব সাবধানে ঐ ছবিগুলো কপি করে নিয়ে আয় তো!"

ছবিগুলো কপি করতে সন্তুর আরও দশ মিনিট লাগল। তারপর চটিজুতোটা কুড়িয়ে নিয়ে সে নেমে এল। জুতোটা চামড়া বা রবারের নয়। কোনো ধাতুর। সোনারও হতে পারে। ওপরে শ্যাওলা জমে গেছে।

কাকাবাবু আল মামুনের মুখের ওপর টর্চ ফেলে বললেন, "তোমাকে আমি খুলে দিচ্ছি না!"

আল মামুন বলল, "আমাকে বাঁচাও, তোমাকে আমি দশ লাখ টাকা দেব!"

"তুমি আমাদের খুন করতে চেয়েছিলে! তার বদলে তুমি অন্তত একটা দিন মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করো!"

সন্তুকে নিয়ে কাকাবাবু সেই হলঘর থেকে বেরিয়ে ঢুকে পড়লেন সুড়ঙ্গে। সেটা পার হতেই ডাগো আবদাল্লাকে দেখতে পাওয়া গেল। সে অধীর ভাবে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল। তারপর আর ওপরে উঠতে কোনো অসুবিধে হল না।

হানি আলকাদি কোথা থেকে ছুটে এসে কাকাবাবুর হাত জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল, "মিঃ রায়চৌধুরী, ইউ গট ইট?"

কাকাবাবু বললেন, "শোনো, মনটা শক্ত করো। দুঃসংবাদ শুনে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যেও না। মুফতি মহম্মদের গোপন কথা হচ্ছে রানি হেটেফেরিসের মমি। সেটা আবিষ্কারের কৃতিত্ব তুমি নাও বা যে-ই নাও, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। সেখানে টাকাপয়সা বা অস্ত্রশস্ত্র কিছুই পাওয়া যায়নি। এই এক পাটি চটি পাওয়া গেছে, বোধহয় এটা সোনার তৈরি। কে এটা ফেলে গেছে জানি না। এর অর্ধেক তুমি ইচ্ছে করলে আল মামুনকে দিতে পারো। সে অবশ্য নীচে শুয়ে আছে। বিকেলের দিকে কোনো লোক পাঠিয়ে তাকে উদ্ধার করতে হবে।"

হানি আলকাদি রাগের চোটে চটিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে!

কাকাবাবু বললেন, "আমার এখন বিশ্রাম দরকার একটু। আমি ক্লান্ত। এখানে একটা রেস্ট হাউস তৈরি হয়েছে না?"

আগের রাতে ঘুম হয়নি, তার ওপর এত উত্তেজনা ও পরিশ্রম। সন্তু আর কাকাবাবু দু'জনেই ঘুমোল প্রায় সন্ধে পর্যন্ত।

সন্তু জেগে উঠে দেখল, রিনি, সিদ্ধার্থ, বিমান সবাই এসে বসে আছে। সিদ্ধার্থ বিমানের কাছে খবর পেয়ে কাল রাতেই এখানকার সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। আজ তারা খুঁজতে-খুঁজতে গিজাতে এসে পৌঁছেছে।

রিনি বলল, "সন্তু, সব ঘটনা আমি আগে শুনব। তার আগে তুই আর কারুকে বলতে পারবি না!"

কাকাবাবু ঠিক করলেন, তখুনি কায়রোর দিকে রওনা হবেন। ডাগো আবদাল্লাকে তিনি অনেক টাকা বখশিশ দিলেন। তারপর তাকে বললেন, একটু পরেই সে গিয়ে যেন আল মামুনকে মুক্তি দিয়ে আসে।

তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "হানি আলকাদি কোথায়?"

ডাগো বলল, "সে তো চলে গেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার কাছ থেকে সে বিদায় না নিয়ে চলে গেল? হতেই পারে না। তার খোঁজ নিয়ে দ্যাখো।"

একটু খোঁজাখুঁজি করতেই তাকে এক আরবের বাড়িতে পাওয়া গেল। সেও ঘুমোচ্ছিল। মনের দুঃখেও তো মানুষের খুব ঘুম পায়।

কাকাবাবু তাকে একলা একটু দূরে ডেকে নিয়ে গেলেন। তারপর বললেন, "আমি চলে যাচ্ছি। তোমার কোনো উপকার করতে পারলুম না, সেজন্য দুঃখিত।"

হানি আলকাদি বিষণ্ণভাবে বলল, "তবু যে তুমি মুফতি মহম্মদের কথা রাখবার জন্য এত দূরে ছুটে এসে এত কষ্ট করলে, সে জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।"

কাকাবাবু পকেট থেকে একটা কাগজ বার করলেন। তারপর বললেন, "রানির লুকোনো কফিনের গায়ে কয়েকটি ছবি আঁকা আছে। সেগুলো আসলে সংকেত-লিপি। সেটা আমি তোমার জন্য অনুবাদ করে দিয়েছি। তাতে লেখা আছে, ফারাও আসেমহেটে তৃতীয়'র সমাধিস্থান। তৃতীয় কক্ষ। ডান দিকের দেয়ালের ওপর দিকে ঠিক পাঁচটি ছবি আঁকা আছে। আমার মনে হয়, সেই ছবি আর এই কফিনের গায়ের ছবি মুফতি মহম্মদের আঁকা। খুব সম্ভবত সেখানে কিছু লুকিয়ে রাখা আছে। রানির মমির কথা বলে তিনি সেই কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন। সেখানে কী আছে না আছে তা আমি আর দেখতে চাই না। তুমি গিয়ে দ্যাখো, যা আশা করছ তা হয়তো ওখানেই পেতে পারো। গুড লাক!"

আনন্দে চকচক করে উঠল হানি আলকাদির চোখ। সে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল কাকাবাবুকে।

ক্লিয়ারাসিল তুলোর পরীক্ষা করে দেখুন। তেল আর ময়লা দেখছেন তো? এর জন্যই তো ব্রণ হ'তে পারে।

ক্লিয়ারাসিল মেডিকেটেড ক্লেনজার লুকোনো তেলও ময়লা বার করে দিয়ে, মুখমণ্ডলে যে ত্বকের সমস্যার উদ্ভব হয় তা প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে

তেলতেলে ত্বক ব্রণ হবার মুখ্য কারণ

তেলতেলে ত্বক ধুলোবালি আকর্ষণ করে বলে লোমকূপের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে ব্রণ দেখা দেয়। সাধারণ সাবান ও জল শুধু ত্বকের ওপরের ভাগের ময়লাটুকুই পরিষ্কার করতে পারে।

ক্লিয়ারাসিল মেডিকেটেড ক্লেনজার— তেলতেলে ত্বকের জন্য বিশেষ ফর্মুলায় তৈরী

ক্লিয়ারাসিল মেডিকেটেড ক্লেনজার ত্বকের গভীরে গিয়ে পরিষ্কার করার ক্ষমতাযুক্ত এবং এতে আছে বিশেষ ঔষধিযুক্ত ফর্মুলা। এর তেল দ্রবকারী ক্ষমতা এবং পরিষ্কার করার উপাদানগুলি লোমকূপের মুখ খুলে দেয় এবং ত্বকের গভীরে গিয়ে লুকোনো তেল ও ময়লা বার করে আনে।

প্রমাণের জন্য, এই তুলোর পরীক্ষাটি করে দেখুন।

প্রথমে আপনার মুখটি যথারীতি ধুয়ে নিন। এবার কিছু তুলো ক্লিয়ারাসিল মেডিকেটেড ক্লেনজার দিয়ে ভিজিয়ে নিন। এটি দিয়ে মুখ অর্থাৎ, নাক, কপাল, গাল, থুতনীর আসেপাশে মুছে নিন।

ময়লা দেখতে পেলেন তো? এতেই প্রমাণ হয় সাধারণ সাবান ও জল লুকোনো তেল ও ময়লা পরিষ্কার করতে সফল হয় না, কিন্তু ক্লিয়ারাসিল মেডিকেটেড ক্লেনজার কত সহজে তা করেছে।

রক্ষাপ্রদ ঔষধিক্রিয়া ত্বকের সমস্যার সমাধান করেই চলে।

আপনার ব্যবহারের পরেও ক্লিয়ারাসিল মেডিকেটেড ক্লেনজার ঘণ্টার পর ঘণ্টা আপনার ত্বককে রক্ষা করে চলে।

সবচেয়ে ভাল ফল পেতে হলে: দিনে দুবার বা তিনবার ব্যবহার করুন।

OBM-3362-BEN

(বাঁয়ে) লালা অমরনাথ, (ডাইনে) মুস্তাক আলি। দুটিই তাঁদের প্রবীণ বয়সের ছবি

লালা আর মুস্তাক

রাজু মুখোপাধ্যায়

লালা অমরনাথ কেমন খেলোয়াড় ছিলেন ? এই ধরনের প্রশ্ন আজকাল অল্পবয়স্ক ক্রিকেট অনুরাগীরা প্রায়ই করে। কারণও আছে। খেলোয়াড় অমরনাথের প্রশংসা তারা বয়োজ্যেষ্ঠদের মুখে অনবরতই শোনে, কিন্তু হিসেবের খাতায় তাঁর গড় রানসংখ্যা ইত্যাদি, তুলনামূলক বিচারে, নিতান্তই সাধারণ। খুবই স্বাভাবিকভাবে তাই প্রশ্ন ওঠে, "তাহলে আর এমন কী খেলোয়াড় !"

কিন্তু লালা অমরনাথের প্রতিভা যদি ঠিক করে বিচার করতে হয়, তা হলে দেখতে হবে সেকালের পরিস্থিতির মধ্যে তিনি কেমনভাবে রান করেছিলেন। ডগলাস্ জার্ডিনের ইংল্যাণ্ড দলের বিপক্ষে জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামেন লালা অমরনাথ। ক্লার্ক, নিকল্‌স্ আর বিখ্যাত স্পিনার হেডলি ভেরিটির আক্রমণের ধাক্কায় ভারতের ব্যাটিং নড়বড়ে হয়ে গেল। আমাদের ২৯৯ রানের উত্তরে ইংল্যাণ্ড জবাব দিল ৪৩৮ করে। দ্বিতীয় দফাতেও ভারতের মাত্র ২১ রানে ২ উইকেট পড়ে যায়। তারপর শুরু হল বম্বের ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে ভারতীয় ক্রিকেটের এক গৌরবময় অধ্যায়।

এক প্রান্তে অভিজ্ঞ অধিনায়ক সি· কে· নাইডু, আর অপর প্রান্তে পঞ্জাবের তরুণ লালা অমরনাথ। ইনিংসের ভিতটাকে শক্ত করে তৈরি করার উদ্দেশ্যে শুরু হল পিচের সঙ্গে, বোলিংয়ের সঙ্গে ধাতস্থ হবার পালা। কিছু রান ওঠার পর দর্শকরা দেখল, বহু যুদ্ধের নায়ক সি· কে· নাইডু নবাগত লালার কাঁধে হাত রেখে ফিসফিস করে কী যেন বলছেন।

সেদিন ২১ বছরের লালাকে কী মন্ত্র দেওয়া হয়েছিল তা আজও আমাদের অজানা, কিন্তু এক অদ্ভুত ধরনের দৈব-শক্তি যে লালার উপরে সেদিন ভর করেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নিমেষের মধ্যে তাঁর ব্যাটিংয়ে এক আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। উইকেটের চারপাশে শুরু হল স্ট্রোকের বন্যা। হুক, কাট, পুল, ড্রাইভ, কোনোকিছুই বাদ নেই। লালা অমরনাথের কেতাবি মারের সামনে কোনো বোলারই সেদিন স্বস্তি বোধ করেননি, কিংবা পারেননি তাঁর আনুগত্য আদায় করতে।

লাঞ্চের পর যখন এক মারাত্মক স্কোয়ার ড্রাইভ সীমানা পেরিয়ে দর্শকদের মধ্যে চলে যায়, সেই মুহূর্তটি ভারতীয় ক্রিকেটের এক অতি শুভ মুহূর্ত। অমরনাথ যে সেদিন শুধু ভারতীয়দের মধ্যে টেস্টে প্রথম শতরান করলেন, তা নয়, দর্শকদের মধ্যেও এনে দিলেন এক নতুন জাগরণ। পরাধীন ভারতবাসীর বুক গর্বে, আত্মমর্যাদায় ফুলে উঠল।

লালা অমরনাথের খেলোয়াড়ি দক্ষতাকে শুধু আগ্নেয়গিরির সঙ্গেই তুলনা করা সম্ভব। কখনও ভয়ঙ্কর, আবার কখনও নিস্তব্ধ। কিন্তু সব সময়েই এক আতঙ্ক।

অস্ট্রেলিয়া-সফরে তিনি ছিলেন অধিনায়ক স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যানের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। ভারতের বিপর্যয়ের মধ্যে হাজারে, মাঁকড় আর অমরনাথ যে খেলা সেবার খেলেছিলেন, তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন স্বয়ং ব্র্যাডম্যানও। চৌকস খেলোয়াড় অমরনাথের মিডিয়াম পেস্ বোলিং, আক্রমণাত্মক নেতৃত্ব আর অসাধারণ স্ট্রোক-প্লে অস্ট্রেলিয়ানদের মুগ্ধ করেছিল।

কিন্তু অত দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও কেন অমরনাথের টেস্ট পারফরম্যান্স তেমন ভাল নয়? যাঁরা লালাকে সামনে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁদের ধারণা, তাঁর মধ্যে সংযম বস্তুটার ভীষণ অভাব ছিল। শুধু ক্রিকেট খেলায় নয়, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও সংযমের অভাবে তিনি প্রায়ই ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে নিজের বিপদ ডেকে আনতেন। তাঁর জীবন থেকে তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, যতই প্রতিভা থাকুক না কেন, সংযম আর মানসিক স্থিরতা না থাকলে সেই প্রতিভার প্রতি সুবিচার করা সম্ভব নয়।

অবশ্য ১৯৩৬ সালে অমরনাথকে যখন ইংল্যাণ্ড থেকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়, তখন নিঃসন্দেহে তাঁর প্রতি অন্যায় করা হয়েছিল। অধিনায়ক 'ভিজি'র পক্ষপাতিত্বের জন্য দলের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকত। ক্রিকেট-জ্ঞানও ছিল তাঁর অতি সামান্য, সেজন্য মাঠে প্রায়ই অদ্ভুত ধরনের সিদ্ধান্ত নিতেন। রাজা-মহারাজাদের সঙ্গে কথা বলবার সময় অন্য খেলোয়াড়রা স্পষ্ট করে নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করতেন না, কিন্তু লালা ছিলেন ব্যতিক্রম। অধিনায়কের খামখেয়ালির বিরুদ্ধে আপত্তি করায় অল্পদিনের মধ্যেই তাঁকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়। এই অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ভারতীয় জনগণ তদন্তের দাবি তোলেন। অবশেষে ক্রিকেট বোর্ড তদন্ত করে রায় দেন যে, অমরনাথ নির্দোষ, তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়েছে। ওই সফরে ওই ক'দিনের মধ্যেই লালা অমরনাথ মাত্র ১০টা ম্যাচে তিনটি শতরানসহ ৬১৩ রান আর ৩২টি উইকেট দখল করে ক্রিকেটমহলে সাড়া জাগিয়েছিলেন।

পরবর্তী জীবনে লালা অমরনাথ নির্বাচক, সমালোচক ও ভাষ্যকার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন. কিন্তু তাঁর দুর্দান্ত ব্যাটিং যোগ্য স্বীকৃতি পায়নি। কোনোরকমের চোখরাঙানি বা ধমকানি কোনোদিনও তাঁকে আপোসের পথে ঠেলে দিতে পারেনি। এটা নিশ্চয়ই প্রশংসার কথা।

॥ ২ ॥

দিনের প্রথম বল করতে ছুটে এলেন দীর্ঘকায় ফাস্ট বোলার। ছোট আউটসুইং. অফ স্টাম্পের অল্প বাইরে। যে আউটসুইং বিশ্বের বাঘা বাঘা ব্যাটস্‌ম্যানদের হিমশিম খাইয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে অপর প্রান্তের ব্যাটস্‌ম্যানদের লেটকাট করে স্লিপ আর গালি অঞ্চলের মাঝ দিয়ে বলটাকে সীমানা পার করে দিলেন। পরের বল ইয়র্কার, একেবারে মিডল স্টাম্পের গোড়ায়। এবার নিমেষের মধ্যে হাফভলি তৈরি করে বোলারের মাথার ওপর দিয়ে সজোরে ড্রাইভ। চার রান। দর্শকরা অবাক, কী বেপরোয়া ব্যাটস্‌ম্যান রে! তাঁরা জানেন না কে ইনি। টেস্টে ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে এসেছেন। ফিল্ডস্‌ম্যানেরাও হতভম্ব। এ আবার কোথাকার আনাড়ি এসে জুটল!

হ্যাঁ, খেলাটা টেস্ট ম্যাচ। ভারত বনাম ইংল্যাণ্ড। ১৯৩৬ সালের ওভাল টেস্ট। কিন্তু ব্যাটস্‌ম্যানটি বেপরোয়াও নন, আনাড়িও নন। রঞ্জি ট্রফিতে যাঁর সতেরোটা আর টেস্টে দু'দুটো শতরান, তাঁর দায়িত্বজ্ঞান আর দক্ষতা নিয়ে নিশ্চয় কোনো প্রশ্ন উঠবে না। তবে তাঁর ব্যাট করার ধরন ছিল নিজস্ব। খেলার মাঠে দর্শকদের আনন্দ দেওয়াই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। খেলার মাঠ থেকে অবসর নেবার চল্লিশ বছর পর আজও মুস্তাক আলির স্মৃতি লোকের মুখে মুখে।

তিরিশ আর চল্লিশের দশকে ভারতে রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতার পাশে কোয়াড্রাঙ্গুলার আর পেন্টাঙ্গুলার দুটি প্রতিযোগিতা হত, ধর্মীয় ভিত্তিতে। মুস্তাক আলি ছিলেন মুসলিম দলের অপরিহার্য খেলোয়াড়। তখনকার এই সব খেলায় ছিল ভীষণ রেষারেষি। কিন্তু তারই মধ্যে কিছু খেলোয়াড় ছিলেন ব্যতিক্রম। তাঁদেরই একজন মুস্তাক আলি। কোনোরকমের রাগারাগি-দলাদলি তাঁকে বেঁধে ফেলতে পারেনি। ক্রিকেট খেলার মধ্যে তিনি পেয়েছিলেন আনন্দ, আর সেই আনন্দ দর্শকদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়াই যেন ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য।

এমন কী, টেস্ট খেলাতেও তাঁর সেই হাল্কা মেজাজের বিন্দুমাত্র হেরফের হয়নি। টেস্টের প্রথম বল আর শেষ বলে তাঁর কাছে কোনো পার্থক্য ছিল না। প্রতিটি ডেলিভারিই ছিল তাঁর কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। হারবার ভয়ে লড়ব না, এমন কথা মুস্তাক আলি স্বপ্নেও ভাবেননি। বোলারের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি যেমন জিতেওছেন, তেমন হেরেওছেন। কিন্তু হারুন আর জিতুন, তাঁর সেই হাসি, তাঁর সেই যৌবনের চাঞ্চল্য সর্বদাই ছিল অটুট। দর্শকদের আনন্দ দিতে চাইতেন তিনি। পুরোমাত্রায় দিতেনও।

মুস্তাক আলির হাল্কা মেজাজ আর সৌন্দর্যময় ক্রিকেট খেলার পদ্ধতির কথা পড়ে অল্পবয়স্ক ক্রিকেট-অনুরাগীরা যেন না মনে করে যে. তিনি সর্বদাই অতিশয় আক্রমণাত্মক ধরনের ব্যাট করতেন। এমন ধারণা করলে সত্যি ভুল করা হবে। কারণ, দলের অবস্থা উপলব্ধি করে ব্যাট করাই হল বড় মাপের খেলোয়াড়ের পরিচয়, আর মুস্তাক আলি অবশ্যই ছিলেন বড় মাপের খেলোয়াড়। তিনি আক্রমণাত্মক ক্রিকেটে বিশ্বাসী ছিলেন ঠিকই, তবে দলের প্রয়োজনে তিনি বহুবার যথেষ্ট সংযমের সঙ্গে লড়াই চালিয়েছেন। তবে তাঁর দেওয়ালে পিঠ রেখে রক্ষণাত্মক খেলার মধ্যেও ছিল এক ধরনের সহজ ভঙ্গি আর চনমনে গতির ছাপ। তিনি ছিলেন পরবর্তীকালের সেলিম দুরানি আর গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথের মতো প্রকৃত শিল্পী. আর এই গুণই তাঁকে অন্যদের থেকে ঊর্ধ্বে রেখেছিল।

১৯৩৬ সালের সেই ওভাল টেস্ট ম্যাচে মুস্তাক আলি আর বিজয় মার্চেন্ট দুজনেই শতরান পূর্ণ করেন। ভারতের হয়ে বিদেশের মাঠে টেস্ট ম্যাচে প্রথম সেঞ্চুরি করার কৃতিত্ব মুস্তাক আলিরই। মুস্তাকের ব্যাট করার ভঙ্গি দেখে ইংরেজ সাংবাদিকরা অবাক। সকলের মুখেই এক প্রশ্ন—এ আবার কোন্ জাদুকর? স্টাম্পের বল লেগ গ্লানস্। গুড লেংথ বলে সজোরে ড্রাইভ। হামেশাই ফিল্ডারদের ওপর দিয়ে লিফ্ট।

মুস্তাক আলির দৃষ্টিশক্তি ছিল তীক্ষ্ণ, আর ফুটওয়ার্ক নিখুঁত। এই দুইয়ে মিলে এই সাহসী ওপেনারকে এক অন্য, অনন্য স্তরে নিয়ে যায়। মুস্তাক আলির মতো খেলোয়াড়ের যোগ্যতার বিচার গড়-হিসাব দিয়ে করা সম্ভব নয়।

ভারতীয় ক্রিকেটের প্রবাদপুরুষ সি· কে· নাইডুর হোলকার দলে মুস্তাক আলির আবির্ভাব হয় বাঁ-হাতি স্পিন বোলার হিসেবে। সেকালের ভারতীয় দলের ফিল্ডিংয়ের মান ছিল অতি সাধারণ, কিন্তু মুস্তাক ছিলেন ব্যতিক্রম। তাঁর সেই ছিপ্‌ছিপে লম্বা চেহারা আজও আমাদের বিস্ময় জাগায়, আজও তাঁর শরীরে এতটুকু মেদ লাগেনি।

দর্শকদের কাছে মুস্তাক আলি যত প্রিয় হোন না কেন, নির্বাচকরা কিন্তু তার প্রতি সুবিচার করেননি। ১৯৪৫ সালে কলকাতা টেস্টে তাঁকে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়। সঙ্গে-সঙ্গে কলকাতা যেন খেপে উঠল। জনতার 'নো মুস্তাক, নো টেস্ট' দাবি নির্বাচকরা শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে বাধ্য হলেন। এ ধরনের জনপ্রিয়তা বিশ্ব-ক্রিকেটে কেউ পেয়েছে বলে আমার জানা নেই।

মুস্তাক আলির চেহারা, নড়াচড়া, কথাবার্তার মধ্যে এক অদ্ভুত ধরনের সাবলীলতা আছে। তাঁর কাছে সব কিছুই যেন অতি সহজ। প্রতিভাবান শিল্পীর এক প্রকৃত অভিজ্ঞান।

অপরের কৃতিত্বে ঈর্ষায় ভোগা নতুন ব্যারাম নয়। আর তাই অসাধারণ প্রতিভা থাকার 'দোষেই' মুস্তাক আলি অনেক ক্ষেত্রে অবিচারের শিকার হন। কিন্তু শত অবিচারও মুস্তাক আলির মাথা নিচু করাতে পারেনি। যাঁরা অন্যায়, অবিচার সত্ত্বেও মাথা উঁচু করে জীবনযাপন করেছেন বা করছেন, তাঁরা অবশ্যই আমাদের পরম শ্রদ্ধার পাত্র। মুস্তাক আলি এই ধরনেরই এক আদর্শ লোক।

সম্পূর্ণ উপন্যাস

বাঘের মাংস

বুদ্ধদেব গুহ

“আউ কেত্তে বাট্ট হব্ব দণ্ডধর টুল্লকা বাংলা ?” চলতে-চলতেই দণ্ডধরকে প্রশ্ন করলাম। তাতে, আমার দিকে মুখ না-ফিরিয়েই উত্তর দিল দণ্ডধর, “হব্ব দ্বি ক্রোশখণ্ডে। আউ কঁড় ?”

“বাপ্পালো বাপ্পা ! দ্বি ক্রোশ ? মু আউ চাঁলি পারিবনি।” হতাশ গলায় বললাম আমি।

“চালি পারিবুনি ? ইঃ, আউ কড় করিবি ? এই ভীষ্বণ গহন জঙ্গলরে রহিবি কি মরিবা পাঁই ? চঞ্চড় করিকি চালুন্ত ঋজুবাবু। এই ঠি বহত্ব গল্ল আছি। বড্ড বড্ড গল্ল।”

প্রায় কেঁদে ফেলে একটা পাথরে বসে পড়ে দণ্ডকে বললাম, “না ম'। মোর গোড়টা কেম্বতি ফুলি গল্লা দেখিলু ! মু আউ জম্মা চালি পারিবুনি।”

“কাম্ব সারিলা !” বলেই, প্রচণ্ড বিরক্তির সঙ্গে আমি যে পাথরে বসে পড়েছিলাম, তারই পাশের একটা পাথরে বসল সে। নিজে বসার লোক দণ্ডধর আদৌ নয় যদিও অন্যকে যখন-তখন পথে বসানোই তার কাজ।

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

আমাদের জিপটা খারাপ হয়ে গেছিল পুরুনাকোট্ থেকে টুল্লকাতে আসার পথে। এ পথে এমন জঙ্গল-পাহাড় যে, দিনমানে চলতেই বুক দুরুদুরু করে। আর এখন তো রাত বারোটা। তাও আবার কৃষ্ণপক্ষের রাত। চাঁদ উঠবে শেষ রাতে। কেন যে জিপেই শুয়ে থাকলাম না, তাই ভাবছিলাম। এই দগুটার পাল্লায় পড়ে আজ যে কত দণ্ড দিতে হবে তা ভগবানই জানেন। জীবনটাই যাবে হয়তো। পাঁচটা নয়, দশটা নয়, মাত্র একটাই জীবন।

দণ্ড জলের বোতলটা এগিয়ে দিল, কথা না বলে। রেগে গেলে ও কথাবার্তা বলে না। মাঝে-মাঝে গলা দিয়ে পিলে-চমকানো একটা আওয়াজ করে, আর পিচিক পিচিক করে তিনহাত দূরে থুথু ফেলে। মিস্টার ডাকুয়ার এই ব্যাপারটা ঠিক কাসিও নয়, হাঁচিও নয়, গলা-খাঁকারিও নয়। এক কথায় তাকে 'কাহাঁখাঁ' বলা চলে। ওর ওই কাহাঁখাঁ হঠাৎ শুনে আমি তো কোন্ ছার, অনেক বড় বড় হিম্মতদার লোককে পর্যন্ত ঘেবড়ে যেতে দেখেছি।

ডিসেম্বরের রাতেও আমার জার্কিন ঘামে ভিজে গেছে। বসে, বন্দুকটা দু' হাঁটুর মধ্যে রেখে, একটু জিরিয়ে নেবার পর পাইপের পোড়া তামাক খুঁচিয়ে ফেলে আবার নতুন করে টোব্যাকো ঠাসতে লাগলাম। দণ্ডকে খুশি করার জন্যে পাইপের টোব্যাকো এগিয়ে দিয়ে বললাম, "টিক্কে তামাকু ?"

মুখে শব্দ না করে ও দুদিকে মাথা নাড়ল, দক্ষিণ ভারতীয়দের মতো। তারপর নেড়েই চলল।

বুঝলাম, প্রচণ্ড বিরক্ত হয়েছে আমার উপর। ও যখন তামাক নিলই না, অগত্যা তখন দেশলাই ঠুকে পাইপটা ধরালাম। ঠিক সেই সময়েই মহানদীর দিক থেকে, একটা বড় বাঘ জঙ্গলের গভীরে ডেকে উঠল। অবশ্য বেশ দূরে। তার এবং আমাদের পথের মধ্যে একটা বড় টিলাও ছিল। ডাক শোনামাত্রই দণ্ড তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। অন্ধকারে তার চোখ দুটো বাঘের চোখের মতোই জ্বলে উঠল। বলল, "ই সে বাঘটা হব্ব নিশ্চয়ই।"

আমি ইচ্ছে করেই টিপ্পনী কেটে বসলাম, "হঃ। তাংকু বদনরে টিক্কিটু লাগিছি। তু ত সব্ব জানিচি !"

ভীষণ রেগে গিয়ে দণ্ড বলল, "মু জানিচি, না কঁড় তম্বমানংকু সান্যাল ডি· এফ· ও· জানিচি ?"

সান্যাল ডি· এফ· ও·-র উপর দণ্ডর ভীষণ রাগ। আমারও রাগ কম নয়। কিন্তু সে-গল্প এখানে নয়। এই "সব্ব জানিচি" কথাটা প্রায়ই দণ্ড দর্পভরে বলত বটে, কিন্তু সেই দর্প বা দম্ভ মিথ্যা আস্ফালন একেবারেই ছিল না। সব কৃতী মানুষেরই বোধহয় একটু দম্ভ থাকে। বিশেষ করে সেই কৃতিত্ব যদি চালাকি বা চুরি করে না অর্জিত হয়। দণ্ড সেইসব সত্যিকারের কৃতীরই একজন। আসলে, একে দম্ভ না বলে বোধহয় আত্মসম্মান বলাই ভাল। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের ভাষায় যা হচ্ছে 'দ্য বেটার হাফ অফ প্রাইড।' যে সময়ের কথা বলছি, সেই সময়ে এই অঞ্চলের বনজঙ্গল দণ্ডর মতো ভাল আর কেউই জানত বলে আমার মনে পড়ে না। তবে বাঘেদের ঠিকানায় তো আর পিন্‌কোডের ছাপ মারা থাকে না, কখনও কখনও এক রাতে তারা পঞ্চাশ মাইলও টহল মেরে ফেলে। এইটাই বাঘমুণ্ডার বাঘ, এ-কথাটা আন্দাজে ঢিল।

আমার পাইপ-খাওয়া দণ্ডর আর সহ্য হল না। ধমকে বলল, "চালুন্তু, চালুন্তু, আউ কেত্তে ভুশভুশ করিবে ?"

উঠলাম অগত্যা।

জিপটা পথের বাঁ পাশে ঠেলে পার্ক করে রেখে এসেছি আমরা। ভয় হচ্ছে, রাতে হাতিতে ফুটবল না খেলে তা দিয়ে। অংগুল থেকে ফার্স্টক্লাস 'পোড়-পিঠা' কিনেছিলাম। সেগুলো সঙ্গে নিয়ে এলে, অথবা পেটে ভরে নিয়ে এলেও মন্দ হত না। জিপ খারাপ হয়েছিল পুরুনাকোটের গেট পেরুনোর মাইলখানেক পরেই। পুরুনাকোটে গেলেই ভাল হত। অনেক কাছেও হত। কিন্তু কে কার কথা শোনে! টুল্লকা বাংলোতে দণ্ডর দুই চেলা ভীম আর দুযোধন গুরাল্টির 'নলা-পোড়া' বানিয়ে রাখবে যত্ন করে। রাতে ফিরে নলা-পোড়ার সঙ্গে খিচুড়ি না খেতে পারলে 'এ ছার জীবন রাখারই আর কোনো মানে হয় না' বলে জেদ ধরল দণ্ড। নলা-পোড়া খেতে অবশ্য চমৎকার। গুরাল্টি, অর্থাৎ মাউস্-ডিয়ারের মাংস ডুমো ডুমো করে কেটে নুন না-ছুঁইয়ে কাবাবের মশলা মাখিয়ে নলা-বাঁশের একমুখ ফুটো করে তার ভেতরে পুরে কাদা দিয়ে সেই মুখ সেঁটে বন্ধ করে ক্যাম্প ফায়ারের আগুনের মধ্যে ফেলে দিতে হয়। তারপর বাঁশের মধ্যে কাবাব তৈরি হয়ে গেলে ফটাং শব্দ সহকারে নলাবাঁশ ফেটে যায়। তখন আগুন থেকে বের করে প্লেটে ঢেলে জম্পেশ করে নুন মাখিয়ে, কাঁচালঙ্কা আর পেঁয়াজ দিয়ে খেতে এক্কেবারে ফাস্টোকেলাস। হাজারিবাগের হান্নানের দোকানের কাবাবও হেরে যাবে নলা-পোড়ার কাছে। এসব দণ্ডধরের পক্ষেই সম্ভব। নইলে, ভীম আর দুর্যোধনের মধ্যে এমন গলাগলি ভাবই বা কী করে যে হয়, তাও আমার মোটা বুদ্ধির বাইরে। এমন অহি-নকুলের ভালবাসা একমাত্র গ্রেট দণ্ডধর ডাকুয়াই ঘটাতে পারে।

জিপ থেকে নেমে মাইলখানেক আসার পরেই আমার ডানপায়ের জুতোটি বিদ্রোহ ঘোষণা করে তার সোল্‌টিকে মুক্তি দিয়েছিল। একটি ধারালো পাথরের মুখে পড়ে তার কিছু আগে হিল্‌টিও হাপিস্ হয়ে যায়। তাই ডান পায়ে আমার জুতোর উপরের খোলসটি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ঐ ঠাণ্ডা আইসক্রিমের মতো ধুলো, বরফের ছুরির মতো পাথর আর আলপিনের মতো কাঁটায় পা আমার ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছিল।

রাত আড়াইটে নাগাদ টুল্লকায় পৌঁছে মুগের ডালের খিচুড়ি এবং গুরাল্টির নলা-পোড়া খেয়ে পায়ের সব কষ্টই যেন লাঘব হয়ে গেল। পথে ঘটনা তেমন আর বিশেষ ঘটেনি। একটা ভাল্লুকের সঙ্গে কুস্তি লড়তে হত, যদি না দণ্ড তার রোলেক্স গামছা মাথার উপর ধরে 'ওরে মোরঅ সজনী, ছাড়ি গল্লা গুণমনি, কা কর ধরিবি' গেয়ে গেয়ে তাকে নাচ না দেখাত। রুপোলি জরি-বসানো ঘোরতর লাল রঙের রোলেক্স গামছাটি দণ্ডর সব সময়ের সঙ্গী। এমন মালটিপারপাস্ গামছা বড় একটা দেখিনি। সর্বসময়ই কাঁধে শোভা পায়।

॥ ২ ॥

বেলা এগারোটা নাগাদ জব্বর ঘুমিয়ে উঠেছি। খুব ভোরে উঠেই চলে গেছিল দণ্ড রফিককে সঙ্গে করে নিয়ে। ট্রাকে, কুলিদেরও নিয়ে গেছিল। সুরবাবুকে বলে। আমার ঘুম ভাঙার পর ও জিপ নিয়ে হৈ-হল্লা করতে করতে ফিরে এল। সঙ্গে একটা কুটরা হরিণ। হরিণটাকে দেখিয়ে বলল, "তোমাদের কালীঘাটের পাঁঠার মতো ঝোল রাঁধব আজকে। সিম্পিল্ রান্না। মাংসের ঝোল আর ভাত।"

খেয়ে খেয়েই দণ্ড মরবে একদিন, যদিও ওর যা কার্যকলাপ, তাতে বাঘের কামড় খেয়ে মরাটাই অনেক বেশি স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয় ছিল। দণ্ড বোধহয় কামড় খেয়ে মরার চেয়ে সুস্বাদু সব খাবার জিনিস কামড়ে খেয়ে মরাটা অনেক ভাল বলে সাব্যস্ত করেছে।

ঘর থেকে চেয়ার বের করে রোদে এনে দিল দণ্ড। আমি বসলাম। এখন গরম জামা-কাপড় খুলে ফেলেছি। আস্তে আস্তে শরীর গরম হয়ে উঠছে। রাত-শিশিরের ওসে ভেজা ভারী ধুলো, রোদের ওমে গরম হয়ে, পাতা-ঝরানো রুখুশুখু হাওয়ায় সবে উড়তে আরম্ভ করেছে। বাংলোর হাতার উল্টোদিকের জঙ্গল থেকে বড়কি ধনেশ ডাকছে কুচিলাগাছ থেকে, হ্যাঁক্-হ্যাঁক্, হ্যাঁক্-হ্যাঁক্ করে। গ্রেটার ইণ্ডিয়ান হর্নবিল্‌কে এখানে বড়কি ধনেশ বলে। আর লেসার্ ইণ্ডিয়ান হর্নবিলকে বলে, ছোট্‌কি ধনেশ। হোমিওপ্যাথিতে

বিখ্যাত ওষুধ আছে নাক্সভমিকা। এই নাক্সভমিকা ওষুধ তৈরি হয় কুচিলা থেকেই। এই গাছগুলোর পাতার মাঝখানটিতে একটু সাদাটে রঙ থাকে। হাল্কা সাদা। অনেক সময় বড়কি ধনেশরা যখন মগডালে বসে থাকে, তখন তাদের বুকের সাদা আর পাতার সাদায় এমনভাবে মিশে যায় যে, পাখিরই বুক না পাতারই মুখ, তা ঠাহর করতে অসুবিধে হয়; বিশেষ করে অন্ধকার পাহাড়তলি অথবা গভীর ছায়াচ্ছন্ন জঙ্গলে।

এই বড়কি ধনেশরা বড্ড আওয়াজ করে, তা তারা যেখানেই থাক না কেন! তাই এদের শিকার করা বেশ সোজা। এদের তেল দিয়ে কবিরাজমশাই এবং হাকিমসাহেবরা বাতের ওষুধ বানান।

ছোট্‌কি ধনেশদের বেশি দেখা যায় ভালিয়া গাছে বসে ফল খেতে। কুচিলার মতো ভালিয়াও একরকমের বন্য গাছ। ওদের ভালিয়া গাছে বসে থাকতেও দেখা যায় বলে ছোট্‌কি ধনেশদের নাম এখানে 'ভালিয়া-খাঁই'। প্রকাণ্ড বড় বড় বাদামি কাঠবিড়ালিগুলো চিঙ্ক্-চিঙ্ক্-চিঙ্ক্ আওয়াজ করতে করতে বড় বড় গাছের এ-ডাল থেকে ও-ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে ডাল ঝাঁকিয়ে শীতের রোদ-পিছ্‌লানো চিকন, উজল পাতার পথে পথে ঝরনার মতো শব্দ করে ঘূর্ণা হাওয়ায় রোদকণা উড়িয়ে ছড়িয়ে সমস্ত জঙ্গলকে মুখর প্রাণবন্ত করে তুলেছে। অদৃশ্য, কোনো দারুণ-জুয়ারির গায়ক যেন সমস্ত প্রকৃতিকে অসংখ্য বাজনার মতো ভরপুর সুরে বেঁধে নিয়ে গাইছেন

"প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে,
অলস রে, ওরে, জাগো জাগো ॥
শোনো রে চিত্তভবনে অনাদি শঙ্খ বাজিছে—
অলস রে, ওরে, জাগো, জাগো ॥

চুপ করে, সেই শীতের পাহাড়-জঙ্গলে, ফ্যাকাসে মাটির ধূলি-ধূসর সড়কে হাওয়ার অলিগলিতে ঝরাপাতার নাচের দিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে তাকিয়ে বসে আছি। দণ্ড, ভীম, দুর্যোধন এবং আরও অনেকের চিৎকার চেঁচামেচি কিছুই আমার কানে আসছে না। কুচিলা-খাঁইদের ডাক, বাদামি কাঠবিড়ালিদের চিকন চিঙ্ক্-চিঙ্ক্, ঝরা-পাতার মচ্‌মচানি, সবুজ চুঁই, মসৃণ মৌটুসিদের শিস্ আর হাওয়ার ফিসফিস সব মিলেমিশে এমন এক ভিডিও-স্টিরিওর এফেক্ট হচ্ছে আমার অবচেতনে যে, তা বুঝিয়ে বলতে পারি এমন কলমের জোর আমার নেই। কোনোকালে হবেও না। জঙ্গলের মধ্যে এলে এই সবই উপরি পাওনা। বোনাস্। যদি কখনও বিনা আন্দোলনে, এই বোনাস্ পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করো তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ জঙ্গলে এসে, তাহলে জানবে যে, তোমরা ভাগ্যবান।

বড় চমৎকার এক ঘোরের মধ্যে ছিলাম। হঠাৎই কানের কাছে দণ্ডধরের ডাকে সেই ঘোর কেটে গেল।

বলল, "সে কুট্‌রা দেইকি আউ কঁড় রাঁধিবু? ঝোল্ ত হউচি। টিক্কে কষা মাংস ভি হেল্লে মন্দ হইথান্তি না। কহন্তু আঁইজ্ঞা। কঁড় করিবু?"

বিহ্বল ছিলাম অন্য এক দেবদুর্লভ জগতে। চলে এলাম মাংসের ঝোল আর কষা-মাংসের রাজ্যে। দণ্ডধর ডাকুয়াও একরকমের বিহ্বলতা আমার।

যদিও একেবারেই অন্যরকমের।

॥ ৩ ॥

একটা বড় বাঘ, বাইসনের বাচ্চা ধরেছিল কাল রাতে। ধরে, অনেকদূর টেনে নিয়ে গেছে বাইসনদের দলের চোখ এড়াতে, বাইসন-চরুয়া মাঠ পেরিয়ে। খাড়া পাহাড়ের গায়ে একটা গুহার মধ্যে নিয়ে গিয়ে তাকে রেখেছিল। আমি রোদে বসে থাকতে থাকতেই দণ্ডর ইনফরমাররা খবর নিয়ে এল। দণ্ড বলল, "নিশ্চয়ই

কাল রাতের বাঘটার কাজ।"

বললাম, "আমার পায়ের যে হাল, তাতে খাড়া পাহাড়ে চড়ার অবস্থা একেবারেই নেই। অন্য কোনো কিল্ করুক, তখনই মাচায় বসা যাবে। নইলে, পরে হাঁকা করার বন্দোবস্ত কোরো।"

ও বলল, "তা হলে সন্ধেবেলা কী করবে ? সন্ধেবেলাও কি বাংলোয় বসে আগুনের পাশে বই পড়বে ? বই-ই পড়বে তো কলকাতাতেই পড়তে পারতে ! বই পড়ার জন্যে এত কষ্ট করে এতদূর ঠেঙিয়ে আসার দরকারটা কী ছিল ?"

"পায়ের অবস্থাটা দেখলে না ?"

"দেখেছি। শিকারে এলে অমন কত কী হয় ! যাবে কি না বলো।"

"তুমি তো মহা অবুঝ !"

"আমি অবুঝ ? না তুমি ? কাল কী খাবে ? আজ না হয় কুট্‌রা হল !"

"খাওয়াই কি সব দণ্ড ?"

দণ্ডধর হতাশ হয়ে দুহাত দুদিকে কাঁধসমান তুলে ঢেউ খেলিয়ে বলল, "আল্লোঁ। মু আউ কঁড় কহিবি ! কিচ্ছি কহিবাকু নাই।"

অনেক তর্কাতর্কির পর শেষ রফা হল যে, বন্দুকটা নিয়ে এক চক্কর হেঁটে আসব সন্ধের পর। সঙ্গে ফোর-সেভেণ্টি ডাব্‌ল-ব্যারেল রাইফেলটাও নেব, যদি কোনো অভদ্র অসভ্য বড় জানোয়ার ঘাড়ে এসে পড়ে, তবে তার গায়ে ঠেকিয়েই দেগে দেব। কালকে ক্যাম্পে সকলের খাওয়ার জন্যে কিছু পট্‌-হাণ্টিং-এর জন্যেই যাওয়া। ও বলল, "যিবি আর আসিবি। টিক্কে বুলি বুলিকি, পলাই আসিবি চঞ্চড়।"

বিকেল হল। জঙ্গলে শীতকালে দ্রুতগতি চিতার মতো বিকেল আসে হরিণীর মতো দুপুরকে তাড়া করে। ক্রমশই তাদের ব্যবধান কমে আসতে থাকে। তারপর হঠাৎই সন্ধে এসে মস্ত হলুদ দিগন্তজোড়া বাঘেরই মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে, কালো থাবা চালায় তাদের দুজনেরই উপর। রাত নামে। সব কালো হয়ে আসে।

আমাদের দণ্ডধরের শীতকালীন শিকারের পোশাকের একটু বর্ণনা দেওয়া দরকার। পায়ে একটি ডাকব্যাকের গামবুট। নিম্নাঙ্গে কাছা-কোঁচা গুঁজে, এই-মারি কি সেই-মারি ভঙ্গিতে পরা খাটো ধুতি। উর্ধ্বাঙ্গে হলুদরঙা হাফশার্ট। তারও উপরে ঘোরতর মারদাঙ্গা লালরঙের একটি আলোয়ান। ওর নুয়াগড়ের বাড়ি ছেড়ে যতদিন জঙ্গলে এসে থাকে দণ্ডধর, ততদিন দাড়ি কামায় না। কাঁচা-পাকা, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি মুখময়। এবং মিটি-মিটি হাসি। হাসির ফাঁকফোকর দিয়ে গুণ্ডির পানের গন্ধ। এই সন্ধেয় বাঁ-কাঁধে লাঠির মতো করে শোয়ানো ফোর-সেভেণ্টি ডাব্‌ল্-ব্যারেল রাইফেলটি। ডান হাতে পাঁচ-ব্যাটারির টর্চ।

রেডি হয়ে এসেই ও বলল, "চালুন্ত আঁইজ্ঞা। চঞ্চড় যিবি, চঞ্চড় আসিবি। গুলি বাজ্জিবে, কি প্রাণ যিবে।"

কিছুটা গিয়ে ভীমধারার ঝরনা পেরিয়ে বাঁ-দিকে ঢুকে গেলাম আমরা। তখন সবে অন্ধকার হয়েছে। আলো না-জেলে দণ্ড আগে আগে চলেছে। আমার লোকাল-গার্জেন, ফ্রেণ্ড অ্যাণ্ড ফিলসফার। জঙ্গলে কৃষ্ণপক্ষ রাতেও তারাদের আলো থাকে। তবে সে-আলোর সুবিধা পাওয়া যায় শুধু জলের ধারে বা ফাঁকা জায়গাতেই। কৃষ্ণপক্ষের রাতে জঙ্গলের গভীরে একবার ঢুকে পড়লে তারারা তেমন কোনো কাজে আসে না। তবুও জানোয়ার-চলা সুঁড়িপথটা দেখা যাচ্ছিল একটু একটু, আবছা। অন্ধকারে, মায়ের খুব কাছে শুয়ে আলোনিবনো ঘরে মায়ের মাথার সিঁথি যেমন দেখতে পাও তোমরা, তেমন।

মিস্টার ডাকুয়া চলেছে তো চলেছেই। আমি ভেবেছিলাম, জলের পাশে কচি ঘাসে বুঝি চিত্রল হরিণের খোঁজে চলেছে সে। অথবা টুল্লকা গাঁয়ের শেষ সীমানাতে বিরি-ডালের খেতে শম্বরের দলের খোঁজে। দণ্ডধরের পূর্ব-চিহ্নিত কোনো বিশেষ শুয়োরের খোঁজেও হয়তো হতে পারে। কিন্তু ব্যাপার-স্যাপার দেখে সেরকম আদৌ মনে হচ্ছে না। অথচ শিকার যাত্রায় বেরিয়ে পড়ার পর দণ্ডধরের গতিবিধি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করি এমন দুঃসাহস আমার আদৌ ছিল না। অধমের পায়ের অবস্থার কথাও ও বিলক্ষণই জানে। মনের অবস্থা জানে না, এমনও নয়। সব জেনেশুনেই ও

এমন হেনস্থা করছে আমার। অ্যালগারনন্ ব্ল্যাকউডের একটা দারুণ বই দিয়েছিল দেবু, সেই বইটা অর্ধেক পড়ে রেখে এসেছি। মনটা আমার এখন সেই মৃজ-শিকারির বুকপকেটে গোঁজা আছে। মনে হচ্ছে, মিস্টার ডাকুয়ার হাতে পড়ার চেয়ে ডাকাতের হাতে পড়াও অনেক ভাল ছিল।

এখনও টর্চটা একবারও জ্বালায়নি ও। উদ্দেশ্য, গভীর সন্দেহজনক। আমার ডান-পা'টা যাতে চিরদিনের মতোই যায়, তারই বন্দোবস্ত পাকা করতে চায় বোধহয়।

হঠাৎই দেখলাম, সামনে জঙ্গলটা ফাঁকা হয়ে এল। যেন, ভোজবাজিতে। সামনে অনেকখানি সমান ফাঁকা জায়গা। কোনোকালে ক্লিয়ার-ফেলিং হয়েছিল সেগুনের। তারপর জংলি ঘাস জবরদখল নিয়েছে। ফাঁকা জায়গাটার কাছে পৌঁছে, দণ্ড মুখে দু' আঙুল পুরে শিস্ দিল একবার। ফাঁকা জায়গাটার ওপাশের জঙ্গল থেকে অন্য কেউ শিস দিয়ে উত্তর দিল। তারার আলোয় দেখলাম ও-পাশের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটি প্রায়-উলঙ্গ ছায়ামূর্তি টলতে টলতে আমাদের দিকে আসছে। লোকটা যখন কাছে এল, তখন দেখলাম, তার পরনে একটি ছেঁড়া গামছা, গায়েও একখানি গামছা। দণ্ড কথা না বলে তার আলোয়ানের নীচ থেকে একটি থলি বের করে লোকটিকে দিল। বলল, "ভাল করে খাস্। পেট ভরে।"

লোকটা বলল, "হুঁ।"

"কষা মাংস আর রুটি আছে।"

"হুঁ।" লোকটা আবার বলল।

তারপর দণ্ড আমাকে কিছুটা পাইপের তামাক দিতে বলল লোকটাকে। দিলাম। খৈনির মতো হাতে ডলে ঠোঁটের নীচে দিয়ে দিল লোকটা সঙ্গে-সঙ্গে।

অন্ধকারেও ওর পাঁজরের হাড় গোনা যাচ্ছিল। দণ্ডধর ওকে জিজ্ঞেস করল, ঘড়িংয়ের পায়ের দাগ সে দেখেছে কি না! লোকটা বলল, "একটু এগিয়েই একটা 'নুনি' আছে। সেখানে শম্বর, ঘড়িং, গল্প, সব নিয়মিত আসে। বাঘও আসে তাদের পিছন-পিছন। নুনির পাশে একটা ঝাঁকড়া শিশুগাছ আছে। তার নীচে বড় বড় পাথর, আর ঝোপঝাড়। তার আড়াল নিয়ে বোসো গিয়ে, নির্ঘাত শিকার। কিন্তু সাবধান! বেশি রাত অবধি থেকো না ওখানে ভুল করেও।"

"কেন?" দণ্ডধর শুধোল, কোমরের বটুয়া থেকে আরেকটা গুণ্ডিপান মুখে ফেলে।

"ঠাকুরানি আছেন ওখানে।"

দণ্ডধর গালাগালি দিয়ে বলল, "আফিং খেয়ে খেয়ে আফিংখোর তোর মগজটা একেবারেই গেছে রে, শিব্ব।"

"না রে, দণ্ড। আমার কথা শুনিস্। নইলে বিপদ হবে।" লোকটা ভয়-পাওয়া গলায় বলল।

"দণ্ডধর ডাকুয়াকে বিপদের ভয় দেখাস না। তুই এখন বউয়ের সঙ্গে কুট্রার কষা-মাংস আর রুটি খা গিয়ে যা পেট ভরে। সঙ্গে সেগুন-পাতায় পোড়া আমলকীর আচারও আছে।"

শিব্ব নামক লোকটি ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "খাবে নাকি?"

দণ্ড যেন খুব অনিচ্ছার সঙ্গেই বলল, "দে।"

"বাড়ি চলো তাহলে।"

শিব্বর সঙ্গে একটু হেঁটে হেঁটে ওর কুঁড়ের কাছে গেলাম আমরা। এক ঘটি জল এনে ও দণ্ডকে কী যেন খেতে দিল। নাড়ুর মতো দেখতে। কিন্তু কালো। দণ্ড আমাকেও দিল দুটো। বলল, "খেয়ে নাও, কথা না বলে।"

"কী? জিনিসটা কী?"

"প্রসাদ। ঠাকুরানির কাছে যাচ্ছ, শিব্বর কথা শোনো। ভাল ছাড়া খারাপ হবে না কোনো।"

নাড়ুদুটো জল দিয়ে বাধ্য ছেলের মতো খেয়ে ফেললাম।

॥ ৪ ॥

শিব্ব আমাদের এগিয়ে দিল একটু। তারপর ছায়ামূর্তিরই মতো মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। অন্ধকারেই দণ্ড আর আমি জঙ্গলের গভীরে ফিরে জানোয়ার-চলা পথটি ধরলাম।

ফিসফিস করে দণ্ডকে শুধোলাম, "ওই ভুতুড়ে লোকটি কে হে?"

"ওর নাম শিব্ব। শুনলে তো!"

"তোমার কে হয়?"

"আমার ভাই।"

"ভাই? কখনও দেখিনি তো। কীরকম ভাই?"

"দেশের ভাই। মাটির ভাই। সবচেয়ে কাছের ভাই।"

"ওঃ।" আমি বললাম।

"আজকে একটা খুব বড় গল্প মেরে দাও তো, ঋজুবাবু।" কথা ঘুরিয়ে ও বলল।

"বড় গল্প তো গত সপ্তাহেই মেরেছি। খামোখা বাইসনের মতো অতবড় জানোয়ার মেরে কী হবে, দণ্ড? আমাদের খেতে তো অত মাংস লাগবে না। তা ছাড়া, বাইসনের বা নীলগাইয়ের মাংস আমি তো খাই না। এ তো অন্যায়।"

"কিসের অন্যায়?" দণ্ডধর ডাকুয়ার চোখ অন্ধকারে আবার বাঘের মতো দপ্ করে জ্বলে উঠল। ও বলল, "জানো ঋজুবাবু, এই শিব্ব মাংস খেয়েছিল গত বছরের আগের বছর, যখন আমরা এখানে শিকারে এসে একটা বড় শম্বর মারি। তারপরে আর কোনোরকম মাংসই ও খায়নি। গত সপ্তাহে তোমার মারা গল্পর মাংস অবশ্য খেয়েছিল পেট পুরে। মাছ খেয়েছিল গত দু বছরে মাত্র তিন-চারদিন। ভীমধারার দহে কখনও-সখনও কুঁচো মাছ জমে। তাও দাবিদার অনেক। টিকর্পাড়ার ঘাট থেকে কাতলামাছ এনে খাইয়েছিলেন একদিন সুরবাবু, ফরেস্ট কনট্রাক্টর। খাইয়েছিলেন এখানকার গ্রামের সববাইকেই গতবছরে তাঁর জঙ্গলে খুব ভাল কাঠ বেরিয়েছিল বলে।"

হেসে বললাম, "মাছ-মাংস তো কত লোকেই খায় না।"

দণ্ডধর দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "তা খায় না বটে, কিন্তু তারা তো অন্য অনেক কিছুই খায়। দুধ খায়, মাখন খায়, ঘি খায়, তরি-তরকারি, ফলমূল, ডাল-ভাত কত কী খায়!"

"শিব্ব কী খায়? শিব্বও তো এ-সব খায়। ঘি-মাখন না হয় নাই খেল!"

"শিব্ব?" তাচ্ছিল্যের গলায় দণ্ড বলল। "দিনে একবেলা, একহাঁড়ি খুদের মধ্যে জল আর আফিঙের একটু গুঁড়ো মিশিয়ে সেদ্ধ করে খেয়ে থাকে ও আর ওর বউ। পেটের পিলেটা দেখলে না, পাঁচ-নম্বরি ফুটবলের মতো। আর বছরের জামা-কাপড়? একটা পাঁচ টাকা দামের গামছা দু' ভাগ করে কেটে গায়ে দেয় ও পরে শিব্ব। সারা বছর। একটা বারো টাকা দামের শাড়ি পরেই ওর বউ বারোটা মাস কাটিয়ে দেয়। করবে কী? ওদের সঙ্গে তুমি কাদের তুলনা করছ ঋজুবাবু?"

আমি চুপ করে ছিলাম।

দণ্ড বলল, "একটা গল্প মারলে কতগুলো গ্রামের লোক মাংস খেতে পারে তার ধারণা তো তোমার আছে। নিজের চোখে দেখোনি? কত পাহাড়-নদী পেরিয়ে মেয়ে-পুরুষরা গত সপ্তাহে মারা বাইসনটার মাংস নিতে এসেছিল? কত ঘণ্টা তারা ধৈর্য ধরে বসে ছিল।"

"কিন্তু আমার পারমিটে যে মোটে একটাই বাইসন ছিল। গত সপ্তাহে তা তো মেরেইছি, দণ্ডধর। অন্যায় হবে না বনবিভাগের পারমিটের বাইরে শিকার করলে?"

দণ্ডধর দাঁড়িয়ে পড়ে হঠাৎ আমার দু'চোখের উপর পাঁচ ব্যাটারির টর্চটা ফোকাস্ করল। যেন আমিই কোনো সাংঘাতিক শ্বাপদ। আলোর তোড়ে আমার চোখদুটো বুঁজে এল। তারপর ওর মুখটা আমার বাঁ কানের কাছে এনে ফিসফিস করে দণ্ড বলল, "একটা বড় ন্যায়ের জন্যে পাঁচটা ছোট অন্যায় করার মধ্যে কোনোই পাপ নেই। এ-গ্রামের এবং অন্য অনেক গ্রামের লোককে সমানভাবে মাংস ভাগ করে দেব আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে। তুমি দেখো। কত মানুষের মুখে হাসি ফোটাবে তুমি! সে কি আনন্দের নয়? পুণ্যের নয়? সব পুণ্য বুঝি কেতাবি আইন মানারই মধ্যে?"

এই অবধি বলেই, আমাকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই রাইফেলটা ধপ্পাস্ করে আমার কাঁধে ফেলে দিয়ে বলল, "চলো। আজ নুনিতে বসে বড্ড গল্প মারব আমরা।"

জঙ্গলের গভীরে বসে দণ্ডধর ডাকুয়ার কথা অমান্য করার সাহস তখন কেন, কোনোসময়ই আমার ছিল না। তা ছাড়া, কতই বা বয়স তখন আমার। বড়জোর বাইশ-তেইশই হবে। কলেজ থেকেই পাইপ ধরেছিলাম। অন্য কিছুর জন্যে নয়, পয়সা খরচ প্রায় একেবারেই নেই বলে। দণ্ডধর জেঠুমণিকে পর্যন্ত ডোণ্টকেয়ার করত, আর আমি তো কোন্ ছার্।

ফোর-সেভেণ্টি রাইফেলটা কাঁধে ঠিক করে তুলে নিলাম। এখন বুঝলাম, বাংলোতে থ্রি-সিক্সটি-সিক্স ম্যানলিকার শুনার রাইফেলটা (আমার প্রিয় রাইফেল) থাকতেও ও ইচ্ছে করেই ফোর-সেভেণ্টি ডাবল-ব্যারেল রাইফেলটা নিয়ে এসেছিল। এটি অনেক বেশি শক্তিশালী রাইফেল। জেফ্রি নাম্বার টু। মোক্ষম মার। বড় জানোয়ার মারতে এতেই সুবিধা।

আর কোনো কথা না বলে নুনিতে এসে পৌঁছলাম আমরা। আমাদের দেশের এবং অন্যান্য অনেক দেশের জঙ্গলের গভীরেই এরকম কিছু জায়গা থাকে, যেখানে মাটিতে নুন থাকে। জংলি তৃণভোজী জানোয়াররো সেই নুন চাটতে আসে। ছোট্ট হরিণ থেকে

গণ্ডার, সবাইই চাটে। ইংরিজিতে একেই বলে 'সল্ট-লিক'। অনেক জায়গায় বনবিভাগ বস্তা বস্তা নুন ফেলেও কৃত্রিম 'নুনি' বানায় অথবা স্বাভাবিক নুনির এলাকা বাড়ায়।

শিব্বর কথামতো নুনিতে পৌঁছে আমরা ঐ ঝাঁকড়া শিশুগাছের নীচেই আড়াল নিয়ে বসলাম ঝোপঝাড়ের পেছনে। নুনির উপরের আকাশ ফাঁকা। মাঝের ঘাস, শিশিরে ভিজে গেছে। কোনো বড় জানোয়ার জঙ্গলের আড়াল ছেড়ে নুনিতে এসে দাঁড়ালে তাকে মারা কঠিন হবে না, আলো ছাড়াই। কিন্তু দণ্ড বলল, "কোনোই চিন্তা নেই। আমি আলো দেব তোমার ডান কাঁধের উপর দিয়ে রাইফেলের ব্যারেলের উপরে, যাতে ব্যাক্‌সাইট, ফ্রন্টসাইট দুইই দেখতে পাও। মারবে, আর পড়ে যাবে। গুলি বাজিবে কী প্রাণ নিবে। তারপর তোমাকে আর পায়ের ব্যথা নিয়ে হেঁটে যেতে হবে না। আমিই কাঁধে করে বাংলোতে নিয়ে যাব।"

"তুমি নিজেই কেন মারছ না দণ্ডধর? তুমি তো আমার চেয়ে হাজারগুণ ভাল শিকারি?"

দণ্ড হাসল। বলল, "তুমি ঋজুবাবু কত ক্ষমতাবান লোক বড়লোক। জেঠুমণির ভাইপো। আইন-কানুন সব তোমাদের হাতে ভাঙলেই মানায় ভাল। তোমাকে কেউই কিছু বলবে না। কিন্তু যদি আকাশের তারারাও দেখে ফেলে যে, এইসব গ্রামের লোকদের একদিনের জন্যে মাংস খাওয়াবার জন্যে, ইংরিজিতে তোমরা পোচিন্ না কী বলো যেন, তাই করে নিজে হাতে একটি ঘড়িং বা গল্ল মেরেছি আমি, নুয়াগড়ের ভিখারি ডাকুয়ার ছেলে এই সামান্য মানুষ দণ্ডধর ডাকুয়া, তাহলেই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের খাতায় আমার নাম উঠে যাবে। আমাকে, আমার ছেলেকে, এমনকী আমার নাতিকে পর্যন্ত অপরাধী থাকতে হবে তাদের কাছে, যুগযুগান্ত ধরে কান মুলতে হবে, নাকে খত দিতে হবে। তুমি আর আমি কি এক হলাম ঋজুবাবু? আইন তোমাদের কাছে তামাশা, আর আমাদের কাছে তা ফাঁসি।"

"তোমার বক্তৃতার চোটে তো কোনো জানোয়ার এদিকে আর আসবে বলে একটুও মনে হচ্ছে না দণ্ডধর।"

"এইই চুপ করলাম।" ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে দণ্ডধর বলল। একটু পরই আবার রাতের জঙ্গলকে চমকে দিয়ে বলল, "আসবে না তো যাবে কোথায়? আমি কি গুণ্ডিপান না-খেয়ে থাকতে পারি? গুড়াখু দিয়ে দাঁত না-মেজে পারি? না, তুমি পারো পাইপ না খেয়ে? নেশা বলে ব্যাপার। জানোয়ার নুনিতে আসতে বাধ্য। খুব বড্ড সাইজের একটা দেখেশুনে একেবারে মোক্ষম মার মারবে কিন্তু। অনেক মন মাংস হয় যাতে। ফস্‌কিয়ে যায় না যেন!"

॥ ৫ ॥

বসে আছি তো বসেই আছি। শিব্বর সেই কেলে নাড়ুতে কী ছিল কে জানে। কেমন ঘুম-ঘুম পাচ্ছে! হাত-পা অবশ-অবশ লাগছে। মনে হচ্ছে, আমার হাতদুটো বেহাত হয়ে গেছে।

ফিস্‌ফিস্ করে দণ্ডকে সে-কথা জিজ্ঞেস করলাম।

ও মাথা নেড়ে বলল, "রাইফেলের গুলির চেয়েও মারাত্মক। আস্তে-আস্তে দেখবে এর ফল। সফ্‌ট-নোজড্ বুলেটের মতোই ক্রিয়া। হুঁ!"

ক্রিয়ার কথা শুনে পুলকিত হলাম। কিন্তু তারপর কর্মটা যে কী হবে, সেইটেই দেখার।

একদল চিতল হরিণ এল, নুন চাটল খস্‌খসে জিভ দিয়ে, খচর্-খচর্ করে চলে গেল। আমাদের পেছনে খানিকটা দূরে হাতির একটি ছোট দল চরে খাচ্ছিল। ডালপালা ভাঙার আওয়াজ পাচ্ছিলাম। হাতিদের পেটে সবসময়েই যজ্ঞিবাড়ির উনুনের মতো কত কী সব রান্না হয়। নিস্তব্ধ জঙ্গলে অনেকদূর থেকেই সেই ফোঁস-ফাঁস, ভটুর-ভাটুর আওয়াজ শোনা যায়। ওরা বাঁশ ভাঙছে মটাস-মটাস করে। হাতিরা আছে, কিন্তু নীলগাই অথবা বাইসন কারো দলেরই দেখা নেই। নীলগাইকে ওরা বলে ঘড়িং। আর বাইসন বা ইণ্ডিয়ান গাউরকে বলে গল্ল। একদল শুয়োর, ধাড়ি-বাচ্চা, মদ্দা-মাদিতে ভরপুর, জোরে দৌড়ে পার হয়ে গেল নুনিটা। কিসের এত তাড়া ওদের কে জানে! ঘণ্টা-দেড়েক বসে থাকার পর কেবলই মনে হতে লাগল, অনেক জানোয়ারই যেন জঙ্গলের কিনারা অবধি আসছে, কিন্তু নুনিতে নামছে না। বিভিন্ন জানোয়ারের পায়ের শব্দ পাচ্ছি স্পষ্ট, পাথুরে জমিতে। তারপরই আওয়াজগুলো আশ্চর্যজনকভাবে মিলিয়ে যাচ্ছে। নুনির কিনারা অবধি আসার আওয়াজ পাচ্ছি। কিন্তু ফিরে যাওয়ার কোনো আওয়াজই কানে আসছে না। আশ্চর্য ব্যাপার! দণ্ডধরকে ফিস্‌ফিস্ করে শুধোলাম, "এখানে তুমি আগে এসেছ কখনও?"

"নাঃ।" সংক্ষিপ্ত জবাব দিল ও।

আমার মনে 'কু-ডাক' দিচ্ছিল। মনে হচ্ছে, জায়গাটায় আশ্চর্য সব ব্যাপার-স্যাপার ঘটে। তবে, ভয় করছিল না; কৌতূহল হচ্ছিল খুব। মাথাটাও খুব ভার-ভার মনে হচ্ছিল। এরকম কখনও আগে বোধ করিনি। অন্ধকারে চোখের সামনে ময়ূরের পালকের মতো রঙ দেখছিলাম ঝলক্-ঝলক্। হঠাৎ খুব বড় একটা একলা-শিঙাল শম্বর ঘাক্ ঘাক্ করে ডাকতে ডাকতে প্রচণ্ড জোরে পূর্বদিক থেকে পশ্চিমে দৌড়ে নুনিটা পার হয়ে গেল মুখ উঁচু করে ডালপালাওয়ালা প্রকাণ্ড শিংটাকে পিঠের উপর শুইয়ে পাথরের উপর পায়ের খুরে খট্‌খটানি আওয়াজ তুলে। এবং তার সামান্য পরেই একটা বড় বাঘ নিঃশব্দে জঙ্গলের গভীর থেকে লাফ মারল। নুনিটার মাঝখানে লাফিয়ে পড়েই ঘাপ্‌টি মেরে বসে যেন ঝোপঝাড় ভেঙে শম্বরটার চলে যাওয়ার আওয়াজ শুনতে লাগল দু-কান খাড়া করে। বাঘ কিন্তু সচরাচর এমন ফাঁকায় আসে না। সবসময়ই আড়ালে আবডালে চলে, ছায়ার মতো। জাত-শিকারি সে। আমাদের দিকে ব্রড-সাইড ছিল বাঘটির। আমার পারমিটের বাঘ এখনও মারা হয়নি। দণ্ডধরের সঙ্গে আমার যেন মনে-মনে কথা হল টেলিপ্যাথিতে। দণ্ডধর মুখে কথা না বলে আমার পিঠে খোঁচা দিল। মুহূর্তের মধ্যে রাইফেল তুললাম আমি। কিন্তু চোখ ঝাপসা। মগজ ফাঁকা। পায়ে দল্‌দলি, হাত বেহাত।

আমার মাথার মধ্যে কে যেন বলল, এ একেবারেই ঠাকুরানির দান। এই বাঘ। দণ্ডধরও আলো ফেলল সঙ্গে-সঙ্গে। দু' চোখ খুলে বাঘের বুকে নিশানা নিয়ে গুলি করলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গেই অদ্ভুত এক কাণ্ড ঘটল। নুনির চতুর্দিক থেকে পাগলাঘণ্টির মতো, কিন্তু গৃহস্থ বাড়িতে লক্ষ্মীপুজোর সময় যেমন নিচুগ্রামে ঘণ্টা বাজে, তেমন অনেক ঘণ্টা একসঙ্গে বেজে উঠল। অসংখ্য লোক হাত নেড়ে-নেড়ে যেন সেই ঘণ্টা বাজাচ্ছিল। সেই ঘণ্টার আওয়াজের সঙ্গে রাইফেলের গুলির আওয়াজ এবং বাঘের চাপা গর্জনের আওয়াজ মিশে গেল। কিছু বোঝার আগেই দেখলাম, একলাফে বাঘ উধাও। তারপর, যাকে সে একটু আগে শিকার করবে বলে তাড়া করেছে বলে মনে হয়েছিল, সেই শম্বরেরই মতো সে-ও জঙ্গল ঝোপঝাড় লণ্ডভণ্ড করতে করতে উধাও হয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে ঘণ্টাধ্বনিও থেমে গেল। হঠাৎ গুলির শব্দে রাতের বনে যে-সব বাঁদর ও নানারকম পাখি চেঁচামেচি করে উঠেছিল, তারাও হঠাৎ থেমে গেল। অথচ, এমন হঠাৎ তারা থামে না কখনও।

দণ্ডধর আমার পিঠে আঙুল দিয়ে আবার খোঁচা মেরে উঠতে বলল।

ঠিক দশটার সময় বাঘটাকে গুলি করেছিলাম। দণ্ডধরকে চিন্তিত দেখাচ্ছিল। খণ্ডিয়া, মানে জখম বাঘ যেদিকে গেছে তার বিপরীত দিকে, ভীমধারার উঁচু মালভূমির দিকে আমরা এগোতে লাগলাম।

বেশ কিছুদূর এসে দণ্ডধর বলল, "ঠিক দশটার সময় তুমি

সীমন্ত - সংবাদ
প্রজাপতি ঋষি, অনুষ্টুপ ছন্দ...
আয়ুষ্মতী ভবঃ।
Shingar
SINDOOR
কুশণ্ডিকা...শুভবিবাহের অন্যতম প্রধান শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান। মন্ত্রোচ্চারণের সাথে সাথে বধূর সিঁথিতে বর এঁকে দেয় টক্‌টকে লাল সিন্দুর।
আর শিঙ্গার সিন্দুর মানেই,অদ্বিতীয় সিন্দুর! এ সিন্দুর হয় যেমন মিহি আর মোলায়েম, অথচ সিঁথিতে ছড়িয়ে পড়ে না, তাই এটি লাগানোও খুব সহজ। ডাক্তারি মতেও প্রমাণিত যে, এটি সর্বোত্তম, বিশুদ্ধ নানান উপাদান দিয়ে তৈরী হয় বলে এ দিয়ে সিঁথিতে চর্মরোগেরও ভয় থাকে না।
শিঙ্গার একটি আকর্ষণীয় প্যাকে পাওয়া যায়, সিন্দুর লাগানোর জন্যে বিনামূল্যে একটি অ্যাপ্লিকেটর সমেত। শিঙ্গার-নারীর সৌন্দর্য্যে শ্রী ফোটাতে, শিঙ্গার!
এখন ইকনমিক্যাল মিনি প্যাকেও পাওয়া যাচ্ছে।
শিঙ্গার সিন্দুর
নারীর অক্ষয় সৌভাগ্যের প্রতীক!
everest/82/SH/707rbn.

বাঘটাকে গুলি করেছিলে, তাই না?"

"হবে। ঘড়ি তো দেখিনি! কিন্তু ঘণ্টাগুলো কী ব্যাপার?"

দণ্ডধর ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, "কথা বোলো না। চুপ।"

আরও কিছুটা গিয়ে ও বলল, "শিব্বকে কান ধরে পিটব আমি। এখানের ঠাকুরানি যে এমন জাগ্রত, এ-কথা সে বলে তো দেবে! আমাদের প্রাণ চলে যেত একটু হলে। জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে চুল পাকালাম, এমন আজব ব্যাপার কখনও দেখিনি বা শুনিনি। এখন দ্যাখো, এ যদি সত্যি বাঘ হয়, মায়ার বাঘ না হয়, তবে কাল এই খণ্ডিয়া বাঘ আমাদের অশেষ কষ্ট দেবে। একে খুঁজে বের করে মারতে হবে। এভাবে তো আর ছেড়ে রেখে চলে যাওয়া যাবে না।"

চলতে চলতে বললাম, "মায়ার বাঘ মানে?"

"বাঃ! রামায়ণে মায়ামৃগের কথা পড়োনি! ঠাকুরানি পঞ্চাশ হাতে ঘণ্টা বাজিয়েছিলেন, আর মায়া-বাঘ হাজির করতে পারেন না? আমার প্রথম থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল। আচ্ছা, নানা জানোয়ারের নুনিতে আসার শব্দ পেয়েছিলে তুমি?"

বললাম, "হ্যাঁ। কিন্তু ফেরার কোনো আওয়াজই পাচ্ছিলাম না। আশ্চর্য!"

"ঠিক! তখনই আমাদের ঐ নুনি ছেড়ে চলে আসা উচিত ছিল। আমি ভাবলাম, তোমাকে কোনোমতে রাজি করিয়েছি একটা বড্ড গল্প মারতে, চলে গেলে যদি কাল আবার তুমি মত পাল্টে ফেলো? আমার লোভেই এমন হল। এখন কাল কী আছে কপালে, তা ঠাকুরানিই জানেন।"

ভীমধারার মালভূমিতে এদিক দিয়ে উঠতে হলে অত্যন্ত চড়াই বেয়ে উঠতে হয়। ঐ শীতেও আমরা ঘেমে গেলাম। উত্তেজনায় শরীরে ও মস্তিষ্কেও সাড় ফিরে এসেছিল। কিন্তু নীচ দিয়ে যাবার সাহস ছিল না। গুলি-লাগা খণ্ডিয়া বাঘ কোথায় ওত পেতে বসে থাকবে কৃষ্ণপক্ষের রাতের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে তা কে জানে! ওদিকে জঙ্গলও অত্যন্ত ঘন। এবং এখন গভীর রাত। তার উপরে দণ্ডধর বলেছে, ঠাকুরানির বাঘ!

ভীমধারার মালভূমির উপরে পৌঁছে একটু দম নিলাম আমরা। কুলকুল করে বয়ে চলেছে পরিষ্কার জল, চ্যাটালো পাথরের বুক বেয়ে অনেক ধারায় ভাগ হয়ে সমান্তরাল রেখায়। কিছুটা গিয়েই আমাদের বাঁদিকে প্রপাত হয়ে পড়েছে। তারার আলোতে পরিষ্কার মালভূমিটিকে স্বর্গীয় বলে মনে হচ্ছে। আমরা জলের কাছে এসে রাইফেল, বন্দুক, টর্চ সব পাথরের উপর শুইয়ে রেখে আঁজলা ভরে জল খেলাম। দণ্ডধর তার আলোয়ানটাকেও নামিয়ে রাখল পাথরের উপর। জল খেয়ে, মুখে-চোখে, ঘাড়ে, ঠাণ্ডা জল দিয়ে আমরা যখন উঠে দাঁড়িয়ে বন্দুক রাইফেল তুলে নেওয়ার জন্যে পিছনে ফিরেছি, দেখি আমাদের সম্পত্তিগুলো আর আমাদের মধ্যে আড়াল করে কালো পাহাড়ের মতো একটি এক্‌রা বাইসন দাঁড়িয়ে আছে। নিথর হয়ে। তার চোখ আমাদের দিকে।

আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেছি দুজনেই। খালি হাত। এত বড় বাইসন এ-অঞ্চলেও কখনও দেখিনি। পুরুনাকোট-টুল্লকার বাইসনদের নাম আছে সারা ভারতবর্ষে। কিন্তু তবু এ-অঞ্চলেও এত প্রাচীন বাইসন কখনও দেখিনি। তার গায়ের কালো রঙ বয়সের দরুন যেন পেকে বাদামি হয়ে গেছে। মাথার মধ্যে সাদা জায়গাটা, হাঁটু ও পায়ের কাছের সাদা জায়গাগুলো পরিষ্কার দেখাচ্ছে। নীলাভ দ্যুতি ছড়ানো তারাভরা কালো আকাশের পটভূমিতে, নিথর হয়ে, মহাকালের মতো দাঁড়িয়ে আছে সে। যেন পাথরে গড়া মূর্তি।

হঠাৎই দণ্ডধর হাঁটু গেড়ে বসে হাতজোড় করে বিড়বিড় করে কী সব বলতে লাগল অস্ফুটে। আর আমি অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম। অত বড় বাইসনটা পাথরের উপর দিয়ে হেঁটে এলে যে শব্দ হত তা বহুদূর থেকেই শোনা যেত। এইখানে অত বড় তৃণভোজী জানোয়ারের লুকিয়ে থাকার মতো কোনো আড়ালও ছিল না। মাংসাশী জানোয়ারেরা লুকোবার অনেক কায়দা জানে। কিন্তু এরা তা জানে না। এও কি ঠাকুরানিরই কারসাজি! এ এখানে কখনোই ছিল না, আমরা যখন জল খেতে নামি ঝরনাতে। আমরা জল খেতে নামার পরেও আসা একেবারেই অসম্ভব ছিল।

দণ্ডধর কী সব বলেই চলল। আবারও হঠাৎ সমবেত ঘণ্টাধ্বনি হল জোরে জোরে। এ যেন কৃষ্ণপক্ষের ঘোর রাত নয়, যেন কোজাগরী পূর্ণিমার উজ্জ্বল আলোয় ঘরে ঘরে কমলাসনার পুজো হচ্ছে। পরক্ষণে হঠাৎই ঘণ্টা থেমে গেল। এবং এত বড় বাইসনটিও উধাও হয়ে গেল। চোখের নিমেষে।

দণ্ডধর মাটিতে থেবড়ে বসে পড়ল। ট্যাঁকের বটুয়া থেকে বের করে একমুঠো গুণ্ডি ঢেলে পান সাজল একটা। পানটা মুখে পুরল। আমিও ওর পাশে বসে পাইপে ঠেসে তামাক পুরে বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিয়ে মাথা পরিষ্কার করার চেষ্টা করতে লাগলাম। পাগল-টাগল হয়ে যাব না তো? কী কুক্ষণে এবার এখানে এসেছিলাম, তাই ভাবছিলাম।

বাংলোয় ফিরে খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়লাম। কাল সকালের কথা ভাবতেই গায়ে জ্বর আসছিল। আহত বাঘকে অনুসরণ করে এর আগে অনেকবারই মেরেছি। এই সব মুহূর্তেই শিকারির স্নায়ু, সাহস, ধৈর্য আর অভিজ্ঞতার পরীক্ষা হয়। তাতে, সত্যিকারের শিকারির উত্তেজনাই বাড়ে। একরকমের আনন্দও হয়, যে আনন্দের কথা শুধু শিকারিরাই জানেন। কিন্তু ভয় করে না। শিকারের সমস্ত আনন্দ তার বিপদেরই মধ্যে। কিন্তু খণ্ডিয়া বাঘকে নিয়ে ঠাকুরানি যে কী খেলা খেলবেন, তা তিনিই জানেন।

শুয়ে শুয়ে শুনতে পাচ্ছিলাম, দণ্ডধর, ভীম, দুর্যোধন, ওরা সকলে মিলে ফিসফিস করে ঠাকুরানির নানারকম অলৌকিক কীর্তিকলাপের কথা আলোচনা করছে। তারপরই দুর্যোধন খালি গলায় রাতের জঙ্গল মথিত করে উদাত্ত স্বরে আবেগভরে গান ধরল

"দয়া করো দীনবন্ধু, শুভে যাউ আজদিন
করজোড়ে তুম পাদে করুছি মু নিবেদন
সত্যশান্তিপ্রদায়ক, দুষ্টদণ্ডবিধায়ক।
রুক্‌মিনী প্রাণনায়েক প্রভু পতিতপাবন।
অনাদি অনন্ত হরি নৃসিংহ মুরতি ধরি
হিরণ্য দৈত্যকু মারি বুক কৈল বিদারণ॥
দোয়াপর যুগরে হরি গুপ্তে বরি গুপপুরী
দুষ্ট কংসকু নিবারি রজা কল উগ্রসেন
ভারতভূমি মধ্যরে সুদর্শন ধরি করে
পাণ্ডবংক ছলে হরি, কৌরবে কল দমন
কলি যুগে জগরনাথ্ বিজে চক্রহস্ত
সাধিয়ে পউঠি অন্ন আপে করুছ ভবন
তুমে এ সংসারে সার, আভি সব মায়া ঘর
কৃতান্ত ডর উঠ্‌রো কহে দীন জনহীন॥

দুর্যোধনের গলার সুন্দর, ভক্তিকম্পিত জগন্নাথ-বন্দনার গান শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

॥ ৬ ॥

ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল চেঁচামেচিতে। বাইরে এসে দেখি, অনেক মেয়ে-পুরুষ জমা হয়েছে বাংলার সামনে। তারা সমস্বরে অনুযোগ করছে, "তম্মে এট্টা কঁড় করিলু বাবু? সে বড্ড বাঘ্‌ঘটাকু খণ্ডিয়া করিকি ছাড়ি দেলু? আম্মোমানে ঝারা দেইবাকু যাউ পারি নাস্তি। কঁড় হব এবে?"

মানে, তুমি এটা কী করলে বাবু? বড় বাঘটাকে আহত করে ছেড়ে রাখলে? আমরা জঙ্গলে প্রাতঃকৃত্য পর্যন্ত করতে যেতে

পারছি না। কী হবে এবারে?

দেখলাম, দণ্ডধর তাদের শান্ত করে বলল, "এক্ষুনি হাঁকা করব আমরা। খণ্ডিয়া বাঘকে মেরে, তবেই মুখে জলদানা দেব। বাঘটা কোথায় আছে যারা দেখেছ, তারা চলো আমাদের সঙ্গে। মেয়েরা আর ছোটরা বাদে।"

এমন সময় দেখা গেল, গামছা-পরা একটা হাড়সার লোক আসছে গেট পেরিয়ে। দণ্ডধর ভাল করে দেখে বলল, "আরে, শিব্ব না?"

কাল রাতের অন্ধকারেই তাকে দেখেছিলাম। দিনের আলোয় আমার চেনার কথা নয়। তার পেছনে পেছনে কঙ্কালসার একটি নারীমূর্তিকেও আসতে দেখলাম।

শিব্ব কাছে এলে, তাকে পাশে ডেকে দণ্ডধর কী সব জিজ্ঞেস করল। দণ্ডধরকে খুবই উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।

শিব্ব বলল, সেও যাবে হাঁকা করতে। খণ্ডিয়া বাঘ যদি মারা পড়ে, তাহলে গরুর মাংসর বদলে বাঘের মাংসই খাবে। বাঘের মাংস তো কী, তাইই সই, মাংস তো!

ভাবছিলাম, বাঘের মাংস চিবোনোই যায় না। রবারে কামড় দিলে দাঁত যেমন লাফিয়ে ওঠে তেমন করেই লাফিয়ে ওঠে দাঁতের পাটিও। বাঘের তলপেটের কাছে যতটুকু চর্বি থাকে, তা তো লোকে বাঘের চামড়া ছাড়ানো হলে কাড়াকাড়ি করেই নিয়ে নেয় ওষুধ বানাবার জন্যে। শিব্ব তার এই জিরজিরে চোয়াল আর আফিঙের গুঁড়ো আর কন্দসেদ্ধ খাওয়া পেট নিয়েও বাঘ খাবার আশা রাখে দেখে তাজ্জব হয়ে গেলাম।

আধঘন্টার মধ্যেই কেরোসিনের টিন, শিঙে, ঢোল, করতাল এবং টাঙ্গি ও তীর-ধনুক নিয়ে প্রায় জনা-পঞ্চাশেক লোক জমে গেল। কিন্তু অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হবার ভয়। এ-কথা দণ্ডধরকে বলতেই সে বেছে-বেছে জনাকুড়ি লোককে সঙ্গে নিল। বাকি যারা, তারা তাদের বউ-শালিদের সামনে রিজেকটেড হওয়াতে প্রচণ্ড অপমানিত বোধ করল, মনে হল।

দণ্ডধরকে শটগানটা দিয়েছি। ডান ব্যারেলে লেথাল্ বল্ এবং বাঁ ব্যারেলে স্কেরিক্যাল বল্ পুরে। আরও চারটে গুলি নিয়েছে সে, শার্টের পকেটে। আমি নিয়েছি ফোর-সেভেন্টি-ফাইভ ডাবল-ব্যারেল। সফ্ট-নোজ্ড গুলি নিয়েছি চারটি সঙ্গে।

এখন কথাবার্তা কম। প্রায় নিঃশব্দে সিঙ্গল ফরমেশানে এগিয়ে গিয়ে ভীমধারার নদী পেরিয়ে নদীটা যেখানে অন্য একটা নালা হয়ে সরে গেছে গ্রামের দিকে, সেখানে এসে দণ্ডধর অবস্থাটা বুঝে নেবার চেষ্টা করল। বাঘের পায়ের দাগ এবং নদীর পাশের সুঁড়িপথের কোনো-কোনো জায়গায় শুকিয়ে-যাওয়া রক্তের দাগও পাওয়া গেল। তারপর ওদের সঙ্গে ফিসফিস করে পরামর্শ করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল দণ্ডধর। বুঝলাম, বিটাররা নালার মধ্যে নামবে দু'পাশের পাড়ের জঙ্গলে জঙ্গলে গিয়ে। তারপর পেছন থেকে হাঁকা করবে, যাতে বাঘটা তাড়া খেয়ে এদিকে আসে।

বসার মতো তেমন ভাল জায়গা নেই এদিকে। দণ্ডধর আমাকে একটা আগাছায় আড়াল করা কালো বড় পাথর দেখিয়ে, নিজে আরও একটু এগিয়ে গিয়ে একটা পিয়াশাল গাছে উঠে গেল তর্তর্ করে কাঠবিড়ালির মতো। ততক্ষণে বিটাররা আমাদের ফেলে দু' ভাগে ভাগ হয়ে চলে গেছে নালার ওদিকের পাড়ে-পাড়ে হেঁটে।

সময় এতই অল্প যে, ব্যাপারটা যে কী দাঁড়াবে, বুঝতে পারছিলাম না। কথা ছিল ভীম প্রথমে শিঙা বাজিয়ে সকলকে হাঁকা শুরু করার সঙ্কেত দেবে। ভীম আছে বাঁ-দিকের পাড়ে-পাড়ে যে-দলটি গেছে তাদেরই সঙ্গে। পাথরে বসে, সামনে থেকে আগাছার বেড়া হাত দিয়ে ফাঁক করে দেখে নিলাম নালা দিয়ে বাঘ যদি দৌড়ে যায় তাহলে তাকে মারা যাবে কি না? মনে হল, যাবে; তবে বাঘের সঙ্গে আমার তফাত থাকবে মাত্র হাত পাঁচেকের। উপায় নেই। তা ছাড়া দিনের বেলায় হাতে এই রাইফেলের দু' ব্যারেলে দুটি সফ্ট-নোজ্ড গুলি থাকলে এবং ঠাকুরানির ঘণ্টা আবারও না বাজলে, খণ্ডিয়া বাবাজিকে খণ্ডিত হতেই হবে।

যাতে নালার মধ্যেটা আর একটু ভাল করে দেখতে পারি, তার জন্য পাথরটার আরও একটু পেছনে উঠে এলাম। পেছনেই একটা গুহামতো। তার মধ্যে থেকে বাদুড়দের গায়ের বোঁটকা গন্ধ আসছে। শীতের সকাল, তখনও গাছ-পাতা বালি-পাহাড় শিশিরে ভেজা। তুলোর মতো শিশির-পড়া মাকড়সার জালে আর বুনো নাম-না-জানা ফুলের উপর সকালের রোদ পড়াতে হাজার হাজার হিরে ঝলমলিয়ে উঠছে। যে একবার এই হিরের খনির খোঁজ পেয়েছে, সে আর কলকাতার সাতরামদাস ধালমল্, পি সি চন্দ্র বা বম্বের জাভেরি ব্রাদার্সের হিরে ছুঁয়েও দেখবে না।

টুঁই পাখি ডাকছে পিছন থেকে। দূর থেকে বড়কি ধনেশের ডাক ভেসে আসছে অস্পষ্ট। এক ঝাঁক টিয়া সকালের রোদ-ঠিক্‌রানো জঙ্গলের সবুজকে টুক্‌রো করে লাল ঠোঁটে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ঝকঝকে নীল-নির্জন আকাশে।

বড় শান্তি এখন, এইখানে।

হঠাৎ ভীমের শিঙা বেজে উঠল। আরম্ভ হল হাঁকাওয়ালাদের চিৎকার। কেরোসিন-টিন পেটানোর আওয়াজ, হাততালি, অদৃশ্য এবং বাস্তব ও কল্পিত সমস্ত শত্রুদের প্রতিই সম্ভাব্য এবং অসম্ভাব্য সবরকম গালাগালি। আওয়াজটা এগিয়ে আসছে। গাছে-গাছে টাঙ্গির মাথা দিয়ে বাড়ি মেরেও ওরা আওয়াজ করছে।

এমন সব সময়ে রক্ত শিরায় শিরায় একটু জোরেই ছোটাছুটি করতে থাকে। হাতের পাতা ঘামতে থাকে। ছেলেবেলায় এই উত্তেজনা আরও অনেক বেশি হত। যত দিন যাচ্ছে, ততই একে কিছুটা কায়দা করতে পারছি বলে মনে হচ্ছে। বিটাররা যে-গতিতে এগোচ্ছে, সেই গতিতে এগিয়ে এলে এবং হাঁকা পূর্ব-পরিকল্পনামতো হলে বড়জোর দশ মিনিটের মধ্যেই আমার সামনের নালা দিয়ে বাঘের যাওয়া উচিত। কাল রাতের গুলিটা খুবসম্ভব ডান পায়ে লেগেছে। এবং পায়ের নীচের দিকে, মানে হাঁটুর আর আর থাবার. মধ্যে। শিব্ব যে নাড়ু খাইয়েছিল তা সাধারণ নাড়ু নিশ্চয়ই নয়। অসাধারণও নয়। সে-নাড়ুর নাম দেওয়া উচিত জ্ঞানহরণ। কালো দেখতে, এবং মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ। খাওয়ার পর থেকেই খুব পিপাসা পাচ্ছিল আমার। দণ্ড বলেছিল যে,বাংলোতে ফিরে দুধ খেতে হবে আমাদের,ওকে মনে করিয়ে দিতে। কী ব্যাপার তখন বুঝিনি। কিন্তু বাঘটার উপর যখন দণ্ড রাতে টর্চের আলো ফেলেছিল, তখন একটা বাঘ নয়, অনেকগুলো বাঘ দেখেছিলাম আমি। নুনিময়ই বাঘ। ছোট বাঘ, বড় বাঘ, মেজো বাঘ, সেজো বাঘ, বাঘে বাঘে বাঘারি! গুলি যে কোন্ বাঘকে করেছিলাম এবং কোন্ বাঘে লেগেছিল তা বুঝিনি।

আজ সকালেও ঘুম ভাঙতে চাইছিল না। রাতে নানারকম স্বপ্নও দেখেছিলাম। দেখি একজন তাঁতি শান্তিপুরের সেই কাঁচা রাস্তাটার পাশে বসে লাল-নীল-সবুজ সুতো দিয়ে কোনো সুন্দরীর জন্যে যেন দারুণ আঁচলের আর পাড়ের এক শাড়ি বুনছে। এখনও ঘুম লেগে আছে আমার চোখে। কোনো কিছুই এখনও আমি স্পষ্ট করে বুঝতে পারছি না।

রবীন্দ্রনাথের ধাঁধার উত্তর

প্রথম ধাঁধার উত্তর 'কামান'। দ্বিতীয় ধাঁধার উত্তর 'হাঁসফাঁস'। তৃতীয় ধাঁধার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন যে, এর উত্তর হচ্ছে 'সঙ্গীত'। অর্থাৎ songগীত।

হাঁকা শেষ হলে আজকে দণ্ডধর আর শিব্বকে এ নিয়ে ভাল করে জেরা করতে হবে। কেন এবং কী জিনিস খাইয়েছিল ওরা আমাকে। একটু হলে আমার প্রাণ নিয়েই টনাটানি হত। বাঘের সঙ্গে ইয়ার্কি!

এমন সময় হঠাৎই বাঘের গর্জন শোনা গেল। সর্বনাশ। বাঘ বিটারদের লাইন ভেঙে ফিরে যাচ্ছে বলে মনে হল সকলের ভয়ার্ত চিৎকারে। ওদের সঙ্গে ভীম আর দুর্যোধন আছে। ভীমের হাতে আমার শট্‌গানটাও আছে ; কারণ 'থ্রি-সিক্সটি-সিক্স' রাইফেলটা নিয়েছে দণ্ড। দুর্যোধনের হাতেও আছে একটি সিঙ্গল ব্যারেল লাইসেন্সবিহীন মাজ্‌ল-লোডার।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই হঠাৎ শটগানের একটি গুলির আওয়াজ হল। বাঘের ঘন ঘন গর্জনে এবারে গাছপালা সব পড়ে যাবে মনে হল পাহাড় থেকে খসে। সঙ্গে-সঙ্গে হাঁকাওয়ালাদেরও সমবেত ভয়ার্ত চিৎকার, "দণ্ড রে! এ দণ্ডধর! ডাকুয়াবাবু! ঋজুবাবু! কাম্ব সারিলা! সে খণ্ডিয়াটা তাংকু মারি দেলে! শিব্বকু! সে কি আউ বাঁচিছি? গল্লা রে, গল্লা!"

আমি নালা ধরে দৌড়তে লাগলাম ঊর্ধ্বশ্বাসে। দণ্ডও তরতরিয়ে পিয়াশাল গাছ থেকে নেমে এসে আমার সঙ্গে দৌড়ল। ঘটনার জায়গাতে পৌঁছে দেখি, নালার বালি আর পায়ের পাতা-ভেজা জলে শিব্ব পড়ে আছে। টাটকা রক্তের ঝিরঝিরে স্রোতে ভিজে যাচ্ছে বালি আর জল। ওর ঘাড় আর মাথাটাকে বাঘটা ডাঁশাপেয়ারার মতোই চিবিয়ে দিয়ে চলে গেছে। শিব্বর হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে নাড়ি দেখল দণ্ড। দেখেই, ছেড়ে দিল।

আমার এত অপরাধী লাগল নিজেকে! কাল যদি বাঘটার বে-জায়গায় গুলি করে তাকে খণ্ডিয়া না করতাম তবে তো এমন হত না। এই মৃত্যুর সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমারই একার। মানুষ খুন করারই মতো অপরাধ এ। আমি আর কোনো কথা না বলে, হাঁকাওয়ালারা বাঘ যেদিকে লাফিয়ে চলে গেছে বলল, সেইদিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম।

দেখলাম, নালার পাড়টা দু'লাফে পেরিয়ে গেছে বাঘটা। রক্ত বেশি পড়েছে এখানে। প্রথম থেকেই বালিতে পায়ের দাগ দেখে এবং ঘাসপাতায় রক্ত যেখানে যেখানে লেগেছে সেই সব জায়গার উচ্চতা দেখে, গুলির চোটটা কোথায় হতে পারে তা অনুমান করেছিলাম। পায়ের থাবার দাগ অবিকৃতই ছিল, কিন্তু ডানপায়ের সামনের থাবার দাগটা অন্য পায়ের থাবার তুলনায় ছিল অস্পষ্ট। এটা বাঘ নয়, বেশি বয়সের বাঘিনী একটা। তাছাড়া, শিব্বকে যখন ধরে বাঘটা, তখন বিটারের মধ্যে অনেকে, এবং একজন গাছে-বসা স্টপারও বাঘটাকে চোখে দেখেছিল। তারা সকলেই বলছিল যে, ডান পায়ের হাঁটু একদম ভেঙে গেছে। ফুলেও গেছে পা-টা।

নালাটা খুব সাবধানে পেরোলাম। এখানে হরজাই জঙ্গল। কুচিলা, বেল, অর্জুন, করম পালধুয়া, হাড়কঙ্কালি, পুটুকাসিয়ার লতা। না-নউরিয়া এবং আরও নানারকম ঝোপ-ঝাড়। একটা পাথরের স্তূপের পাশ দিয়ে বাঘটা জঙ্গলে ঢুকে গেছে। রাইফেলের ব্রিচ খুলে গুলি দুটোকে আর একবার দেখে নিলাম। পাপটা আমার। সুতরাং প্রায়শ্চিত্তও একা আমাকেই করতে হবে।

আহত বাঘকে অনুসরণ করে মারার মধ্যে যে বিপদের আশঙ্কা এবং উত্তেজনা থাকে, তাই-ই শিকারিদের গর্বিত করে তোলে। যে-সব প্রাণী-দরদী সমস্ত শিকারকেই একধরনের নীচ স্পোর্টস বলে মনে করেন, তাঁদের বোধহয় ঠিক ধারণা নেই যে, শিকার ব্যাপারটা সকলের জন্যে নয়। এবং শিকারিও নানারকমের হয়ে থাকেন। আইন মেনে বিপজ্জনক জানোয়ার শিকার করার মধ্যে কোনো লজ্জা আছে বলে কখনও মনে হয়নি। বরং শিকার একজন শিকারিকে হয়তো মানুষ হিসেবেও অনেক বড় করে। দেশকে চেনায়, দেশের সাধারণ মানুষদের সম্পর্কে জানবার সযোগ দেয়,

তাদের প্রতি দরদী করে তোলে, যা খুব কমসংখ্যক শহুরে লোকের পক্ষেই সম্ভব। যে-সময়ের কথা বলছি, সে সময়ে শিকার করার মধ্যে কোনো অন্যায়বোধও ছিল না। জানোয়ার প্রচুর ছিল এবং চুরি করে শিকার করতাম না আমরা।

অনেকেরই ধারণা যে, মাচায় বসে বা হাঁকোয়াতে একটি বাঘ মেরে দেওয়া বোধহয় খুবই সোজা। কিন্তু যাঁরা জানেন, তাঁরাই জানেন যে, "There is many a slip between the cup and the lip." এবং এই কথাটা শিকারের বেলা কতখানি প্রযোজ্য। একজন শিকারি যেভাবে 'ব্যর্থতাই হল সাফল্যের সিঁড়ি' এই কথাটি হৃদয়ঙ্গম করেন এবং নিজের জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারেন, তা বোধহয় অন্য ধরনের খুব কম খেলোয়াড়ের পক্ষেই সম্ভব।

আজকে কিন্তু মনটা খুবই দুর্বল লাগছে। ভয়ও লাগছে ভীষণ। বাঘ যে কত ক্ষমতাবান, তার গলার স্বরে যে পৃথিবী সত্যিই কাঁপে, তার সামনের দুটি পায়ে যে সে কতখানি বল রাখে, তা যারা জানে, বাঘকে ভয় না করে তাদের কোনো উপায়ই নেই। শিব্বর রক্তাক্ত ছিন্নভিন্ন ঘাড়, মুখ আর মাথাটা মনে পড়ছিল, আর আমার নিজের মাথায় তখনও ঘুরছিল। কিন্তু এখন মাথা ঠিক না রাখতে পারলে আমার মাথার অবস্থাও শিব্বর মাথার মতোই হবে।

॥ ৭ ॥

পাথরের স্তূপটার আড়ালে বাঘটার পক্ষে লুকিয়ে থাকা খুবই সম্ভব। তাই, যেদিক দিয়ে বাঘটা সেদিকে গেছে, সে-দিক দিয়ে না এগিয়ে, অনেক ঘুরে বাঁ-দিক দিয়ে এগোলাম এক-পা এক-পা করে। নিঃশব্দে। সেই মুহূর্তে ডান পায়ের অবস্থার কথা একেবারেই ভুলে গেলাম। যা পরে রাতে শুয়েছিলাম, তাই পরেই চলে এসেছিলাম আমরা। পায়ে রবারের হাওয়াই চটি। নিঃশব্দে চলতে অসুবিধা হচ্ছিল না। তবে, গোড়ালি আর পায়ের পাতায় কাঁটা ও

ঘাসের খোঁচা লাগছিল। আস্তে-আস্তে বড় গাছের আড়াল নিয়ে নিয়ে অনেকখানি এগিয়ে এলাম বাঁদিকে।

জমিটা ওখানে পৌঁছে নরম চড়াই হয়ে একটি টিলার দিকে উঠে গেছে। আরও একটু এগিয়ে গেলাম টিলার দিকে, যাতে সেখানে পৌঁছে ঐ কালো পাথরের স্তূপের পেছনটা পরিষ্কার দেখতে পাই। বাঁ-দিকে একটি ময়ূর ও চারটি ময়ূরী চরছিল। ওরা আমাকে দেখতে পায়নি। তবু, খুবই ঘাবড়ে গেলাম। ময়ূররা যেমন বাঘ দেখলে কেঁয়া কেঁয়া করে ডেকে ভয় পেয়ে উড়ে গাছে গিয়ে বসে, জঙ্গলের গভীরে কাছাকাছি মানুষ দেখলেও তা-ই করে। ওরা আমাকে দেখতে পেলেই ওদের আওয়াজে বাঘ বুঝতে পারবে। বনের রাজার কাছে বনের কোনো খবরই গোপন থাকে না।

ভাগ্য ভাল। ময়ূরগুলো আমাকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত লক্ষই করল না। করল না, কারণ এদিকে তারা মুখই ফেরাল না। যারা সাপ ধরে খায়, তাদের চোখ ভীষণই তীক্ষ্ণ। এদিকে মুখ ফেরালেই ওরা দেখতে পেত আমাকে। কিন্তু, না-ফিরিয়ে পেখম ছড়িয়ে চরতে-চরতেই ওরা নালার দিকে নেমে গেল। নালা তখন শান্ত। আমাদের দলের অন্য সকলেই ততক্ষণে হতভাগা শিব্বর প্রাণহীন শরীরটি নিয়ে টুল্লকা গ্রামের দিকে চলে গেছে। বোধহয় দণ্ডধরেরই নির্দেশে। দণ্ডও হয়তো গেছে ওদের সঙ্গে।

একটি সুবিধামতো জায়গাতে পৌঁছে বড় একটি অর্জুন গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে জিরিয়ে নিলাম। ফোর-সেভেন্টি ডাবল-ব্যারেল রাইফেলটির ব্যালান্স্ চমৎকার। বইতে একটুও কষ্ট হয় না। তবুও, ভীত এবং উত্তেজিত অবস্থায় তাকেও খুব ভারী বলে মনে হচ্ছিল।

জখম ডান পায়ের তলাটাও দপ্দপ্ করছিল দাঁড়িয়ে পড়লেই। আমারই এই হচ্ছে, তাহলে না-জানি খণ্ডিয়া বাঘটার কতই কষ্ট হচ্ছে রাইফেলের গুলিতে ভাঙা পায়ের জন্য। যত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটার হেস্তনেস্ত হয়, ততই ভাল।

নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিকে খুব আস্তে-আস্তে মাথা ঘোরাতে লাগলাম। নাঃ, কোথাও কোনো চিহ্ন নেই বাঘের। খুবসম্ভব সে কোনো নিভৃত জায়গার খোঁজে গেছে। কিন্তু যেখানেই যাক, তার মৃত্যু নিশ্চিত! ফোর-সেভেন্টি রাইফেলের গুলিতে পা ভেঙে গেলে বাঘের পক্ষে বাঁচা মুশকিল। মরার আগে আরও অনেক মানুষ মেরে, এবং বড় যন্ত্রণার মধ্যে গড়াগড়ি দিয়ে, তিল তিল করে তাকে মরতে হবে। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, ওকে খুঁজে বের করতেই হবে। তা ছাড়া কোনো জন্তুকেই এমন কষ্ট দেওয়ার অধিকার কোনো শিকারির নেই।

শিব্বর উপর খুবই রাগ হচ্ছিল আমার। দণ্ডর উপরেও। কী যে নাড়ু খাওয়াল কাল রাতে! ঐ নাড়ু না-খেলে এমনভাবে গুলিও করতাম না, এবং গুলি হয়তো অমন বে-জায়গাতেও লাগত না। শিব্বকেও হয়তো মরতে হত না এমন করে। বাঘটার আঘাত এমন মারাত্মক মোটেই হয়নি যে, সে একেবারে অকেজো হয়ে গেছে। ভাবলাম, এখানে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে বরং জঙ্গলের কী বলার আছে তা শোনা যাক। জঙ্গলের পাখি আর জানোয়াররাই বলে দেবে বাঘের গতিবিধির কথা। কিন্তু যেহেতু তার চলচ্ছক্তি পুরোপুরিই আছে, তাই অল্প সময়ের মধ্যেই সে অনেক দূরেও চলে যেতে পারে। অবশ্য, নাও যেতে পারে। কারণ, দণ্ডধর বলছিল, এই জঙ্গলে ওই বাঘের বাড়ি। তাই নুনিতে গুলি খেয়ে সে এখানেই ফিরে এসেছে।

বাঘটা গুলি খেয়ে অন্য জঙ্গলে গেলেও আমাদের তাকে খুঁজে বের করতেই হত। সে যদি বাংলোর কাছের জঙ্গলে না আসত, তবে নুনিতে ফিরে গিয়ে আজ সকালে তার খোঁজ শুরু করতেই হত। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে, আমাদের কষ্ট কমই হচ্ছে। সবই হত, যদি না শিব্ব...

শিব্বর রক্তাক্ত শরীরটার ছবি বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। গা গুলিয়ে উঠছিল আমার, মাঝে-মাঝে ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল, দৌড়ে বন-বাংলার নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যাই। বাঘটাঘ মারা আমার কর্ম নয়। এই খণ্ডিয়া বাঘ নিশ্চয়ই যমের দূত। পুরো ব্যাপারটাই কাল রাত থেকে একটা দুঃস্বপ্নের মতো চেপে বসে আছে মনে। শরীরও আদৌ সুস্থ নেই।

দণ্ডধরই বা গেল কোথায়? আমার চেয়ে ওর অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। সাহসও বেশি। এই সময়ে, এই জঙ্গলে, ও আমার পাশে থাকলে অনেক বেশি জোর পেতাম।

অর্জুন গাছটার নীচে বসে পড়লাম আমি। পাইপটা পাঞ্জাবির পকেট থেকে বের করলাম। লাইটারটা বাংলোর ঘরের টেব্‌লেই পড়ে আছে। তাড়াতাড়িতে আনা হয়নি। একজন হাঁকাওয়ালার দেশলাই চেয়ে নিয়েছিলাম।

গভীর জঙ্গলে একটি দেশলাইকাঠি জ্বাললেও অনেকই শব্দ হয়। এবং সবচেয়ে বড় কথা, সেই শব্দ বনের স্বাভাবিক শব্দ নয়। হালকা-বেগুনি খদ্দরের পাঞ্জাবি আর সাদা পায়জামা পরে ছিলাম। আসা উচিত হয়নি এমন করে। এই পোশাকে ক্যামোফ্লেজ করা যায় না, তা ছাড়া সারাদিনই হয়তো এই বাঘের পেছনেই ঘুরতে হবে আমাকে আজ। কে জানে!

রাইফেলটাকে আড়াআড়ি করে দু'পায়ের উপরে রেখে পাইপটা ধরালাম, দেশলাই জ্বেলে। বাঘ যেখানেই থাকুক, সে আমার খুব কাছে নেই। শব্দ শুনে সে যদি তেড়ে আসে তাহলে তো ভালই। গুলি করার সুযোগ পাব। সে আসতে আসতে রাইফেল তুলে নিতে যে পারব, সে-বিশ্বাস আমার ছিল। চোখ সামনে সজাগ রেখে, দেশলাইটা জ্বেলে পাইপ ধরালাম। নাঃ। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই।

একজোড়া বেনেবউ বসে ছিল ঐ পাথরের স্তূপের ওপাশের একটি বুনো জামগাছের ডালে। তারা দুজনে হঠাৎ খুব ভয় পেয়ে ডানা ফরফর করে উড়ে গেল উল্টোদিকে। চম্‌কে উঠে, জ্বলন্ত পাইপ পকেটে পুরে ফেলে, রাইফেলের স্মল্ অব্ দ্য বাট্-এ হাত ছোঁয়ালাম।

আবার সব চুপচাপ। আমার পিছনের ছায়াচ্ছন্ন গভীর জঙ্গল থেকে সমানে একটি কপারস্মিথ্ পাখি ডেকে যাচ্ছিল। আর তার সঙ্গী সাড়া দিচ্ছিল অনেক দূর থেকে। দিনের বেলায় এদের ডাক জঙ্গলের নানারকম শব্দের মধ্যে অন্যরকম শোনায়। আশ্চর্য এক গা-ছমছমে ভাব আছে এই পাখির ডাকে।

এবার একঝাঁক টিয়া উড়ে এসে বসল ঐ পাথরের স্তূপেরই কাছের একটি গাছে। কিন্তু বসেই সঙ্গে-সঙ্গে আবার ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ করে উড়ে গেল।

এবারে আমার সন্দেহ হল। উঠে দাঁড়ালাম। এবং খুব সাবধানে, আস্তে আস্তে এগোতে লাগলাম এক গাছের আড়াল থেকে অন্য গাছের আড়াল নিয়ে। স্তূপটার কাছাকাছি এসে, রাইফেল রেডি পজিশনে ধরে খুব সাবধানে এগিয়ে যেতেই দেখলাম বাঘটার পেছনের একটি পায়ের সামান্য অংশ আর লেজ মিলিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে ঝাঁটি-জঙ্গলের মধ্যে।

দেরি হয়ে গেছিল। ভালভাবে নিশানা না নিয়ে আহত বাঘকে আবারও বে-জায়গায় গুলি করার কোনো ইচ্ছাই ছিল না আমার।

বাঘটা নালাতেই নেমে গেল আবার। নালার দিকে সরে এসে দাঁড়াব কি না ভাবছি, এমন সময় আমার ঠিক পেছনে শুকনো পাতা-মাড়ানোর আওয়াজে চম্‌কে উঠে পিছন ফিরলাম। দেখি, দণ্ড। নীল লুঙ্গি দু'ভাঁজ করে কোমরে গোটানো। গায়ে সেই হলুদ শার্ট। খালি পা। হাতে থ্রি সিক্সটি-সিক্স রাইফেলটি। নীল লুঙ্গির গায়ে ছোপ-ছোপ লাল রক্ত লেগে আছে। শিব্বর রক্ত।

দণ্ড আমার দিকে চেয়ে, চোখ দিয়ে শুধোল, কোন্ দিকে?

কথা না বলে, আঙুল দিয়ে ওকে দেখালাম। ইশারায় বোঝালাম

যে, বাঘ আবার নালায় নেমে যাচ্ছে, ঝাঁটি-জঙ্গলের আড়াল নিয়ে। মতলবটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

দণ্ড ইশারাতে বলল যে, এবার বাঘের পিছন পিছন যাব আমরা। দুজন আছি। বাঘকে এবার আমাদের দিকে চার্জ করে আসতে প্ররোচনা দেওয়াই ভাল হবে। তার চেহারা দেখামাত্র দুজনে একসঙ্গে গুলি করব। এখন আর ব্যাপারটা স্পোর্টসের পর্যায়ে নেই। তার যন্ত্রণা থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া যেমন দরকার, শিব্বর মৃত্যুর বদলা নেওয়াও তেমনই দরকার। যদিও সে খণ্ডিয়া না হলে শিব্বকে আদৌ মারত না। দোষটা পুরোপুরিই আমার।

অন্যায় আমরা অনেকেই করি। জীবনে সবসময় ন্যায়ই করছেন, এমন ভাব দেখান যাঁরা, তাঁরা ঘোরতর ভণ্ড। মানুষ মাত্রই দোষগুণে ভরা। অন্যায় সকলেই করে। কেউ জেনে, কেউ না-জেনে। যে ভাবেই করুন না কেন, অন্যায় যে আমরা করেছি, সেটা স্বীকার যদি করি, তাহলে বোধহয় দোষের অনেকখানিই লাঘব হয়ে যায়।

আমিই আগে আগে চললাম, কারণ আমার হাতেই হেভি রাইফেল। কিন্তু দণ্ডর অভিজ্ঞতা, সাহস ও বাঘ সম্বন্ধে জ্ঞান আমার চেয়ে অনেক বেশি। ঝাঁটি-জঙ্গলে একটু গিয়েই বাঘ নালায় নেমেছে এক লাফে। বোধহয় অসমান পাথুরে জঙ্গলের চেয়ে নালার সমান নরম বালিতে ভাঙা-পা নিয়ে হাঁটতে তার সুবিধে হবে ভেবেই সে নালায় নেমেছিল।

গত সপ্তাহে এ-দিকেই শুয়োর মারতে এসেছিলাম। নালার এই অংশটা অজানা ছিল না। আরও একটু আগে গিয়ে নালার মধ্যে একটু দহর মতো আছে। জায়গাটা ছায়াচ্ছন্ন। দু' পাশ দিয়ে ঘন জঙ্গলে ঝুঁকে পড়ে চাঁদোয়ার মতো সৃষ্টি হয়েছে নালার উপরে সেখানে। দহতে জল আছে। সামান্য।

নালায় নামতেই রক্তের দাগের সঙ্গে বাঘের পায়ের দাগ আবারও পেলাম। লাফিয়ে নামতে বেচারার কষ্ট যেমন হয়েছে, তেমনি রক্তও পড়েছে অনেকখানি। ওকে হাঁটাচলা করতে না হলে রক্ত-পড়াটা অন্তত এতক্ষণে বন্ধ হয়ে যাবার কথা ছিল। বনের এই জানোয়ারদের জীবনীশক্তি এবং প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াতে সুস্থ হয়ে ওঠার ক্ষমতা অবিশ্বাস্য।

কিছুটা গিয়েই নালাটা হঠাৎ একটা বাঁক নিয়েছে বাঁ-দিকে। এবং সেখানে নালার বুকে অনেক বড় বড় পাথর জড়ো হয়ে আছে। গত বর্ষায় কি তারও আগের বর্ষায় বানের তোড়ে ভেসে এসেছিল হয়তো। আহত বাঘের পক্ষে ঐ সব পাথরের যে-কোনো একটার আড়ালে লুকিয়ে থাকা আদৌ অসম্ভব নয়। নালার বাঁকটার মুখ থেকে যাতে বেঁকে-যাওয়া নালাটা পুরোপুরি দেখতে পাই, সেইজন্যে একেবারে ডান প্রান্তে চলে গেলাম। গিয়ে, সাবধানে আস্তে আস্তে মাথা দু'পাশে ঘুরিয়ে সমস্ত জায়গাটা তীক্ষ্ণ চোখে দেখলাম, নিশ্চল পায়ে দাঁড়িয়ে।

ওইখানে দাঁড়িয়েই হঠাৎ লক্ষ করলাম যে, নালার বালিতে ওই বাঁকের পরে বাঘের থাবার আর কোনো দাগ নেই। বাঘটা বাঁকের মুখে এসেই নালার ডানপাড়ে উঠে গেছে আবার এক লাফে। বোধহয় আমরা যে তাকে অনুসরণ করছি, তা বুঝতে পেরেছে। অথবা এমনিতেই ও গভীর জঙ্গলের নিরুপদ্রব কোনো আশ্রয়ের খোঁজে গেছে।

কী করব ভাবছি। দু'তিন সেকেণ্ড সময়ও কাটেনি, হঠাৎই পিছন থেকে দণ্ডর ভয়ার্ত চিৎকার শুনলাম : "বাঘঘ ! ডান পাখেরে !"

সঙ্গে সঙ্গে ডানদিকে মুখ ঘুরিয়েই দেখি, বাজ পড়ে পুড়ে-যাওয়া একটা শিমুল গাছের গুঁড়ির আড়াল থেকে বাঘটা আমার উপর লাফিয়ে পড়ার জন্যে জমির সঙ্গে লেপ্টে শুয়ে থাকার মতো করে বসে আছে। লেজটা পেছনে লাঠির মতো সোজা সমান্তরাল হয়ে আছে। আমার চোখের সঙ্গে তার চোখের দৃষ্টি যখন মিলল, তখন অনেকই দেরি হয়ে গেছে। সেফ্‌টি ক্যাচটি ঠেলারও সময় পেলাম না। সে ততক্ষণে লাফ দিয়েছে। কিন্তু বাঘটা লাফাবার সঙ্গে সঙ্গেই পেছন থেকে দণ্ডর হাতের রাইফেল গুড়ুম করে গর্জে উঠল। হলুদ-কালোয় ডোরাকাটা একটি সাইক্লোনের মতোই বাঘটা কানে তালা-লাগানো বুক-কাঁপানো গর্জন করে উড়ে এল আমার উপর। রাইফেল কাঁধে তুলে আমি একলাফে এগিয়ে গেলাম কিছুটা, তারপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম, বাঘের ছোঁয়া এড়াবার চেষ্টাতে। বাঘটা চার হাত পা এবং লেজসমেত যখন আমার মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল তখনই রাইফেল সুইং করে ট্রিগার টেনে দিলাম প্রায় তার বুকের সঙ্গে ঠেকিয়ে।

এত সব ঘটনা ঘটতে কিন্তু লাগল মাত্র কয়েক মুহূর্ত।

হেভি রাইফেলের রিপোর্টে সমস্ত বন-পাহাড় গমগম করে উঠল। বাঘটা আছড়ে পড়ল জলের মধ্যে ঝপাং করে। জল ছিট্‌কে উঠল চারদিকে। নালার দহের পাড়ে একটা ছোট্ট নীল মাছরাঙা মরা গাছের ডালে বসে ছিল। গুলির আওয়াজে ও বাঘের গর্জনে অন্য অনেক পাখির সঙ্গে সেও গলা মিলিয়ে ভয়ার্ত গলায় ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল।

বাঘটা জলে পড়েই এক মোচড়ে শরীরটাকে বিদ্যুতের মতো ঘুরিয়ে আবারও আমাকে ধরার জন্যে তেড়ে এল। কিন্তু ততক্ষণে আমার ও দণ্ডর আর-এক রাউণ্ড গুলি গিয়ে তার বুকে ও মাথায় লেগেছে। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে।

গুলি-রাইফেল হাতে আমি বাঘটার দিকে চেয়ে রইলাম। সেও চেয়ে রইল আমার দিকে। তার কশ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে এল। তার দু'চোখ লাল হয়ে ধীরে ধীরে বুঁজে এল। সমস্ত শরীর থর্‌থর্ করে কাঁপতে লাগল। মনে হল, আমারই মতো ওরও খুব ঘুম পেয়েছে।

মনটা ভীষণই খারাপ হয়ে গেল হঠাৎ। রাইফেলের ব্যারেলটা একটা পাথরের উপরে রেখে বাট্‌টা বালিতে পুঁতে বালিরই মধ্যে বসে পড়ে পাঞ্জাবির পকেট থেকে পাইপটা আবার বের করে ধরালাম। দণ্ড পাশে এসে বসল।

আজ দণ্ড না থাকলে আমার অবস্থাও এতক্ষণে শিব্বর মতোই হত। কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় ভয়ে আমার গায়ে কাঁপুনি এল।

॥ ৮ ॥

দণ্ড হাত পাতল। বলল, "টিক্কে তামাকু।"

তামাক দিয়ে বললাম, "আজ তোমার জন্যেই আমার প্রাণটা বাঁচল, দণ্ড।"

নিচু গলায় দণ্ড বলল, "আমি প্রাণ বাঁচাবার কে ? সবই ঠাকুরানির দয়া !"

ততক্ষণে অতগুলো গুলির শব্দ আর বাঘের গর্জন শুনে গ্রাম থেকে অনেকে দৌড়ে এসেছিল। সবচেয়ে আগে দেখা গেল দুর্যোধনকে। তার হাতে আমার দোনলা শট্‌গানটি। সে সাবধানে আমাদের খোঁজে অন্যদের চেয়ে আগে-আগে এগিয়ে এসেছিল। আমাদের বসে থাকতে দেখেই হাত দিয়ে পিছনে ইশারা করল। এবং পরক্ষণেই চিৎকার করে বলল, "মরিচি ! বাপ্পালো বাপ্পা ! কেত্বে বড্ড বাঘ্‌ঘটা মঃ !"

দৌড়ে এল ওরা সকলেই। হুড়োহুড়ি করে। পুরুষদের পিছনে পিছনে মেয়ে ও বাচ্চারাও। দণ্ড, পাইপের টোব্যাকোটা হাতে খৈনির মতো মেরে মুখে ফেলার আগেই হাতে-হাতে বাঘের গোঁফ সব উধাও হয়ে গেল। দুর্যোধন চেঁচামেচি শুরু করে দিল।

বাঘকে বয়ে বাংলোর হাতায় নিয়ে আসার ভার দুর্যোধনের উপরে দিয়ে আমি আর দণ্ড বাংলোর দিকে হেঁটে চললাম। বাঘ মরেছে। এবারে শিব্বর মৃত্যুটা আমার মনে ফিরে এল। গভীর গ্লানি আর পাপবোধ ভারী করে তুলল আমার মাথা।

চলতে চলতেই দণ্ড বলল, "শিব্ব ! বাঘ্‌ঘ খাইবে বল্লিকি হাঁ করিবাকু এইঠি আসিথেল্লে। আউ বাঘ্‌ঘটা তাংকু খাই নেল্লে। তাংকু বড্ড ভুখ্‌খ থিল্লা।"

কার ? শিব্বর,আবার কার ? অন্য মাংস না পেয়ে বাঘের মাংসই খাবে বলে হাঁকা করবার জন্যে লাফিয়ে লাফিয়ে এল, আর তাকেই খেল বাঘে ! বড়ই খিদে ছিল শিব্বর। মাংসর উপর দারুণ লোভ ছিল ওর ! পরের জন্মে ঠাকুরানির দয়ায় ও হয়তো বাঘ হয়েই জন্মাবে। আশ মিটিয়ে মাংস খাবে তখন। কে জানে, সবই ঠাকুরানির ইচ্ছা।

প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যে বললাম, "আচ্ছা দণ্ড, সেদিন কিসের নাড়ু খাইয়েছিল বলো তো শিব্ব আমাদের ? ওই নাড়ু না-খেলে বাঘের পায়ে গুলি করে তাকে খণ্ডিয়াও করতাম না, আর না-করলে শিব্ব তার হাতে মারাও যেত না। পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে রহস্যময়। রাতের নুনিতে এবং ভীমধারার মধ্যে ঐ আশ্চর্য ঘন্টা বাজা। সবই কি স্বপ্ন ? মনের ভুল ? ঐ মাটি ফুঁড়ে-ওঠা পেল্লায় বাইসন ! কাল রাতের সব কিছুই !"

দণ্ড দাঁড়িয়ে পড়ে লাল চোখে আমার দিকে চেয়ে বলল, "কী বলতে চাইছ তুমি ?"

"কিছুই বলতে চাইছি না। জানতে চাইছি শুধু।"

"ঐ নাড়ু সিদ্ধির নাড়ু। আর যা-কিছুই রহস্যময় ব্যাপার-স্যাপার কাল ঘটেছে, তার কিছুই স্বপ্ন নয়। সব সত্যি। ও সব ঐ ঠাকুরানিরই লীলাখেলা। শিব্ব জেনেশুনেও আমাদের ঠাকুরানির ঠাঁইয়ে গল্প মারবার জন্যে পাঠিয়েছিল বলেই হয়তো ঠাকুরানিই বাঘের রূপ ধরে এসে তোমাকে দিয়ে বে-জায়গায় গুলি করিয়ে নিজে খণ্ডিয়া হয়ে শিব্বকে মেরে গেলেন। ঠাকুরানিকে নিয়ে জঙ্গলের যে-সব লোক তামাশা করে, তাদের শেষ এই-ই হয়। কে জানে, পেট পুরে যাতে মাংস খেতে পারে, তার জন্যে এই মরা বাঘের আত্মাটা ঠাকুরানি শিব্বকেই দিয়ে দেবেন হয়তো। শিব্ব বাঘ হয়ে যাবে। তাঁর লীলা, তিনিই জানেন।"

ঠাকুরানির বাঘ আর নুনির রহস্যময় ব্যাপার-স্যাপার, সব কিছুরই মূলে তাহলে ওই সিদ্ধির নাড়ু ! ছি, ছি !

দণ্ডর কথা আমি কিছুই বুঝলাম না। কিন্তু ওদের অনেক কথাই আমি এবং আমরা বোধহয় বুঝি না। এই শিব্ব এবং দণ্ড, ভীম, দুর্যোধন, টুল্লকা বন-বাংলার চৌকিদার বেঁটেখাটো ছোট্ট বলিরেখাময় গোল মুখের খুকি, এরা এক অন্য জগতের মানুষ। এদের আমরা কখনও বুঝিনি, বুঝি না এবং বুঝবও না। এরাও বোঝে না আমাদের। আমাদের এই দুই জগতের মাঝে একটা

সাঁকো থাকলে বোধহয় ভাল হত।

দণ্ড বলল, "শিব্বর বউয়ের জন্য আমাদের তো কিছু করা উচিত ? কী বলো?"

"নিশ্চয়ই।" আমি বললাম। "কিন্তু তোমার কী মনে হয় ? কী করা উচিত ?"

"ওকে গ্রামে কিছু জমি কিনে দাও। ওদের তো ছেলেমেয়ে নেই। বউটার বয়সও বেশি নয়। ওর আবার বিয়ে দিতে বলব গ্রামের লোকদের শিব্বর শোক মরে গেলে। তুমি দুশো টাকা দেবে ? জেঠুমণির কাছ থেকে চেয়ে ? তাইই যথেষ্ট। দুশো টাকা কি কম টাকা ! ওরা কেউই একসঙ্গে কখনও দুশো টাকা চোখে দেখেনি।"

দুশো টাকা ? একজন মানুষের জীবনের দাম মাত্র এইটুকু ?

বললাম, "হাজার টাকা দেব জেঠুমণিকে বলে।" যেন একজন মানুষের জীবনের দাম হাজার টাকা ! আবার বললাম, "আর সুরবাবুদের বলে দেব যে, শিব্বর বউকে এবং ও যদি আবার বিয়ে করে তা হলে তাকেও যেন একটা চাকরি করে দেন ওঁরা, ওঁদের ক্যাম্পে।"

আমি আর দণ্ড যখন টুল্লকা বাংলার হাতাতে ঢুকলাম, তখন দেখলাম বাংলার সামনেই ডানদিকে যে বড় উঁচু সাদাটে পাথরটা আছে, সেই পাথরের উপর শিব্বর বউ বসে রোদ পোয়াচ্ছে পা ছড়িয়ে। কী সান্ত্বনা দেব ওকে জানি না। কী করে সামনে গিয়ে দাঁড়াব আমি ?

"শিব্ব ?" ওর কাছে পৌঁছে দণ্ড জিজ্ঞেস করল। মানে, মৃতদেহর কথা।

নিরুত্তাপ গলায় বউ বলল, "তাংকু নেই গল্লে..."

স্বামীকে দাহ করতে নিয়ে গেল অথচ তার গলাতে একটুও দুঃখের আভাস পেলাম না। অবাক হলাম।

পরক্ষণেই শিব্বর বউ বলল, "বাবু, তুমি কি কখনও বাঘের মাংস খেয়েছ ? শিব্বর তো খাওয়া হল না, কিন্তু আমি খাব বলে বসে আছি। বাঘ কখন কাটা হবে ? চামড়া ছাড়ানোর পর ?"

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আমি। উত্তর না-দিয়ে ঘরে গেলাম। মেয়েটার বোধহয় মাথাই খারাপ হয়ে গেছে।

বাঘের মাংস আমি জেঠুমণির সঙ্গে একবারই খেয়েছিলাম। নাগাল্যাণ্ডের মোকক্‌চঙের কাছের এক গ্রামে। চিবোনো যায় না। দাঁতের পাটি লাফিয়ে ওঠে। কিন্তু আমাদের এই বনজঙ্গলের বড় গরিব, ক্ষুধাতুর, সরল, সাধারণ মানুষগুলোর জীবনযাত্রা ও চাওয়া-পাওয়ার আসল রকমটি দেখে ও জেনে আমার মনে হল,

বাঘের মাংস হজম করার চেয়েও অনেক বেশি কঠিন ওদের আসল দুরবস্থার সরল সত্যটি হজম করা।

রাইফেলটা ঘরে রেখে বারান্দার চেয়ারে এসে বসলাম। চৌকিদার খুকি চা নিয়ে এল। শিব্বর বউকেও একটু চা দিতে বললাম ওকে।

খুকি আপত্তি জানিয়ে বলল, "শিব্বর বউ তো পুরো আধ-হাঁড়ি খিচুড়ি খেয়েছে। কালকের খিচুড়ি বেঁচেছিল অনেক।"

"কখন খেল?" অবাক হয়ে শুধোলাম ওকে।

"শিব্বকে অন্‌গুলে নিয়ে গেল যখন ওরা ট্রাকে করে, তারপরে। নিরিবিলিতেই খেয়েছে। বিরক্ত করার কেউই ছিল না। পেট পুরে খেল।"

চায়ের গ্লাসটা হাতে নিয়ে অবিশ্বাসী চোখে খুকির মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

জঙ্গল থেকে বাংলোর দিকে ফেরার পথে একটু আগেই দণ্ড বলছিল যে, আমাদের কাছে ভাগ্যিস জিপ এবং ট্রাক আছে, তাই আজই শিব্বর পোস্ট-মর্টেম হবে হয়তো। না, তবু আজ হবে না। আজ যে রবিবার। কাল হবে। কিন্তু যখন মোষের গাড়িতে চাটাই মুড়ে মৃতদেহ নিয়ে যেতে হয়, কেউ গাছ-চাপা পড়লে বা বাঘ, হাতি বা বাইসনের হাতে মরলে, তখন অন্‌গুলে পৌঁছে পোস্টমর্টেম হতে হতে অনেকসময় সাতদিনও লেগে যায়। বাঘের হাতে মরেও নিস্তার নেই। তারপর পড়তে হয় পুলিশের হাতে। বাঘের চেয়েও বিপজ্জনক তারা।

খুকিকে বললাম, "তোমাদের আপনজন মরলে তোমরা শোক করো না? দুঃখ লাগে না তোমাদের?"

খুকি আমার কথা শুনে খুব জোরে হেসে উঠল। বলিরেখাভরা কপাল কুঁচকে উঠল। ফোকলা দাঁতের মধ্য দিয়ে হাসির টুকরো-টাকরা লাফিয়ে আসতে চাইছিল বাইরে। কিন্তু সামলে নিয়ে তার চোখ আমার চোখে রেখে বলল, "ঋজুবাবু, শোকটোক দুঃখ-টুঃখ সব তোমাদের মতো বড় মানুষদেরই জন্যে। আমাদের ওসব বিলাসের সময় কোথায়? প্রতিটি দিনই আসে বড় দাপটে এক-একটা ঝড়ের মতো। ডানাভাঙা পাখির মতো গুঁড়িয়ে দিয়ে যায়। আমাদের দিন গুজরান করতেই প্রাণান্ত। আমরা তাইই তো গাই দয়া করো দীনবন্ধু শুভে যাউ আজ দিন, করজোড়ে তুমপাদে করুছি এ নিবেদন। এই এমনি করেই কেটে যাচ্ছে দিন। তোমরা যে-কদিন আছ, ভাল খাচ্ছি-দাচ্ছি, তোফা আছি। চলে গেলেই আবার যে কে সেই।"

বলেই খুকি রান্নাঘরে চলে গেল।

চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বসে সামনে তাকিয়ে ছিলাম। শীতের হাওয়ায় পাতা ঝরে যাচ্ছে গাছ থেকে। হাওয়ার সওয়ার হয়ে ব্যালেরিনার মতো ঘুরতে-ঘুরতে উড়তে-উড়তে মাটিতে নামছে তারা। ঝরঝর করে ঝরনার মতো শব্দে পাথরের উপর দিয়ে সেই পাতার পাল তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে রাখাল হাওয়াটা।

পাতার মতো দিনও ঝরে। ঝরাপাতার মতো দিন। আমার দেশবাসীর দিন, আমার ভাইবোনের দিন। ঠাকুরানির জঙ্গলের বাঘে-চিবোনো এই সাধারণ শিব্ব, তার বউ, খুকি, ভীম, দুর্যোধন, এবং আরও অসংখ্য অজানা অচেনা মানুষদের প্রত্যেকেরই দিন।

বাঘের মাংসের মতো দিন!

শব্দসন্ধান

১	২		■	৩	৪	■	৫	৬	
■		■	৭			৮			■
৯		১০		■	■	১১	১২		১৩
	■		■	১৪	১৫	■		■	
১৬	১৭	■	১৮			১৯	■	২০	
■	২১	২২		■	■	২৩	২৪		■
২৫			■	২৬	২৭	■	২৮		২৯
	■	৩০	৩১			৩২		■	
■	৩৩			■	■	৩৪		৩৫	■
৩৬		■	৩৭				■	৩৮	

সংকেত

পাশাপাশি (১) ময়ূরের শোভা। (৩) অনাবৃষ্টির ফল। (৫) আদি কবি কবিত্বলাভ করেছিলেন কোন্ নদীর তীরে? (৭) কানে-কানে কথা। (৯) ছোটরা খেলাচ্ছলে খায়। (১১) থোক বা নগদ। (১৪) পর্বত। (১৬) প্রহরী। (১৮) পলি থেকে জাত। (২০) এক মাসে দুবার আসে। (২১) দ্বিচক্রযান, জাপানি নাম। (২৩) দাঁত। (২৫) কোন্ হ্রদে সন্ধ্যা নামল ব'লে! (২৬) শিরে সর্পাঘাত হলে বেঁধে লাভ নেই। (২৮) একই শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো গুরুজনের — মানো, তাম্র— কী তা জানো? (৩০) এশিয়ার বিখ্যাত এক মরুভূমি। (৩৩) আগুন। (৩৪) বিবাহিতা মেয়েদের আত্মীয়া। (৩৬) রূপকথাতে পাই, বাস্তবে কি নাই? (৩৭) একটি যোগাসন। (৩৮) ক্ষত্রিয়।

উপর-নীচ (২) ছোরাবিশেষ। (৩) যে-নারীর বচন বিখ্যাত। (৪) পূর্ণিমা-চাঁদ। (৬) সুন্দর। (৭) ঝাড়ুদার পাখি। (৮) ফল পাতা তেতো হলেও উপকারী গাছ। (৯) পায়ের অলংকার। (১০) প্রাচীন ভারতীয় ভাষা। (১২) অতি দর্পে তাঁর পাতালে হল ঠাঁই। (১৩) জানলা। (১৪) এই নামে পৌরাণিক ভারতবর্ষে নর-বানর দুই-ই ছিলেন। (১৫) সংকীর্ণ পথ। (১৭) ফলবিশেষ। (১৮) খেললে খেলা, পরলে গয়না। (১৯) কিরণ। (২০) একটি ফলের সংস্কৃত নাম। (২২) নদী বা ঝরনার শব্দ। (২৪) রাবণ। (২৫) শত্রুতা। (২৬) যা ধরে কানে, তা-ই লাগে বাড়িতে দোকানে। (২৭) বিখ্যাত পালোয়ান। (২৯) রাত্রি। (৩১) সাদা চুল কালো করে। (৩২) বন। (৩৩) শত্রু। (৩৫) যাঁর যজ্ঞ মানেই প্রলয়কাণ্ড।

(সমাধান ২৭৬ পৃষ্ঠায়)

শ্রী থেকে ঈশ্বর

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

পুপু আর কোয়েলির দিদা একদিন একটা বাচ্চা ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। এনে ওদের মা'কে বললেন, "তোর একটা কাজের লোকের দরকার না? এই ছেলেটাকে নিয়ে এলাম।

ছেলেটাকে দেখে পুপু আর কোয়েলি তো হেসেই অস্থির। ওর বয়েস সাত কিংবা আট। বেশ গোলগাল চেহারা। বড়-বড় চোখ। গায়ে বোতাম-ছেঁড়া শার্ট। কালো হাফপ্যান্ট পরে ভয়ে-ভয়ে একবার পুপুর দিকে, একবার কোয়েলির দিকে তাকাচ্ছে।

পুপু হাসতে-হাসতে বলল, "এইটুকু ছেলে কী কাজ করবে দিদা? তুমি চলে গেলেই তো নাকে কাঁদতে শুরু করবে —তখন?"

এইবার ছেলেটি বলে উঠল, "না, কাঁদব না।"

কোয়েলি ওর ফোলা গাল টিপে দিল, "ঠিক?"

"হুঁ, কাঁদব না।"

পুপু হাল্কা স্বরে বলল, "কিন্তু কাজ-টাজ তুই তো কিছুই করতে পারবি না।"

"আমি সব কাজ করতে পারি। দোকান করতে পারি, বাজার করতে পারি, ঘর ঝাড়ফুঁক করতে পারি।"

"সর্বনাশ! ঝাড়ফুঁক করিস কী রে?" পুপু আর কোয়েলি বেশ মজা পেল, "কেমন করে করিস বল তো?"

"ঝাঁটা আর কাপড় দিয়ে গো। টেবিল-চেয়ার, জানলা-দরজা একেবারে ঝকমক করবে, হুঁ।"

পুপু আর কোয়েলির মা এবার ওদের তাড়া দিলেন, "এই তোরা থাম তো। আসতে না আসতেই বাচ্চা ছেলেটার পেছনে লেগেছিস।"

দিদা হেসে বললেন, "ছেলেটা খুবই কাজের। আমাদের বাড়ির

পাশের বস্তিতে থাকে। অনেক ভাইবোন। ওর বাবা পাড়ার ছোট একটা কারখানায় কাজ করে। আমাকে অনেকদিন ধরে বলছে ছেলেকে একটা ভাল বাড়িতে কাজে লাগিয়ে দিতে।"

"ওকে এনে খুব ভাল করেছ মা। যা মুশকিলে পড়েছি, দিন-রাতের একটা ভাল লোক পাচ্ছি না," পুপু-কোয়েলির মা বাচ্চা ছেলেটার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "তোর নাম কী বাবা ?"

"হরেন্দ্রনাথ নস্কর।"

ছেলেটার পুরো নাম বলার ধরন দেখে কোয়েলি ফিক করে হাসল। হেসে বলল, "আর তোর বাবার নাম ?"

"আঃ, তোরা যা তো এখান থেকে। বড় যা-তা বকে যাচ্ছিস সেই থেকে। বেচারা ঘাবড়ে যাচ্ছে।"

হরেনের চেহারায় কিন্তু ঘাবড়ে যাওয়ার কোনো চিহ্ন নেই। সে বড়-বড় চোখ মেলে কোয়েলির দিকে তাকিয়ে সপ্রতিভ ভঙ্গিতে বলল, "আমার বাবার নাম শ্রীরতিকান্ত নস্কর।"

হরেনের রকম দেখে এবার কোয়েলি আরও বেশি হাসল, "কী নাম বললি ?"

"শ্রীরতিকান্ত নস্কর।"

পুপু বলল, "রতিকান্ত নস্কর ?"

"না," পুপুর ভুল শুধরে দেওয়ার জন্যে এবার হরেন বেশ জোরে বলে উঠল, "শ্রীরতিকান্ত নস্কর।"

ওইটুকু ছেলের মুখে 'শ্রী' কথাটা শুনে হঠাৎ পুপু আর কোয়েলি যেন বেশ মজা পেয়ে গেল। কী হাসি ওদের দুজনের ! এদিকে হরেন ওদের দুজনের এত হাসির কারণ বুঝতে না পেরে মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে থাকল চুপচাপ।

পুপু-কোয়েলির মা ওদের দিদাকে বেশ বিরক্ত হয়ে বললেন, "এই মেয়েদুটোকে নিয়ে হয়েছে যত মুশকিল। সংসারের কোনো কাজ করবে না, খালি শুয়ে-বসে দিন কাটাবে আর ভাল কোনো কাজের লোক এলে তার সঙ্গে ইয়ার্কি-ফাজলামি করে তাকে অতিষ্ঠ করে তুলবে।"

হরেন কী বুঝল কে জানে, পুপু-কোয়েলির নিন্দে শুনে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে খুকখুক করে হাসল। আর ওরা দুজন তখন হরেনের দু'হাত ধরে তার সঙ্গে বোধহয় আরও মজা করবার জন্যে তাকে টেনে নিয়ে গেল ওদের পড়বার ঘরে।

বয়েস সাত-আট বছর হলে হবে কী, হরেন খুবই কাজের ছেলে। এক কথা তাকে দু'বার বলতে হয় না, সব মনে রাখে। আর কাজও করে সে চটপট। ছুটে-ছুটে সে দোকানে যায়, পুপু-কোয়েলি আর তাদের মা'র শাড়ি-কাপড় দরকারমতো লন্ড্রি থেকে ইস্তিরি করিয়ে নিয়ে আসে খুব তাড়াতাড়ি। আর পুপু-কোয়েলির মা'র পাশেপাশে থেকে সংসারের সব টুকিটাকি কাজে তাঁকে সাহায্য করে।

পুপু-কোয়েলির মা খুব খুশি হরেনের মতো কাজের ছেলে পেয়ে, আর হরেনও খুব সুখী, এ সংসারে এসে। হরেনের মা-বাবা কাছাকাছিই থাকে। এই তো বালিগঞ্জে। টালিগঞ্জ থেকে বালিগঞ্জ আর কতই বা দূর। কিন্তু হরেন বাড়ি-টাড়ি একেবারেই যেতে চায় না। বাড়ি যাওয়ার কথা উঠলেই পাকা বুড়োর মতো বলে, "কেমন করে যাই গো। একবেলার জন্যেও যেতে পারি নাকি আমি ? কত কাজ আমার না এ-সংসারে।"

খুব অল্পদিনের মধ্যে হরেন এ-বাড়ির ছেলের মতোই হয়ে গেল। পুপু-কোয়েলির সঙ্গেও এখন তার খুব ভাব হয়ে গেছে। কিন্তু হরেনের মুখ থেকে 'শ্রী' উচ্চারণ শোনবার জন্যে ওরা ওর সঙ্গে প্রায়ই মজা করে।

সন্ধেবেলা যখন পুপু আর কোয়েলি মন দিয়ে পড়াশুনো করে কিংবা বাবাকে সব খবর দিয়ে লম্বা চিঠি লেখে হায়দরাবাদে, তখন

হরেনের বেশি কাজ-টাজ থাকে না। সে এসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে ওদের পড়ার ঘরে। আর দুজনের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভেবে যায় সারাক্ষণ।

পুপু একসময় জিজ্ঞেস করে, "কী রে হরেন, তোর ঘুম পাচ্ছে নাকি?"

হরেন হাই তোলে, "না," তারপর উঠে দাঁড়িয়ে পুপুর দু-একটা বই নেড়েচেড়ে বলে, "জানো পুপুদিদি, আমার বাবাও বই পড়ে। মোটা-মোটা রামায়ণ, মহাভারত—"

"তাই নাকি?" পুপু মজা করবার জন্যে বলে, "কী নাম যেন তোর বাবার?"

"শ্রীরতিকান্ত নস্কর।"

কোয়েলি পড়া থামিয়ে হাসে হরেনের দিকে তাকিয়ে। পরে বলে, "কী বললি? রতিকান্ত নস্কর?

"না, শ্রী—"

কিন্তু হরেন কথা শেষ করতে পারে না, তার আগেই পুপু-কোয়েলির মা ঘরে এসে বকে দেন ওদের, "আবার বেচারির সঙ্গে আজেবাজে বকছ? খুব পড়াশুনো হচ্ছে দেখছি তোমাদের।" হরেনের হাত ধরে তিনি তাকে অন্য ঘরে নিয়ে যান।

হরেনের মতো অত ছোট না হলেও পুপু আর কোয়েলিও তো ছেলেমানুষ। হরেনের বাবাকে নিয়ে মজা করবার কথা তারা কক্ষনো ভাবে না—তাহলেও তাকে তারা প্রায়ই তার বাবার নাম জিজ্ঞেস করে শুধু তার ছোট মুখ থেকে 'শ্রী' শব্দটা শোনবার জন্যে। হরেনও বেশ জোর দিয়ে কথাটা উচ্চারণ করে, ভুলেও বাদ দেয় না। আর তখন তার মোটাসোটা চেহারা বড় মিষ্টি মনে হয় পুপু আর কোয়েলির।

এই রকম করেই দিন কেটে যায়। হরেন এখন এ-বাড়িতে বেশ পুরনো হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও থেকে-থেকে পুপু আর কোয়েলি তাকে সেই এক প্রশ্ন করে আর সেও ঠিক তেমন মুখ করে একই উত্তর দেয়। তখন দুজনে সেই রকম করেই হাসে।

হরেন এ-বাড়িতে আসার পর থেকেই পুপু আর কোয়েলির যেন নতুন একটা নেশা ধরে গেছে। তোমরা যেমন ভাল-ভাল ক্যাসেট বাজিয়ে খুশি হও, স্টিরিওতে বারবার মনের মতো গান কিংবা সেতার কি সরোদ শোনো, সেই রকম পুপু আর কোয়েলিও হরেনের মুখে শোনে তার বাবার নাম। অদ্ভুত একটা নেশা। কী বলো তোমরা? এ গল্পটা যে একেবারে সত্যি তা কি বিশ্বাস করতে পারো? হ্যাঁ, সত্যি। হরেন বলে সত্যি একটা বাচ্চা ছেলে আছে। আর পুপু-কোয়েলি তো আছেই। তোমরা কেউ-কেউ হয়তো তাদের চেনো।

ক্যাসেট কিংবা স্টিরিওতে মনের মতো গান কিংবা বাজনা তোমরা যেমন শুধু নিজেরাই শোনো না, বন্ধুবান্ধবদের শুনিয়ে আনন্দ পাও—আশ্চর্য, পুপু-কোয়েলিও তাদের চেনাশোনা সকলকে হরেনের মুখ থেকে শোনায় তার বাবার নাম। আর সকলে ওইটুকু ছেলের মুখে মিষ্টি 'শ্রী' উচ্চারণ শুনে খুবই মজা পায়।

এই তো সেদিন পুপু আর কোয়েলির দু-তিনজন বন্ধু এল ওদের বাড়িতে বিকেলবেলা গল্প-টল্প করবার জন্যে। কয়েকদিন আগে অ্যানুয়েল পরীক্ষা হয়ে গেছে, এখন ওদের ঢালা অবসর। পড়াশুনোর চাপ তো নেই, শীতের দুপুরে শুধু এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ানো আর দলবল নিয়ে মাঝে-মাঝে সিনেমা দেখা।

মৌ, বুলবুলি আর পিঙ্কিকে দেখে ভারী খুশি পুপু আর কোয়েলি। ওদের আড্ডা জমে উঠতে দেরি হল না। এত হৈ-চৈ শুরু করল ওরা, যেন এইমাত্র একটা ক্লাস শেষ হয়েছে।

একটু পরেই একটা বড় ট্রে হাতে নিয়ে পুপু-কোয়েলির মা ঘরে এলেন। ট্রেতে খাবারের প্লেট। তার সঙ্গে এল হরেন। তার হাতেও আর-একটা ট্রে। তাতে জলের গেলাস।

ট্রে টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে পুপু-কোয়েলির মা মেয়েদের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, "অনেকদিন তোমাদের দেখিনি। কেমন আছ? পরীক্ষা তো ভালই দিয়েছ?"

"না না, মাসিমা, খুব খারাপ," পিঙ্কি বলল, "কী যে হবে বুঝতেই পারছি না।"

"পরীক্ষার পর ওরকম মনে হয়," পুপু-কোয়েলির মা বললেন, "রেজাল্ট ভাল হবেই তোমাদের।" তিনি হরেনের হাতের ট্রে থেকে একটি-একটি করে জলের গেলাস তুলে নিয়ে খুব সাবধানে টেবিলের ওপর রাখলেন।

পুপু আর কোয়েলির বন্ধুদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল হরেন। পিঙ্কিকে দেখতে দেখতে সে অবাক হয়ে যাচ্ছিল। কবে কোন মুদির দোকানে টাঙানো ক্যালেণ্ডারে এক মেমসাহেবের ছবি দেখেছিল হরেন—এই দিদিমণি ঠিক সেইরকম দেখতে।

পুপু-কোয়েলির মা ঘর থেকে চলে যাবার পরেও হরেন গেল না, খালি ট্রে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল মৌ, বুলবুলি আর পিঙ্কিকে।

হরেনকে দেখে পিঙ্কি পুপুকে বলল, "বাচ্চা ছেলেটা কী সুইট!"

"হ্যাঁ," পুপু হাসল, "আর সুইট করে ও যখন একটা কথা উচ্চারণ করে—শুনলে তোর ইচ্ছে হবে ওর গাল টিপে দিতে।"

"কী কথা রে?"

পুপু হরেনকে কাছে ডাকল। ডেকে বলল, "এই হরেন, তোর বাবার নাম কী রে?"

হরেন পিঙ্কিকে দেখল। মৌ আর বুলবুলিকেও দেখল। পরে পুপুর দিকে ফিরে সেই রকম মিষ্টি করে বলল, "শ্রীরতিকান্ত নস্কর।"

পুপু পিঙ্কির দিকে তাকিয়ে হাসল, "ও 'শ্রী' বলবেই। একটা মজা দ্যাখ্—" বলে পুপু হরেনকে আবার বলল, "কী নাম বললি? রতিকান্ত নস্কর?"

হরেন প্রবল বেগে মাথা নাড়ল, "না। শ্রী—" কিন্তু সে বাকিটা বলবার আগেই সকলে একসঙ্গে বলে উঠল, "হাউ সুইট!"

ওর দিকে তাকিয়ে তারপর কী হাসি সকলের!

হরেনের কোনোদিন কিছু মনে হয় না, কিন্তু আজ পিঙ্কিকে হাসতে দেখে ওর মন বেশ খারাপ হয়ে গেল। সে আর দাঁড়িয়ে থাকল না সে-ঘরে, আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসে খাবার ঘরে ট্রেটা রেখে বারান্দায় চলে এল। মেঘলা আকাশ। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। রেলিঙে দু-হাত রেখে করুণ মুখে হরেন দাঁড়িয়ে থাকল চুপচাপ।

সে ভাবছিল তার বাবার নাম বললে দিদিরা অত হাসে কেন। 'শ্রী' বললে কী হয়? তার বাবাই তো তাকে শিখিয়েছে যে গুরুজনদের নাম বললেই 'শ্রী' বলতে হয়। তবে কী ভুল হয় তার? কেন তা শুনে সকলে হাসে? হরেন কিছু বুঝতে পারে না। তাহলেও তার মনে হয় একটা ভুল যেন হয়ে যায় কোথাও, তাই সকলে হাসে। হরেনের কচি বুকে রহস্যের একটা পুরু জাল যেন আপনাআপনি ছড়িয়ে যায়। শীতের কনকনে বিকেলে অনেকক্ষণ থমথমে মুখে সে দাঁড়িয়ে থাকে বারান্দায় একা-একা।

আজ আর একটু পরে, দশটা-সাড়ে দশটায়, মৌ, পিঙ্কি আর বুলবুলি আবার আসবে। পুপু আর কোয়েলিকে নিয়ে ওরা যাবে চিড়িয়াখানায় দুপুর কাটাতে। হরেনকেও নিয়ে যাবে সঙ্গে। শুনে কী খুশি হরেন! সে চিড়িয়াখানা কক্ষনো দেখেনি।

পুপু-কোয়েলির মা তাকে বারবার সাবধান করে দিলেন, "একা-একা এদিক-ওদিক যাবি না, সব সময় দিদিদের সঙ্গে থাকবি।" পুপু-কোয়েলিকেও সেই এক কথাই বললেন তিনি, "গল্পে মশগুল হয়ে হরেনের কথা ভুলে যেও না। সব সময় চোখে-চোখে রাখবে। পরের ছেলে। হারিয়ে-টারিয়ে গেলে খুব বিপদে পড়তে

হবে কিন্তু—"

কোয়েলি চোখ পাকিয়ে তার মাকে বলল, "যত আজেবাজে কথা তোমার ! হারাবে কেন ? হরেন বোকা নাকি ?"

পুপু হরেনকে তাড়া দিয়ে বলল, "এই, চান-টান করবি না ? ওরা এখুনি এসে পড়বে। আমরা কিন্তু এক মিনিটও দাঁড়াব না বলে দিলাম।"

হরেন তার গামছা টেনে নিয়ে ছুটে চান করতে গেল।

পুপু আর কোয়েলিও একেবারে তৈরি। বড় টিফিনক্যারিয়ার, জলের বোতল আর কয়েকটা গ্লাস আর প্লেট প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে সামনেই রেখে দিয়েছেন ওদের মা। এখন মৌ, বুলবুলি আর পিঙ্কি গাড়ি নিয়ে এলেই হয়, হরেনকে নিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়বে সঙ্গে সঙ্গে।

একটু পরে গাড়ির আওয়াজ শুনে পুপু আর কোয়েলি ছুটে এল বারান্দায়। এসে দেখল গাড়ি নয়, একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়েছে ওদের বাড়ির সামনে আর দিদা নামছেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো।

ওপরে এসে পুপু-কোয়েলির মাকে তিনি ধরা গলায় বললেন, "ওরে সর্বনাশ হয়েছে," তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে স্বর অনেক নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হরেন কোথায় ?"

কী হয়েছে বুঝতে না পেরে পুপু-কোয়েলির মা বিব্রত হয়ে বললেন, "হরেন চান করতে ঢুকেছে। কী হয়েছে মা ?"

পুপু আর কোয়েলিও এসে দাঁড়িয়েছে দিদার পাশে। ওদের দিকে তাকিয়ে তিনি আস্তে বললেন, "হরেনকে তোমরা এখন কেউ কিছু বোলো না। একটু আগে ওর বাবা মারা গেছে।"

পুপু-কোয়েলির মা ভাঙা-ভাঙা স্বরে বলে উঠলেন, "সে কী ! কী হয়েছিল ?"

"হয়নি কিছুই।" দিদা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না, পাশের চেয়ারটায় ধপ করে বসে পড়ে কয়েক মিনিট হাঁপালেন। পরে থেমে থেমে বললেন, "কাজে যাচ্ছিল বেচারি। রাস্তা পার হওয়ার সময় একটা লরি ধাক্কা মারল ওকে। ব্যাস্, সঙ্গে সঙ্গে শেষ !"

পুপু আর কোয়েলির বুকের ভেতর কী রকম করে উঠল। ওদের মা'র চোখও ছলছল করছে। কারুর মুখে কোনো কথা নেই।

একটু পরে দিদা আবার বললেন, "হরেনের মা হাঁ-হাঁ করে কাঁদতে-কাঁদতে ছুটে এসেছিল আমার কাছে। এসে বলল, আমার হরেনকে এখুনি এনে দাও—" একটু চুপ করলেন তিনি। শাড়ির আঁচলটা চোখে আলতোভাবে বুলিয়ে নিলেন, "আমি হরেনকে এখুনি নিয়ে যাব রে—"

"নিশ্চয়ই—" পুপু-কোয়েলির মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "ছেলেটার জন্যে বড় খারাপ লাগছে।"

হরেন চান সেরে বেরিয়ে এসে দিদাকে দেখে হি-হি করে হাসল, "ও দিদা, জানো আমি দিদিদের সঙ্গে আজ চিড়িয়াখানা যাব—"

দিদা হরেনকে কাছে ডাকলেন, তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে মিষ্টি করে বললেন, "শোন্ হরেন, তুই আজ আমার সঙ্গে বাড়ি যাবি। তোর বাবার যে খুব অসুখ—"

"হোক অসুখ," হরেন কান্না-কান্না মুখে বলল, "আমি তোমার সঙ্গে যাব না। আমি চিড়িয়াখানায় যাব—"

"হরেন, শোন্—"

হরেন ছুটে এল পুপু আর কোয়েলির কাছে। এসে কেঁদেই ফেলল, "ও পুপুদিদি, ও কোয়েলিদিদি, তোমরা দিদাকে বলো না—"

ব্যাপারটা বড় করুণ হয়ে পড়ছে দেখে পুপু আর কোয়েলির মা হরেনকে কাছে টেনে বললেন, "তুই যা হরেন দিদার সঙ্গে। তুই ঘুরে এলে তবে সকলে চিড়িয়াখানায় যাবে।"

তা-ও হরেন বোঝে না। বলে, "পুপুদিদি যে বলল, এক মিনিটও দাঁড়াবে না ?"

"দাঁড়াবে, দাঁড়াবে। তুই ফিরে না এলে কেউ যাবে না চিড়িয়াখানায়।"

পুপু আর কোয়েলির মা'র কথা যেন বিশ্বাস করল হরেন। শেষ অবধি রাজি হল দিদার সঙ্গে যেতে। ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিল। দিদা হরেনকে নিয়ে চলে গেলেন।

হরেন এ-বাড়িতে আবার ফিরে এল প্রায় মাস-দেড়েক পর। বাবার শ্রাদ্ধের সময় ন্যাড়া হয়েছিল, এখনও মাথায় ভাল করে চুল ওঠেনি। বেশ রোগা হয়ে গেছে হরেন। ছেলেটার কথা ভেবে পুপু কোয়েলি আর ওদের মা'র মন খুব খারাপ হয়ে ছিল, এতদিন পর ও ফিরে আসতে সকলেই খুশি হল।

হরেনের মন থেকে শোক একেবারে মুছে ফেলবার জন্যে পুপু আর কোয়েলি আজকাল তার সঙ্গে অনেক মজার-মজার গল্প করে, বন্ধুদের বাড়ি নিয়ে যায়। সেদিন ওকে নিয়ে ওরা চিড়িয়াখানায়ও গিয়েছিল। অত জন্তু-জানোয়ার দেখে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল হরেন। বাঘের দিকে তাকিয়ে ছিল চোখ বড় বড় করে, বাঁদরকে ভেংচি কেটেছিল। আর অনেক খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে এক-একটা জন্তু দেখিয়ে বারবার পুপু আর কোয়েলিকে জিজ্ঞেস করেছিল, "ও পুপুদিদি, এটা কী ? ও কোয়েলিদিদি, ওটা কী ?"

এ-বাড়িতে আবার ফিরে আসবার পর হরেনের মন থেকে শোকের আঘাতটা সত্যি বোধহয় আস্তে আস্তে মুছে গেল। সে ঠিক আগের মতোই ছুটে ছুটে দোকানে যায়, পুপু আর কোয়েলির মা'র পায়ে-পায়ে ঘুরে সংসারের অনেক টুকিটাকি কাজে না বললেও তাঁকে সাহায্য করে। আর মাঝে-মাঝে আপন মনে গানও গায়, "আমি শ্রীশ্রীভজহরি মান্না—"

ওর গান শুনে পুপু আর কোয়েলি হাততালি দিয়ে হেসে ওঠে। তখন লজ্জা পেয়ে থেমে যায় হরেন।

ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি হতে চলল, কিন্তু শীত আর যেতেই চায় না এ-বছর। সকালে তো রীতিমত ঠাণ্ডা থাকে। আজ সন্ধের আগে হঠাৎ ঝড়ের মতো হাওয়া বয়ে গেল, বৃষ্টিও নামল ঝমঝম করে।

পুপু আর কোয়েলি দুটো গল্পের বই নিয়ে মন দিয়ে পড়ছিল পড়বার ঘরে বসে। এমন সময় হরেন আস্তে আস্তে পুপুর টেবিলের পাশে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল।

একটু পরে বই থেকে মুখ তুলে হরেনকে দেখে পুপু হাসল। বলল, "কী রে হরেন ?"

"পুপুদিদি—" কিছু যেন বলতে গিয়ে বলল না হরেন। পুপুর পড়ার টেবিলে আঙুল ঘষতে লাগল।

"এই হরেন, কী বলবি রে ? বল্ না ?"

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল হরেন, "পুপুদিদি, তোমরা আর আমার বাবার নাম জিজ্ঞেস করো না কেন ?" সে যেন এতদিন পরে নিজের ভুলটা বুঝতে পেরেছে এমন ভাব করে বলল, "আমি আর শ্রী বলব না—"

মনে মনে ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে পুপু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "কেন বলবি না ? নিশ্চয়ই বলবি। এই হরেন, তোর বাবার নাম কী রে ?"

হরেন করুণ চোখে তাকাল পুপুর মুখের দিকে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল। পরে খুব আস্তে উচ্চারণ করল, "আমার বাবার নাম ঈশ্বর রতিকান্ত নস্কর !"

ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটায় পুপুর বুকের ভেতর কনকন করে উঠল। হরেনের বাবার কথা ভেবে তারও চোখ দুটো এখন ভিজে উঠেছে।

ছবি জয়ন্ত ঘোষ

সুপারমেন

সমরেশ মজুমদার

ওপরে নীল আকাশ, সেখানে চতুর্দশীর চাঁদ। দু'তিনটে সাদা মেঘের নৌকোর শরীরে চাঁদটা সাঁটা, তাই তার আলো বেশ হালকা। অবশ্য তাতেই পাহাড়টাকে চিনতে কোনোরকম অসুবিধে হচ্ছে না। বেশ খাড়াই পাহাড়, যার খাঁজে খাঁজে অন্ধকার। পাহাড়টা এমন ন্যাড়া যে, সবুজ রঙটা ওর শরীর থেকে উধাও। পেটবরাবর একটা বিশাল পাথর বেরিয়ে এসেছে চাতালের আদলে, ঠিক ঝুল-বারান্দা। সেখানেই চাঁদ যেন টর্চের আলো ফেলে রেখেছে। পাহাড়ের নীচে কী আছে বোঝা যাচ্ছে না, কারণ সেটা চোখের আড়ালে।

ক্রমশ পাহাড়টা আরও বড় হয়ে গেল। এখন চোখের সামনে জুড়ে আছে ওই চাতালটা। পাহাড়ের অন্য অংশ আর দেখা যাচ্ছে না। চাতালটার বুকে ছড়ানো রয়েছে বড় বড় পাথর। তার একদিকে জ্যোৎস্নায় চকচকে, অন্যদিকে অন্ধকার। কোনো শব্দ নেই, কোনো প্রাণের অস্তিত্ব নেই। রাত বলেই হয়তো পাখিরাও দেখা দিচ্ছে না। হঠাৎ একটি পাথরের আড়ালের অন্ধকার নড়ে উঠল। তারপর সেখান থেকে সন্তর্পণে বেরিয়ে এল একটি লম্বা মানুষ। চাঁদের আলো তার চকচকে কালো পোশাকে জমে গেল। পা থেকে কাঁধ পর্যন্ত শরীর আঁকড়ে থাকা কালো পোশাক, শুধু কাঁধের পেছন থেকে আর একটা কালো কাপড় পেখমের মতো ছড়ানো। লোকটার মাথায় একটা কালো রবারের মতো কিছু যা তার চুল এবং ঘাড়কে চেপে রেখেছে। কিন্তু তার কপালের শুরু থেকে চিবুক পর্যন্ত উন্মুক্ত। ফলে বোঝা যাচ্ছে ওর মুখ বেশ মিষ্টি, বিশেষ করে হাসিটা। গায়ের রঙ যে অত্যন্ত গৌর, তা ওই মুখেই মালুম হয়। চোখ টানা-টানা, হাসির সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে গেছে। কিন্তু লোকটা যখন কয়েক পা হেঁটে উন্মুক্ত চাতালে এল, তখন বোঝা গেল এতক্ষণ ও সন্ত্রস্ত ছিল। এখনও হাবভাবে তার রেশ রয়েছে। যেন তার শত্রুর উপস্থিতি আশঙ্কা করছিল সে। কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে চাঁদের দিকে তাকাতেই লোকটার সুন্দর মুখ আরও সুন্দর হয়ে উঠল।

হঠাৎ দুটো হাত দুদিকে ছড়িয়ে লোকটা চিৎকার করে উঠল, "কোথায় সে ? আমি তাকে চাই। এই দুটো হাত দিয়ে তাকে ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলব। কোথায় সে ?"

শব্দগুলো পাহাড়ের শরীরে আছড়ে পড়তেই কয়েকগুণ হয়ে ফিরে এল। লোকটা তার প্রসারিত একটি হাত চাঁদের দিকে নিয়ে গেল। "তুমি ! কেন যে চিরটাকাল কৃষ্ণপক্ষ হয় না !"

তখনও চাঁদের কোনো পরিবর্তন হল না। শুধু মেঘের নৌকোগুলো যেন গায়ে গায়ে সরে এল। জ্যোৎস্নায় মাখামাখি চাতালটায় লোকটা অত্যন্ত ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে কয়েকবার পায়চারি করে নিয়ে আচম্বিতে এক-হাঁটু ভেঙে নিচু হল। তার দুটি মুষ্টিবদ্ধ হাত সামনে নিয়ে চিৎকার করে উঠতেই একটা বিশাল কালো পাখি উড়ে এল শূন্য থেকে। ডানায় শব্দ হতেই লোকটা হিংস্র চোখে তাকাল। আর ওই মুহূর্তে দেখা গেল, ওর সুন্দর মুখ দ্রুত বদলে যাচ্ছে। গৌরবর্ণ চামড়া, টানা হাসি-হাসি চোখের বদলে কয়েকটা শুকনো হাড়ে গড়া মুখ দেখা গেল, যার দুই চোখের বদলে অন্ধকার। লোকটার মুষ্টিবদ্ধ হাতের ওপর পাখি নরম পায়ে বসতেই ওর জাত জানা গেল। ওই কুৎসিত চেহারা একমাত্র শকুনেরাই অর্জন করেছে।

"কোথায় সে ? দেখেছিস ?"

ন্যাড়া মাথার পাখিটা শরীর দোলাল। না, সে দ্যাখেনি।

সঙ্গে-সঙ্গে তাকে আছড়ে ফেলল লোকটা শূন্যে। "অপদার্থ! যা, যেমন করেই হোক তার হদিস নিয়ে আয়। তাকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। দূর হ, দূর হ আমার সামনে থেকে।" ক্রীতদাসের মতো পাখিটা ডানায় সাঁতার কেটে অন্ধকার থেকে অন্ধকারে চলে গেল সন্ধানে।

লোকটা সেই যাওয়া দেখল। তার চোখের বদলে নরকের অন্ধকার। মুখের গহ্বরে জিহ্বার বদলে চিতার অগ্নিশিখা। অথচ যেই সে দুটো হাত তার দুই গালে আদরের ভঙ্গিতে বোলাল, অমনি সেই সুন্দর কন্দর্পকান্তি মুখ ফিরে এল। আবার সুন্দর করে হাসল লোকটা। তারপর পায়ে-পায়ে চলে এল চাতালের ধারে।

এইবার দেখা গেল নীচের খাদ কত গভীর। তাল-তাল অন্ধকার সেখানে স্তূপ করে রাখা। লোকটা সেদিকে তাকিয়ে আবার হাসল। তারপর চকিতে চাঁদের দিকে ঘুরে চিৎকার করে উঠল, "তোমরা শুধু সামনেটাই ধুয়ে দিতে পারো, কিন্তু পেছনটা? পেছনটা আমার অধিকারে। সেখানে তোমাদের কোনো কায়দা চলবে না। অতএব এই পৃথিবীর অর্ধেক আমার। কিন্তু আমি এবার পুরোটা চাই। সে কোথায়?" তারপর নিচু গলায়, যেন নিজেকেই শোনাল, "আমি যেমন তাকে খুঁজছি, সেও তো আমাকে। অতএব দেখা হবেই।" তারপর দুটো হাত শূন্যে বাড়িয়ে লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়ল চাতাল থেকে, ঠিক শকুনের মতো নীচে নেমে যেতে লাগল সে।

পাহাড়ের নীচেও কোনো গাছপালা নেই। ছোট-বড় প্রচুর পাথর ডিঙিয়ে হঠাৎই বালির রাজত্ব শুরু। দিগন্তে ছড়ানো শুধু বালি আর বালি, দু-একটা কাঁটাঝোপ আর মাঝে-মাঝে এমন ন্যাড়া পাহাড়। দূর বহুদূর থেকে বয়ে আসা বাতাস সেই বালি তুলে নিয়ে এলোপাথাড়ি ছুটে এসে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খায়, এবং ফিরে যায়। বালিতে শরীরের অর্ধেক গোঁজা একটা বিশাল পাথরের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল লোকটা। তার চোখ এবং কান সতর্ক। কিন্তু এর শরীরে হালকা নীল-রঙা পোশাক। পা-আঁটা প্যান্ট, কোমরে চামড়ার বন্ধনী, লম্বা-হাতা হালকা-নীল শার্টের প্রান্ত সেই বন্ধনীর নীচে। মাথায় কোনো আড়াল নেই। মানুষটির গায়ের রঙ শ্যামলা, চোখমুখ সাধারণ মানুষের মতো। শুধু তার শরীর ছিপছিপে, এবং চোয়ালের গঠনে বোঝা যায়, ওর চরিত্রে দৃঢ়তা আছে। কাঁধের পেছন থেকে ঝালরের মতো একটা কাপড় তারও।

লোকটি সতর্ক চোখে বাতাসের যাওয়া-আসা দেখল। জ্যোৎস্নায় সন্দেহজনক কিছু নেই। ঠিক এইসময় সে বাতাসে সামান্য শব্দ পেতেই পাথরের আড়ালে সরে এল। জ্যোৎস্নায় ছায়া ফেলে শকুনটা একটা পাক দিল। তার নাক ঘ্রাণ পাচ্ছে, অথচ চোখে কিছু ঠেকছে না। ক্রমশ পাকগুলো ছোট হয়ে এল। লক্ষ্যবস্তুর সন্ধানে তার কুৎসিত মাথাটা চারপাশে নড়ছে।

শেষপর্যন্ত নিঃশব্দে শকুনটা এসে সেই পাথরের ওপর বসল, যার পেছনে নীলবসন মানুষটি লুকিয়ে রয়েছে। শকুনের ভঙ্গিতে বেশ ঘাপটিমারা ভাব, যেন দর্শন পাওয়ামাত্র সে উড়ে যাবে খবর দিতে। লোকটি নিশ্বাস বন্ধ করে পাখিটাকে দেখছিল। একটা সাধারণ পাখি এরকম সন্দেহজনক আচরণ করবে কেন? সে তার কোমরবন্ধনী খুলে আচমকা আঘাত করতেই শকুন তীব্র চিৎকার করে উড়ে যেতে চাইল, কিন্তু পরিবর্তে পাথরের ওপর থেকে বালিতে গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু সে প্রাণহীন হয়নি, কারণ তার চোখ হিংস্র, এবং সে দুই পায়ের আঁচড়ে বালির ঝড় তোলার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তার ডানা অসাড় হয়ে যাওয়ায় সে স্থির হয়ে চেয়ে রইল একসময়। লোকটি ঝুঁকে দেখল শকুনের শরীর থেকে যে ধারা বের হচ্ছে, তার রঙ কালো।

নীলবসনের চোয়াল আরও শক্ত হল। কিন্তু সে শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল, "তুমি মরতে চাও?"

সঙ্গে-সঙ্গে শকুনের মাথাটা যেন কুঁকড়ে উঠল, দৃষ্টিতে বোঝা গেল প্রাণ বড় আদরের।

নীলবসন হাসল, "রক্ত যার কালো, তার বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। কিন্তু তবু তোমাকে আমি সুযোগ দিচ্ছি। সে কোথায়?"

শকুনের বাকশক্তি নেই। সে অসহায়ভাবে ডানা ঝাপটাতে লাগল। যার অর্থ, সে শক্তিহীন। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য তার নেই। নীলবসন দেখল ওই দুরবস্থাতেও শকুনের চোখে হিংস্র হাসি। সে তার চামড়ায় মোড়া পা তুলল শকুনটাকে হত্যা করার জন্যে, কিন্তু তারপরেই মত পরিরর্তন করল। একটি আহত প্রাণীকে হত্যা করার মধ্যে কোনো বীরত্ব নেই।

তখন চাঁদ ঠিক মাথার ওপরে। মেঘের নৌকোগুলো উধাও। চারধারে তকতকে জ্যোৎস্না। নীলবসন সামান্য লাফানোর ভঙ্গি করতেই তার দেহ ওপরে উঠে যেতে লাগল। অনেক ওপরে উঠে সে চাতালটাকে দেখতে পেল। শূন্য চাতালে কয়েকটা ছোট-বড় পাথর ছড়ানো। সেখানে চাঁদ-সাদা রঙ। নীলবসন সেই চাতালে নেমে এল। সতর্ক চোখে সে চারপাশ দেখে নিয়ে চাঁদের মুখোমুখি হল। "আমি বাতাসে তার ঘ্রাণ পাচ্ছি। তার প্রতিনিধিকে খানিক আগে দেখে এসেছি। এই নিস্তব্ধ চরাচরে তোমার দৃষ্টির আড়ালে কেউ যেতে পারে না। সুতরাং তুমিই বলতে পারো সে কোথায়!"

তখনও চাঁদের কোনো পরিবর্তন হল না। নীলবসন আক্ষেপে তার ডান হাত তুলতেই চাতালে ছায়া পড়ল। চকিতে ঘুরে দাঁড়াল সে। এই বিশাল চাতালে তার নিজের দীর্ঘ ছায়া লুটিয়ে আছে। দু'পা সরতেই ছায়াটাও সরে এল। তার মানে চাঁদ সর্বত্রগামী নয়। সে পাথরগুলোর দিকে তাকাল। ওদের পেছনে জ্যোৎস্না যাচ্ছে না। অতএব ওই আড়ালে কেউ লুকিয়ে থাকলে চাঁদের চোখে পড়বে না। পৃথিবীর অর্ধেকটা আলোকিত, অর্ধেক অন্ধকার। নীলবসন নিজের কোমরে হাত দিয়েই চমকে উঠল। তার কোমরবন্ধনী? তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল, পাখিটাকে আহত করে ওটাকে সে পাথরের ওপরেই ফেলে এসেছে।

আর দেরি করল না নীলবসন। চাতালের প্রান্তে গিয়ে সে দুটো হাত সামনে প্রসারিত করে শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়তেই তার শরীর পাখির মতো নীচে নেমে যেতে লাগল। ধুধু বালির ওপর দাঁড়িয়ে সে মুখ তুলতেই কৃষ্ণবসনকে দেখতে পেল। বালির প্রান্তে পাহাড়ের তলায় কৃষ্ণবসন, তার অন্ধকারের চোখ জ্বলছে। মুখে কয়েকটা হাড়ের বাঁধন। কৃষ্ণবসনের ডান হাতে আহত শকুন আর বাঁ হাতে ফেলে-আসা কোমরবন্ধনী। চোখাচোখি হতেই প্রচণ্ড গর্জন করে কৃষ্ণবসন শকুনটাকে ছুঁড়ে দিল নীলবসনের দিকে।

আচমকা চোখের সামনে সমুদ্রের ঢেউ উঠে এল। ঢেউয়ের ওপর একটি শীতল পানীয় বোতলে ভাসছে। পৃথিবীর সবরকম কানফাটানো সঙ্গীত বেজে যাচ্ছে দৃশ্যটির সঙ্গে। এতক্ষণ দু'হাতে আঁকড়ে থাকা রবারের বড় বলটা আচম্বিতে ছুঁড়ে দিল কালোশার্ট নীলশার্টের দিকে। টিভির পর্দায় দৃশ্যান্তর হওয়ামাত্র নীলশার্ট সতর্ক ছিল, কিন্তু বলের গতি এত দ্রুত যে, সে মাথা সরাতে পারল না। কপালের ওপরে সেটা স্পর্শ করেই ওপরে উঠে গেল। সুন্দর সাজানো ঘরের মাঝখানের ছাদ থেকে পুরনো দিনের ঝাড়লণ্ঠনের আদলে বিজলি বাতি ঝুলছিল। বলটা সেই কাঁচের ভিড়ে আঘাত করতেই ঝনঝন শব্দ বাজল। কোনোরকম ভাঙচুর না করে বলটা ফিরে আসতেই কালোশার্ট সেটাকে লুফে নিয়ে একটু লাফিয়ে দুটো পা ফাঁক করে চিৎকার করল, "আমি হি-ম্যান। আমি তোমাকে হত্যা করব।"

নীলশার্ট কপালে হাত ঝুলিয়ে বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ল, "কী করে! তোমার গায়ে কালো শার্ট। ওটা ব্যাড ম্যানেরা পরে থাকে।"

কালো শার্ট চকিতে নিজের জামা দেখে নিয়ে বলল, "ঠিক আছে, এসো, জামা দুটো পাল্টাপাল্টি করে নিই।"

"অসম্ভব।" নীলশার্ট এক পা এগিয়ে এল, "আমি হি-ম্যান, আমি তোমাকে হত্যা করব।" তারপর চকিতে টিভি'র দিকে ফিরে সেইরকম গলায় চিৎকার করল, "তোমার দৃষ্টির আড়ালে কেউ যেতে পারে না। অতএব তুমিই বলতে পারো সে কোথায়!"

সঙ্গে-সঙ্গে কালোশার্ট চিৎকার করে উঠল, "কোথায় সে? আমি তাকে চাই। এই দুটো হাত দিয়ে তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলব। কোথায় সে?"

সামনের পর্দায় তখন একটা অক্টোপাশ তার সবকটা শুঁড় দিয়ে পানীয়ের বোতলটা আঁকড়ে টেনে এনেছে মুখের কাছে। তারপর সমুদ্রের ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে সেই রঙিন পানীয় ঢেলে দিল গলায়। সঙ্গে সঙ্গে অজস্র বাজনার সঙ্গে একটি অদৃশ্য কণ্ঠ বলে উঠল, "জল, সর্বত্র জল, শুধু আমাদেরটাই পানীয়।"

দুই দর্শকের মুখ বিকৃত হল। ওরা জানে এখন মিনিট কয়েক এইসব বিজ্ঞাপন চলবে। নীলশার্ট প্রচণ্ড গতিতে ছুটে এল কালোশার্টের দিকে। তারপর ঢিসুম করে একটি ঘুসি চালাতেই কালোশার্ট উল্টে পড়ল সোফায়। বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে নীলশার্ট বলল, "কোথায় সে? আমি তাকে হত্যা করব।"

কালোশার্টের খুব কষ্ট হচ্ছিল। তার চোখে জল বেরিয়ে এলেও সে বলল, "তুমি একটা গাধা! একটা প্যাঁচা! একটা ব্যাঙ!"

নীলশার্ট ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"তোমার গায়ে নীলশার্ট। তুমি আগে মার খাবে। দমাদম মার। খেতে খেতে শেষপর্যন্ত বেল্টটা ছিনিয়ে নিয়ে আমাকে মারতে পারবে। আজ আমি খতম হব। কিন্তু প্রথমে আমি মারব। সেটাই রুল।" বলতে-বলতে উঠে দাঁড়াল কালোশার্ট।

নীলশার্টের মনে পড়েছে। অতএব সে মার খেতে লাগল। নীলশার্ট পালাতে লাগল। ঘরের এ-কোণ থেকে ওই কোণে। বাইরের দরজায় তালা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। নীলশার্ট পাশের ঘরে ঢুকল আত্মরক্ষার জন্যে। সঙ্গে-সঙ্গে খাটের ওপর লাফিয়ে উঠল কালোশার্ট। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল নীলের ওপর। দুটো শরীর ধড়াম করে আছড়ে পড়ল মেঝেতে।

নীলশার্ট ককিয়ে উঠল। তার কোমরে প্রচণ্ড যন্ত্রণা সত্ত্বেও সে মুখে কিছু বলল না। এই অবস্থায় নীলবসন কখনও কাঁদেনি। তাকে অন্তত পাঁচ মিনিট নির্মমভাবে মারবে ওই কৃষ্ণবসন। তারপর তার পালা। যে মার সে খেয়েছে, তার ডাবল মারতে পারবে। কিন্তু প্রথম পাঁচটা মিনিট যে সহ্য করা মুশকিল। কালোশার্ট তখন টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে। সেখান থেকে সে ঝাঁপ দেবে নীলশার্টের ওপর, যেমন করে কৃষ্ণবসন পাহাড়ের ওপর থেকে শাঁ করে নেমে আসে। নীলশার্ট উঠে বসার চেষ্টা করল। কিন্তু ঠিক তখনই তার ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কালোশার্ট চিৎকার করে উঠল, "এই পৃথিবীর পুরো দখল চাই আমি। আকাশ থেকে চন্দ্রসূর্য মুছে যাক।" তারপর ঢিসুম করে আর একটা ঘুসি।

সেই বালকহাতের ঘুসিতে তেমন জোর ছিল না। কিন্তু নীলশার্টের মনে হল আজ কালোশার্ট তাকে খুব বেশি মারছে। সে কোনোরকমে উঠে জানলার কাছে ছুটে গেল। তারপর পাল্লা খুলে উঠে বসে চেঁচাল, "পাঁচ মিনিট হয়ে গিয়েছে।"

কালোশার্টের হাতে তখন একটা চামড়ার বেল্ট। সে মাথা নাড়ল, "না, তিন মিনিট, এখনও দু' মিনিট বাকি।" এই বলে সে চামড়ার বেল্টটা শূন্যে নাড়াতে লাগল, যেমন করে ক্রুদ্ধ সাপ লেজ নাড়ে।

নীলশার্ট আর পারল না। সে ভয়ে লাফিয়ে পড়ল বাইরের বাগানে। তারপর আত্মরক্ষা করতে ছুটে গেল বাগানের কোণে। সেখানে জঞ্জাল ফেলার খালি ড্রাম পড়ে আছে। আজ বাড়ি থেকে বের হবার আগে মা বাবা ওটা খালি করিয়ে গেছেন। নীলশার্ট টুক করে সেই ড্রামের মধ্যে ঢুকে বসে রইল উবু হয়ে। এইসময় কালো শার্ট বেরিয়ে এল জানলায়। তারপর চিৎকার করল, "কোথায় সে?" তার হাতের বেল্ট বাতাসে আস্ফালিত হচ্ছিল। সে আরও দু'বার চিৎকার করল। কিন্তু তার গলার স্বর ক্রমশ নরম হয়ে আসছিল। নীলশার্টকে সে কোথাও দেখতে পাচ্ছিল না। তার হিসেবমতন পাঁচ মিনিট হয়ে গিয়েছে। এবার তার মার খাওয়ার পালা। কী নির্মম সেই মার। প্রতিদিন বাবা-মা কাছাকাছি থাকায় সেই নির্মম প্রহারের সময় তাঁরা ছুটে এসে রক্ষা করেন। নীলশার্টকে শাস্তির ভয় দেখান। তাই নীলশার্ট এখন জামা বদল করতে চায়। প্রথম মারটা সে মারতে চায়। কিন্তু কালোশার্ট কিছুতেই রাজি হয়নি এতকাল। আজ বাড়িতে বাবা মা নেই, আজ তাকে কে বাঁচাবে। টিভিতে নীলবসন যখন পাল্টা মার মারে, কালোশার্ট সে-দৃশ্য কল্পনা করে শিউরে উঠল।

চট করে জানলা বন্ধ করে সে আশ্বস্ত হল। এখন সে ঘরের ভেতরে, বাইরে নীলশার্ট। দরজায় তালা। এখন তার মার খাওয়ার সময়, কিন্তু নীলশার্ট তো ভেতরে ঢুকতেই পারবে না। সে খুশি হল। তারপরেই খেয়াল হল এই বাড়িটায় এখন সে একা। সে চিৎকার করল, "এই পৃথিবীটা এখন আমার। অর্ধেকটা নয়। পুরোটা।"

এইসময় ঢিসুম শব্দটা কানে ছিটকে আসতেই কালোশার্ট টিভির ঘরে ছুটে এল। সেখানে চাঁদের আলোর নীচে কৃষ্ণবসনকে দু'হাতে তুলে নীলবসন আছাড় মারল। "পৃথিবীটা তোর? খুব লোভ? তোর ওই কালো মনটাকে আমি খতম করবই।" তারপর দড়াম করে ছুঁড়ে দিল মহাশূন্যে। কৃষ্ণবসনের শরীর ভাসতে-ভাসতে পৃথিবীর বাইরে চলে যেতে নীলবসন দর্শকের দিকে তাকিয়ে হাসল, "পৃথিবীর কালো দূর হোক।"

সেই হাসির দিকে তাকিয়ে কালোশার্ট শিউরে উঠল। চটপট নিজের জামা খুলে ফেলতে বেশ আরাম মনে হল। তারপরেই খেয়াল হল, নীলশার্ট তো বদলা নিতে এল না। ঘরে ঢুকতে না পারলেও তার চিৎকার শোনা যেত! কী হল তার?

কালো শার্টটাকে সোফার নীচে চালান করে খালি গায়ে সে জানলা খুলে বাগানে বেরিয়ে এল। পাখির ডাক ছাড়া কোনো শব্দ নেই। সমস্ত বাগান খুঁজে সে ড্রামটার কাছে এল। তারপর সন্তর্পণে ভেতরে উঁকি মেরে ডাকল, "বাপি!"

কোনোরকমে মুখটা ওপরে উঠল, "আমাকে আর মারিস না। আমি শার্ট খুলে ফেলেছি।"

ঊর্ধ্বাঙ্গ বিবস্ত্র, বালক কাঁপতে কাঁপতে উঠে দেখল কালোশার্ট নেই। তার যমজভ্রাতা জিজ্ঞেস করল, "তুই আমাকে মারবি না? পাঁচ মিনিট হয়ে গিয়েছে।"

"কী করে মারব? তোর গায়ে তো কালোশার্ট নেই।"

জানলা গলে ওরা আবার ফিরে এল ঘরে। একজন খুব কাহিল, অন্যজন নার্ভাস। টিভির সামনে বসতেই দেখল ঝড় উঠেছে। শোঁশোঁ করে বালির ঝড় উঠছে। আকাশ অন্ধকার। চাঁদের দেখা নেই। সেই শীর্ণ আলোয় দেখা গেল একটা শকুন আবার আকাশে ডানা মেলল।

আর তখনই একজনের চোখে পড়ল সোফার নীচে ঢুকিয়ে রাখা কালোশার্টের একটা প্রান্ত বাইরে বেরিয়ে এসেছে। সন্তর্পণে সঙ্গীকে লুকিয়ে সে গোড়ালি দিয়ে কালো শার্টটাকে আরও ভেতরে ঠেলে দিল। যাতে না দেখা যায়। তারপর ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোর কষ্ট হচ্ছে?"

ছবি প্রণবেশ মাইতি

উৎসবের আমেজে আনে স্বাতন্ত্র্যের রং...

বর্ণে বাহারে লোভন শোভন

রঙ্গীন টি ভি

অস্কার রঙ্গীন টিভি–

আকাশছোঁয়া মূল্য প্রতিযোগিতার যুগে এক বিরল ব্যতিক্রম। দাম কম অথচ ছবির গুণপনায়, রং ও শব্দের উৎকর্ষতায়, সামগ্রিক চেহারায়—সব দিক দিয়েই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আর এই স্বাতন্ত্র্য আপনার জীবনযাত্রার চাওয়া-পাওয়ার সাথে পুরোপুরি মানানসই। 'তোশিবা' যন্ত্রাংশের উপর নির্ভরশীল, 'অস্কার' প্রথম সারির জাপানী কারিগরীর হুবহু রূপান্তর।

- কম্পিউটার প্রণীত সংহত সার্কিট।
- ১৮% বেশী উজ্জ্বলতর ছবি যা পিকচার টিউবে বিশেষ হেলিওক্রোম ফসফরের অবদান।
- ত্রুটিহীন ইলেকট্রনিক টিউনিং।

মডেল শিবা ৫১১ ডিলাক্স

- ৪" উফার ও ২" টুইটার যুক্ত দ্বিমুখী স্পীকার যা অত্যাধুনিক বিশেষ শব্দ কারিগরীর নিদর্শন।
- ভোল্টেজ (সর্বনিম্ন ৯০ ভোল্ট থেকে সর্বোচ্চ ২৭০ ভোল্ট) ওঠানামা রোধে বিস্ময়কর মাত্রার ক্ষমতা।
- অনেক কম বিদ্যুৎ খরচায় সম্পূর্ণ নির্ভরতা।
- সর্বশেষে সুদক্ষ বিক্রয়োত্তর সেবা।

অবশ্য কেনার আগে নিজেই পরীক্ষা করে দেখে নিন অস্কার টিভি তার দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালনে কতদূর আত্মপ্রত্যয়ী। সর্বশেষে অস্কারই হবে আপনার সিদ্ধান্ত।

অস্কার আপনার যা চাই, সেই রঙ্গীন উৎকর্ষতার প্রতীক

STUAD/OT/4/84

কে শিকার আর কে শিকারি

শিবশঙ্কর মিত্র

কিশোর যে কখন যুবক হয়ে ওঠে, বোঝা দায়। এই উত্তরণ তো দিনক্ষণ দেখে বা বয়স মেপে হয় না। অথচ এই সন্ধিক্ষণ আসবেই, এবং আসবে জলোচ্ছ্বাসের মতো উত্তাল হয়ে। গোসাবার নাম-করা বনোয়ালি বেদে বাউলে। আর সবুর হল পাশের গ্রাম সাতজেলিয়ার ছেলে। বাউলের সে এক অতি প্রিয় নতুন যুবক। বাউলে যেমন সুন্দরবন নিয়ে মত্ত হয়ে থাকে, সবুরকেও তেমনি সুন্দরবন-পাগলা করে তুলতে চায়। ডেকে বলে, "কী রে সবুর, নবমীর মাংস খেতে চাস্ না?"

গোসাবায় অন্যবারের মতো এবারও ধুমধাম করে দুর্গোৎসব চলেছে। আজ সপ্তমী। সন্ধ্যায় আজ জলসা। মৌজার লোকেরাই সবাই মিলে এই জলসার আয়োজন করেছে। বাউলে তার প্রধান উদ্যোক্তা, আর সঙ্গে আছে সবুর ও তার দিদি মাধুরী। কাজেই সপ্তমীর দিন মাঝ-রাত অবধি ওদের নড়চড় করার অবকাশ নেই। অষ্টমীর দিন যাত্রা। যাত্রা হলে তো সবুর পাগল, সারা রাত জেগে যাত্রা শুনবে। ফলে বাউলে নবমীর মাংস খাবার লোভ দেখাল।

মাংসটা ছুতো মাত্র। আসলে, সবুর এখন যুবক হয়ে উঠেছে তো, তাই তাকে সুন্দরবনের ব্যাপারে সড়গড় করে তুলতে চায় বাউলে। বাদার যুবক সুন্দরবনের সঙ্গে লড়াই করবে না, সুন্দরবনের আকর্ষণে উন্মত্ত হয়ে উঠবে না, তাও হয় নাকি?

বাউলে বলে, "বুঝলি সবুর, ভোরের সুজনে বাদায় যাব, আবার দুপুরের সুজনে ফিরে আসতেই হবে। তা না হলে নবমীর মাংস খাবি কী করে? ভাটি ও জো'র টান ঠিকমতো পড়েছে। এমন সুযোগে ভাল যোগাযোগ না হয়ে যায় না।" আরও জানাল, "ভোররাত্রিতে আমার বন্দুকটা এনে ঠিকঠাক করে রাখব। তুই ঠিকই আসবি কিন্তু।"

দুজনে মিলে ছোট্ট একখানা ডিঙি করে এসে গেছে নবমীর ভোর সকালে পিরখালির বনে। বনের এই দ্বীপটি তেঁতুলবেড়ে খালের উত্তরে। কেউ কেউ এই চক্‌কে বলে 'বত্রিশ একর বন'। নাবি বন। নতুন ভেসে ওঠা দ্বীপে তৈরি হয়েছে এই বন।

গোটা সুন্দরবনটাই যেন দ্বীপময় এক আশ্চর্য জগৎ। নদীর মোহনায় বা তেমাথায়, বা চৌমাথায় পলি পড়ে পড়ে প্রথমে ছোট একটা দ্বীপ দেখা দেয়। গঙ্গার ভূমি-গঠন-ক্ষমতা অপরিসীম। সারা পৃথিবীতে এমন পলি-বহনকারী নদী দুর্লভ। হিমালয়ের বা হিমালয়ের পাদদেশের পলিকণা বহন করে উজাড় করে ঢেলে দেয় অববাহিকা অঞ্চলে। যেন মাতৃস্নেহে প্রলেপের পর প্রলেপ দিয়ে পলিমাটির দ্বীপ সৃষ্টি করে চলেছে আবহমান কাল ধরে। দ্বীপ দেখা দিতেই আসে পাখির দল, তারপর আসে গাছপালা। গাছপালা বলিষ্ঠ হতে না হতে আসে সুন্দরবনের হিংস্র-অহিংস প্রাণীরা। আসে বানর, আসে হরিণ, আসে সাপ, আসে শুয়োর, আসে বাঘ। আর সর্বশেষে আসে মানুষ, নানা সুযোগের সন্ধানে। এমনিভাবেই চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই সমস্ত হিংস্রতা ও মমতা নিয়েই এক-একটা দ্বীপ সুন্দরবনের সঙ্গে সংযোজিত হয়।

এই 'বত্রিশ একর বন'-এই আজ এসেছে বেদে বাউলে। পরনে

তার ধুতি, গোটো করে পরা, গায়ে ফতুয়া, গলায় মোটা রুদ্রাক্ষের মালা, মুখে হালকা কালো দাড়ি, বাব্‌রি চুল, দীর্ঘ কপালে, বাহুতে ও বুকে রক্ত-রাঙা চন্দনের বড় বড় তিলক, আর হাতে তার বন্দুক। সঙ্গে একমাত্র সহচর সবুর। পরনে তার হাফ্-প্যান্ট, গায়ে কামিজ আর চোখে সুন্দরবনকে চিনবার উদগ্র বাসনা।

খবর এসেছিল, এই বনে কদিন হল অনেক হরিণের পাল দেখা গেছে। কাজেই নবমীর মাংসের জন্য বাউলের স্থান বেছে নিতে দেরি হয়নি। ওদের ডিঙি বড়নদী থেকে পাশ-খালে ঢোকে। বড় নদীর মুখেই মাল উঠবে না। তাহলে অনেকে দূর থেকেই ওদের ডিঙি দেখে ফেলবে। খালের তিন-চারটি ছোট ছোট বাঁক পেরিয়ে ডিঙি পোঁতে। ভাল করেই পোঁতে, যাতে জোয়ার এলে ভাসিয়ে না নিয়ে যায়। মালের গাছের গুঁড়িতে এদেশের লোক কখনও কাছি বাঁধে না।

সব ঠিকঠাক করে পাশ-খাল থেকে একটু দূরে একটা কেওড়া গাছে বসে ওরা। বাউলে বেশ একটু উঁচুতে এক তে-ডালায় সবুরকে বসিয়ে দিয়েছে। বলে, "তোর তো আর গামছা দিয়ে ডালের সঙ্গে নিজেকে বাঁধতে হবে না ; তুই যা চালাক আর সাহসী, বলার নয়! আমি থাকতে তোর শঙ্কা পাবার কিছু নেই! না রে!"

কিশোর-মনকে পিছনে ফেলে এসেছে সবুর। উত্তরে সে ফিস্‌ফিস্ করে বলে, "বাঃ, তে-ডালায় বসে বসে কী সুন্দর দেখতে পাব সব ঝোপঝাড়।"

বসতে-না-বসতেই বাউলে হরিণের নকল ডাক ডাকতে থাকে। মেয়ে-হরিণের ডাক দেয় ; এতে মদ্দা শিঙেলই প্রলুব্ধ হয়। ডাকটা একই প্রায়, তবে মেয়ে-হরিণের ডাকে মোলায়েম ভাব থাকে। নবমীর মাংসের জন্য এসেছে, বহুলোক আপ্যায়ন করতে হবে। মেয়ে-হরিণ মারতেও জাত-শিকারিদের মনে বাধা আছে। একটা বড় শিঙেলের মতো শিঙেল চাই।

সময় কেটে যায়। বাউলে ভাবে, তাহলে কী হল! বেলাও গড়িয়ে গেছে অনেক। কার্তিকের শেষ। সকালের হিমেল ঝিরঝিরে বাতাস আছে ঠিকই, তবে সূর্যও উপরে উঠেছে অনেকখানি তীব্রতা নিয়ে। তা হলে? হরিণের অতি প্রিয় ধানিঘাসও আছে বেশ খানিকটা, খুব কাছেই, পাশখালির চরে। কেওড়া গাছটার যে-ডাল ভেঙে ভেঙে সে নীচে ফেলেছে বানরের নকল ঝগড়ার কিচির-মিচির শব্দে, তার পাতাগুলিও কচি ও লোভনীয়। তা হলে? হরিণের কোনো পাত্তা নেই কেন এখনও?

বাউলে কেমন যেন হতবাক হয়ে যায়।

এমন সময়ে সহসা এক চোটের আওয়াজ! খুবই কাছে। বিস্মিত হয়ে বাউলে ভাবে, কিসের এই বন্দুকের চোট। তবে কি শিকারির পেছনে শিকারি! আমাদেরই লক্ষ করে নয় তো? আগে ঠাহর করতে হবে কাকে লক্ষ করে? হঠাৎ আমাদের কিছুই করার নেই। শুধু আড়ালে চুপচাপ থাকা। তবে সবুরকে সাবধান করা দরকার।

আকারে ইঙ্গিতে দু-একটা অস্ফুট ফিস্‌ফিস শব্দে সবুরকে বলল, "যেখানে আছিস সেখানেই থাক্। ডালটা এমনি করে শক্ত করে ধরে রাখ্ ; একদম নড়াচড়া করবি না, খবরদার না!"

তখনও 'ব্যাঘ্র প্রকল্প' হয়নি। লোকে বনে আসে, দু-একটা হরিণ মারে। সুন্দরবনে বাঘ মারতে আসা বলা বাতুলতা। বন-কর অপিসের পেট্রোলবোট বা পিটেলবোট বন পাহারা দেয় বটে, কিন্তু চোরা শিকারিকে ধরে সদরে চালান দেওয়া তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। ধরতে পারলে বা ধরার মতো অবস্থা বাগাতে পারলে, কিছু পয়সা, না হয় কিছু মাংসের ভাগ নেওয়া, আর কিছু নকল শাসানি ও ধমকানির পালা। কাজ দেখানোর জন্য মাঝেমধ্যে দু-একজনকে সদরে চালান দিতে হয় অবশ্য।

বাউলের অজানিতে অনেক দূর থেকে, বড়নদীর দূরের বাঁকের মুখ থেকেই পিটেলবোটের বাবু ওদের ডিঙিকে পাশখালিতে ঢুকতে দেখে। পাশখালিকে নজরে রেখে রেখে পিটেলবোট শেষ পর্যন্ত পাশখালির মুখে হাজির। আসতে বেশ সময় লাগে। এখনকার মতো সুন্দরবনে ভট্‌ভটি বা লঞ্চের তখন আমদানি ছিল না। দাঁড় বেয়েই এক বাঁক জল ঠেলতে হয়েছে।

সাদা ধবধবে পিটেলবোট। সুন্দরবনের মানুষরা যেমন, তেমনি বাঘ-বাঘিনিও এদের ঠিক চিনে নেয়। তবে এদের পিছু নিতে হলে যে খুব সাবধান হতে হবে, বাঘেরা তাও জানে। বারবার দেখে বুঝে নিয়েছে, এই সাদা বোটে বন্দুকও থাকেই। আর বন্দুক ওরা এমন চেনে যে, বলার নয়। সামান্য কাকপাখিরও যেমন হাতের ঢিলকে চিনতে এতটুকু দেরি হয় না, তেমনি মৃত্যুযন্ত্রণাদায়ী বন্দুকের নলকে চিনতেও বাঘকে বেশি বুদ্ধি খাটাতে হয় না।

কাজেই, নদীর কূল ঘেঁষে ঝোপঝাড়ের আড়ালে-আড়ালে বাঘ অতি সাবধানে পিটেলবোটের পিছু নিয়েছে। বোটের বেশ পিছনে। মাঝে-মাঝে উঁকি মারে, আবার ঘাড়-পিঠ নিচু করে গুটিগুটি এগোয়। পাশখালের মুখে আসতেই বোট প্রায় থেমে গেছে। বাঘও এবার সচকিত।

পাশখালের মুখে পিটেলবাবু দোমনা। ভাবনা, শেষ পর্যন্ত এই সরু খাঁড়িতে বোট আটকে না পড়ে। বোটের গলুই খালের মধ্যে। বোধহয় ঘুরে বড় নদীতে পড়তে চায়। গলুই যেন ঘুরতে চায় না। বাবুর আদেশমতো বড় লগি নিয়ে ওদের এক যুবক খোঁচা মারতে গেছে।

সুন্দরবনের বাঘ চলতি নৌকোয় সহসা আক্রমণ করতে চায় না। বাঘের ধোঁকা লাগে, হয়তো গলুই থেমে গেছে। যুবকটিও লগির গোড়া কোমরজলে ফেলে খোঁচের চাড় দিয়েছে। সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত ; কারও হাত আজোড় নেই। বাঘও এমন সুযোগ হেলায় বা দ্বিধায় হারাতে চায় না। তীর থেকে যুবককে লক্ষ করে চকিতে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হয়তো ভেবেছিল, গলুইতে দু-পায়ে ভর দিতে পারবে। কিন্তু অঘটন ঘটে গেছে। লগির খোঁচাতে হয়তো গলুই একটু পাশ নিয়েছে। বাঘ গলুই ছাড়িয়ে নীচে জলে পড়তে চলেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের টাল সামলাতে তার থাবা যুবকের বাহুতে বিদ্ধ করেছে। হিংস্র ও উদ্যত বক্র নখ বাহুর পেশীতে সমূলে প্রোথিত। যুবকেরও টাল সামলানো দায়। লগির পেলায় কোনোমতে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরে যায়। কিন্তু বিদ্যুৎগতি লাফ আর বিশাল দেহের গুরুভার যাবে কোথায়! সোজা গিয়ে ওপাশে জলে পড়ল বাঘ, আর সেই সঙ্গে তার থাবার বক্র নখ যুবকের বাহুর পেশী ছিন্নভিন্ন করে ছিঁড়ে নিয়ে গেল।

বোটের লোক সব মারমার করে ততক্ষণে গলুইতে। পিটেলবাবুও টোটাভরা বন্দুক হাতে বোটের কামরা থেকে হন্তদন্ত হয়ে গলুইতে ছুটে এসেছেন।

সকলে দল বেঁধে বেরিয়ে আসার আগেই বাঘ জল-কাদামাটি অগ্রাহ্য করে আবার চটাং করে লাফ দিয়ে মালে উধাও। সুন্দরবনের বাঘের এ এক অদ্ভুত প্রকৃতি। একবার আক্রমণ বিফল হলে, তখন-তখন সে দ্বিতীয়বার আক্রমণ করে না।

দেখতে না-পেলেও বাঘ সরে পড়ার পথ লক্ষ করে বাবু গুলি চালান। কতকটা ভয়ে, কতকটা আসর সরগরম করার জন্য। যুবক ওদিকে গলুইতে এলিয়ে পড়েছে যন্ত্রণায়। তার বাহু থেকে সমানে রক্ত ঝরছে।

পিটেলবাবুর নির্দেশে ওদের বোট এবার ছুটল হেল্‌থ সেন্টারে। যদি যুবকটিকে প্রাণে বাঁচানো যায়। ছোট চাম্‌টার খাল ধরতে ওরা দ্রুত ধাবিত।

বাঘের আক্রমণ, হুঙ্কার, বোটের মানুষের হৈ-হল্লা, আর সর্বোপরি চোটের আওয়াজে সবুর যেন প্রাণ হাতে করে তে-ডালার দুটো ডাল নিঃসাড়ে সাপ্‌টে ধরে আছে। বাউলে ভাবে, নবমীর মাংস জোটাতে

এসে এ কী ফাঁদে পড়লাম !

এতক্ষণে সব চুপচাপ। যেন শান্ত এই বন। যে শান্ত বন দূর থেকে মানুষকে হাতছানি দিয়ে মোহগ্রস্ত করে। তবু বাউলে বিন্দুমাত্র নড়চড় করে না, উশখুশও করে না। কোনোভাবে কোনো প্রাণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা চলবে না এখন। হরিণ পাবার আর কোনো আশা নেই। বন যদি কোনো কারণে একবার তোলপাড় হয়, তবে সে-মুখো হবে না এই নিরীহ জীব। অন্তত সে-দিনের মতো তো নয়ই।

তবুও বাউলে অতি সাবধানীর মতো আরও অপেক্ষা করতে চায়। অপেক্ষা করতে হয় না। সামনের সামান্য ফাঁকা জায়গায় কাদা-জলে ভেজা মূর্তিমান। একেবারে চারহাতপায়ে ঘোড়ার মতো টান্‌টান্ দাঁড়িয়ে। এমন দাঁড়ানো বাঘকে দেখা সুন্দরবনে অতি দুর্লভ ব্যাপার। এ-জীব তো হঠাৎ-আক্রমণে চমক লাগাতেই অভ্যস্ত, শত্রুর সামান্যতম ইঙ্গিতে পিঠ ও মাথা নিচু করে পাতা ও আগাছার আড়ালে গুটি মেরে চলাই তো এ-জীবের রণকৌশল। তা না, এ তো ঘোড়ার মতো টান্‌টান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে! তাও আবার বন্দুকের আওতায়! একবার প্রবল ইচ্ছা হয়, ইঙ্গিতে সবুরকে এ-দৃশ্য দেখে নিতে বলে। না, তৎক্ষণাৎই তা থেকে নিরস্ত হয়। বাউলে বুঝি আর স্থির থাকতে পারে না। অতি সন্তর্পণে বন্দুকের নল ধীরে, অতি ধীরে, ইঞ্চি-ইঞ্চি করে যথাস্থানে এনেছে। কিন্তু এত সাবধানতায়ও শেষরক্ষা হয় না। বাঘের সঙ্গে বাউলের হঠাৎ চোখাচোখি।

আর চোখ ফেরাবার উপায় নেই। কট্‌মট্ করে আগুনের মতো দৃষ্টিতে সে-চোখের পরে চোখ রাখতেই হবে। একবার চোখ সরেছে কি রক্ষা নেই। মুহূর্তে প্রলয় কাণ্ড ঘটে যাবে।

হঠাৎ বাউলের টনক নড়ে। নলে তো 'বাক্‌শট', হরিণ মারতেই এতক্ষণ তৈরি ছিল। ফতুয়ার ডান পকেটে এল·জি·গুলি। বনে উঠলেই এল·জি·গুলি ও সঙ্গে নেবেই নেবে। বুলেট বাউলের পছন্দ নয়। ধীরে, অতি ধীরে, ডান হাতখানা সে পকেটে দিয়েছে। যতটা সম্ভব আড়ালে-আড়ালে। বন্দুকের নল আর চোখের চাহনি এতটুকু সরায়নি।

এল·জি·ছাড়া অন্য টোটাও পকেটে ছিল। একবার চোখে দেখে নিশ্চিত হতে চায়। 'যা থাকে বরাতে' ভেবে, ঘাড় না নামিয়ে, অপাঙ্গে দেখে নিয়েই গুলি ভরে ফেলেছে। পলকের সময় মাত্র। চেয়ে দেখে, বাঘ সেখানে নেই।

নেই. বাঘকে কোথাও সে দেখতে পায় না। সবুরকে ডেকে বলে,"মরদ ! আমরা গাছে বলেই ও ব্যাটা আক্রমণ করেনি। কিন্তু ও আছে, ধারেকাছেই আছে। ভাল করে নজর দে।"

তবুও ওরা কোনো চিহ্ন দেখতে পায় না। হঠাৎ বাউলে অনুমান করে, এ জাত বড় চতুর জাত···ও নিশ্চয় কোনো ফাঁকে আমাদের ডিঙি দেখে ফেলেছে। ফিস্‌ফিস্ করে বলে, "আরে মরদ ! ডিঙির দিকটা দ্যাখ!" বলেই সে নিজেও ধীর স্থির দৃষ্টিতে সেদিকে তাকায়। ভাবে, নিশ্চয় মতলব করেছে, গাছ থেকে নেমে যখন আমরা ডিঙিতে উঠতে যাব, তখনই কাজ সারবে!

তন্নতন্ন করে দেখতে দেখতে হঠাৎ নজরে আসে একটা ছোট কানের মতো। গরান গাছের গুঁড়ির ছাল নয় তো! না, আর দেখতে পায় না। চোখটা একটু মুছে নিয়েও দেখতে পায় না। কয়েক লহমা পরেই আবার গুঁড়িটার ওপাশে ডান দিকে যেন একটা কানের মতো। বাউলের আর অনুমান করতে হয় না। ব্যাটা! গুঁড়ির আড়ালে একবার এ-পাশে, আরেকবার ও-পাশে এক চোখে উঁকি মারছে। গোটা মুখটা কোনো দিকেই বের করছে না।

বাউলে বন্দুকের তাক্ সূক্ষ্মভাবে করে আছে। কিন্তু কিছুতেই মাথা বের করছে না। গুলি করলেও করা যায়। লাগলে হয়তো বাঘের মাথার তেল্‌সা পিচ্ছিল হাড়ে আঁচড় লেগে বেরিয়ে যাবে। কোনো পথ না পেয়ে বন্দুকের নিরিখ্ আরও তীক্ষ্ণ করে নিজের জিভ টাকরায় লাগিয়ে জোরে একটা 'ট' শব্দ করে। নিঝুম বনে সেই শব্দও প্রতিধ্বনিত হয়। কী ব্যাপার তা সঠিক বুঝবার জন্য বাঘ এবার পুরো মাথাটা হেলিয়ে দু'চোখ দিয়ে দেখতে গেছে। দেখতে আর হয় না—সঙ্গে সঙ্গে বেদে বাউলের বন্দুকে গুড়ুম আওয়াজ।

বাঘ লুটিয়ে পড়ে না। কাত হয়ে পড়েই আবার উঠে ঝোপঝাড় হুড়মুড় করে ভেঙে টলতে-টলতে সেই ফাঁকা চত্বরটার উপর টালমাটাল ভাবে আড়ালে চলে যায়।

বাউলে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলে, বেশ জোরেই বলে, "চল্ মরদ, এবার আমরা চলি, তুরন্ত নেমে চল্ ডিঙিতে। এখন ওর পেছনে আর নয়। পরে দেখা যাবে। চল্।"

জো' এসে গেছে। ডিঙি সুজনে ভাসিয়ে শ্রান্ত ও ক্লান্ত বাউলে আদরের সুরে বলে, "কী দেখলি, কী বুঝলি নতুন মরদ?"

উত্তরের অপেক্ষায় না-থেকে বেদে বাউলে বলে, "জানিস, ···আর দেখলিও তো, আমাদের বাদায় কে শিকার আর কে শিকারি তা বোঝাই দায়!"

ছবি অনুপ রায়

মজার বিজ্ঞান

অরূপরতন ভট্টাচার্য

লুচি ফোলে কেন ?

ফুলকো লুচি কথাটা খুবই চালু। লুচির লেচি ভাল করে বেলে গরম ঘিয়ে ঠিকমতো ছাড়লে তা ফুলে যায় কেন ?

লুচি ফুলে যাওয়ার কী কারণ থাকতে পারে ?

লুচি গরম ঘিয়ে ছাড়া হলে কী হয় ?

যেই লুচি গরম ঘিয়ে ছাড়া হয়, অমনি লুচির দুটো পিঠ আগে গরম ঘিয়ের ছোঁয়া পায়। কিন্তু ভেতরটা নয়। বাইরের দুটো তলে যে জল থাকে তা জলীয় বাষ্প হয়ে উবে যায়। ফলে দুটো তল তখন জলশূন্য। আর তেলে দুটো পিঠ ঢাকা। তাই দুটো বাইরের তলের অতি সূক্ষ্ম যে ছিদ্রপথে জলীয় বাষ্প বেরিয়ে আসতে পারত, তাও বন্ধ।

এখন লুচির ভেতরে যে জল থাকে, তার কী হবে ?
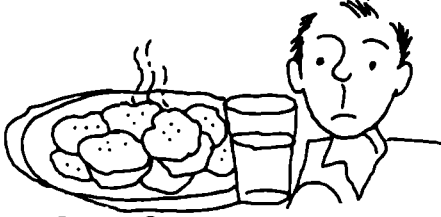
কড়ায় লুচি ছাড়ার কিছু পরে সেই জল গরম হয়, বাষ্প হয়। এখন জল থেকে যে বাষ্প হয়, জলের পরিমাণ থেকে তা অনেক বেশি। ফলে তা লুচির দুটো তলকে চাপ দেয়। সেইজন্যে লুচি ফুলে ওঠে। কিন্তু তা এত বেশি নয় যে, লুচির খোলকে ফুটো করে বাইরে বেরিয়ে আসবে। তাই ফুলকো লুচি আমরা খেতে পাই। লুচি খেতে বসে আঙুল দিয়ে সেই লুচি ভাঙবার সময়ে বেশ বোঝা যায়, ভেতরে গরম বাতাস রয়ে গেছে।

মরা মাছ কেন জলে ভেসে ওঠে

এমনিতে মাছ জলের তলায় থাকে। তখন তাকে দেখা যায় না। কিন্তু মরা মাছ কেন জলে ভেসে ওঠে ?

সাধারণভাবে মাছের শরীরে হাড় ও মাথার ঘিলু জলের থেকে ভারী। বাকি অংশ জলের থেকে হালকা। মাথা যার ভারী, তার তো জলে ডুবে যাওয়ার কথা। তাহলে সাধারণ অবস্থায় একটা জ্যান্ত মাছের জলের নীচেই থাকা উচিত।

দেখা গেছে, বিশেষ কয়েকটা মাছ ছাড়া প্রত্যেকটা মাছের শরীরে একটা বড় বায়ু-থলি বা পটকা থাকে। এই পটকাই তাকে ভাসতে সাহায্য করে। জলে যদি একটা বাতাস-ভর্তি ব্লাডারের মুখ বন্ধ করে ডুবিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়, তাহলে ব্লাডারটা কি জলে ডুবে যাবে না ভাসতে থাকবে ?

নিশ্চয়ই সে জলে ভাসবে।

ব্লাডারের বেলাতেও যে-রকম, মাছের বেলাতেও অনেকটা সেই রকম। পটকায় বাতাসের পরিমাণ যখন কম থাকে, তখনই মাছটি ডুবতে পারে। আর ভাসবার জন্যে বায়ু-থলিতে তারা খানিকটা বাতাস ভর্তি করে নেয়। পটকার ভিতরে বাতাসকে নিয়ন্ত্রণ করে মাছ তার দরকারমতো ভাসা ডোবা ঠিক করে নেয়।
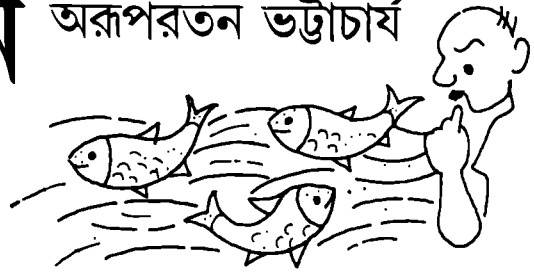
মরবার সময়ে মাছের বায়ু-থলি বা পটকা যদি বাতাস ভর্তি ব্লাডারের অবস্থায় থাকে, তাহলে মরা মাছ জলে ভাসবেই। কিন্তু বায়ু-থলিতে বাতাস যদি না থাকে ? তখন মাছ থাকবে জলের তলায়। এ সময়ে মাছ যদি মরে যায় তো কী হবে ? সে কি জলের তলাতেই থেকে যাবে ?

মাছের শরীরের বিভিন্ন জীবাণু বিক্রিয়ার ফলে অ্যামোনিয়া ও কার্বনডাই-অক্সাইড গ্যাস তৈরি করে। এই গ্যাসের জন্যে মাছ হালকা হয়ে যায়। সেইজন্যে মরা মাছও শেষ পর্যন্ত জলের তলা থেকে জলের উপরে ভেসে ওঠে।

শিশির কেন পড়ে ?

সকালবেলায় অনেক সময়ে দেখি মাঠ, ঘাস, সব শিশিরে ভেজা। মাঠের উপর দিয়ে হাঁটলে পায়ে জল লাগে, পা ভিজে যায়।

এই যে শিশির, এ-শিশির পড়ে কেমন করে ?

আমাদের নদী, হ্রদ, সমুদ্র থেকে অনবরত জলীয় বাষ্প সৃষ্টি হয়। এই জলীয় বাষ্প যায় কোথা ? তা উপরে উঠে বায়ুমণ্ডলের বাতাসের সঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু তার মিশবারও তো একটা সীমা আছে। বাতাস কতটা জলীয় বাষ্প ধরবে, তা নির্ভর করে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার উপরে।

ধরা যাক, বাতাস একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় আছে। এই উষ্ণতাতে বাতাস সবচেয়ে বেশি যে-পরিমাণ জলীয় বাষ্প ধরতে পারে, তার থেকে বেশি জলীয় বাষ্প ধরতে পারে উষ্ণতা বেড়ে গেলে। কিন্তু উষ্ণতা যদি কমে যায় ? তখন জলীয় বাষ্প ধরে রাখার ক্ষমতা নিশ্চয় কমে আসবে।

দিনের বেলায় সূর্যের তাপে মাটি হয়ে থাকে গরম। মাটির কাছে যা আছে, তা-ও। কিন্তু রাত্রি হলে মাটি আর মাটির উপরের সব কিছু তাপ বিকিরণ **(Radiation)** *করে চলে। ফলে ধীরে-ধীরে তারা ঠাণ্ডা হতে থাকে। চারপাশের বাতাসও শীতল হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত বাতাসের উষ্ণতা এত কমে যায় যে, বেশি উষ্ণতায় যতটা জলীয় বাষ্প সে ধরে রাখতে পারত, কম উষ্ণতায় আর তা পারে না। যে জলীয় বাষ্প আর ধরে রাখা যায় না, তার হয় কী ?*

এই অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প তখন ঘাস, গাছের পাতার মতো শীতল পদার্থের উপর ঘন হয়ে **(condensation)** *জলবিন্দুরূপে জমে।*

এই জমা জলবিন্দুকেই শিশির বলে।

আকাশ পরিষ্কার আর বাতাস স্থির থাকলে শিশির পড়ে ভাল।
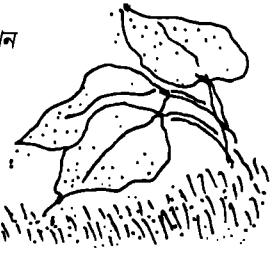
কী করে নম্বর বাড়ানো যায়

হেড এগজামিনার

কী করে যে নম্বর বাড়াতে হয়, তা তো তোমরা জানোই। প্রতিটি বিষয়ে যত্ন করে, নিখুঁতভাবে, তৈরি হতে হয়, প্রশ্নপত্র ভাল করে পড়ে নিতে হয়, তারপর যে-সব প্রশ্নের উত্তর সবচেয়ে ভাল জানো, সেইগুলিকে বেছে নিয়ে লিখতে হয় নির্ভুল উত্তর। বাস্, তাহলেই নম্বর বাড়ে। তাই না ? কিন্তু এমনও তো হয় যে, তোমারই একটু অন্যমনস্কতার জন্যে, কিংবা ঠিক কী লিখতে বলা হয়েছে তা ধরতে পারোনি বলে, কিংবা উত্তর লেখার টেকনিক বা কৌশল ঠিক জানা নেই বলে কিছু নম্বর হয়তো কাটা গেল। এই ধরো চার কি পাঁচ নম্বর। শুনে মনে হচ্ছে, মাত্র চার-পাঁচ। কিন্তু প্রতিটি পেপারে চার-পাঁচ করে কাটা গেলে সব মিলিয়ে বিস্তর নম্বর কাটা যায় যে। যাতে না যায়, তারই জন্যে মাধ্যমিক বোর্ডের তিনজন হেড এগজামিনারের সাহায্য চেয়েছিলুম আমরা। ইংরেজি, বাংলা আর অঙ্কের তিন হেড এগজামিনার তাই তোমাদের জানাচ্ছেন, কীভাবে উত্তর লিখলে নম্বর কাটা যাবার আশঙ্কা থাকবে না।

বাংলার হেড এগজামিনার জানাচ্ছেন

মাধ্যমিক বাংলায় ভাল ফল করা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। এই শারদ আনন্দমেলা তোমাদের হাতে গিয়ে পৌঁছবার পরেও যে মাস-পাঁচেক সময় থাকবে, তাকে ঠিকঠাক কাজে লাগালে ডিভিশন বদলে নেওয়া যায়।

ক ॥ পাঠ্য এবং উপপাঠ্য বই

মাধ্যমিক বাংলায় নম্বর ওঠে, বেশ ভাল নম্বরই জোটে, কারণ আজকাল বস্তুনিষ্ঠ প্রশ্নেই জোর পড়েছে। পরীক্ষকের মন-মতো হল কিনা সে-কথা উঠছে না, ঠিক উত্তর তো পুরো নম্বর। আর এই সব উত্তর বইয়েতেই আছে, বাইরের কোনো ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের উপরে তা নির্ভর করে না। কোন্ উক্তি কোন্ রচনায় আছে, সেটি প্রবন্ধ না গল্প না কবিতা, কে সেটি লিখেছেন, এ-সব তো এক-এক কথায় জবাব দেবার মতো। কোন্ কথা কে বলেছে, কাকে বলেছে, এসবও তাই ; কেন বা কী অবস্থায় বলেছে, কখন বলা হল, এ-কথার ফলে কী ঘটল, তার উত্তরে দু'চার কথা লিখতে হয়, কোথাও কিছু ব্যাখ্যা দিতে হয়, কিছু যুক্তি খুঁজতে হয়।

এভাবে যদি ভেবে দেখি তো জানব, বাংলা বই থেকে (পাঠসঙ্কলন এবং উপপাঠ্য) যে-সব প্রশ্ন আসে তার প্রধানত দুই ভাগ

১· বস্তুনিষ্ঠ।

২· বস্তুনিষ্ঠ+ব্যাখ্যামূলক।

অবশ্য আরও কিছু প্রশ্ন থাকে যা শুধুই ব্যাখ্যা বা আলোচনামূলক। তাহলে অপর ভাগ হল

৩· ব্যাখ্যা ও আলোচনামূলক।

১৯৮৩ সালের একটি প্রশ্ন দ্যাখো। ১ (ক) "এইরূপে মেজদার অত্যন্ত সতর্কতায় এবং সুশৃঙ্খলায় আমাদের এবং তাঁহার নিজের কাহারো এতটুকু সময় নষ্ট হইতে পাইত না।"—"আমাদের" কথাটিতে কাদের বোঝানো হয়েছে ? কে কোন্ ক্লাসে পড়ে ? মেজদার শিক্ষাগত মান কী ? তাঁর 'সতর্কতা ও সুশৃঙ্খলা'র সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ২+২+২+৬।

এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমাংশে কয়েকটি নাম, দ্বিতীয়াংশেও কয়েকটি ক্লাসের নাম। তৃতীয়াংশে থাকবে একটি কি দুটি বাক্যে মেজদার এন্ট্রান্স ফেল ও আবার পরীক্ষার জন্য তৈরি হবার কথা। বাক্য শুদ্ধ করে এই তথ্যটুকু জানাতে পারলেই ২+২+২=৬ নম্বর পাবার কথা। শেষাংশের উত্তরে ঘটনার তথ্যগত বিবরণ দিতে হবে। কিছুটা লিখতে হবে। যদি ব্যঙ্গের ভাবটা উত্তরে আনা যায়, যেমনটা শরৎচন্দ্রের মূল লেখায় আছে, তাহলে অবশ্য বেশি নম্বর পাওয়া যাবে।

দেখা যাচ্ছে, বই পড়া থাকা, ঘটনাগুলি ও তথ্যগুলি জানা-ই আসল কথা।

প্রশ্নের রকমফের অবশ্য আছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে মূল পাঠ্যবই খুব ভাল করে পড়া থাকলে তবেই সম্ভব 'বস্তুনিষ্ঠ' প্রশ্নের থেকে পুরো মার্কা আদায় করা, 'বস্তুনিষ্ঠ+ব্যাখ্যামূলক' প্রশ্নের শতকরা ৭৫ ভাগ এবং 'ব্যাখ্যা ও আলোচনামূলক' প্রশ্নের উত্তরে শতকরা ৬০-এর বেশি নম্বর পাওয়া। তাই—

পাঠসঙ্কলন এবং উপপাঠ্য বইগুলো পড়তে পড়তে মুখস্থের মতো করে ফেলা প্রথম জরুরি কাজ।

এতে আরও একটা বাড়তি লাভ হবে। পাঠসঙ্কলন আর উপপাঠ্য বইয়ে যাঁদের লেখা পড়ানো হয়, আমাদের ভাষার তাঁরা সব বিরাট লেখক। তাঁদের লেখা বারবার পড়তে পড়তে ভাল বাংলা লেখার শক্তি এসে যাবে।

বাজারে যে-সব নোটবই আছে, তার সবই, সবটুকু ভাল, এ-কথা বলব না, কিন্তু আমার মতে নাক উঁচু করে 'নোট বর্জনীয়'—এই নীতি নেওয়া ঠিক নয়। তবে—

১· কোনোক্রমেই পাঠ্য মূল বইকে গৌণ করে নোটকে মাথায় তোলা চলবে না।

২· নোট যেন পরীক্ষার্থীকে নিয়ন্ত্রণ না করে।

৩· নোটকে তোমার সাহায্যকারী হিসেবে কাজে লাগাও—তুমি তাকে নিয়ন্ত্রণ করো।

খ ॥ বঙ্গানুবাদ

প্রশ্নপত্রে দেখানো না হলেও বঙ্গানুবাদের বেলায় মোট ১০ নম্বর বাক্যানুযায়ী ভাগ করা থাকে। পরীক্ষকেরা সেইভাবে হিসেব করেই মার্কা দেন। ছোট, সরল বাক্যের জন্য কম নম্বর, দীর্ঘ জটিল বাক্যের জন্য বেশি। কেউ যদি একটি বাক্য লিখতে পারে তো তার জন্যও কিছু পাওয়া যাবে। পারছি না বলে একদম ছেড়ে আসা কাজের কথা নয়। কোনো বিশেষ শব্দের মানে অজানা হলে সেটা বাদ রেখে (ইংরেজি) শব্দটাই বসিয়ে বাকিটা অনুবাদ করা—তাতে কিছু কম হলেও নম্বর তো পাওয়া যাবে।

প্রতিটি বাক্য হুবহু অনুবাদ করতে হবে। তারপরে দেখা যাবে ভাষাটায় ইংরেজি-ইংরেজি গন্ধ আসছে। তখন শব্দগুলি আগে-পিছে সরিয়ে একটু অদলবদল ঘটিয়ে সেই গন্ধটুকু মেরে দেওয়া, যাতে সোজাসুজি পড়লে লেখাটুকু খাঁটি বাংলা বলে মনে হয়। এর জন্য রাফ-ফেয়ার করার সময়টুকু নিলে লাভই হবে। ওই সময়টুকু খরচ করতে কার্পণ্য করা ঠিক নয়।

গ ॥ প্রবন্ধ রচনা

প্রশ্নে দেওয়া সূত্রগুলি বাঁ দিকের মার্জিনে লেখা চাই। ছাত্র যে নির্বোধের মতো মুখস্থ করা প্রবন্ধ লিখছে না, প্রশ্ন বুঝে বুদ্ধি আর চিন্তা খাটিয়ে উত্তর দিচ্ছে, পরীক্ষক সেটা বুঝলে তবেই ভাল নম্বর দেবেন।

লক্ষ করো, প্রতিবারই অন্তত একটি প্রবন্ধ থাকে, যা বর্ণনামূলক, বাকিগুলো চিন্তামূলক। বিষয়টা নিয়ে কিছু জানা না থাকলে এ-জাতের প্রবন্ধ লেখা যায় না। তখন বাধ্য হয়ে অনেকে বর্ণনামূলক প্রবন্ধ লেখে। যদিও ভাষা আর কল্পনার যথেষ্ট জোর না থাকলে এ-ধরনের প্রবন্ধে বেশি নম্বর উঠবে না। কিন্তু যাদের উপায় নেই তারা তো এ জিনিস লিখবেই। অন্যদের কিন্তু সতর্ক হয়ে বুঝে নিতে হবে কোন্‌টি সে লিখবে।

যার স্বাধীন বাংলা সুন্দর লেখার অভ্যাস আছে, ভাষায় আছে কবিত্ব, কল্পনাশক্তি পুষ্ট, সে বর্ণনাপ্রধান প্রবন্ধে সফল হবে। অন্যেরা চিন্তামূলক প্রবন্ধই লিখবে।

ঘ ॥ ব্যাকরণ

ব্যাকরণে অনেক অনেক নম্বর পাওয়া যায়। এখন থেকেই (যারা আগে থেকে শুরু করেছে, আরও ভাল) টেস্টপেপার দেখে ব্যাকরণ সমাধান করে যাও। বড় কাউকে দেখিয়ে নাও ঠিক আছে কিনা। এগুলো একটা পৃথক খাতায় করো, যাতে পড়বার সময় সেই খাতাই পড়তে পারো। ব্যাকরণ-বইয়ের বিস্তারকে এইভাবে নিজের খাতায় হাতের মুঠোয় নিয়ে এসো। এর ফলে নম্বর বাড়বেই।

ঙ ॥ শেষ কথা, বিশেষ কথা

সকলের জানা—আমিও প্রতিবছর বলছি। তবু প্রতিবছর দেখছি, শতকরা ২৫ জনের খাতা অতি নোংরা, আরও ২৫ জনের প্রায়-নোংরা। মার্জিন নেই, প্যারাগ্রাফ ভাগ নেই, একটা প্রশ্ন শেষ হল তো ঘাড়ের উপর শুরু হল পরেরটা। হাতের লেখা পড়া যায় না, কত নম্বরের প্রশ্ন, স্পষ্ট করে লেখা নেই।

একটু সতর্ক থাকলে এই দুর্বলতাগুলো ডিঙোনো যায়। হাতের লেখা ভাল করতে একটু সময় লাগে (যদিও তা দুঃসাধ্য কিছু নয়), কিন্তু ঝরঝরে পরিষ্কার, ফাঁক-ফাঁক করে লেখা একটু চেষ্টা করলেই, একটু নজর দিলেই আয়ত্তে আসবে। আর—

১· প্রতি উত্তরের পরে এক ইঞ্চি জায়গা ছাড়ো।

২· খাতার বাঁ দিকে এক ইঞ্চি মার্জিন থাক।

৩· প্রশ্নে অনেক অংশ থাকলে, প্রতি অংশ ভিন্ন ভিন্ন প্যারাগ্রাফে লেখো।

৪· একটু বড় উত্তর প্যারাগ্রাফে ভাগ করে লেখো।

৫· কিছু কাটতে হলে পরিষ্কার করে কাটো। উপরে নীচে দাগ দিয়ে কাটা অংশটা পৃথক করে পরের উত্তর শুরু করো।

ইংরেজির (দ্বিতীয় ভাষা) হেড এগজামিনার জানাচ্ছেন

এ বছরে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেক ভাল হয়েছে। ভাল হওয়ার কারণ নিশ্চয়ই তোমরা জানো। ইংরেজি ও অঙ্ক এই দুটি বিষয়ে প্রতি বছর বড় রকমের বিপর্যয় ঘটে। এবার তার মাত্রা অনেকটা কমেছে। অর্থাৎ বিষয় দুটি সম্পর্কে ছেলেমেয়েরা ক্রমশ তাদের ভয় কাটিয়ে উঠতে পারছে। তাই এই সাফল্য। সুতরাং এমন দিন আসতে পারে যখন কেউ আর ফেল করার গ্লানি ভোগ করবে না। তার জন্য অবশ্যই পরিশ্রম করতে হবে, এবং শ্রমের সঙ্গে কৌশলও কিছুটা আয়ত্ত করতে হবে। যাকে বলে পরীক্ষায় ভাল করার আর্ট, যা তোমরা সকলেই কিছুটা জানো এবং প্রতি বছর যা তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় 'আনন্দমেলা'র পূজা-সংখ্যায়। সেই কথাগুলিই এখানে বলি।

প্রথম কথা এবং প্রধান কথা পরীক্ষায় ভাল করতে হলে যেমন কী পড়তে হবে, কেমনভাবে পড়তে হবে জানা চাই, তেমনি কী লিখতে হবে এবং কেমনভাবে কতটুকু লিখতে হবে সেটিও আরও ভাল করে রপ্ত করা চাই। ইংরেজির কথায় আসি। প্রশ্নের ধরনধারণ তোমাদের চেনা। কেননা ছক তো একই রকমের। সেই গদ্যরচনা ২৫ নম্বরের। কবিতা ১৫ নম্বরের। পাঠ্যগ্রন্থ থেকে মোট ৪০ নম্বর। প্রশ্নের ধরন একই। বস্তুনিষ্ঠ প্রশ্ন অবজেকটিভ টাইপ ও সংক্ষিপ্ত-উত্তর-ভিত্তিক। প্রথম ও তৃতীয় প্রশ্ন (যথাক্রমে ৪+৩) অবজেকটিভ টাইপের। প্রতিটির উত্তর এক-একটি শব্দে। কিন্তু উত্তর দেবে এক-একটি বাক্যে। তাহলে পুরো নম্বর পাবে। অর্থাৎ সাতের মধ্যে সাতই। '৮৪ সনের প্রশ্ন থেকে দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। 1(a) প্রশ্নের উত্তরে শুধু 'foolish' না লিখে তুমি লিখবে The word opposite in meaning to 'wise' is 'foolish': কিংবা ধরো 1(b) প্রশ্নের উত্তরে তুমি লিখবে The word 'whipped' is nearest in meaning to 'lashed'। লক্ষ করেছ, উত্তরটি দেওয়া হচ্ছে একটি বাক্যে এবং সঠিক শব্দটির নীচে দাগ দেওয়া হয়েছে। তোমরা এইভাবে উত্তর করবে।

এবার সংক্ষিপ্ত-উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্নের প্রসঙ্গে আসি। দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত-উত্তর-ভিত্তিক। গদ্যাংশ থেকে তিনটি প্রশ্নের (প্রতিটিতে ৭ নম্বর) উত্তর করতে হবে। আবার প্রত্যেকটি প্রশ্নের তিনটি অংশ। নম্বর পৃথক-পৃথকভাবে নির্দিষ্ট ২+৩+২ ; সুতরাং উত্তর লিখতে হবে পৃথক-পৃথক অনুচ্ছেদে। প্রতিটি অংশের উত্তর ক'টি বাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে তাও বলা থাকে। স্বভাবতই কী লিখতে হবে, কতটুকু লিখতে হবে এবং কীভাবে লিখতে হবে, এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে ভাল নম্বর উঠবে না। প্রশ্নগুলির প্রবণতা দেখেছ। অতি সহজ থেকে ক্রমশ কঠিনের দিকে। প্রথম অংশটি অতি সহজ। অবজেকটিভ টাইপ। অতএব উত্তর ঠিক হলেই পুরো নম্বর। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে পুরো নম্বর পাওয়া না গেলেও পুরোর কাছাকাছি পেতে পারো ভাল উত্তর লিখলে। প্রশ্নের তৃতীয় অংশটিতে তোমার বুদ্ধিমত্তা ও বোধের কিছুটা পরিচয় দিতে হচ্ছে। কবিতার ক্ষেত্রেও একই প্যাটার্ন। গদ্যাংশে

যেখানে তিনটি প্রশ্ন, এখানে দুটি। কিন্তু প্রতিটি প্রশ্নেরই তিনটি অংশ এবং নম্বর পৃথক-পৃথকভাবে নির্দিষ্ট ১+৩+২ ; ধরন একই। মানও এক। তৃতীয় অংশে একটু গভীরে যাওয়ার প্রয়াস থাকে। ভাল উত্তরে তার আভাস পরীক্ষক নিশ্চয়ই আশা করবেন।

গ্রামার (১৫ নম্বর), ট্রানস্লেশন (১৫ নম্বর) এবং কম্পোজিশন (৩০ নম্বর) মিলে বাকি ৬০ নম্বর। পাঁচ নম্বরের প্রশ্ন গ্রামার থেকে এবং এখানে পাঁচটি ভাগ, প্রতিটিতে ৩ নম্বর করে। এক আর্টিকেল/প্রিপোজিশন সহযোগে শূন্যস্থান পূরণ ; দুই পাংচুয়েশন ; তিন বাক্যের রূপান্তর ; চার ন্যারেশন চেঞ্জ ; পাঁচ বাক্যে বাঁকা হরফে লেখা শব্দ বা শব্দসমষ্টির বদলে ফ্রেজ ইডিয়ম/গ্রুপ ভার্বের প্রয়োগ। গ্রামারে অনায়াসেই পুরো নম্বর পাওয়া যায়। ছয় নম্বরের প্রশ্নে ট্রানস্লেশন প্যাসেজ দুটি (৭+৮ নম্বর)। প্যাসেজের মধ্যে কোনো কঠিন বা স্বল্প পরিচিত শব্দ থাকলে প্রশ্নপত্রেই তার ইংরেজি প্রতিশব্দ দেওয়া থাকছে। এবারে যেমন 'আদিবাসী' শব্দের ইংরেজি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যদি না দেওয়া থাকত ইংরেজিতে 'Adivasis' লিখলেও চলত। ভাষান্তরের সময় অর্থ না বুঝে নিছক আক্ষরিক অনুবাদ করলে কিন্তু ভুল হবে। যেমন গলার ইংরেজি throat হলেও একটা প্যাসেজে যেখানে ছিল—'এ যে মাস্টারমশাইর গলা', সেখানে গলার ইংরেজি প্রতিশব্দ voice হবে, throat নয়। এ-সব কথা তোমরা জানো। তবু মনে করিয়ে দিলাম।

সাত নম্বরের প্রশ্নে চারটি অংশ। প্রশ্নগুলি মোটামুটি সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক। শুধু শেষের অংশ যেটি বিষয়বোধের পরীক্ষা (কম্প্রিহেনশন টেস্ট) সেটি নয়। এখানে অনেকগুলি বিকল্প উত্তর থেকে সঠিক উত্তর বেছে নিতে হয়। প্যাসেজটি ঠিকমতো বুঝতে পারলে অঙ্কের মতো পুরো পাঁচই পাবে। ভুল হলে কিন্তু শূন্য। অন্যান্য প্রশ্নগুলিতে, যেমন প্যারাগ্রাফ (১০ নম্বর), লেটার (৮ নম্বর) এবং সামারি (৭ নম্বর) লেখার মধ্যে তোমাদের ইংরেজির বিদ্যা ভালভাবে প্রমাণের সুযোগ আছে। প্যারাগ্রাফ লেখা সম্পর্কে একটা কথা বলি। এবারে প্যারাগ্রাফ লেখার জন্য যে বিষয়গুলি ছিল, তার মধ্যে একটি হচ্ছে : কলকাতায় সাম্প্রতিক অনুষ্ঠিত **শিশুদের বইমেলা** (The Children's Book Fair recently held in Calcutta)। কলকাতার ছেলেমেয়েরা যারা এই মেলা দেখেছে, এবং মফস্বলের ছেলেমেয়েরা যারা এই বইমেলা দেখেনি কিন্তু খবরের কাগজে পড়েছে, তাদের অনেকেই কিন্তু এই বিষয়ে রচনা লিখতে গিয়ে মারাত্মক ভুল করেছে। তারা সাধারণভাবে বইমেলা সম্পর্কে লিখেছে যা প্রতিবছর কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়, মফস্বল শহরেও হয়। কিন্তু বিষয়টি তো তা নয়। **শিশুদের বইমেলা** সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হল কলকাতায় ১৯৮৩ সনের শেষের দিকে এবং এর উদ্যোক্তা ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট। তোমরা কিন্তু ঠিক কী বিষয়ে লিখতে বলা হয়েছে ভাল করে দেখে বুঝে তবে লিখতে শুরু করবে, এবং কোথায় শেষ করতে হবে খেয়াল রেখো যেন। এখানে তোমার নিজস্ব রচনাক্ষমতার স্বীকৃতি পাবে। লেটারে বিষয়বস্তু ও ফর্ম মিলিয়ে ৮ নম্বর (৬+২)। ব্যক্তিগত চিঠি ও অফিশিয়াল/আধা-সরকারি চিঠির পৃথক ফর্ম তোমরা জানো। ব্যক্তিগত চিঠিতেও সম্বোধন থেকে নাম স্বাক্ষরের আগে কী লিখতে হয়, পাংচুয়েশন কী দিতে হয়, সম্পর্ক অনুসারে কোথায় কী তফাত হয় তাও ভালভাবে জানা দরকার। কেননা ফর্মে ভুল থাকলে নম্বর কাটা যাবে। আর ফর্ম নির্ভুল হলে ফর্মের জন্য নির্দিষ্ট পুরো নম্বরটা সহজেই পাবে, চিঠির মধ্যে বস্তু যদি কিছু থাকে। কিন্তু চিঠির মধ্যে বিষয়বস্তু কিছু না থাকলে শুধু ফর্মের জন্য নম্বর পাবে না। সামারি (৭ নম্বর) লেখার সময় তোমাদের ইংরেজির দুর্বলতা বিশেষভাবে ধরা পড়ে। মূল প্যাসেজ থেকে কিছু-কিছু বাক্য বিচ্ছিন্নভাবে তুলে ধরলে সামারি হয় না। প্যাসেজটি ভাল করে বোঝার জন্য বেশ কয়েকবার পড়বে। তারপর তোমার নিজের কথায় প্যাসেজের ভাবটি সংক্ষেপে লিখবে। কম্পোজিশনের জন্য বাড়িতে নিয়মিত লেখার অভ্যাস করবে।

প্রশ্নোত্তরের প্যাটার্ন সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা হল। এখন একবার টেক্সট-ভিত্তিক প্রশ্নের দিকে ফিরে তাকাই। '৮৪ সনের পরীক্ষায় গদ্যাংশের সাতটি পিসের মধ্যে পাঁচটি থেকে সংক্ষিপ্ত-উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন এসেছে। যে দুটি পিস থেকে এই প্রশ্ন নেই তা হচ্ছে Jenner, the Conqueror of Smallpox এবং Our Heritage-II. যদি ধরা যায় আগামী পরীক্ষায় এই দুটি পিস থেকে প্রশ্ন থাকার সম্ভাবনা বেশি তাহলেও পাঁচটি প্রশ্ন থাকলে আরও তিনটি পিস থেকে প্রশ্ন আসবে। সুতরাং কোনো পিস একেবারে বাদ দেওয়া বিপজ্জনক। দুটি বড় পিস The Bishop's Candlesticks এবং The Selfish Giant থেকে প্রায় প্রতি বছরই প্রশ্ন আসছে। কোনটা বাদ দেবে তাহলে ? কেনই বা দেবে ?

দৈনন্দিন জীবনের নাটক এখানে আছে। হাসি আছে। কান্না আছে। ক্রোধ আছে। কৌতুক আছে। ফুলের মতো সুন্দর শিশুর নিঃস্বার্থ ভালবাসায় স্বার্থপর দৈত্যের জন্মান্তর ঘটে এখানে। দরদি প্রতিবেশীর দুর্লভ সেবার আদর্শে মন আমাদের ভরে ওঠে। সত্যিকার প্রতিবেশী কে, আমরা চিনতে পারি। আবার গ্রাম্য-নারীর সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে বিজ্ঞানীর অসামান্য আবিষ্কারের কাহিনী যা মহামারী থেকে লক্ষ লক্ষ প্রাণ রক্ষা করেছে, তা আমাদের চমকিত করে, কৃতজ্ঞতায় অভিভূত করে। শুধু রোগ নয়, শোক নয়, সব রকমের ভয় থেকে মুক্তির ইঙ্গিত এখানে আছে। সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস এখানে মেলে। পোড়-খাওয়া এই মানবদেহ কী গভীর মানবিক আবেদনে জীবন্ত দেবতার মন্দির হতে চায়। আমাদের সুপ্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য-মণ্ডিত জীবনের কথাও আছে। বাইবেলের কাল থেকে একালের মুল্‌ক রাজ আনন্দের নিবন্ধটি ধরে যে সাতটি গদ্যরচনা তোমাদের পাঠ্যতালিকায় দেখছি, তার সবগুলির মধ্যেই এই সব মানুষের কথাই আছে। এদের ভাল না বেসে কি পারা যায় ? কবিতাগুলিও কি কম সুন্দর ? শেক্‌সপিয়ার থেকে সরোজিনী নাইডুর কবিতা। মোট এগারোটি। সবগুলিই ছোট ছোট। এবার যে তিনটি কবিতা থেকে সংক্ষিপ্ত-উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ছিল তা হচ্ছে স্কট, টেনিসন ও ফ্রস্টের কবিতা। আগামী পরীক্ষায় হয়তো রোমান্টিক কবিদের কবিতার উপর জোর দেওয়ার ঝোঁক থাকবে। সব কবিতাই পড়বে কিন্তু।

উত্তরপত্রে প্রশ্নের উত্তর লেখার আগে প্রশ্নগুলি খুব ভাল করে পড়ে বুঝে তারপর উত্তর লিখতে আরম্ভ করবে। লেখা পরিচ্ছন্ন হলে পরীক্ষকের মন প্রথমেই প্রসন্ন হয়ে উঠবে

প্রতিটি প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ পৃথক পৃথক অনুচ্ছেদে লিখবে। উত্তর হবে সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ, যেমন প্রশ্নপত্রে নির্দেশ থাকবে। সবশেষে সময়মতো উত্তরপত্রটি রিভাইজ করবে। দেখবে শুধু বানান ভুল নয়, কত রকমের ভুল সহজেই সংশোধন হয়ে যাবে। সেইসঙ্গে নম্বরও যে বাড়বে, তাতে সন্দেহ নেই।

অঙ্কের হেড এগজামিনার জানাচ্ছেন

অঙ্কে নম্বর বাড়াবার মূল চাবিকাঠি একটাই, অঙ্ক ভাল করে জানতে হবে। তবে অঙ্কের কোন্ কোন্ দিক একজন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর পক্ষে বেশি করে জানা উচিত, সে সম্বন্ধে অবশ্যই একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। আর সেই ধারণা দেওয়ার জন্যই এই লেখার অবতারণা।

যোগ বিয়োগ গুণ ও ভাগ—এই চারটি গাণিতিক প্রক্রিয়া অঙ্কশাস্ত্রের চারটি স্তম্ভবিশেষ। সেজন্যে ভাল ফল পেতে হলে এই চারটি প্রক্রিয়ায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন। অন্যান্য প্রক্রিয়া যথা ল· সা· গু·, গ· সা· গু·, বর্গমূল, বর্গ নির্ণয় ইত্যাদিতে পারদর্শিতা লাভ করাও ঐ চারটি প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল।

পরীক্ষার উত্তর দেওয়ার সময় অসাবধানতা, ব্যস্ততা ও অজ্ঞতাবশত যে-সব ভুলত্রুটি বেশি নম্বর পাওয়ার পরিপন্থী, সেগুলি এইরকম

(১) প্রশ্নপত্র থেকে প্রশ্নের অংশবিশেষ উত্তরপত্রে তুলতে গিয়ে অনেক সময় ভুল হয়। এটা অসাবধানতাজনিত ত্রুটি, সেজন্যে লেখার অব্যবহিত পরেই প্রশ্নপত্রের লেখাটির সঙ্গে উত্তরপত্রের লেখাটি সাবধানতার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া দরকার। একটা উদাহরণ দিই। ধরো, প্রশ্নে আছে : x^2-5x+6কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো। পরীক্ষার্থী তাড়াতাড়ি করে উত্তরপত্রে x^2+5x-6 লিখল এবং তদনুসারে উত্তর দিল। এরকম সামান্য অসাবধানতার জন্যে অঙ্কে পারদর্শী ছাত্রও নম্বর পায় না।

(২) যেখানে সমান চিহ্ন '=' দেওয়া দরকার, সেখানে '=' চিহ্ন বারবার বাদ পড়লে অঙ্কের উত্তর ঠিক হলেও পুরো নম্বর পাওয়া যায় না। সেইরকম, সমীকরণের ক্ষেত্রে Or (অথবা, বা) বাদ পড়লেও নম্বর কম হয়। ব্র্যাকেট বসানো বা তোলার ক্ষেত্রে নিয়ম যথাযথ পালন না করলে ভুল হয়। যেখানে ব্র্যাকেট দেওয়া দরকার, অনেকেই সেখানে ব্র্যাকেট দেয় না ; যেমন $x^3-8=(x-2)(x^2+x2+2^2)=x-2(x^2+2x+4)$, এটা ভুল।

(৩) ছাত্ররা অনেক সময় নির্ণীত ফলের একক লেখে না বা ভুল একক লেখে ; ফলত এক বা দুই নম্বর কম পায়।

(৪) জটিল গুণভাগ, যেগুলি মনে মনে করা সম্ভব নয়, সেগুলি উত্তরপত্রের ঐ পৃষ্ঠাতেই ডান দিকের মার্জিনে দেখানো উচিত। এগুলি উত্তরের প্রয়োজনীয় অংশ এবং উত্তরপত্রে না থাকলে নম্বর পাওয়া যায় না। অনেকে একবার 'রাফ্' (Rough) এবং পরে 'ফেয়ার' (Fair) করে, এতে প্রতি অঙ্ক দুবার করে করতে হয়, তাতে সময় অযথা ব্যয় হয় এবং বেশি প্রশ্নের উত্তরও করা যায় না। উপরন্তু রাফ্ থেকে ফেয়ারে তুলতে অনেক সময় ভুল হয়। স্বভাবতই এ-পদ্ধতি বাঞ্ছনীয় নয়।

এবার তোমাদের প্রশ্নপত্রের দিকে তাকানো যাক। মাধ্যমিকের গণিত প্রশ্নের দুটি অংশ থাকে পার্ট ওয়ানে অবজেক্টিভ্ ও পার্ট টু-তে অপেক্ষাকৃত বড় অঙ্ক থাকে।

পার্ট ওয়ানে ভাল করতে গেলে অঙ্কের বিভিন্ন সংজ্ঞা আর ফর্মুলা খুব ভালভাবে আয়ত্ত করতে হবে, আর তার প্রয়োগবিধি অনুশীলন করতে হবে।

পার্ট টু-তে বীজগণিত, জ্যামিতি, পাটীগণিত, পরিমিতি ও ত্রিকোণমিতি—এই কটি বিষয়ে প্রশ্ন থাকে।

যারা বীজগণিতের গ· সা· গু· প্রশ্নের উত্তর উৎপাদকে বিশ্লেষণ-পদ্ধতিতে করে, তাদের অনেকে রাশিগুলিকে যথাযথ বিশ্লেষণ করেও ব্যস্ততার জন্য নির্ণেয় গ· সা· গু· কত সেটা লিখতে ভুলে যায় এবং প্রাপ্য নম্বর থেকে বঞ্চিত হয়।

লেখ চিত্রাঙ্কন অনেকেরই প্রিয় বিষয় হলেও নির্ভুল উত্তর করতে গেলে যথেষ্ট সতর্কতার প্রয়োজন। যেমন লেখচিত্র x-অক্ষ, y-অক্ষ এবং মূল বিন্দু অবশ্যই নির্দেশ করতে হবে। এছাড়া $\begin{array}{c|c|c|c} x & \cdots & \cdots & \cdots \\ \hline y & \cdots & \cdots & \cdots \end{array}$ এইভাবে সারণী নির্ণয় বা ট্যাবুলেশন করা এবং গৃহীত বিন্দুগুলির (প্রতি সরলরেখার জন্য অন্তত তিনটি বিন্দু) পাশে স্থানাঙ্ক লেখা দরকার। পরিশেষে 'লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান' থাকলে ছেদবিন্দু নির্ণয় এবং $x=$ কত ও $y=$ কত লেখা আবশ্যক।

অসমীকরণে '$\geqslant$', '$>$', '$\leqslant$', '$<$' চিহ্নগুলির অর্থ বুঝে সঠিকভাবে অঞ্চল নির্ণয় চিহ্নিত (শেড) করতে হবে এবং সমাধান অঞ্চল নির্ণয় করতে হবে। যেমন, '84 সালের 5 নং প্রশ্নের ক্ষেত্রে $x\geqslant 2$ এর লেখচিত্র হিসেবে $x=2$ রেখা সমেত এর ডানদিকের অঞ্চল চিহ্নিত করতে হবে, তেমনি $y\geqslant 3$ এর ক্ষেত্রে $y=3$ রেখা এবং তার উপরের অঞ্চল। $5x-4y\leqslant 0$ এর লেখচিত্র হবে $5x-4y=0$রেখা এবং তার বামদিকের অঞ্চল অর্থাৎ যে-দিকে নেগেটিভ্ x-অক্ষ ও পজিটিভ y-অক্ষ আছে। এই তিনটির সাধারণ বা কমন অঞ্চলকে সমাধান অঞ্চল লিখে অথবা চিহ্নিত করে দিতে হবে।

জ্যামিতিতে প্রায়ই চাঁদা ও সেট-স্কোয়ারের সাহায্য না নিয়ে চিত্রাঙ্কন করতে বলা থাকে, তখন চাঁদা ও সেট-স্কোয়ারের সাহায্য নিলে কোনোই নম্বর পাওয়া যায় না আবার কখনও কখনও প্রশ্নে নির্দেশ থাকে, "কেবলমাত্র অঙ্কনচিহ্ন দিতে হবে", তখন উজ্জ্বল পেন্সিলের সাহায্যে এমনভাবে আঁকতে হবে যাতে সমস্ত অঙ্কনচিহ্ন যথাযথ পরিস্ফুট হয়। এখানে লিখিত বিবরণের কোনো দরকার নেই। জ্যামিতিক প্রমাণের ক্ষেত্রে সমস্ত যুক্তি সুস্পষ্টভাবে লিখে দিতে হবে এবং প্রমাণের সঙ্গে অপরিহার্যভাবে চিত্র (ফিগার) দিতে হবে। চিত্র যদি যথাযথ হয়, তাহলে প্রমাণের ভুল হলেও কিছু নম্বর পাওয়া যায়। তবে চিত্র ত্রুটিপূর্ণ হলে পুরো প্রশ্নে কোনো নম্বর পাওয়া যায় না। (যেমন পরীক্ষার্থী লিখছে A B C D একটি বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ, কিন্তু ছবিতে A কৌণিক বিন্দুটি পড়েছে বৃত্তের বাইরে।)

পাটীগণিতের প্রশ্নের বিষয়বস্তু বারেবারে পড়ে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। পরিমিতি ও ত্রিকোণমিতির অঙ্কে প্রাথমিক সূত্রগুলির যথাযথ প্রয়োগের উপরেই পরীক্ষা হয় ; এবং বারবার অনুশীলন করলে এতে খুবই ভাল করা যায়।

গণিতে বেশি নম্বর পাওয়া খুব একটা শক্ত কিছু নয়, মেধাবীদের পক্ষে তো নয়ই। তবে একটা বিষয় সকলেরই, এমন কী মেধাবীদেরও, মনে রাখতে হবে ; যে বিষয়টি (বীজগণিত, জ্যামিতি, পাটীগণিত ইত্যাদির মধ্যে) তোমার কাছে সবচেয়ে সোজা মনে হয় এবং যাতে ভুলত্রুটি কম হয়, সেটাই সকলের আগে উত্তর করা ভাল। এতে মানসিক শক্তি ও নিজের উপর আস্থা বাড়বে। পরীক্ষার ভীতি কাটানোর জন্যে এবং সময়সচেতন হওয়ার জন্যে মাঝে-মাঝে আগেকার মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্র বা টেস্ট পেপার থেকে প্রশ্ন নিয়ে ঠিক তিন ঘণ্টা সময়ে নিজেই নিজের পরীক্ষা নেওয়া এবং শিক্ষকের সাহায্যে (অথবা নিজেই) তার মূল্যায়ন করা অত্যন্ত ফলপ্রদ। মনোযোগী ও মেধাবী ছাত্রদের মনে রাখতে হবে যে টেক্সট্ বই ছাড়াও আরও দুয়েকটি সমপর্যায়ের বা একটু উচ্চ পর্যায়ের অঙ্ক-বইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা উচিত।

এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি ঠিক-ঠিক দৃষ্টি রাখলে অঙ্কে সহজেই 80, 90 এমন কী 100 নম্বরও পাওয়া সম্ভব।

খেলা থেকে অবসর নেবার পরেই হঠাৎ দেশে-বিদেশে-বিখ্যাত এক ফুটবল-খেলোয়াড় বিমান-দুর্ঘটনায় মারা যান। রেখে যান তাঁর আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপি...আর একজোড়া বুট। স্কুলের ছাত্র বিলু তাঁর ফ্ল্যাটে গিয়ে সেই আত্মজীবনী ও বুটজোড়া পেয়ে যায়। নিহত খেলোয়াড়ের শট ছিল কামানের গোলার মতো। তাই সবাই তাঁকে 'গোলন্দাজ' বলত। তাঁর বুট পরে মাঠে নামতেই বিলুর খেলার ধাঁচ একেবারে পালটে যায়...

পোস্টে লেগে বল ফিরতেই বিলু শুট করল···
শাবাশ বিলু !
গোলটা কে করল ? আমি, না এই বুট ?
এইভাবে খেললে জগুর জায়গায় এখন থেকে তোকেই নামানো হবে !
খেলা শেষ হবার পর···
জগুর জ্বর, তাই তোকে নামানো হয়েছে, কিন্তু···
জগু তোর চেয়ে বড় খেলোয়াড় !
না না, বিলুও দারুণ খেলছে !

গেম-টিচার এসেছেন···
বল পেলেই বিলুকে পাস করবে । সামনের শনিবার স্কুল-লিগের খেলা সেদিনও বিলুকেই নামাব ।

সামনের শনিবারের খেলা দেখেই নাকি রাজ্য-স্কুল-দল গড়া হবে। নির্বাচকরা সেদিন মাঠে হাজির থাকবেন শুনছি ।
ওরেব্বাবা, সে তো বিরাট ব্যাপার ! আমরা কেউ কি চান্স পাব ?

সেই রাত্তিরে··· বিলু ভাবছে···
আত্মজীবনীতে দেখছি, 'গোলন্দাজ'ও রাজ্য-স্কুল-দলে নির্বাচিত হয়েছিলেন । তার পরেই তিনি জাতীয় স্কুল দলে জায়গা পান ।

বিলু জোর অনুশীলন চালাচ্ছে···
রাজ্য-স্কুল-দলে আমাকে নির্বাচিত হতে হবেই । তার পরে জায়গা পেতে হবে জাতীয় স্কুল-দলে।

স্কুলে···শুক্রবার···
খবর শুনলে বিলু কেঁদে ফেলবে !
কী বলাবলি করছে ওরা ?

সামনেই নোটিস-বোর্ড···
এ কী, জগুই খেলছে ! আমি নেহাতই বদলি-খেলোয়াড় !
নোটিস
শনিবারের খেলায় জগবন্ধু বসুই সেন্টার ফরোয়ার্ড খেলবে । বদলি-খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে উপস্থিত থাকবে বিলাস রায় ।

সে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। আবার চালাতে লাগল অনুশীলন!

বাস্ রে ! যেন চুনী গোস্বামী !
এইভাবে যদি খেলতে পারিস বিলু, তাহলে আর ভাবনা নেই!
শনিবার···
এসো বিলাস, বাস ছাড়বে !
যাচ্ছি তো, কিন্তু জগুও যখন যাচ্ছে, তখন কী হবে কে জানে !

বিলু, আমি এখনও ঠিক সুস্থ হয়ে উঠিনি । তুই খেললেই ভাল হত !
না রে জগু, তোকে আমি হিংসা করি না । তুই খেললেই আমি খুশি হব !
ড্রেসিং রুমে···
তুমিও তৈরি থাকো বিলু । দরকার হলেই মাঠে নামতে হবে ।
তৈরি থাকছি । কিন্তু আশা করছি, জগুই শেষ পর্যন্ত খেলবে ।

মাঠের ধারে বসে আছে বিলু···
জগু খুব সুন্দর খেলছে । গোল পাচ্ছে না, কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি নেই ।
ওদের গোলিটা দারুণ ! রাজ্য-দলে জায়গা পাবেই !
9

খেলা শেষ হবার দশ মিনিট আগে··· ফল তখনও ০—০···
এবারে তোমাকে নামাব বিলাস, ওয়ার্ম-আপ করো···
সত্যি ?

আমি বিলাস রায়···জগবন্ধু বসুর জায়গায় নামছি···
ঠিক আছে !

ঠিক 'গোলন্দাজ'-এর মতোই আমি নামলাম । খেলা শেষ হতে আর দশ মিনিট বাকি !

পায়ে ভুতুড়ে জুতো।
'গোলন্দাজ'-এর আত্মজীবনীর
কথা ভাবছে বিলু...

সেও কি তাহলে
দশ মিনিটে হ্যাটট্রিক করবে ?

খেলা শেষ হবার দশ মিনিট আগে মাঠে নেমেছে বিলু। নেমেই একটা বলকে ব্যাক-ভলি করে বিপক্ষ-দলের সীমানায় পাঠিয়েছে...

দারুণ !

শাবাশ !

নির্বাচকরাও খুব খুশি !

খেলার চেহারাই পালটে দিয়েছে !

কী নাম ওর ?

বিলু দৌড়চ্ছে...

বুটজোড়া যেন হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে !

বিলু আজ জেট-প্লেন !

বিলু এগোচ্ছে…
ওকে কাটাতে হবে…

কাটিয়ে নিয়েই বিলু বাঁ পায়ে কিক্ করল… গো-ও-ও-ল !
গোল !
শাবাশ বিলু ! শাবাশ

এখন বিলু জানে…
আরও একটা গোল আমি পাবই !

আর মাত্র দু' মিনিট বাকি । কর্নার কিক
বুট বলছে, এখানে দাঁড়াও !

বল গোলের সামনে পড়ছে…
এ-গোলটাও আমিই পাব !

বিলু লাফিয়ে উঠে বলে মাথা ঠেকাতেই… গো-ও-ও-ল !
হ্যাটট্রিক !
দশ মিনিটে তিন গোল !

জগুও ছুটে এসে অভিনন্দন জানাচ্ছে…
দারুণ খেলেছিস বিলু !
তুই খুশি তো ?

গেম-টিচার ড্রেসিং রুমে এসেছেন…
তোমাকে ওঁরা রাজ্য-দলে নিচ্ছেন, বিলাস !
সত্যি ?

তবে জগবন্ধুও বদলি হিসেবে দলে থাকছে !
শাবাশ জগু !
শাবাশ বিলু !
শেষ

সম্পূর্ণ উপন্যাস

কলাবতীদের ডায়েট-চার্ট

মতি নন্দী

ছবি : দেবাশিস দেব

কলাবতী রাতে খাওয়ার টেবিলে এল বড় একটা খাম হাতে। দাদু তখন রুটির গোছা থেকে বেছে ফোস্কা-পড়া চারখানা রুটি প্লেটে তুলে নেওয়ায় ব্যস্ত। রাতে চারখানা রুটি নিজের জন্য বরাদ্দ করেছেন সত্তর বছরে পা দেওয়ার দিন থেকে। চার বছর আগেও তিনি যোলখানি রুটি খেতেন, যে জন্য আধ কেজি আটা দরকার হত। আটা থেকে ভুষি বাদ দেওয়ার তিনি ঘোরতর বিরোধী। ভূষিতে প্রচুর নাকি পুষ্টি আছে। বয়োবৃদ্ধি এবং খাটুনি হ্রাস, এই দু'য়ের সঙ্গে মানিয়ে পাকযন্ত্রকে ব্যবহার করলে শরীর অবাঞ্ছিত আচরণে মন দেয় না, আয়ুও বাড়ে, এইরকম একটা ধারণা রাজশেখর সিংহ চিরকালই পোষণ করে আসছেন। আর সেইজনাই পুত্র সত্যশেখর এবং নাতনি কলাবতীর খাদ্যের পরিমাণ কতটা হবে সেটা তিনি ঠিক করে দিয়েছেন। দু'জনের জন্য কতটা ক্যালরি শরীরে দিলে কর্মক্ষমতা সতেজ থাকবে এবং চর্বি জমবে না, সে-সব তিনি নানান বইপত্র পড়ে এবং নামকরা এক খাদ্যবিশারদের সঙ্গে পরামর্শ করে (খাদ্যবিশারদকে ৬৪ টাকা ফি দিয়েছিলেন) ঠিক করে দিয়েছেন।

এজন্য তিনি ছেলে ও নাতনিকে জেরাও করেছিলেন। যেমন :

রাজশেখর সতু, সারাদিনে তুমি কতক্ষণ চেয়ারে বসে কাটাও, কতটা পথ চলাফেরা করো, আর কতক্ষণ বিছানায় শুয়ে কাটাও ?

সত্যশেখর হকচকিয়ে তারপর আমতা-আমতা করতেই রাজশেখর ধমক দিয়ে ওঠেন, "অত মাথা চুলকোবার কী আছে আর কড়িকাঠ গোনারই বা দরকার কী ? আমিই বলে দিচ্ছি, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তুমি দশ ঘণ্টা ঘুমোও, দু' ঘণ্টা মোটরে, আর চেম্বারে মক্কেলদের সঙ্গে চেয়ারে বসে, দু'বেলায় মোট ছ'ঘণ্টা, আর হাইকোর্টে বসে কাটাও ছ'ঘণ্টা। এ ছাড়া হাঁটাচলার বা দাঁড়িয়ে থাকার জন্য তোমার সারাদিনে সময় যায় এক ঘণ্টা। কেমন, ঠিক বলেছি ?"

সত্যশেখর অসহায়ভাবে ভাইঝি কলাবতীর দিকে তাকিয়ে বলল, "কালু, আমি কি দশঘণ্টা ঘুমোই ?"

কলাবতী গম্ভীরমুখে গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, "দাদুর হিসেবে একটু ভুল হয়ে গেছে। চব্বিশ ঘণ্টায় শোয়া-বসা-চলার যে হিসেব তুমি দিলে, সেটা যোগ করলে হয় পঁচিশ ঘণ্টা।"

"অ্যাঁ, পঁচিশ ?" বেশ তাহলে চেম্বার থেকে একঘণ্টা কমিয়ে দিচ্ছি।"

"আমি তো রোজই ঘুমোতে যাই এগারোটায় আর মুরারির কাছ থেকে খবরের কাগজ নিই ভোর ছ'টায়, বারান্দায় চা খেতে খেতে রোজই তো দেখি, তুমি আর কালু জপ করতে করতে ফিরছ। সাত ঘণ্টার বেশি আমি ঘুমোই না।"

রাজশেখর টেবিলে রাখা কাগজে কী যেন লিখে নিলেন। তারপর গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন, "আলুকাবলি আর ফুচকা এখনও তুমি খাও, ঠিক কিনা ? ঘুগনি ? তাও নিশ্চয় ? ব্যস ব্যস, তর্ক করতে যেও না, গত বুধবার মুরারিকে দিয়ে কী কিনে আনিয়ে চেম্বারে বসে গপগপ করে খেয়েছিলে তা কি আমি জানি না ?"

সত্যশেখর প্রবলভাবে প্রতিবাদ জানাতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাবার কঠিন দৃষ্টি তাকে ম্রিয়মাণ করে দিল, কেননা রাজশেখর একটুও মিথ্যে বলেননি।

"উফ্ফ্, এই সব বদভ্যাস এখনও ছাড়তে পারলে না। আজেবাজে রেস্তোরাঁয় নিশ্চয় চপ-কাটলেট গেলো ?"

সত্যশেখর টেবিলের দিকে চোখ নামিয়ে চুপ।

"পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স তো হয়ে গেছে, এবার একটু স্বাস্থ্যের দিকে নজর দাও। খাওয়া দাওয়া রেস্ট্রিক্টেড করো, ব্যায়াম-টায়াম তো জীবনে করোনি সেদিন কে যেন বলল, বাড়ি ফেরার পথে গাড়ি থামিয়ে তুমি নাকি শর্মার দোকানে ঢুকেছিলে ?"

"মাত্র আড়াইশো গ্রাম রাবড়ি ···"

"মাত্র হল ! উফ্ফ্ ওই আড়াইশো গ্রাম হজম করতে কমপক্ষে আড়াই মাইল দৌড়নো দরকার।"

"আমার ওজন লাস্ট টেন ইয়ার্স একই আছে, সত্তর কেজি।" প্রায় বিদ্রোহ করার ভঙ্গিতে সত্যশেখর বলল।

"গুড, ভেরি গুড।"

রাজশেখর কাগজে আরও কিছু লিখে নিয়ে বললেন, "ডায়েট চার্ট করে দোব, তাই ফলো করবে এবার থেকে।"

এরপর তিনি কলাবতীকে প্রশ্ন শুরু করেন।

"রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত রোজ ঘরে আলো জ্বলে। তার মানে গল্পের বই। সকালে মাইল তিনেক দৌড়, টায়ার্ড অবস্থায় পড়ার টেবিলে মিনিট পনেরো, স্কুলে ঘণ্টা ছয়-সাত, বিকেলে জলে সাঁতারের নাম করে ঘণ্টাখানেক কাটানো, কিম্বা জুডো না ক্যারাটে কি যেন বলে, তাই শেখা, তারপর মাস্টারমশায়ের সামনে ঘণ্টা দুই বসে ঢুলুনি, এছাড়া ···"

কলাবতী আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দু হাত তুলে 'ব্যস, ব্যস' বলে উঠতেই সত্যশেখর গম্ভীর মুখে বলল, "কালুর জন্যও ডায়াট চার্ট দরকার।"

রাজশেখর দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে মুচকি হেসে বলেন, "তিনজনের জন্যই চার্ট হবে। খাওয়া একটা গুরুতর ব্যাপার। ঠিকমতো, ঠিক সময়ে, ঠিক পরিমাণ না হলে শরীরের জোর কমে যায়, রোগ জন্মায়। তাছাড়া রান্নার মতো ভোজনও একটা শিল্পকলা, দেখার মতো একটা জিনিস। যখন তখন হাবিজাবি এটা ওটা গেলা, ফেলে ছড়িয়ে পাতটাকে নোংরা করা, আগেরটা পরে পরেরটা আগে খাওয়া, আঙুলগুলোকে সাজিয়ে বাটি থেকে খাবার তোলা, থালায় মাখা, মেপে হাঁ করা, গ্রাস মুখে দেওয়া, তারপর চিবোনো, আহ্, দেখার মতো এসব ব্যাপার এইজন্যই তো লোকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ায়।"

রাজশেখর যতক্ষণ কথা বলে যাচ্ছিলেন, সত্যশেখর আর কলাবতী তার মধ্যে চোখাচোখি করে মুচকি হেসেছিল। স্ত্রী মারা যাবার পর থেকে প্রায়ই উনি নানান বাতিকের মধ্যে ঢুকে পড়েন, আর হাতের কাছে যাদেরই পান নাজেহাল করে ছাড়েন। কলাবতীর মায়ের অকালমৃত্যু এবং কলাবতীর বাবা দিব্যশেখরের সন্ন্যাস নিয়ে বাড়ি থেকে চলে যাওয়া তাঁকে যথেষ্ট আঘাত দিয়েছিল। এরপর তিনি নাতনিকে আশ্রয় করে নিজের জন্য আলাদা একটা জগৎ বানিয়ে ক্রমশই ছেলেমানুষ হয়ে যেতে থাকেন। বাবার বেদনা আর নিঃসঙ্গতা বুঝে সত্যশেখর তালে তাল দিয়ে প্রশ্রয় দিয়ে যায়। বিরাট বাড়িতে ছেলে আর নাতনি ছাড়া ঝি, চাকর, বামুন নিয়েই তাঁকে দিন কাটাতে হয়। তিনি যে এককালের দোর্দণ্ড আটঘরার জমিদারদের বংশধর, এটা কখনও ভোলেন না এবং তাঁর রাশভারিত্ব ও আভিজাত্য থেকে কখনও টলেন না।

সত্যশেখর ও কলাবতী নিজেদের মধ্যে মুচকি হাসার তিন দিন পরেই ডায়েট চার্ট অনুযায়ী কাজ শুরু হয়ে যায়।

সকালে খবরের কাগজে চোখ রেখে সত্যশেখর হাত বাড়িয়ে মুরারির কাছ থেকে চায়ের কাপ নিয়ে চুমুক দিয়েই চেয়ার থেকে তড়াক করে উঠে দাঁড়ায়।

"থানকুনি পাতার রস।"

মুরারির শান্ত সাদামাটা মুখে বা কণ্ঠস্বরে কোনোরকম বিকার ফুটল না ছোড়দার লাফ দিয়ে দাঁড়ানো বা 'ওয়াক ওয়াক' করতে দেখে। মুরারি এ বাড়িতে আছে আটত্রিশ বছর। ব্যাপার স্যাপার বোঝে।

"রাস্কেল, এই কি চা ?"

"না, এটা চা নয়। চা আসবে কাঁচা হলুদ, নিমপাতা, ভিজে ছোলা-আদার পর, অবিশ্যি কর্তাবাবু যদি মনে করেন।"

"মনে করেন মানে ?"

"এসব খেয়ে তোমার কেমন লাগল, কেমন ব্যাভার করলে, সেসব আমার কাছ থেকে শুনে তারপর ঠিক করবেন চা না দুধ না কালমেঘের রস, কোন্‌টা দেওয়া হবে।"

সত্যশেখরের চোখে জল এসে গেল। মুরারির দুটো হাত চেপে ধরে শুধু বলল, "আমাকে বাঁচাও।"

কলাবতীর হাতে থানকুনি রসের কাপ তুলে দিয়ে মুরারি পিরামিডের স্ফিঙ্কসের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে। গন্ধটা বারদুয়েক শুঁকে রসে আঙুল ডুবিয়ে কলাবতী জিভে ঠেকায়।

"উমম্, টেস্টটা খুব খারাপ নয়। মুরারিদা, এই বস্তুটি কাকা খেয়েছে ?"

"অদ্ধেক।"

কলাবতী এক ঢোঁকে রসটা খেয়ে নিল।

"দাদু খেয়েছে ?"

"সবার আগে।"

কাঁচা হলুদ, নিমপাতা, ছোলা-আদা পর্ব শেষ হবার পর, রাজশেখর দুজনকে ডেকে পাঠালেন, এবং হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন, "স্প্লেণ্ডিড ! ভাবতেই পারিনি তোরা এত সিরিয়াস হবি

হেল্‌থ সম্পর্কে। এই তো চাই। একটা ডায়েট চার্ট করছি। সকাল থেকে রাতের খাওয়া ওই চার্ট অনুযায়ী চলবে। কম খাবি, কিন্তু আসল জিনিসটা খাবি। এই যে চা খাওয়া, এতে কী লাভ। বরং বেলের পানা খাও।"

"অ্যাঁ, পানা! বাবা, সাতটায় আমার মক্কেল আসার কথা আছে, আজ আর্লি আওয়ারেই হেয়ারিং হবে, তাই...।"

"তাহলে যাও। মুরারি চেম্বারে ফল আর দুধ দিয়ে আসবে'খন।"

"চা দেবে না?"

চা শব্দটা রাজশেখর যেন এই প্রথম শুনলেন এমনভাবে দশ সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে বললেন, "কালমেঘের রস খুব উপকারী, চায়ের পর ওটা খেলে হজমে খুব সাহায্য করে।"

"না না, চায়ে আমার খুব একটা আসক্তি নেই।" বলতে বলতে সত্যশেখর প্রায় দৌড়ে চলে গেল।

"কালমেঘ দারুণ লাগে আমার।" কলাবতী এমনভাবে জিভে আওয়াজ করল যেন সর্ষে দিয়ে কাঁচা আমবাটা নাকের সামনে ধরা হয়েছে।

রাজশেখরের দুটি চোখ ঝকঝক করে উঠল। ছ'ফুটের দশাসই কাঠামোটা টানটান করে পেটে আলতো কয়েকটা চাপড় মেরে বললেন, "পেটই হচ্ছে স্বাস্থ্যের মূল ঘাঁটি। এটাকে জোরালো রাখতে হলে একটা রেজিমেণ্টকে যে রকম ডিসিপ্লিণ্ড হতে হয় সেই রকম হতে হবে খাওয়ায়। কালমেঘ, চিরেতা, ব্রাহ্মি শাক, ত্রিফলা এসব হচ্ছে বাংলার নিজস্ব জিনিস। ছোটবেলায় মা খাওয়াতেন, দ্যাখ্ আজও কেমন শরীরটা রয়েছে। সতুটা দিনদিন পেটুক হয়ে যাচ্ছে, শুনেছি কাঁচাগোল্লা খেতে নাকি মছলন্দপুর গেছল!"

সত্যশেখর সত্যিই গেছল এবং কলাবতীর জন্য প্রায় আধকিলো কাঁচাগোল্লা এনে দিয়েছিল। আর কলাবতীর কাছ থেকে ভাগ পেয়েছিল মুরারি। কিন্তু এ খবর তো দাদুর অজানা থাকারই কথা, তাই সে মনে মনে সাবধান হয়ে গেল।

"সত্যিই কাঁচাগোল্লা খুব বাজে জিনিস। লাখ টাকা দিলেও আমি খাব না। দাদুকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে কলাবতী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে খুঁজতে লাগল মুরারিকে। দোতলায় উঠোনের বারান্দা থেকে সে দেখতে পেল, মুরারি একটা গ্লাসের উপর রেকাবি বসিয়ে কাকার চেম্বারের দিকে যাচ্ছে। এক নজরে সে চিনতে পারল রেকাবিতে কলা, শশা, কমলালেবু, আঙুর আর গ্লাসে বোধহয় বেলের পানা।

"মুরারিদা, দাদু জানল কী করে কাকার কাঁচাগোল্লা খাওয়ার কথা?"

সত্যশেখরের ভীতিগ্রস্ত চাহনির নীচে রেকাবি আর গ্লাসটা টেবলে রেখে মুরারি ভারিক্কি চালে "এগুলো শেষ করো" বলে যখন ঘুরে দাঁড়িয়েছে, সেই সময় কলাবতী উত্তেজিত হয়ে চেম্বারে ঢুকল।

"তুমি বিট্রে করেছ।"

মুরারি আকাশ থেকে পড়ল। দু'হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, "মা কালীর দিব্যি, আমি কিচ্ছুটি বলিনি। বিশ্বাস করো, কত্তাবাবুকে আমি "

"হুম্‌ম্।"

সত্যশেখর টেবলে যে ঘুঁটিটা বসাল, তাতে মহম্মদ আলি নকআউট হয়ে যেতে পারে।

"এবার বুঝলুম কে আমার সম্পর্কে বাবার কাছে লাগায়। মুরারি..." সত্যশেখর রক্ত জল করা হুঙ্কার দিল চাপা গলায়, "পরশু তোকে পাঁচ টাকা দিয়েছিলুম ফেলুর দোকান থেকে রাধাবল্লভী আনতে। দশটার বদলে পেয়েছি আটটা, বাকি দুটো কী হল?

পয়সা মেরেছিস না খেয়েছিস মালাই বরফওলাকে ও-মাসের জন্য দিতে হবে বলে বাষট্টি টাকা নিয়েছিস অথচ আমার হিসেবে হচ্ছে বায়ান্ন টাকা। কী ভেবেছিস আমাকে ? গোরু ভেড়া না মন্ত্রী ? বাবাকে এবার বলে দেব, নির্ঘাত বলে দেব।"

"ছোড়দা, তাহলে মরে যাব।"

মুরারির চোখ দিয়ে টপটপ জল ঝরতে শুরু করল।

"কাঁদলে কী হবে, এবার দাদুকে বলে তোমারও ডায়েট চার্ট করাব, কালমেঘের রস, চিরেতার জল, গিমে শাক, ব্রাহ্মীশাক···।"

"এই কান মুলছি, এই নাক খত দিচ্ছি···"

মুরারি কুঁজো হয়ে টেবলের এক ধার থেকে অন্য ধার পর্যন্ত নাক ঘষড়ে গেল।

"কত্তাবাবুর সামনে মিথ্যে বলতে কেমন ভয় ভয় করে। তবু তো রেখে ঢেকে বলি, নইলে তুমি যে চেম্বারে মক্কেল বসিয়ে রেখে রাস্তায় গিয়ে মালাই বরফ খাও, তা কি কখনো বলেছি ?"

"বলবি কী করে, তুইও তো আমার সঙ্গে খাস্।"

"কাকা তো চেম্বারে, বরফওলাকে ডেকে আনে কে ?"

"আমি।"

আসামি অপরাধ কবুল করেছে, জজ এবার কী রায় দেবেন ! এমন একটা কৌতূহলী ভঙ্গিতে কলাবতী তাকাল কাকার দিকে। সত্যশেখর রিভলভিং চেয়ারে ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরাঘুরি করতে করতে "হুম্‌ম্···হুম্‌ম্" শব্দ করে যেতে লাগল চোখ বুজে।

"ছোড়দা, নিত্যানন্দে আটটার পর আর কিন্তু জিলিপি ভাজে না, শিঙাড়া সাড়ে আটটা পর্যন্ত।"

সত্যশেখর চোখ খুলে দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকিয়েই "অ্যাঁ, তাই তো," বলেই ড্রয়ার থেকে মানিব্যাগ বার করল।

"কত দেব ?"

"কালুও রয়েছে, টাকা দশেকই দাও। নরম বোঁদেও যদি দেখি···।"

টাকা নিয়ে মুরারি বেরিয়ে যাচ্ছিল, কালু হাত ধরে টানল।

"এগুলো কী হবে ?"

"ঠিক্। মুরারি, এই কলা, শশা, বেলের পানা··· সক্কালবেলায় এসব কী হবে ?"

বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে মুরারি গ্লাস তুলে চোঁ-চোঁ করে বেলের পানা খেয়ে ফেলল।

"ওগুলো এখানেই থাক, পরে এসে খেয়ে নেব।"

"না, এখুনি তোকে খেতে হবে।"

মুরারি কথা না-বাড়িয়ে মিনিট তিনেকের মধ্যে সব ফল কচমচ করে খেয়ে ফেলে রেকাবি আর গ্লাসটা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

একটু পরে রাজশেখর নাতনির কাছ থেকে জানলেন তাঁর ছেলে গোগ্রাসে সব ফল খেয়েছে আর এক চুমুকে বেলের পানা।

"ভাতের সঙ্গে উচ্ছে আর পেঁপে-সেদ্ধ, নিম-বেগুন, তারপর সুক্তো, মাগুর কিংবা শিঙ্গির ঝোল হবে মশলা ছাড়া, আনাজের খোসা একদম ছাড়ানো চলবে না। আর কম্পাল্সারি শাক, ডাঁটা, কচু কিংবা ওল কিংবা থোড় বা মোচা, বিচে কাঁচকলা, মাসকড়াই, গাজর, এইসবের একটা তরকারি আর টক দই। ভাজাভুজি একদম বন্ধ। একমাস পর দেখবি ডায়েট চার্ট ফলো করে লোহা চিবিয়ে তোরা হজম করে ফেলছিস।"

॥ দুই ॥

একমাস পর সেদিন রাত্রে কলাবতী খাওয়ার টেবলে এল বড় একটা খাম হাতে। রাজশেখর তখন চারখানি রুটি নিজের প্লেটে রাখছিলেন।

"মলয়াদি কতকগুলো ছবি দিলেন তোমায় দেখাবার জন্য।"

"কে মলয়া?" রাজশেখর গভীর মনোযোগে রুটিগুলোর প্রতি-মিলিমিটার যথোপযুক্ত সেঁকা হয়েছে কিনা পরীক্ষা করতে করতে অন্যমনস্কের মতো জানতে চাইলেন। অবশ্য মলয়াকে তিনি খুব ভালই চেনেন।

"আমাদের স্কুলের বড়দি, হেডমিস্ট্রেস মলয়া মুখার্জি।"

"হুঁ উ উ··· হরিশঙ্করের মেয়ে?"

"হ্যাঁ।"

এখানে এবার কিছু পূর্বকথা জানিয়ে রাখা দরকার। হুগলি জেলায় আটঘরা আর বকদিঘি নামে পাশাপাশি দুটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম আছে। দুই গ্রামের দুই জমিদার-বংশ সিংহ ও মুখুজ্যেদের মধ্যে আকচাআকচি প্রবল। সামান্য বা অসামান্য সব ব্যাপারেই উভয়ের মধ্যে রেষারেষি। জমিদারি প্রথা উঠে যাবার পর সেটা কেন্দ্রীভূত হয়েছে দুই গ্রামের মধ্যে বছরে একবার একটি ক্রিকেট ম্যাচকে উপলক্ষ করে। মহা ধুমধামে দুর্গোৎসবের মতো এই বাৎসরিক ম্যাচ হয়। এক মাস আগে থেকেই দুই গ্রামের ছেলে-বুড়ো-মেয়ে-পুরুষ টেনশ্যনে ভুগতে শুরু করে। প্রতিবার এই খেলায় একটা-না-একটা ঝঞ্ঝাট বাধেই, আর তাই নিয়ে হুলুস্থুলু পড়ে যায়।

আটঘরার জমিদারবাড়ির নাতনি কলাবতী বাংলার মেয়ে ক্রিকেট দলে খেলে। খুবই সম্ভাবনাময় ব্যাটসউওম্যান, টেস্টম্যাচ খেলার জন্য যে ডাক পাবেই তাতে সন্দেহ নেই। ওর খুবই ইচ্ছে, এবং রাজশেখরেরও, এই বাৎসরিক ম্যাচে খেলার। কিন্তু বকদিঘির অধিনায়ক পতু মুখুজ্যে সাফ জানিয়ে দেয়, কোনো মেয়েকে এই ম্যাচে তারা খেলতে দেবে না।

প্রাক্তন এম·পি·এবং বর্তমানে এম·এল·এ· গোপীনাথ ঘোষের ছেলে ব্রজদুলাল ওরফে দুলু গতবারের ম্যাচে আটঘরা দলে ছিল। খেলা শুরুর ঠিক আগে কলাবতীর পরামর্শে দুলু 'হঠাৎ' ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে ড্রেসিংরুমে শুয়ে থাকে। তার হয়ে ফিল্ড করে সাবস্টিটিউট হাবু ময়রার ছেলে বিশু। কিন্তু ব্যাটিংয়ের সময়, হাতে মাত্র দুটি উইকেট নিয়ে জয়ের জন্য আটঘরার যখন ১৭ রান দরকার, তখন ম্যালেরিয়ায় কাহিল দুলু ব্যাট হাতে নামে ফুলহাতা সোয়েটারে, মাফলারে এবং পানামা টুপিতে এমন ভাবে নিজেকে ঢাকাঢুকি দিয়ে যে, নাক আর চোখ দুটি ছাড়া তার আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। দুলুর ব্যাটিংই শেষ পর্যন্ত যখন জয় এনে দেয় তখন নন-স্ট্রাইকার ছিলেন ১১ রানে অপরাজিত রাজশেখর।

তবে এই জয়ে সত্যশেখরেরও অবদান ছিল। তেরোটি ওভারবাউণ্ডারি মেরে আচমকা একটা সেঞ্চুরি করে ফেলে সে রীতিমত নার্ভাস হয়ে যায়। আটঘরার জনতা মাঠের মধ্যে নেমে এসে তাকে কাঁধে তুলে নাচানাচি করে—এই বাৎসরিকীতে আগে কেউ সেঞ্চুরি করেনি। সুতরাং সেঞ্চুরিটি ঐতিহাসিক।

একটা বল হুক করার সময় দুলুর মাথা থেকে পানামা টুপিটা পড়ে গেছল। ফিল্ডাররা সবাই তখন বলের দিকে তাকিয়ে। সেই অবসরে দ্রুত টুপিটা কুড়িয়ে সে মাথায় পরে নেয়। বকদিঘি শিবিরে দর্শকদের মধ্যে ছিল হরিশঙ্কর এবং নিত্যসঙ্গী নিক্কন ক্যামেরাটি হাতে নিয়ে মলয়া। বহু ছবি সে ম্যাচ চলার সময় মাঠের চারপাশ ঘুরে-ঘুরে তোলে। বিশেষ করে সত্যশেখর ও ব্যাটসম্যান দুলুর।

ম্যাচশেষে পতু মুখুজ্যে আটঘরা শিবিরে এসে রাজশেখর সিংগির নাতনির খোঁজ করেছিল। কিন্তু কলাবতীকে পাওয়া যায়নি। তবে ড্রেসিংরুমে আপাদমস্তক মুড়ি দেওয়া ম্যালেরিয়ায় কাহিল দুলুকে কোঁকোঁ আওয়াজ করে কাঁপতে দেখা গেছল। পতু মুখুজ্যেকে অবশ্য বেশি কথা বলতে দেয়নি আটঘরা গ্রাম পঞ্চায়েত

প্রধান পটল হালদার। তবে পতু বলে গেছল সে ছবি দিয়ে প্রমাণ করে দেবে, গোপী ঘোষের ছেলে দুলুর বদলে রাজশেখর সিংগির নাতনি কালু ব্যাট করেছে। পটল হালদার তখনই ঘোষণা করে সত্যশেখরের সেঞ্চুরিকে স্মরণীয় করে রাখতে সে একটা স্তম্ভ গড়ে দেবে।

রাজশেখর রুটি পরীক্ষা শেষ করে মুচকি হেসে বললেন, "কিসের ছবি ?... তুই ব্যাট করেছিলি তারই প্রমাণ ?"

কলাবতী ঘাড় নাড়ল। দেয়াল-ঘড়িতে দশটা বাজছে। সত্যশেখর একতলা থেকে এইসময় উঠে এল। রাজশেখরের শেষ কথাটি কানে যাওয়ায় কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করল, "প্রমাণ ! কিসের প্রমাণ ?"

কলাবতী খামটা থেকে একগোছা রঙিন ছবি বার করল। কয়েকটা দিল দাদুকে, কয়েকটা কাকাকে।

"হরির মেয়ের হাত দেখছি খুবই পাকা, ছবিগুলো ভালই এসেছে।" রাজশেখরের চোখে তারিফ ফুটে উঠল। রুটিতে যতটা মনোযোগ দিয়েছিলেন, ছবিগুলোয় ততটাই দিলেন।

"হাত পাকা হবে না কেন, বিলেতেই তো ক্যামেরা কিনে শুরু করে। এতদিনে হাত পাকবে না !" সত্যশেখর হাতের ছবিগুলো টেবলে সাজিয়ে রাখল। এইসময় বারান্দার দিকের দরজায় মুরারির মুখ উঁকি দিতে দেখা গেল। সত্যশেখরের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সে হাত নাড়ছে।

"কাকা, এই ছবিটা কেমন ?"

কলাবতী একটা ছবি নিজের মুখের কাছে ধরল। সত্যশেখর ছবি দেখার জন্য মুখ তুলতেই সে চোখের ইশারায় মুরারিকে দেখিয়ে দিল। সত্যশেখর তাকাতেই মুরারির হাতছানি দেখে বোঝা গেল জরুরি কিছু বলার আছে।

"ওহ্হো, দেখেছ, ড্রয়ারে চাবি দিয়ে আসতে ভুলে গেছি।"

সত্যশেখর ব্যস্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বারান্দার অন্ধকার কোনায় গিয়ে সে বলল, "কী হল, ডাকছিস কেন ?"

"বলতে একদমই ভুলে গেছি, আজ সকালে তোমাকে কালমেঘ দিইনি, কত্তাবাবু বারণ করিছে। মাঝে-মধ্যে সব বন্ধ থাকবে। ডাট চাট অনুযায়ী খাওয়া দাওয়া হঠাৎ বন্ধ রেখে কত্তাবাবু পরীক্ষা করবেন, তোমাদের খাওয়ার বহর কমিছে কি না, তোমাদের নোলা ঠিকঠাক তৈরি হইছে কিনা।"

"আজ সকালে তাহলে আমাকে কালমেঘের রস দিসনি ? মানে খাইনি ?"

"না।"

"কাঁচা হলুদ

"ওসব কিচ্ছু খাওনি।"

"কাল রাতে ইসবগুলও খাইনি তো ?"

"না, তাও নয়।"

"কী ভাবে নোলা পরীক্ষা করবেন ?"

"গাড়ি নিয়ে আজ বেইরেছিলেন। রয়েলের চাপ, সাবিরের রেজালা, মাধবের ঝাল আলুদ্দম, বিজলীর ফিশ ওর্লি, অম্বরের তন্দুরি চিকেন, অনাদির মোগলাই পরোটা, অমৃতের দই, নকুড়ের কড়াপাক ..."

"থাম্ থাম্।"

"আরো আছে যে তপসে ভাজা, ভাপা ইলিশ।"

"মরে যাব উফ্ফ, মরে যাব।"

"সামনে থাকবে কিন্তু খাবে না, খেয়েছ কি ডাট চাট লম্বা হয়ে যাবে। তুমি কালুকে জানিয়ে দাও এখুনি।"

"এখন কী করে বাবার সামনে জানাব, আগে বলতে হয় তো, পাঁঠা কোথাকার।"

"ইশারা করে করে মানা করে দিও, কালুর খুব বুদ্ধি আছে, ধরে ফেলবে।"

সত্যশেখর পাংশু নার্ভাস অবস্থায় ফিরে এসে চেয়ারে বসল। কলাবতী জিজ্ঞাসু কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে দেখে সত্যশেখর বাবার দিকে চোখের ইশারা করে, মুখের কাছে আঙুল দিয়ে গ্রাস তুলে মাথা নেড়ে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করতে যাচ্ছিল, তখন রাজশেখর ছবি থেকে চোখ তুলে বেশ জোরেই হেসে উঠলেন। কলাবতী কাকার ইশারার মাথামুণ্ডু বুঝতে না পেরে খুবই ধাঁধায় পড়ে গেল।

"মেয়েটা টিপিক্যাল হরির মতোই হয়েছে বটে। সিংগিদের কী করে জব্দ করা যায় সেটা খুব ভালই শিখে গেছে।"

"এজন্য তো কাকাই দায়ী। কাকাই তো বড়দিকে খেপিয়ে দেয় জিভ দেখিয়ে।"

"আমি, কক্ষনো না ! লাস্ট ওকে জিভ দেখিয়েছি নাইন্টিন সিক্সটি সেভেনে, বিলেতে। তারপর ওর সঙ্গে আমার দেখা এই ক্রিকেট ম্যাচে।"

এখানে আবার একটা পূর্ব কথা বলে রাখা দরকার।

সত্যশেখর আর মলয়া তাদের বাবাদের মতোই বাল্যবয়স থেকেই পরিচিত। দুজনের যত ভাব, তত ঝগড়া। অবশ্য ঝগড়ার কারণগুলোর প্রত্যেকটাই ঠিক তাদের বাবাদের মতোই বংশগত মানমর্যাদাকে কেন্দ্র করে। দুজনের দেখা হলেই ওদের মধ্যে বুনো ওলের সঙ্গে বাঘা তেঁতুলের মতো একটা সম্পর্ক দেখা দেয়। সত্যশেখরের ছোটবেলার অভ্যাস জিভ দেখিয়ে মলয়াকে রাগিয়ে দেওয়া। চুলে পাক ধরলেও সে আজও অভ্যাসটা ছাড়তে পারেনি। ব্যারিস্টার হবার জন্য সে যখন বিলেত যায়, মলয়াও তখন সেখানে শিক্ষা ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ে পড়াশুনো করতে গেছল। দুজনের প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ হত, এবং সাক্ষাৎগুলি অবশ্যম্ভাবী পরিণত হত ঝগড়ায়। একজন যদি বলে সূর্য পশ্চিমদিকে ওঠে তাহলে অন্যজন অবধারিত বলবে, 'কিন্তু অস্ত যায় উত্তরে।' দুজনে প্রায় একই সময়ে দেশে ফিরে আসে। একজন এখন প্র্যাকটিস করছে কলকাতা হাইকোর্টে আর অন্যজন কাঁকুড়গাছিতে মেয়েদের স্কুলে হেডমিস্ট্রেস এবং সেই স্কুলেই কলাবতী পড়ে। ছিপছিপে, চল্লিশের কাছাকাছি অবিবাহিতা বড়দি যে কালুকে একটু বেশিই স্নেহ করেন, এটা স্কুলের মিশির থেকে টিচার্স-রুমের প্রত্যেকেই জানে।

রাজশেখর একটা ছবি তুলে বললেন, "সতুকে যখন কাঁধে তুলে নাচছিল, তখন যে ওর জিভটা বেরিয়ে গেছল সেটা কি লক্ষ করেছিলিস কালু ?"

"তখন কেমন যেন মনে হয়েছিল কাকা একবার না একবার জিভ বার করবেই। বড়দির হাতে ক্যামেরা অথচ কাকার জিভ শান্তশিষ্ট, তাই কখনো হয় !"

সত্যশেখরের হঠাৎ বিষম লাগায় দুজনে মুচকি হাসল।

"দাদু, এই ছবিটায় কি বোঝা যাচ্ছে এটা আমিই ?"

রাজশেখর ঝুঁকে পড়লেন কলাবতীর হাতের ছবিটার উপর। সেই অবসরে সত্যশেখর আবার ইশারা করে বোঝাতে চাইল খাবার-দাবার সম্পর্কে খুব সাবধান, এখনি ডায়েট চার্টের প্রতিক্রিয়া জানার পরীক্ষা হবে, লোভ দমন করতে হবে। কিন্তু এবারও কলাবতী ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে আরও বিভ্রান্ত হয়ে গেল।

"কালু, তোর নাকটাই যা গোলমাল করছে। গোপী ঘোষের ছেলের নাক কি এত টিকোলো ?" রাজশেখর চোখ তুলে নাতনির নাক দেখতে গিয়ে ভ্রূ কোঁচকালেন। "কালু, মুখটা অমন করে আছিস কেন, পেট কামড়াচ্ছে ? বাইরে কিছু খেয়েছিস নিশ্চয় ?"

"কিচ্ছু খাইনি তো, শুধু-শুধু পেট কামড়াবে কেন !"

"কালুর বোধহয় খুব খিদে পেয়েছে। আচ্ছা বাবা, থানকুনি

পাতার রসে কি খিদে বাড়ে ?"

"নিশ্চয় । তা ছাড়া পেট ঠাণ্ডা রাখে, অম্বল-টম্বল হয় না ।"

"তাই । আমার ইদানীং যা খিদে বেড়েছে কী বলব । কাঁঠালের বিচি আর ওল-ভাতে যে এত টেস্টফুল, কচুর মুখি যে এত প্যালেটেবল, জানতামই না । বোধহয় নিমপাতা আর কাঁচা হলুদের অ্যাকশন, তাই না ?"

"হতে পারে ।" রাজশেখর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন । ঘাড় বেঁকিয়ে তিনি দরজার দিকে তাকাতেই অপেক্ষমান মুরারি এগিয়ে এল ।

"সব রেডি আছে, আনব কি ?"

"হ্যাঁ, এদের খুব খিদে পেয়েছে মনে হচ্ছে ।"

মুরারি বেরিয়ে যাবার সময় করুণভাবে একবার সত্যশেখরের দিকে তাকিয়ে গেল ।

"দাদু এই ছবিটা দিয়ে কি প্রমাণ করা যাবে আমিই খেলেছি ?" কলাবতী একটা ছবি তুলে শূন্যস্থান পূরণের মতো টেবলে খাবার এসে পৌঁছবার আগের সময়টা ভরাট করার জন্যই বলল ।

"ডিফিকাল্ট, ভেএরি ডিফিকাল্ট । দুলু আর কালু দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায় এক । তা যদি না হত, তাহলে সেদিনই ধরা পড়ে যেত । তবে এই ছবিটা দিয়ে পতু মুখুজ্যে হয়তো জল ঘোলা করার চেষ্টা করবে । তা এখানে তো একজন আইনজানা লোক রয়েছে, সে কী বলে ?"

রাজশেখর ভ্রূ তুলে ব্যারিস্টার ছেলের দিকে ট্যারা চোখে তাকালেন ।

সত্যশেখর দু'বার কেসে বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে কপালে টোকা মারতে মারতে প্রচণ্ড গম্ভীর হবার জন্য বারো সেকেণ্ড সময় নিল ।

"আইন বলতে এখানে ক্রিকেটের আইন ।" সত্যশেখর ফিল্মি ব্যারিস্টারদের মতো কাল্পনিক একটা চশমা চোখ থেকে খুলে ফেলার ভঙ্গি করল । "ইয়েস, ক্রিকেটের আইন আমি দেখেছি । কোথাও লেখা নেই যে, মেয়েরা খেলতে পারবে না পুরুষদের টিমে ।"

"বাট, এটা তো ক্রিকেটের একটা সাধারণ আইন । কিন্তু প্রত্যেক টুর্নামেন্টেরই কিছু নিজস্ব আইন তো থাকে ।" রাজশেখর প্রায় চিফ জাস্টিসের মেজাজে কথাটা বললেন । প্রসঙ্গত, গত কুড়ি বছরে তিনজন চিফ জাস্টিসের সঙ্গে তাঁর তুই-তোকারির সম্পর্ক ছিল ।

"হ্যাঁ, থাকে । কিন্তু এক্ষেত্রে কি কোনো লিখিত আইন আছে এই ম্যাচ সম্পর্কে ?"

রাজশেখর কয়েক সেকেণ্ড ভেবে নিয়ে মাথা নাড়তে লাগলেন ।

"না, আই অ্যাম শ্যুওর, কোনো লিখিত আইন নেই । শুধু কনভেনশনের উপর খেলা চলে আসছে । আর কনভেনশন তো যে-কোনো সময় ভাঙা যায় ।"

"কিন্তু তার একটা কারণ থাকা দরকার । ইচ্ছেমতো যখন খুশি তো প্রথা ভাঙা যায় না । কালু ইচ্ছে করলেই স্পোর্টিং ইউনিয়ন বা কালীঘাটের হয়ে কি লিগ ক্রিকেট খেলতে পারবে ? যদিও ওর যোগ্যতা আছে ।"

কলাবতী লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠতে পারল না যেহেতু তার গায়ের রঙ কালো । শুধু হাত তুলে বলল, "আচ্ছা আচ্ছা, খুব হয়েছে । ভারী তো খেলি ।"

"তোমার কথাটা ঠিকই, যখন খুশি প্রথা ভাঙা যায় না, কিন্তু আমি, তুমি আর কালু তিনপুরুষ একটা ম্যাচে খেলবে এটা কি একটা স্পেশাল অকেশন নয় ? এটা তো একটা গৌরবের ব্যাপার, এক্ষেত্রে কি..."'

মুরারি এবং তার পিছনে আরও দুজন, বলরাম আর অপুর মা, প্রত্যেকের হাতে নানান আকারের নানান গড়নের চিনেমাটির, স্টিলের, কাঁচের ও কাঁসার পাত্র দু'হাতে ধরা । একটার উপর আর একটা—কুতব মিনার, শহিদ মিনার, একটা তো পিসার হেলানো টাওয়ারের মতো ।

টেবলের অর্ধেকটাই ভরে গেল । ঝুঁকে রাজশেখর প্রত্যেকটা থেকে ঢাকনা তুলে নিতে নিতে জোরে নিশ্বাস টেনে, "আহ্হ্হ্" বলে মাথা নাড়তে লাগলেন । কখনও বললেন, "ডিলিশাস", কখনও "আহ্, মার্ভেলাস ।"

সত্যশেখর করুণ চোখে খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল । কলাবতীর চোখ উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে । বেরিয়ে যাবার সময় মুরারি দুঃখভরা বিষণ্ণ চোখ সবার মুখের উপর বোলাল ।

"দাদু, এসব কী, অ্যাঁ, অ্যাত্তো কই বলোনি তো আগে !"

"আগে বললে কি এমন মিষ্টি-অবাকটা পেতিস ? আগে ভাজা দিয়ে শুরু, তুলে নে যত খুশি । মানিকতলা বাজারে টাটকা তপসেটা পেলাম, ইলিশটা শোভাবাজারের । কই, সতু, তোল্ তোল্ ।"

সত্যশেখরের মুখটা দ্রুত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মতো হয়ে গেল । খুবই শান্ত ভঙ্গিতে বলল, "নাহ্, এসব খাবার দেখলেই এখন গা গুলিয়ে ওঠে । মুখরোচক নিশ্চয়ই, কিন্তু পেটের পক্ষে একদমই ভাল নয় ।"

শুনতে শুনতে রাজশেখর খুশিতে বারদুয়েক মাথা ঝাঁকালেন ।

"কাকা, কী বলছ তুমি ! এই তো কদিন আগে ..." কলাবতী থেমে গেল সত্যশেখরের কটমট চাহনি দেখে । তারপর বলল, "না খাও না খাবে, আমি কিন্তু খাব ।"

সত্যশেখর প্রচণ্ড অনিচ্ছায় বেগুনির মতো দেখতে ফিশ ওর্লির আধখানা আর ইলিশের পেটি থেকে একচিমটে ভেঙে নিল । তপসে ছুঁলই না । আলুর দমের একটা আলু মুখে দিয়েই "ওরে বাবা কী ঝাল" বলে ফেলে দিল । আর রেজালার মাংসে লাগা ঝোল রুটি দিয়ে চেঁছে ফেলে তবেই মুখে ঠেকাল ।

নিম টুথপেস্ট

শক্ত দাঁত ও সুস্থসবল মাড়ির জন্যে একটি প্রাকৃতিক উপায়

শত শত বৎসর ধরে নিমের দাঁতনই ছিল দাঁতের যত্নের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রাকৃতিক উপায়। এতে দাঁত শক্ত হত ও মাড়ি
থাকত সুস্থসবল।

৬২ বছর আগে, ক্যালকাটা কেমিক্যাল নিমের প্রাকৃতিক গুণটুকু নিয়ে তৈরি করেছে একটি টুথপেস্ট···নিম—ভারতের প্রথম ভেষজ গুণেভরা টুথপেস্ট।

আর এখন, নতুন নিম টুথপেস্টে আছে বাড়তি ফেনা···এর ফলে নিমের ভেষজ ও তেলের জীবাণুনাশী শক্তি আরো সক্রিয়ভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাছাড়া এতে একটি নতুন সুবাস থাকার ফলে মুখে একটি তরতাজা অপূর্ব স্বাদ অনুভব করা যায়।

পৃথিবীর প্রথম ভেষজ টুথপেস্ট। ভারতে এর জন্ম ৬০ বছর আগে

9290A/14BEN

"এত তেল-মশলা-ঘি, পেটের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর।" সত্যশেখর তার বাবার সামনে থেকে রেজালার পাত্রটা সরিয়ে নিয়ে বলল. "বাবা,এসব তুমি খেও না, বরং তন্দুরি চিকেনটা নাও, ওতে ঘি-মশলা নেই

রাজশেখর বিস্ময় চাপতে চাপতে আনন্দে প্রায় কেঁদে ফেলার মতো অবস্থায় পৌঁছে গেছেন। কলাবতী রেজালা শেষ করে আঙুলগুলো চাটতে চাটতে মটন চাপের প্লেটটার দিকে তাকিয়ে বলল, "দাদু তুমি যে রয়্যালের গল্প করতে, সেখান থেকেই কি এনেছ?"

"নিশ্চয়, এখনও সেই টেস্ট, সেই ফ্লেভার।"

"কাকা যদি না খায়··· খাবে তুমি?"

সত্যশেখর সভয়ে সঘৃণায় মাথা নাড়ল।

"তাহলে আমাকে সবটা দাও।"

রাজশেখর ভ্রূ তুলে গম্ভীরভাবে কলাবতীর দিকে পুরো প্লেটটাই এগিয়ে দিলেন। সত্যশেখরের করুণ চোখ যেন বলে উঠল কালু করছিস কী? এই চাপ যে পরে চাপচাপ কচু, ওল, উচ্ছে, ঢ্যাঁড়স, কাঁচাপেঁপে হয়ে টেবলে ফিরে আসবে।

কলাবতীও অবাক হয়ে যাচ্ছে খাওয়ার প্রতি কাকার অরুচি দেখে। যে-সব জিনিস টেবলে সাজানো রয়েছে, কাকার তো ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা। প্রত্যেকটাই ওর প্রিয় খাদ্য, অথচ কেমন মনমরা হয়ে রয়েছে। দু আঙুলে চিমটি দিয়ে তুলে কোনোরকমে জিভে ঠেকিয়েই ফেলে দিচ্ছে, যেন নিম বা উচ্ছে। দিন পাঁচেক আগে কোর্ট থেকে ফেরার সময় নিজামের আঠারোটা শিককাবাব আর দশটা পরোটা এনে মুরারিকে দিয়ে গরম করিয়ে গ্যারাজে মোটরের মধ্যে বসে কাকা একাই বারোটা শিক আর সাতটা পরোটা শেষ করার পর চেম্বারে গিয়ে বসে। বাকিগুলো ছিল তার আর মুরারির জন্য। অথচ পাঁচদিনের মধ্যেই কী পরিবর্তন হয়তো আজ জজের কাছে ধমক খেয়েছে, মন খারাপ, কিংবা ফেরার পথে গাঙ্গুরাম বা গোল্ডেন ড্রাগন কি ওয়ালডর্ফে ঘুরে এসেছে।

সত্যশেখর একটার পর একটা প্লেট ঠেলে সরিয়ে দিল, আর কলাবতী সেগুলো টেনে নিল। দই আর কড়াপাক যখন এল, কলাবতীর তখন আইঢাই অবস্থা।

"কতদিন পর এমন দারুণ দারুণ জিনিস উফ।"

কলাবতী হাঁফাচ্ছে। কপাল থেকে দরদর ঘাম চিবুকে নেমে এসেছে। সিলিং পাখার দিকে তাকিয়ে হাওয়াটা মুখে লাগাতে লাগাতে বলল, "দাদু, তোমার ডায়েট চার্ট ফলো করতে-করতে কাকার খিদে মরে গেছে, আর আমার খিদে বেড়ে গেছে।"

"মোটেই আমার খিদে মরেনি।" সত্যশেখর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে দই আর কড়াপাকের দিকে সেইভাবে তাকাল, বাউন্সার-হুক-করা ব্যাটসম্যানের প্রতি ফাস্ট বোলার যে-ভাবে তাকায়।

"আসলে স্বাস্থ্যকর, পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে খেয়ে আমার এখন অন্য কিছু, বিশেষত ভাজাভুজি, ঝালঝোল, মশলা দেওয়া কিছু আর মুখে তুলতে ইচ্ছে করে না। বাঙালিরা এই সব খায় বলেই তো যত রাজ্যের পেটের রোগে ভোগে, অকালে বুড়িয়ে যায় আর অল্পবয়সে মারা যায়, তাই না বাবা?"

"তার থেকে বড় কথা, সতু," রাজশেখর এক কেজি ভাঁড় থেকে এক চামচ দই তুলে প্লেটে রাখতে রাখতে বললেন, "খারাপ স্টমাক নিয়ে পরিশ্রম, চিন্তা, কল্পনা কোনোকিছুই করা যায় না, তাই তো বাঙালি ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে।"

রাজশেখর দইয়ের প্লেট নাতনির দিকে এগিয়ে দিলেন। সত্যশেখরের মুখ কুঁকড়ে গেল। জিভ দিয়ে গত আধঘণ্টায় ষোড়শতম ঠোঁট-চাটা শেষ করে সে কাতর চোখে ভাইঝির দিকে চেয়ে রইল।

"খাওয়া মরে গেছে বললে ভুল হবে, সুষম খাদ্য মানে ব্যালান্সড ডায়েটের জন্য খিদেটাও ব্যালান্সড মানে পরিমিত হয়ে গেছে। বাবা, কালুর খিদেটা অপরিমিত হল কেন বলো তো

"হুম্‌ম্‌, সেটাই তো বোঝার চেষ্টা করছি। এবার বোধহয় ওর কালমেঘের ডোজটা বাড়াতে হবে, সেইসঙ্গে এককাপ করে আনারস-পাতার রসের সঙ্গে তুলসীপাতার রস, দুবেলা। বাগানের যেদিকটায় কালুর জন্য প্র্যাকটিস পিচ করব ভাবছি, তার পিছনে দেয়াল ঘেঁষে আনারস আর তুলসী গাছ লাগাব।"

"দাদু, খিদে হওয়াটা তো হেলথেরই লক্ষণ, পাকযন্ত্র যে দারুণ ফর্মে আছে, সেটাই তো প্রমাণ করছে পারফরম্যান্স দিয়ে। কোথায় তুমি প্রশংসা করবে, তা না, ডোজ বাড়াবার কথা বলছ!"

কলাবতী রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়ে খাব্‌লা দিয়ে দই তুলে মুখে ভরল।

"একগাদা খাওয়াকে পারফরম্যান্স বলে না।" রাজশেখর ন্যাপকিনে গোঁফের দই মুছলেন। সন্দেশের প্লেটটা ছেলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "গাওস্কর গাদাগাদা রান করেছে, কিন্তু সেভেন্টি ফাইভে মাদ্রাজে বিশ্বনাথের নট আউট নাইন্টিসেভেন অন এ ফায়ারি পিচ এগেনস্ট এ ডেডলি অ্যান্ডি রবার্টস, একেই বলে পারফরম্যান্স। এই এখন, সতু যেভাবে বেছে বেছে খাবার চুজ করল, পিক করল, এ তো বিশ্বনাথের ইনিংস। কী বিস্ময়ের সঙ্গে, ক্যাজুয়ালি অথচ কত প্রচণ্ডভাবে তন্দুরি চিকেনের শুধু পিছনের একটা ঠ্যাং ছিঁড়ে নিয়ে পরিচ্ছন্নভাবে খেল, যেন পারফেক্ট একটা বিশ্বনাথ-ফ্লিক টুয়ার্ডস মিড উইকেটে। অফ স্টাম্পের ওপর আউটসুইঙ্গারটা নিখুঁত হিসেব কষে ছেড়ে দেওয়ার স্টাইলে রেজালার ঝোলটা কেমন ছেড়ে দিল! তপসে ভাজাটাকে তো লাস্ট মোমেন্ট পর্যন্ত দেখে নিয়ে ডেড ব্যাটে নামিয়ে দিল। নকুড়ের কড়াপাক মানে র‍্যাঙ্ক লংহপ। দ্যাখো কী এলিগ্যান্টলি পরপর দুটোকে ডেসপ্যাচ করল পয়েন্ট বাউণ্ডারিতে।"

রাজশেখর যতক্ষণ ধরে তাকে পারফরম্যান্স বোঝাচ্ছি কলাবতী তার মধ্যেই গোটা ছয়েক সন্দেশ শেষ করে ফেলল সত্যশেখরের লোলুপ চাহনি অগ্রাহ্য করে।

"সত্যি দাদু, কাকার স্টাইল, এলিগ্যান্স, ক্যাজুয়াল অ্যাপ্রোচ সব কিছুরই তুলনা একমাত্র বিশ্বনাথ। আমি কিন্তু গাওস্কর ভাল ব্যাটিং উইকেট পেলে গপাগপ রান তুলব।" চেয়ার থেকে উঠে হাত ধোবার জন্য বেসিনের দিকে যেতে-যেতে কলাবতী একটু যোগ করল, "কিন্তু খিদে হওয়াটা যে হেলথেরই লক্ষণ এটাকে তোমার অস্বীকার করা উচিত হবে না।"

তখন রাজশেখর মুখ ফিরিয়ে দেখলেন তাঁর ছেলে তাকিয়ে আছে টেবলে ছড়ানো খালি পাত্রগুলোর দিকে। তার চাহনি ছলছলে, জিভটা ঠোঁটের উপর তুলির মতো বোলাচ্ছে, একটা ভারী দীর্ঘশ্বাস আটকে থাকায় মুখটা লাল।

"তোর এমন বিচক্ষণতা আগে কখনও দেখিনি সতু, কিপ আপ্ বয়, কিপ্ আপ্।"

॥ তিন ॥

গোপীনাথ ঘোষের মেয়ের বিয়ে। আটঘরা, বকদিঘির বহু লোককেই তিনি নিমন্ত্রণ করতে ইচ্ছুক, বিশেষত বাৎসরিক ক্রিকেট ম্যাচের খেলোয়াড় এবং আয়োজকদের। এই ম্যাচ উপলক্ষেই তো তাঁর আম্পায়ারিং সিদ্ধান্ত হৈচৈ ফেলে তাঁকে বিখ্যাত করে দিয়েছে। সুতরাং সবাইকে একসঙ্গে জড়ো করে আপ্যায়িত করার এই সুযোগটা তিনি হাতছাড়া করতে চান না।

রবিবারের সকালে তিনি এবং পুত্র দুলু, হাতে একগোছা নিমন্ত্রণপত্র আর ঠিকানা লেখা একটা ফর্দ নিয়ে গাড়িতে চেপে

বেরিয়েছেন। একদিনেই সব সেরে ফেলবেন, তাই প্রথমেই গাড়ির ট্যাঙ্ক পেট্রলে ভরে নিলেন। তাঁর হিসেব ছিল প্রতিটির জন্য আট মিনিট সময় দিয়ে একদিনে গড়ে পঁচাত্তরটি হিসেবে দুশো পঁচিশজনকে নিমন্ত্রণ তিনদিনে সারবেন। তারপর গাড়ি নিয়ে বেরোবেন দুলুর মা আত্মীয়স্বজনদের নিমন্ত্রণ করতে।

গোপী ঘোষ তেত্রিশতমটি পর্যন্ত গড় ঠিক রেখে বকদিঘির হরিশঙ্কর মুখুজ্যের কাছে গিয়ে স্টাম্পড হলেন। সেখানে আধঘণ্টারও বেশি সময় দিয়ে সোজা এলেন আটঘরার জমিদারবাড়িতে।

রাজশেখর তখন বাগানে বকুলগাছ তলায় টুলে বসে প্র্যাকটিস পিচ তৈরি করার তদারকিতে ব্যস্ত। দড়ি দিয়ে ঘিরে রাখা ১০×৬ ফুট জমি মুরারি কোদাল দিয়ে সকালেই কুপিয়েছে। এখন বলরাম কোপানো জমি থেকে অবাঞ্ছিত বস্তু বাছাইয়ের কাজে ব্যস্ত। রাজশেখরের তীক্ষ্ণ নজর এই কাজের উপর। একটু দূরে দু'বালতি গোবর পড়ে রয়েছে।

"বলরাম, প্র্যাকটিস পিচ ইজ দ্য মোস্ট ভাইটাল থিং ইন দ্য মেকিং অফ এ ক্রিকেটার। এখান থেকেই ব্যাটসম্যান গড়ে ওঠে, পিচের বাউন্স যদি অসমান হয়, পিচে যদি একটা সর্ষেদানার মতোও কাঁকর থাকে..." রাজশেখর একটা অ্যাম্বাসাডারকে ফটক দিয়ে ঢুকতে দেখে কথা বন্ধ করলেন।

একটু পরেই মুরারি এসে গোপীনাথ ঘোষের আগমন-বার্তা জানাল।

"বসিয়েছিস?...শরবত দে।"

মিনিট পাঁচেক বাদে রাজশেখর বৈঠকখানায় এলেন। গোপী ঘোষ আর দুলুর হাতে কাঁচা আমের শরবতের গ্লাস। সত্যশেখর কথা বলছে ওদের সঙ্গে।

"আরে গোপীবাবু যে, কী সৌভাগ্য আমার... বসুন বসুন...বোসো খোকা। তারপর?"

"আমার বড়মেয়ের বিয়ে এই সামনের আঠাশে, অনুগ্রহ করে আপনাকে পায়ের ধুলো দিতে হবে।" গোপী ঘোষ জোড়হাতে নিবেদন করলেন।

"কিন্তু বিয়েবাড়ি যাওয়া তো আমি অনেকদিনই বন্ধ করেছি।"

"বাবা, সেই কথাই তো আমি ওঁকে বলছিলাম যে, গত পঁচিশ বছর আপনি কোনো বিয়েবাড়িতে যাননি।"

"তা না যান, আমার মেয়ের বিয়েতে কিন্তু যেতেই হবে। এই তো একটু আগে হরিশঙ্করবাবুও বললেন তিনি কোথাও যান না। সবাই যদি না যান বলেন ...মতি, নন্তু, পরমেশ ওইদিনই ওদের নেমন্তন্ন আত্মীয়বাড়িতে, কেউই আসতে পারছে না, হরিশঙ্করবাবুও..."

"কে? হরিশঙ্কর...হরি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বকদিঘির।"

"কতদিন যায় না বলেছে?"

"তা জিজ্ঞেস করিনি।"

"করে আসুন। খাওয়ার নেমন্তন্ন পেলে ওই পেটুকটা যাবে না আবার? বুঝলি সতু..."

এই সময় কলাবতী বৈঠকখানার পাশ দিয়ে বাড়ির ভিতরে যাচ্ছিল। দুলুকে দেখতে পেয়ে সে থমকে দাঁড়াল। তারপর ঘরে ঢুকে "হাই" বলে সে কাকার পাশে বসল।

"সেই ম্যাচের পর এই প্রথম দেখা...সেদিন আমরা চলে আসার পরেই নাকি মাঠে খুব ঝঞ্ঝাট হয়েছিল?" কলাবতী জিজ্ঞাসা করল দুলুকে।

"ঝঞ্ঝাট তো বাধালে তুমিই। এমন প্যাঁচে ফেললে যে আমায় ম্যালেরিয়ার রুগি সেজে কাঁপতে হল সারাক্ষণ বকদিঘির লোকেদের দেখিয়ে। তার উপর লাঞ্চটাও খেতে পেলাম না। তিনদিন গায়ে ব্যথা ছিল শরীর কাঁপাতে গিয়ে।"

"সরি, ভেরি সরি। কিন্তু ড্রেসিংরুমে যে বেঞ্চে তুমি শুয়ে ছিলে তার তলায় একটা রসগোল্লার হাঁড়ি লাঞ্চের পর চুপিচুপি রেখে এলাম যে? তাতে তো গোটা পনেরো অন্তত ছিল।"

"মাত্র পনেরোটায় কিছু হয়?"

"কারেক্ট, ঠিক বলেছ, ওইটুকু-টুকু পিং পং বল সাইজের রসগোল্লায় কী হয়? সাইজ হবে এইরকম ডিউজ বলের মতো।" প্রবল উৎসাহে সত্যশেখর ডান হাতের তালু দিয়ে আকারটা বোঝাল। "তাহলে ওভারবাউণ্ডারি হাঁকিয়ে সুখ আছে। হাফভলিতে আঙুলে তুলবে আর টকাস করে মুখে ফেলবে।"

বিরাট হাঁ করে সত্যশেখর কাল্পনিক রসগোল্লাটা মুখের মধ্যে ফেলতে গিয়ে চোখাচোখি হল রাজশেখরের সঙ্গে। হাতটা ধীরে-ধীরে নেমে এল আর গলা দিয়ে অস্ফুট আর্তনাদের মতো বেরিয়ে এল, "রসগোল্লা কিন্তু আমার একদমই ভাল লাগে না।"

"সিংগিমশাই, তাহলে আপনি কিন্তু আসছেন।"

"হরি শেষ পর্যন্ত কী বলল, আসবে?"

"জিজ্ঞেস করলেন কী কী আইটেম হবে। শুনে উনি সাজেস্ট করলেন ফুলকপির রোস্ট আর পেস্তার বরফি। কিন্তু আসবেন কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিতে পারলেন না। ওইদিনই আবার ওনার বন্ধুর নাতনির বিয়ে। সেখানে ওঁকে যেতে হবেই।"

"হরি আসবে। বছর চল্লিশ আগে জানি একরাতে তিন জায়গায় বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়েছিল। বাজি ধরে বলতে পারি, হরি আপনার মেয়ের বিয়েতে খেতে আসবে।"

"তাহলে আপনি..."

"হরি আইটেম সাজেস্ট করবে আর আমি তাই খেতে যাব?"

"না না, সে কী কথা!" গোপী ঘোষ জিভ কেটে শিউরে উঠলেন। "আমি আটঘরার লোক, আমি কেন বকদিঘির সাজেশান মানতে যাব। তবে বকদিঘি তো আমার কনস্টিটিউয়েন্সির মধ্যেই, তাই ভাবছি ফুলকপি রেখে রোস্ট বাদ দেব আর পেস্তা বাদ দিয়ে বরফি রাখব। ফুলকপির বরফি করা যায় কি না এ সম্বন্ধে হালুইকরের সঙ্গে কথা বলতে হবে। ভাবছি নতুন একটা খাদ্য তৈরি করব।"

"আমি যাব কি না সে সম্পর্কে হরি কিছু বলল?"

"আবার সেই ছেঁদো কথা। বললেন, আটঘরা জোচ্চুরি করে ম্যাচ জিতেছে। একজনের বদলে এমন একজন খেলেছে, টিমের লিস্টেই যার নাম নেই। পতু মুখুজ্যে নাকি কোর্টে যাবে।"

"প্রমাণ আছে?"

"ছবি তোলা আছে।"

"সে-ছবি দেখেছি। কালুর নাকটা ছাড়া আপনার ছেলের সঙ্গে ওর কোনো অমিল নেই।" রাজশেখর কলাবতীর মুখের দিকে চোখ সরু করে তাকালেন। কলাবতী নিজের নাক দু আঙুলে ধরে দুলুর পাশে গিয়ে বসল।

"আমারটা কি খুব লম্বা?"

সত্যশেখর নানান দিক থেকে দুজনের নাক পরীক্ষা করে মাথা নেড়ে বলল, "প্রমাণ করা শক্ত।"

গোপী ঘোষ বললেন, "আগে কোর্টে যাক তো, তারপর দেখা যাবে...তাহলে আপনারা, সতুবাবু কলাবতী সবাই আসছেন।...না না, কোনো আপত্তি শুনব না, আঠাশে বুধবার...আইটেমে রাজভোগ আছে, তবে ওটাকে ডিউজ বল সাইজের করতে বোধহয় অসুবিধে হবে না, হালুইকরের সঙ্গে একবার কথা বলব...আর ফুলকপির বরফিটা যদি করা যায়, একটা নতুন আবিষ্কার হবে...আটঘরার টুপিতে আর-একটা নীল ফিতে!"

কলাবতী গাড়ি পর্যন্ত এল ওদের সঙ্গে। দুলুকে সে জিজ্ঞাসা

করল, "পরীক্ষা তো হয়ে গেল, এখন কী করছ ?"

"ম্যাজিক শিখছি।"

"ম্যাঅ্যাআ···জিক্‌ দারুণ, কার কাছে, কোথায় শিখছ ?"

"পাড়াতেই, একজন বুড়ো লোক আছেন, অনেক রকমের ম্যাজিক জানেন।"

"আমার খুব ইচ্ছে করে শিখতে

"জিজ্ঞেস করব। যদি তোমাকে শেখাতে রাজি হন তো জানাব।"

"ঠিক ?"

"ঠিক।"

॥ চার ॥

বাড়ির সামনের ফুটপাথ রঙিন কাপড়ে ঘিরে চেয়ার পেতে অভ্যাগত আর বরযাত্রীদের বসার ব্যবস্থা হয়েছে আর বাড়ির লাগোয়া খালি জমিটা তাদের খাওয়ানোর ব্যাপারে লেগেছে। বাড়ির রকে সানাই বসেছে।

নাতনিকে পাশে নিয়ে রাজশেখর ১৯২৮-এর ফোর্ড গাড়িটা চালিয়ে যখন পৌঁছলেন, তখন গিজগিজে ভিড়। বর এসে গেছে। তিনটে মিনিবাস রাস্তার মোড়ে। তাছাড়া গোটা পঁচিশ মোটর সার দিয়ে রাস্তার দুধারে। রাজশেখর তাঁর ফোর্ডকে কোথায় রাখবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। সামনে কোথাও রাখার স্থান না পেয়ে গাড়িটাকে পিছু হটিয়ে আসছিলেন কলাবতীর নির্দেশ অনুসরণ করে

"দাদু, বড়দিদের গাড়ি।" কলাবতী গলা নামিয়ে চাপাস্বরে বলল

"কই

রাজশেখর ব্রেক প্যাডেলে পা চাপলেন।

"ওপারে, সবশেষের সবুজ অ্যাম্বাসাডারটা।"

"ঠিক দেখেছিস, হরিরই তো ?"

"হ্যাঁ ঠিক দেখেছি। বড়দি তো ওটাতেই রোজ স্কুলে আসেন।"

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই ফোর্ড এসে সবুজ অ্যাম্বাসাডারের পিছনে এমনভাবে দাঁড়াল যে, উভয়ের বাম্পারের মধ্যে দূরত্ব রইল ইঞ্চি-ছয়েক। সামনের স্টেশন ওয়াগনটা বা পিছনের ফোর্ড জায়গা না দিলে অ্যাম্বাসাডার বেরোতে পারবে না।"

"সতুর আজকেই কিনা মক্কেলদের নিয়ে গুজুর-গুজুর করার তাড়া পড়ল। একসঙ্গে এলে কত ভাল দেখাত।" গাড়ি থেকে নেমে লুটোনো কোঁচাটা বাঁ হাতের দু' আঙুলে আলতো তুলে ধরে রাজশেখর কাঁধের মুগার চাদরটা ডান হাতে গুছিয়ে নিতে নিতে ক্ষুব্ধ কণ্ঠেই বললেন।

"কাকার এখন নাম হয়েছে, পসার হচ্ছে," কলাবতী বিজ্ঞের মতো সান্ত্বনা দেবার স্বরে বলল, "এখন ফাঁকি দেওয়াটা ঠিক হবে না।"

উপহারের জন্য শাড়ির বাক্সটা সে গাড়িতেই ফেলে রেখে নেমে পড়েছিল। রাজশেখর মনে করিয়ে দিতেই সে "ইস্‌স্‌" বলে জিভ কাটল।

দুজনে বিয়েবাড়ির সামনে পৌঁছতেই গোপী ঘোষ এগিয়ে এলেন দুই কর জোড়া করে।

"আমার কী সৌভাগ্য, আপনি এলেন···এইমাত্র হরিশঙ্করবাবুও পৌঁছলেন আর-এক জায়গায় নেমন্তন্ন সেরে···হেঁ হেঁ, ঠিকই আপনি বলেছিলেন···যাও মা, তুমি ভিতরে যাও, ওরে, দুলুকে ডাক।···আপনি এদিকের ঘরে এসে বসুন, ওদিকটা বরযাত্রীদের জন্য।"
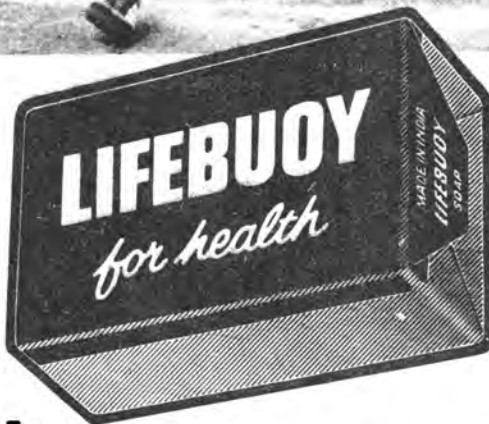
রাজশেখরকে তিনি যে-ঘরে আনলেন, সেটি তাঁর আম-দরবার। তাঁর বিধানসভা এলাকার লোকেদের সঙ্গে এই ঘরে দেখা করেন। ঘরের তিন দেয়াল ঘেঁষে লম্বা সোফা। একটা বিরাট টেবল। সোফায় বসে আছেন হাইকোর্টের এক জজ, খবরের কাগজের একজন সম্পাদক, আর হরিশঙ্কর।

"আয় রাজু, আয়।"

হরিশঙ্কর উৎফুল্লভাবে সোফায় তাঁর পাশের খালি জায়গাটা চাপড়ে বসলেন। ঘরের সবাই গৌরবর্ণ দশাসই চেহারার দিকে তাকিয়ে রইল। তিনি হরিশঙ্করের পাশে গিয়ে বসলেন।

"একটা তো সেরে এলি, আবার এখানেও খাবি ?"

"ভগবান একটা পেট দিয়েছেন, সেটার সেবা করতে হবে তো !"

"ভগবান সবাইকেই পেট দিয়েছেন, কিন্তু তাই বলে..."

এইভাবে দেখামাত্র দুজনে তর্ক বাধিয়ে যখন কথার পিঠে কথা চাপাতে লাগলেন, তখন দুলু কলাবতীকে পৌঁছে দিয়েছে কনের ঘরে। সাজগোজ করা মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে ঘরের এককোণে বড়দিকে দেখে কলাবতী তো স্তম্ভিত। হেডমিস্ট্রেস মলয়া মুখার্জি যে এত সুন্দরী, সে এতদিন বুঝতে পারেনি।

বড়দির হাতছানিতে সে ভিড় কাটিয়ে পাশে গিয়ে বসল।

"কী দারুণ আপনাকে দেখাচ্ছে না !"

মলয়া বিব্রত এবং রক্তিম মুখ সামলাতে সামলাতে বলল, "আচ্ছা আচ্ছা, তোমাকেও তো সুন্দর দেখাচ্ছে...কখন এলে, সবাই এসেছ ?"

"এইমাত্র, দাদু আর আমি এসেছি।"

"শুধু দুজনে !"

কলাবতীর মনে হল, বড়দির মুখটা পলকের জন্য যেন হতাশ ম্লান দেখাল।

"কাকা চেম্বারের কাজ শেষ করেই আসবে, হয়তো ইতিমধ্যে এসেও গেছে।"

তার মনে হল, বড়দির মুখ এবার আগের থেকেও ঝকঝকে হয়ে উঠল।

"ওহ্, তোমার কাকাও আসবে বুঝি ?"

"তাই তো কথা আছে।"

ওরা দুজন যখন ঘরের মধ্যের প্রভূত সোনা, বেনারসি ও সুগন্ধী নির্যাসে ডুবে গিয়ে গলা নামিয়ে কথা বলছে তখন গোপী ঘোষের আমদরবারে রাজশেখর আর হরিশঙ্করের দিকে সারা ঘরের চোখ আর কান তটস্থ হয়ে নিবদ্ধ।

"খাওয়ার তুই কী বুঝিস ? কচুরি আর রাধাবল্লভীর তফাত জানিস ? মুলো-ছেঁচকি আর থোড়-ছেঁচকি খেতে দিলে বলতে পারবি কোনটে কী ? ছানাবড়া আর কালোজামের কথা তো ছেড়েই দিলাম।"

রাজশেখর মিটমিটিয়ে হাসছিলেন আর শুনছিলেন। বললেন, "সব জিনিস কি আর সবাই জানে, আইনের ব্যাপারে জজসাহেব যতটা জানবেন, কাকে খবর বলে সেই সম্পর্কে সম্পাদকমশাই যতটা জানেন, তুই-আমি কি ততটা জানব ? ক্রিকেটের আমি কিছুই জানি না, তবু যতটা জানি, তুই তো তাও জানিস না। হ্যাঁ, রান্নার তুই কিছু-কিছু বুঝিস এটা আমি মানব, কিন্তু রান্না আর খাওয়া তো দুটো আলাদা ব্যাপার, একেবারেই এক জিনিস নয়। রেঁধে পাতে সাজিয়ে দেওয়া পর্যন্ত একটা পর্ব। তারপর শুরু হয় বাকি পর্ব। এই শেষেরটা সম্পর্কে তোর থেকে আমি ভালই জানি। কচুরি-রাধাবল্লভীর মধ্যে তফাত জানতে একবার করে কামড় দিলেই তো জানা যাবে, সেজন্য কি গবেষণার দরকার হয় ? রসগোল্লা আর রাজভোগের মতোই একটা হুক আর একটা পুলের মধ্যে তফাত বুঝতে কি মাথার চুল ছিঁড়তে হবে ? চোখ থাকলেই বোঝা যায়।"

এই সময় দরজার কাছে সত্যশেখরকে হাসি মুখে উঁকি দিতে দেখা গেল। কিন্তু ঘরের মধ্যে টাকমাথা এবং আশু মুখুজ্যে-গোঁফ সম্বলিত জজসাহেবকে দেখেই সে জিভ কেটে শট্‌কান দিল। রাজশেখর সঙ্গে-সঙ্গে ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। জজসাহেব গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, "এইমাত্র যে উঁকি দিল...ব্যারিস্টার সিন্‌হা, গতকাল আমার বেঞ্চেই আর্গু করতে করতে অন্তত পাঁচবার আমাকে জিভ দেখিয়েছে।"

হরিশঙ্কর মুচকি হেসে চোখ টিপলেন রাজশেখরকে।

"আপনি কিছু বলেননি ?" হরিশঙ্কর খুবই ভালমানুষী গলায় বললেন।

"নিশ্চয়। বলেছি ফারদার জিভ বার করলে আমার এজলাসে আর ঢুকতে দেব না।"

"তারপরও কি আর জিভ বেরিয়েছে ?" রাজশেখর গম্ভীরভাবে জানতে চাইলেন।

"না, তারপর এখানে এইমাত্র দেখলুম।"

"ব্যারিস্টার সিন্‌হা এরই ছেলে।" হরিশঙ্কর ভিজে বেড়ালের মতো চোপসান স্বরে এবং মুখটি নিরীহ করে বললেন। রাজশেখর কটমটিয়ে তাঁর দিকে তাকালেন। জজসাহেব অপ্রতিভ হয়ে টাকে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "ইয়ে, কিছু মনে করবেন না, আমি জানতাম না যে..."

"মনে করব কেন।" রাজশেখর ধমকের মতো কণ্ঠে বললেন, "ঠিকই বলেছেন ওকে, আমি হলে তো তিনবারের পরই এজলাস থেকে বার করে দিতাম।... উফ্‌ফ্, কতদিন আমি এটাই ভয় করেছি যে, সতু এমন কাণ্ড করবে। ওর এই বদ অভ্যাসটা তৈরি করেছে তোর মেয়ে।"

"মলয়া !"

"নিশ্চয়। হাতে সব সময় ক্যামেরা, আর সতু জিভ বার করলেই ছবি তুলে নেয়। ছবি তোলাবার লোভ থেকে সতুর তাই জিভ বার করার অভ্যাসটা দাঁড়িয়ে গেছে।"

"তোর ছেলে তো সিংগি, তাহলে ষাঁড়েদের মতো স্বভাব কেন ?"

"মানে ?"

"ষাঁড়ের সামনে লাল কাপড় নাড়লেই খেপে যায়। তোর ছেলের সামনে ক্যামেরা ধরলেই..."

"কিনিয়ার সাফারি পার্কে আমি খুব কাছের থেকে সিংহদের ছবি তুলেছি, কিন্তু সিংহরা তো একবারও খেপে যায়নি !" খবরের কাগজের সম্পাদক বললেন।

"আফ্রিকার সিংহরা একরকম, আটঘরার সিংহরা আর-একরকম।" হরিশঙ্কর বিনীত ভঙ্গিতে জানালেন, "ওরা হরিণ খায়, শুওর খায়, জেব্রা খায়, আর এরা খায় কলা !"

"সিংহ খায় কলা !!" ঘরের সবাই বিস্ময়ে একসঙ্গে বলে উঠলেন।

"ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন। ক্রিকেট ম্যাচে বাজি ধরেছিল রসগোল্লা বা সন্দেশ নয়...কলা।"

রাজশেখর মুখ লাল করে নীরব রইলেন।

ঘরের অনেকেই মুচকি হাসলেন। এইসময় বাইরে সামান্য কোলাহল শোনা গেল একব্যাচ খেয়ে উঠে বেরিয়েছে, সম্ভবত এরা বরযাত্রী। শামিয়ানা ঘেরা বসার জায়গায় কন্যাপক্ষের লোকদের মধ্যে বকদিঘির বিষ্টু মিশির, ক্যাপ্টেন পতু মুখুজ্যে আর হরিশ কর্মকারকে দেখা যাচ্ছে। একটা ম্যাচে হরিশ এবং গোপী ঘোষ আম্পায়ার ছিল। তাই হরিশের নিমন্ত্রণ। স্টোরেজে গোপী ঘোষের খেতের আলু থাকে।

আটঘরার চণ্ডী কম্পাউণ্ডার, পঞ্চায়েত-প্রধান পটল হালদার

রয়েছে ওদের সামনের সারির চেয়ারে।

"পটলবাবু, এবারের ম্যাচে লাঞ্চের জন্য হাবু ময়রা নাকি মাত্র দু' হাঁড়ি রসগোল্লা দিয়েছিল ?"

পতু মুখুজ্যে কী বলতে চায়, তা বুঝতে না পেরে পটল হালদার সাবধান হয়ে গেল।

"দু হাঁড়ি কি দশ হাঁড়ি তাতে কী এসে যায়, সবাই পেটভরে তৃপ্তি করে খেয়েছে কি না, সেটাই বড় কথা।"

"তা তো ঠিকই, নিশ্চয়, আসল কথা হল তৃপ্তি। কিন্তু আমি শুনেছিলাম রসগোল্লা কম পড়ে গেছল ? আর তাইতে নাকি আধপেটা সতু সিংগি রেগে বকদিঘির বোলারদের পিটিয়ে সেঞ্চুরি ভক্ষণ করে !"

"একদম বাজে কথা।" পটল হালদারের উত্তেজিত কনুই পাশে বসা আটঘরার মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান চণ্ডী কম্পাউণ্ডারকে খোঁচা দিল। চণ্ডী তখন ব্যাকুল চোখে শামিয়ানার প্রবেশপথের ফাঁক দিয়ে খাওয়া দেখছিল। হঠাৎ পাঁজরে খোঁচা খেয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "রসগোল্লার সাইজটা বেশ ভালই মনে হচ্ছে।"

"দূর মশাই রসগোল্লার সাইজ, পতুবাবু কী বললেন তা শুনেছেন ?"

"শুনিনি মানে ? রসগোল্লা কম খেলে রাগ হয়, আর তাহলেই সেঞ্চুরি ভক্ষণ করে রাগ মেটাতে হয়। তাই তো ?"

এই সময় দেখা গেল সত্যশেখর কাঁচুমাচু মুখে কেমন জড়োসড়ো ভঙ্গিতে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। ওকে দেখেই পটল হালদার উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল।

"সতুবাবু...এদিকে, এই যে, এখানে একবার আসুন তো।"

মনে হল সত্যশেখর এই আহ্বান শুনে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কোঁচাটা হাঁটু পর্যন্ত তুলে প্রায় ছুটে এল।

"আচ্ছা বলুন তো, আপনার সেঞ্চুরি করার পিছনে কিসের প্রেরণা ছিল ?"

এমন একটা প্রশ্নের সামনে যে পড়তে হবে, সত্যশেখর তা ভাবেনি। ফ্যালফ্যাল করে সে সদাসংগ্রামশীল ও বিপ্লবী আটঘরা অঞ্চল সমিতির প্রধান পটল হালদারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

"আমার তো মনে হয় আটঘরার প্রগতিশীল মেহনতি মানুষের ঐক্য জোরদার করার জন্যই, তাদের বুর্জোয়া বিরোধী চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই আপনি ব্যাট হাতে দেখিয়ে দিয়েছেন কী করে শত্রুর মোকাবিলা করতে হয়। আর এর পিছনে ছিল আটঘরার জনগণের সমবেত শুভেচ্ছা ও শত্রুর প্রতি বৈপ্লবিক ঘৃণা, যা সংগ্রামের সঠিক পথে চালিত হবার জন্য মদত দিয়েছিল। ঠিক বলছি কিনা ?"

সত্যশেখর মুহূর্ত বিলম্ব না করে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানাল।

"আপনার সেঞ্চুরি যে জনগণকে সঠিক পথ দেখাবে, এটা নিশ্চয় আপনি জানতেন ?"

"নিশ্চয় জানতুম।"

"আপনার সেঞ্চুরি যে প্রতিক্রিয়াশীলদের কবর খুঁড়বে, তা নিশ্চয় আপনি জানতেন ?"

"অবশ্যই জানতুম।"

"অথচ দেখুন এরা তথ্যকে বিকৃত করে প্রচার করছে আপনি নাকি বুর্জোয়া সংস্কৃতির অন্যতম ধারক যে রসগোল্লা, শোষক সম্প্রদায়ের লোভ দেখানোর বস্তু যে রসগোল্লা, তাই ভক্ষণ থেকে বঞ্চিত হয়ে নাকি সেদিন সেঞ্চুরি করেছিলেন, শত্রুকে প্রহার করে অতৃপ্তির শোধ নিয়েছিলেন ?"

"হতে পারে।"

"সে কী, জনগণের প্রতি নিবিড় ভালবাসা কি আপনার প্রেরণা ছিল না ? আপনি কি বকদিঘির অপপ্রচারকে সমর্থন করবেন ?"

"অ্যাঁ ! বকদিঘি এই রকম কথা বলছে ?" সত্যশেখর বিপন্ন হয়ে তাড়াতাড়ি যোগ করল, "রসগোল্লা আমি যে মোটেই ভালবাসি না, পতুবাবু, আপনি কি তা জানেন না ?"

"আমি কী করে জানব ! আপনি উচ্ছে ভালবাসেন না করলা ভালবাসেন, তা কি আমার জানার কথা ?"

এই সময় চণ্ডী কম্পাউণ্ডার ঝুঁকে হরিশ কর্মকারকে বলল, "লক্ষ করলি, সন্দেশের মতো কী একটা দুবার রিপিট করল, কিন্তু কেউ নিল না ! শুঁকেই পাতে ফেলে রাখছে।"

"বোধহয় মিষ্টি বেশি হয়ে গেছে।"

"এটা উচ্ছে-করলার প্রশ্ন নয়, পতুবাবু।" অঞ্চল-প্রধান চোখ বুঁজে দু'হাত নাড়ল। "আপনি রসগোল্লাকে প্রেরণা বলছেন, অথচ উনি রসগোল্লাই ভালবাসেন না, খান না...দেখতে পর্যন্ত পারেন না। আপনি ভুল তথ্য দিয়ে আমাদের বিভ্রান্ত করছেন।"

"পটলদা, তুমি যে বলেছিলে সতুবাবুর সেঞ্চুরির জন্য সভা করবে, মিছিল করবে, শতরান-স্তম্ভ গড়বে, সে-সবের কী হল ?" হরিশ সরল বোকাবোকা মুখ করে জানতে চাইল।

"হবে। সভা হবে, মিছিলও হবে। সতুবাবু ব্যস্ত মানুষ, সময় যেদিন দিতে পারবেন সেদিনই..." সত্যশেখরকে কিছু একটা বলার জন্য হাঁ করতে দেখেই পটল হালদার দ্রুত যোগ করল, "জানি জানি আপনি কাজের লোক, তাই তো বিরক্ত করিনি।"

"পটলদা, স্তম্ভটা ?"

"হাইট কতটা হবে তাই নিয়ে নিয়মিত আলোচনায় বসছি। আপাতত তিন ফুট থেকে চার ফুটে আমরা উঠেছি।"

বাড়ির ভিতর থেকে এই সময় একটা চিৎকার ভেসে এল "আর দু' মিনিট পর মেয়েদের নামতে বলবে, পাত রেডি হচ্ছে।"

বিষ্টু আর চণ্ডী একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। পান চিবোতে চিবোতে লোকেরা বেরিয়ে আসছে।

"বেশ খাইয়েছে...ফ্রাইটা জোর সাঁটিয়েছি।"

"আমি তেরোটার বেশি আর টানতে পারলুম না।"

"আরে মিহিদানাটা অত খাচ্ছিলিস কেন বোকা ! সরভাজা আছে জানতিস না ?"

"বিরিয়ানিটাই বেস্ট...কী একটা বরফি বলে দিল, মাগো, যা বোঁটকা গন্ধ! অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসছিল।"

শুনতে শুনতে চণ্ডীর চোখমুখ কখনও উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল, কখনও চুপসে যাচ্ছিল। কাতর স্বরে সে বলল, "পটলদা, পেটের মধ্যে খিদের স্তম্ভটা যে দশ ফুট ছাড়িয়ে গেছে। এবার তো দেখছি মেয়েরা বসবে...ভেতরে গিয়ে হালচাল বুঝে এসো না।"

বিষ্টু বলল, "তুমি হলে গিয়ে অঞ্চল-প্রধান, দেখবে না আমাদের ? হলামই বা আমরা বকদিঘির।"

পতু মুখুজ্যের পাকস্থলিতেও মোচড় দিচ্ছে। সে গাম্ভীর্য বজায় রেখে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, "যাদের ট্রেন ধরতে হবে, তাদের আগে ছেড়ে দেওয়া উচিত।"

পটল হালদার আমতা-আমতা করে বলল, "কিন্তু আমি তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না

"বাড়ির ভেতরে যান। গোপীবাবু ভেতরে আছেন, আর তিনি তো আপনাকে বিলক্ষণই চেনেন।" পতু মুখুজ্যে সেকেণ্ড স্লিপকে থার্ডম্যানে যেতে বলার মতো বাড়ির দরজার দিকে আঙুল দেখাল।

পটল হালদার গুটিগুটি এগোল। তখন সত্যশেখর খপ্ করে তার হাত টেনে ধরে বলল, "ঢুকেই বাঁ দিকের ঘরে বাবা, হরিকাকা বসে আছেন। দেখবেন ফর্সা, টেকো, গুঁপো, একটা প্যাঁচামুখো লোকও আছে। লোকটা কখন বিদেয় হবে সেটা কায়দা করে জেনে আসতে হবে, পারবেন ?"

"হেঁ হেঁ হেঁ, কায়দাই যদি না জানি, তা হলে কি অঞ্চলপ্রধান হতে পারতুম। নিশ্চিন্ত থাকুন, দু' মিনিটে খাওয়ার ব্যবস্থা আর আপনার

খবর...”

সত্যশেখর তাকিয়ে রইল পটল হালদার বাঁ দিকের ঘরটায় না ঢোকা পর্যন্ত। তখন দোতলা থেকে মেয়েরা আর বাচ্চারা কলকল করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। কে চেঁচিয়ে বলে উঠল, “এখনও রেডি হয়নি...একটু অপেক্ষা করুন, আর দু' মিনিট।”

দুলু এবং ক্যামেরা হাতে একটি ছেলের সঙ্গে কলাবতী গল্প করতে-করতে নামছিল। দূরে কাকাকে দেখে সে মুখের কাছে গরাস ধরে ইশারায় জানতে চাইল খাওয়া হয়েছে কি না। পেটে হাত রেখে সত্যশেখরের বিষণ্ণ মাথা নাড়া দেখে কলাবতী পিছনে মুখ ঘুরিয়ে বলল, “বড়দি, এখনও কাকার খাওয়া হয়নি।”

“এসেছেন বুঝি?”

“হ্যাঁ। মনে হচ্ছে খুবই কষ্ট পাচ্ছে। দাদুর ডায়েট চার্টের এফেক্ট শুরু হয়ে গেছে। আজকাল যা খিদে পায় না কী বলব!”

“এই যে বললে লুকিয়ে-লুকিয়ে তোমরা খাও।”

“খেলেই বা! ইদানীং দাদুর কেমন যেন সন্দেহ হয়েছে আমরা ডায়েট চার্ট ফলো করছি না। মুরারিদাকে প্রায় সাসপেণ্ড করে রেখেছেন। বাড়ির বাইরে এক পা'ও যেতে দেন না। বলরাম দোকান-বাজার করে। দাদু নিজের হাতে এখন আমাদের ভোর থেকে রাত পর্যন্ত সামনে বসে খাওয়ান...উফফ্ বড়দি, সে যে কী ভীষণ, বোঝাতে পারব না! এখন রাক্ষসের মতো খিদে হয়েছে, কাকার তো আরও বেশি! আজই বলছিল, ফাঁসির খাওয়া খাব।”

সিঁড়ির মুখে ভিড় জমে গেছে। পাশের ঘরে দাদুকে দেখতে পেয়ে কলাবতী বড়দিকে বলল, “ভিতরে যাবেন?”

মলয়া একটু ইতস্তত করে বলল, “বড্ড গরম লাগছে, আমি বাইরেই থাকি, তুমি দেখা করে এসো বরং।”

কলাবতী তখন দুলু আর তার ক্যামেরা-হাতে বন্ধুটিকে বলল, “চলো মজার ব্যাপার দেখবে, দুই বুড়োর ঝগড়া।”

“মজা!” দুলু অবাক হয়ে ঘরের ভিতরে তাকিয়ে বলল, “জীবনে এই প্রথম বাবাকে ধমক খেতে দেখছি, ওই দ্যাখো।”

॥ পাঁচ ॥

ওরা তিনজন ঘরে ঢুকে একধারে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়াল। ক্যামেরার ফ্ল্যাশ বহুবার ঝলসাল, কিন্তু ঘরের কেউ তাতে ভ্রূক্ষেপ করল না।

“বলেন কী, আমার অ্যাডভাইস আপনি নিলেন না?” হরিশঙ্করের গর্জনে গোপী ঘোষ আর-একটু কুঁকড়ে গেলেন। “ফুলকপির রোস্ট আর পেস্তার বরফি করেননি?”

“ভাবলুম নতুন একটা কিছু করি, তাই দুটো থেকে আধখানা করে মানে রোস্ট আর পেস্তাটা বাদ দিয়ে করেছি ফুলকপির বরফি...অসাধারণ, নতুন ব্যাপার। ষাট ঘণ্টা ফুলকপিগুলো ভিজিয়েছি পোস্তবাটা জলে। ধুয়ে নিয়ে মাখিয়েছি গোলমরিচ, হিং আর আদা এগারো ঘণ্টা ধুয়ে সেদ্ধ করে চটকে মাখন মাখিয়ে ছ'ঘণ্টা উনুনে শুধু পাক হয়েছে। তারপর খোয়া ক্ষীর, ছানা, কাঁচা আলু-বাটার সঙ্গে মিশিয়ে আবার পাক। তারপর চিনেবাদাম বাটা, চিঁড়ে বাটা...।”

“থাক্ থাক্ আর বলতে হবে না।” দু' হাত মাথার উপর তুললেন হরিশঙ্কর।

“এটা আটঘরার একটা আবিষ্কার।” রাজশেখর উদাসীন ভঙ্গিতে প্রথম জজসাহেবের দিকে তাকিয়ে কথাটা শুরু করে মুখটা সম্পাদকের দিকে ফিরিয়ে “এডিটোরিয়ালের জন্য ভাল সাবজেক্ট” বলে শেষ করলেন।

“আটঘরার আবিষ্কার মানে তো অখাদ্য। ইসস্, পেস্তার বরফিটাই খাব বলে বন্ধুর বাড়িতে কিছুই খেলাম না, শুধু আটটা ফ্রাই আর গোটা দশেক কড়াপাক...ওহ্, কী ভুলই করেছি

হরিশঙ্কর কপালে করাঘাত করার জন্য হাত তুলেই নামিয়ে নিলেন পটল হালদারকে দেখে।

"গোপীবাবু," পটল পিছন থেকে ঝুঁকে গোপী ঘোষের কানে ফিসফিসিয়ে বলল। হরিশঙ্করের ক্রোধ-গর্জনে গোপী ঘোষ নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। চমকে পিছন ফিরে পটলকে দেখেই রেগে উঠলেন।।

"গোপীবাবু কী করবে ? এ ঘরে অঞ্চল-প্রধানের কী দরকার ? অ্যাঁ···এখানে শ্রেণীসংগ্রাম চলবে না বলছি।"

"আজ্ঞে সংগ্রাম নয়, আমাদের খিদে পেয়েছে।"

"পেয়েছে তো বসে পড়ুন।"

পটল হালদার বসার জায়গার জন্য এধার-ওধার তাকাতে লাগল। জজসাহেবের পাশের খালি জায়গাটুকু নজরে পড়তেই সে এগিয়ে এসে 'একটু সরুন তো' বলেই জজের পাঞ্জাবির হাতা চটকে, লোটানো ধুতির কোঁচা মাড়িয়ে সোফায় বসল।

জজসাহেবের গোঁফের ফাঁক থেকে কোলাব্যাঙ ডাকার মতো একটা শব্দ বেরিয়ে এল। পটল হালদার লজ্জিত হয়ে বলল, "মাপ করবেন···আমি দেখতে পাইনি, ক্ষমা চাইছি।"

"দেখতে পাননি ? কী নাম আপনার ?"

"পটল হালদার।"

"কী করেন।"

"আটঘরা অঞ্চল সমিতির প্রধান।···আপনি ?" বিনীতভাবে পটল জানতে চাইল।

"আমি হাইকোর্টের একজন বিচারপতি।"

"অ।" বলেই পাঁচ সেকেণ্ড পর পটল হালদার স্প্রিংয়ের মতো সিধে হয়ে বসল। "তাই বলুন ! আপনিই সেই জজ, যার কথা সতুবাবু বলে দিলেন।"

"কে সতুবাবু ? কী বলেছেন ?"

"সত্যশেখর সিংহ, চেনেন না ? আপনাদের হাইকোর্টেরই তো ব্যারিস্টার। ···আহা, কী ব্যাটটাই না এবার করলেন। শতরান-স্তম্ভ আমি তুলবই, স্যার, আপনাকে গিয়ে উদ্বোধন করতে হবে··· না না, কোনো কথা শুনব না···আটঘরার জনগণ আপনাকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে।" পটল হালদার জজসাহেবের উরুতে দু'হাতের তালু রেখে মিনতি জানাল।

"উঁহুহু, করছেন কী ?"

"আপনাকে যেতেই হবে। আমার প্রধানত্বে আটঘরায় কিনা হাইকোর্টের জজ !··· উহুহু, ভাবতে পারেন কতবড় প্রাপ্তি হবে সেটা ?"

দুই তালু দিয়ে এবার সে উরু খামচে ধরল। জজসাহেব রেগে হাতদুটো সরিয়ে দিলেন।

"আপনি বড্ড বেয়াড়া লোক তো !"

"যেতেই হবে। নইলে হাইকোর্টে মিছিল আনব, ধর্না দেব, ঘেরাও করব।"

"তিনমাসের জন্য তাহলে চালান করব।"

"মানে ?"

"মানে ঘানি ঘোরাবার ব্যবস্থা করব।···হাত সরান।"

পটল হালদার মাথাটা কাত করে সরু চোখে আট সেকেণ্ড জজসাহেবের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আপনি কেমন বিচারপতি, মশাই, জনগণের ইচ্ছাকে···সতুবাবু দেখছি ঠিকই বলেছিল, আপনি প্যাঁচামুখোই বটে।"

"কে, কে, কে বলেছে ?"

ঘরের অন্যদিকে তখন হরিশঙ্করের মুখের কাছে মুখ এনে রাজশেখর দাঁত চেপে গজরালেন, "আটঘরার আবিষ্কার অখাদ্য ? আবিষ্কার কথাটার মানে জানিস ? আবিষ্কার হচ্ছে নতুন জিনিস, ইনভেনশন, যা আগে কখনও পৃথিবীতে ছিল না···সুইং বোলিং আর গুগলি কী করে খেলতে হয়, প্রথম দেখাল জ্যাক হবস, লেগ গ্লান্স প্রথম দেখাল রঞ্জি, একেই বলে আবিষ্কার। আটঘরার ফুলকপির বরফিও সেম অ্যাজ লেগ গ্লান্স···লোকের পাতে পড়বে আর গণ্ডায় গণ্ডায় বাউণ্ডারি পেরিয়ে যাবে। গোপীবাবু, গোটাকতক হরিকে এনে দিন তো।"

"এখুনি মেয়েদের ব্যাচ বসবে, একেবারে সেখানেই তো···"

"না না, মেয়েদের সঙ্গে বসে নয়। এখানে এখুনি ওকে দিন। আটঘরার আবিষ্কার অখাদ্য কি না সেটা জজসাহেব রয়েছেন, এডিটার রয়েছেন, ওঁদের সামনেই প্রমাণ হয়ে যাক।"

"হ্যাঁ, এঁদের থেকে যোগ্য ব্যক্তি···হাইকোর্টের জজ, কাগজের এডিটার···আর কে হতে পারেন ?" পটল হালদার ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো দাঁড়িয়ে উঠল। "যদি হরিশঙ্করবাবু বলেন অখাদ্য, তাহলে এনারা চেখে দেখবেন। এনারা যদি বলেন সুস্বাদু, তাহলে আমি কথা দিচ্ছি, আটঘরা অঞ্চল সমিতি তার এলাকার প্রতিটি মেহনতি মানুষকে এক কেজি করে এই আবিষ্কার উপহার দেবে এবং সেই উপহার-অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন···" পটল মুখ নামিয়ে বলল, "স্যার, অনুষ্ঠানে আপনাকে যেতেই হবে··· না না, আর আপত্তি করবেন না, এবার রাজি হয়ে যান।"

"আগে তাহলে বলুন, আমাকে প্যাঁচামুখো কে বলেছে ?"

পটল হালদার ফ্যাকাসে বিব্রত মুখে গোপী ঘোষের দিকে তাকিয়ে দেখল তিনি দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন, কলাবতীরা হাসি চাপছে, রাজশেখর ব্যস্ত হয়ে সম্পাদকের দিকে ঝুঁকে আফ্রিকার সিংহদের কেশর গির-সিংহদের থেকে ঝাঁকড়া কিনা জানতে চাইলেন।

হরিশঙ্কর নখ খুঁটতে খুঁটতে আনমনে বললেন, "পটলবাবু তখন যেন সতুর নাম বললেন বলে মনে হল।"

"সতু কে ? ডাকুন তো তাকে।" জজসাহেবের কণ্ঠে এজলাসের স্বর ফুটে উঠল।

হরিশঙ্কর টিপ্পনী কাটলেন, "আসবে কি ?"

"সতু আমার ছেলে, একটু আগেই তাকে দেখেছেন।" রাজশেখর কেশর-ফোলানো সিংহের মতো তেজী ভঙ্গিতে হরিশঙ্করের দিকে তাকালেন। "নিশ্চয় সে আসবে, সিংগিবাড়ির ছেলে যখন, ভয় পাবে কেন ···কালু, ডেকে আন তো কাকাকে।"

সেই সময় বাইরে থেকে শোনা গেল "দুটো পাত খালি রয়েছে, আর-কেউ থাকেন তো পাঠিয়ে দাও।"

তাই শুনে বিষ্টু আর চণ্ডী একসঙ্গে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। দুজনের চোখ হরিশ আর পতু মুখুজ্যের উপর। কী দেখল কে জানে, ওরা দুজন আবার ধীরে-ধীরে চেয়ারে বসে পড়ল।

"মাত্র দুটো পাত।"

"আমরা চারজন।"

"পটলদা সেই যে গেল !"

॥ ছয় ॥

ঘরের মধ্যে তখন ঘোর উত্তেজনা। কাগজের রেকাবিতে মাখা-ময়দার মতো দেখতে হরতন-আকৃতির পাতলা কয়েকখণ্ড বরফি নিয়ে গোপী ঘোষ দাঁড়িয়ে। মুখে গদগদ ভাব। হরিশঙ্কর দুই আঙুলে চিমটের মতো একটি বরফি সন্তর্পণে তুলে নাকের কাছে এনেই মুখ বিকৃতি করলেন। কয়েক সেকেণ্ড রাজশেখরের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার শুঁকলেন। ঘরের সবাই প্রবল উৎকণ্ঠায় তাঁর মুখভাব লক্ষ করে যাচ্ছে। হরিশঙ্করের নাক কুঁচকে রয়েছে, শরীর যেন ঘোলাচ্ছে।

"হরিবাবু তো বিরোধী পক্ষ, ওনার কাছে আটঘরার আবিষ্কার তো খারাপ লাগবেই।"

পটল হালদার তার সুবিজ্ঞ সিদ্ধান্ত পেশ করে মিটিমিটি হাসতে

লাগল।

"তা বটে। নিরপেক্ষ কারুর মতামতই এক্ষেত্রে গ্রাহ্য হওয়া উচিত, কী বলেন জজসাহেব ?" সম্পাদক বললেন।

"তার আর দরকার হবে না।" ফুলকপির বরফি খুবই পরিতোষের সঙ্গে চিবোতে চিবোতে হরিশঙ্কর জানালেন। "অসাধারণ, সত্যিই আবিষ্কার ! নেহাত একটা নেমন্তন্ন খেয়ে এখানে এসেছি, নইলে..." হরিশঙ্কর কয়েক সেকেণ্ড চুপ থেকে আবার বললেন, "...নইলে এখুনি খাওয়ার সেঞ্চুরি করে দিতাম। অদ্ভুত জিনিস, সত্যিই একটা আবিষ্কার।"

"সেঞ্চুরি করা সোজা ব্যাপার নয় হরিশঙ্করবাবু, সেজন্য প্রেরণা চাই... চাই জনগণের শুভেচ্ছা। সতুবাবুর সেঞ্চুরির পিছনে আছে জনগণকে সঠিক পথ দেখাবার ইচ্ছা।"

"তাহলেই সেঞ্চুরি করা যাবে ?" জজসাহেব কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

"নিশ্চয় যাবে। বকদিঘি থেকে রটনা হচ্ছে, লাঞ্চে রসগোল্লা খেতে না পেয়ে সতুবাবু নাকি সেই রাগে বেধড়ক ব্যাট চালিয়ে সেঞ্চুরি করেছেন...এটা কি একটা যুক্তি হল ?"

"রাগটা নিশ্চয় খুব মহান ছিল তির্যক মন্তব্য কললেন হরিশঙ্কর।

"খিদের চোটে মানুষ অবশ্য অনেক কিছু অবিশ্বাস্য কাজ করে ফেলে।" সম্পাদক টীকা যোগ করলেন।

"পৃথিবীতে বিপ্লবের জন্মই তো খিদে থেকে।" পটল হালদারের কণ্ঠ থেকে দৃপ্ত শব্দগুলি বেরিয়ে আসতে না আসতেই দরজার কাছ থেকে কাতর স্বর ভেসে এল, "পটলদা !"

সবাই চমকে উঠে দেখল চারটি লোক বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে। তাদের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে আর-একটি ভীত মুখ। পটল হালদার হাত তুলে তাদের অপেক্ষা করতে বলল।

"বাবা, তুমি ডাকছ আমায় ?" জড়োসড়ো সত্যশেখরের ক্ষীণ স্বর ঘরে ভেসে এল।

"এখানে এসো।" সিংহ-গর্জনে আহ্বান গেল।

মেঝেয় চোখ রেখে সত্যশেখর এগিয়ে এল রাজশেখরের সামনে। তার পিছনে কলাবতী এবং মলয়া।

"জজসাহেবকে জিভ দেখিয়েছিলে আর্গু করার সময় ?"

সত্যশেখর মাথা হেঁট করে রইল। রাজশেখর কড়া চোখে মলয়ার দিকে তাকালেন। "সঙ্গে ক্যামেরা এনেছ নাকি ?"

বিভ্রান্ত মলয়া মাথা নেড়ে বলল, "না তো !"

"জজসাহেবকে প্যাঁচামুখো বলেছ ?"

চমকে পটল হালদারের দিকে তাকাল সত্যশেখর।

পটল কুঁকড়ে গেল। পাংশু মুখটা ফিরিয়ে সে দরজায় দাঁড়ানো চারজনের দিকে অসহায় চোখ রাখল।

"হ্যাঁ।" সত্যশেখর ঢোক গিলে কাঁদোকাঁদো মুখে জজসাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল।

রাজশেখর গর্বভরে হরিশঙ্করের দিকে এমন ভাবে ভ্রূ তুললেন যেন বলতে চান, একেই বলে সিংহ।

"কিন্তু জজসাহেবের মোটেই প্যাঁচার মতো মুখ নয়। এখনও ওনাকে বাংলা ফিল্মের নায়কের ভূমিকায় নামানো যায়। তোমার অবজার্ভেশন যে এত খারাপ, আমি জানতুম না। কী করে যে আইন নিয়ে... যাক গে, জজসাহেব, আপনি যা শাস্তি দিতে চান দিন।"

জজসাহেব বিমূঢ় হয়ে আমতা-আমতা শুরু করলেন। ব্যাপারটা যে এই পর্যায়ে আসবে বুঝতে পারেননি। রুমালে ঘনঘন মুখ মুছতে লাগলেন।

গলা খাঁকারি দিয়ে হরিশঙ্কর বললেন, "শাস্তি কেন ? এই সত্যবাদিতার জন্য সত্যশেখরকে তো তারিফ করা উচিত।"

"ঠিক্, ঠিক্।" জজসাহেব যেন অকূলে কূল পেলেন। "শাস্তি নয়, বরং অভিনন্দন জানানোই ভাল।"

"মানপত্র দেওয়া যেতে পারে।" পটল হালদারের মুখে স্বাভাবিক রঙ ও কণ্ঠস্বরের উদ্দীপনা ফিরে এসেছে।

"আটঘরা-বকদিঘি বাৎসরিক ক্রিকেট ম্যাচ এতবছর ধরে চলছে। কিন্তু সত্যশেখর ছাড়া কেউই আজ পর্যন্ত সেঞ্চুরি করতে পারেনি।" হরিশঙ্কর যেন বকদিঘির নয়, আটঘরার লোক, এমনভাবে কথাগুলো বললেন। "আমার মনে হয়, এই প্রথম এবং একমাত্র কৃতিত্বকে যথার্থ সম্মান দেওয়া হবে যদি আটঘরার আবিষ্কার ফুলকপির বরফি দিয়ে প্রথম সেঞ্চুরি করার সুযোগটাও সত্যশেখরকে দেওয়া হয়। এই সুস্বাদু আবিষ্কারের জন্য ব্যাপক পাবলিসিটিও তো দরকার।" সম্পাদকের দিকে তাকিয়ে হরিশঙ্কর মাথা দোলালেন। সম্পাদকের মাথাও দুলে উঠল সায় দিয়ে, "নিশ্চয় নিশ্চয়, স্পেশাল স্টোরি করা উচিত।"

"আমাদের কিন্তু খুব খিদে পেয়েছে।" দরজার কাছ থেকে কথাগুলো ভেসে এল।

"পাক। আর-একটা সংগ্রাম সামনে, আটঘরার আবিষ্কারের উদ্বোধন-ভক্ষণ হবে সেঞ্চুরি দিয়ে আর সতুবাবুর থেকে সুযোগ্য কেই বা আছেন এই কাজের জন্য ? ...উফ্ফ্, দু'দুটো স্তম্ভ গড়তে হবে...স্যার, আপনাকে কিন্তু দুটোরই... না না, কোনো আপত্তি শুনব না।"

সত্যশেখর বলল, "বাবা, এসব খাওয়া কি উচিত হবে ? ডায়েট চার্টে তো বরফি নেই !"

রাজশেখর একটু ভেবে গম্ভীর হয়ে বললেন, "আটঘরা বা সিংগিবাড়িরই নয়, তোমার নিজের সম্মানও বিপন্ন। জিভ দেখিয়ে, প্যাঁচামুখো বলে|গোলমাল পাকিয়েছ, তাতে সেঞ্চুরি না করলে|..." হরিশঙ্করের দিকে তাকিয়ে কথা শেষ করলেন, "মুখ দেখানো যাবে না।"

"আমি কি বরফি এখানেই আনতে বলব ?" গোপী ঘোষ জজসাহেবকেই প্রশ্ন করলেন।

"তাই বলুন।"

॥ সাত ॥

সত্যশেখরের মুখ ইতোমধ্যে স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। শুধু তাই নয়, একটু ঔজ্জ্বল্যও যেন ফুটে উঠেছে। ঘাড় ফিরিয়ে কলাবতীর দিকে তাকাল, তারপর মলয়ার দিকে। তখন জিভটা ঠোঁটের বাইরে একটু বেরিয়ে এসেছিল। জজসাহেব সেটা লক্ষ করে গম্ভীর হলেন।

"পটলদা, উনি একা-একা সেঞ্চুরি করবেন কী করে ?" হরিশ মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করল। "বল করবে কে ? ফিল্ড করবে কে ? নো-বল কিংবা ওয়াইড হলে ডাকবে কে ? অন্তত জনাচারেক যদি মাঠে না থাকে ।"

"ঠিক কথা, তোমরাও তাহলে সতুর সঙ্গে নেমে পড়ো।" রাজশেখর চারজনকে ঘরের মধ্যে আসার জন্য হাত নাড়লেন।

"ব্যাট তো দুজনে করবে, তাহলে আর একজন ?" জজসাহেব সারা ঘরে চোখ বোলালেন।

"আমি হব কাকার পার্টনার।" কলাবতী এগিয়ে এল।

"আসল লোককেই ঠিক করা হল না, স্কোরার, গুনবে কে ?"

মিনিট কয়েক বাদানুবাদ চলল। অবশেষে মলয়া বলল, "আমি স্কোরার হব। স্কুলে অঙ্কের টিচার না এলে আমিই ক্লাস নিই, যোগ-বিয়োগে কোনো অসুবিধা হয় না। অবশ্য কেউ যদি আপত্তি তোলেন ।" মলয়া কথা শেষ করল সত্যশেখরের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে।

পুজোর দিনে
একটি সুর
গেঞ্জি পরুন
কোহিনুর
K
কোহিনুর নিটিং মিলস্
গেঞ্জি • জাঙ্গিয়া
প্রস্তুতকারক

মলয়াই স্কোরার নিযুক্ত হল পটল হালদারের আপত্তি সত্ত্বেও, কেননা জজসাহেব বা সম্পাদক ছাড়া রাজশেখরও মলয়ার পক্ষে সায় দেন।

কলাবতী ফিসফিস করে বলল, "কাকা, বড়দিকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে।"

সত্যশেখর একটু গলা চড়িয়ে বলল, "সিংগিদের জব্দ করার ব্যবস্থা হলেই কেউ-কেউ সুন্দর হয়ে যায় মজা দেখবে বলে। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা দেখতে দেব না।"

হঠাৎ সারা ঘরে একটা হালকা কিম্ভূত ধরনের দুর্গন্ধের সঞ্চার হল। গোপী ঘোষ ঘরে ঢুকলেন, তার পিছনে দুটি লোকের কাঁধে ট্রে ভর্তি বরফি। ট্রে দুটি তারা টেবলে রেখে চলে গেল। সারা ঘরের চোখ ট্রের উপর।

"গন্ধ কিসের?" জজসাহেব রুমাল দিয়ে নাক মুছলেন।

"আজ্ঞে, গোলাপজলের।" গোপী ঘোষ একগাল হাসলেন।

"উঁহু।" সম্পাদক পকেট থেকে রুমাল বার করলেন। "শুধু গোলাপজল নয়, আরও কিছু যেন বলুন তো কিসের?" প্রশ্নটা জজসাহেবকে।

"বোকা পাঁঠার।"

"তাই কি?" সম্পাদক পতু মুখুজ্যের দিকে তাকালেন।

"মনে হচ্ছে গোবর-পচানো সারের।"

পটল নড়ে-চড়ে বসল। ডান হাতের মুঠি এক গজ উপর থেকে নামিয়ে বাম তালুতে সশব্দে রাখল। "এসব অপপ্রচার। আমি তো গোলাপজলের ছাড়া অন্য কোনো গন্ধ পাচ্ছি না।"

"কিন্তু জজসাহেব পেয়েছেন।" পতু হুঙ্কার দিল। পটলের মুখ শুকিয়ে গেল।

"বোধহয় একটু ভেপসে গন্ধ হয়েছে।" গোপী ঘোষ কাঁচুমাচু হয়ে জানালেন।

"আমি দেখেছি, কেউ খাচ্ছিল না··· সবাই পাতে ফেলে রাখছিল।" চণ্ডী কম্পাউণ্ডার একটা গূঢ় রহস্য ফাঁস করার মতো ফিসফিস স্বরে বলল।

"চঅন্ ···ডী।" পটল হালদার দাঁতে দাঁত চেপে ক্রোধ সংবরণ করল। "মনে রাখিস, তুই আটঘরার লোক এটা আটঘরার আবিষ্কার।"

চণ্ডীর ফ্যাকাসে মুখে ভয় ছড়িয়ে গেল। বিভ্রান্তের মতো বলল, "আমি তো আমি তো বলিনি বরফি খাচ্ছিল না। নিশ্চয় খেয়েছে, আলবাত খেয়েছে।"

হরিশঙ্কর মুচকি হেসে বললেন, "চণ্ডী হয়তো ভুল দেখেছে। আলবাত খেয়েছে, রাজু তো বলল রান্না এক জিনিস আর খাওয়া আর-এক জিনিস। রান্নার পর্ব তো হয়েই গেছে, এবার খাওয়ার পর্ব আমরা দেখব। সবাই তো শুনেছেনই রাজু বলছে এটা আবিষ্কার, এডিটোরিয়াল লেখার সাবজেক্ট! ভাল কথা। খাওয়ার ব্যাপারটা নাকি সিংগিরাই ভাল বোঝে হবেও বা। এখুনি তা প্রমাণ হয়ে যাবে।"

কথাটা কীভাবে যেন ছড়িয়ে পড়েছিল। দরজার কাছে ভিড়, ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে গেছে। জানালা ভরে গেছে উঁকি-দেওয়া মুখে। যারা পরিবেশন করছিল, তাদের কয়েকজনকে ভিড়ের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। দুলু দু'হাত ছড়িয়ে ভিড় ঠেলতে-ঠেলতে বলল, "আপনারা কেউ ঘরের মধ্যে ঢুকবেন না, তাহলে কনসেন্ট্রেশন নষ্ট হয়ে যাবে।"

দুলুর বন্ধু ইতোমধ্যে কয়েকটা ছবি তুলে ফেলেছে। টেবলের ধারে কলাবতী আর সত্যশেখর দাঁড়িয়ে নিচু স্বরে কথা বলছে।

"কাকা, পারবে তো?"

ঠোঁট বেঁকিয়ে সত্যশেখর তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল। "কালমেঘের থেকেও খারাপ লাগবে কি? গ্যাঁদাল পাতা, ব্রাহ্মী শাক, চিরেতা, ত্রিফলা, থানকুনি এই সব হল গিয়ে নেট প্র্যাকটিস। তুই শুধু মেডেন ওভার দিয়ে যাবি আর নজর রাখবি মলয়ার দিকে, মনে হচ্ছে স্কোরে গোলমাল করবে।"

"সাইলেন্স সাইলেন্স।" জজসাহেবের প্রচণ্ড স্বর গমগম করে উঠতেই ঘরটা স্তব্ধ হয়ে গেল। "হরিশঙ্করবাবুকে অনুরোধ করছি, এই ভক্ষণ-ম্যাচের রুল্‌স সম্পর্কে আমাদের অবহিত করতে।"

"খুবই সরল আইন।" হরিশঙ্করকে সিরিয়াস হতে দেখা গেল। "বকদিঘির বিষ্টু মিশিরজি ছ'টা বরফি তুলে দেবে আটঘরার সত্যশেখরের হাতে। হরিশ দেখবে বরফিগুলো আস্ত না ভাঙা, ঠিকমতো মুখের মধ্যে গেল কি না, বা মুখ থেকে ফেলে দেওয়া হল কি না, খেতে অযথা দেরি করা হচ্ছে কি না। মলয়া গুনবে কটা খাওয়া হল। সময় রাখবেন গোপীবাবু। জলপান-বিরতির ব্যাপারটা খুবই ভাইটাল। সারা দিনে তিনবার মাঠে জল আসে, তাছাড়া লাঞ্চ অ্যাণ্ড টি আছে। এখানে তাই পাঁচবার জল দেওয়া যাবে আর দশ মিনিট আর পাঁচ মিনিটের দুটো ব্রেক। মিশিরজির পর পতু বরফি দেবে কালুকে। মানে কলাবতীকে।" ঘরের সকলের দিকে চোখ বুলিয়ে হরিশঙ্কর অনুমোদন প্রত্যাশা করলেন। অনেকেই মাথা নাড়িয়ে তাঁকে সমর্থন জানাল।

"এখানে কি আউট নেই?" জানলার বাইরে থেকে অজানা কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন এল।

"নিশ্চয় আছে। এদের মধ্যে কেউ খাওয়ায় নিবৃত্ত হলে আটঘরার অন্য কেউ নামবে। এই তো চণ্ডী রয়েছে, পটলবাবু রয়েছেন।" হরিশঙ্করের আঙুল পটল হালদারের দিকে উঁচিয়ে রইল।

"অ্যাঁ! আআআ ···মি!" পটল হালদার বরফির স্তূপের দিকে সভয়ে তাকিয়ে বলল। "আমি তো ক্রিকেট কখনও খেলিনি।"

"খেলেননি ঠিক কথা। কিন্তু কখনও কি কিছু খাননি ভাত ডাল তরকারি মাছ এই সব?" জজসাহেব তার বিপুল গোঁফের ভেতর থেকে একটা মুচকি হাসি বার করলেন।

"তা খেয়েছি। কিন্তু তাতে তো এমন গন্ধ মানে এটা নতুন জিনিস তো, সমিতির নির্দেশ না পেলে ···"

"পটলদা, এটা সংগ্রাম, ঝাঁপিয়ে পড়ো।" চণ্ডীর আবেদন পটল হালদারকে বিচলিত করার আগেই রাজশেখর জলদকণ্ঠে বললেন, "থাক্, আমি তো আছি।"

চণ্ডী বিড়বিড় করল। শোনার জন্য বিষ্টু মিশির গলা বাড়িয়ে দিল।

"অ্যাঁ! কী বললি? দুর্গন্ধ? এমন আবিষ্কার কি কেউ বিয়েবাড়িতে খাইয়ে বউনি করে?"

"গোলাপজল ঢেলে গন্ধ চাপতে গিয়েই কেস খারাপ করে ফেলেছে। ওদিকে পাতে এতক্ষণ বিরিয়ানি নিশ্চয় এসে গেছে। ব্যাচটা উঠলেই বসে পড়ব।"

"আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাস ভাই।"

॥ আট ॥

হঠাৎ নির্ঘোষ শোনা গেল হরিশের গলায়, "প্লে"।

নাক কুঁচকে বিষ্টু গুনে-গুনে ছ'টা বরফি ট্রে থেকে তুলে বাড়িয়ে ধরল। সত্যশেখর ছ'টাই খপ করে তুলে নিয়ে মুখে পুরে কোঁত করে গিলে ফেলল। সবিস্ময়ে হর্ষধ্বনি উঠল দরজায়, জানলায়।

"ছক্কা, প্রথম ওভারেই ছক্কা!"

"জনগণ আপনার সাথে আছে; সতুবাবু, চালিয়ে যান।" পটল হালদার প্রবল উদ্দীপনায় তার পাশের উরুতে চাপড় মারল।

"আবার আপনি ···"

"আর হবে না, স্যার কিন্তু আপনাকে আমি আটঘরায় নিয়ে যাবই।"

কলাবতী অবাক হয়ে কাকার মুখের দিকে তাকিয়ে। সত্যশেখর তাচ্ছিল্যের ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, "বাটা নিমপাতা এর থেকেও কুইক গিলতে পারি।"

এবার পতু মুখুজ্যের পালা। মুখবিকৃতি করে সে ছ'টা বরফি তুলল। কলাবতী প্রত্যেকটা থেকে সামান্য ভেঙে মুখে দিয়ে হাত নেড়ে জানাল আর খাবে না।

"মেডেন দিল। খুব চালাক মেয়ে তো!" সম্পাদক ফিসফিস করে জজসাহেবকে বললেন। হরিশঙ্করের মুখে মৃদু হাসি ভেসে বেড়াচ্ছে। আপনমনে বললেন, "দেখা যাক।"

সাত মিনিট পর দেখা গেল সত্যশেখর সাতটি ওভার বাউণ্ডারি এবং একটি বাউণ্ডারি গিলে হাফ সেঞ্চুরির দরজায় পৌঁছে গেছে। স্টাইল দেখাতে ছুঁড়ে মুখের মধ্যে পাঠাতে গিয়ে দুটো বরফি ঠোঁটে লেগে মাটিতে পড়ে না গেলে সে আটচল্লিশে পৌঁছে যেত। কলাবতী এখনও স্কোর করেনি।

"দারুণ চালাচ্ছে তো আপনার ছেলে।" জজসাহেব ঝুঁকে রাজশেখরকে বললেন। "মনে হচ্ছে সেঞ্চুরি করবে।"

"মনে হচ্ছে মানে?" পটল হালদার সোফা থেকে এক বিঘত উঠে দুই মুঠো ঝাঁকিয়ে বলল, "দুটো স্তম্ভের আবরণ আপনাকে উন্মোচন করতে হবে। সতুবাবু, এগিয়ে চলুন।"

স্কোর পঞ্চাশ পার হতেই তুমুল হাততালির, কোলাহলের এবং ঘনঘন ক্যামেরার আলোর ঝলসানির মাঝে বাইরে শোনা গেল "ওরে, বরকে ছাঁদনাতলায় নিয়ে আয়!"

"গোপীবাবুকে তো এবার যেতে হবে।" সম্পাদক বললেন। বাইরে সানাই বেজে উঠল।

"অসম্ভব! আটঘরার প্রেস্টিজ এখন কঠিন সঙ্কটে।"

চণ্ডী ফিসফিস করল, "হ্যাঁ রে, মনে হল ওদিকে যেন পান আনতে বলল। এবার তো রেডি হতে হয়।"

বিষ্টু ঝুঁকে হরিশের কানে-কানে বলল, "নতুন ব্যাচ বসবে, তাড়াতাড়ি শেষ করে না দিলে

হরিশ বলল, "তিনটে তিনটে দিয়ে ওভার করুন আর পতু মুখুজ্যে যেন টের না পায়।"

কলাবতী তার কাকাকে তখন বলল, "স্কোরিং রেট খুব ফাস্ট হচ্ছে, এবার গোটাকতক মেডেন দাও।"

"উঁহু, তাহলে ওরা মাথায় চড়ে বসবে।" এই বলে সত্যশেখর তার জিভ ইঞ্চি তিনেক বার করে মলয়ার দিকে ঘুরে তাকাল। মলয়ার চোখ কটমট হয়ে উঠতেই জজসাহেব স্মিত হেসে বললেন, "পারমিসিবল, ফিফটি হয়ে গেছে তো; তবে সেঞ্চুরির পর উনি আর-একবার মাত্র দেখাতে পারবেন।"

এরপর প্রবল উত্তেজনা আর চিৎকারের মধ্য দিয়ে স্কোর ষাট থেকে সত্তরের কোঠায় উঠল। সত্যশেখরকে অবশ্য এর মধ্যে কয়েকবার বিস্মিত হয়ে বিষ্টুর দিকে তাকাতে দেখা গেছল।

ছিয়াত্তর থেকে বিরাশিতে পৌঁছতেই সম্পাদক বলে উঠলেন, "উফ্ফ, এ যে মেলবোর্ন টাই-টেস্টের মতো এক্সাইটিং লাগছে।"

রাজশেখর আড়চোখে হরিশঙ্করের দিকে তাকিয়ে গলা খাঁকারি দিলেন। হরিশঙ্করের গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হল।

নিরানব্বুই! পটল হালদার দু'হাত বাড়িয়ে সত্যশেখরের দিকে ছুটে যাচ্ছিল। জজসাহেব তার কাছা টেনে ধরলেন।

"এখনও শেষ হয়নি, একটা বাকি রয়েছে যে!"

পটল হালদার সোফায় ফিরে এল কাছাটা জজসাহেবের মুঠো থেকে ছাড়াতে না পেরে।

"আপনি যাবেন তো, জোড়া স্তম্ভ

"যাব যাব, সুস্থির হয়ে বসুন তো।"

পতু মুখুজ্যে খুঁতখুঁতে গলায় হরিশ কর্মকারকে বলল, "ঠিকমতো দেখেছ তো? ষাট থেকে স্কোরটা বড্ড ফাস্ট উঠল যেন।"

"উঠবেই তো, চোখ মানে স্টমাকটা সেট হয়ে গেছে তো।" নিরানব্বুই!

জজসাহেব রুমালে কপাল মুছলেন, ঠোঁট চাটলেন। সম্পাদক হাতছানি দিয়ে দুলুর বন্ধুকে ডেকে বললেন, "সেঞ্চুরি করছে সবে মুখের মধ্যে দিয়েছে, এমন একটা ছবি চাই, এক্সক্লুসিভ।"

সত্যশেখর একটা বরফি পতুর হাত থেকে তুলে কী ভেবে আর-একটা তুলল। পেটে হাত বুলিয়ে ঘরের চারপাশে তাকিয়ে হাসল। তারপর একসঙ্গে কপাত করে মুখে পুরে ঢোক গিলে বিরাট হাঁ করে মুখের মধ্যে পুরে ভিতরটা দেখাল। ক্যামেরার আলো ঝলসাল বারবার।

এরপর ঘরের মধ্যে কী হুলুস্থুলু কাণ্ড ঘটল তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

সর্বাগ্রে হরিশ, বিষ্টু আর চণ্ডী খ্যাপা ষাঁড়ের মতো ভিড় ঠেলে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছল। পটলের কাছা জজসাহেবকে দু'হাতে টেনে রাখতে হয়েছিল। সম্পাদক গোপী ঘোষকে আগামীকাল সকালে রেডি থাকতে বললেন, চিফ রিপোর্টার আসবে ইন্টারভ্যু করতে। পতু বারবার মলয়াকে জিজ্ঞাসা করেছিল ঠিকমতো গোনা হয়েছে কি না। রাজশেখরের চোখ দিয়ে শুধু কয়েক ফোঁটা জল ঝরেছিল। জজসাহেব রুমালটা এগিয়ে দিতে তিনি ধন্যবাদ জানিয়ে সেটি নিয়ে চোখ মোছেন, আর বলেন, "আশা করি ওর জিভ বার করা মার্জনা করবেন।" জজসাহেব জিভ কেটে বললেন, "কী যে বলেন। এত বড় গুণী আমি জানতাম না। নিশ্চয় জিভ দেখাবে কিন্তু আপনি কি সিরিয়াসলি মনে করেন সিনেমার নায়ক হওয়ার মতো ..."

রাজশেখর ততক্ষণে হরিশঙ্করের দিকে তাকিয়ে হাসছেন।

"রাজু, তোর ছেলে পারল কী করে বল তো? সত্যি বলছি, এমন উৎকট গন্ধওলা জিনিস আমি জীবনে দেখিনি!"

"সিংগিবাড়ির ছেলে তো বংশের মান রাখতে ..."

"না না, ভুল বলছেন, আটঘরার জনগণের নিবিড় প্রেরণা জনগণকে সঠিক পথ দেখাবার ..."

বাড়ি ফেরার সময় রাজশেখর ট্র্যাফিকের লাল আলো দেখে গাড়ি থামাতেই কলাবতী বলল, "দাদু, সেঞ্চুরির জন্য আমাদের কোনো উপহার দেবে না?"

"নিশ্চয় নিশ্চয়, কী চাই তোদের?"

পাশে একটা সবুজ অ্যাম্বাসাডার এসে থামল। রাজশেখর মুখ ফিরিয়ে তাকালেন।

"তোমার ডায়েট চার্ট এবার বন্ধ হোক।"

"অ্যাঁ! আমি তো ভাবছিলাম কাল থেকে চার্টে আরও কয়েকটা

"চার্ট বন্ধ না করলে কাল থেকে আমি আর কাকা অনশন শুরু ..."

বলতে বলতে কলাবতী পিছনের সিটের দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখল সত্যশেখর জিভ বার করেছে আর পাশের গাড়ির জানালা দিয়ে বড়দি গম্ভীর মুখে আকাশের দিকে তাকিয়ে।

হয়তো

অলকচন্দ্র গুপ্ত

অবিনাশবাবু খবরের কাগজটা ভাঁজ করে টেবিলে রাখলেন। তারপর চশমা খুলে কাগজের ওপর রেখে জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন। ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি, বেলা প্রায় সাড়ে-দশটা। গুমোট গরম। একটু আগেই বৃষ্টি হচ্ছিল, এখন আকাশের এখানে ওখানে নীল ফাটল দিয়ে রোদ্দুর বেরিয়েছে। আজ ছুটির দিন। রবিবার। রাস্তায় ছেলেরা হল্লা করে ফুটবল খেলছে,তার আওয়াজ শুনতে শুনতে অবিনাশবাবু অন্যমনস্ক ভাবে বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন। শরৎকাল অবিনাশবাবুর প্রিয় ঋতু। পাঁজির হিসেবে যদিও শরৎকাল এসে গেছে, কিন্তু যা তিনি ছেলেবেলা থেকে মুগ্ধ হয়ে দেখেন সেই তকতকে নীল আকাশ, ধীরে ভেসে বেড়ানো নানান চেহারার সাদা মোমের মতো মেঘ আর তার নীচে সোনার জলে ধোয়া ঝকঝকে দিন এখনো এসে পৌঁছয়নি।

অবিনাশবাবুর বয়েস ষাট পেরিয়েছে। রোগা, লম্বা, ফর্সা চেহারা। চোখে সোনার চশমা। মাথায় পাতলা হয়ে আসা চুল মাঝখান দিয়ে সিঁথি করা, তাতে সাদা কালো প্রায় সমান সমান। বেশ উঁচুর দিকের সরকারি চাকরি করতেন, বছর দুই হল অবসর নিয়েছেন। দক্ষিণ কলকাতায় লেকের কাছে এই বাড়িটা তৈরি করেছেন বছর-পাঁচেক আগে। দোতলার তিনটে ঘর নিয়ে তিনি একাই থাকেন। একতলা ভাড়া দিয়েছেন। তাঁর এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলে ক্যানাডায় ডাক্তার, সেখানেই বিয়ে-থা করে পাকাপাকিভাবে আছে। মেয়ে-জামাই থাকে দিল্লিতে। অবিনাশবাবুর স্ত্রী মেয়ের কাছেই থাকেন, নাতি-নাতনির দেখাশোনা করেন। বছরে বার-দুই স্ত্রী, মেয়ে, নাতি-নাতনির সঙ্গে তাঁর দেখা হয়, যখন তারা কলকাতায় আসে। নাতি-নাতনিরা তো কলকাতায় আসতেই চায় না, অবিনাশবাবুর স্ত্রীও কলকাতা শহর বাসের অযোগ্য মনে করেন। ছেলের সঙ্গে অবিনাশবাবুর শেষ দেখা হয়েছে তিন বছর আগে, যখন সে তার স্ত্রীকে ভারতবর্ষ দেখাতে নিয়ে এসেছিল। কলকাতায় ছিল দু-দিন। অবশ্য একা থাকেন বলে অবিনাশবাবুর কোনো কষ্ট নেই। অনেক দিনের পুরনো লোক উপেন আছে, সে সাধ্যমতো তাঁকে দেখাশোনা করে। পাড়ার কারও বাড়িতে তাঁর যাতায়াত নেই, যদিও প্রায় সবার সঙ্গেই মৌখিক আলাপ আছে। অনেক রিটায়ার্ড লোকের কাছে যেমন সময় কাটানো একটা সমস্যা, অবিনাশবাবুর তা নয়। বই পড়া অবিনাশবাবুর নেশা, ব্রিটিশ কাউন্সিল আর পাড়ার লাইব্রেরি থেকে নানা বিষয়ের বই নিয়ে আসেন, গল্প-কবিতা-উপন্যাস-ভ্রমণকাহিনী-দর্শন সবই তাঁর পড়তে ভাল লাগে। আর ভাল লাগে চুপচাপ একলা বসে থাকতে। কত পুরনো দিনের কথা মনের মধ্যে ভিড় করে আসে। ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব যাদের অনেকেই আজ ওপারে, তাদের মুখ, কথা বলার ভঙ্গি, হাঁটা-চলার কায়দা কিছুই তিনি ভোলেননি। পাঁচ বছর বয়েস থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করা পর্যন্ত ভবানীপুরের যে বাড়িতে বড় হয়েছেন তার ঘর-বারান্দা, ছাদ, আনাচ-কানাচ সব তাঁর পরিষ্কার মনে আছে—যেন দুদিন আগেও সে-বাড়িতে ছিলেন! ছেলেবেলা থেকে নিজের সমস্ত জীবনটা চোখের সামনে মেলে ধরতে চেষ্টা করেন এতে তিনি মনে আনন্দ পান।

অবিনাশবাবুর আর-একটি অভ্যেস রোজ সকালে খবরের কাগজে দেখা শহরের কোথায় কী সভা-সমিতি হচ্ছে। রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ নেই, তাই রাজনৈতিক সভা ছাড়া অন্য যে

কোনো বিষয়েই হোক এবং শহরের যেখানেই হোক সপ্তাহে একদিন তিনি বক্তৃতা শুনতে যাবেনই। এটা তাঁর একটা নেশা। কয়েকবার ছোটখাটো জায়গায় নাম-না-জানা লোকের মুখে এমন বক্তৃতা তিনি শুনেছেন যা ভুলতে পারেননি। বছর-দেড়েক আগে বৌবাজারে এক জায়গায় অল্পবয়সী এক ভদ্রলোককে নক্ষত্রলোক ও আমাদের সৌরজগৎ সম্বন্ধে বলতে শুনেছিলেন, এমন আলোচনা তিনি আর কোথাও শোনেননি, যদিও ঐ একই বিষয়ে অন্য জায়গায় নামকরা বিজ্ঞানের অধ্যাপকদের বক্তৃতা শোনার তাঁর সুযোগ হয়েছে। এরও বছরখানেক আগে বেহালায় একজনের মুখে বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনেছিলেন, যার পর ও বিষয়ে নতুন কোনো কথা তিনি কোনো বইয়ে পাননি।

নানান জায়গায় মিটিং শুনতে যাওয়া অবিনাশবাবুর কাছে অ্যাডভেঞ্চারের মতো, আশা করে যান হয়তো কোনো নতুন বিষয়ে কিছু জানতে পারবেন অথবা কোনো জানা বিষয় নতুন আলোতে দেখতে পাবেন যা আগে ভাবতে পারেননি। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরাশ হয়ে ফিরতে হয়েছে তবু তাঁর উৎসাহ কমেনি। আজও তিনি মন দিয়ে খবরের কাগজে দেখছিলেন, শুনতে ইচ্ছে করে এমন কোনো বিষয়ে কোথাও কোনো মিটিং আছে কি না। দেখলেন এক জায়গায় বক্তৃতার বিষয় লিখেছে, 'অস্তিত্ব-রহস্য'। অস্তিত্ব-রহস্যটা আবার কী ব্যাপার। অবিনাশবাবু একটু উৎসাহ বোধ করলেন, দেখাই যাক না কী বলে। মিটিং সাড়ে-পাঁচটায়, অবিনাশবাবু ঠিক করলেন যাবেন। বারোটার মধ্যে স্নান-খাওয়া সেরে উপেনকে বললেন চারটের সময় চা দিতে। খাবার পর ইজিচেয়ারে শুয়ে খবরের কাগজটা আবার দেখলেন। মিটিংয়ের জায়গা লিখেছে ১৭/২ ভুবন হালদার লেন। নির্দেশ দেওয়া আছে কর্নওয়ালিস বিডন স্ট্রিটের মোড় থেকে পুব দিকে কিছু দূর এগোলে বাঁয়ে ভুবন হালদার লেন পড়বে। ভুবন হালদার লেনের নাম আগে যেন শুনেছেন মনে হল। মনে পড়ল স্কুলে সুরেশ বলে একটি ছেলে তাঁর সঙ্গে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছিল, তার কাছে শুনেছিলেন যে, তাদের পুরনো পৈতৃক বাড়ি ছিল ভুবন হালদার লেনে। আশ্চর্য! রাস্তাটার নাম এতদিন পরে হঠাৎ কাগজে দেখলেন। অস্তিত্ব রহস্যর মানে তো কত কিছুই হতে পারে, কী যে ঠিক বোঝাতে চেয়েছে, অবিনাশবাবু ভেবে পেলেন না। যত ভাবলেন ততই ভুবন হালদার লেন তাঁকে টানতে লাগল। ভাবতে ভাবতে ঝিমুনি এসেছিল, চারটের সময় উপেন চা নিয়ে এলে তন্দ্রা ভাঙল। ইজিচেয়ারে শুয়ে তন্দ্রার ঘোরে কী যেন সব স্বপ্ন দেখছিলেন, অবিনাশবাবু চেষ্টা করেও মনে করতে পারলেন না, কিন্তু শরীর বেশ ঝরঝরে আর মনে ফুর্তি বোধ করতে লাগলেন। জানলা দিয়ে দেখলেন বাইরে রোদ্দুর নেই, আকাশে মেঘ জমছে। তৈরি হয়ে ছাতা নিয়ে গড়িয়াহাটের মোড়ে যখন ট্রাম ধরলেন তখন ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

এসপ্লানেডে নেমে যখন শ্যামবাজারের ট্রামে উঠলেন, চারদিক অন্ধকার করে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি এল। ট্রামে যাত্রীও মাত্র চার-পাঁচজন, নেহাত প্রয়োজন ছাড়া কে আর এই দুর্যোগে বেরুতে চায়। অবিনাশবাবুর কিন্তু মনে হল না যে, না-বেরোলেই ভাল হত, বরং সেই রহস্যময় বিষয় সম্বন্ধে বক্তা কী বলে তাই শোনার জন্য মনের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা বোধ করতে লাগলেন।

বিডন স্ট্রিটের মোড়ে যখন ট্রাম থেকে নামলেন তখন বৃষ্টি একটু ধরেছে কিন্তু আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা। এখনো বিকেল সাড়ে পাঁচটা হয়নি অথচ সন্ধে নেমে এসেছে, কালো চশমার মধ্য দিয়ে যেমন দেখায় চারদিকে তেমনি থমথমে আবছা অন্ধকার। ছাতা মাথায় অবিনাশবাবু এগোলেন। এই তো ভুবন হালদার লেন। অল্প হাঁটতেই ১৭ নম্বর পাওয়া গেল। তার পাশেই ১৭/১ কিন্তু ১৭/২ কোথায়? ১৭/১-র পর ১৮ নম্বর বাড়ি। অবিনাশবাবু ব্যস্ত হয়ে বারকয়েক এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করলেন। হঠাৎ চোখে পড়ল ১৭ আর ১৭/১ নম্বর বাড়ির মাঝখানে রাস্তা থেকে দু'ধাপ উঠে একটা কালো ভেজানো দরজা, তাড়াহুড়োয় বোধহয় আগে নজরে আসেনি। অন্ধকারে দরজার গায়ে বাড়ির নম্বর দেওয়া আছে কিনা বোঝা গেল না। ততক্ষণে আবার ঝেঁপে বৃষ্টি এল। আর ইতস্তত না করে অবিনাশবাবু সেই ভেজানো দরজায় ধাক্কা দিলেন, ভিতর থেকে কে যেন দরজা খুলে দিল।

অন্ধকারে দেখা গেল সামনেই সিঁড়ি সোজা ওপরে উঠে গেছে। সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কী করবেন ভাবছেন অবিনাশবাবু, তখন ওপরের ল্যাণ্ডিং থেকে কে একজন বলল, ওপরে উঠে আসুন। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে আবছা আলোয় দেখলেন, ল্যাণ্ডিং থেকে যিনি কথা বলছিলেন তিনি আগে-আগে চলেছেন। অবিনাশবাবু শুনলেন ভদ্রলোক বলছেন, এই দুর্যোগ মাথায় করে আপনিই এসেছেন, আর কেউ আসবে না। আপনার মতো উৎসাহ আর জানবার ইচ্ছে খুব কম লোকেরই আছে। কথা বলতে বলতে সিঁড়ি ভেঙে ভদ্রলোক অবিনাশবাবুকে যেখানে নিয়ে এলেন সেটা ছাদের ঘর বলে মনে হল। সামনে বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে খোলা ছাদের ওপর বৃষ্টির শব্দ শোনা যাচ্ছে। যেখানে অবিনাশবাবু দাঁড়িয়েছেন তার কাছেই একটা পুরনো কাঠের চেয়ার।

ভদ্রলোক বললেন, "বসুন।" মনে হল নিজেও একটু দূরে, আর একটা চেয়ারে বসলেন। অন্ধকারে ভদ্রলোকের মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। অবিনাশবাবু শুনলেন, ভদ্রলোক বলছেন, "আপনি নিশ্চয় ভাবতে ভাবতে এসেছেন আজকের বক্তৃতার বিষয়টা ঠিক কী হতে পারে, তাই না? এ বিষয়ের অনেক দিক আছে। একটা দিকের কথা শুধু আপনাকে বলি, আপনি বুঝবেন। আপনি তো এই বয়সেও নিজের ছেলেবেলাকার কথা একেবারে ভুলে যাননি, সেই সব পুরনো দিনের কথা থেকে-থেকে আপনার আজও মনে পড়ে, ঠিক নয় কি?"

অবিনাশবাবুর মনে হল, এ গলার আওয়াজ তাঁর পরিচিত, কিন্তু কোথায় শুনেছেন মনে করতে পারলেন না।

"ফোটোর অ্যালবামে নিজের আর আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের পুরনো ছবি দেখে সেই হারানো দিনের কথা কম আর বেশি সবারই মনে হয় কিন্তু সে-দিনগুলি তো ফিরে আসে না। কোথায় গেল সে সব দিন! সে কি একেবারেই হারিয়ে গেছে? না, কিছুই হারায়নি, কেউ হারায় না, শুধু জায়গা বদলে-বদলে সব কিছুই থাকে।" শেষের কথাগুলো অবিনাশবাবুর মনে হল তাঁর জানা কোনো কবিতায় আছে, কিন্তু কোন্ কবিতা, কার লেখা মনে করতে পারলেন না। কেমন যেন ঘুম আসতে লাগল তাঁর।

আচ্ছন্নের মতো শুনতে লাগলেন। ভদ্রলোক বলে চলেছেন, "যদি ক্যামেরার সাহায্যে ধরে রাখা বহু বছর আগেকার একটি মুহূর্তের ছবি আজও দেখা যায়, অনেক বছর আগে গাওয়া একটি গান যদি গ্রামোফোন বাজালে আজও শোনা যায়, তবে সেই জীবন্ত মুহূর্তটিও, শুধু তার ছায়া নয়, কোথাও ধরা থাকতে পারে, এটা কি একেবারেই অসম্ভব? না, অসম্ভব নয়। তবে সেই হারানো দিনগুলিকে ফিরে পেতে হলে চাই উপযুক্ত মন আর দেখবার চোখ যা কিনা দশ লাখে একজনেরও আছে কিনা সন্দেহ। অতীতের স্মৃতি যাঁদের মন থেকে একেবারে মুছে যায়নি তাঁরাও অতীতকে স্মৃতির বেশি আর কিছু ভাবতে পারেন না। আপনি ব্যতিক্রম, আপনার মন আর চোখ তো প্রায় তৈরি। হ্যাঁ, অনুকূল পরিবেশও খুব দরকার, সেদিক থেকে আজকের এই দিন আইডিয়াল। এখন সামান্য একটু সাহায্য করলেই আপনি —।"

হঠাৎ ছাদের দিকের ভেজানো দরজাটা খুলে গেল, বৃষ্টির ছাট গায়ে লাগতে অবিনাশবাবু উঠে দাঁড়ালেন। পেছনের অন্ধকার থেকে আওয়াজ এল, "বাইরে তাকিয়ে দেখুন।" এক-পা এক-পা

করে অবিনাশবাবু ছাদের দরজার দিকে এগোলেন। এ কী! প্রায়ান্ধকার ছাদে বৃষ্টির ঝালরের ওপারে এ কী দেখছেন তিনি। গাঢ় নীল আকাশ, আর তার নীচে আর একটি ছাদ, যেটা তাঁর অতি পরিচিত, তার আশেপাশে আরো সব চেনা বাড়ি, বিকেলের রোদ্দুরে জলছবির মতো ঝকঝক করছে। ঐ তো গলির মোড়ে বসাকদের বাড়ির রেলিং দিয়ে ঘেরা কোণের ঘরটা, যেখানে বাড়ির বাবুরা একটা ময়ূর পুষেছিলেন প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। কাছেই মাঠে খেলতে যাবার রাস্তায় তিনি আর তাঁর বন্ধুরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে যেতেন যদি ময়ূর পেখম মেলে এই আশায়। উলটো দিকে সেনদের বাড়ির বাগানের লম্বা গাছের সার তেমনি আছে, যার আড়াল থেকে পূর্ণিমার মস্ত চাঁদ ধীরে ধীরে উঠে আসত। অবিনাশবাবুদের বাড়ির সামনে ভোলারা থাকত। ভোলা, তার মা, দাদারা আর ছোটবোন। মনে আছে যখন তিনি ক্লাস নাইনে পড়েন তখন ভোলারা এই ভাড়াবাড়ি ছেড়ে অন্য পাড়ায় উঠে গেলে খালি বাড়িটার দিকে তাকিয়ে কিছুদিন তাঁর খুব কষ্ট হত। ভোলাদের বাড়িটা ভাল করে দেখার জন্য অবিনাশবাবু সামনের দিকে ঝুঁকলেন। এমন সময় নজরে পড়ল—আরে, তাঁদের নিজেদের বাড়ির ছাদ থেকে কে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। ঘুড়ি ওড়াত সুকুমার, তিনি লাটাই ধরতেন। সুকুমার তাকে ঘুড়ির কল বাঁধতে, সুতোয় মাঞ্জা দিতে শিখিয়েছিল। ওই তো, তাঁদের ছাদ থেকে তরতর করে একটা চাঁদিয়াল নীল আকাশের দিকে উঠে আসছে, ঘুড়ির কলের ঠিক নীচে সুতো ধনুকের মতো বেঁকে গেছে, রোদ্দুরে তাও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ছাদের পাঁচিলের ওপর দিয়ে ও কার মাথা। ওই তো সুকুমার। কিন্তু লাটাই ধরেছে কে, তিনি তো এখানে।

অবিনাশবাবু চেঁচিয়ে ডাকলেন, "সুকুমার, সুকুমার।" কেন শুনছে না সুকুমার। বেশি দূর তো নয়, বৃষ্টির এই দেয়ালের ওপারেই। অবিনাশবাবু দৌড়ে ঘরের বাইরে বেরুলেন।

১৭/১ ভুবন হালদার লেনের মালিক দু-ভাইয়ের মধ্যে বাড়ি পার্টিশান হচ্ছিল। পার্টিশান শেষ হলে বাড়ির এক অংশের নম্বর ১৭/২ হত কিনা জানা নেই। বাড়ি ভাঙাভাঙি মেরামতের সুবিধের জন্য দু-পরিবারই কিছুদিন হল অন্যত্র বাস করছিলেন। সকালে মিস্ত্রিরা কাজ করতে এলে ছাদের ওপর অবিনাশবাবুকে দেখতে পেল। পরনের ধুতি-পাঞ্জাবি জল-কাদায় মাখামাখি, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে আছেন। মুখে কোনো কষ্টের চিহ্ন নেই, এমন কি চশমাটাও চোখ থেকে খুলে যায়নি। ছাদের ঘরে একটা ভাঙা চেয়ারে ঝোলানো অবিনাশবাবুর ছাতাও পাওয়া গেল।

অবিনাশবাবুর মৃত্যুর কারণ পরে জানা গেল, সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস। প্রশ্ন থেকে গেল, তিনি লোকশূন্য সম্পূর্ণ অজানা এক বাড়ির ছাদে উঠতে গেলেন কেন? উপেন তার মনিবের সভা-সমিতিতে যাওয়ার অভ্যেস জানত, পুলিশকেও সে-কথা জানিয়েছিল। কিন্তু সব খবরের কাগজ তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও ভুবন হালদার লেনে কোনো মিটিংয়ের খবর পাওয়া গেল না। কেউ বললেন, হয়তো অবিনাশবাবুর অন্য কোথাও যাবার ছিল, তারপর সেরিব্রাল অ্যাটাকের সূত্রপাত হতে সব গোলমাল হয়ে গিয়েছিল।

তবু প্রশ্ন থাকে, তিনি বাড়ির ভেতরে ঢুকলেন কেমন করে? ১৭/১ বাড়ির দুটো দরজা। মিস্ত্রিরা বিকেলে কাজ শেষ করা একটা দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে অন্যটা বাইরে থেকে তালা দিয়ে যায়। সেদিনও মিস্ত্রিরা তালা খুলেই ভেতরে ঢোকে। অবিনাশবাবু তবে কী করে ছাদে উঠলেন?

এর উত্তরে কেউ বললেন মিস্ত্রিরা স্বীকার না করলেও হয়তো তারা আগের দিন ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল। হয়তো… কে জানে!

ছবি অহিভূষণ মালিক

সরল

শিবশম্ভু পাল

সরলের উত্তর সকলেই জানো তো
শূন্য অথবা এক হয় সাধারণত।

সরলে ভিড়েছে যত গুণ ভাগ যোগ
সিঁড়িভাঙা দশমিক নানা দুর্যোগ।

সবচেয়ে গোলমেলে গুণ-ভাগ-'এর',
গোদের ওপর বিষফোড়া ব্র্যাকেটের।

এবং সরল শুধু গণিতে না, বাইরে,
ঘর থেকে সামান্য বেরুলেই, ভাই রে।

ধর্মতলায় এসো, চেয়ে দ্যাখো চারদিক
হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান আর শিখ।

পাশাপাশি হাঁটছেন পথে নিঃশঙ্ক,
নানাবেশে চলমান সরলের অঙ্ক।

যতই জটিল গুণ ভাগ, জেনে নিয়ো—
উত্তর সেই এক, একই ভারতীয়।

ছবি অহিভূষণ মালিক

হিরো

মঞ্জিল সেন

সৌম্যের চোখের সামনেই ঘটনাটা ঘটে গেল। বেলা তখন প্রায় দুটো। ওদের ইস্কুল মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করেছে, তাই আগেই ছুটি হয়ে গিয়েছিল। শরৎ বসু রোড ধরে ও হাঁটছিল দেশপ্রিয় পার্কের দিকে। বড় পোস্টাপিসের বাড়িটা ছাড়িয়ে একটা বাস-স্ট্যাণ্ডের কাছে বেশ-কিছু যাত্রী বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, দু'জন মহিলাও ছিলেন। হঠাৎ একটা গাড়ি এসে জোরে ব্রেক কষল, তারপরই গাড়ির দরজা খুলে লাফিয়ে পড়ল চারজন যুবক, বয়স বেশি নয়, কুড়ি থেকে পঁচিশের মধ্যে। একজনের হাতে ছোরা, একজনের হাতে গোল বলের মতো কী যেন একটা। পরে অবশ্য সৌম্য বুঝেছিল, ওটা আসলে একটা বোমা।

অন্যদের হাতেও কিছু ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু সৌম্যের নজর তখন অন্য দিকে, ওর চোখের সামনে নাটকের মতো একটা দৃশ্য ফুটে উঠেছে। মোটামতন এক ভদ্রলোক একটা পেটমোটা ব্রিফকেস নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। একজন প্রথমেই সেটা তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিল। ভদ্রলোক হাহা করে ব্যাগটা উদ্ধারের আশায় এক পা এগুতেই ব্যাগটা যে কেড়ে নিয়েছিল সে ছোরার ফলাটা চেপে ধরল তাঁর বুকে, থর্‌থর্‌ করে কেঁপে উঠল ভদ্রলোকের শরীর, তারপরই টাল সামলাতে না পেরে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন।

আরেকজন এক ভদ্রমহিলার হাত থেকে ঢাউস বটুয়াটা কেড়ে নিল, তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। তারপরই যারা ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল, যে যেদিকে পারল দৌড়ুল, সে যেন ওলিম্পিকের দৌড়কেও হার মানায়। দেখতে-দেখতে জায়গাটা ফাঁকা। যুবক চারজন চটপট গাড়িতে উঠে চোখের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওরা চলে যেতেই আবার ভিড় জমতে শুরু করল। নানানজনের নানান মন্তব্য টুকরো-টুকরো ভেসে এল সৌম্যের কানে। দু'-একজন আবার আস্ফালন করলেন, ঘটনার সময় যদি ওখানে থাকতেন তবে মজাটা টের পাইয়ে দিতেন বাছাধনদের। সৌম্য মনে মনে ভাবল, হুঁ, তখন তোমাদের টিকিও দেখা যেত না, মুখেই যত বড়-বড় কথা।

বাড়ি ফিরে মা'কে ও সবিস্তারে সব ঘটনা বলল। মা তো ওর কথা শুনে ভয়ে কাঠ, বললেন, "তুই কেন ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলি? তোকে যদি ডাকাতরা কিছু করত?"

"আমাকে আবার কী করবে!" সৌম্য বিজ্ঞের মতো জবাব দিল, "আমার কাছে কি টাকাপয়সা ছিল?"

"তবু তোর ওখানে দাঁড়িয়ে থাকার দরকারটা কী ছিল?"

"বাঃ চোখের সামনে অমন একটা ঘটনা ঘটছে, দেখব না?"

"না, দেখবি না," মা এবার রেগে গেলেন, "বড্ড সাহস হয়েছে তোর। এমনি করেই তো নিরীহ মানুষ মরে। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মজা দেখতে গিয়ে মজাটা বেরিয়ে যায়। আসুক তোর বাবা আজ অফিস থেকে…।"

"আঃ!" সৌম্য মা'কে বাধা দিয়ে বলে উঠল, "তুমি বড্ড ফেনিয়ে তুলছ ব্যাপারটাকে। আচ্ছা, আর কখনও আমি চোখের সামনে কিছু ঘটতে দেখলে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখব না।"

"ঠিক বলছিস?" মা এবার যেন একটু আশ্বস্ত হলেন।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ।" তারপরই ও বলে উঠল, "আচ্ছা মা, ওখানে অতগুলো লোক দাঁড়িয়ে ছিল, মাত্র চারজন ডাকাতের ভয়ে সবাই পালিয়ে গেল কেন? সবাই যদি ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, তবে তো ওরা পালাবার পথ পেত না!"

"তোর যেমন বুদ্ধি!" মা বললেন, "ওরা তখন বোমা ছুঁড়ত, লোক মারা পড়ত। তার থেকে প্রাণে বেঁচে গেছে, সেই ভাল। ওসব জায়গায় বীরত্ব ফলাবার চেষ্টা করাটাই বোকামি।"

"তবে তো চিরকালই গুণ্ডা-ডাকাতরা যা খুশি করবে, রাস্তায় চলাফেরা করাই মুশকিল হয়ে পড়বে।"

"কেন, তার জন্য পুলিশ আছে!" মা জবাব দিলেন।

"পুলিশের ভরসায় কি সব সময় থাকা যায়? সবাই যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়ায়, তবে পুলিশ একা কী করবে?" ক্লাস টেনের ছাত্র, পনেরো বছরের সৌম্য না-বলে পারল না।

"থাক্‌, তোমাকে আর ন্যায়-অন্যায় নিয়ে চিন্তা করতে হবে না," মা'র গলা আবার চড়ল, "ঠিকমতো লেখাপড়া করার কথাটাই তোমার এখন ভাবা দরকার।"

পরদিন ইস্কুলে গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের কাছে ওই ঘটনার কথা সবিস্তারে খুলে বলল সৌম্য। চোখের সামনে একটা ডাকাতের
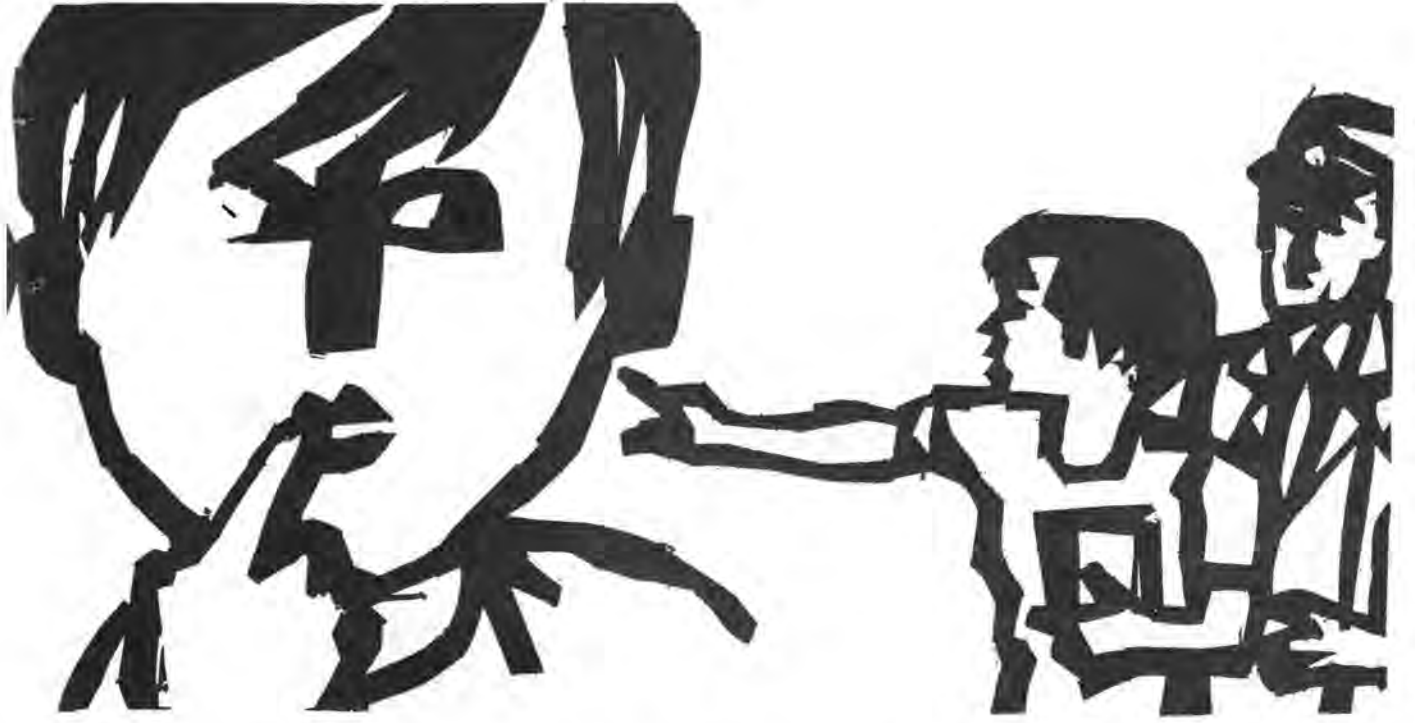
দলকে দেখেছে, সৌম্যের সে কী খাতির ! বন্ধুদের চোখে সে যেন হিরোই বনে গেল। তাদের কাছে বারবার ডাকাতদের চেহারার বর্ণনা দিতে দিতে ওর মনের মধ্যে গেঁথেই গেল ওদের চেহারা।

ওই ঘটনার দিন পনেরো পরে সৌম্য টালিগঞ্জ ব্রিজের কাছ থেকে হেঁটে রাসবিহারীর মোড়ের দিকে আসছিল। ওদের ইস্কুল সেদিন ছুটি। ফাউণ্ডেশন ডে। ওর এক বন্ধুর কাছে একটা বই আনতে গিয়েছিল ও। বেলা তখন প্রায় এগারোটা। সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের মোড় পেরিয়ে একটু এগিয়ে ডান দিকে একটা ব্যাঙ্কের পাশ দিয়ে ওকে যেতে হবে। হঠাৎ একটা গাড়ির উপরে ওর চোখ পড়ল। গাড়িতে পাঁচজন মানুষ, সবাই বয়সে তরুণ, গভীর ভাবে কী যেন পরামর্শ করছে। সৌম্য প্রথমে আমল দেয়নি, তারপরই ও চমকে উঠল। দু'জনের চেহারা খুব চেনা-চেনা ! তারপরেই মনে পড়ল সেদিনের সেই ডাকাত দলের কথা ! তাদের চেহারা ওর মনে এখনও স্পষ্ট হয়ে আছে। ওই দাড়িওয়ালা ছেলেটাই তো ছোরা হাতে ব্যাগটা কেড়ে নিয়েছিল !

কী মতলব ওদের ! তারপরই ব্যাঙ্কটার ওপর চোখ পড়ল ওর, আর সঙ্গে-সঙ্গে ছ্যাঁত করে উঠল বুকের ভেতরটা। ওরা কি ব্যাঙ্ক-ডাকাতি করতে এসেছে ! কাগজে তো প্রায়ই এমন খবর থাকে।

ওর অনুমানই ঠিক। পাঁচজনের মধ্যে একজন বসে রইল ড্রাইভারের আসনে, আর বাকি চারজন এগিয়ে গেল ব্যাঙ্কের দিকে। একজনের হাতে দুটো থলি।

এক মুহূর্ত স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল সৌম্য, তারপরই যেন হুঁশ ফিরে এল ওর। কাছেই থানা। ও আর সময় নষ্ট না করে বড় বড় পা ফেলে হাঁটা দিল, প্রায় দৌড়েই ঢুকে পড়ল থানায়। থানার ও· সি· কোথায় যেন বেরুচ্ছিলেন। একটি কিশোরকে অমনভাবে হাঁপাতে-হাঁপাতে ঢুকতে দেখে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

"একটা ব্যাঙ্কে ডাকাতরা ঢুকেছে," কোনোরকম ভণিতা না করে সৌম্য এক নিশ্বাসে বলল, "আমি ওদের ঢুকতে দেখেছি।"

"ডাকাত ! তুমি কী করে বুঝলে ?" ও· সি· ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন।

"কয়েকদিন আগে আমি ওদের একটা বাস-স্ট্যাণ্ডে ডাকাতি করতে দেখেছি," গড়গড় করে সেদিনের ঘটনা বলে গেল সৌম্য।

ও· সি· এক মুহূর্ত ভাবলেন, তারপর চটপট তৈরি হয়ে নিলেন। একটা জিপে তিনি সৌম্যকে তুলে নিলেন, পেছনে একটা বেতার-গাড়িতে সশস্ত্র পুলিশ।

ব্যাঙ্কের কাছে আসতেই যে-গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল তার ড্রাইভার পুলিশ দেখে হকচকিয়ে গেল, তারপরই জোরে চালিয়ে দিল গাড়ি। সামনেই আসছিল একটা বাস, সেটায় গিয়ে জোরে ধাক্কা মারল। ড্রাইভার ছিটকে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে তাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। তারপর ও· সি·-র নির্দেশমতো সবাই জায়গা নিয়ে দাঁড়াল।

এদিকে ব্যাঙ্কের ভিতরে তখন যেন একটা নাটকের মহড়া চলছে। মুখে রুমাল বাঁধা চারজন ডাকাত রিভলভার, বোমা উঁচিয়ে সবাইকে একপাশে দাঁড় করিয়েছে। ম্যানেজারকেও বাইরে এনে টেলিফোনের তার কেটে দিয়েছে। ব্যাঙ্কের দরোয়ান বন্দুক হাতে একটা টুলের ওপর বসে ঢুলছিল, তাকে উঠে দাঁড়াবার কোনো সুযোগই দেয়নি, তার বন্দুকটাও কেড়ে নিয়েছে। দু'জন রিভলভার উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর দু'জন ভেতরে ঢুকে ক্যাশিয়ারের সামনে টাকার বাণ্ডিলগুলো থলিতে ভরছে। ক্যাশিয়ার বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন, তার মাথায় একজন ডাণ্ডা মেরেছে। তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে আছেন। সবাই যেন ভয়ে কাঁটা। যাঁরা টাকা তুলতে বা জমা দিতে এসেছিলেন তাদের দু' একজন মূর্ছা গেছেন।

থলিতে টাকা ভরা হলে সবাইকে শেষের দিকের একটা ঘরে যাবার হুকুম করল একজন। দু'জনের হাতে রিভলভার উঁচোনো, যাদের হাতে থলি ছিল তাদের একজনের হাতে একটা তাজা বোমা, আরেকজনের হাতে ডাণ্ডা। ওই ঘরে সবাইকে ঠেলে দিয়ে ওদের একজন বলল, "আমরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত কেউ বেরুবার চেষ্টা করলেই গুলি করব। এক কথার মানুষ আমরা।" তার গলায় একটা হিংস্র রুক্ষতা।

ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে গাড়িটা না-দেখে চারজনই হতভম্ব। গেল

কোথায় গাড়িটা ! এদিক-ওদিক তাকাতেই ওটা চোখে পড়ল, দোমড়ানো অবস্থায় একপাশে কাত হয়ে পড়ে আছে। এদিকে রাস্তায় বেশ ভিড়, যেন কিছু একটা ঘটবার অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে মানুষ। ঠিক তখুনি পাতাল রেলের একটা থামের আড়াল থেকে ও· সি· হ্যাণ্ড-মাইকে বললেন, "সবাই হাত তুলে দাঁড়াও, একটু নড়েছ কি গুলি করব।"

ওদের একজন থামটা লক্ষ করে হাত তুলতেই ও· সি·র রিভলভারের গুলি এসে লাগল তার হাতে। যন্ত্রণায় হাত চেপে সে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

"পালাবার পথ নেই," ও· সি· আবার বললেন, "তোমাদের ঘিরে ফেলা হয়েছে। প্রাণে বাঁচতে চাও তো অস্ত্রশস্ত্র ফেলে মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও।"

বাধ্য ছেলের মতো সেই আদেশ পালন করল বাকি তিনজন, তারপরই তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পুলিশ-বাহিনী।

সৌম্যকে নিয়ে ব্যাঙ্কের ভেতরে ঢুকলেন ও· সি·। পুলিশ এত তাড়াতাড়ি এসে ডাকাতদের হাতেনাতে ধরে ফেলেছে, সবাই খুশি। ও· সি· সৌম্যকে দেখিয়ে বললেন, "প্রশংসা কিন্তু এই ছেলেটির প্রাপ্য। ও যদি ডাকাতদের চিনতে না পারত, আর চিনেও সাহস করে ছুটে এসে আমাদের খবর না দিত, তবে ডাকাতরা এত সহজে ধরা পড়ত না। সাহসী ছেলে।"

আর যায় কোথায়! সৌম্যকে নিয়ে সবাই নাচানাচি শুরু করে দিল। সেখান থেকে যেন ও পালাতে পারলে বাঁচে।

বাড়ি ফিরে মা'র কাছে সব বলতেই তিনি ভীষণ ভয় পেলেন, বললেন, "তোর অত বীরত্বপনার কী দরকার ছিল? ওরা যদি তোকে কিছু করে?"

"আমাকে আবার কী করবে?" সৌম্য বলল, "এখন তো ওদের জেল খাটতে হবে।"

"জেল থেকে বেরিয়েও তো কিছু করতে পারে।"

"তুমিও যেমন!" সৌম্য বলল, "কয়েক বছর জেল খেটে ওদের আর সেই মনের জোর থাকবে নাকি? তখন আমার খোঁজই বা পাবে কোথায়? তাছাড়া পুলিশের খাতায় ওদের সব কিছু লেখা থাকবে, আমাকে কিছু করবার চেষ্টা করলেই পুলিশ যে আবার ওদের ধরবে, সেটা না বোঝার মতো বোকা ওরা নিশ্চয়ই নয়।"

"হ্যাঁ, তুই তো সব জেনে বসে আছিস," মা গজ্‌গজ্ করে বললেন, "আমার হয়েছে যত জ্বালা।"

টালিগঞ্জ থানার ও· সি· ওদের বাড়িতেও এলেন। সৌম্যর মা-বাবার কাছে তাঁদের ছেলের উপস্থিত-বুদ্ধি আর সাহসের প্রশংসা করে বললেন, সাহসের জন্য পুরস্কার দেবার সুপারিশ করে ওর নাম দিল্লিতে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হচ্ছে। রাষ্ট্রপতি নিজে ওর গলায় সোনার মেডেল পরিয়ে দেবেন। সে-কথা শুনে সৌম্যর চোখ দুটো বড়-বড় হল।

ব্যাঙ্কের ম্যানেজারও একদিন এলেন ওদের বাড়ি। ওর হাতে একটা পাশবই দিয়ে বললেন, ওর সাহসের জন্য ব্যাঙ্কের অনেক টাকা বেঁচে গেছে, তাই উপরওয়ালারা ঠিক করেছেন ওর নামে একটা রেকারিং ডিপোজিটই খুলে দেবেন। ব্যাঙ্ক থেকেই টাকাটা জমা পড়বে, বড় হয়ে যাতে ও ভালভাবে পড়াশোনা করতে পারে।

আর ইস্কুলে! সত্যিকার ডাকাত ধরতে সৌম্য সাহায্য করেছে, সারা ইস্কুলে এখন ওর নাম। এবার সত্যি-সত্যিই ও হিরো হয়ে গেছে।

ছবি প্রণবেশ মাইতি

পাতালরেলের পকেটমার

তারাপদ রায়

কলকাতার নিউ মার্কেটের পেছন দিকের একটা চোরাগোপ্তা অন্ধকার গলি। চারপাশে যত রাজ্যের আবর্জনা, তরকারির খোসা, মুরগির পালক, ময়লা জল। তার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। রাস্তার শেষে একটা আদ্যিকালের বাড়ির একপাশের দেওয়াল ঘেঁষে লম্বা একটা টিনের চালা।

এই টিনের চালার মধ্যে একদিকে গাদা হয়ে পড়ে রয়েছে হাজার হাজার ছেঁড়া, নতুন, ভাল, খারাপ মানিব্যাগ। তারই পাশে কত রকম কলম, নামী, দামি, দিশি-বিলিতি। সেও অন্তত কয়েক হাজার। তাছাড়াও চশমার খাপ, চশমা, কাগজপত্র, কিছু ঘড়ি, আরও কত কী জিনিস ছড়ানো রয়েছে।

টিনের চালাটা বিরাট। চালাটার অন্য প্রান্তে রয়েছে একটা সাবেকি আমলের মেহগনি খাট, গদিমোড়া, তার উপরে রঙিন ঝালর-দেওয়া চাদর। ওই বিছানা হাফিজ সর্দারের। আজ সকালে ওই বিছানার ওপরে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে শুয়ে আছে হাফিজ সর্দার। ঘরের মেঝেতে লম্বা, টানা শতরঞ্চি বিছানো ওইদিকের মানিব্যাগ, কলমের গাদা পর্যন্ত। ঘরের মেঝে ছেয়ে গেছে লোকজনে। রোগা-রোগা, কালো-কালো, চেপা প্যান্ট আর রঙিন জামা পরা অধিকাংশ লোক। এদের নামগুলো কী রকম যেন। লাল্লু সিং, চুল্লু শেখ, কাল্লু দাস, বিল্লু মিঞা! প্রায় সকলেরই বয়স বিশ থেকে ত্রিশের কোঠায়। দু'একজন বেশি-বয়সী বা রঙ-ফর্সা বা মোটা ব্যক্তি যে নেই তা অবশ্য নয়। তবে ঘর গিজগিজ করছে লোকে, তার মধ্যে তাদের সংখ্যা ধর্তব্যের মধ্যে আসে না।

আজ সকালে এই চালাঘরে কলকাতার পকেটমারদের মিটিং বসেছে। হাফিজ এদের সর্দার। এখন যে বিছানায় বসে সভা চালাচ্ছে, সেটা তারই বিছানা। আর যে-সব মানিব্যাগ, কলম ঘরের ওপাশে পড়ে রয়েছে, সেগুলো যে পকেটমারার ফসল, সে-কথা আশা করি বুঝিয়ে বলতে হবে না।

সে যা হোক, আজকের সমস্যা গুরুতর। সেই কলকাতায় যখন ঘোড়ার ট্রাম উঠে গিয়ে বিদ্যুতের ট্রাম চালু হয়েছিল, আর তারপরে যখন প্রথম মোটরবাস এল, এই দু' সময় ছাড়া কলকাতার পকেটমারদের গত একশো বছরে এর থেকে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং আর হয়নি।

পকেটমাররা জেনে গেছে, দু' চার মাসের মধ্যে এই শহরে পাতালরেল চালু হবে। এদের মধ্যে দু'চারজন পার্ক স্ট্রিট কিংবা ময়দান স্টেশনে সিঁড়ি দিয়ে গহ্বরের মধ্যে নেমে ব্যাপারটা কিছুটা দেখেও এসেছে।

ট্রাম-বাস, বাজার-সভা, এ-সব জায়গা সম্পর্কে এ শহরের পকেটমারদের চমৎকার অভিজ্ঞতা আছে হাতে-কলমে। কিন্তু এই পাতালরেল ব্যাপারটা একেবারে নতুন।

পকেটমারদের যা কিছু কেরামতি বাস-ট্রামের দরজায়। কিন্তু শোনা যাচ্ছে যে, পাতালরেলের কামরার দরজা গাড়ি ছাড়া মাত্র একা-একা বন্ধ হয়ে যাবে, আর তারপরে না-থামা পর্যন্ত খুলবে না। যদি তাই হয়, সে খুবই দুশ্চিন্তার কথা। তাছাড়া চওড়া সিঁড়ি, অনেক আলো, কোনোটাই পকেটমারদের পক্ষে শুভসংবাদ নয়।

সবচেয়ে বড় কথা অভিজ্ঞতার অভাব। পকেটমারার কাজটা খুবই নিখুঁত হাতের ব্যাপার। যার যেখানে অভিজ্ঞতা ও অভ্যাস, যে যেখানে রপ্ত করেছে, সে সেখানেই পকেট মারে। দোতলা বাসের সিঁড়িতে যে পকেট মারে, একতলা বাসের দরজায় যত লোভনীয় খদ্দেরই থাক, সে চেষ্টা করবে না। আবার একতলা বাসের দরজার লোকটি ভুলেও কোনোদিন, যতই আকর্ষণ থাক, ট্রামের দরজায় ব্যবসা করবে না। যে যেখানে যে-ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ, সে সেখানেই থাকবে, অন্যত্র কাজের চেষ্টা করা তার পক্ষে বিপজ্জনক।

কিন্তু এখন কোথাও গিয়ে কিছু শেখা যায় যদি তবেই রক্ষা। তা না হলে পাতালরেল চালু হলে ধনেপ্রাণে মরতে হবে। পকেটমাররা যতদূর খোঁজ নিয়ে জেনেছে, এ-দেশে কোথাও পাতালরেল নেই। সুতরাং দু'চারমাস অন্য কোনো শহরে গিয়ে হাতে-কলমে ট্রেনিং

নিয়ে আসবে,' তাও হবার নয়।

কী করা যাবে এ-অবস্থায় ? হাফিজ সর্দারের ঘরে আজকের মিটিংয়ের আলোচ্য বিষয় এই একটাই।

সিল্কের লুঙ্গি, বিরাট গোঁফ, খালি গা, গলায় সোনার বিরাট ধুকধুকি, হাফিজ সর্দার চিন্তিত মুখে বিছানায় বসে রয়েছে আর খাটের নীচে মৃদু গুঞ্জনে ব্যস্ত হয়ে রয়েছে কলকাতার অব্যর্থ পকেটমারেরা। ভাবী দিনের অনিশ্চয়তায় অস্থির সবাই।

হঠাৎ হাফিজ সর্দার মৌন ভঙ্গ করে গম্ভীর কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, "ভাই সব, চিন্তায় আমার রাতে ঘুম হচ্ছে না। এখন কী করবে তোমরাই ঠিক করো।"

লাল্লু সিং শেয়ালদার ট্রামে পকেট মারে। শেয়ালদায় পাতালরেল যাচ্ছে না। তাই সে একটু নিশ্চিন্ত, তার মাথাও ঠাণ্ডা। সে বলল, "পাতালরেল দু'চার মাস কেন দু'চার বছরেও হবে না। এ নিয়ে ভাবনা করে এখন কী লাভ ?"

সঙ্গে-সঙ্গে চার-পাঁচজন খেঁকিয়ে উঠল, "এই, চুপ ! তোমার লাইনে অসুবিধে নেই, তাই মাতব্বরি করছ, আমরা যারা চৌরঙ্গির ট্রামে-বাসে পকেট মারি, আমাদের পাতালরেলের ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

কাল্লু দাস পার্ক স্ট্রিটের মোড়ের কারিগর। সে বলল, "পকেট থেকে হাত দিয়ে যখন মানিব্যাগটা সরাচ্ছি, তখন যদি কামরার দরজাটা বন্ধ হয়ে যায়, হাতসুদ্ধ গাড়ির দরজায় আটকে গিয়ে ঝুলতে ঝুলতে পরের স্টেশন পর্যন্ত যেতে হবে, ধরা তো পড়বই, হাতটাও চিরকালের মতো নষ্ট হয়ে যাবে।"

নানারকম কথা-কাটাকাটি হতে লাগল। কেউ বলে, পকেট মারা ছেড়ে দিয়ে এর পর থেকে সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করবে। আরেকজন বলে, কাটা ফল বেচবে। বিল্লু মিঞা বলল, তাদের বাপ-ঠাকুর্দার চুলকাটার ব্যবসা, সে'ও এখন থেকে তা-ই ধরবে।

কিছুক্ষণ আবোল-তাবোল শোনার পর হাফিজ সর্দার এক হুঙ্কারে সবাইকে থামিয়ে দিল। হিন্দি সিনেমার হিরোর মতো গর্জন করে সে বলল, "খামোস। থামো।"

হাফিজ সর্দারকে কলকাতার পকেটমাররা প্রত্যেকে বাঘের মতো ভয় পায়। তার গর্জনে মুহূর্তের মধ্যে সকলের কথাবার্তা থেমে গেল। এবার হাফিজ সর্দার তার দেশোয়ালি ভাষায় সমবেত পকেটমারদের যা বলল, তা খুবই সুচিন্তিত এবং সর্দারের যোগ্য কথা।

সর্দারের বক্তব্য হল, সামান্য এক পাতালরেলের জন্যে আর্টিস্টরা (পকেটমাররা নিজেদের আর্টিস্ট বলে থাকে) তাদের বহু কর্মের, বহু সম্মানের পেশা ত্যাগ করতে পারে না। এই পাতালরেল কলকাতার আর্টিস্টদের সামনে এক অসামান্য চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেছে। কলকাতার আর্টিস্টরা, যারা সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত, যারা অঙ্গুলিহেলনে অসাধ্য সাধন করতে পারে, তারা কি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে না ? তারা কি চোরের মতো পালিয়ে যাবে এই চ্যালেঞ্জের সামনে থেকে ?

হাফিজ সর্দারের এই ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনে কলকাতার আর্টিস্টরা অর্থাৎ পকেটমারেরা নড়েচড়ে বসল। হাফিজ সর্দার বলে চলল, "ভাই সব, সামান্য পাতালরেলের ভয়ে আজ যদি আমরা পালিয়ে যাই, তাহলে তার চেয়ে আর লজ্জার কথা কী হতে পারে ? ছিঁচকে চোরেরা, ছেনতাই-পার্টিরা আমাদের দুয়ো দেবে, বাটপাড়ের জগতে আর আমরা মুখ দেখাতে পারব না। আমাদের পকেটমারি পাতালরেলে চালাতেই হবে।"

হাফিজ সর্দার জানাল, সে বহু কষ্টে খবর যোগাড় করেছে যে, বিলেতে, আমেরিকায় ও অন্য যে-সব দেশে পাতালরেল আছে, সেখানেও পকেটমার আছে। আর যদি সেই সব সাহেবদের দেশের পাতালরেলে পকেটমারি চলতে পারে, তো কলকাতাতেও চলবে।

এবার প্রশ্ন উঠল, সেখানে কী করে পকেটমাররা কাজ করে সেটা তো জানা দরকার। হাফিজ সর্দার বলল, "সেটা ঠিক কথা। সেই জন্যে তোমরা চাঁদা দেবে। আমি বিলাত যাব। গিয়ে দেখে আসব সেখানকার পকেটমারদের কীর্তিকলাপ, ফন্দি-প্যাঁচ। তারপর এসে তোমাদের সব শিখিয়ে দেব।"

এতক্ষণে সমবেত পকেটমাররা সকলেই আজকের মহতী সভার উদ্দেশ্য বুঝতে পারল, সবাইকে এখন কষ্টের টাকা দিয়ে সর্দারকে বিলেত পাঠাতে হবে। চুল্লু শেখ প্রশ্ন করল, অবশ্য একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, সর্দার তো ইংরেজি জানে না, বিলেত গিয়ে কি কিছু বুঝতে পারবে ?

হাফিজ সর্দার পাকা লোক, এরকম প্রশ্নের জন্য সে প্রস্তুত ছিল। সে সঙ্গে-সঙ্গে বলল, "আমি পিন্টুকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।" পিন্টু একজন ছোকরা, ফিরিঙ্গি পকেটমার। সে ইংরেজিতেই কথা বলে।

কিন্তু সর্দারের কথা শুনে সাকরেদরা আরো ঘাবড়ে গেল। শুধু একজন নয়, সর্দার ছাড়া পিন্টুরও ভাড়ার টাকা তাহলে তাদের দিতে হবে। ব্যাপার বেশ গোলমেলে হয়ে উঠেছে, এমন সময় বুড়ো পকেটমার কাল্লু দাস, সে হাফিজেরই সমবয়সী, হঠাৎ দুম করে বলে বসল, "সর্দার, তুমি তো গদিতে বসে বখরা নাও, তুমি কলকাতার পকেটমারিই শিখলে না, বিলেতের পকেটমারি কী শিখবে ?"

ঘরের আবহাওয়া রীতিমত উত্তপ্ত হয়ে উঠল। বচসা, চেঁচামেচি থেকে প্রায় হাতাহাতি পর্যন্ত। হাফিজ সর্দার অগ্নিবর্ণ চোখ করে

খাটের ওপর থেকে তর্জন-গর্জন করতে লাগল। অবশেষে কয়েকজন ঠাণ্ডা-মাথার পকেটমার মধ্যস্থতা করে ব্যাপারটাকে আপাতত ধামাচাপা দিল।

কোনো কিছু সিদ্ধান্ত না নিয়েই সভা ভাঙতে বসেছে, এমন সময় দেখা গেল ঘরের শেষ মাথায় দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে মোটা তারু খুকখুক, খুকখুক করছে। হাসছে না কাসছে, বোঝা যাচ্ছে না। হাসাই স্বাভাবিক, কারণ তারু লোকটা একটু ফাজিল, বিনা কারণেই হাসে। এমনকী পকেটমারার মোক্ষম মুহূর্তে, খদ্দেরের পকেট থেকে মানিব্যাগ তুলে নেওয়ার গোপন ক্ষণেও সে ফিক করে হেসে ফেলে।

এই গুরুত্বপূর্ণ সভায় তার এই অহেতুক হাসির কারণ কেউই ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। হাফিজ সর্দার তো ভীষণ খেপে গেল, চেঁচিয়ে উঠল, "এই মোটা তারু, এত হাসির কী হয়েছে।"

মোটা তারু হাসতে হাসতেই উঠে দাঁড়িয়ে তার জামার উপরের দুটো বোতাম খুলে গেঞ্জির ভিতরে হাত দিয়ে পাঁচ-সাতটা মানিব্যাগ বার করে আনল, তারপর গোটা চারেক ফাউন্টেন পেন বার করল প্যান্টের সাইড-পকেট থেকে। যে-কোনো সফল পকেটমারের কাছেই কয়েকটা কলম বা মানিব্যাগ থাকবে, সেটা আশ্চর্যের কিছু নয়, কিন্তু আসল আশ্চর্যের বিষয় হল মোটা তারু যা জানাল সেই ব্যাপারটা।

মোটা তারুর বক্তব্য হল যে, এই মানিব্যাগ আর কলমগুলো সবই সে পাতালরেলের কামরা থেকে পকেট মেরে পেয়েছে। সবাই একথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল, তা হলে কি তারু এর মধ্যে বিলেত-আমেরিকা কোথাও থেকে ঘুরে এসেছে। তারু লোকটা ফাজিল কিন্তু মিথ্যেবাদী নয়, কিন্তু ও তো ইংরেজি-টিংরেজি জানে না, বিলেতে বা আমেরিকায় কী করে কাজ চালাল।

তারু বলল, "বিলেত-টিলেত নয়, এই কলকাতার পাতালরেল থেকেই এসব পেয়েছি।"

সবাই অবাক, কলকাতায় পাতালরেল কোথায় ? সে তো আরম্ভ হতে কয়েক মাস দেরি রয়েছে। তারু বলল, "গতকাল দুপুরে পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে একটা ছয় নম্বর বাস তাক করছিলাম। এমন সময় দেখি গাড়ি করে লোকজন, বাবুসাহেব নেমে সবাই পাতালরেলের নতুন সিঁড়ি দিয়ে নামছে। কিনা, কাজ কেমন এগোচ্ছে, তাই তাদের দেখানো হবে। আমিও তাদের পিছু নিলাম। কেউ আমাকে ভাল করে খেয়ালই করল না।"

সবাই রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল। তারু একটু থামতেই চেঁচিয়ে উঠল, "তারপর ?"

মোটা তারু অল্পেই হাঁপিয়ে যায়, সে একটু দম নিয়ে বলল, "কী ঝলমলে, ঝকঝকে প্লাটফর্ম ! সিঁদুর পড়ে গেলে সিঁদুর কুড়িয়ে নেওয়া যায় সেখান থেকে। তারপরে গাড়ির কামরা, সিট, সব চমৎকার। বাবুসাহেবেরা সবাই খুশিতে ভরপুর হয়ে কামরায় কামরায় উঠে পড়ল, আমিও উঠলাম। সবাই আত্মহারা, গেটের কাছে যখন ধাক্কাধাক্কি করে সবাই উঠছে, আমি হাতিয়ে ফেললাম এই সব কলম, মানিব্যাগ।"

এরপর ধীরে-ধীরে তারু বর্ণনা করল কীভাবে পাতালরেলের কামরার দরজা খোলে, বন্ধ হয়। সিটের সারির বাঁকে ঠিক কোন্ জায়গায় দাঁড়ালে হাত-সাফাইয়ের সুবিধে হবে।

এর পরের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত। 'পাতালরেলে পকেট মারো', এই নামে নতুন ট্রেনিং ক্লাস চালু হয়েছে কলকাতার পকেটমারদের জন্যে। বলাবাহুল্য, মোটা তারুই সেই ক্লাসের প্রিন্সিপ্যাল। হাফিজ সর্দারের বিলেত যাওয়া হয়নি। তার জন্যে সে খুব দুঃখিত নয়, পাতালরেল চালু হলে তার আয় খুব বেড়ে যাবে, এ-বিষয়ে সে নিশ্চিত। সর্দার এখন দিন গুনছে, পাতালরেল কবে চালু হবে।

ছবি দেবাশিস দেব

ভাব না আড়ি

সুরজিৎ ঘোষ

বাঘের সঙ্গে হাতির সঙ্গে
বনমানুষের নাতির সঙ্গে
তিতলিসোনার এখন থেকে আড়ি।
যেই না শোনা এই কথাটা
চিড়িয়াখানার মাথামোটা
বাঘসিঙ্গি সবার মুখই হাঁড়ি।

সবাই বলে, "ঘাট হয়েছে,
ভয় দেখাতে বয়েই গেছে,
আনছি পেড়ে একশোখানা ডাব।
হনুমানের লেজটি ধ'রে
টানাটানি কে আর করে !
তিতলিদিদি, এখন থেকে ভাব।

ছবি দেবাশিস দেব

শেষ ইচ্ছে

সুব্রত সেনগুপ্ত

ভণ্ডুল জিজ্ঞেস করল, "বাবা, তোমার শেষ ইচ্ছে কী ?" কাঁপা-কাঁপা গলায় বাবা উত্তর দিলেন, "একটা হিরের আংটি পরব, অনেক দিনের ইচ্ছে।"

ভণ্ডুল কেঁপে উঠল। হিরের আংটি সে কোথায় পাবে ? সে ভারী গরিব। কষ্ট করে দিন চালায়। হিরে কোনোদিন চোখেও দেখেনি। এদিকে বাবা অনেক দিন ধরে রোগে ভুগছেন। যে-কোনো দিন চোখ বুজবেন। সে ভাল ভেবে জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিল, বাবার শেষ সাধ কিছু আছে কি না। ভেবেছিল, বাবা একটু পাবদা মাছের ঝোল বা লালশাক খেতে চাইবেন। বড় জোর বলবেন, "একটা নতুন গামছা চাই।" কিন্তু এ কী ! হিরে ! এত টাকা সে কোথায় পাবে ? কত টাকা যে লাগে, তাও সে জানে না। বাবার ওপর ভণ্ডুলের একটু অভিমানও হল। কেন বাপু, তুমি কি তোমায় ছেলের অবস্থা জানো না ? তাহলে কী করে তুমি এমন একটা জিনিস চাইতে গেলে ! এদিকে একটা মানুষের শেষ ইচ্ছে, কী করবে এখন ভণ্ডুল ? বাবার বিছানাতে বসে-বসেই সে ভাবতে লাগল।

এক সময় মনে পড়ল, বাবার ওষুধ খাওয়ার সময় হয়েছে। ভণ্ডুল উঠে পাশের ঘরে গেল। হঠাৎ দেখে কী, তার বিছানার ওপর কী একটা চিকচিক করছে ! হাতে নিয়ে দেখে একটা আংটি ! দেখতে অসাধারণ। কিন্তু এখানে এল কী করে ?

ভণ্ডুল অবাক হয়ে চারপাশে তাকায়। কিছু বুঝতে পারে না। শেষে আংটিটা নিয়ে দৌড়ে চলল তার বন্ধু গুরুদাসের বাড়ি। গুরুদাস শহরে চাকরি করে। অনেক কিছু জানে। আংটি দেখে সে বলল, "এ কী, এত বড় হিরের আংটি কোথায় পেলি ?

বলে কী ! হিরের আংটি ! তার ঘরে হিরে কোথা থেকে আসবে, ভণ্ডুল ভেবে পায় না। এর পেছনে নিশ্চয় কারও কোনো কুমতলব আছে। কেউ ভণ্ডুলকে বিপদে ফেলতে চায়।

গুরুদাসকে আর কিছু না-বলে ভণ্ডুল আংটিটা নিয়ে আবার ছুটতে লাগল। ফেরার পথে মাঠ। মাঠের শেষে কানায়-কানায় ভর্তি একটা পুকুর। ভণ্ডুল তার হাতের আংটিটা জলে ফেলে দিল।

বাড়িতে ফিরে দেখে, এ কী, তার বিছানার ওপর আবার একটা আংটি। ঠিক আগেরটার মতো !

ভণ্ডুল মহা চিন্তায় পড়ল। ভয়ও পেল। এখনই হয়তো আংটির মালিক ছুটে এসে হৈ চৈ বাধাবে, এই আংটি এখানে এল কী করে ? ভণ্ডুল ভাবল, সে তো কারও কোনো ক্ষতি করেনি, তবে কে তাকে এরকম বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে। একেই তার বাবার এখন-তখন অবস্থা। বাবা যখন থাকবে না, তখন সে কোথায় যাবে, কী করবে, ভেবে-ভেবে তার পাগলের মতো অবস্থা। তার বাড়ি ভেঙে পড়ছে। সম্বল সামান্য একটু জমি। তাতে পেট ভরার মতো ফসল হয় না। ঠাকুর্দার আমলের একটা তেলের ঘানি ছিল, তাও অচল হয়ে পড়ে আছে।

বাবা অসুখে ভুগছেন দু-বছর ধরে। বাবা যে একটা শেষ ইচ্ছের কথা বলেছিলেন, তার যে কী হবে, সে ভণ্ডুল জানে না। এদিকে
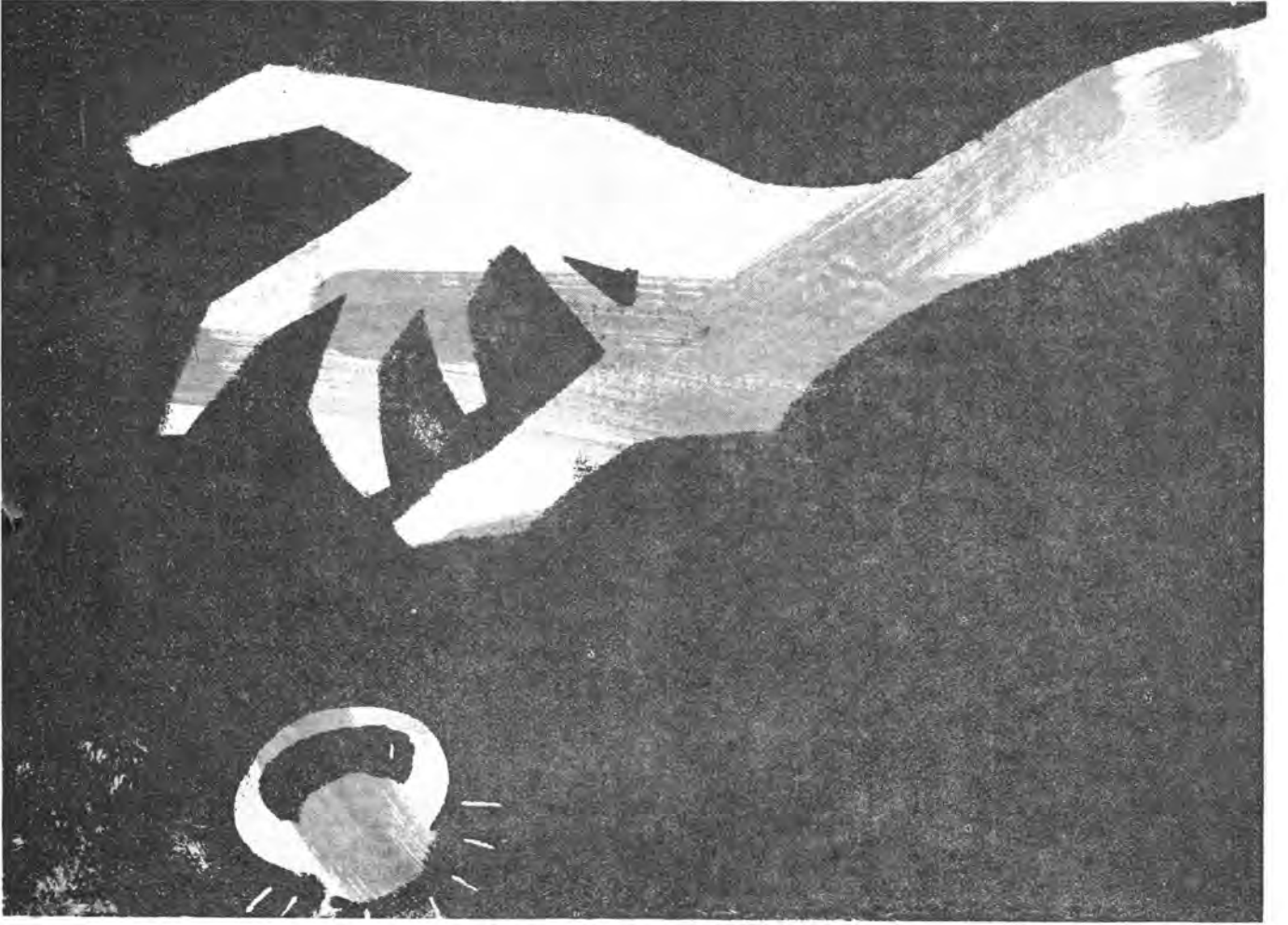
বরাত দ্যাখো, বাবা চাইলেন হিরের আংটি, আর গোল বেধেছে ঐ আংটি নিয়েই। বাবা যা চেয়েছেন, তা-ই কে তার ঘরে রেখে যাচ্ছে। নিশ্চয় উপকার করার জন্য নয়। রেখে যাচ্ছে যে, তার ভাল সে চায় না। চায় তার ক্ষতি করতে। কাজেই এই আংটি বাবাকে দেওয়া চলে না।

ভণ্ডুল তার বিছানা থেকে আংটিটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গ্রামের এক প্রান্তে আবর্জনার স্তূপের মধ্যে ফেলে দিল। তারপর বাড়ি ফিরে দেখল, আংটি যেখানে ছিল, ঘরের সেখানেই পড়ে আছে। আবার সে ছুটে গিয়ে জঙ্গলে আংটি ফেলে দিয়ে এল। আবার ফিরে দেখল, তার ময়লা বিছানার ওপর হিরের আংটি ঝিকমিক করছে।

ভণ্ডুল তখন হাঁপাচ্ছে।

"এ তো ভারী মুশকিলে পড়া গেল!"

চমকে উঠল ভণ্ডুল। এটা তারই বলার কথা। কিন্তু সে তো বলেনি। তবে কে বলল এই কথা?

আবার শোনা গেল, কে বলছে, "ভাল ভেবে বারবার আংটিটা এনে দিচ্ছি, আর ছেলেটা এমন বোকা, বারবার সেটা ফেলে দিচ্ছে।"

এবার ভণ্ডুলের চোখে পড়ল, ঘরের বাইরে জানালার ওপারে বেঁটেমতো একজন দাঁড়িয়ে আছে। কথাগুলো সে-ই বলেছে। লোকটা তাকিয়ে আছে ভণ্ডুলের দিকে। ওর গায়ের রঙ কালো না ঘন-সবুজ, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সব চাইতে অদ্ভুত ব্যাপার, ওর শরীরের ভেতর দিয়ে ওপাশের গাছপালা, ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে, যেমন কাচের ভেতর দিয়ে দেখা যায়!

ভণ্ডুল জিজ্ঞেস করল, "কে তুমি? কী করছ এখানে?"

"কী করছ এখানে," ভণ্ডুলের গলা নকল করে সে বলল, "তুমি এত জ্বালাতন করছ কেন?"

"আমি তোমাকে জ্বালাতন করছি! তার মানে?"

"আমি বারবার আংটি এনে দিচ্ছি, আর বারবার তুমি ফেলে দিচ্ছ।"

"ও তুমিই তাহলে আংটি আনছ? কে বলেছে আনতে?"

"কে বলেছে আনতে! কেন তোমার বাবা তোমাকে বলেনি, একটা হিরের আংটি চাই, অনেকদিনের সাধ?"

"বলেছে তো আমাকে বলেছে। তোমার তাতে কী?"

"আমার তাতে কী? কেন, তুমি তোমার ঘরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বলোনি, 'এখন আমি কী করি, হিরের আংটি কোথায় পাই' হ্যান-ত্যান?"

"ইশ, আমাদের সব কথা তুমি শুনেছ, তার মানে নিশ্চয় আড়ি পেতেছিলে? বলি তোমার মতলবটা কী?"

"মতলব? কিসের মতলব?"

"তোমাকে আমি পুলিশে দেব।"

"দুয়ো, পুলিশ আমাকে ধরতেই পারবে না।"

"ধরতে পারবে না কেন?"

"আমি একদম হাওয়া হয়ে যাব।"

"এতই সহজ ! পুলিশের সঙ্গে তুমি দৌড়ে পারবে ?"

"ধ্যাত, খামোখা দৌড়তে যাব কেন, বললাম যে হাওয়া হয়ে যাব এই যে এই রকম !" বলেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এ কী রে বাবা ভণ্ডুলের হাত-পা কাঁপতে লাগল। এ কার সঙ্গে সে এতক্ষণ কথা বলছিল ? ভূ-ভূ-ভূ-ত

ভূতকে আবার জানালার ওপাশে দেখা গেল। ভণ্ডুল অনেকক্ষণ কথা বলতে পারল না। শেষে অনেক কষ্টে সে বলল, "তা ঠিক আছে, তুমি ভূত হও আর যেই হও, আমার তাতে কী। ভেবো না আমি তোমাকে দেখে একটুও ভয় পেয়েছি।"

ভূত বলল, "আহা, ভয় পাবে কেন ? আমি তো তোমাদের বাড়ির পাশের ঐ গাছটায় থাকি।"

"ঐ গাছে থাকো ? দাঁড়াও, বাবাকে বলে দেব।"

"বাবাকে কেন ? এর মধ্যে আবার বাবা কেন ?"

"ঐ গাছটা আমার বাবার তা জানো ? ওতে থাকতে হলে ভাড়া দিতে হবে।"

"গাছভাড়া ? বেঁচে থাকতে শুনিনি, মরেও কোনোদিন শুনিনি।"

"শোনোনি সে তোমার কানের দোষ। আমি কী করতে পারি ?"

"অ। তা কত ভাড়া দিতে হবে শুনি ?"

"সে-কথা পরে হবে। তুমি এই হিরের আংটি কেন এনেছ, কার না কার জিনিস, আমাদের ঘরে ঢুকিয়ে বিপদে ফেলতে চাও ?"

ভূত কিছুক্ষণ অবাক হয়ে ভণ্ডুলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, "বিপদে ফেলার জন্য নয়, নিজে বিপদে না পড়ার জন্য দিয়েছি। তা এত কথায় কাজ কী বাপু ? তোমার বাবার শেষ ইচ্ছে একটা হিরের আংটি হাতে পরবে, আংটি পেয়ে গেছ, ব্যাস।"

ভণ্ডুল তার কথায় বাধা দিয়ে বলল, "দাঁড়াও দাঁড়াও, কী যেন তুমি বললে, বিপদে না পড়ার জন্য আংটি দিয়েছ, তার মানে কী ?"

"মানে আবার কী ! সে অনেক ঝামেলা।"

"ঝামেলাটা কী তাই তো জিজ্ঞেস করছি।"

"আহা, শেষ ইচ্ছে না ?"

"তাতে কী হল ? এতে তোমার বিপদটা কোথায় ?"

"দুত্‌, আমায় সবাই বলে বোকা ভূত, তুমি দেখছি আমার চাইতেও ইয়ে, কিছুই জানো না। বলি, শেষ ইচ্ছে না মিটলে মানুষ মরে কী হয় ?"

"কী হয় ?"

"তোমার মাথা। মরে ভূত হয় গো। ভূত অবিশ্যি এমনি-এমনি মরেও হয়। এই যেমন আমি হয়েছি। কিন্তু শেষ ইচ্ছে যাদের মেটেনি, তারা ভীষণ রাগী ভূত হয়। যাকে পায়, তাকেই মারে। সব কেড়েকুড়ে নেয়। সে এক মহা উৎপাত। তা তোমার বাবা হিরের আংটি না পেয়ে যদি টুক করে মরে যায়, মরে রাগী ভূত হয়, তাহলে হাতের কাছে প্রথমেই কাকে পাবে ? আমাকে। তার মানে আমার দফারফা। তার চাইতে হিরের আংটিটা দিয়ে দিলে আমি ধনেপ্রাণে বাঁচি। বুঝেছ এবার ?"

ভণ্ডুল বুঝেছে। সে আংটিটা নিয়ে তার বাবার কাছে গেল। আংটিটা হাতে দিতে তার বাবা চোখ খুলে তাকালেন। একটু যেন হাসিও ফুটল মুখে। তাই দেখে ভণ্ডুলের মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি খুলে গেল।

সে তাড়াতাড়ি তার ঘরের জানালার সামনে গিয়ে ডাকতে লাগল, "কই, কোথায় গেলে গো ?"

ভূত জিজ্ঞেস করল, "কী হল ?"

"বাবার আর-একটা ইচ্ছে আছে।"

"কী ইচ্ছে ?"

"বাবার ইচ্ছে, ভাল বদ্যির ওষুধ আর ভাল পথ্য খেয়ে তবে তিনি মরবেন। যাতে কেউ বলতে না পারে যে, বিনা চিকিৎসায় বিনা পথ্যে লোকটা মারা গেল।"

ভূত বলল, "ঠিক আছে, তা-ই হবে।"

দেখতে-দেখতে শহর থেকে বদ্যি এল, ওষুধ এল। ভাল পথ্যের ব্যবস্থা হল। আর ভণ্ডুলের বাবা দিনে-দিনে সেরে উঠতে লাগলেন।

ভণ্ডুল তখন ভূতকে গিয়ে বলল, "বাবার ইচ্ছে একটা নতুন বাড়িতে মারা যাবেন। এরকম ভাঙাচোরা বাড়িতে তাঁর মরতে ইচ্ছে করছে না।"

ভূত বলল, "ঠিক আছে।"

রাতারাতি বিরাট বাড়ি তৈরি হয়ে গেল। ভণ্ডুল তখন তার বাবাকে ভূতের কথা, হিরের আংটির কথা সব বলল। তার বাবা উঠে বসে বললেন, "আরে, এই আংটিটা তো আমাদেরই ছিল। ঠাকুর্দার আমলের জিনিস। ঐ ব্যাটা চুরি করেছিল। ওর নাম ছিল চোর-হরু।"

ভণ্ডুল বলল, "কিন্তু বাবা, তোমার শেষ ইচ্ছে বলে ওর কাছ থেকে সব আদায় করেছি। এখন তুমি ভাল হয়ে উঠেছ দেখে ও যদি গোলমাল বাধায় ?"

কপাল কুঁচকে বাবা বললেন, "তাই তো, কী করা যায় ?"

ভণ্ডুল বলল, "তুমি ক'দিন চাদর গায়ে শুয়ে থাকো। এর মধ্যে একটা কিছু করতে হবে।"

তারপর ভণ্ডুল করল কী, একদিন সকালে জানালার সামনে গিয়ে ডাকল, "কোথায় গেলে গো ?"

ভূত এসে বলল, "আবার কী হল ?"

ভণ্ডুল বলল, "এটাই বাবার শেষ ইচ্ছে।"

ভূত বিরক্ত হয়ে বলল, "ক'টা শেষ ইচ্ছে থাকে মানুষের ?"

ভণ্ডুল বলল, "এটাই শেষ। তুমি দেখে নিও।"

ভূত বলল, "আমার দ্বারা আর কিছু হবে না।"

"তাহলে আর কী, তুমি নিজেই বিপদে পড়বে।"

"কী, কিসের বিপদ শুনি ?"

"কী বিপদ জানো না ? তুমি নিজেই তো বলেছ, শেষ ইচ্ছে না মিটলে মানুষ মরে রাগী ভূত হয়। নানা উৎপাত শুরু করে।"

ভূত বলল, "তা ঠিক, তা ঠিক।"

"তবে ?"

"তবে আর কী, বলো কী করতে হবে ? কিন্তু আমি বলে রাখছি, এই শেষ। এরপর যতই ভয় দেখাও, যাই বলো, আমি আর কিছু করতে পারব না।"

ভণ্ডুল বলল, "ঠিক আছে। এবার শোনো, কী করতে হবে।"

চোখ বুজে ভূত বলল, "বলো শুনি।"

"বাড়ির সামনে ছোট্ট যে মাঠ আছে, সেটা ভাল করে চষে সরষেখেত তৈরি করতে হবে। ব্যাস, তারপর আমরা কানামাছি খেলব।"

"কানামাছি ?"

"হ্যাঁ, জানো না, কানামাছি ভোঁ ভোঁ, যাকে পাবি তাকে ছোঁ ?"

এতক্ষণে ভূতের মুখে হাসি ফুটল। শুরু হয়ে গেল কাজ। কাজ শেষ হলে ভণ্ডুল ভূতের চোখে একটা রুমাল বেঁধে দিল। শুরু হল কানামাছি খেলা।

"আমাকে ছোঁও দেখি," বলে-বলে ভুলিয়ে ভণ্ডুল ভূতকে তাদের ঘানি-ঘরে ঢোকাল। সেখানে আগে থেকেই দাঁড়িয়ে ছিলেন তার বাবা। দু'জনে মিলে ভূতকে তেলের ঘানির সঙ্গে যুতে দিল।

সেই থেকে ভূত ভণ্ডুলদের ঘানি টানে। চোখ তার বাঁধা। ঘুরেই চলেছে। তবে তেল হয় ভারী চমৎকার।

ছবি প্রণবেশ মাইতি

কুখ্যাত শিল্পীর শেষ কথা

শেখর বসু

কিছুদিন আগে আমার চিঠির বাক্সে আমি এমন একটা চিঠি পেয়েছি, যেটাকে আমার পক্ষে নিছক আজগুবি বলে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। কেন জানি না, বারবার মনে হচ্ছে এটা সত্যি, আর এটা যদি সত্যিই সত্যি হয়, আমাদের দেশ শিগ্‌গিরই ভয়ঙ্কর এক সঙ্কটের মধ্যে পড়তে যাচ্ছে। এ-ক্ষেত্রে দেশের মানুষকে সতর্ক করে দেওয়া আমার কর্তব্য।

চিঠিটা এসেছে লম্বাটে ধরনের একটা বন্ধ খামে। খামের ওপর আমার নাম-ঠিকানা ইংরেজিতে টাইপ করা। চেম্বার অব কমার্স মাঝেমধ্যে তাদের কিছু-কিছু হ্যাণ্ড-আউট আমার কাছে পিওন দিয়ে পাঠিয়ে দেয়। চিঠিটা হাতে নেবার পরেই আমার মনে হয়েছিল এটাও বোধহয় তেমন কিছু হবে। কিন্তু খামটা খোলার পরেই আমার ভুল ভাঙল, অচেনা হাতের লেখায় নামঠিকানাহীন লম্বা এক চিঠি। চিঠিতে দ্রুত চোখ বোলাতে গিয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল হঠাৎ। আরে! এ তো সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার!

চিঠিটা বারকয়েক পড়লাম আমি। চিঠির কথাগুলো যদি সত্যি হয়, তাহলে তো আমাদের দেশ ভয়ঙ্কর এক সর্বনাশের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ভীষণ অস্থির বোধ করছিলাম আমি, আবার খটকাও লাগছিল মাঝেমধ্যে। এত বড় একটা ব্যাপার আমার মতো সামান্য একজন মানুষকে জানানো হল কেন? এ-চিঠিটা তো অনায়াসে পুলিশের গোয়েন্দা-দফতরে যেতে পারত, কিংবা হোমরা-চোমরা কারও কাছে। একবার ভাবলাম, এটা হয়তো আমার চেনাশোনা কারও বদখেয়াল। কিন্তু এটা ভেবেও আমি নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। আতঙ্কগ্রস্ত মানুষটা হয়তো হাতের কাছে আর-কাউকে না পেয়ে চিঠিটা আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এ-ব্যাপারে আমি কী করতে পারি?

অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম, চিঠিটা কোনো পত্রিকায় ছাপিয়ে দিতে পারলে সব দিক বাঁচে। এটা পড়ার পরে পাঠকরা ঘটনার সত্যিমিথ্যে বিচার করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারবেন। আর আমিও আমার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাব।

চিঠির শেষে নামের জায়গায় লেখা আছে 'ক', এটা হয়তো পত্রলেখকের নামের প্রথম অক্ষর। তাঁর নাম হয়তো কমল কিংবা কান্তি কিংবা কৃষ্ণদাস কিংবা । যাই হোক না কেন, আমি তাঁর চিঠিটা হুবহু তুলে দিচ্ছি। চিঠিতে কোনো সম্বোধন ছিল না। বোঝার সুবিধের জন্য আমি একটা শিরোনাম দিয়ে দিলাম।

'ক'-এর কথা

আজ থেকে কিছুকাল বাদে একদিন সকালে উঠে ভারতবর্ষের লোক হয়তো দেখতে পাবে এদিক-সেদিক সর্বত্র ছড়িয়ে আছে কড়কড়ে একশো টাকার কারেন্সি নোট। বাড়ির উঠোনে নোট, ছাতে নোট, গাছের মাথা আর ময়দান ছেয়ে আছে শুধু টাকায়। এই নোটের সঙ্গে আসল নোটের তফাত বার করা কারও সাধ্যে কুলোবে না। তফাত অবশ্য কাছে, তবে সে-তফাত ধরতে পারবেন শুধু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এক্সপার্টরা। কিন্তু পরীক্ষা করে জাল নোট ধরা আর উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আগে সারা দেশে কী হয়ে যাবে ভাবুন তো! অল্প সময়ের মধ্যে কোটি-কোটি জাল টাকার লেনদেন হয়ে যাবে দেশের মধ্যে। তারপর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মারফত লোকে যখন জানতে পারবে ওগুলো জাল টাকা—তখন? আসল-নকল ধরার সাধ্য সাধারণ মানুষের হবে না, সুতরাং হাত গুটিয়ে বসে থাকবে সবাই। লেনদেন বন্ধ, তার মানে গোটা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যই বন্ধ। অর্থাৎ পুরো দেশের অর্থনীতিই ভেঙে পড়বে একসঙ্গে।

এটা হল চক্রান্তের শেষ ধাপ। এর আগের ধাপে আছে চোরা পথে ভারতবর্ষের বাজারে আড়াইশো কোটি টাকার জাল নোট ছেড়ে দেওয়া। সব টাকাই আসবে ওই ভুয়ো একশো টাকার কারেন্সি নোটের চেহারায়।

অল্প সময়ের মধ্যে এই দুটো ধাপের মধ্যে পড়লে আমাদের দেশের অবস্থা নিশ্চয়ই শোচনীয় হয়ে উঠবে। আমরা কেউই সেটা চাই না। বরং কোনোভাবে সে-চক্রান্তের কথা জেনে গেলে আমাদের কাজ হবে সবাইকে সতর্ক করে দেওয়া। সে-জন্যেই এ চিঠি। জানি না, এ চিঠি আপনার কাছে পৌঁছবে কি না! তার

আগেই হয়তো গুপ্তঘাতকের হাতে আমার মৃত্যু হবে। চক্রান্তকারীরা আমাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। জানি না আর কতক্ষণ তাদের চোখে ধুলো দিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারব! তবে মরতে আমি ভয় পাই ন্যা। আমার শুধু একটাই আফসোস, নোংরা চক্রান্তকারীদের দলে জড়িয়ে পড়ে আমি এমন একটা কাজ করতে বাধ্য হয়েছি, যার কোনো ক্ষমা নেই। ভয়ঙ্কর ওই চক্রান্তের কথা ফাঁস করে দিতে পারলে আমি হয়তো কিছুটা শান্তিতে মরতে পারব।

আমার অনুরোধ, আর-পাঁচজন অপরাধীর সঙ্গে আপনারা আমাকে মিশিয়ে ফেলবেন না। আমি আসলে একজন শিল্পী, অন্তত তাই আমি হতে চেয়েছিলাম। আমার নিজের জীবনের গোড়ার দিককার কিছু কথা এই ফাঁকে বলে নেওয়া দরকার।

আমি খুবই সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মেছি। কলেজে ভর্তি হওয়ার পরেই বাবা মারা যান হঠাৎ। তার ফলে লেখাপড়া ছেড়ে রোজগারের ধান্দায় বেরোতে হয় আমাকে। অনেক চেষ্টায় সামান্য একটা কাজ জোটালাম শেষে। কাজটা ছিল ভদ্রলোক চৌকিদারের। অর্থাৎ আর-পাঁচজন কাজ করবে, আমাকে চোখ রাখতে হবে তাদের ওপর। কেউ কাজে ফাঁকি দিচ্ছে কি না, সেটা দেখাই ছিল আমার একমাত্র কাজ।

ক্লান্তিকর চাকরি, এই চাকরিটা করার সময় আমার বই পড়ার বাতিক অসম্ভব বেড়ে উঠেছিল। বই নিয়ে আমার কোনো বাছবিচার ছিল না, হাতের কাছে যা পেতাম তাই পড়তাম। আর বাড়ি ফিরে রঙ-তুলি নিয়ে ছবি আঁকতে বসতাম। আমি কখনও কোনো আর্ট স্কুলে পড়িনি, আমার কোনো শিল্পী-মাস্টারমশাইও ছিলেন না। মাথায় যা আসত তা-ই হত আমার ছবি আঁকার বিষয়। রঙ ব্যবহার করার ব্যাপারেও আমি কোনো ব্যাকরণ মানতাম না। বই-পড়া বিদ্যে সম্বল করেই এচিং আর এনগ্রেভিং শিখলাম। শিখলাম ক্লে, প্লাস্টার আর তেলরঙে কাজ করা। এই সময় দুটো ঘটনা আমার জীবনে প্রায় একসঙ্গেই ঘটে গেল। প্রথমটা হল ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ফুটপাথ থেকে একটা চটিবই কেনা, দ্বিতীয়টা হল ব্রেবোর্ন রোডে নাদকার্নি বলে এক প্রতারকের খপ্পরে পড়া।

প্রথমে বইটার কথা বলে নিই। শস্তায় বই কিনব বলে আমি ফুটপাথের সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড বইয়ের দোকানে-দোকানে ঘুরতাম। একদিন এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটা অদ্ভুত নামের বইয়ের ওপর চোখ পড়ল আমার। বইটার নাম 'দি অ্যাকমপ্লিশ্‌ড্ সুইন্‌ড্‌ল্'। চটিবই। ভেতরে গাদা-গাদা খুদে হরফ। একটাকা দিয়ে বইটা কিনে নিয়ে বাড়ি চলে এলাম আমি। কিন্তু পড়তে শুরু করার পরে আর থামতে পারলাম না। বই শেষ হল মাঝরাত্তিরে।

বইটাতে ছিল অদ্ভুত দুই শিল্পীর জীবনী। এঁদের নাম আমি আগে কখনও শুনিনি, পরেও না। দুই শিল্পীই ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁরা হয়ে উঠেছিলেন কুখ্যাত জালিয়াত। একজনের নাম কার্ল পেগ্‌লো, বিরাট এক শিল্পী হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন তিনি। কিন্তু তাঁর স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যে ছিল আকাশ-পাতাল তফাত। শিল্পচর্চার স্বাভাবিক রাস্তায় ঠোক্কর খেতে খেতে তিনি নিরুপায় হয়ে কারেন্সি নোট জাল করতে শুরু করলেন। তাঁর জাল-করা নোটের সঙ্গে আসল নোটের পার্থক্য বার করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। পেগ্‌লো শিল্পী হতে পারেননি ঠিক, কিন্তু তাঁর জালি নোট নিখুঁত শিল্পের জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল প্রায়।

দ্বিতীয় প্রতিভাবান শিল্পীর নাম ভ্যান মিগ্‌রেন। অসম্ভব ভাল ছবি আঁকতেন তিনি। কিন্তু পেশাদার শিল্প-সমালোচকরা তাঁর ছবি নিয়ে এমন হাসিঠাট্টা জুড়ে দিয়েছিল যে, নিজের প্রতিভা প্রমাণ করার জন্য বাধ্য হয়ে তাঁকে উলটো পথ ধরতে হয়েছিল। তিনি বিশ শতকের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ডাচ শিল্পী ভারমিরের ছবি জাল করতে শুরু করলেন। সেই আমলের অখ্যাত শিল্পীদের ছবি যোগাড় করে তিনি ক্যানভাস থেকে ছবিগুলো তুলে ফেললেন প্রথমে। তারপর পুরনো ক্যানভাসে শুরু হল ভারমির আঁকা। নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তিনি সেকেলে হার্ড পেন্ট বানিয়েছিলেন, ভারমিরের প্রিয় নীল রঙ তৈরি করেছিলেন লাপিস-লাজুলি দিয়ে।

ধীরে ধীরে একালের স্টুডিওতে জন্ম নিল প্রাচীন ভারমির। জালিয়াতি এত নিখুঁত হয়েছিল যে, বাঘা-বাঘা আর্ট-ডিলারও ফাঁকিবাজি ধরতে পারলেন না। মিগ্‌রেন তাঁর প্রথম ভারমির ষাট হাজার পাউণ্ডে বিক্রি করেছিলেন রটারডামের একটি মিউজিয়ামকে। মোট ছটি ভারমির বিক্রি করে মিগ্‌রেনের হাতে এসেছিল পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। ধরা পড়েছিলেন পেগলোও।

সত্যি কথা বলতে দোষ নেই, এই দুই কুখ্যাত শিল্পীর জীবনী আমার জীবনের ওপরেও প্রচণ্ড একটা প্রভাব ফেলেছিল। বারবার মনে হয়েছিল, ওঁদের সঙ্গে আমারও কোথায় যেন মস্ত একটা মিল আছে। আমিও ছবি আঁকতে প্রচণ্ড ভালবাসি, মনে হয় খুব একটা খারাপ আঁকিও না, কিন্তু আমার সামনের সব রাস্তাই বন্ধ। কেউ আমাকে পাত্তাই দেয় না, ঠারেঠোরে ঠাট্টা-বিদ্রূপও করে। আমাকেও কি প্রতিভা প্রমাণের জন্য উলটো পথ ধরতে হবে?

ভাগ্যবিধাতা বলে কেউ আছেন কি না জানি না। তবে সত্যিই তিনি যদি থেকে থাকেন, আমার এই কথায় নিশ্চয়ই তাঁর মুখে বাঁকা হাসি ফুটে উঠেছিল। পরদিনই ব্রেবোর্ন রোডে প্রতারক নাদকার্নির সঙ্গে আমার আলাপ হয়। ঠিক কীভাবে আলাপ হয়েছিল আজ

আর মনে নেই, তবে ও চট করে আমার একজন বন্ধুর মতো হয়ে উঠেছিল। তারপরেই আমার সঙ্গে আলাপ করার উদ্দেশ্যটা জানিয়েছিল বেশ সোজাসুজি ভাষায়। আমি যদি কয়েকটা পাশপোর্ট জাল করে দিই, ও আমাকে প্রচুর টাকা দেবে।

আমি গরিব মানুষ। প্রচুর টাকা পেলে আমি মনের সুখে পছন্দসই রঙ-তুলি-ক্যানভাস কিনতে পারব, ছবির প্রদর্শনীর জন্য ভাড়া করতে পারব আর্ট-গ্যালারি। এই দুটো জিনিস করতে পারার অর্থই হল আমার জীবনের স্বপ্ন অনেকখানি সফল হওয়া। তা ছাড়া, কুখ্যাত দুই শিল্পী পেগ্‌লো আর মিগ্‌রেনের ভূতও আমার ঘাড়ে চেপে বসেছিল। আমি নাদকার্নির প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলাম এককথায়।

তারপর থেকেই শুরু হল আমার অন্ধকার পথে চলা। ঝাপসা অন্ধকার থেকে গাঢ় অন্ধকার, তারপরে আরও গাঢ় অন্ধকার।

আমার জাল-করা পাশপোর্ট জালিয়াতদের কাছে খুব প্রশংসা পেয়েছিল। শিল্পী হিসেবে ওই ছিল আমার প্রথম 'স্বীকৃতি'। কিন্তু এরকম স্বীকৃতি তো আমি চাইনি। হাতে বেশ কিছু পয়সাকড়ি এলে ভেবেছিলাম ও-পথ আর মাড়াব না। কিন্তু তখন জানতাম না, ও-পথে একবার ঢুকলে আর বেরুনো যায় না। তারপর আস্তে-আস্তে ভয়ঙ্কর একটা আন্তর্জাতিক দলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম। তারা একদিন জরুরি একটা কাজের অজুহাতে আমাকে এক সীমান্ত-শহরে নিয়ে এল। তারপর আমার খাবারের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে ঘুমন্ত অবস্থাতেই সীমান্ত পার করানো হল আমাকে। ঘুম থেকে উঠে দেখি আমি সম্পূর্ণ এক অচেনা জায়গায়। এরপর বেশ কয়েকবার চোখ বেঁধে আর ঘুমের ওষুধ খাইয়ে আমাকে আরও অনেক দূরে এনে ফেলা হল। বুঝতে পারছিলাম না কোথায় এসেছি আমি, তবে এটা বুঝতে পারছিলাম যে, জায়গাটা দূর বিদেশ।

এখানে আনার পরে দলের নেতা অল্প কথায় একটা আদেশ দিল আমাকে। ভারতীয় একশো টাকার নোট নিখুঁতভাবে জাল করতে হবে। না পারলে মৃত্যু।

আমি জানতাম, এদের কথার কোনো নড়চড় হয় না। সুতরাং নিরুপায় হয়ে কাজে বসে পড়তে হল আমাকে। আমার চারপাশে হাল ফ্যাশানের প্রিন্টিং প্রেস। এনগ্রেভিং করার যাবতীয় সরঞ্জাম এনে দেওয়া হল আমাকে। দিন-রাত ধরে চলতে লাগল আমার 'শিল্পের সাধনা'। মাঝেমধ্যে মনে পড়ে যেত ওই 'দি অ্যাকমপ্লিশড সুইন্‌ড্‌ল্'-এর কথা। মনে হত, বিখ্যাত শিল্পী হতে গিয়ে পেগ্‌লো আর মিগ্‌রেনের মতো আমিও হয়ে গিয়েছি কুখ্যাত জালিয়াত।

কয়েক মাস ধরে দিনরাত্তির পরিশ্রম করার পরে আমার জাল-করা নোটের প্লেট যখন প্রায় নিখুঁত হয়ে উঠেছে তখন একদিন ঘটনাচক্রে ভয়ঙ্কর ওই চক্রান্তের কথা আমি জেনে ফেললাম। এই চক্রান্তের সঙ্গে হিটলারের জঘন্য 'অপারেশন বার্নহার্ড'এর কিছুটা মিল আছে।

চক্রান্তের কথা কানে যেতেই আমার হাত-পা অসাড় হয়ে গিয়েছিল। আতঙ্কিত হয়ে ভাবলাম, তাহলে কি পৃথিবীতে আবার কোনো হিটলার জন্মেছে! আবার কি তাহলে হাজার-হাজার নিরীহ ইহুদিদের জন্য তৈরি হবে গ্যাস-চেম্বার! নাকি এবার জার্মানির বদলে ভারত! ইহুদিদের বদলে অন্য কোনো সম্প্রদায়!

ভেতরে-ভেতরে অসম্ভব ছটফট করতে লাগলাম আমি, তারপর মাথা খাটিয়ে নিজের জালিয়াতিতেই ফাঁক তৈরি করলাম। আমার কপাল ভাল, দলের বিশেষজ্ঞরা সেই ফাঁক ধরতে পারল না। উচ্ছ্বসিত হয়ে তারা জানাল, নিখুঁত হয়েছে জাল নোট।

তারপরেই আমার ওপর নতুন আদেশ এল, এবার পঞ্চাশ টাকার নোট জাল করতে হবে। আমি এই ধরনের একটা আদেশের আশঙ্কা করে একটা মতলব এঁটে রেখেছিলাম আগেই। সঙ্গে সঙ্গে বললাম, "পঞ্চাশ টাকার নোটের প্লেট তো আমার তৈরি করাই আছে।" দলের নেতা চমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় সেটা?" বললাম, "বাড়িতে, কলকাতার বাড়িতে।"

দলের নেতা আমাকে কিছুতেই কলকাতায় ফিরতে দিতে চাইছিল না। বারবার বলছিল, "কোথায় আছে বলো, আমার লোক গিয়ে নিয়ে আসবে।" জবাবে একটা কথাই আমি বারবার বলেছিলাম, "সেটা এমন জায়গায় আছে যে, আমি ছাড়া কারও পক্ষেই খুঁজে বার করা সম্ভব নয়।"

দলের নেতা আমার কথায় রাজি হল শেষ পর্যন্ত, তবে ভয়ধরানো গলায় বলল, "দলের লোকরা সব সময় তোমাকে শ্যাডো করবে, পালাবার চেষ্টা করলেই তোমার সারা শরীর ঝাঁজরা হয়ে যাবে স্টেনগানের গুলিতে।"

আবার বেশ কয়েকবার চোখ-বাঁধা অবস্থায় গাড়িতে চেপে আর ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অজানা দূর দেশ থেকে ভারতবর্ষে ফিরে এলাম আমি। তারপর দেশের সীমান্ত-শহর থেকে কলকাতায়। সন্ধের সময় এই শহরের রাজপথ ধরে হাঁটার সময় টের পাচ্ছিলাম বেশ কয়েকজোড়া চোখ নজর রাখছে আমার ওপর। কিন্তু এখানকার ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের দৌলতে মুক্তি পেয়ে গেলাম আমি। হঠাৎ পাওয়ারকাট। সঙ্গে-সঙ্গে বাঁ দিকের অন্ধকার গলি ধরে প্রাণপণে ছুট লাগালাম আমি।

এই কথাগুলো আমি এখন লিখছি এই শহরের ছোট্ট একটা হোটেলে বসে। চিঠিটা আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবার পরেই আমি হোটেল ছাড়ব। উদ্দেশ্য, আরও নিরাপদ কোনো জায়গায় গিয়ে ওঠা। তবে আমি ভাল করেই জানি, ভয়ঙ্কর ওই দলের লোকদের চোখ এড়িয়ে বেশিদিন কোথাও থাকা সম্ভব নয়, তা পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তেই হোক না কেন। আর, ওদের কথার নড়চড় হয় না কখনও। চোখে পড়ামাত্তর আমার সারা শরীর ঝাঁজরা হয়ে যাবে স্টেনগানের গুলিতে। তবে তার আগে মারাত্মক এই চক্রান্তের কথা যদি দেশের মানুষের কাছে ফাঁস করে দিতে পারি, আমি শান্তিতে মরব।

এবার আসল কথায় আসি। আসল কথা হল নিজের জালিয়াতিতেই ইচ্ছে করে ফাঁক তৈরি করার কথা। আগেই বলেছি, ওই ফাঁকটা দলের বিশেষজ্ঞদের চোখ এড়িয়ে গেছে। এবার সেটা আমি দেশের মানুষদের জানিয়ে দিতে চাই। খুব সহজ সূত্র। এটা জানা থাকলে আসল একশো টাকার নোট আর আমার তৈরি জাল নোটের তফাতটা ধরা যাবে চট করে।

আসল একশো টাকার নোটে অশোকস্তম্ভের ওপরের তিনটে সিংহের মুখই অল্প হাঁ-করা। আমার তৈরি জাল নোটে বাঁদিকের সিংহটার মুখ একেবারে বন্ধ। এ ছাড়া দুটো নোটের মধ্যে আর কোনো পার্থক্য বার করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

এবার যদি চোরা পথে ভারতের বাজারে আড়াইশো কোটি একশো টাকার নোট আসে, কিংবা একদিন সকালে উঠে যদি দেখেন বাড়ির উঠোন বা ছাদ নম্বরি নোটে ভরে গেছে, আশা করি ঠকবেন না।

আর একটা অনুরোধ। এটা আমার এখনকার উচ্চাশা বলতে পারেন। 'দি অ্যাকমপ্লিশড সুইন্‌ড্‌ল্'-এর লেখকের নাম আমার মনে নেই। জানি না তিনি কোন্ দেশের লোক, জানি না তিনি বেঁচে আছেন কিনা! যদি তিনি বেঁচে থাকেন, যদি তাঁকে আপনাদের কেউ খুঁজে বার করতে পারেন, আমার হয়ে ছোট্ট একটা অনুরোধ জানাবেন তাঁকে। বলবেন, কার্ল পেগ্‌লো আর ভ্যান মিগ্‌রেনের মতো আমিও বড় শিল্পী হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমারও তাঁদের দশাই হয়েছে। লেখক যেন বইটির পরবর্তী সংস্করণে ওই শিল্পীদের পাশে আমাকেও একটু জায়গা দেন।

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

মুনসং পাহাড়ের পাখি

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

কোনো রকম শব্দই বরদাস্ত করতে পারেন না তারুমামা। বলেন, 'শব্দব্রহ্ম না কী বলে না ? ওটা বাজে কথা। শব্দ হচ্ছে ব্রহ্মদত্যি। নয়েজ নুইসেন্স। এতে ব্লাড-প্রেশার বেড়ে যায়, ইনসোমনিয়া হয়, পেপটিক আলসার হতে পারে। কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হতে পারে।' এই এক বাতিক মামার। বাড়ি করেছেন গলির মধ্যে, গাড়ি ঘোড়া ট্রাক মিনিবাসের শব্দ নেই। দরজায় বোর্ড টাঙিয়েছেন, 'দরজায় টোকা দিন, কড়া নাড়বেন না।' বৌ ছেলেপুলে মানেই গোলমাল, চিৎকার-চেঁচামেচি, এইজন্যেই নাকি বিয়ে করেননি। চাকরি করেছেন মূক-বধির বিদ্যালয়ে। মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসেন তারুমামা। মা দু'চারদিন থাকতে বলেন, থাকেন না। যেটুকু সময় থাকেন শুধু শব্দ-দূষণ-সমস্যার কথা বলেন। পাশের বাড়িতে হয়তো রেডিও বাজছে বা টি ভি চলছে, তারুমামা বললেন, 'হ্যাঁ দিদি, ওটা কি ভাগের রেডিও, তোমাদেরও শেয়ার আছে ?' মা বললেন, 'সে আবার কী ?' সঙ্গে-সঙ্গে তারুমামা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'নিজেরা তো শুনছেই, তোমাদেরও শোনাচ্ছে কিনা, তাই। ও-রকম গাঁক-গাঁক আওয়াজ ওরা টলারেট করে কী করে ? এক-একটা বাড়ি আছে, গিয়ে বসলেই ফ্যান খুলে দেবে ; আর তার কটর

কটর ক্যাঁচকোঁচ শব্দে মাথা ধরে যাবে। এদেশের লোক নয়েজ নুইসেন্স নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না।'

রিটায়ার করে তারুমামার বাতিক আরো বাড়ল। আমরা আড়ালে বলি, 'শব্দজব্দ-মামা'। শব্দে অতিষ্ঠ হয়ে মামা কিছুদিন বাইরে বেড়িয়ে আসবেন ঠিক করলেন। বললেন, 'তুইও চল, ঘুরে আসবি আমার সঙ্গে। দেখে আসবি এই পশ্চিমবঙ্গেই কত পিসফুল কোয়ায়েট জায়গা আছে।'

মা বললেন, 'সেটা কোথায় তারু?'

মামা বললেন, 'বললে বিশ্বাস করবে না দিদি, কিন্তু আছে। দার্জিলিংয়ে।'

মা অনেকবার দার্জিলিং বেড়াতে গেছেন। শেষ গেছেন আমি যখন খুব ছোট। কিছুই আমার মনে নেই। এখন বড় হয়েছি, মামার সঙ্গে দার্জিলিং যাব, এই আনন্দে, একেবারে নেচে উঠলাম। বললাম, 'টয় ট্রেনে চড়ব তো মামা?'

তারুমামা মায়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'বাঙালি টুরিস্ট দার্জিলিং বলতে বোঝে ম্যাল—সেখানে গরম জামাটামা পরে ঘুরপাক খায়, চেনাজানা কারো সঙ্গে দেখা হলে কবে এলেন—কোথায় উঠেছেন করে টাইগার হিলে যায়, জলাপাহাড়ে ওঠে, পারলে একবার মিরিক ঘুরে আসে। সব জায়গাগুলো ক্রাউডেড।' এবার আমার উদ্দেশে বললেন, 'আমরা যাব মুনসং পাহাড়ে।' আগে কখনো নাম শুনিনি। একটু নিরুৎসাহ হয়েছি বুঝতে পেরে তারুমামা বললেন, 'বল তো, কোথায় সিনকোনার চাষ হয়, কুইনিনের কারখানা আছে?'

আমি বললাম, 'সে তো মংপু।'

'রাইট।' মামা বললেন, 'তোদের ছোটদের বইয়ে পড়া বিদ্যে ঐ পর্যন্তই। কিন্তু মংপুর মতো আরো একটা পাহাড় আছে মুনসং, সেখানেও সিনকোনার চাষ হয়, এবং বেশ ব্যাপক আকারেই হয়। এ-খবর আমরা অনেকেই রাখি না। আমার এক মাসতুতো ভাই শৈলেন আছে মুনসং প্ল্যানটেশনে। সিনকোনার ডেপুটি, সবাই বলে বোসসাহেব।'

মামা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগে আমি বললাম, 'তারুমামা, মংপুতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, তাই না?'

একটু হেসে মামা বললেন, 'সেই জন্যেই তো ওখানে যাব না। তোমাদের তারুমামা থাকবে মুনসং পাহাড়ে।'

॥ দুই ॥

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে একটানা গাড়িতে এলাম রংপুতে। রংপু পশ্চিমবঙ্গের শেষ আর সিকিমের শুরু। এই রংপু থেকে গাড়ি উঠে গেল ডান দিকে। এখান থেকেই প্ল্যানটেশনেরও শুরু। পাহাড় বেয়ে গাড়ি উঠছে, ডান দিকে বাঁ দিকে টারফেল্টের ঢাকা দেওয়া সারি সারি একচালা-মতন ওগুলো কী জিজ্ঞেস করতেই বোসসাহেব বললেন, 'ওগুলোর নীচে রয়েছে ইপিকাক গাছ। ইপিকাক থেকে এমিটিন হয়। মংপুতে কারখানা আছে।' লাট্টুর মতো পাকানো রাস্তায় রংপু থেকে ষোলো কিলোমিটার গিয়ে পৌঁছুলাম বোসসাহেবের বাংলোয়। উচ্চতা শুনলাম সাড়ে-চার হাজার ফুট। আসতে আসতে বিকেল পড়ে এসেছে, শেষ-এপ্রিলের বিকেল, তবু একটু শিরশিরে ভাব রয়েছে এখানকার বাতাসে।

মামা শুনেছিলেন শৈলেন বড় চাকরি করে, কিন্তু কত বড় সেটা জানতেন না। বুঝতে পারলাম, বাংলো দেখে উনি বেশ অবাক হয়েছেন। কাঠের বাড়ি যে এত সুন্দর হয় আগে জানতাম না। বাইরে টিনের চারচালা, কিন্তু ভিতরে কাঠের মেজে, কাঠের দেয়াল, কাঠের সিলিং। মানানসই সুন্দর রঙ করা। হিন্দি সিনেমায় এ-রকম বাড়ি দেখেছি। বোসসাহেব মুনসং পাহাড়ে আছেন এগারো বছর। গড়গড় করে নেপালি বলেন। বাড়িতে কৃষ্ণামামির সঙ্গে একটু-আধটু যা বাংলা বলতে পারেন। মুনসং পাহাড়ে ওরাই একমাত্র বাঙালি। স্বামী-স্ত্রীর সংসারে কাজের লোক অনেকগুলি। বেশিরভাগই অবশ্য বাইরের। একজন মালি, একজন পানিওলা, দু'জন রুটিওলা। সাহেবদের আমল থেকে এই নামই চলে আসছে। মালি মালির কাজই করে। পানিওলা ছেলেটি ঘরের কাজকর্ম করে। ওকে কৃষ্ণামামি বাঙালি রান্নাবান্নাও শিখিয়েছেন। রুটিওলার কিন্তু ঠিক রুটির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক এখন আর নেই। মুনসং পাহাড়ে দোকানপাট নেই, কিচ্ছু পাওয়া যায় না। একশো নুন বা একটা দেশলাই আনতে হলেও যেতে হবে কালিমপং। যেতে দশ মাইল, আসতে দশ মাইল। রুটিওলার কাজ কালিমপং যাওয়া। আজ যে যাবে কাল তার বিশ্রাম কাল আর-একজন যাবে, পরশু তার বিশ্রাম। রুটিওলা কালিমপং থেকে খবরের কাগজ নিয়ে আসে। বোসসাহেবের যখন যা দরকার—মাছ মাংস তরি-তরকারি রুটি মাখন সিগারেট চা পান সুপুরি—রুটিওলারা নিয়ে আসে।

আমরা বাইরের ঘরে বসেছি।

তারুমামা একটা ওয়ালনাট কাঠের টেবিলে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'এ-রকম নির্জন জায়গাই আমার পছন্দ।' পানিওলা ছেলেটা কৃষ্ণামামির পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, তাকে এতক্ষণ একবারও কথা বলতে শোনেননি মামা। তাই বললেন, 'আর একটা খুব ভাল সাইন কী দেখলাম জানো, এখানকার লোকেরা অহেতুক কথা বলে না।'

আমি দেয়ালে একটা ড্রাগনের ছবি দেখছি। ছবিটা দেখতে দেখতে মনে হল এক্ষুনি একটা মাকুন্দমতন লোক, ভিলেন আর কী, কুতকুতে চোখ নিয়ে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। রহস্যগল্পে যেমন পড়ি। এসব ভাবতে ভাবতেই আমি পানিওলার মুখের দিকে তাকালাম। মুখটা মেয়েদের মতো মসৃণ, গায়ের রঙ ফর্সা, একটু হলদেটে। দাড়ি-গোঁফ নেই। চোখদুটি একটু গোলমতন, ভুরু নেই। তাতেই মুখ দেখে ও কী ভাবছে আন্দাজ করা যায় না। মামা আর আমি যে ওদের বোসসাহেবের বাড়িতে এসে উঠেছি তাতে কি ও খুশি হয়েছে? নাকি, কাজ বাড়ল বলে বিরক্ত? আমি ওকে স্টাডি করবার চেষ্টা করছি, হঠাৎ শুনি মামা বললেন, 'বাহাদুর, এক গেলাস জল খাওয়াও তো হে।'

কৃষ্ণামামি বললেন, 'তাতো পানি।'

আমি লক্ষ করেছি মামা জল আনতে বলতেই পানিওলার চোখের কোণ যেন একটু কোঁচকাল। এক গেলাস অল্প গরম জল এনে মামাকে দিল। তারপর কৃষ্ণামামির সঙ্গে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। বোসসাহেব বললেন, 'আমরা বাঙালিরা নেপালি দেখলেই তাকে বাহাদুর বলি। এটা ওরা পছন্দ করে না। ও সয়লা, তুমিও ওকে সয়লা বলে ডেকো, তারুদা।'

মামা বললেন, 'ও আমার মনে থাকবে না ভাই শৈল। ঠিক আছে, ও তো ছেলেমানুষ, আমি ওকে কান্‌ছা বলে ডাকব'খন।'

বোসসাহেব হেসে ফেললেন। তারুমামা একটু অস্বস্তি বোধ করলেন। আমি বুঝতে পারলাম না তারুমামা ভুল কী বললেন। ছোট-ছোট নেপালি ছেলেদের কান্‌ছা বলে, মায়ের মুখে শুনেছি। বোসসাহেব বলতে লাগলেন, 'জানো তারুদা, দেখতে ছোট হলেই কান্‌ছা হয় না। একজন বুড়ো মানুষও কান্‌ছা হতে পারে। ওরা বাড়ির সবচেয়ে ছোট ছেলেকে বলে কান্‌ছা। ভাইদের মধ্যে বড় মেজ সেজ এই অর্ডারেই ওদের ডাকনাম। ও সেজ, তাই সয়লা। সবগুলো ডাক শুনবে? জেঠা, ময়লা, সয়লা, কয়লা, অন্তরে, যন্তরে, মন্তরে, খন্তরে, লখন্তরে, অ্যাণ্ড লাস্ট' অব অল—কান্‌ছা। এই একটা বিষয়ে নেপালি ভোকাবুলারি বাংলার থেকে রিচ। হারাধনের দশটি ছেলেকে বাংলায় এভাবে

বর্ণনা করতে পারবে ? বড় মেজ সেজ ন ফুল, তারপরই ফুলস্টপ।'

আমার ভীষণ মজা লাগল। আমি জেঠা-ময়লা-সয়লা মুখস্থ করতে লাগলাম।

কৃষ্ণামামি যখন আমাদের খেতে ডাক দিলেন তখনই লক্ষ করলাম, বাংলোটা ঠিক যেন একটা টিলার মাথা কেটে তার ওপর বসানো। সামনে খানিকটা সমতল বাগান। চতুর্দিকে কর্পূর ধুপি আমলকী ওয়ালনাট আর নাশপাতির গাছ। ঝুপ করে অন্ধকার নেমে এল। খাবার টেবিলে কেরোসিনের বাতি দেখে বুঝলাম এখানে ইলেকট্রিক লাইট নেই। বড়-বড় জানলা, তাতে গ্রিল বা রড নেই, কাচের পাল্লা খোলা। যেদিকে তাকাই সেদিকেই থোকা-থোকা অন্ধকার। ডাইনিং স্পেস থেকেই দেখলাম রান্নাঘরের পাশে একটা ছোট্ট টিনের দোচালা, আউট হাউস, ওখানে সয়লা থাকে।

জলখাবার খেয়ে বাইরের দিকে যে-ঘরে এসে প্রথম বসেছিলাম তারই পাশের বেডরুমে এলাম আমি আর তারুমামা। অনেক বিচার-বিবেচনা করে বোসসাহেব আর কৃষ্ণামামি এই ঘরটিতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেছেন। দুটো আলাদা খাট, তাতে পরিপাটি বিছানা। ঘরের মধ্যে ফায়ারপ্লেস, শীতকালে জ্বলে, চিমনি উঠে গেছে উপরদিকে। এ-ঘরেও পর্দা-দেওয়া বড় বড় ফাঁকা জানলা। বাইরে থেকে লোক ঢুকে পড়তে পারে। এখন তেমন শীত নেই। কৃষ্ণামামি বললেন, 'জানলা বন্ধ কোরো না। ঘরে শুয়ে-শুয়ে আকাশ দেখতে পাবে।' ঐ জানলা দিয়ে একশো-দেড়শো ফুট নীচে শ্রমিকদের টিনের চালা দেখতে পাচ্ছি। ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। শ্রমিকদের বাড়িগুলোকে নেপালিতে বলে 'ধুরা'। দূর থেকে ছোট দেখায়। যেন খেলনার কাঠের বাড়ি, পাশাপাশি সাজানো। বাড়ির গায়ে-গায়ে মকাইয়ের খেত। বোসসাহেব বলেছেন, খুব সকালে উঠতে পারলে এই জানলা দিয়েই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাব।

তারুমামা বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে জানলার দিকে চেয়ে ছিলেন। হঠাৎ বললেন, 'এখানে যেন অন্ধকারটাও বেশি। পর্দাগুলো টেনে দে।'

পর্দা টানতে গিয়ে আবার চোখে পড়ল অন্ধকার পাহাড়ে একটা আলো চলতে চলতে আবার মিলিয়ে গেল। ওটা কী ? ওকেই কি আলেয়া বলে ?

ঘরে একটা হারিকেন জ্বলছিল। ঘরের তুলনায় আলো নেহাতই কম। কোনাগুলো সব অন্ধকার হয়ে আছে। ফায়ারপ্লেসে যেখানটায় কাঠ দেয় সেই গহ্বর ছায়া-ছায়া আলোয় কেমন রহস্যময় মনে হয়। জানলার পর্দা টেনে দিতেই গাছে গাছে অনেক পাখি, নানা সুরে, নানা সপ্তকে ডেকে উঠল। কোনোটা মধুর, কোনোটা ভীষণ কর্কশ। কোনো দ্রুত, কোনো বিলম্বিত। পাখির ডাকে যে এমন বিশ্রী কোলাহল তৈরি হয় আগে জানা ছিল না। তারুমামা কানে আঙুল দিয়ে বললেন, 'নয়েজ নুইসেন্স !' সেই সময়ই ডাবের মতো গোল চিমনিওলা জোরালো বাতি দিয়ে গেল সয়লা। ও বিস্মিত হয়ে মামার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে বললাম, 'ঐ যে বিচ্ছিরি ডাক ডাকছে, ওগুলো কী ?' সয়লা কী বুঝল কে জানে, সচকিত হয়ে কান পেতে রইল কিছুক্ষণ। যেন ঐ মিশ্র রাগিণীর মধ্যে কোনো একটা বিশেষ স্বর আছে কিনা বোঝবার চেষ্টা করছে। আমি বললাম, 'কী হল ?' ও শুধু বলল 'চরা'।

আলো বদলে দিয়ে হারিকেন নিয়ে চলে গেল সয়লা। একটু পরে বোসসাহেব এলেন আমাদের ঘরে। জানলার পর্দাগুলো সব টানা দেখে বললেন, 'কী হে, ভয় পেলে নাকি ?'

নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, 'ভয় আবার কিসের।'

তারুমামা খাটে শুয়ে-শুয়েই বললেন, 'পাকু আমাদের খুব সাহসী।'

বোসসাহেব বললেন, 'ভয় না পেলেই ভাল। কিন্তু ভয়ের গল্প এখানে অনেক আছে।'

কিছুক্ষণ আগেই আমি পাহাড়ে আলেয়া দেখেছি। ঐ আলো পথচারীকে বিভ্রান্ত করে একেবারে খাদে ফেলে মারে। সে কথা আর তুললাম না, বরং সাহস দেখাবার জন্যে বললাম, 'একটা গল্প বলুন না, শৈলমামা।'

বোসসাহেব মামার দিকে চেয়ে বললেন, 'কী তারুদা, ঘুমোলে নাকি ?'

মামা চোখ বুজেই বললেন, 'শুনছি। তুমি বলো।'

শৈলমামা বললেন, 'মুনসং শব্দের মানে হচ্ছে ভূতের আবাস। বেশির ভাগই হচ্ছে সাহেব-ভূত। এই দুর্গম পাহাড়ে এসে সিনকোনার চাষ প্রথম তো সাহেবরাই করেছিল। সাহেব বড় একটা মাঠে যেত না, তার ঘোড়া, লাঠি আর টুপি নিয়ে সহিস যেত মাঠে। গিয়ে ঘোড়া দাঁড় করিয়ে তার পাশে লাঠি পুঁতে, লাঠির মাথায় সাহেবের টুপি বসিয়ে দিত। মানুষের যেমন কুশপুত্তলি হয়, এও তেমনি সাহেবের কাকতাড়ুয়া। তাই দেখেই ভয়ে-ভয়ে কাজ করত মাঠের শ্রমিকরা। সাহেবের টুপি লাঠি এসে গেছে মানেই সাহেব এসেছে। সেই থেকে এখানে প্রায়ই লোকে দেখে লাঠি হেঁটে যাচ্ছে টুপি মাথায় দিয়ে। সেই আদি সাহেব প্ল্যানটারের ভূত মুনসং পাহাড় চষে বেড়াচ্ছে।'

তারুমামা খাটের ওপর উঠে বসেছেন গল্প শুনতে-শুনতে। বললেন, 'এখানে সাহেবদের গোরস্তানটা কোথায় ?'

'নেই।' ছোট উত্তর দিলেন বোসসাহেব। বললেন, 'গির্জাও নেই।'

তারুমামা বললেন, 'ভূত আছে গোরস্তান নেই, হতে পারে না। মরলেই তো ভূত হয়। আবার মরলে তো গোর দিতেও হয়। এ ডেড সাহেব বিকাম্‌স এ ভূত ভায়া গোরস্তান।'

বোসসাহেব বললেন, 'কত সাহেব আমার এই বাংলোতেই বাস করে গেছে। মরলে হয়তো এখানেই কোথাও পুঁতে দিয়েছে। তারপর কোন সময় তার ওপরই বাংলোর এক্‌সটেন্‌শন হয়েছে। হয়তো এই ঘরের নীচেই কোনো কবর ছিল। নট আনলাইকলি। কী হে পাকু, ভয় করছে ?'

আমি শুধু মাথা নাড়লাম।

বোসসাহেব আবার আরম্ভ করলেন, 'আমি এসব বিশ্বাস করি না। কিন্তু পাহাড়িরা করে। যেমন ধরো, আমাদের সয়লা, তিন-তিনবার ডাক না দিলে সন্ধের পর ও সাড়া দেবে না। ওরা বিশ্বাস করে ভূতপ্রেত দত্যিদানো একেবারে চেনা লোকের রূপ ধরে আসে। যেমন, এই যে আমি এসেছি তোমাদের ঘরে, এ আমি যে আমিই, অশরীরী কেউ নয়, তার ঠিক কী।'

তারুমামা বোসসাহেবকে থামিয়ে দিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা শৈল, চরা মানে কী ?'

'এখানকার লোকেরা পাখিকে চরা বলে।'

তারুমামা বললেন, 'এক-আধটা বোধ হয় খুব নয়জি।'

বোস-সাহেব সতর্ক করে দিলেন, 'যা ইচ্ছে করুক। ওদের ডিসটার্ব কোরো না, তারুদা।'

॥ তিন ॥

দিনের বেলায় মুনসং পাহাড় ঝলমল করে। অফিসের গাড়িতে করে শৈলমামা আমাদের প্ল্যানটেশন ঘুরিয়ে দেখালেন। পাহাড়ের গা কেটে অপ্রশস্ত রাস্তা। কখনো ডান দিকে খাদ, কখনো বাঁ দিকে। তাকালে গা শিরশির করে। ঐ খাদের ঢালে আট-দশ ফুট লম্বা একহারা গাছ, বেশি মোটা না, পাতা বেশির ভাগ ফিকে সবুজ, কিছু কিছু গাঢ় খয়েরি রঙের। ওগুলোই সিনকোনা। শৈলমামার কাছে শুনলাম, ঐ গাছ আট বছরে যতটা বাড়বার বাড়বে, তখন গোড়ায় ইঞ্চি-চারেক রেখে কেটে নেওয়া হবে, ওঁরা বলেন 'কপিসিং'। তারপর আবার ঐ গোড়া থেকে নতুন গাছ হবে, আট বছরের মাথায়

সেটা গোড়াসুদ্ধ তুলে নেওয়া হবে। সিনকোনার পাতায় কিছু নেই, ওদের কারবার ছালবাকল আর শিকড় নিয়ে। শুকনো গাছে কাঠের হাতুড়ি পিটিয়ে ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া হয়, তাকে বলে 'বার্কিং'। ডাঁইকরা ছাল আর শেকড়ের অংশ দেখলাম গুদামে। ওখান থেকে বস্তাবন্দী হয়ে মংপু কারখানায় যাবে। ভাগ্যিস তারুমামা আমাকে নিয়ে এসেছিলেন, নইলে এত কিছু দেখতেও পেতাম না, জানতেও পারতাম না।

জমিতে পুরুষ-মেয়ে শ্রমিকরা কাজ করছে, আমাদের দিকে একবার তাকাল, তারপর আবার কাজে মন দিল। একসঙ্গে কুড়ি জন, তিরিশ জন, কোথাও বা পঞ্চাশ জন। কোনো কথাবার্তা নেই। বোসসাহেব সর্দার গোছের এক-আধজনকে ডেকে নেপালিতে কী যেন বললেন, তারা এক-আধ কথায় উত্তর দিল। তারুমামা ওদের এই স্বভাবনীরবতায় খুব খুশি। শুনে শুনে আমি একটা কথা শিখে নিয়েছি, 'রামরো ছ'— মানে 'ভাল'। আমার মুখে নেপালি শুনে ধুরার বাসিন্দারা কৌতুক বোধ করে। চকচকে সাদা দাঁত বের করে হাসে।

দিনের বেলা বেশ ভালই লাগে। রাত্রির নিস্তব্ধতা যেন বুকে চেপে বসে। সাতটা সাড়ে-সাতটার মধ্যে ধুরার আলো নিবে যায়। ওরা সকাল-সকাল শুয়ে পড়ে। তখন যেদিকে তাকাই অন্ধকার।

দিন-তিনেক পরে একদিন একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। তারুমামার আর উৎসাহ নেই। বয়স হয়েছে, অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। ঘরের মধ্যে শুয়ে আছেন। আমার একটু সাহস বেড়েছে। আলেয়ার ভয়টা কেটে গেছে। শৈলমামা বলেছেন, পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি চললে, হেডলাইটের আলো কখনো দেখা যায়, কখনো আবার বাঁক নিলে সেটা অদৃশ্য হয়। তাতেই ও-রকম মনে হয়েছে। সেই থেকে মনকে বুঝিয়েছি সব-কিছুরই একটা বাস্তব ব্যাখ্যা আছে। একা বারান্দায় বসে অপেক্ষা করছি, কখন পুবের পাহাড়ের চূড়ার পেছন থেকে একটু একটু করে কমলা-রঙের চাঁদ উঠবে। বাংলোবাড়ির চারদিকটা ভীষণ অন্ধকার লাগছে। হঠাৎ মনে হল একটা দমকা বাতাসের স্রোত বয়ে গেল। লম্বা ধুপিগাছগুলো দুলে উঠল, শোঁ-শোঁ শব্দ শোনা গেল। আমলকী গাছের পাতায় কাঁপন লাগল। বাংলোর কাঠের মেজেতে একটা ফাঁপা শব্দ হল, কে যেন দ্রুতপায়ে এদিকে আসছে। আমি কিছু বুঝে ওঠবার অমনেই একটা ছায়ামূর্তি এসে আমার সামনে ধপাস করে বসে পড়ে আমার হাঁটু ছুঁয়ে রইল। আমি বোধ হয় ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিলাম। তাতেই দৌড়ে এলেন আলো নিয়ে তারুমামা, আর ওদিক থেকে কৃষ্ণামামি। তখনও আমাকে ছুঁয়ে বসে আছে সয়লা। ও বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। লোকজন আর আলো দেখে উঠে দাঁড়াল। কৃষ্ণামামি ওকে ধমক দিলেন, 'আবার!' ও যে ভয় পেয়েছে সেটা বুঝতে কষ্ট হল না।

পরে শুনেছি এ-রকম আগেও করেছে সয়লা। হঠাৎ হাওয়া উঠলে ও মনে করে বনদেবতা রুষ্ট হয়েছেন, চলে যাচ্ছেন একদিক থেকে আর একদিকে। একা থাকলে তার কোপে পড়তে পারে, তাই সয়লা সেই সময়টা হাতের কাছে যাকে পায় তাকেই ছুঁয়ে থাকে। অনেকবার কৃষ্ণামামির পায়ের কাছেও বসেছে সয়লা।

তারুমামা ঘরের মধ্যে নীরবতা উপভোগ করছিলেন, হঠাৎ আমি চেঁচিয়ে ওঠাতে একটু বিরক্ত হয়েছেন মনে হল। বললেন, 'সয়লাকে দেখে তুই ভয় পেলি পাকু!'

একটু পরেই খাবার ডাক পড়ল। খাবার টেবিলে বোসসাহেব বললেন, 'শুনেছ তারুদা, আমাদের সয়লা কী বলছে? শুধু হাওয়া উঠেছে বলে ভয় পায়নি ও। ও নাকি শুনেছে বনের মধ্যে অনেক দূরে কে যেন কাঁদছে। কোলের বাচ্চা যে-রকম টেনে টেনে কাঁদে সেই রকম তীক্ষ্ণ কান্না।' তারপর সয়লাকে নেপালিতে কী যেন জিজ্ঞেস করলেন তিনি। সয়লা বলল, 'চরা।'

আমি ভাবলাম বলি, ভালই তো। বলে ফেললাম, 'রামরোই তো ছ।' একেবারে বাংলা বাক্‌ভঙ্গিতে অনুবাদ।

আশ্চর্যের ব্যাপার, পরের দিন রাত্রে ঠিক ঐ রকম কান্না তারুমামা শুনেছেন। আমি তখন গভীর ঘুমে অচেতন। আমাকে মামা চাপা গলায় অনেক ডাকাডাকি করেছেন, আমি জাগিনি। ওঁর মুখে যা শুনেছি তা এই রকম

তারুমামার ঘুম খুব পাতলা। বাড়িতে চিরকাল একা থেকেছেন। সামান্য খুটখাট শব্দও সহ্য করতে পারেন না। সেই মানুষ হঠাৎ শুনলেন থেমে থেমে কে যেন কাঁদছে, এত তীক্ষ্ণ সে স্বর যে, কানে অসহ্য লাগল। বিছানায় উঠে বসলেন। একটু পরে বুঝলেন ওটা কোনো পাখির ডাক, এবং সেই পাখি বসেছে আমাদের ঘরের টিনের চালে। টিনের ওপর বিশ্রী ধাতব শব্দ করছে পাখিটা। এমনও হতে পারে যে, একটা নয়, অনেকগুলো পাখি একসঙ্গে ঝটাপটি করছে, নখে আঁচড়াচ্ছে টিন। দাঁতের মধ্যে শিরশির করে উঠল তারুমামার। আমাকে তুলতে না পেরে তিনি শিয়র থেকে টর্চ নিয়ে ফায়ারপ্লেসের নীচে মাথা গলিয়ে ওপর দিকে ফোকাস করলেন। পাখির উপদ্রব তাতে আরো বেড়ে গেল। এবার উত্ত্যক্ত হয়ে বাইরের বাগানে গিয়ে টিনের চালে আলো ফেললেন, কিন্তু কোথাও কিছু দেখতে পেলেন না। মামার কেমন সন্দেহ হল, তিনি স্বপ্ন দেখে উঠে আসেননি তো! কিন্তু যেই ঘরের মধ্যে এলেন মনে হল সেই বিশ্রী শব্দ যেন চিমনি বেয়ে নীচের দিকে এগিয়ে আসছে। পাখির শব্দ যে এত জোরালো ও কর্কশ হয় শোনেননি তিনি। 'চরা' মানে কি শুধু পাখি, না অশরীরী পাখি! টর্চের আলোয় দেখতে পাচ্ছেন না, অথচ সমানে উৎপাত করে যাচ্ছে। সারা রাত ঘুমুতে দেবে না নাকি? মরিয়া হয়ে উঠলেন তারুমামা। শৈলেন ও কৃষ্ণাকে এত রাত্রে ডাকাডাকি করা চলে না। তারুমামা বাগান দিয়ে ঘুরে রান্নাঘরের পাশের আউটহাউসে গিয়ে সয়লাকে ডাকলেন। ভাববিনিময়ের অসুবিধে আছে, তাই বেশি কথা হল না। কোনো রকমে বুঝিয়ে কয়েকখানা চেলাকাঠে আগুন ধরিয়ে এনে ফায়ারপ্লেসে দিয়ে দিলেন। ধোঁয়া আর তাপ ছাদের চিমনির চৌখুপিতে পৌঁছে গেল। প্রথমটা বেশ জোরে আগের মতন ঝটাপটি শব্দ হল, কান্নার মতো শব্দটা আরো তীব্র ও করুণ শোনাল। তারপর একেবারে থেমে গেল। শব্দ জব্দ করে তারুমামা শেষ রাত্রে ঘুমিয়েছিলেন।

সমস্ত ঘটনাটা কী জানি কেন তারুমামা শুধু আমাকেই বলেছিলেন, আর কেউ জানত না। পরে বুঝেছিলাম, বোধ হয় মামা নিজেও বুঝেছিলেন, কাজটা করা ঠিক হয়নি। এরকম উপদ্রব স্থানীয় পাহাড়িরা অশুভ সঙ্কেত বলে মনে করে।

মুনসং পাহাড় থেকে কলকাতায় ফেরার আগের দিন শৈলমামা আমাদের মংপু নিয়ে যাবেন বললেন। কৃষ্ণামামিরও দেখলাম খুব উৎসাহ। ওঁরা একসময় মংপুতে ছিলেন, অনেক বাঙালি অফিসার আছেন সেখানে। ইচ্ছে, একটা রাত্তির ওখানে কাটিয়ে আসেন। আমি নেচে উঠলাম। কিন্তু তারুমামা রাজি হলেন না। 'ওখান থেকে ফিরে আবার পরদিনই রিটার্ন জার্নির ধকল, ও আমার এ বয়সে সইবে না।' মামা বললেন, 'তার চেয়ে তোমরা যাও, আমি শেষ দুটো দিন চুটিয়ে বিশ্রাম করে নি।'

শৈলমামা বললেন, 'ভয় করবে না তো তারুদা? বুঝে দ্যাখো।'

তারুমামা বললেন, 'সয়লা থাকছে তো। তাহলেই হল।'

কৃষ্ণামামি যাবার আগে অতিথিসেবার সব নির্দেশ দিয়ে গেলেন। টাকাপয়সা দিয়ে

বাঙালি

শান্তনু দাস

আক্‌শি-পিঠে ইড্‌লি হল,
সরুচাক্‌লির টান-ধোসার।
লাইন পড়ছে আন্টি ঝাম্‌টি
রাস্তায় হট্‌ পছন্দটি।
ভাতভাজা ফ্রাই কিংবা চাউ
সাবাড় হচ্ছে। নয়তো ফাউ।
রান্না ভাল সব দেশী
আপ্‌ ভাল না ভিনবেশী!

বাঙালি নামে জাত ছিল?
খাওয়া-দাওয়া ভাত ছিল?
ফুরিয়ে যাবার ধাত ছিল?
মাম্‌মি-ড্যাডি ডাক ছিল?
আন্টি সাহেব টাই ছিল?

দরকার সব্বার আগে
শহিদ-মিনার শেষ ভাগে
সেই বাঙালির মূর্তি নাই,
বাঁচতে গেলে মূর্তি চাই।

ছবি অহিভূষণ মালিক

গেলেন রুটিওলার হাতে, কী কী যেন ও আনবে কালিম্পং থেকে।

আমরা যে রাত্রি মংপুতে কাটাচ্ছি সেই রাত্রেই আবার সেই পাখির উপদ্রব হয়েছিল তারুমামার শোবার ঘরের চিমনির ওপরে। পরে এসব আমরা শুনেছি সয়লার কাছে। যাবার আগে বোসসাহেব ওকে মামার ঘরের কাছে বারান্দায় শুতে বলে গিয়েছিলেন। ঘরের মধ্যে টর্চ নিয়ে তারুমামার দাপাদাপিতে ওর ঘুম ভেঙে যায়। ও শুনতে পায় শিশুর কান্নার মতো তীক্ষ্ণ স্বর। টিনের চালে নখ দিয়ে আঁচড়ানোর শব্দ হচ্ছিল সমানে। তারুমামা অনেক কিছু বলেছেন সয়লাকে, হিন্দি করেও বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, ও কিছুই বুঝতে পারেনি। শুধু দ্রুত হাতে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলেছিল। ল্যাম্পের ট্যাঙ্কও কাচের, কতটা তেল আছে বাইরে থেকে দেখা যায়। ফায়ারপ্লেসের চৌবাচ্চার মতো জায়গাটায় আগের দিনের আধপোড়া কাঠ পড়েই ছিল, একটু ভিতর দিকে, বাইরে থেকে কারো নজরে পড়বার কথা নয়। পরে সয়লা বলেছে, তারুমামা কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলেন। টেবিল ল্যাম্পটা নিয়ে তেলের ডিবের ছিপি খুলে হড়হড় করে খানিকটা কেরোসিন ঢেলে সেই কাঠে আগুন ধরিয়ে দিলেন। লকলক করে এক ঝলক আগুন সোজা উপরের দিকে উঠে গেল ফায়ারপ্লেসের চিমনি বেয়ে। উপদ্রবকারী পাখিরা যেন শেষবারের মতো আক্রোশে ফেটে পড়ল। অল্পক্ষণ ঝটপট করল, তারপর একেবারে নিস্তেজ হয়ে গেল। ও চরা তো বনদেবতা, ওর পেছনে এমন করে কেউ লাগে! ভয়ে কাঁপতে লাগল সয়লা। অনেক কিছু বলেছে ও তারুমামাকে, তিনিও কিছুই বুঝতে পারেননি। কী করবে না-করবে বুঝতে না পেরে সয়লা দৌড়ে গেল ঝাঁকরির খোঁজে। ভূতের ওঝাকে ওরা 'ঝাঁকরি' বলে।

হঠাৎ ভয় পেয়ে সয়লা চলে যেতে ঘরের দরজা বন্ধ করে খাটের ওপর বসলেন তারুমামা। ঘুম চটে গেছে। মুখ তাঁর সেই ফাঁকা গরাদে বা গ্রিল-না-দেওয়া জানলার দিকে। পাল্লা খোলা, পর্দা টেনে দেওয়া রয়েছে, একপাশটা একটু ফাঁকা। মামা দেখলেন সেই ফাঁক দিয়ে কে যেন উঁকি দিল। তার আগেই দরজায় টোকা দিয়েছিল কেউ। তারুমামা টেবিল ল্যাম্পটা আর একটু উশকে দিয়ে যেমন বসে ছিলেন তেমনি বসে রইলেন জানলার দিকে চোখ রেখে। কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলছে জানলার কাছেই। তারুমামা নিশ্চয়ই 'কে—কে ওখানে' বলে চিৎকারও করেছিলেন। তারপরই বাইরে থেকে জানলার পর্দাটা এক টানে কেউ সরিয়ে দেয়। উদোম জানলার ফ্রেমে স্পষ্ট একটা ভয়ঙ্কর মূর্তি স্থির হয়ে দাঁড়ায়। চোখ দুটো কুতকুতে, নির্লোম ভুরু, চিবুকে কয়েক গাছা চুল। বিচিত্র তার পোশাক। পা পর্যন্ত লম্বা ঝুলের আলখাল্লা, ইতস্তত রঙবেরঙের তালি। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতের নানা জায়গায় খেজুরের মতো বড় বড় রঙিন পুঁতি গয়নাগাটির মতো পরা। মাথায় ধনুস পাখির পালক আর শজারুর কাঁটা লাল কাপড়ের ফেট্টির মধ্যে গুঁজে যাত্রার দলের মুকুটের মতো মাথায় পরেছে। হাতে ওটা কী? মড়ার হাঁটুর হাড় দিয়ে বানানো বাঁশি, ফুঁ দিলে শঙ্খের মতো বাজে। আলোয় স্পষ্ট দেখেছেন তারুমামা, লোকটা তাঁর দিকে চেয়ে হলদে দাঁত বের করে হেসেছে, তারপর সেই শঙ্খে ফুঁ দিয়ে বাংলোবাড়ির নিস্তব্ধতা খানখান করে দিয়েছে। এ শব্দ সহ্য করতে পারেননি তিনি, তাই দুই হাতে দুই কান চাপা দিয়ে বসে ছিলেন। চোখ ফেরাতে পারেননি জানলা থেকে। একটু পরে কী সব মন্তরতন্তর ছড়ার মতো বলেছে সেই লোকটা। বলতে বলতে অদ্ভুত সব ভঙ্গি করেছে। ডান হাতের তেলো বিস্তৃত করে আঙুলগুলোকে টান-টান ফাঁক করে মুখের সামনে ধরে হাতটা কাঁপাতে থাকে। মন্ত্র বলতে বলতে সেই হাত একবার তারুমামার উদ্দেশে এগিয়ে দেয়, একবার নিজের দিকে টেনে আনে। যেন চোখের সামনে একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য অভিনীত হচ্ছে। সবশেষে বিজয়-আনন্দে মড়ার হাড়ের শঙ্খ বাজিয়ে জানলা গলে ভিতরে ঢুকে পড়ে লোকটা, মামার সামনে কর্কশ দুর্বোধ সব শব্দ করে সারা শরীর ঝাঁকাতে থাকে। আর তাতেই মৃত্যু হয় তারুমামার।

এসব যখন ঘটছে তখন আমি মংপুতে। ফিরে এসে সব দেখেশুনে বোসসাহেব সমস্ত ব্যাপারটার যা বর্ণনা দিয়েছিলেন, তাতে মনে হয় এই রকম কিছুই ঘটেছিল। সয়লা ঝাঁকরি ডেকে এনেছিল, ওরা অমনি সেজেগুজে আসে। দরজা বন্ধ ছিল, তাই সয়লা ঝাঁকরিকে নিয়ে এসেছিল জানলায়। পরদিন প্ল্যানটেশনের ডাক্তার এসে সয়লাকে ও ঝাঁকরিকে খুব বকলেন। ওরা কী কী করেছে সব বলল, কিন্তু কিছুতেই মানল না আতঙ্কে মৃত্যু হয়েছে তারুমামার। সয়লার স্থির বিশ্বাস, চরা যার বাড়ির চালে উপদ্রব করে ঝাঁকরি ডেকে তার ঝাড়ফুঁক করা উচিত। এ-সাহেব উল্টে চরার পেছনে লাগতে গেলেন। ঝাঁকরি আর কী করবে আসলে নাকি 'চরা'ই ওঁকে শেষ করে রেখে গেছে ঝাঁকরি ডেকে নিয়ে আসার আগেই।

ছবি অহিভূষণ মালিক

ছবি : অনুপ রায়

সম্পূর্ণ উপন্যাস

গৌরের কবচ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

গৌরগোপালেরা বড়ই গরিব। গ্রামের মধ্যে তাদের বাড়িখানাই সবচেয়ে বেশি ভাঙাচোরা এবং শ্রীহীন। একবুক আগাছার মধ্যে তেড়াবেঁকা হয়ে কোনোক্রমে বহুকালের পুরনো বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে।

একসময়ে গৌরগোপালদের অবস্থা ভালই ছিল। জমিজমা ছিল, চাষবাস ছিল, একটু ব্যবসাও ছিল। গৌরের ঠাকুর্দার আমল থেকে অবস্থা পড়তে পড়তে এখন একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। একবেলা নুনভাত জোটে তো আর একবেলা উপোস থাকতে হয়। চাষের জমি সব দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে গেছে।

গৌরগোপালেরা দুই ভাই। নিতাইগোপাল বড়, গৌরগোপাল ছোট। গৌরের বয়স এখন উনিশ-কুড়ি। লেখাপড়ায় দুই ভাইয়ের

কেউই ভাল নয়। তবে নিতাইগোপাল একটু সংস্কৃত জানে। পুজোআচ্চা করতে পারে। তাই করেই সে কোনোক্রমে সংসার চালায়। তাদের বাবা নেই, মা আছে। নিতাইগোপালের শ্বশুরবাড়ির লোকেরা একটু পয়সাওলা, তাই তার বউয়ের ভারী দেমাক। সে শ্বশুরবাড়ির লোকদের মানুষ বলে জ্ঞানই করে না। নিতাইগোপাল বউকে ভয় খায়। তাই বেশি উচ্চবাচ্য করে না। বড় ভাইয়ের সংসারে আহাম্মক গৌরগোপাল আর তার বুড়ো মা বড় অনাদরে থাকে।

গৌরগোপালের লেখাপড়া হয়নি, তেমন কোনো বিশেষ গুণও তার নেই। তবে সে খুব সরল এবং ভালমানুষ গোছের। মিথ্যে কথা বলে না, কাউকে আঘাত দেয় না, কখনও তার মুখে কেউ কোনো খারাপ কথা বা গালাগাল শোনেনি। অতি কষ্টে অধ্যবসায়ে সে ইস্কুলের শেষ পরীক্ষাটা পাশ করেছে। এখন তার দজ্জাল বউদি তাকে দিয়ে বাসন মাজায়, কাপড় কাচায়, উঠোন ঝাঁট দেওয়ায়, আগাছা পরিষ্কার করায়, গোয়ালেরও হরেক কাজ তাকে করতে হয়। এমনকি দুপুরবেলা গোরু চরানোও আজকাল তার কাজ হয়েছে।

গৌরের এই কষ্ট তার মা আর চোখে দেখতে পারে না। একদিন মা তাকে ডেকে বলল, "শোন্ বাবা, আমি চোখ বুজলে এদের সংসারে তোর বড় অনাদর হবে। একটু রয়ে বুঝে থাকিস। আর মরার আগে আমি তোকে একটা জিনিস দিয়ে যাব। সেটা সাবধানে রাখিস।"

গৌর অবাক হয়ে বলে, "কী জিনিস, মা?"

"সে আছে। সময়মতো দেখতে পাবি।"

এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই গৌরের মা মারা গেল। মরার আগে গৌরকে কাছে ডেকে চুপিচুপি যে জিনিসটা তার হাতে দিল, সেটা এমন কিছু আহামরি জিনিস নয়। একটা কবচ।

গৌর খুব কান্নাকাটি করল মায়ের জন্য।

শ্রাদ্ধের পর নিতাই আর তার বউ গৌরকে একদিন ডেকে বলল, "এভাবে আর কতদিন বসে বসে খাবে? রোজগারের ধান্ধায় বেরিয়ে পড়ো।"

শুনে গৌরের ভারী ভয় হল। কারণ জীবনে সে কখনও গাঁয়ের বাইরে বেরোয়নি। বাইরের জগৎটা কেমন তাও সে জানে না। তবে মুখে কিছু বলল না সে। শুধু বলল, "আচ্ছা।"

নিজের ভাঙা ঘরখানায় বসে একদিন দুপুরে ভাগ্যের পাকচক্রের কথা ভাবতে ভাবতে মায়ের দেওয়া কবচটার কথা মনে পড়ল তার। কুলুঙ্গিতে লক্ষ্মীর পটের পিছনে লুকিয়ে রাখা কবচটা বের করে ভালভাবে দেখল সে। সাধারণ তামায় তৈরি। সোনা হলেও নাহয় বেচে দু'পয়সা আয় হত। কবচটার গুণই বা কী? যদি গুণই থাকত, তাহলে সংসারে এত অভাব আর অশান্তিই বা কেন!

গৌরগোপাল কবচটা হাতের মুঠোয় নিয়ে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। মরার সময় তার মা বিকারের ঘোরে ভুল বকছিল। গৌরগোপাল তখন সংসারে তার শেষ স্নেহের আশ্রয় মায়ের মৃত্যু-নীল মুখখানার দিকে চেয়ে হাঁ করে বসে থাকত। কথাগুলো তার কানে সেঁধোলেও মগজে ভাল করে ঢুকত না। তার মনে পড়ল, মা বিকারের ঘোরে বলেছিল, "কবচটা কিন্তু খুব সাবধান কখনো হারাসনি বাবা ওর মধ্যে কিন্তু দানো আছে দানো খুব সাবধান

এই দানো কে বা কী তা গৌরগোপাল জানে না। তবে কবচটা সে আবার সাবধানে কুলুঙ্গিতে পটের আড়ালে রেখে দিল।

সংসারে তার যতই অনাদর হোক, মা যতদিন বেঁচে ছিল, ততদিন দু'বেলা ভরপেট খাওয়া জুটত। কিন্তু মা মরে ইস্তক সেটাই আর জুটছে না। বউদি খেতে দেয় বটে, তবে একবারের বেশি দু'বার ভাত সাধে না। ভাল পদ যদি কোনোদিন কিছু রান্না হয়, তবে তা গৌরগোপালের চোখের আড়ালে রাখে। এ-সবই গৌর টের পায়, কিন্তু ভয়ে কিছু বলে না। বলে হবেই বা কী? বরং বেশি ট্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই করতে গেলে দাদা ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেবে। এই বাড়ি থেকে বেরোতেই গৌরের যত ভয়। বাইরের দুনিয়াটাকে তো সে একেবারেই চেনে না। এমন বিদ্যেও নেই যে, নিজে কিছু রোজগার করে খাবে।

গৌর তাই আধপেটে খেয়েও আজকাল দাদার সংসারে দ্বিগুণ খাটুনি দেয়। গোরু চরানো, বাগান পরিষ্কার, মাটি কোপানো, জল তোলা তো ছিলই, সেই সঙ্গে আরও অনেক কাজ করে দেয় সে। কাঠ কাটে, পুকুরের পানা তোলে, দাদার ছেলেমেয়েকে পড়ায়। সারাদিন এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেয় না। হাসি-হাসি মুখ করে সারাক্ষণ দাদা-বউদিকে খুশি করতে চেষ্টা করে, যাতে বাড়ি থেকে এরা তাকে তাড়িয়ে না দেয়।

কিন্তু বিপদ হল, হঠাৎ একদিন বউদি তার দুই ষণ্ডামতো বজ্জাত ভাইকে এ-বাড়িতে থাকার জন্য আনাল। তাদের নাম মাউ আর খাউ। তারা নাকি বখে যাচ্ছিল, সুতরাং ঠাঁইনাড়া করে তাদের শোধরানো দরকার। দুই ভাইয়েরই বেশ পালোয়ানের মতো চেহারা। খুব ডাকাবুকো ধরনের। বাড়িতে পা দিয়েই তারা নিরীহ গৌরগোপালকে নিয়ে পড়ল।

গৌর সাতে-পাঁচে থাকে না, সারাদিন কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু তাকে দেখলেই কেন যেন দাদার শালাদের মজা করার ইচ্ছে উশকে ওঠে। গৌর হয়তো বাগানের কাজ করছে, পিছন থেকে এসে তারা হয়তো তার কাছাটা টেনে খুলে দেয়। নয়তো তার ন্যাড়া মাথায় হঠাৎ একটু তেরে কেটে তাক বাজিয়ে চলে যায়। গৌর কিছু বলে না। একে কুটুম মানুষ, তার ওপর আবার বউদি বা দাদার কাছে সুবিচার পাওয়ার বদলে বকুনি খাওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশি। তাই গৌরকে সয়ে যেতে হয়। শুধু তাই নয়, এই দুই বজ্জাতকে খুশি করার জন্য সে সেধে-সেধে হেসে-হেসে আগ বাড়িয়ে কথা বলতেও যায়। তাতে যে সবসময়ে লাভ হয় এমন নয়। মাউ আর খাউ বুঝে গেছে, গৌরগোপাল একটি আহাম্মক এবং বোকা। তার ওপর এ-বাড়িতে সে আছে আগাছার মতোই। সুতরাং গৌরকে তারা একদম পাত্তা দেয় না। তবে দরকারমতো তাকে দিয়ে পা দাবিয়ে বা পিঠ চুলকিয়ে নেয়। গৌর তাদের স্নানের আগে গায়ে তেল মাখায়, খাওয়ার সময় পাখা দিয়ে মাছি তাড়ায়। মাউ আর খাউ তাকে বাড়ির চাকরের মতোই ভাবে আর সেইরকমই ব্যবহার করে।

তবে কিনা গৌরগোপালের তাতে অপমান বোধ হয় না। এ বাড়িতে সে যে থাকতে পারছে, তাকে যে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না, এইটেই তার কাছে ঢের বলে মনে হয়। জন্মাবধি এ বাড়ির সঙ্গে তার নাড়ির সম্পর্ক।

মাঝে-মাঝে নিঝুম রাতে গৌরগোপাল মায়ের দেওয়া কবচটা বের করে হাতের মুঠোয় করে চুপ করে বসে থাকে। সে কিছুতেই বুঝতে পারে না মা তাকে এই কবচটা দিয়ে গেল কেন। তামার কবচটার মুখ ধূপের আঠা দিয়ে আটকানো। মাঝে মাঝে সে কবচটা নেড়ে বুঝবার চেষ্টা করে, ভিতরে কী আছে। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারে না।

এর মধ্যে একদিন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। গৌরগোপাল খাউ আর মাউয়ের সঙ্গে পুকুরে স্নান করতে গেছে। তিনজনেই জলে দাপিয়ে স্নান করছে। হঠাৎ খাউ মাউ দুই ভাইয়ের মজা উশকে উঠল। হঠাৎ দুজনে মিলে গৌরকে ধরে জলের মধ্যে চুবিয়ে রাখল। দুষ্টু বাচ্চারা এরকম একটু-আধটু করে, কিন্তু এ-খেলায় একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেলে জীবন-সংশয়। মাউ আর খাউয়ের সেই কাণ্ডজ্ঞান নেই। একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে যে তিন মিনিটের বেশি কিছুতেই শ্বাস বন্ধ করে রাখা সম্ভব নয়, এটা বোধহয় তাদের

জানাও ছিল না। দুই ভাই গৌরকে জলের তলায় চেপে রেখে হিহি করে হাসছিল।

ওদিকে জলের মধ্যে গৌর তখন আস্তে-আস্তে এলিয়ে পড়ছে। শ্বাস নিতে গিয়ে ঘাঁত ঘাঁত করে জল গিলে ফেলছে। চেতনা আস্তে-আস্তে মুছে যাচ্ছে।

কাঠ কেটে, মাটি কুপিয়ে গৌরের গায়ে জোর কিছু কম হয়নি। তা ছাড়া জলে সাঁতার কেটে-কেটে তার দমও হয়েছে অফুরন্ত। ইচ্ছে করলে সে খাউ আর মাউয়ের থাবা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারত। কিন্তু ভালমানুষ গৌর মরতে-মরতেও ভাবছে 'যদি গায়ের জোর খাটাই তাহলে কুটুম মানুষদের অপমান করা হবে। ওরা তো আমাকে নিয়ে একটু মজাই করছে। তার বেশি তো কিছু নয়। মজাটা যদি করতে না দিই তাহলে দাদা বউদি বোধহয় রেগে গিয়ে তাড়িয়েই দেবে বাড়ি থেকে।' এইসব ভেবে গৌর আর নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করল না। খুব বিনয়ের সঙ্গে মরার জন্য চোখ বুজে ফেলল।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন পুকুরপাড়ে মেলা লোক জমেছে। তাকে উপুড় করে শুইয়ে গাঁয়ের চৌকিদার কুস্তিগির বাঁটুল তার পেটের জল বের করার জন্য পিঠের ওপর বসে দুমদাম কিল মারছে। বুড়ো কবিরাজমশাই তার নাড়ি ধরে বসে চোখ বুজে বিড়বিড় করে বলছেন, "এখনো ক্ষীণ অতিক্ষীণ নিমজ্জমান।" তাঁর পাশেই ফকিরসাহেব তাঁর আরশিখানা নিয়ে বসে আছেন।

গৌরের জ্ঞান ফিরে এল বটে, কিন্তু বাঁটুলের কিলের চোটে আবার তার মূর্ছা যাওয়ার উপক্রম। সে চেঁচিয়ে উঠল, "আমি বেঁচে আছি-ই! ওরে বাবা, মরলাম রে।"

সবাই হৈ-হৈ করে উঠল "বেঁচে আছে বেঁচে আছে

তা বেঁচে গেল বটে গৌর, কিন্তু তার বড় ভয় হতে লাগল। ওই দুই বজ্জাত কুটুমের পাল্লায় পড়ে একদিন বেঘোরে প্রাণটা না যায়।

ভেবেচিন্তে গৌর একদিন দুপুরে গোরু চরানোর সময় গাঙপারে ফকিরসাহেবের স্থানে হানা দিল। আড়াইশো বছর বয়সী ফকিরসাহেব তখন একখানা আরশি মুখের সামনে ধরে কাঠের চিরুনিতে দাড়ি আঁচড়াচ্ছেন। ওই আরশি আসলে ভূতের কল। যেখানে যত লোক মরে, ফকিরসাহেব গিয়ে তার আত্মাটাকে আরশিতে ভরে ফেলেন। এইভাবে ওই আরশিতে এ-যাবৎ কয়েক হাজার ভূত জমা হয়েছে।

গৌর ফকিরসাহেবের সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে বলে, "আজ্ঞে আমাকে একটা ভয়-তাড়ানোর তেল দেবেন?"

ফকিরসাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, "তোর ভয়টা কিসের?"

"আজ্ঞে খাউ আর মাউ বড্ড অত্যাচার করে। কুটুম মানুষ, কিছু বলতেও পারি না। দেখলেন তো সেদিন জলে চুবিয়ে মারার যোগাড় করেছিল।"

ফকিরসাহেব খুব বিরক্ত হয়ে বললেন, "তা সেদিন যদি মরতিস তো অমাবস্যার আগেই আমার পাঁচ হাজারটা ভূত পুরে যেত। যত নষ্টের গোড়া ওই কবরেজটা। তোর আত্মাটা শরীর ছেড়ে নাকের ফুটো দিয়ে বের হওয়ার জন্য সবে মাথাটা গলিয়েছে, আর ঠিক সেইসময়ে কবরেজ এমন একটা পাঁচন খাইয়ে দিলে যে, বাপ বাপ করে আত্মাটা আবার সেঁদিয়ে গেল ভিতরে।"

গৌর চোখ বড়-বড় করে বলে, "আমার আবার ভয় করতে লেগেছে ফকিরবাবা।"

"খাউ আর মাউটা কে বল তো!" ফকিরসাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

"বউদির ভাই।"

"তা ওদের ওরকম নাম কেন?"

"সে জানি না। তবে তিন ভাইয়ের নাম হাউ মাউ আর খাউ।

বড় জন হাউ এখন জেলখানায় আছে। ডাকাতির আসামি। খালাস পেয়ে সেও নাকি এসে জুটবে। ফকিরবাবা, আমি বোধহয় বেশিদিন আর বাঁচব না।"

ফকিরসাহেব মোলায়েম গলায় বললেন, "বেঁচে থেকে হবেটা কী? বেঁচে থাকলেই খিদে পায়, খাটতে হয়, লোকের সঙ্গে ঝগড়া লাগে। তার চেয়ে মরে ভূত হয়ে আমার আরশিতে ঢুকে পড়, সুখে থাকবি।"

"তা নাহয় থাকব ফকিরবাবা, কিন্তু বেঁচে থাকার দু'একটা সুখ না করে আমি মরতে পারব না।"

ফকিরসাহেব ভ্রূ কুঁচকে বলেন, "বেঁচে থাকায় আবার সুখ কী রে! মরলেই সুখ।"

"কিন্তু আমি যে জীবনে কখনো পোলাউ খাইনি, চন্দ্রপুলি খাইনি, লুচি দিয়ে পায়েস খাইনি, মোটরগাড়িতে চাপিনি, ঢেউপুরের রথের মেলায় সার্কাসের খেলা দেখিনি। আগে এসব হোক, তারপর মরব।"

ফকিরসাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "ছেলেমানুষ। একেবারে ছেলেমানুষ। তা যা, ভয় তাড়ানোর তেল একটু দিয়ে দিচ্ছি।" বলে ফকিরসাহেব উঠে ঘর থেকে একশিশি তেল এনে মন্ত্র পড়তে লাগলেন, "যন্তর মন্তর তন্তর সার, ভয় ভাবনা পগার পার। রাক্ষস খোক্কস দত্যি দানো, হাউ মাউ খাউ যতই আনো। ভূত পেত্নি ডাকাত তস্কর, তফাত হ রে যত ভয়ংকর। বৃশ্চিক, সর্প, সিংহ ব্যাঘ্র, দুর হয়ে যা শীঘ্র শীঘ্র। নিশুত রাত্রি, অমাবস্যা, হয়ে যা রে একদম ফর্সা।" তিনটে ফুঁ দিয়ে ফকিরসাহেব তেলটি তার হাতে দিয়ে বললেন, "কবরেজটার কাছে একদম যাবি না। আর রোজ একঘটি করে টাটকা দুধ দুয়ে দিয়ে যাবি সক্কালবেলায়।"

গৌর ঘাড় নেড়ে তেল নিয়ে ফকিরসাহেবের কাছ থেকে বিদেয় হল।

বিকেলে যখন গৌর খিদে-পেটে গোরু চরিয়ে ফিরছে, তখন মহাকাল-মন্দিরের সামনের রাস্তায় কবরেজমশাইয়ের মুখোমুখি পড়ে গেল।

কবরেজমশাই নাক উঁচু করে বাতাস শুঁকতে-শুঁকতে বললেন, "উঁ! উঁ! মহামাস তেলের গন্ধ পাচ্ছি। এই ছোঁড়া, কার গা থেকে গন্ধটা আসছে রে?"

ভয়ে-ভয়ে গৌরগোপাল বলে, "আজ্ঞে আমার গা থেকে।"

"তুই এ তেল পেলি কোথায় ?"

"ফকিরসাহেব দিয়েছেন। তবে এ মহামাস তেল নয় কবরেজমশাই, এ হল ভয়তাড়ানো তেল। অনেক মন্তর লাগে।"

কবরেজমশাই হাঃ হাঃ করে হেসে বললেন, "ফক্‌রেটা তাই বলে বুঝি! ত্যাঁদড় তো কম নয়। এই তো বোধহয় গত মঙ্গলবার আমাকে অনেক তোতাই-পাতাই করে পুরনো মহামাস তেলটা ধারে নিয়ে গেল। সেটাই ভয়তাড়ানো তেল বলে বেচেছে বুঝি!"

গৌর ঘাড় চুলকোতে থাকে।

কবরেজমশাই হুংকার দিয়ে বলেন, "তোর আবার ওটার কাছে যাওয়ার দরকারই বা পড়ল কেন ? ভয় পাচ্ছিস বুঝি ? কিসের ভয় ?"

"আমার অনেকরকম ভয় কবরেজমশাই।"

"দেখি তোর নাড়িটা।" বলে কবিরাজমশাই অনেকক্ষণ ধরে গৌরগোপালের নাড়ি ধরে চোখ বুজে রইলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "প্রাণপাখিটা যে বড্ড ডানা ঝাপটাচ্ছে রে। ভয় হওয়ারই কথা কিনা।"

"তবে কী হবে কবরেজমশাই ?"

"বাড়ি গিয়ে শুয়ে থাকগে। আজ আর কিছু খাসনে। কাল একটা পাঁচন তৈরি করে রাখবখন, এসে নিয়ে যাস। আর ওই ফক্‌রেটার কাছে কখনো যাবি না। জ্যান্ত মানুষ ওর ভালই লাগে না। মানুষ মরলে পরে ওর আনন্দ হয়।"

"যে আজ্ঞে।"

"তোদের পিছনের আমবাগানে একটা মস্ত মৌচাক দেখেছিলাম যেন।"

"ঠিকই দেখেছেন।"

"পিছনের পুকুরটায় খুব পদ্মফুল ফোটে, না ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তাহলে পদ্মমধুই হবে। খানিকটা দিস তো।"

ঘাড় নেড়ে গৌরগোপাল বাড়ির পথ ধরল। কবিরাজমশাই কিছু খেতে বারণ করেছেন। কিন্তু খিদের চোটে গৌরের বত্রিশ নাড়ি পাক দিচ্ছে। সকালে যে তেঁতুল-পান্তা খেয়েছিল, সারাদিন রোদে রোদে মাঠে ঘুরে তা কখন তল হয়ে গেছে। উপোস করলে কি আর রক্ষে আছে!

তবু গৌর বাড়ি ফিরে গোয়ালে সাঁজাল দিয়ে পেটব্যথা বলে ঘরে গিয়ে শুয়ে রইল।

গাঁ-গ্রামের লোকেরা সন্ধের পরই খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ে। বাতি জ্বালাবার খরচ অনেক। সন্ধের পর কাজটাই বা কী ?

কিন্তু গৌরের ঘুম আসার নাম নেই। ঘড়ি-ঘড়ি উঠে খিদের জ্বালায় জল খাচ্ছে। সাতঘটি জল খেয়ে ফেলল, কিন্তু খিদে মেটবার নামটিও নেই। রাত যখন নিশুতি হয়ে এসেছে, তখন গৌর আর পারল না, উঠে দরজা খুলে বেরিয়ে এল।

বেশ ফটফটে জ্যোৎস্না উঠেছে। সাদা উঠোনটা ধবধব করছে চাঁদের আলোয়।

গৌর চুপিচুপি গিয়ে রান্নাঘরের শিকল খুলে ঢুকল। সে জানে, রান্নাঘরে কিছুই থাকে না। চোরের ভয়ে বাসনকোসন রাখা হয় না এ-ঘরে। তবে মাটির গামলায় কিছু ভাতের ফ্যান হয়তো রাখা আছে, এই ভেবে গৌর মাটির গামলাটা তুলে দেখল। না, নেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গৌর বেরিয়ে আসছিল। বাগানের গাছে ফলটল আছে। কিন্তু রাত্রিবেলা গাছের গায়ে হাত দিতে নেই। বউদির ঘরে যদিও-বা মুড়ি-বাতাসা কিছু থেকে থাকে কিন্তু তার নাগাল পাওয়া অসম্ভব।

রান্নাঘরের শিকলটা তুলে দিয়ে গৌর উঠোনে নামবার জন্য পা বাড়িয়েও থেমে গেল। উঠোনের পশ্চিম দিকে দরজা খোলার শব্দ হচ্ছে। গৌর ছায়ায় সরে দাঁড়ায়।

দরজা খুলে খাউ আর মাউয়ের ঘর থেকে ঢ্যাঙামতো একটা লোক বেরিয়ে লম্বা-লম্বা পায়ে উঠোনটা পেরিয়ে চলে গেল।

জ্যোৎস্নায় লোকটার মুখ ভাল দেখা গেল না বটে, কিন্তু গৌরের মনে হল, লোকটার মুখে দাড়ি আছে। আর চোখ দুটো মনে হল বেশ গর্তে ঢোকানো। লোকটা উঠোন পেরোবার সময় চারদিকে চোখ ঘোরাতে-ঘোরাতে যাচ্ছিল।

গৌর এরকম ঢ্যাঙা লোক এ-অঞ্চলে আর দেখেনি। লোকটা চলে যেতেই খাউ আর মাউয়ের ঘরে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

এই নিশুতি রাতে এরকম একটা অদ্ভুত লোক ওদের ঘরে এসেছিলই বা কেন আর চুপিচুপি চলেই বা গেল কেন, তা ভেবে পেল না গৌর। ভাববার মতো শরীরের অবস্থাও নয় তার। খিদের চোটে পেট থেকে গলা অবধি তার আগুন জ্বলছে।

ঘরে এসে সে ঘুমোবার চেষ্টা করল। না, ঘুম আসছে না। উঠে একটু পায়চারি করল। তাতেও হল না। তখন সে খুব কষে কয়েকটা বুকডন আর বৈঠক দিয়ে নিল। তাতে হল হিতে বিপরীত। খিদেটা রাক্ষসের মতো হাউ মাউ খাঁউ করে তার পেটটাকে ছিঁড়ে ফেলতে লাগল।

গৌর কুলুঙ্গিতে পটের পিছনে লুকোনো কবচটা বের করে হাতের মুঠোয় ধরে কাঁদতে-কাঁদতে বলল, "মা, তুমি বেঁচে থাকতে কখনো খাওয়ার কষ্টটা হয়নি। এবার যে খিদেয় বাঁচি না। বাঁচিয়ে দাও মা।"

খিদেটা তাতে মরল না বটে, কিন্তু কবচটা হাতের মুঠোয় নিয়ে বসে থাকতে থাকতেই গৌর কাহিল হয়ে শুয়ে পড়ল। কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তা আর তার খেয়াল নেই।

॥ ২ ॥

পেটে ভাত নেই বলে গৌরের ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। শরীরটা বেশ কাহিল লাগছিল। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। বাইরে এসে গৌর অভ্যাসবশে গিয়ে গোয়ালঘরে ঢুকল।

গোরুদের সঙ্গে গৌরের ভারী ভাবসাব। তাদের দুটো গোরু, দুটো বাছুর। গৌরকে দেখলেই তারা ভারী চঞ্চল হয়ে ওঠে। গা শুঁকে, চেটে, কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নানারকমভাবে তাদের আদর জানায় পশুপাখিরাও মানুষ চেনে। গৌর গোরুদের গায়ে হাত বুলিয়ে, গলকম্বলে সুড়সুড়ি দিয়ে আদর করে বলল, "বড্ড খিদে পেয়ে গেছে তোদের, না রে? চল্, আগে তোদের জাবনা দিই।" বড় গোরুটা এই কথা শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

গোরুদের জাবনা দিতে-দিতে গৌরের সেই লম্বা লোকটার কথা মনে পড়ল। মাউ আর খাউয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে লোকটা হনহন করে কোথায় যেন চলে গেল চোর-ডাকাত নয় তো! কথাটা একবার তার দাদা নিতাইয়ের কানে তোলা দরকার। গাঁয়ের চোরদের সবাইকেই চেনে গৌর। তাদের সঙ্গে বেশ ভাবসাবও আছে। সুতরাং লোকটা গাঁয়ের আশেপাশের গাঁয়েরও নয়। তাহলে লোকটা কে?

নিতাই যখন পুকুরের ঘাটলায় দাঁড়িয়ে দাঁতন করছিল, তখন গৌর গিয়ে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, "দাদা, একটা কথা ছিল।"

নিতাই ভাইয়ের ওপর বিশেষ সন্তুষ্ট নয়। অন্যদিকে চেয়ে বলল, "পয়সা-টয়সা চেয়ো না। অন্য কথা থাকলে বলতে পারো।"

"না, পয়সা নয়। আমি পয়সা দিয়ে কী করব! বলছিলাম কী, কাল রাতে বাড়িতে চোর এসেছিল।"

নিতাই আঁতকে উঠে বলে, "চোর! কোন্ চোর দেখেছিস?"

"চেনা চোর নয়। লোকটা খুব লম্বা, খাউ আর মাউয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল দেখলাম।"

"তাহলে চেঁচাসনি কেন?"

"আমার প্রথমটায় মনে হয়েছিল, বোধহয় ওদের চেনা লোক। দরজা খুলে বেরোল, তারপর আবার ভিতর থেকে কে যেন দরজা

বন্ধ করে দিল। তাই বুঝতে পারছিলাম না কী করব। যদি কুটুমদের চেনা লোক হয়, তাহলে চোর বলে চেঁচালে তাদের অপমান হবে।"

নিতাই দাঁতন করা থামিয়ে গৌরের দিকে চেয়ে ছিল। হঠাৎ বলল, "কীরকম চেহারাটা বললি ?"

"খুব লম্বা আর সুরুঙ্গে।"

নিতাই গম্ভীর হয়ে বলল, "আজ রাত থেকে তোর ঘুমোনো বন্ধ। সারা রাত জেগে লাঠি নিয়ে বাড়ি পাহারা দিবি। তোর বউদিকে বলে দিচ্ছি, আজ থেকে যেন তোকে রাতে ভাতটাত না দেয়। ভাতটাত খেলেই ঘুম আসে। পেটে একটু খিদে থাকলে জেগে থাকতে সুবিধে হয়।"

নিতাইয়ের কথা শুনে গৌরের মুখ শুকিয়ে গেল। একেই তো বউদি তাকে পেট ভরে খেতে দেয় না বলে সারাদিন পেটের মধ্যে হাঁচোড়-পাঁচোড় করে। তার ওপর রাতের খাওয়া বন্ধ হলে যে কী অবস্থা হবে ! কিন্তু কী আর করা। গৌর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চাট্টি পান্তাভাত খেয়ে গোরু নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

নদীর ধারের মাঠে গোরুগুলিকে ছেড়ে দিয়ে গৌর গোবিন্দের বাড়ি গিয়ে হানা দিল। গোবিন্দ এই তল্লাটের সবচেয়ে পাকা চোর। মাঝবয়সী, গাঁট্টাগোট্টা চেহারা, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, চোখ দুখানায় বুদ্ধির ঝিকিমিকি। চোর হলেও গোবিন্দ লোক খারাপ নয়। গৌরের মা বেঁচে থাকতে ভাগবত শুনতে যেত, মুড়ি-বাতাসা খেয়ে আসত।

গোবিন্দ উঠোনে বসে পাটের দড়ি পাকাচ্ছিল। গৌরকে দেখে খুশি হয়ে বলল, "আয়, বোস এসে। তা দাদা-বউদির সংসারে কেমন আছিস ?"

গৌর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "ভাল নয় গোবিন্দদা।"

"ভাল থাকবি কী করে ? ওই যে দুটো গুণ্ডাকে আনিয়ে রেখেছে

তোর দাদা, ওরাই তোকে মেরে তাড়াবে। সাবধানে থাকিস।"

গৌর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "তাড়াবে সে আর বেশি কথা কী ? বেঁচে যে আছি, এই ঢের। আজ থেকে আবার রাতের খাওয়াও বন্ধ হল।"

"কেন, কেন ?"

"কাল রাতে বাড়িতে চোর এসেছিল, সেকথা দাদাকে বলায় দাদা রাতের খাওয়া বন্ধ করে সারা রাত জেগে পাহারা দিতে হুকুম করেছে।"

"চোর !" বলে গোবিন্দ সোজা হয়ে বসল। তারপর বলল, "চোরকে দেখেছিস ?"

"সেই কথাই তো বলতে এলাম। লম্বা সুরুঙ্গে চেহারার বিটকেল একটা লোক রাতে খাউ আর মাউয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোন পেরিয়ে চলে গেল। প্রথমটায় ভেবেছিলাম বুঝি ওদের কাছেই কেউ এসেছিল, চেনা লোক-টোক হবে।"

"লোকটা যে চোর তা বুঝলি কী করে ?"

"চোর কি না তা জানি না। তুমি এরকম চেহারার কোনো লোককে চেনো ?"

গোবিন্দ মাথা নেড়ে বলল, "সে কথা পরে হবে। আগে ভাল করে লোকটার চেহারাটা মনে করে বল।"

"খুব ভাল করে দেখিনি। জ্যোৎস্নার আলোয় আবছা-আবছা যা মনে হল, লোকটা তালগাছের মতো ঢ্যাঙা, রোগাটে চেহারা, লম্বা লম্বা পা ফেলে উঠোন পেরিয়ে চলে গেল। তারপর খাউ আর মাউয়ের দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পেলাম।"

গোবিন্দ দড়ি পাকানো বন্ধ করে গোল-গোল চোখে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ভুরু কুঁচকে বলল, "ঢ্যাঙা লোক বললি ? খুব রোগা ?"

"সেরকমই মনে হল।"

গোবিন্দ দু'একটা শ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে বলল, "এ-অঞ্চলের লোক হলে ঠিক বুঝতে পারতাম লোকটা কে। না রে, এ তল্লাটের লোক নয়। চোর বলেও মনে হচ্ছে না। চোর হলে দরজায় শব্দ হত না। তোর দাদার ওই দুই গুণ্ডা শালার স্যাঙাত নয় তো ?"

"তাও হতে পারে।"

"একটু নজর রেখে চলিস। ওদের বড় ভাইটা লোক ভাল নয়। সেটা এখন জেলখানায় আছে বটে, কিন্তু চারদিকে তার অনেক চেলা-চামুণ্ডা।"

"হাউয়ের কথা বলছ ? তাকে চেনো নাকি ?"

"খুব চিনি, হাড়ে-হাড়ে চিনি। বিশাল লম্বাচওড়া চেহারা, গায়ে অসুরের মতো জোর। সেই জোর নিয়ে কী করবে তা ভেবে পায় না। তাই সবসময়ে একে মারছে, তাকে ধরছে, লোকের সঙ্গে পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করছে। চুরি ডাকাতি থেকে শুরু করে খুন অবধি কিছু বাকি নেই। হেন কাজ নেই যা ও করতে পারে না।"

গৌর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "শুনছি জেল থেকে বেরিয়ে সেও এখানে আসছে।"

"আমিও শুনেছি। তোর দাদার মাথায় গোলমাল আছে বলেই শালাকে আদর করে এনে বসাতে চাইছে। কিন্তু এই আমি বলে দিচ্ছি, হাউ যদি আসে তবে তোদের কাউকে আর ওই ভিটেয় তিষ্টোতে হবে না। এমনকি, গাঁয়ে লোক থাকতে পারবে কি না সন্দেহ।"

গৌর হতাশ হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল।

গোবিন্দ তার দিকে চেয়ে বলল, "লম্বা লোকটা কে সেটা আমাকেও জানতে হচ্ছে। তুই ভাবিস না, আজ রাতে তোর সঙ্গে আমিও পাহারা দেব'খন।"

খানিকটা ভরসা পেয়ে গৌর উঠে গোরু চরাতে গেল।

গোরু চরাতে গৌরকে খুব একটা পরিশ্রম করতে হয়, তা নয়। গোরুগুলো আপনি ঘুরে-ঘুরে মাঠের নধর ঘাস খেয়ে বেড়ায়। গৌর শুধু নজর রাখে যাতে ওরা হারিয়ে না যায় বা কারও বাগানে বা বাড়িতে না ঢোকে, কিংবা নালা-নর্দমায় না পড়ে-টড়ে যায়। গোরু মাঠে ছেড়ে দিয়ে গৌর প্রথমে জঙ্গলে গিয়ে ঢোকে। দুপুরবেলাটায় তার বড় খিদে পায়। কিন্তু এত ঘন-ঘন খিদে পেলে তো চলবে না। দুপুরের ভাত সেই বেলা গড়ালে গিয়ে জুটবে। ততক্ষণে গৌর জঙ্গলে ঢুকে ফলটল খোঁজে। পেয়েও যায় মাঝে-মাঝে। এক-এক সময়ের এক-এক ফল। কখনও কামরাঙা, কখনও আতা, তেঁতুল, বেল, মাদার বা ফলসা। চুনোকুল আর বনকরমচাও মিলে যায় কখনও-কখনও। তারপর একটা ঝুপসি গাছের তলায় শুয়ে সে কিছুক্ষণ ঘুমোয়।

আজ গৌর জঙ্গলে দুটো আতা পেয়ে গেল। ভারী মিষ্টি। খেয়ে গাছতলায় গামছা পেতে শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে গৌর স্বপ্ন দেখল, মা তার মাথার কাছটিতে এসে বসেছে। খুব মিষ্টি করে মা বলল, "কবচটা পরিসনি ? ওরে বোকা ! কবচটা সব সময়ে পরে থাকবি।"

ঘুম ভেঙে গৌর ধড়মড় করে উঠে বসল। তাই তো ! কবচটার কথা যে তার খেয়ালই ছিল না। ঘরে কুলুঙ্গিতে তুলে রাখা আছে।

দুপুরবেলা বাড়ি ফিরেই গৌর গিয়ে কুলুঙ্গিতে কবচটা খুঁজল। নেই। গৌর অবাক। কাল রাতে নিজের হাতে কবচটা এইখানে রেখেছে সে। গেল কোথায় ? সারা ঘর এবং ঘরের আশেপাশে আঁতিপাঁতি করে খুঁজল সে। কোথাও কবচটা খুঁজে পেল না। বুকটা ভারী দমে গেল তার। চোখে জল এল। কবচটার মধ্যে যে বিশেষ কোনো গুণ আছে, তেমন তার মনে হয় না। তবে মায়ের দেওয়া জিনিসটার মধ্যে মায়ের একটু ভালবাসা আর আশীর্বাদও তো আছে।

ঢাকা ভাত রান্নাঘরে পড়ে ছিল। গৌর স্নান সেরে কড়কড়ে সেই ঠাণ্ডা ভাত একটু ডাল আর ডাঁটাচচ্চড়ি দিয়ে কোনোক্রমে গিলেই ফকিরসাহেবের কাছে দৌড়োল। লোকে বলে ফকিরসাহেব তাঁর আর্শিখানার ভিতর দিয়ে তামাম দুনিয়ার সব জিনিস দেখতে পান। হারানো জিনিসের সন্ধান তাঁর মতো আর কেউ দিতে পারে না।

ফকিরসাহেব এই দুপুরেও আর্শিখানা হাতে নিয়ে দাওয়ায় বসে ছিলেন। চোখ দুটো ঢুলুঢুলু, মুখে পান।

"ফকিরসাহেব ! ও ফকিরসাহেব !"

ফকিরসাহেব একটু চমকে উঠে বললেন, "কে রে ! গৌর !"

"আমার একটা জিনিস হারিয়েছে ফকিরবাবা।"

ফকিরসাহেব একটা হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বললেন, "হারিয়েছে না চুরি গেছে ? ঘর থেকে না বার থেকে ? ধাতুদ্রব্য না অধাতুদ্রব্য ? ভারী না হালকা ? চকচকে না ম্যাটমেটে ?"

"একটা কবচ ফকিরবাবা। একটা তামার কবচ। আমার মা মরার আগে দিয়ে গিয়েছিল।"

কথাটা শুনে ফকিরসাহেব কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইলেন। সেই হাঁ দেখে গৌরের মনে হয়েছিল, ফকিরসাহেব বুঝি আবার হাই তুলছেন। কিন্তু এতক্ষণ ধরে কেউ তো হাই তোলে না ! আর হাই তোলার সময়ে কেউ ওভাবে গুল্লু-গুল্লু চোখ করে চেয়েও থাকে না। গৌরের বেশ ভয়-ভয় করতে লাগল। ফকিরসাহেব হাঁ করে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ খিচিয়ে উঠে বললেন, "হারিয়ে বসলি ? মুখ্যু গাধা কোথাকার !"

গৌর হকচকিয়ে গিয়ে বলল, "আমার দোষ নেই। কুলুঙ্গিতে যত্ন করে রেখেছিলুম।"

ফকিরসাহেব মুখ ভেঙিয়ে বললেন, "কুলুঙ্গিতে রেখেছিলুম ! মাথাটা কিনে নিয়েছিলে আর কী ! কেন রে হতভাগা, কবচটা হাতে পরে থাকতে কী হয়েছিল ?"

"আজ্ঞে, গোরু-টোরু চরাই, বাসন-টাসন মাজি, কাঠটাঠ কাটি, কখন কোথায় ছিটকে পড়ে যায়, সেই ভয়ে হাতে পরিনি।"

ফকিরসাহেব দুখানা হাত গৌরের মুখের সামনে নাচিয়ে বললেন, "উদ্ধার করেছ। এখন কী সর্বনাশ হয় দ্যাখো।"

এই বলে গম্ভীর মুখে ফকিরসাহেব উঠে গিয়ে বারান্দার এক কোণে তামাক সাজতে বসলেন।

গৌর ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারল না। তবে কাঁচুমাচু মুখ করে বসে রইল চুপচাপ।

ফকিরসাহেব অনেকক্ষণ ধরে তামাক খেলেন। তারপর কলকে উপুড় করে রেখে নিমীলিত চোখে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে বললেন, "ও কবচের কথা এ-গাঁয়ে মাত্র কয়েকজন জানে। এই ধর আমি, কবরেজ, সুবল হোমিও, চোর গোবিন্দ, এমন ক'জন মাত্র। যারা জানে, তাদের বয়স এই আমারই মতো দেড়শো বা দুশো বছর।"

গৌর চোখ কপালে তুলে বলে, "গোবিন্দদার বয়স দেড়শো দুশো ?"

"এই সবে একশো একান্ন হয়েছে। আমার চেয়ে বাহান্ন বছরের ছোট। কবিরাজের বোধহয় একশ পঁচাত্তর চলছে, সেদিনের ছোকরা। সুবলের গত মাঘে দুশো হয়ে গেল।"

গৌর খুব ভক্তিভরে চেয়ে ছিল। বলল, "উরে বাবাঃ।"

"বয়সের কথাটা তুললাম কেন জানিস ? তোদের ওই কবচটার ইতিহাস পুরনো লোক ছাড়া কেউ জানে না। আর ইতিহাসও সাঙ্ঘাতিক। তবে শুনে রাখ, এই গাঁয়ে যোগেশ্বর নামে একজন লোক থাকতেন। সে কীরকম লোক তা এক কথায় বলা মুশকিল। তবে আমরা তাঁকে আকাশে উড়তে, জলের ওপর হাঁটতে আর ডাঙায় ডিগবাজি খেয়ে খেয়ে চাকার মতো চলেফিরে বেড়াতে দেখেছি। তিনি আগুন দিয়ে বরফ জমাতে পারতেন, দিনদুপুরে অমাবস্যার অন্ধকার নামাতে পারতেন, একমুঠো ধুলো নিয়ে এক ফুঁ দিয়ে সোনার গুঁড়ো তৈরি করতেন। আমি, কবরেজ, গোবিন্দ, সুবল সব তার সাগরেদি করতুম। এই যে আর্শিখানা দেখছিস, এ তাঁরই দেওয়া। কবরেজটা তেমন কিছু শিখতে পারল না বলে ওকে কবরেজির লাইনে ঠেলে দিয়েছিলেন তিনি। একখানা শিশিও দিয়েছিলেন ওকে, তাতে কী আছে জানি না। গোবিন্দ, সুবল, ওরাও কিছু-না-কিছু পেয়েছিল, তবে ওসব গুহ্য কথা। তোর ঠাকুর্দার ঠাকুর্দাও ছিল তাঁর সাকরেদ। সে পেয়েছিল ওই কবচখানা। যাকে বলে জ্যান্ত কবচ। কবচের গুণাগুণ বলা বারণ, অত ভেঙে বলেনওনি যোগেশ্বরবাবা। তবে আমার ধারণা, ওই কবচ ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারলে মানুষের অসাধ্যি কিছু নেই। কিন্তু বংশের বাইরে কারো হাতে গেলেই সর্বনাশ।"

গল্প শুনে গৌর আর-একটু এগিয়ে বসল। বলল, "আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দাকে আপনি চিনতেন ?"

"চিনব না মানে ? এইটুকু দেখেছি।"

"তা যোগেশ্বরবাবার দয়ায় আপনারা সব এতকাল ধরে বেঁচে আছেন, তবে তিনি মরলেন কেন ?"

"মরেছে ! তোকে কে বলল যে, মরেছে ! যোগেশ্বরবাবার যখন হাজার বছর বয়স পুরল তখন আমাদের ডেকে একদিন বললেন, 'ওরে আমার তো মরণ নেই, কিন্তু এই শরীরটা বড় পুরনো হয়ে গেছে। হাড়গুলোয় ঘুণ ধরেছে, চামড়াটাও বড্ড কালচে মেরে গেছে, মাংস যেন ছিবড়ে। তা এটাতে বাস করতে আর আমার মন চায় না। আজই এটা ছেড়ে ফেলব।' আমরা শুনে তাঁর হাতে-পায়ে ধরে অনেক কান্নাকাটি করলুম। তখন তিনি বললেন, 'মন যখন করেছি তখন ছাড়বই। ছেঁড়া, ময়লা, নোংরা জামা গায়ে পরে থাকতে যেমন ঘেন্না হয়, আমারও এই শরীরটা নিয়ে তাই হয়েছে। তবে তোরা দুঃখ করিস না, শরীর ছাড়লেও আমি কাছাকাছিই

কৃত্রিম দুনিয়াতে আপনি যেন
এক টাটকা হাওয়ার আভাষ
আমরা আপনার পছন্দ জানি
বিন্নী
সিল্ক

থাকব।' এই বলে তিনি পটাং করে শরীরটা ফেলে দিলেন। বাস্তবিকই শরীরটা আর কিছু ছিল না, একেবারে চামচিকের মতো দেখতে হয়েছিল। আমরা সবাই খুব কান্নাকাটি করলুম। কিন্তু তোর ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা ফটিক শোকে কেমন হয়ে গেল। যোগেশ্বরবাবার সেই শরীরখানা ঘাড়ে নিয়ে বিবাগী হয়ে গেল। সে মরেনি, দিব্যি আছে। আর্শিখানার ভিতর দিয়ে তার সঙ্গে প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ হয়, হিমালয়ে এক দুর্গম জায়গায় খুব জপতপ করছে ব্যাটা। এই আর্শিখানা দিয়ে সব দেখা যায় কিনা।"

"তাহলে আমার কবচখানা কোথায় তা একটু দেখে দিন।"

ফকিরসাহেব মাথা নেড়ে বললেন, "ওটি হওয়ার জো নেই। এই আর্শি দিয়ে আর সব দেখা গেলেও যোগেশ্বরবাবার মন্ত্রপূত জিনিস কোনোটাই দেখার উপায় নেই। এই ধর যেমন কবরেজের শিশি, ফটিকের কবচ, সুবল বা গোবিন্দর কাছে যা আছে সেসব এই আর্শিতে ধরা পড়বে না। তাই বলছি, কবচটা হারিয়ে খুব গ্যাঁড়াকলে পড়ে গেছিস। এখন খুঁজেপেতে দেখগে কে নিল।"

ফকিরসাহেবের গল্প শুনে কেমন যেন আনমনা হয়ে গেল গৌর। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে যায় না, আবার না করেই বা উপায় কী। বাড়ি ফিরে গৌর এক ডাঁই বাসন মাজল, উঠোন ঝাঁট দিল, গাছে জল দিল, গোরুকে জাবনা দিল। তারপর মাটি কোপাতে গেল বাড়ির উত্তর দিককার বাগানে। কবচখানার জন্য মনটা বড় খারাপ। মন খারাপ থাকলে গৌরের গায়ে বেশ জোর আসে, কাজও করে ফেলে চটপট। যে মাটি কোপাতে অন্য দিন সন্ধে হয়ে যায়, তা আজ গৌর এক লহমায় কুপিয়ে ফেলল।

গৌর কুয়োর পাড়ে যখন মাটিমাখা হাত-পা ধুচ্ছে, তখন নিতাইগোপাল এসে বলল, "মনে আছে তো?"

গৌর ঘাড় নেড়ে বলে, "আছে।"

"আজ রাত থেকে তোর খাওয়া বন্ধ। সারা রাত ঘরদোর পাহারা দিবি। বসে বসে আবার ঢুলিস না যেন। সব সময়ে পায়চারি করবি আর মাঝে-মাঝে লাঠি ঠুকবি। মনে থাকবে যা বললুম?"

গৌর ঘাড় নেড়ে বলল, "থাকবে।"

সন্ধের পর গৌর চুপিসারে বেরিয়ে পড়ল কবরেজমশাইয়ের বাড়ির দিকে। পথেই বাজারের গা ঘেঁষে হরিপদর ফুলুরির দোকান। দারুণ করে। দেখল, সেখানে দাঁড়িয়ে মাউ আর খাউ খুব মনের সুখে ফুলুরি ওড়াচ্ছে। গৌর আড়াল হয়ে সুট করে কেটে পড়ল।

কবরেজমশাই বৈঠকখানায় বসে কী একটা ঘষছিলেন। সবসময়েই তিনি কিছু-না-কিছু বানিয়েই যাচ্ছেন। লতাপাতা, শেকড়বাকড়, ধাতু, পাথর, মধু, দুধ, এইসব সারাদিন একটার সঙ্গে আর-একটা মেশাচ্ছেন, জ্বাল দিচ্ছেন, পোড়াচ্ছেন। এরকম কাজপাগল লোক গৌর দুটো দেখেনি।

তাকে দেখে কবরেজমশাই হাতের কাজ থামিয়ে ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "এঃ, তোর গা থেকে যে বড্ড ভূত-ভূত গন্ধ আসছে রে। ওই বুজরুক ফকরেটার কাছে গিয়েছিলি নাকি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে।"

"আবার সমস্যা কিসের?"

"আমার একটা জিনিস হারিয়েছে।"

"অ। তাই ফকরেটার কাছে গিয়েছিলি বুঝি? তা কী বলল বুজরুকটা?"

"আজ্ঞে সে মেলা কথা।"

"তা জিনিসটা পাওয়া গেল না তো?"

"আজ্ঞে না। যোগেশ্বরবাবার দেওয়া সেই কবচ নাকি ফকিরসাহেবের আর্শিতে দেখা দেন না।"

কবিরাজমশাই এতক্ষণ দিব্যি সুস্থ স্বাভাবিক ছিলেন। কবচের কথা শুনে আচমকা একটা 'আঁক' করে শব্দ তুললেন গলায়। তারপর বজ্রাহতের মতো কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন গৌরের দিকে। সেই দৃষ্টি দেখে গৌরের মনে হল, কবিরাজমশাই বুঝি বসে-বসেই মূর্ছা গেছেন। ভয় খেয়ে সে কবিরাজমশাইয়ের গায়ে একখানা ঠেলা দিয়ে ডাকল, "কবরেজমশাই! ও কবরেজমশাই!"

কবিরাজমশাই চোখ পিটপিট করে খুব নিচু স্বরে বললেন, "সর্বনাশ!"

ফকিরসাহেবও সেই কথাই বলছিলেন। কবচটা হারানো নাকি ঠিক হয়নি। কুলুঙ্গিতে পটের পিছনে কবচটা লুকোনো ছিল। হারানোর কথা নয়। তবু যে কী করে হারাল!"

কবিরাজমশাই খেঁকিয়ে উঠে বললেন, "কুলুঙ্গি! তোর কি মাথা খারাপ? ও জিনিস কেউ হেলাফেলা করে এখানে-সেখানে ফেলে রাখে?"

গৌর কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে, "এখন তাহলে কী হবে কবরেজমশাই?"

কবিরাজমশাই মুখ ভেঙিয়ে বলে উঠলেন, "কী হবে কবরেজমশাই! কী হবে তার আমি কী জানি রে লক্ষ্মীছাড়া? বেরো, বেরো, দূর হয়ে যা চোখের সামনে থেকে! হাঁদারাম কোথাকার!"

গৌর ভয় খেয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। তারপর চোখের জল মুছতে মুছতে ফিরে এল বাড়ি। বাড়িতে ঢুকতেই দেখল, বড় ঘরের বারান্দায় হ্যারিকেনের আলোয় তার দাদা নিতাই দুই শালাকে নিয়ে খেতে বসেছে। গরম ভাত আর ডালের গন্ধে ম' ম' করছে বাড়ি।

॥ ৩ ॥

গৌর নিজের অন্ধকার ঘরখানায় ঢুকে একপেট জল খেয়ে বসে রইল। নিতাই আর তার দুই শালা আঁচিয়ে ঘরে ঢুকল। বউদি এঁটো সারছে। আজ আর তাকে কেউ খেতে ডাকল না। শুধু নিতাই নিজের ঘর থেকে একখানা হাঁক দিয়ে বলল, "গৌর, জেগে আছিস তো?"

গৌর ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, "আছি।"

"এবার তাহলে রোঁদে বেরিয়ে পড়। আমরা ঘুমোচ্ছি।"

গৌর কী আর করে। লাঠিগাছ হাতে নিয়ে বেরোল। ঠিক নিতাই যেমন বলেছিল, তেমনি লাঠি ঠুকে-ঠুকে চারদিক ঘুরে-ঘুরে পাহারা দিতে লাগল।

তারপর শেয়াল ডাকল, পেঁচা ডাকল, ঝিঁঝি ঝিনঝিন করতে লাগল। ক্রমে রাত নিশুত হয়ে গেল। গৌরের পেট খাঁ খাঁ করতে লাগল খিদের চোটে। বড় ঘরের দাওয়ায় একটু জিরোতে বসল সে। তারপর কখন একটু ঢুলুনি এসে গেল।

আচমকা চটকা ভেঙে উঠে বসল সে। কিসের একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনেছে সে ঘুমের মধ্যে। অনেকটা দরজার শেকলের শব্দের মতো। লাঠি হাতে গৌর উঠে আর-একবার বাড়িটা এক পাক ঘুরে দেখল। দরজা জানালা সব ঠেলেঠুলে দেখল, সবই বন্ধ আছে। নিশ্চিন্ত হয়ে আবার সে দাওয়ায় বসে একটা হাই তুলল। গোবিন্দদা বলেছিল আসবে। এল না কেন তা বোঝা যাচ্ছে না।

ফের ঢুলুনি আসতে না আসতেই আবার শব্দ। শেকল নাড়ার শব্দ নয়, এবার বেশ মনে হল ধারে কাছে কেউ ফিসফাস করে কথা বলছে। গৌরের গায়ে একটু কাঁটা দিল। ভয়-ভয় করতে লাগল। আর-একবার লাঠি ঠুকে বাড়িটা চক্কর দিল সে। কোথাও কিছু নেই।

এবার গৌর দাওয়ায় একটু গা এলিয়ে দিয়ে বসল। শরীরটা ঝিমঝিম করছে খিদে আর ক্লান্তিতে। হাঁটাহাঁটি ভাল লাগছে না। ঢুলতে-ঢুলতে গৌর কখন হাতের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল তা আর খেয়াল নেই।

খাউ আর মাউ যে ঘরটায় থাকে, সেটা এ-বাড়ির সেরা ঘর। তবে পুরনো বাড়ি বলে জানালা-দরজা খুলতে বা বন্ধ করতে প্রচণ্ড ক্যাঁচকোঁচ শব্দ হয়। আচমকা সেই শব্দ গৌরের ঘুমের মধ্যেও সেঁধোল গিয়ে। চটকা ভেঙে সে উঠে বসল। তারপরই দেখল, খাউ আর মাউয়ের ঘরের দরজা খুলে সেই লম্বা লোকটা বেরিয়ে আসছে। লোকটার পরনে একটা আলখাল্লার মতো লম্বা ঝুলের পোশাক। কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে লোকটা লম্বা লম্বা পা ফেলে উঠোনে নেমে চলে যাচ্ছিল।

গৌর কী করবে প্রথমটায় বুঝতে পারেনি। হাতের লাঠিটার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে তাই সে হঠাৎ চিৎকার করার জন্য হাঁ করল। কিন্তু সেই সুযোগ আর পেল না। পিছন দিক থেকে একটা হাত এসে তার মুখ খুব শক্ত করে চেপে ধরল। প্রথমটায় হকচকিয়ে গিয়ে আঁট হয়ে বসা হাতটার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে জুত করতে পারল না গৌর। একে উপোসি শরীর, তার ওপর রাত জাগার ক্লান্তি। তবে বুদ্ধি করে সে কুট করে একটা কামড় বসাল হাতটায়।

পিছন থেকে "উঃ" শব্দ শোনা গেল। তারপরই হাতটা সরে গেল মুখ থেকে। গোবিন্দ হাতটা ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, "আর একটু হলেই কাঁদিয়ে দিয়েছিলি আর কী।"

"ওঃ, গোবিন্দদা! তুমি কখন এলে?"

"এসেছি অনেকক্ষণ, তোর দাদা ঘুমোতে যাওয়ার আগে।"

"সে কী! টের পাইনি তো!"

"আমরা কি আর জানান দিয়ে আসি রে। লুকিয়ে লুকিয়ে নজর রাখছিলাম।"

"লোকটাকে দেখলে?"

গোবিন্দ একটা শ্বাস ফেলল, তারপর পাশে রাখা একটা পুঁটুলি

খুলতে খুলতে বলল, "দেখেছি। এখন এই রুটি ক'খানা আর তরকারিটুকু খেয়ে নে তো।"

খাবার দেখে গৌরের চোখে জল এসে গেল। বলল, "ওঃ, খিদে যে কী জিনিস তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি গোবিন্দদা।"

"ভাবিস না, রাতের খাবারটা এখন থেকে রোজ আমিই এনে দেবোখন। এখন আর কথা নয়, আগে খা, মাথা ঠাণ্ডা হোক, বুদ্ধি খুলুক, তারপর কথা।"

গৌরকে দুবার বলতে হল না। আটখানা রুটি চোখের নিমেষে উড়িয়ে এক ঘটি জল খেয়ে ঢেঁকুর তুলে সে বলল, "লোকটা চোর নয়?"

গোবিন্দ একটু গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, "জানি না।"

"তাহলে লোকটাকে ধরলে না কেন?"

"ধরা কি অত সোজা?"

"চেঁচালেও হত। লোকজন উঠে পড়ত, তারপর সবাই মিলে তাড়া করে ধরে ফেলতাম।"

গোবিন্দ মাথা নেড়ে বলে, "অত সোজা নয় রে। অনেক গুহ্য কথা আছে।"

গৌরের একটু অভিমান হল। সে বলল, "তোমরা সবাই আমার কাছে কী যেন একটা লুকোচ্ছ গোবিন্দদা।"

গোবিন্দ একটু হেসে বলে, "যদি লুকিয়েই থাকি তবে সে তোর ভালর জন্যই। এখন একটা কথা জিজ্ঞেস করি। তোর মা মরার আগে যে কবচটা তোকে দিয়ে গেছে সেটা কোথায়?"

"কবচ! সেই কবচ তো চুরি গেছে।"

"চুরি! বলিস কী?"

গৌর বিপন্ন গলায় বলে, "কবচ চুরি গেছে শুনে ফকিরবাবা আর কবরেজমশাইয়ের যে কী রাগ!"

গোবিন্দ কিছুক্ষণ গৌরের দিকে চেয়ে বলল, "রাগ না হওয়াই বিচিত্র কিনা। শুনে আমারও হচ্ছে। তা সেটা চুরি গেল কী করে?"

গৌর মাথা নেড়ে বলে, "জানি না। ঘরে ছিল, খুঁজে পাচ্ছি না।"

"তোর ঘরে তালা দেওয়া থাকে না?"

"বাড়িতে লোক থাকতে কেউ ঘরে তালা দিয়ে বেরোয়? তাছাড়া আমাদের তালাটালা নেই, চোরের নেওয়ার মতো থাকেও না কিছু ঘরে। কিন্তু আগে বলো, কবচটা এমন কী দামি জিনিস যে চুরি গেছে শুনে তোমরা অত রেগে যাচ্ছ?"

গোবিন্দ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে বলল, "সে তুই বুঝবি না। তবে কবচটা যে অমূল্য জিনিস তা আমরা জনাকয় লোক ছাড়া আর কেউ জানে না। তাহলে একটা সামান্য কবচ চুরি করতে কে আসবে বল তো! যারা জানে তারা সব আমার মতোই বুড়ো-টুড়ো লোক, আমি ছাড়া চুরি করার এলেমও কারো নেই। আর চুরি করে লাভও নেই, যার কবচ সে ছাড়া অন্য কারো হাতে গেলে তার সর্বনাশ হবে, এও আমরা জানি।"

গৌর বলল, "তাহলে?"

গোবিন্দ মাথা নেড়ে বলল, "চুরি যায়নি। কোথাও আছে। খুঁজে দেখতে হবে।"

"আমি তন্ন-তন্ন করে খুঁজেছি।"

"তোর খোঁজা আর আমার খোঁজায় তফাত আছে।"

"তুমি খুঁজবে?"

"খুঁজতেই হবে রে। এখন দাওয়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে থাক। আজ রাতে আর কোনো উপদ্রব হবে বলে মনে হয় না। আমি সকালবেলায় আসব'খন।"

গোবিন্দ নিঃশব্দে চলে গেল। গৌর আকাশ-পাতাল

ভাবতে-ভাবতে হাই তুলে দাওয়ায় এলিয়ে পড়ল। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে তা টেরও পেল না।

ঘুম ভাঙল মাজায় দুটো মোক্ষম লাথি খেয়ে! সঙ্গে বাজখাঁই গলা, "অ্যাই গাধা, ঘুমোচ্ছিস যে বড়! তোকে না জামাইবাবু পাহারা দিতে বলেছে?"

গৌর ঘুম ভেঙে উঠে বসে হাবার মতো তাকিয়ে দেখে, সামনে মাউ আর খাউ দাঁড়িয়ে। এখনও ভোর হয়নি। ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। দুঃখে তার চোখ ফেটে জল এল। রাগও হল খুব। তেজের গলায় বলল, "আমাকে লাথি মারছ কেন? তোমাদের ঘরে চোর আসে, তোমরা পালা করে পাহারা দিলেই পারো।"

এ-কথায় দু' ভাই একটু মুখ-চাওয়াচাওয়ি করল। মাউ বলল, "আমরা না তোদের কুটুম! আমাদের বাড়ি পাহারা দিতে বলিস, এত বড় সাহস! বড়-বড় কথা বলছিস, দেব জামাইবাবুকে বলে? একবেলা খাওয়া জুটছে, তাও বন্ধ হয়ে যাবে।"

গৌর জানে কথাটা ঠিকই। সে নিতাইগোপালের মায়ের পেটের ভাই হলে কী হবে, নিতাই তাকে মানুষ বলেই জ্ঞান করে না। অসহায় গৌর কাপড়ের খুঁটে চোখের জল মুছে উঠে পড়ল।

উঠতেই মাউ তার চুলের মুঠিটা ধরে মোলায়েম করে একটা নাড়া দিয়ে বলল, "এবার বলো তো বাছাধন, আমাদের ঘরে যে চোর আসে, সেটা আর কে কে জানে!"

গৌর কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে, "দাদা জানে।"

"শুধু দাদা? আর কেউ না?"

গৌর ভয় খেয়ে বলল, "না।"

"তুই চোরকে দেখেছিস? বল তো কেমন চেহারা?"

এবার চুলের টানে গৌরের চোখে নতুন করে জল এল। বলল, "লম্বা সুড়ুঙ্গে একটা লোক।"

"সে যে চোর, তা কী করে বুঝলি?"

"চোরের মতোই মনে হল যে! নিশুত রাতে তোমাদের ঘর থেকে বেরোল।"

"তুই ভুল দেখেছিস।"

গৌর হাঁ করে কী যেন বলতে যাচ্ছিল, মাউ তার ঝুঁটিটা ধরে এত জোরে নাড়া দিল যে, পটপট করে কয়েকটা চুল ছিঁড়ে গেল, কতগুলোর গোড়া আলগা হয়ে গেল। গৌর "বাপ রে" বলে চাপা আর্তনাদ করল একটা। মাউ কঠিন গলায় বলল, "চেঁচাবি তো গলা টিপে মেরে ফেলে দেব। এখন যা জিজ্ঞাসা করছি, ঠিকঠাক জবাব দে। লোকটা আজ এসেছিল?"

"এসেছিল।"

"তাহলে চেঁচাসনি কেন?"

গৌর চেঁচাতেই চেয়েছিল, কিন্তু গোবিন্দ চেঁচাতে দেয়নি। কিন্তু সেই কথাটা মাউকে বলে কী করে গৌর। তাই হাত দিয়ে চোখের জল মুছে ধরা গলায় বলল, "ভয় পেয়েছিলাম।"

"ভয় পেলে পাহারা দিস কী করে? তোর দাদাকে বলে দেব যে, তুই চোরকে দেখেও চেঁচাসনি বা ধরার চেষ্টা করিসনি?"

"বোলো না। তাহলে দাদা তাড়িয়ে দেবে।" গৌর ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে বলল।

গৌরের কান্না দেখেও মাউ চুলের মুঠি ছাড়ল না, বরং আরও শক্ত হাতে চুলের গোছা চেপে ধরে বলল, "তা হলে আমাদের কথা শুনে চলতে হবে। যা বলব তাই করতে হবে। রাজি?"

চুলের টানে গৌরের বোধবুদ্ধি গুলিয়ে যাচ্ছিল। চিঁচিঁ করে বলল, "রাজি। আমাকে খামোখা মারছ কেন? আমি তো কিছু করিনি।"

"করেছিস বই কী! যে ব্যাপারে তোর নাক গলানো উচিত নয়, তাইতে নাক গলিয়েছিস। এখন আমাদের কথায় রাজি না হলে একদম শেষ করে পাঁকে পুঁতে দেব। বুঝলি?"

গৌর বুঝেছে। না-বুঝলেও বুঝেছে। বলল, "আচ্ছা।"

মাউ চুল ছেড়ে দিয়ে বলল, "আমাদের সঙ্গে আয়।"

গৌরকে নিজেদের ঘরে নিয়ে গিয়ে মাউ আর খাউ দরজাটা বন্ধ করে দিল, তারপর মাউ বলল, "বোস।"

গৌরের চুলের গোড়াগুলো ফুলে উঠেছে। একশো ফোঁড়ার যন্ত্রণা তার মাথায়।। মাথায় চিন্তাভাবনা কিছু আসছে না। চুপ করে ভ্যাবলার মতো বসে রইল সে।

মাউ হ্যারিকেনটা একটু উশকে দিয়ে গৌরের দিকে আগুন-চোখে চেয়ে রইল। মাউ আর খাউ পাজি বটে, কিন্তু এরকম ঠাণ্ডা খুনির মতো চেহারা তাদের কখনও দেখেনি গৌর। এ যেন অন্য জগতের দুটো মানুষ। চোখ ধক-ধক করে জ্বলছে, কপালের শিরা ফুলে উঠেছে, চিতাবাঘের মতো থাবা পেতে আছে যেন, একটু বেয়াদবি করলেই লাফিয়ে পড়বে।

মাউ চাপা গলায় বলল, "যাকে তুই দেখেছিস, সে চোর নয়। আমাদের কাছে প্রায়ই আসবে। গভীর রাত্রেই আসবে। কিন্তু খবর্দার, তাকে দেখে একটি শব্দও করবি না। যদি করিস তাহলে তার কিছুই হবে না, কেউ ধরতে পারবে না তাকে, কিন্তু তোর দারুণ বিপদ ঘটবে। বুঝেছিস?"

গৌর সম্মোহিতের মতো মাউয়ের দিকে চেয়ে ছিল। মাথা নেড়ে বলল, "বুঝেছি।"

"আর-একটা কথা। এসব ব্যাপার যদি বাইরের কেউ জানতে পারে, তাহলে কিন্তু..." মাউ কথাটা শেষ না করে অর্থপূর্ণ চোখে গৌরের দিকে চাইল।

গৌর মাথা নেড়ে বলে, "কেউ জানবে না।"

"ঠিক বলছিস?"

"দিব্যি করে বলতে পারি।"

"তোর দিব্যির কোনো দাম আছে নাকি? সে যাকগে, দিব্যি-টিব্যি করতে হবে না। শুধু বলে দিচ্ছি, তার কথা কেউ জানলে তোর গলার ওপর মাথাটা আর থাকবে না। যদি প্রাণে বাঁচতে চাস তো মুখে কুলুপ এঁটে রাখিস। এখন যা।"

গৌর পালিয়ে বাঁচল। নিজের ঘরে এসে দু' ঘটি জল খেল, তারপর বসে-বসে ব্যাপারখানা ভাবতে লাগল। ব্যাপারটা যে জটিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ-বাড়িতে আর থাকাটাই তার পক্ষে ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এই বাড়িতেই তার জন্ম, এই গাঁয়েই সে এত বড়টি হয়েছে। এ-জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে তার একটুও ইচ্ছে করে না। এ-বাড়িতে তারও অধিকার আছে। মাউ আর খাউ উটকো লোক, তাদের ভয়ে নিজের বাপ-পিতামহের ভিটে ছেড়ে পালাতেও ইচ্ছে করে না। এই বাড়ি, এই গাছপালা, এরা সব যেন তার বন্ধু, তার আপনজন। ভাবতে ভাবতে তার চোখে জল এল। আপনমনে নিজের মাথায় একটু হাত দিল সে। চুলের গোড়ায় রক্ত জমে আছে, সাঙ্ঘাতিক ব্যথা।

কী করবে বুঝতে না পেরে গৌর কিছুক্ষণ ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদল। তারপর আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। ভোরের দিকে একটু ঢুলুনি এসেছিল তার। তখন স্বপ্নে তার মা দেখা দিল। মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "বড্ড লেগেছে বাবা? তা কবচটা হারিয়ে ফেললি, কী যে করি তোকে নিয়ে! একটা কথা বলি শোন, রাজা রাঘব কিন্তু ভাল লোক নয়। তাকে কখনও বিশ্বাস করিসনে।"

ঘুম ভেঙে গৌর দেখল, ভোর হয়ে গেছে। গোয়ালে গোরুগুলো ডাকাডাকি করছে খুব। গৌর তাড়াতাড়ি উঠে বাসন-টাসন মেজে, ঝাঁটপাট দিয়ে, পান্তা খেয়ে বেরিয়ে পড়ল গোরু নিয়ে।

নদীর ধারে একটা বেশ বড় বটগাছ আছে। গোরুগুলোকে ছেড়ে দিয়ে সেই বটগাছের ছায়ায় বসে গৌর কাল রাতের কথা, স্বপ্নের কথা, সব ভাবছিল। মা স্বপ্নে এসে বলল, "রাজা রাঘব ভাল

লোক নয়।" কিন্তু রাজা রাঘবটা কে? সে তো এরকম কোনো রাজার নামই শোনেনি।

বটের ছায়ায় বসে একটু ঝিমুনি এসেছিল গৌরের। হঠাৎ একটা কর্কশ গলা-খাঁকারির শব্দে চোখ চাইল। বটগাছের কাছেই একটা বহু পুরনো ঢিবি। রাখালরা ওখানে লুকোচুরি খেলে। সেই ঢিবির চুড়োয় একটা শুঁটকো চেহারার বুড়ো লোক দাঁড়িয়ে জুলজুলে চোখে তাকে দেখছে। পরনে চোগা-চাপকান, হাতে লাঠি। গৌর চমকে উঠে বসতেই বুড়ো লোকটা ঢিবির আড়ালে ওধারে নেমে গেল ধীরে-ধীরে।

দুপুর বেলা ফেরবার পথে গৌর ফকিরসাহেবের থানে আবার হানা দিল। লোকটা বুজরুক হোক, মিথ্যেবাদী হোক, বেশ মজার লোক। তাকে গৌরের ভালই লাগে।

"ও ফকিরবাবা।"

ফকিরসাহেব একটা পুরনো পুঁথি পড়ছিলেন। চোখ তুলে অবাক হয়ে বললেন, "বেঁচেবর্তে আছিস এখনও! শুনলুম কাল রাতে মাউ আর খাউ তোকে ভালরকম ডলাই-মলাই করেছে। তা মরিসনি কেন? মরলে এতক্ষণে দিব্যি আমার আর্শিনগরে থাকতে পারতি। তা বৃত্তান্তটা কী?"

গৌর অবাক হয়ে বলে, "ডলাই-মলাই নয়, চুল ধরে খুব টেনেছে। কিন্তু সে-কথা আপনি জানলেন কী করে?"

ফকিরসাহেব খুব হেঃ হেঃ করে হেসে বললেন, "আমার আর্শিখানা যে সবজান্তা রে।"

কথাটা ঠিক বিশ্বাস হল না গৌরের, আবার অবিশ্বাসই বা করে কী করে? একটু মাথা চুলকে সে বলল, "কাল রাতে মাকে স্বপ্নে দেখলাম। তা মা বলল, রাজা রাঘব নাকি খুব খারাপ লোক। কিন্তু মুশকিল হল, রাজা রাঘব লোকটা যে কে, তাই আমি বুঝতে পারছি না। আপনি জানেন ফকিরবাবা?"

ফকিরসাহেবের মুখখানা দিব্যি হাসি-হাসি ছিল এতক্ষণ। কানের আতর-ভেজানো তুলো থেকে দিব্যি সুবাস আসছিল। তেল-চুকচুক করছিল মুখখানা। রাজা রাঘবের নামটা শুনেই কেমন যেন হত্তুকির মতো শুকিয়ে গেল। ফকিরসাহেব একটা ঢোঁক গিলে বললেন, "তোর মা বলল? অ্যাঁ! ওরে বাবা! তা কী বলল বল্ তো! রাঘব আসছে নাকি?"

"তা আমি জানি না। মা শুধু সাবধান করে দিয়ে গেল। কেন ফকিরবাবা, রাঘবরাজা কি খুব সাঙ্ঘাতিক লোক?"

ফকিরসাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। তারপর মাথায় হাত দিয়ে বসে অনেকষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর আপনমনে বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, "ঈশানকোণে রক্তমেঘ! আগেই জানতুম, আর বেশিদিন নয়। লেগে যাবে সুন্দে-উপসুন্দে। গাঁ ছারখার হয়ে যাবে। ওরে বাবা!"

গৌর হাঁ করে ফকিরসাহেবের মুখের দিকে চেয়ে ছিল। বুঝতে পারছিল না, ব্যাপারখানা কী।

ফকিরসাহেব বিড়বিড় করা থামিয়ে তার দিকে বড়-বড় চোখ করে চেয়ে বললেন, "এখনও বসে আছিস যে বড়! এখনই গিয়ে পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে মরে যা। কোনো ভয় নেই, মরতে না মরতেই আমি আত্মাটাকে চিমটে দিয়ে ধরে বের করে এনে আর্শিতে পুরে ফেলব।"

"মরব ফকিরবাবা? কেন?"

"বেঁচে থেকে আর সুখ কী রে? সে যদি এসেই যায়, তবে বেঁচে থেকে আর সুখ কী? গাঁ কে গাঁ শ্মশান হয়ে যাবে।"

"রাঘব কে ফকিরবাবা?"

"ওরে বাবা, সে আমি জানি না।"

"এই যে এতক্ষণ বিড়বিড় করে কী সব বলছিলেন, যা শুনে মনে হল, রাঘবরাজা খুব খারাপ লোক।"

ফকিরসাহেব নিজের কানে হাতচাপা দিয়ে বললেন, "ভুল বলেছি তাহলে। ও কিছু নয়। তুই বাড়ি যা তো, বাড়ি যা।"

গৌর বেজার মুখে উঠে পড়ল।

॥ ৪ ॥

দুপুরবেলা ভাত খেয়ে গৌর যখন পুকুরে বাসন মাজছে, তখন দেখল, পাশের কচুবনের মধ্যে একটা লোকের মাথা। উবু হয়ে-হয়ে কী যেন খুঁজছে। কৌতূহলী হয়ে গৌর উঠে ভাল করে লোকটাকে দেখার চেষ্টা করতে-করতে বলল, "ওখানে কে গো?"

লোকটা মুখ তুলে তার দিকে চেয়ে একটা ধমক দিল। "কাজের সময় কেন যে এত চেঁচামেচি করিস।"

গৌর দেখল, গোবিন্দদা। চাপা গলায় সে বলল, "গোবিন্দদা! ওখানে কী করছ তুমি?"

"করছি তোর মাথা আর মুণ্ডু! কাছে আয়।"

গৌর একটু অবাক হল। তারপর হাত ধুয়ে গুটিগুটি গিয়ে কচুবনে সেঁধোল। দেখল গোবিন্দ একটা তামার ঘটে জল নিয়ে তার ওপর একখানা সিঁদুরমাখানো ছোট্ট আয়না ধরে চারদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কী যেন দেখছে। দেখতে-দেখতে বলল, "সন্ধান প্রায় পেয়ে গেছি। পশ্চিম দিকেই ইশারা দিচ্ছে।"

গৌর উদ্‌গ্রীব হয়ে বলল, "কবচটা?"

"তবে আর কী খুঁজব রে গাড়ল! ইশ, কাল রাতে কী চোরের মারটাই না খেলি গুণ্ডাদুটোর হাতে!"

"তুমি দেখেছ!"

"চোঁখের পাতা না ফেলে দেখেছি। প্রথম থেকে শেষ অবধি।"

গৌর অভিমানের গলায় বলল, "তবু আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করোনি? তুমি কেমনধারা ভালবাসো আমায়?"

গোবিন্দ খিঁচিয়ে উঠে বলে, "হ্যাঁ, তোকে বাঁচাতে গিয়ে দু-দুটো গুণ্ডার হাতে হাড় ক'খানা ভেঙে আসি আর কী! তা তুইও তো ঘাড়ে-গর্দানে কম নোস, নিজেকে বাঁচাতে হাত-পা ছুঁড়তে পারলি না? নিদেন কামড়েও তো দিতে পারতিস!"

গোবিন্দ মুখ গোমড়া করে বলে, "সেটা পারলে আর কথা ছিল নাকি! ওরা কুটুম মানুষ না! কুটুমের গায়ে হাত তোলে কেউ? আর তুললে দাদাই কি আমাকে আস্ত রাখবে?"

গোবিন্দ ভেবেচিন্তে বলল, "তা বটে। তা খেয়েছিস নাহয় একটু মারধোর। কিল চড় ঘুষি, চুলের গোছায় টান, এসব এমনিতে খেতে ভাল লাগে না বটে, তবে ওসব খেলে গা-গতর বেশ শক্তপোক্ত হয়ে ওঠে, গায়ের জোর বাড়ে, মনের জোরও বাড়ে। যেসব ছেলে মারধোর খায় না, তারা একটুতেই দেখবি কাহিল হয়ে পড়ে। তাছাড়া মারধোর খেলে ভয়ডরও চলে যায়। এতে তোর ভালই হচ্ছে।"

গৌর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "পেটে খেলে পিঠে সয় কথাটা তো জানো! আমার কপালে পেটে কিছু নেই, কিন্তু পিঠে আছে।"

গোবিন্দ জবাব দিল না, দর্পণে কী যেন ইশারা পেয়ে বনবাদাড় ভেঙে পশ্চিম দিকে ধেয়ে চলল। পিছু-পিছু গৌর। দণ্ডকলসের জঙ্গল, ভাটগাছ আর বিছুটিবন পেরিয়ে একটা ঢিবির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল গোবিন্দ। ঢিবির গায়ে একটা বড়সড় গর্ত। ছুঁচোর বাসাই হবে। সেই গর্তের সামনে দর্পণটা ধরে থেকে গোবিন্দ একটা নিশ্চিন্তির শ্বাস ফেলে বলল, "হয়েছে।"

"কী হয়েছে গোবিন্দদা?"

"গর্তের মধ্যেই আছে। দৌড়ে গিয়ে একটা শাবল নিয়ে আয়।"

চোখের নিমেষে গৌর দৌড়ে গিয়ে শাবল আনল। গোবিন্দ গর্তটার মুখে শাবল ঢুকিয়ে চাড় দিতেই ঢিবির অনেকটা অংশ ঝুরঝুরে হয়ে ভেঙে পড়ল। গোবিন্দ খানিক মাটি সরিয়ে ভিতরে

হাত ঢুকিয়ে দিতেই বাচ্চাসমেত তিনটে ধেড়ে ছুঁচো বেরিয়ে কিচিক-মিচিক শব্দ করে দিগ্বিদিক হারিয়ে ছুটে পালাল। গোবিন্দ বগল পর্যন্ত হাত ঢুকিয়ে খানিকক্ষণ হাতড়ে অবশেষে যখন হাত বের করে আনল, তখন তার হাতের মুঠোয় কবচ।

গৌরের চোখ আনন্দে চকচক করে উঠল। চেঁচিয়ে বলল, "এই তো আমার কবচ!"

গোবিন্দ মাথা নেড়ে বলল, "সে তো ঠিকই রে। অসাবধানে রেখেছিলি বলে ছুঁচোয় মুখে করে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু অত আনন্দ করার মতো কিছু হয়নি।"

"কেন গোবিন্দদা, তোমরাই তো বলো, এ কবচের নাকি সাঙ্ঘাতিক গুণ!"

"সেটাও মিথ্যে নয়। তবে যোগেশ্বরবাবার দেওয়া ও কবচ হচ্ছে ঘুমন্ত। ঘুমের মধ্যে কি তুই কাজ করতে পারিস?"

"না তো!"

"তাহলে ও কবচটাও পারবে না। ওটাকে জাগাতে হবে।"

"কী করে জাগাতে হয়?"

"সে আমি কী জানি? আমার ছিল কবচ খুঁজে দেওয়ার কথা, দিয়েছি। এখন যার কবচ সে বুঝবে।"

"কিন্তু না জাগলে আমি জাগাব কী করে?"

গোবিন্দ একটু হাসল। বলল, "সে ঠিকই জানতে পারবি। এখন কোমরে একটা কালো সুতোয় ভাল করে কবচটা বেঁধে রাখ্। আর যেন না হারায়। সময় হলেই কবচকে ঘুম থেকে তোলা হবে। এখন কাজে যা। ঘাটে বাসন ফেলে এসেছিস, একখানা চুরি গেলে তোর বউদি আস্ত রাখবে না।"

গৌর তাড়াতাড়ি ঘাটে ফিরে গেল।

বিকেলবেলায় কবচটা খুব সাবধানে কোমরে বেঁধে নিল গৌর। তারপর গোরুর জাবনা দিয়ে, গোয়ালে সাঁজাল দিয়ে কাজ সেরে ফেলতে গেল।

হাডুডু সে খুবই ভাল খেলে। অফুরন্ত দম, এক দমে তিন-চারজনকে মেরে দিয়ে আসে। যাকে জাপটে ধরে, সে আর নিজেকে ছাড়াতে পারে না।

গৌরের দল রোজই জেতে। আজও তারা তিন পার্টিই জিতল। কিন্তু জিতেও গৌরের সুখ নেই, বরং উল্টে তার ভয় হল। বেশি খেলাধুলা করলে খিদেটাও যে বেশি পায়। রাতের খাওয়া বন্ধ, খিদে পেলে পেটের জ্বালা জল ছাড়া আর কিছু দিয়ে তো মেটানো যাবে না। গোবিন্দদা যদি আজ না আসে বা এলেও যদি রুটি আনতে ভুলে যায়, তাহলে কী হবে?

খেলার পর মাঠের ধারে বসে রোজই গৌর বন্ধুদের সঙ্গে একটু গল্পগাছা করে। আজও করল। তারপর বাড়ি যাবে বলে সবাই যে যার পথ ধরল।

বাজারের কাছ দিয়ে আসার সময় তেলেভাজার ম'ম' গন্ধে গৌর দাঁড়িয়ে গেল। বলতে নেই, তার খিদে পেয়েছে। তেলেভাজার গন্ধে সেই খিদেটা এখন দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। হরিপদ আজ হিং দিয়ে আলুর চপ আর ফুলুরি ভাজছে। কী যে বাস ছেড়েছে, সে আর বলার নয়। ইচ্ছে করে লাফিয়ে পড়ে থাবিয়ে সব খেয়ে নেয়।

কিন্তু ইচ্ছে করলেই তো হল না। আইনকানুন আছে, সহবত আছে, চক্ষুলজ্জা আছে। গৌর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হরিপদর দোকানটা এড়িয়ে বটতলার ঘুরপথটা ধরল। এ-পথটা অন্ধকার, নির্জন। তা হোক, তবু ফুলুরির দোকানের সামনে দিয়ে না যাওয়াই ভাল। তার লোভী চোখের নজর লাগলে ও ফুলুরি আর তেলেভাজা যে খাবে, তারই পেটের অসুখ করবে।

বটতলার মহাবীরের থান পেরোলেই আমবাগান। সেখানে জমাট অন্ধকারে থোকা-থোকা জোনাকি জ্বলছে। ঝিঁঝি ডাকছে খুব। সামনেই সরকারদের পোড়ো বাড়ি, যেখানে কন্ধকাটা ভূত আছে বলে সবাই জানে। সন্ধের পর এ পথে কেউ বড় একটা হাঁটাচলা করে না। গৌর যে খুব সাহসী এমন নয়, তবে গরিব-দুঃখীদের ভয়ডর বেশি থাকলে চলে না। সে এগোতে লাগল। গুনগুন করে একটু গান ভাঁজছিল সে, ভয় তাড়ানোর জন্য। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "কে রে?"

তার স্পষ্ট মনে হয়েছে, অন্ধকারে আগে-আগে কে যেন হাঁটছে। এখনও চাঁদ ওঠেনি। অমাবস্যা চলছে। কিন্তু আকাশ থেকে যে ঝাপসামতো একটুখানি আভা-আভা আলো আসে, তাইতেই তার মনে হয়েছে, একটা সরু লোক, স্পষ্ট বোঝা যায়নি অবশ্য। কিন্তু লোকটা জবাব দিল না।

গৌর আবার হাঁটতে লাগল। আমবাগানের সুঁড়িপথে ঢুকতে যাবে এমন সময় আবার মনে হল, সামনে কেউ একটা আছে। পায়ের শব্দ হল যেন।

"কে ওখানে?"

কেউ জবাব দিল না। কিন্তু হঠাৎ ঠন করে কী একটা জিনিস যেন এসে পড়ল গৌরের পায়ের কাছে। সে প্রথমটায় চমকে উঠেছিল। তারপরে সাহস করে নিচু হয়ে মাটি হাতড়ে গোলমতো একটা জিনিস পেয়ে তুলে নিল। জিনিসটার ওপর হাত বুলিয়ে আন্দাজে বুঝল, একটা কাঁচা টাকা।

ভয়ে গৌর আর এগোতে পারল না। টাকাটা মুঠোয় নিয়ে পিছু হটে আবার বাজারে চলে এল। দোকানের আলোয় মুঠো খুলে দেখল, টাকাই বটে। কিন্তু টাকাটা তার দিকে ছুঁড়ে দিল কে? আর দিলই বা কেন? অনেকক্ষণ ভেবেও সে প্রশ্নের জবাব পেল না। তবে মনে হল, টাকাটা যখন পাওয়াই গেছে, তখন খরচ করতে দোষ নেই। যেই দিয়ে থাক, সে গৌরের খিদের কথা জানে।

হরিপদর দোকানে গিয়ে গরম-গরম ফুলুরি আর আলুর চপ খেল গৌর। শ্রীদাম ময়রার দোকান থেকে রসগোল্লাও খেল। টাকাটা কে দিল তা ভাবতে-ভাবতে একটু অস্বস্তি নিয়েই বাড়ি ফিরল গৌর। নিতাইগোপাল তার দুই শালাকে নিয়ে খেয়ে উঠে আঁচাচ্ছে। তার দিকে চেয়ে গম্ভীর মুখে বলল, "তৈরি হ'। রাতে পাহারা দিতে হবে মনে থাকে যেন।"

গৌর মাথা নেড়ে নিজের ঘরে গিয়ে লাঠিগাছা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল।

ক্রমে রাত নিশুতি হয়ে এল। সবাই অঘোর ঘুমে। গৌর একা দাওয়ায় বসে লাঠি ঠুকে-ঠুকে পাহারা দেওয়ার চেষ্টা করছে। মাঝে-মাঝে উঠে চারদিকটা ঘুরেও আসছে। হুয়া হুয়া করে একঝাঁক শেয়াল ডেকে উঠল কাছেই, দীর্ঘ বিষণ্ণ সুরে একটা কুকুর কাঁদতে লাগল। রাতের আরও সব বিচিত্র শব্দ আছে। কখনও তক্কক ডাকে, কখনও পেঁচা, কখনও বাঁশবনে হাওয়া লেগে মচমচ শব্দ ওঠে, কখনও গুপুস করে পুকুরে ঘাই মারে বড়-বড় মাছ। ঝিঁঝি ডাকে, কোনো বাড়ির খোকা হঠাৎ ওঁয়া-ওঁয়া করে কেঁদে ওঠে। শব্দগুলি সবই গৌরের চেনা। তবু আজ তার একটু গা-ছমছম করতে লাগল। তাকে ঘিরে যেন ক্রমে-ক্রমে একটা রহস্যের জাল বোনা হচ্ছে। কে বুনছে? কে সেই অদ্ভুত মাকড়সা?

একটু ঢুলুনি এসেছিল গৌরের। হঠাৎ দূর থেকে একটা খটখট শব্দ এগিয়ে আসতে লাগল। চটকা ভেঙে সোজা হয়ে বসল গৌর। ঘোড়ার পায়ের শব্দ না? জোর কদমে নয়, আস্তে আস্তে একটা ঘোড়া হেঁটে আসছে এদিকপানে।

গৌর ভয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে কপাটের আড়ালে গা ঢাকা দিল। উঁকি মেরে দেখল, উঠোনে একটা মস্ত সাদা ঘোড়া ধীর পায়ে হেঁটে এসে দাঁড়াল, পিঠে সেই লম্বা লোকটা। লোকটা এতই লম্বা যে, ঘোড়ার পিঠ থেকেও তার পা দুটো মাটি ছুঁই-ছুঁই। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে লোকটা সোজা গিয়ে মাউ আর খাউয়ের ঘরের দরজায়
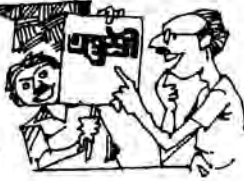
ধাক্কা দিল। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল কপাট। লোকটা ভিতরে ঢুকতেই দরজা ফের বন্ধ হয়ে গেল।

গৌরের বুকটা ভয়ে ঢিবঢিব করছে। এই লম্বা লোকটাকে দেখলেই তার মনটা ভয়ে কুঁকড়ে যায়। মনে হয় এ-লোকটা মোটেই ভাল নয়। আগের দিন ঘোড়াটা দেখতে পায়নি গৌর। আজ দেখল। গ্রামদেশে এরকম বিশাল চেহারার ঘোড়া দেখাই যায় না। খুবই ভাল জাতের তেজী ঘোড়া। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই, লেজটা পর্যন্ত তেমন নাড়াচ্ছে না।

কৌতূহল বড় সাংঘাতিক জিনিস। লম্বা লোকটা যে ভাল নয়, তা বুঝেও, এবং মাউ আর খাউয়ের হুমকি সত্ত্বেও, গৌরের ইচ্ছে হল, লোকটা কী করতে এত রাতে আসে সেটা একটু দেখতে। খুব ভয় করছিল গৌরের, তবু সে পা টিপে-টিপে গিয়ে মাউ আর খাউয়ের ঘরের পিছন দিকের একটা জানালার ভাঙা খড়খড়ি দিয়ে ভিতরে উঁকি দিল।

ঘরে মিটমিটে হ্যারিকেনের আলোয় লম্বা লোকটার মুখখানা দেখে বুকের ভিতরটা গুড়গুড় করে ওঠে গৌরের। এ যেন কোনো জ্যান্ত মানুষের মুখই নয়। বাসী মড়ার মুখে যেমন একটা রক্তশূন্য হলদেটে ফ্যাকাসে ভাব থাকে, এর মুখখানাও সেরকম। চোখ দুটো গর্তের মধ্যে ঢোকানো, নাকটা লম্বা হয়ে বেঁকে ঝুলে পড়েছে ঠোঁটের ওপর। একটা কাঠের চেয়ারে বসে কোলের ওপর দুই হাত জড়ো করে লোকটা স্থির দৃষ্টিতে মাউ আর খাউয়ের দিকে চেয়ে ছিল। মাউ আর খাউয়ের ভাবগতিক দেখে খুবই অবাক হল গৌর। গুণ্ডা ও দুর্দান্ত প্রকৃতির দুই ভাই এখন জড়োসড়ো হয়ে লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মুখ অবশ্য দেখতে পেল না গৌর, কারণ গৌরের দিকেই তাদের পিঠ। তবে হাবভাবে বুঝতে পারল লম্বা লোকটাকে এরা দারুণ ডরায়।

লম্বা লোকটা স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ দুই ভাইকে দেখল, তারপর মৃদুস্বরে বলল, "খুন করতে প্রথমটায় হাত কাঁপে বটে, কিন্তু আস্তে-আস্তে অভ্যেস হয়ে যায়। মশা-মাছি মারা যেমন খুন, মানুষ মারাও তাই। ভয় পেও না। আমার দলে থাকতে গেলে এসব করতেই হবে।"

মাউ ভয়-খাওয়া গলায় বলে, "যদি পুলিশে ধরে?"

লম্বা লোকটা মৃদু একটু হাসল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, "পুলিশ কিছু করতে পারবে না। সে-ব্যবস্থা আমি করব। আমার রাজ্য উদ্ধার হয়ে গেলে তোমাদের এত বড়লোক বানিয়ে দেব যে, এখন তা কল্পনাও করতে পারবে না। বড়লোক হতে গেলে একটু কষ্ট তো স্বীকার করতেই হবে।"

মাউ গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, "কাকে খুন করতে হবে তা যদি বলেন।"

"সময়মতো জানতে পারবে। কিন্তু তার আগে আর একটা কাজ আছে। আমি আমাদের পুরনো প্রাসাদের নকশা থেকে জানতে পেরেছি যে, এই বাড়িটা একসময়ে আমাদের তোশাখানা দিল। আমার বিশ্বাস, এ-বাড়ির তলায় এখনও আমার পূর্বপুরুষের ধনসম্পদ রয়ে গেছে। কাজেই নিতাই আর গৌরকে খুব তাড়াতাড়ি এ-বাড়ি থেকে তাড়াতে হবে।"

মাউ আর খাউ পরস্পরের দিকে একটু তাকাতাকি করল। তারপর মাউ বলল, "তাহলে ওরা যাবে কোথায়?"

লম্বা লোকটা মৃদু হাসল। তারপর বলল, "নিতাইকে নদীর ধারে একটা ছোট ঘর করে দেওয়া যাবে। আর গৌর ছেলেটা একেবারেই ফালতু। এটাকে টিকিয়ে রাখার কোনো মানেই হয় না। তোমরা কী বলো?"

মাউ আর খাউ ফের নিজেদের মধ্যে তাকাতাকি করে নেয়। তারপর মাউ বলে, "সে অবশ্য ঠিক রাজামশাই।"

গৌরের হাত-পা এ-কথা শুনে একদম হিম হয়ে গেল।

রাজামশাই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে, "ওকে একবার তোমরা ডুবিয়ে প্রায় মেরে ফেলেছিলে, তাই না ? ছোঁড়াটা অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছিল। এবার ওকে দিয়েই তোমাদের বউনি হোক। কিন্তু সাবধান, বোকার মতো কোনো কাজ কোরো না। এমনভাবে কাজ হাসিল করবে, যাতে কেউ তোমাদের সন্দেহ করতে না পারে।"

"যে আজ্ঞে।"

রাজামশাইয়ের পরনে আলখাল্লার মতো লম্বা সাদা পোশাক। তাতে জরির চুমকি। পকেটে হাত ভরে রাজামশাই একটা চকচকে জিনিস বের করে মাউ আর খাউয়ের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "এটা রাখো।"

রাজামশাই দরজা খুলে বেরোতেই গৌর চুপিসাড়ে সরে গিয়ে আমবাগানের মধ্যে সেঁধোল। ভয়ে তার বুক ঢিপঢিপ করছে, হাত-পা ঝিমঝিম করছে, বুদ্ধি ঘুলিয়ে যাচ্ছে। সে একটা গাছের গোড়ায় ধপ করে বসে দম নিতে লাগল।

রাজামশাইয়ের ঘোড়ার পায়ের শব্দ ধীরে-ধীরে দূরে মিলিয়ে যেতে একটু নড়েচড়ে বসল গৌর। তার মনে হল, বাঁচতে হলে আর বেশি দেরি করা চলবে না। এক্ষুনি পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে রওনা হয়ে পড়তে হবে।

পা টিপে টিপে চারদিকে চোখ রাখতে-রাখতে গৌর নিজের ঘরে এসে কপাটটা নিঃশব্দে বন্ধ করে দিল। জামাকাপড় তার খুবই সামান্য। জিনিসপত্তরও তেমন কিছু নেই। একজোড়া মোটা কাপড়ের ধুতি আর দুটো গেঞ্জি গামছায় বেঁধে লাঠিগাছা হাতে নিয়ে সে যখন বেরোতে যাচ্ছে, তখন হঠাৎ পিছন থেকে সরু গলায় কে যেন বলে উঠল, "গৌর কি ভয় পেলে ?"

গৌর চমকে উঠে, সভয়ে জানালাটার দিকে তাকাল। জানালার ওপাশে অন্ধকারে একটা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে।

কাঁপা গলায় গৌর বলে, "কে...কে ওখানে ?"

"পালিয়ে কি বাঁচতে পারবে গৌর ? যেখানেই যাও, রাজা রাঘবের গুপ্তঘাতকদের হাত থেকে রেহাই পাবে না।"

"আপনি কে ?"

"আমি তোমার একজন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। এখন যা বলছি, শোনো। রাজা রাঘবের ক্ষমতা অনেক। তার মতো নৃশংস মানুষও হয় না। এই জায়গায় একসময়ে তার পূর্বপুরুষেরা রাজত্ব করত। অনেক দিন আগেই সেই রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। রাঘব আবার সেই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। আমরা কিছু লোক সেটা ঠেকাতে চাইছি। কেন জানো ?"

লোকটা যেই হোক, এর কথাবার্তা শুনে গৌরের মনে হল, লোকটা শত্রু নয়। সে একটু ভরসা পেয়ে বলল, "আজ্ঞে না। বলুন।"

"রাঘবের পূর্বপুরুষেরা ছিল সাংঘাতিক অত্যাচারী। কেউ সামান্য বেয়াদপি করলেই তার গলা কেটে ফেলে দিত। আসলে ওরা রাজত্ব তৈরি করেছিল ডাকাতি করে। রাজা হয়েও সেই ডাকাতির ভাবটা যায়নি। প্রায় একশো পঁচিশ বছর আগে একদল প্রজা খেপে গিয়ে মরিয়া হয়ে প্রাসাদ আক্রমণ করে। প্রাণভয়ে রাজা আর তার আত্মীয়রা পালায়। বিদ্রোহী প্রজার হাতে কয়েকজন মারাও পড়ে। তখন যে রাজা ছিল তার নাম মাধব। সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, এই বেয়াদপির শোধ সে নেবেই। সে না পারলেও তার বংশের কেউ না কেউ ফিরে এসে এখানে আবার রক্তগঙ্গা বইয়ে রাজ্য স্থাপন করবে।"

গৌর জানালার দিকে তাকিয়ে বলল, "ওই লম্বা লোকটাই কি রাঘব ?"

"হ্যাঁ। সাংঘাতিক লোক। রাঘব না পারে এমন কোনো কাজ নেই। ওর চেহারাটা রোগা বটে, কিন্তু লোহার মতো শক্ত। যে-কোনো বড় পালোয়ানকে ও পিষে মেরে ফেলতে পারে। আর শুধু গায়ের জোরই নয়, ওর কিছু অদ্ভুত ক্ষমতাও আছে। ও চোখের দৃষ্টি দিয়ে যে-কোনো মানুষকে একদম অবশ করে দিতে পারে। নানারকম দ্রব্যগুণও ওর জানা আছে। ওর টাকাপয়সাও অনেক। যেখানে যত ভয়ংকর, নিষ্ঠুর, পাজি আর বদমাস আছে, তাদের ও একে একে যোগাড় করছে। সেইসব লোককে নিয়ে একটা দল তৈরি করে একদিন ঝাঁপিয়ে পড়বে এই গ্রাম আর আশপাশের পাঁচ-সাতখানা গাঁয়ের ওপর। গাঁয়ের পর গাঁ জ্বালিয়ে দেবে, বহু মানুষকে কচুকাটা করবে। তারপর নিজের দল নিয়ে রাজত্ব করবে। বুঝেছ ?"

গৌর কাঁপতে কাঁপতে বলল, "বুঝেছি। কিন্তু আমাকে যে মারবার হুকুম দিয়ে গেল, আমি এখন কী করি ?"

"ভয় পেও না। পালিয়ে বাঁচতে পারবে না। একটু সতর্ক থেকো, তাহলেই হবে। আর তোমার কবচটাকে ঠিকমতো ব্যবহার কোরো।"

কবচ ! কবচের কথা গৌর ভুলেই গিয়েছিল। কোমরে হাত বুলিয়ে কবচটা ছুঁয়ে দেখে সে বলল, "কিন্তু গোবিন্দদা বলছিল, কবচটা নাকি ঘুমন্ত। এটাকে না জাগালে কাজ হবে না।"

"গোবিন্দ ঠিকই বলেছে।"

"তা কবচটাকে জাগাব কী করে ?"

"সে ঠিক সময়মতো জানতে পারবে।"

"এখন আমি কী করব তাহলে ?"

"যেমন আছ তেমনি থাকবে। চারদিকে চোখ রেখে চলবে।"

"আপনি কে ?"

"আমি রাজা রাঘবের শত্রু, এর বেশি আজ আর বলব না।"

"আমবাগানে কে একজন আমার দিকে একটা টাকা ছুঁড়ে দিয়েছিল, সে কি আপনি ?"

কেউ এ-কথার জবাব দিল না। গৌর চেয়ে দেখল, জানালার ধারে ছায়ামূর্তিটা নেই।

গৌর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পুঁটুলি খুলে ধুতি আর গেঞ্জি যথাস্থানে রেখে দিল।

॥ ৫ ॥

পরদিন সকালেই একটা ছেলে এসে গৌরকে খবর দিল, বিকেলে ন'পাড়ার সঙ্গে দারুণ হাডুডু ম্যাচ। এরকম কোনো ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু ন'পাড়ার কোন্ বড়লোক নাকি এই হাডুডু ম্যাচের জন্য টাকা দিচ্ছেন। যে-দল জিতবে, তার প্রত্যেক খেলোয়াড় একটা করে সোনার মেডেল আর নগদ পঞ্চাশ টাকা পাবে। তা ছাড়া খেলার শেষে বিরাট ভোজের ব্যবস্থা হয়েছে।

খবরটা পেয়ে গৌরের ভারী আনন্দ হল। সোনার মেডেল, টাকা এসব তার কাছে স্বপ্নের মতো। হাডুডু সে ভালই খেলে। তার দম অফুরন্ত, গায়ে জোরও সাঙ্ঘাতিক। চটপটেও সে বড় কম নয়। গাঁয়ের দলের সে-ই সবচেয়ে ভাল খেলোয়াড়।

সারা দিনটা মেডেল আর টাকার কথা চিন্তা করে মনটা বেশ উড়ু-উড়ু হয়ে যাচ্ছিল তার। আবার মাঝে-মাঝে কেমন যেন একটা আবছা ভয়ও হচ্ছিল। ন'পাড়া তাদের পাশের গ্রাম। বেশি দূর নয়। তবে ন'পাড়ার সঙ্গে তারা কখনও খেলেনি। গ্রামটার খুব বদনাম আছে ডাকাতের গাঁ বলে। ন'পাড়ার নামে লোকে ভয়ে কাঁপে। লটকা, কচি বেত বা কামরাঙার খোঁজে বন্ধুদের সঙ্গে কয়েকবার ন'পাড়া গেছে গৌর। গাছপালায় ঘেরা অন্ধকার গা-ছমছমে পরিবেশ। একটা হাজার বছরের পুরনো কালীবাড়ি আছে। সেখানে এখনও রোজ পুজো হয়। ঠ্যাঙাড়ে ডাকাতরা নাকি এই কালীকেই পুজো দিয়ে ডাকাতি করতে বেরোয়। ন'পাড়ার মানুষগুলোও কিছু অদ্ভুত। প্রত্যেকেরই বেশ মজবুত চেহারা আর

প্রত্যেকেই ভীষণ গোমড়ামুখো। দেখলেই ভয় করে। ন'পাড়ার ছেলেরা যে হাডুডু খেলে এটা গৌর জানতই না, তাই কেমন একটু অস্বস্তি হচ্ছিল তার।

বিকেলে একটু তাড়াতাড়ি ফিরে গোরুর জাবনা দিয়ে, ঘরদোরের কাজ চটপট সেরে গৌর গিয়ে দক্ষিণের মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে জুটে ন'পাড়া রওনা হল।

তেজেন হল দলের ক্যাপটেন। গৌর তাকে জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ রে তেজেন, ন'পাড়ার আবার কবে থেকে খেলাধুলোর শখ হল?"

তেজেন বলল, "কী জানি ভাই, ন'পাড়ার ছেলেরা যে খেলে তাই তো জানতাম না। তবে শুনেছি, এক বড়লোক জুটেছে সেখানে। যে নাকি গাঁয়ের চেহারা বদলে দেবে, জলের মতো টাকা ঢালছে।"

"সোনার মেডেল দেবে সত্যি?"

"সোনার মেডেল, টাকা, তার ওপর পোলাও কালিয়া দিয়ে ভোজ।"

"এর মধ্যে কোনো গোলমাল নেই তো?"

"গোলমাল আর কী থাকবে? বিশে নিজে আজ ন'পাড়ায় গিয়ে দেখে এসেছে সেখানে সাজো-সাজো রব, রঙিন কাগজ দিয়ে সারা গাঁ সাজানো হয়েছে। কালীবাড়ির সামনের চাতালে বিশাল উনুন তৈরি হচ্ছে, বত্রিশটা পাঁঠা বলি হয়ে গেছে, হাঁড়ি-হাঁড়ি দই-মিষ্টি আসছে ঘোষপাড়া থেকে।"

দলের সকলেরই ভারী ফুর্তি, জোর কদমে হাসাহাসি আর গল্পসল্প করতে করতে হাঁটছে সবাই।

গৌর হঠাৎ তেজেনকে জিজ্ঞেস করল, "আর হেরে গেলে কী দেবে?"

তেজেন বলল, "সে কথাও হয়েছে, হারলে পাঁচ টাকা করে পাবে সবাই। খাওয়া তো থাকছেই। তবে ভাবছিস কেন, আশপাশের দশখানা গাঁয়ে আমরাই সেরা। ন'পাড়ার ছেলেদের গায়ে যত জোরই থাকুক আমাদের মতো কায়দা জানে না। হেরে ভূত হয়ে যাবে।"

কিন্তু গৌর তেজেনের মতো নিশ্চিন্ত হল না। তার মনে কেমন একটা অস্বস্তি হতে লাগল। এই যে হুট করে খেলার আয়োজন, এত প্রাইজ আর মেডেলের লোভানি, এটাকে খুব স্বাভাবিক ঘটনা বলে ভাবতে পারছে না সে।

ন'পাড়ায় ঢুকে তার অস্বস্তিটা বরং বাড়ল। বাস্তবিকই এ'পাড়াকে আজ চেনা যায় না। গাছে-গাছে রঙিন ফেস্টুন, রঙিন কাগজের শিকলি, নিশান, কালীবাড়িতে ব্যাণ্ড পার্টিও এসেছে, দারুণ বাজনা বাজছে সেখানে।

কালীবাড়ির পাশেই খেলার মাঠে কোর্ট কাটা হয়েছে। লোকে লোকারণ্য, গৌররা সেখানে যেতেই একদল বাচ্চা মেয়ে এসে সবাইকে মালা পরিয়ে দিল, কপালে দিল চন্দনের ফোঁটা, এইসব দেখে সকলেই কেমন একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

কোর্টের পাশেই সুন্দর করে সাজানো টেবিলে ছোট ছোট নীল ভেলভেটের বাক্সে সোনার মেডেলগুলো ঝকঝক করছে। টেবিলের ওধারে চারটে চেয়ারে চারজন বেশ সম্ভ্রান্ত চেহারার মানুষ বসে আছেন।

গৌররা ঢুকতেই সকলে হাততালি দিয়ে হর্ষধ্বনি করে উঠল।

তেজেন গৌরের কানে-কানে বলল, "আজ জিততেই হবে গৌর।"

"চেষ্টা করব।"

"জিতে না ফিরলে প্রেস্টিজ থাকবে না, মনে রাখিস।"

খেলা শুরু হতে একটু দেরি আছে, দু'পক্ষের টিম এসে মাঠের ধারে জড়ো হয়েছে সবে। একটা দৃশ্য দেখে সকলে অবাক। ন'পাড়ার খেলোয়াড়দের মধ্যে মাউ আর খাউ রয়েছে।

তেজেন ন'পাড়ার ক্যাপটেনের কাছে গিয়ে আপত্তি জানাল, "ওরা তো আমাদের গাঁয়ে থাকে, ওরা তোমাদের হয়ে খেলছে কেন?"

ন'পাড়ার ক্যাপটেন বলল, "মোটেই তোমাদের গাঁয়ের লোক নয় ওরা, কুটুমবাড়িতে বেড়াতে গিয়েছে এই মাত্র। তোমরা ওদের টিমেও নাওনি, তাই আমরা হায়ার করেছি।"

তেজেন আর যুক্তি না খুঁজে পেয়ে ফিরে এসে গৌরকে চুপি-চুপি বলল, "তোর কুটুমরা ও-দলে খেলছে, ব্যাপারটা একটু গোলমেলে।"

"তাই দেখছি।"

গৌরের বুকের ভিতরটা একটু ঢিবঢিব করতে লাগল। মাউ আর খাউ ন'পাড়ার হয়ে খেলছে খেলুক, সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু রাঘবরাজা ওদের যে হুকুমটা দিয়েছে, সেটা মনে করেই গৌরের হাত-পা হিম হয়ে আসছিল। তার মনে হচ্ছিল, খেলায় না নেমে ফিরে গেলেই বোধহয় ভাল হত। মাউ আর খাউয়ের মতলব হয়তো ভাল নয়।

কিন্তু পিছিয়ে যাওয়া আর সম্ভব নয়। মালা পরে চন্দনের ফোঁটা নিয়ে পিছিয়ে গেলে সবাই দুয়ো দেবে। তাদের গাঁ থেকেও অনেকে খেলা দেখতে এসেছে, তারাই বা মনে করবে কী? ভিড়ের মধ্যে গৌর কবরেজমশাই, ফকিরসাহেব, গোবিন্দদা, সবাইকেই দেখতে পেল।

শরীরের আড় ভাঙার জন্য কোর্টে নামার আগে একটু ডন-বৈঠক করে গা ঘামিয়ে নিচ্ছিল সবাই। এমন সময় কবরেজমশাই এগিয়ে এসে একটা ছোট্ট শিশি গৌরের হাতে দিয়ে বললেন, "চটপট তেলটুকু মেখে নে। হাতে-পায়ে আর ঘাড়ে ভাল করে মাখিস।"

"এ মেখে কী হবে কবরেজমশাই?"

"হবে আমার গুষ্টির পিণ্ডি, যা বলছি চোখ বুজে করে যা। আজ তোর বড় ফাঁড়া।"

গৌর আর দ্বিরুক্তি না-করে তেলটা মেখে ফেলল। ভারী অদ্ভুত তেল। জলের মতো পাতলা, মাখতেই শরীরে মিশে গেল। কোনো তেলতেলে ভাব অবধি থাকল না।

খেলা শুরু হল। প্রথম দান গৌরদের। তেজেন দম নিয়ে 'ডু...উ...উ...উ... ডাক ছেড়ে ঢুকে গেল ন'পাড়ার এলাকায়। দু'হাত পাখির ডানার মতো ছড়ানো, হালকা পায়ে উড়ে-উড়ে কোর্টের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত যেতে যেতে হাত দিয়ে তীব্র কয়েকটা ছোবল ছুঁড়ল সে, চকিতে পা বাড়িয়ে দিল এদিক সেদিক। না, ন'পাড়ার কেউ 'আউট' হল না।

তেজেন নিজের কোর্টে ফিরে আসতে না আসতেই ন'পাড়ার এক বিশাল চেহারার কালো জোয়ান পাহাড়ের মতো ধেয়ে এল। বিকট 'ডু...উ...উ...' শব্দ করতে করতে কোর্টে ঢুকে পড়তেই গৌর বুঝে গেল, লোকটা আনাড়ি। চেহারা বিশাল হলেই তো হয় না। এ খেলায় চটপটে হওয়া এবং কূটকৌশল জানা একান্ত দরকার। এ-লোকটার তা নেই, এক্ষুনি ধরা পড়ে যাবে। গৌর প্রস্তুত হল।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, লোকটা কাউকে আউট করার জন্য হাত-পা খেলানোর চেষ্টাই করল না। বিপক্ষের কোর্টে ঢুকে সে একটু থমকে দাঁড়িয়ে হঠাৎ প্রবল আক্রোশে আর প্রতিহিংসায় সোজা এগিয়ে এল গৌরের দিকে।

গৌর লোকটার কাণ্ড দেখে অবাক। তেজেন এবং তার দলবল চারদিক থেকে ঘিরে ধরে জাপটেও ফেলল লোকটাকে। কিন্তু দানবের মতো লোকটা দু'তিন ঝটকায় সবাইকে ঝেড়ে ফেলে জোড় পায়ে একটা তুর্কি লাফ মেরে লাফিয়ে পড়ল গৌরের ওপর।

ওই বিশাল দানবীয় চেহারার জোড়া লাথি বুকে লাগলে পাঁজরের হাড় মড়মড় করে ভেঙে যাওয়ার কথা। কিন্তু গৌর নিজে ভাল খেলোয়াড়, গায়ের জোরে দানবটার সঙ্গে পাল্লা টানতে না

পারলেও সে দারুণ চটপটে, দ্রুতগতি। পা দুটো যখন তার বুকের ওপর নেমে আসছে, তখন সে খানিকটা হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। এ-খেলায় ছোঁয়াছুঁয়ি আছে বটে, কিন্তু ধরা পড়ার ভয় না-রেখে কেউ যে এরকম বেহেড হয়ে কারও ওপর লাফিয়ে পড়তে পারে, এ-ধারণা তার ছিল না। তাই অবাক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে সে চট করে বাঁ দিকে শরীরটা বাঁকিয়ে পাঁকাল মাছের মতো সরে গেল। দানবটা তাকে পেরিয়ে গদাম করে আছড়ে পড়ল মাটিতে। গৌরই গিয়ে ধরে তুলল তাকে। অবাক হয়ে বলল, "এ কেমনধারা খেলা?"

লোকটা ভ্রুকুটি করে বলল, "এখনই কী? খেলা দেখবে।"

একটা লোক আউট হওয়ায় ন'পাড়ায় কোনো বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। পরের দান গৌরের, গৌর চোখ বুজে ঠাকুর স্মরণ করে বুক ভরে দম নিল। তারপর ভিমরুলের মতো ডাক ছেড়ে হাল্‌কা পায়ে গিয়ে ঢুকল ন'পাড়ার কোর্টে। তেজেনের চেয়ে সে বহুগুণ দ্রুতগতি, অনেক বেশি তার গায়ের জোর। সে অনেক উঁচুতে লাফাতে পারে, শরীরে নানারকম অদ্ভুত মোচড় দিতে পারে। এ-খেলায় সেইটিই দরকার। গৌর ঢুকেই চটপট ডাইনে-বাঁয়ে একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মতো নিজেকে বইয়ে দিল। কিন্তু তার মনে হচ্ছিল, ন'পাড়ার খেলোয়াড়গুলো আসলে খেলোয়াড় নয়, খুনে কেন মনে হল কে জানে!

ডান থেকে বাঁয়ে, বাঁ থেকে আবার ডান দিকে ঘুরে যাওয়ার মুখেই এক পায়ের ওপর শরীরটাকে রেখে আর-এক পা চকিতে বাড়িয়ে লাইনে-দাঁড়ানো একজন মুশকো চেহারার লোককে ছুঁয়ে দিল। আউট। গৌর চোখের পলকে বাতাসে শরীর ভাসিয়ে একটা লাফ মারল নিজের কোর্টের দিকে।

কিন্তু মাটিতে পড়তে পারল না গৌর, মুশকো লোকটা মোর হয়ে তখন মরিয়া। সেও এক লাফে এগিয়ে এসে গৌরের কোমরটা দু'হাতে জাপটে ধরে পেড়ে ফেলল মাটিতে। কিন্তু গৌর পাকা খেলোয়াড়। এই হুটোপাটিতেও দম হারায়নি। ডাক ছাড়তে ছাড়তেই সে লাইনের দিকে খানিকটা গড়িয়ে গেল লোকটাকে জাপটে ধরেই।

কিন্তু ন'পাড়ার খেলুড়েরা তখন ক'টা মস্ত মস্ত পাথরের মতো গদাম গদাম করে এসে তার ওপর পড়ছে। এ-খেলায় হুটোপাটি হয়ই। কিন্তু মারদাঙ্গার তো নিয়ম নেই। কিন্তু গৌর বুঝতে পারছিল, তাকে আউট করার ছল করে কে যেন লোহার হাতে তার গলার নলি টিপে ধরেছে। আর একজন ঘুঁসি চালাচ্ছে কানের পিছনে। কে যেন হাঁটু দিয়ে তার বুকের পাঁজর ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কনুই দিয়ে কে যেন মারল তার পেটে। একটা লাথি এসে জমল তার মুখে।

অন্য কেউ হলে এতক্ষণে অজ্ঞান হয়ে যেত। কিন্তু গৌর অনেক কষ্ট করে বড় হয়েছে। ব্যথাবেদনা তাকে কাবু করতে পারে না। শরীরটাও তার যথেষ্ট সহনশীল। তাই অতগুলো লোকের জাপটাজাপটি এবং আক্রমণের মধ্যেও সে দম ধরে রেখে ইঞ্চি-ইঞ্চি করে এগোতে লাগল লাইনের দিকে। যেন পাহাড় বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে তার, মাথা ঝিমঝিম করছে। কিন্তু সে জানে, ন'পাড়ার এই লোকগুলো খেলোয়াড়ই নয়, এরা চায় তাকে খুন করতে। খেলায় হারজিত নিয়ে এরা মাথা ঘামায় না।

চারদিকে খুব চেঁচামেচি হচ্ছিল। গৌর লক্ষ করল, কে যেন তাকে আটকাতে না পেরে তার চোখে আঙুল ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। হাতের অনামিকায় পলার আঙটিটা দেখে চিনল গৌর। মাউ। মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিল গৌর। বুক ফেটে যাচ্ছে, তবু দম না ছেড়ে সে একবার শেষ চেষ্টায় শরীরে একটা ঢেউ দিল। সামান্য আলগা হল কি পিঠের ওপর পাহাড়টা? তবে গৌর দেখল, খুব চেষ্টা করলে তার আঙুল লাইনটা ছুঁয়ে ফেলতে পারে।

'ডু-উ-উ...' করে বুকের তলানি বাতাসটুকু উজাড় করে দিয়ে গৌর মাটির ওপর নিজেকে ঘষে দিয়ে এগোল। এগোতেই হবে। ডান হাতখানা আকুলভাবে বাড়িয়ে দিল লাইনের দিকে।

লাইনটা ছুঁল কি না বুঝতে পারল না গৌর, তবে একটা বিশাল চিৎকার উঠল চারদিকে। গৌরের চোখে সেইসময়ে নেমে এল নিবিড় অন্ধকার। সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

যখন জ্ঞান ফিরে এল, তখন তার সর্বাঙ্গ জলে ভেজা। কোর্টের ধারে তাকে শুইয়ে ক্ষতস্থানে ওষুধ মাখাচ্ছেন কবরেজমশাই। ক্ষত হয়েছেও বড় কম নয়। বুক আর হাতের অনেকটা ছাল উঠে গেছে। ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়ছে, নাক ভেঙে গেছে, কানের পিছনে মাথাটা ফুলে ঢোল, কপালের অনেকটা ছড়ে গেছে। চারদিকে ভিড়ে ভিড়াক্কার।

গৌর প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, "আমার দানটার কী হল?"

কে একজন চেঁচিয়ে বলল, "ওঃ, যা দেখালে খেলা একখানা বাপ! এক দানে ন'পাড়ার গোটা দল আউট!"

শুনেই গৌরের রক্ত গরম হয়ে গেল। শরীরের ব্যথা-বেদনা যেন উড়ে গেল ফুৎকারে। সে এক লাফে উঠে পড়ে বলল, "আমি পরের গেম খেলব।"

ন'পাড়া কী চায় তা গৌর বুঝে গেছে। সে বুঝে গেছে, রাজা রাঘবের আদেশে ন'পাড়ার সাত খুনি সব খেলুড়েকে ছেড়ে শুধু তার ওপরেই চড়াও হবে এই খেলার লক্ষ্যই হল গৌর। কিন্তু গৌরের আর ভয় করছিল না।

তেজেন তার অবস্থা দেখে চিন্তিত মুখে বলল, "এ কি খেলা নাকি? এ তো খুনখারাবি! তোকে আর খেলতে হবে না, বসে যা। একটা গেম তো একাই জিতিয়ে দিয়েছিস, এখন বসে জিরো।"

গৌর মাথা নেড়ে বলল, "না, বসব না। আমার কিছু হয়নি।"

"পারবি তো?"

"খুব পারব।"

পরের গেম শুরু হল। ন'পাড়ার দলটা একটু মনমরা বটে, কিন্তু ওদের চোখ ধকধক করে জ্বলছে। আর সকলেরই দৃষ্টি প্রতিপক্ষের একজনের ওপর। সে হল গৌর। গৌর যে এই বাঁশডলা খাওয়ার পর এখনও দাঁড়িয়ে আছে এবং আবার খেলার জন্য তৈরি হচ্ছে, এটা যেন তাদের বিশ্বাসও হচ্ছিল না, তারা সইতেও পারছিল না। সবচেয়ে বেশি ছটফট করছিল মাউ আর খাউ। পারলে তারা যেন ছিঁড়ে খায় গৌরকে।

খেলা শুরু হল। প্রথম ন'পাড়ার দান। যে দানবটা প্রথম দান দিতে এসে গৌরকে জোড়-পায়ে লাথি মারার চেষ্টা করেছিল এবারও সেই আসছে। 'ডু...উ...উ...' বলে ডাক ছেড়ে সে লাফিয়ে এল গৌরদের কোর্টে। তবে এবার আর গৌরকে লাথি মারার মতো বোকামি করল না। খেলার ভান করে এদিক-ওদিক ঘুরতে লাগল। গৌর স্থির দৃষ্টিতে লোকটাকে দেখছিল। মাউ আর খাউয়ের সঙ্গে লোকটার চেহারার বেশ মিল আছে। তবে এ আরও বেশি লম্বা-চওড়া এবং আরও বেশি নিষ্ঠুর প্রকৃতির।

লোকটা কাউকে 'মোর' করতে না পেরে ফিরে যাচ্ছিল। হঠাৎ গৌর লাইন ছেড়ে এগিয়ে গেল। বিদ্যুৎগতিতে গিয়ে লোকটা লাইন পার হওয়ার আগেই দু'হাতে লোকটার কোমর ধরে ফেলল। গৌরের দলের সকলেই 'হায় হায়' করে উঠল। এ-অবস্থায় লোকটাকে ধরে রাখা অসম্ভব। গৌর আউট হবেই, কারণ লোকটা গৌরের চেয়ে চেহারায় দেড়গুণ এবং লাইনে প্রায় পৌঁছেও গেছে।

কিন্তু গৌর অবিচল। কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সে আচমকা একটা হ্যাঁচকা টানে লোকটাকে প্রায় লাইনের ওপর থেকে টেনে আনল। গৌরের এই দুঃসাহসে লোকটা অবাক। তবে মুহূর্তের

মধ্যে নিজেকে সামলে সেও এক ঝটকা মারল। সেই ঝটকায় হাতি অবধি ছিটকে যায়।

কিন্তু গৌরের আজ হল কী কে জানে। সে সেই বিকট ঝটকায় একচুলও টলল না। একটা 'কোঁত' শব্দ করে সে লোকটাকে দু'হাতে শূন্যে তুলে নিল, তারপর কয়েকটা পাক দিয়ে নিজের কোর্টে মারল এক আছাড়। সেই আছাড়ে মাটি কেঁপে উঠল। চারদিকে এক সূচীভেদ্য নিস্তব্ধতা। কেউ যেন ঘটনাটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। তারপরেই বিপুল উল্লাসে দর্শকরা ফেটে পড়ল।

তেজেন এসে গৌরের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, "তুই আমাদের সেরা খেলোয়াড় বটে, কিন্তু এ-রকম খেলা আগে কখনোই তো দেখিনি তোর। হল কী রে গৌর?"

গৌর গম্ভীর ভাবে বলল, "আমিও তা জানি না। তবে এবার আমি দান দেব।"

তেজেন একটু দোনোমোনো করে বলল, "দে তাহলে। আজ তোর কপালটা ভালই যাচ্ছে।"

কপাল নয়, অন্য কিছু। কিন্তু সেটা যে কী, তা গৌর বুঝতে পারছে না। হঠাৎ যেন শরীরে একশো হাতির জোর জোয়ারের মতো নেমে এসেছে। ঘোড়ার মতো টগবগ করছে হাত-পা। রক্ত গরম। শরীর পালকের মতো হালকা।

সে যখন হানা দিতে ন'পাড়ার কোর্টে ঢুকল তখন তার শরীরে ঘূর্ণিঝড়ের মতো গতি। শব্দ করে দম ছাড়তে-ছাড়তে সে একেবারে বিপক্ষ-দলের মধ্যে ঢুকে গেল। ন'পাড়ার মুশকো-মুশকো খেলোয়াড়রা তার কাণ্ড দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সকলে একেবারে শেষপ্রান্তে সরে গিয়ে অপেক্ষা করছে।

ডান কোণে দাঁড়িয়ে ছিল মাউ। চোখে উপোসি বাঘের মতো তীব্র দৃষ্টি। হঠাৎ যেন ভোজবাজির মতো মাউয়ের হাতে একটা গজাল এসে গেল কোথা থেকে। এমন কৌশলে সেটা হাতের পাতায় ঢেকে রেখেছে মাউ যে, কারও চোখে পড়ার কথা নয়। কিন্তু গৌর ঠিকই দেখতে পেল।

বাঁ দিকে একটু ঢেউ খেয়ে গৌর সোজা মাউয়ের দিকেই এগিয়ে গেল। পা বাড়িয়ে একটা ভড়কি দিয়েই সরে এল। ফের ডান দিকে ঝুল খেল। সবাই ভাবছে এবার সে ডান দিকে সরে যাবে। কিন্তু গৌর আবার বাঁ দিকে বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে গিয়ে মাউকে বাঁ হাতে মোর করে দিল। কিন্তু মোর হয়েই মাউ লাফিয়ে পড়ল তার ওপর। হাতে লুকোনো গজাল।

গৌর শুধু হাতটা নজরে রেখেছিল। গজালসুদ্ধু হাতটা সোজা এগিয়ে এসেছিল তার পেটের দিকে। গৌর শরীরটা সরিয়ে নিয়ে হাতটা ধরে ফেলল, ঠিক যেমনভাবে নিপুণ সাপুড়ে বুনো সাপ ধরে। সঙ্গে-সঙ্গে একটা মোচড়।

পাটকাঠির মতো মাউয়ের হাতটা যে ভেঙে যাবে, তা গৌর স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। মাউয়ের চেহারা বিশাল, গায়ে দানবের মতো জোর। এই সেদিনও গৌরকে মনের সুখে মেরেছে। গজালটা পড়ে গেল হাত থেকে। বাঁ হাতে ডান হাতটা চেপে ধরে 'বাপ রে' বলে চেঁচিয়ে বসে পড়ল মাউ। চারদিকে একটা হৈ-হৈ উঠল। "গজাল! গজাল!...এ তো খুনখারাবির মতলবে ছিল! বের করে দাও! ন'পাড়া হেরে গেছে।... দুয়ো... দুয়ো..."

কিন্তু লোকে চেঁচালে হবে কী? ন'পাড়ার উদ্দেশ্য তো খেলা নয়! মাউ পড়ে যেতেই ন'পাড়ার বাকি ছ'জন আবার লাফিয়ে পড়ল গৌরের ওপর।

গৌর পড়ে গেল না, ঘাবড়াল না। সাবধানে দমটা ধরে রেখে সে শরীরে একটা ঘূর্ণি তুলল আবার। চরকির মতো বোঁ-বোঁ করে ঘুরপাক খেতে লাগল সে। আর সেই ঘূর্ণাবেগে ন'পাড়ার

বিশালদেহী খেলোয়াড়রা ছিটকে-ছিটকে যেতে লাগল এদিক-সেদিক। দু'জন গিয়ে পড়ল কোর্টের বাইরে, একজন দর্শকদের মধ্যে।

গৌর সবাইকে আউট করে নিজের কোর্টে ফিরে আসতেই এমন তুমুল হাততালি আর হর্ষধ্বনি উঠল যে, কানে তালা ধরার উপক্রম।

দর্শকদের সেই উল্লাস ছাপিয়ে একটা রাজকীয় গুরুগম্ভীর গলা থেকে একটা মাত্র শব্দ বেরিয়ে এল, "শাবাশ!"

গৌর তাকিয়ে হিম হয়ে গেল। যে-টেবিলে প্রাইজ রাখা আছে, তার ওপাশে দাঁড়িয়ে রাজা রাঘব। প্রায় সাড়ে ছ'ফুট লম্বা, সাদা একটা জোব্বার মতো পোশাকে তাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

গৌর সম্মোহিতের মতো রাজা রাঘবের দিকে চেয়ে ছিল।

হঠাৎ রেফারি ঘোষণা করল, "খেলা শেষ। পাঁচ পাট্টি খেলা বাতিল করা হল। মল্লারপুরকে বিজয়ী ঘোষণা করা হচ্ছে। বিজয়ী দলের গৌরগোপাল এ-খেলায় শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান পেয়েছে। তাকে এর জন্য অতিরিক্ত একশো টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।"

এই ঘোষণার সঙ্গে-সঙ্গে মল্লারপুরের লোকেরা দারুণ নাচানাচি আর হৈ-হৈ শুরু করে দিল। খেলোয়াড়দের কাঁধে তুলে কোর্টের চারপাশে ঘোরানো হল। গৌরকে নিয়েই হৈ-চৈ হল সবচেয়ে বেশি। গোলমাল থামবার পর গৌর আর রাজা রাঘবকে কোথাও দেখতে পেল না, ন'পাড়ার গুণ্ডা খেলোয়াড়রাও কে কোথায় সরে পড়েছে।

॥ ৬ ॥

খাওয়া-দাওয়া সেরে উঠতে বেশ রাত হয়ে গেল। আর খাওয়াটাই তো এক এলাহি ব্যাপার। পোলাও, মাছের কালিয়া, মাংসের কোর্মা, ছানার ডালনা, মুড়িঘণ্ট, মাছের মুড়ো দিয়ে মুগডাল, চাটনি, রাবড়ি, রসগোল্লা, সরভাজা··· উফ্। সকলে খেতে খেতে একেবারে জেরবার হয়ে গেল। তবে গৌর মাছমাংস-পেঁয়াজরসুন খায় না। তার মা তাকে ছেলেবেলা থেকেই ওসব খাওয়ায়নি। তাদের বংশটাই নিরামিষ বংশ। বহুকাল ধরে প্রথাটা চলে আসছে। কিন্তু নিতাইগোপাল তার বউয়ের পাল্লায় পড়ে ওসব আর মানে না। গৌর মানে। মা বারণ করে গেছে বলেই মানে। সে ছানার ডালনা দিয়ে পোলাও খেল, আর প্রায় এক হাঁড়ি রাবড়ি।

খেয়ে উঠে সবাই মিলে গলায় মেডেল আর মালা ঝুলিয়ে, ট্যাঁকে প্রাইজের টাকা গুঁজে রওনা হল। মল্লারপুরের লোকেরা যারা খেলা দেখতে এসেছিল, তারা সবাই আগেই ফিরে গেছে। এখন তারা শুধু আটদশজন।

রাস্তা অন্ধকার বলে দুটো মশাল জ্বালিয়ে নিয়েছে তারা। গল্প করতে করতে হাঁটছে। আজকের খেলার কথাই হচ্ছে বেশি। সবাই বেশ নিশ্চিন্ত আর খুশি।

কিন্তু গৌর নিশ্চিন্তও নয়, খুশিও নয়। ন'পাড়ার দলে মাউ আর খাউ ছাড়াও আর একটা লোক ছিল, যে অনেকটা ওদের মতোই দেখতে। লোকটা কে তা বুঝতে পারছে না সে। অথচ মনটা টিকটিক করছে। লোকটা তাকে নির্ঘাত খুন করে ফেলতে চেয়েছিল। তার ওপর রাজা রাঘব। রাঘব যে কেন ওখানে জুটল তা-ই বা কে বলবে?

গৌর স্পষ্টই টের পাচ্ছে, এই খেলাটা এক মস্ত ষড়যন্ত্র। সম্ভবত এ-খেলার উদ্দেশ্য ছিল তাকে খুন করা। খেলার মধ্যে বেকায়দায় লেগে সে মরে গেলে সেটা ইচ্ছাকৃত খুন বলে কেউ প্রমাণ করতেও পারত না এবং খুনি ধরা পড়ত না। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। সুতরাং ওরা আবার চেষ্টা করবে। কখন, কোথা দিয়ে যে আক্রমণটা আসবে তার তো ঠিক নেই। কিন্তু তার মতো এক অতি সাধারণ ছেলেকে খুন করে কী লাভ, সেটাই গৌর ভাবছে।

ন'পাড়ার প্রকাণ্ড মাঠটা পেরিয়ে তারা ফলসা-বনে ঢুকল। চারদিকটা ছমছম করছে। একঝাঁক শেয়াল পালাল পাশ দিয়ে। ঘুমন্ত পাখিরা কেউ কেউ একটু ডানা ঝাপটে ডেকে উঠল ভয় পেয়ে। গৌরের বন্ধুরা খুব নিশ্চিন্তে হাঁটছে। সকলেরই ভারী ফুর্তি। সোনার মেডেল, টাকা পাওয়া, ভরপেট ভালমন্দ খাওয়া তো সচরাচর জোটে না কপালে।

ফলসা-বন পার হয়েই আর একটা বড় মাঠ। তার পরেই মল্লারপুরের সীমানা। বন্ধুরা এখান থেকেই ভাগ ভাগ হয়ে যে যার বাড়ি যাবে। গৌরের বাড়ির দিকে যাওয়ার কেউ নেই। রাস্তাটাও নির্জন। এত রাতে গাঁ-গঞ্জে কেউ জেগে থাকে না।

তেজেন বলল, "গৌর, তুই একা যাবি, একটা মশাল নিয়ে নে।"

মশাল হাতে গৌর একা-একাই চলল, ভয়ডর তার বিশেষ লাগছিল না, কিন্তু কেমন যেন মনের মধ্যে একটা সুড়সুড়ি টের পাচ্ছিল সে। রাঘবরাজা এত সহজে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। কাবাডি খেলায় এত লোকের সামনে ওরকম হেনস্থা আর লাঞ্ছনা নীরবে হজম করে যাওয়ার পাত্রও নয় মাউ আর খাউ। একটা কিছু করবে।

সামনেই মহাবীর থানের বটতলার ঝুপসি অন্ধকার। থোকা-থোকা জোনাকি জ্বলছে। মশালের আলো এখন নিবু-নিবু। সেটা উঁচু করে তুলে ধরে গৌর বটতলাটা দেখার চেষ্টা করল। মনটায় বড্ড সুড়সুড়ি লাগছে। বাঁ দিকে বুড়ো শিবের ভাঙা মন্দিরে একটা তক্ষক ডেকে ওঠে। একটা কেলে খোঁড়া কুকুর এই বটতলায় রোজ শুয়ে থাকে। আজ সেটার কোনো সাড়াশব্দ নেই। পা বাড়িয়েও বটতলাটা পেরোতে একটু ইতস্তত করতে লাগল সে। মশালের নিবু-নিবু আলোয় কাউকে দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু জায়গাটা যে বেশ ছমছমে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ঘুরপথে যাওয়ারও উপায় নেই। একধারে নিবিড় কাঁটাবন, অন্য ধারে বিপজ্জনক জলার ধারে চোরাবালি, পথ এই একটাই। গৌর করে কী?

একটু ভেবেচিন্তে গৌর দ্বিধার ভাবটা ঝেড়ে ফেলল। তারপর চারদিকে সতর্ক চোখ ফেলে ধীর পায়ে এগোল।

বটের ঝুরি নেমে চারদিকটা যেন জঙ্গলের মতো হয়ে আছে। অনেকটা জায়গা নিয়ে বটের বিস্তার। গৌর যখন মাঝামাঝি এসেছে তখন পিছনে হঠাৎ অস্পষ্ট একটা শব্দ শুনতে পেল সে। যেন কে শুকনো পাতা মাড়িয়ে দিল। বিদ্যুৎ-বেগে ঘুরে দাঁড়াল গৌর।

কিন্তু কিছু করতে পারল না। একটা লাঠি এসে মশালটা ছিটকে ফেলে দিল মাটিতে। আর একটা লাঠি এসে পড়ল বাঁ দিকের কাঁধে।

গৌর লাঠি খেয়ে চোখে সর্ষেফুল দেখে বসে পড়ল মাটিতে। মাথাটা ঘুরছে। মাটি দুলছে। সে অজ্ঞান হয়ে যাবে নাকি? ন'পাড়ার কালীবাড়ির মাঠে মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে যে গৌর সাত-সাতটা দানবকে একাই মোর করেছে, সে মাত্র দু'ঘা লাঠির চোটে কুপোকাত হয়ে যাবে? এখনও সোনার মেডেলটা তার গলায় দুলছে যে! ট্যাঁকে রয়েছে প্রাইজের কড়কড়ে দেড়শোটা টাকা। মল্লারপুরের লোকেরা তাকে বীর বলে একটু আগেই কাঁধে নিয়ে কত নাচানাচি করেছে যে! এত সহজে হার মানলে তার চলবে কেন?

এইসব ভাবতে কয়েক সেকেণ্ড মাত্র সময় নিয়েছে সে। এর মধ্যেই উপর্যুপরি কয়েকটা লাঠি এসে পড়ল তার ওপর। ভাগ্যি ভাল যে, মশালটা পড়েই নিবে গেছে। অন্ধকারে তাই লাঠিগুলোর সব ক'টা তার শরীরে পড়ল না। একটা মাজায় লাগল বটে, কিন্তু তত জোরে নয়। বোধহয় বটের কোনো ঝুরিতে ঠেকে গিয়েছিল লাঠিটা। আর দুটো লাঠি পরস্পরের সঙ্গে লেগে কাটাকুটি হয়ে

গেল।

কে একজন চাপা স্বরে বলল, "শেষ করে দে! শেষ করে দে! তারপর কবচটা ছিঁড়ে নে কোমর থেকে। নইলে রাজার কাছে মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না।"

গৌর মাথা বাঁচানোর জন্য একটা হাত তুলে রেখেছিল। একটা লাঠি এসে পড়ল ঠিক তার মুঠোয়। প্রচণ্ড লাগল হাতে। মনে হল চামড়া ছড়ে গেল লাঠির চোটে। কিন্তু গৌর তবু চেপে ধরল লাঠিটা। প্রথমে একহাতে, তারপর দু'হাতে এক হ্যাঁচকা টান মেরে অদৃশ্য আততায়ীর হাত থেকে লাঠিটা ছিনিয়ে নিয়েই খানিকটা হামাগুড়ি দিয়ে সরে গিয়ে লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল গৌর।

তারপর অন্ধকারে কী যে হল তা গৌর বলতে পারবে না। তার আনাড়ি হাতের লাঠি অন্ধকারে এলোপাথাড়ি চলতে লাগল। ঠকাঠক ঠকাঠক শব্দ উঠতে লাগল মুহুর্মুহু। অদৃশ্য আততায়ীদের শরীরেও লাগল বোধহয়। কে একজন চেঁচাল—"উঃ!" আর একজন বলল, "বাবা রে!"

মিনিট কয়েক লড়াই চলার পর গৌর টের পেল, ওরা রণে ভঙ্গ দিচ্ছে। একজোড়া পা বাজারপানে দৌড় মারল। একজন বুড়োশিবের মন্দিরের দিকে ছুটল। একজন মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। চার নম্বরটা সাঁত করে কোথায় লুকিয়ে পড়ল লাঠি ফেলে।

হতভম্বের মতো লাঠি হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল গৌর। চার-চারটে লোক যে তার জন্য ওত পেতে ছিল, এটা যেন তার বিশ্বাস হল না। চারজনেই যে রণে ভঙ্গ দিয়েছে এটাও হজম করতে একটু সময় লাগল তার। কোমরে হাত দিয়ে সুতলিতে বাঁধা কবচটা একবার ছুঁয়ে দেখল, গলায় মেডেল বা ট্যাঁকে টাকা, কিছুই খোয়া যায়নি। তারপর সে জোর কদমে হাঁটতে লাগল বাড়ির দিকে।

॥ ৭ ॥

বাড়ি ঢুকে গৌর একটু অবাক হয়ে দেখল দাদার ঘরের দাওয়ায় হ্যারিকেন জ্বলছে। দাদা আর বউদি বসে বসে মশা তাড়াচ্ছে। প্রথমে গৌর ভেবেছিল রাত হয়েছে, বোধহয় তার জন্যই উদ্বেগে দাদা-বউদি বসে আছে বারান্দায়। কথাটা ভেবে গৌর একটু খুশিই হয়েছিল। কিন্তু নিতাইগোপালের কথায় গৌরের ভুল ভাঙল।

গৌরকে দেখে নিতাই বলল, "কে রে, গৌর এলি নাকি?"

"হ্যাঁ দাদা।"

"তোর মাউ আর খাউদাদাকে দেখেছিস? তারা এখনও ফেরেনি।"

"তারা তো ন'পাড়ায় কাবাডি খেলতে গিয়েছিল।"

নিতাই ভারী বিরক্ত হয়ে বলল, "সে খবর শুনেছি। বেকায়দায় পেয়ে তুমি তাদের হেনস্থাও করেছ, কিন্তু তোমার বিচার পরে। তারা গেল কোথায়?"

"আমি তো তা জানি না।"

গৌরের বউদি কান্নাজড়ানো খনখনে গলায় বলল, "তা জানবে কেন? খেয়ে খেয়ে গতর হয়েছে, আমার ভাই দুটো খেলতে গিয়েছিল, ধরে সবাই মিলে মেরেছ, লজ্জা করে না? এখন সত্যি করে বলো, তাদের কী হয়েছে। মেরে পাঁকে পুঁতেটুতে দিয়ে আসোনি তো?"

গৌর অবাক হয়ে বলল, "আমি মারব কেন?"

বউদি ফুঁসে উঠে বলল, "কেন মারবে তা জানো না? দিনরাত তো হিংসেয় জ্বলেপুড়ে মরছ! চোর গোবিন্দ, বুড়ো কবরেজ আর ভণ্ড ফকিরটার সঙ্গে সাঁট করে ওদের সরানোরও মতলব করেছ, সব জানি। ওরা নিজেরাই আমাকে বলেছে। এই বলে রাখছি, আমার ভাইরা যদি না ফেরে, তাহলে তোমাকে আঁশবঁটি দিয়ে আমি দু'খানা করে কাটব।"

নিতাইগোপাল রাগের গলায় বলল, "তোমার ব্যবহারে লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেছে। আবার সোনার মেডেল গলায় ঝুলিয়ে রেখেছ! লজ্জা করে না? মাউ আর খাউ কী এমন দোষ করেছিল যে, সবাই মিলে ওদের ওরকম মারধোর করলে?"

গৌর এত অবাক জীবনে হয়নি। কিছুক্ষণ সে কথাই বলতে পারল না, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "ওদের মেরেছি কে বলল?"

"বলবে আবার কে! গাঁয়ের লোকেরাই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলে গেছে। খেলতে একটু গুঁতোগুঁতি হয়েই থাকে। না হয় তোমাকে একটু ধাক্কাধাক্কিই করেছে, তা বলে হাত ভেঙে দেওয়া! ছিঃ!"

"গাঁয়ের লোক কী বলল? তারা কি বলল দোষটা আমার?"

বউদি খনখনে গলায় বলে ওঠে, "তা বলবে কেন? আমার ভাই দুটো এ গাঁয়ে আছে বলে সকলেরই চোখ টাটায়। সব শত্রু। কী হি-হি করে হাসি সকলের! আমার ভাইয়ের হাত ভাঙায় কী আহ্লাদ তাদের! গৌর ভারী বীরত্বের কাজ করেছে তো! কুটুম-মানুষের হাত ভেঙে দিয়েছে। যাও এবার সোনার মেডেলটা তাদের দেখিয়ে এসো। হুঃ, বীর! মুখে নুড়ো অমন বীরের।"

নিতাই বলল, "অত কথায় কাজ নেই। হ্যারিকেনটা নিয়ে যা, যেখানে পাস খুঁজে নিয়ে আয়। আমরা শুতে যাচ্ছি। সকালের মধ্যে যদি তারা না ফেরে, তবে আমাকে পুলিশে খবর দিয়ে তোকে হাজতে পাঠাতে হবে।"

চোখের জল মুছে গৌর হ্যারিকেন নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

গৌরের সন্দেহ নেই যে, মহাবীর থানের বটতলায় যারা তাকে আক্রমণ করেছিল তাদের মধ্যে মাউ আর খাউ ছিল। খেলার মধ্যে কী হয়েছে তা সেই উত্তেজনায় গৌরের আর মনে নেই। তবে মাউ বা খাউ কারও হাত ভেঙেছে বলে তার মনে হয় না। যদি ভেঙে থাকে, তাহলে অবশ্য লজ্জার কথা।

গৌর হ্যারিকেন হাতে মহাবীর থানের দিকে হাঁটছিল। যদি ওদের পাওয়া যায় তবে ওখানেই পাওয়া যাবে।

রাত আরও গভীর হয়েছে। আরও নিশুতি। চারদিক ছমছমে থমথমে। কেমন যেন মনের মধ্যে ফের সুড়সুড়িটা টের পাচ্ছে গৌর। কী যেন একটা ঘটবে।

গৌর বটগাছটার ছায়ার দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়াল। তার পা সরছিল না। দূর থেকেই সে গলা খাঁকারি দিয়ে মৃদু স্বরে ডাকল, "মাউদাদা! খাউদাদা!"

কেউ জবাব দিল না।

গৌর আরও দু'পা এগোল। আবার ডাকল, তবু জবাব নেই। একটা বিদঘুটে উত্তুরে হাওয়া কনকন করে বয়ে গেল, হ্যারিকেনটা দপদপ করে কয়েকবার লাফিয়ে ঝপ করে নিবে গেল। নিকষ্যি অন্ধকার গ্রাস করে নিল চারদিক।

কিন্তু সেই অন্ধকারে এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল। এমন কাণ্ড গৌর আর কখনও দেখেনি।

হ্যারিকেনটা নিবে যাওয়ার একটু পরেই হঠাৎ বটতলার অন্ধকারে দপ করে একটা নীলচে আলো জ্বলে উঠল। খুব উজ্জ্বল নয়, কিন্তু ভারী নরম, ভারী মায়াময় এক আলো। যেন জ্যোৎস্নার সঙ্গে আকাশের নীল রঙখানা কে গুলে মিশিয়ে দিয়েছে। সেই অদ্ভুত আলোয় বটতলাটা যেন এক রূপকথার রাজ্য হয়ে গেল। কিছুই আর যেন চেনা যায় না। বুড়োশিবের ভাঙা মন্দির, বাঁধানো চাতাল, বটের ঝুরি সব যেন ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেল। নীল আলোর মধ্যে ফুটে উঠল একটা ধপধপে সাদা সিংহাসন।

গৌর পালাতে গিয়েও পারল না। সম্মোহিতের মতো চেয়ে রইল সামনের দিকে। আঠাকাঠি দিয়ে যেমন পাখি ধরে, তেমনি করে কে যেন আটকে ফেলল গৌরকে। সে পিছোতে পারল না.

ঘুরে দৌড় দিতে পারল না, বরং ধীরে ধীরে চুম্বকের টানে এক-পা এক-পা করে এগিয়ে যেতে লাগল বটতলার দিকে।

এখানে এমন ধপধপে সাদা সিংহাসন এল কোত্থেকে ? এমন অদ্ভুত আলোও তো জন্মে দেখেনি গৌর ! বটতলায় হাজারটা ঝুরির ভিতরে বিচিত্র এক আলোছায়া। গাছের মোটা গুঁড়িটার কাছে ফাঁকা সিংহাসনটা কে রেখে গেল ?

গৌর ধীরে-ধীরে সিংহাসনটার কাছে এসে দাঁড়াল। না, নিজের ইচ্ছেয় নয়। এতক্ষণ যেন এক অদৃশ্য সুতোর টান তাকে নিয়ে এসেছে এইখানে। একটা অদৃশ্য হাত যেন হঠাৎ তাকে থামিয়ে দিল নির্দিষ্ট জায়গায়।

গৌরের চোখে পলক পড়ছে না। বুকের ভিতর সেই গুড়গুড় সুড়সুড়। হঠাৎ একটা সাদা আলোর ঝলকানি দেখতে পেল গৌর। তারপর নিজের চোখকে বিশ্বাস হল না তার—সিংহাসনে রাজা রাঘব বসে আছে। সেই অদ্ভুত লম্বা লোকটা। পরনে সাদা একটা জোব্বা, মাথায় জরির কাজ করা সাদা একটা পাগড়ি।

রাজা রাঘব গৌরের দিকে চেয়ে একটু হাসল। বলল, "খুব বাহাদুর ছেলে তুমি। বহোত খুব। আমি তোমার ওপর খুশি হয়েছি।"

গৌর জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে বলল, "আপনি কি ভোজবাজি জানেন ?"

রাজা রাঘব মৃদু হেসে মাথা নেড়ে বলল, "তা একরকম বলতে পারো। তবে ভোজবাজি মানেই হল বস্তুবিদ্যার সঙ্গে আত্মশক্তির প্রয়োগ। অত সব তুমি বুঝবে না। তবে তুমি যে আজ ন'পাড়ার সঙ্গে কাবাডি খেলায় ভোজবাজি দেখালে, সেটাও একটা বস্তুবিদ্যার কারসাজি।"

গৌর অবাক হয়ে বলল, "বস্তুবিদ্যা ? কই, আমি তো কিছু জানি না ?"

রাঘব মাথা নেড়ে বলে, "তোমার জানার কথাও নয়। আর সেইজন্যই বস্তুটি তোমার পক্ষে বিপজ্জনক।"

"আমার তো তেমন কোনো বস্তু নেই ?"

রাঘব মৃদু-মৃদু হেসে মাথা নেড়ে বলল, "আছে বই কী ! কিন্তু বাঁদরের গলায় যেমন মুক্তোর মালা বেমানান, তোমার মতো আনাড়ির কাছে ও-বস্তু থাকাও তেমন বিপজ্জনক। বস্তুটি আমি চাই।"

গৌর এক পা পিছিয়ে বলল, "আমার কাছে কিছু নেই।"

মুহূর্তের মধ্যে রাঘবের হাসিমুখ পাথরের মতো স্থির হয়ে গেল। চোখ দুটো ধকধক করে উঠল। হিংস্র গলায় রাঘব বলল, "পালানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। এই জায়গাটা আমি বন্ধন দিয়ে রেখেছি। আর-একটা কথাও মনে রেখো, যে বস্তুবিদ্যার জোরে আমার লোকদের হাত থেকে বেঁচে বেরিয়ে গেছ, তা দিয়ে আমায় ঠকাতে পারবে না।"

গৌর কী বলবে বুঝতে না পেরে শুধু অপলক চেয়ে রইল।

রাঘব ক্রূর চোখে কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে বলল, "কবচটা কোমর থেকে খোলো।"

শুনে গৌরের মনে হল, এই আদেশ পালন না করে তার উপায় নেই। ওই কণ্ঠস্বর যেন দৈববাণী। তার একখানা হাত আস্তে-আস্তে কোমরের দিকে উঠে এল।

রাঘব বলল, "কবচটা খুলে নাও। তারপর জলার ধারে ওই চোরাবালুতে ছুঁড়ে ফেলে দাও।"

গৌর কোমরের সুতলিটার গিঁট খুলল। তারপর কবচটা হাতে নিয়ে ধীর পায়ে জলার দিকে এগিয়ে গেল।

পিছন থেকে রাঘবরাজার গলা গমগম করে উঠল, "ফেলে দাও ! ছুঁড়ে ফেলে দাও।"

গৌর কবচসুদ্ধু হাতটা মাথার ওপর তুলল। তারপর প্রাণপণ শক্তিতে সেটা ছুঁড়ে দিল জলার দিকে।

তারপর আস্তে-আস্তে ঘুরে দাঁড়াল সিংহাসনের দিকে।

কিন্তু বটতলা নিকষ কালো অন্ধকারে ডুবে গেছে আবার। সেই আলো নেই, সিংহাসন নেই। শুধু অন্ধকার থেকে একটা গমগমে গলা বলে উঠল, "এবার বাড়ি যাও।"

শরীরটা দুর্বল লাগছিল গৌরের। এতক্ষণ যে নির্ভয় নির্ভার মন ছিল, তা আর নেই। এখন তার ভয় করছে, শীত করছে, ঠকঠক করে কাঁপছে সে। তাহলে কি কোনো কার্যকারণে তার কবচটার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ? কবচের গুণেই কি সে ন'পাড়ার সাত-সাতটা দানবীয় খেলুড়িকে মোর করে দিয়েছিল দু'দুবার ? আর জাগ্রত সেই কবচের জন্যই রাজা রাঘবের এত দুশ্চিন্তা ?

গৌর আর ভাবতে পারল না। সে প্রাণপণে বাড়ির দিকে ছুটতে

লাগল।

বাড়িতে ঢোকার মুখেই একটা বাঁশঝাড়। অন্ধকারে দেখতে পায়নি গৌর, একটা বাঁশ ঝুঁকে পড়েছিল রাস্তার ওপর। সেটায় পা বেধে ধমাস করে পড়ে গেল সে। মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। ভয়ে সিঁটিয়ে গেল হাত-পা। সে বুঝল যে, আর রক্ষা নেই। এবার শত্রুপক্ষ তাকে পিঁপড়ের মতো পিষে মারবে।

গৌর চেঁচাল, "বাঁচাও..."

একটা হোঁতকা হাত তার মুখটা চেপে ধরল অন্ধকারে।

কানের কাছে কে যেন বলে উঠল, "চেঁচাস না। খবর্দার!"

গৌর একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, "গোবিন্দদা!"

"এদিকে আয়, তফাতে গিয়ে দাঁড়াই। কথা আছে।"

কাঁপতে-কাঁপতে গোবিন্দর পিছু-পিছু সে বাঁশঝাড় পেরিয়ে একটা জংলা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল।

হাঁফাতে-হাঁফাতে গোবিন্দ বলল, "আর রক্ষে নেই। প্রাণ বাঁচাতে যদি চাস তো এক্ষুনি এখান থেকে পালা!"

গৌর সভয়ে বলল, "কোথায় পালাব গোবিন্দদা? আমার যে যাওয়ার জায়গা নেই। আর পালিয়েই বা হবে কী? আমার বাঁচার ইচ্ছেও নেই।"

গোবিন্দ চোখ কপালে তুলে বলে, "কেন রে, বাঁচার ইচ্ছে নেই কেন?"

গৌরের চোখে প্রায় জল এসে গেল। "বেঁচে থেকে লাভ কী বলো? রাঘবরাজার তোশাখানা খুঁড়ে বের করবে বলে আমাদের ভিটেছাড়া হতে হবে। তার ওপর যদি প্রাণে কোনোরকমে বেঁচেও যাই, সারাজীবন দাদার শালাদের তাঁবেদারি করে মরতে হবে। খাউ মাউ তো জুটেছেই, বোম্বেটে হাউও এসে জুটল বলে। বড় ভরসা ছিল কবচখানা। তার জোরেই আজ কাবাডিতে খুব লড়েছিলাম। তা সেটাও রাঘবরাজার পাল্লায় পড়ে গেছে! বেঁচে আর লাভ কী?"

গোবিন্দ একটু মাথা নেড়ে বলল, "সবই জানি রে। তুই ভাবিস তুই বুঝি একা! তা নয় রে বোকা। আমরা কেউ না কেউ সব সময়ে তোকে চোখে-চোখে রাখছি। যা-যা ঘটেছে, সব স্বচক্ষে দেখেছি।"

গৌর অভিমানভরে বলল, "দেখেছ! তাও আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করলে না!"

গোবিন্দ মাথা নেড়ে বলে, "উপায় নেই! রাঘবরাজার সঙ্গে পাল্লা টানতে পারি, আমাদের তেমন ক্ষমতা কোথায়? তোকে বশ করে ভেড়া বানিয়ে কবচ-ছাড়া করল, তাও মুখ বুজে হজম করতে হল। কিন্তু কাছে গেলে আমারও তোর মতোই দশা হত।"

গৌর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "এতকাল কবচটার মহিমা বুঝতে পারিনি। ঘুমন্ত ছিল। আজই কিন্তু কবচটা জ্যান্ত হল। আমার শরীরটায় আজ ঝিলিক খেয়ে গেল বারবার।"

গোবিন্দ মাথা নেড়ে বলল, "দূর বোকা। কবচ জাগেনি।"

"জাগেনি? তাহলে এসব হল কী করে?"

"কবচ জাগলে তার লক্ষণ আমরা ঠিকই টের পেতাম। যোগেশ্বরবাবার তুক আছে। কবচ জাগলে আমরা যারা তাঁর চেলা, সবাই নীল আকাশে তিনবার বিদ্যুতের ঝলক দেখতে পাব।"

"তাহলে কী করে এতসব কাণ্ড হল?"

"তুই বড় বোকা গৌর। যে ক্ষমতা আজ তুই দেখিয়েছিস, তা কবচের ক্ষমতা নয়, তোরই ক্ষমতা।"

গৌর বিস্ময়ে হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, "আমার? আমি সাতটা দানবকে ওরকম গো-হারান হারিয়েছি? বলো কি গোবিন্দদা!"

"ঠিকই বলছি। আরে হাঁদারাম, যোগেশ্বরবাবার দেওয়া কবচ যদি জাগত তাহলে কি রাঘব অত সহজে তোকে হিপনোটাইজ করতে পারত?"

গৌর জিজ্ঞেস করে, "তাহলে কবচ জাগত কিসে? কেমন করে?"

গোবিন্দ মাথা নেড়ে বলে, "তা জানি না। সেসব আমাদের যোগেশ্বরবাবা বলে দেননি। তবে এটুকু জানি, ঠিক সময়ে ঠিক যোগাযোগে কবচ জাগবে। আর সেইটেই আমাদের একমাত্র ভরসা। নইলে রাঘবরাজা গাঁয়ের পর গাঁ শ্মশান করে দেবে।"

গৌর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "আর ভরসা করে কী হবে? কবচ তো চোরাবালিতে ডুবে গেছে।"

"তা বটে। কিন্তু কবচ না থাকলেও তোর নিজের ক্ষমতাও যে কিছু কম নয়, তা তো আজ টের পেলি!"

"সে-ক্ষমতা দিয়ে কি রাঘবরাজার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যাবে?"

"সে-ক্ষমতাটাও যে বড় ফ্যালনা নয় রে। আমরা যারা বুড়ো-হাবড়া, বয়সের গাছপাথর যাদের নেই, তারা অবধি মরার কথা ভাবি না, তুই ভাবছিস কেন? এখন তুই-ই যে আমাদের বড় ভরসা।"

গৌর অবাক হয়ে বলে, "আমি তোমাদের ভরসা? বলো কী? না হয় গায়ে একটু জোরই আছে, আর কাবাডিও মন্দ খেলি না, তা বলে রাঘবরাজার সঙ্গে পাল্লা দেব এমন সাধ্যি কী?"

গোবিন্দ চিন্তিতভাবে বলল, "গায়ের জোরটাও কিছু ফ্যালনা নয় রে। তাতেও মাঝে মাঝে কাজ হয়। তবে কিনা রাঘবের গায়ে অসুরের জোর। তার ক্ষমতাও অনেক বেশি। কিন্তু তা বলে নিজেকে ছোট ভাবতে নেই। যদি একবার ধরে নিস 'পারব না' তাহলে আর কিছুতেই পারবি না। অন্তত 'পারব' বলে একটা ধারণা রাখতে হয়।"

গৌর বলল, "তাহলে পালাতে বলছ কেন?"

"পালানো মানেও একটা কৌশল। এইমাত্র দেখে এলাম তোর বাড়িতে রাঘব জনাকয়েক যমদূত মোতায়েন রেখেছে। দুটো বসে আছে তোর ঘরের পিছনে আমবাগানে, আর দুটো কলার ঝাড়ে। ওরা কি তোকে ছাড়বে?"

গৌর অবাক হয়ে বলে, "মারতে হলে রাঘবরাজা তো বটতলাতেই আমাকে মারতে পারত। এমন হিপনোটাইজ করেছিল যে, আমার হাত-পা শরীর একদম অসাড় হয়ে গিয়েছিল। তখন মারল না কেন?"

গোবিন্দ ঠোঁট উল্টে বলল, "কে জানে রাঘবের কী লীলা। তবে তোকে যদি মেরে ফেলে তাহলে আর আমাদের রক্ষে নেই।"

গৌর একটু ভাবল। আশ্চর্য এই যে, রাঘবরাজা তাকে কবচ-ছাড়া করায় সে যেমন ভয় পেয়েছিল, এখন আর সেরকম ভয় করছে না। শরীরটা বেশ হালকা লাগছে, গায়ে স্বাভাবিক জোর-বলও যেন ফিরে এসেছে। তার চেয়েও বড় কথা, তার মাথায় একটু-আধটু বুদ্ধি-বিবেচনা খেলছে। সে মাথা নেড়ে বলল, "পালানোর কোনো মানেই হয় না। আমার যাওয়ার জায়গাও নেই। তবে আমার মনে হয় রাঘবরাজা আমাকে মারতে চাইছে না। চাইলে অনায়াসে মারতে পারত।"

গোবিন্দ বলল, "তা বটে। তাহলে কী করবি?"

"আমি বাড়ি যাব।"

"যদি যমদূতগুলো তোকে মেরে ফেলার চেষ্টা করে?"

"দেখাই যাক।"

"তোর সাহস আছে গৌর। ঠিক আছে, আমিও পিছনে রইলাম। আড়াল থেকে নজর রাখব। তেমন বিপদ দেখলে অন্তত একটা ফাবড়া বা বল্লম তো অন্তত ছুঁড়ে মারতে পারব!"

গৌর একটু হাসল। তারপর অন্ধকারে পথ ঠাহর করে করে

হাঁটতে লাগল বাড়ির দিকে।

সদরের দিক দিয়ে গৌর গেল না। একটু ঘুরে আমবাগানের পথ ধরল। এসব তার চেনা জায়গা, নখদর্পণে। অন্ধকারেও সে বলে দিতে পারে, কোন্ গাছটায় মৌচাক আছে, কোনটায় কাঠঠোকরার বাসা বা কোনটার প্যাঁচ-খাওয়া শরীরে আছে কুস্তিগিরের আকৃতি।

লোকদুটোকে অন্ধকারেও ঠিকই দেখতে পেল গৌর। কাঁচামিঠে আর বেগমপসন্দ দুটো গাছ একেবারে পাশাপাশি। ভারী ঝুপসি ছায়া। সেই ছায়ায় আরও গাঢ় দুটো ছায়া ঘাপটি মেরে আছে। হাতে কোনো অস্ত্র আছে কি? কে জানে!

গৌর নিঃশব্দে এগিয়ে গেল। একটা গাছ থেকে আর-একটা গাছের আড়ালে কোলকুঁজো হয়ে ছুটে যাচ্ছিল সে। কাবাডি খেলার দক্ষ খেলোয়াড়ের কাছে ব্যাপারটা খুবই সহজ। কিন্তু লোকদুটো বোকা নয়। অন্ধকারে যতই নিঃশব্দে গৌর এগোক না কেন, লোক দুটো কিন্তু ঠিক টের পেল। আচমকা ছায়াদুটো ছিটকে সোজা হল। তারপর সিঁটিয়ে গেল গাছের আড়ালে।

গৌর চারদিকটা একটু লক্ষ করল। তারপর কাঠবেড়ালির মতো একটা গাছ বেয়ে উঠে গেল খানিকটা ওপরে। এক গাছ থেকে আর-এক গাছে যাওয়া তার কাছে ছেলেখেলার মতো। লোক দুটো যে-গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে, সে দুটো টপকে গৌর সোজা গিয়ে তার ঘরের পিছনে নেমে পড়ল। নামল খুবই সাবধানে, আড়াল রেখে। কেউই দেখতে পায়নি তাকে।

হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে তার ঘরের দাওয়ার পাশে হাজির হল। কেউ কোথাও নেই। খুব সাবধানে উঠে দাঁড়াল গৌর। দাওয়ায় পা রাখল। উঠতে যাচ্ছে, ঠিক এই সময়ে লোহার মতো দু'জোড়া হাত এসে তার দুই বাহু চেপে ধরল।

গৌর একটুও চমকাল না, ভয়ও পেল না। ঘাড় ঘুরিয়ে লোকদুটোকে একটু দেখল। সাক্ষাৎ যমদূতই বলা যায়। কিন্তু গৌরের আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে। সে জানে, ইচ্ছে করলে বোধহয় এই যমদূতদের সঙ্গেও সে পাল্লা দিতে পারে।

তবে গৌর কিছুই করল না। ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী চাও তোমরা?"

যমদূতদের একজন একটু অবাক হয়ে বলল, "ভয় পাচ্ছিস না যে। খুব তেল হয়েছে, না?"

"তেল হবে কেন? তেল তো দেখছি তোমাদের।"

ঘাড়ে একটা রদ্দা মেরে যমদূতটা বলল, "কার কত তেল সেটা আজই বোঝা যাবে। চল্!"

রদ্দা খেয়ে গৌরের মগজ নড়ে গিয়েছিল। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। চোখে সর্ষেফুল। তবু শরীরটা ঝাঁকিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "তোমরা বাবু কথায়-কথায় বড় গায়ে হাত তোলো। সবসময়ে কি হাত নিশপিশ করে নাকি?"

"তা করে। তোর মতো চোরকে হাতে পেলে হাত নিশপিশ করবেই।"

"আমি চোর!" গৌর অবাক হয়ে বলে, "কী চুরি করলাম বলো তো!"

যমদূতটা আর-একটা রদ্দা চালিয়ে বলল, "ন'পাড়া থেকে যে সোনার মেডেল নিয়ে এলি, সেটা চুরি নয়? কবচের জোরে জিতেছিস। ওরকম জেতাকে চুরিই বলে।"

এই বলে যমদূতেরা গৌরকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল। বনবাদাড় মাঠঘাট কাঁটাঝোপের ভিতর দিয়ে যেখানে এনে হাজির করা হল তাকে, সে-জায়গাটা গৌরের খুব চেনা। সেই বটতলা, যেখানে একটু আগেই রাঘবরাজার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। এখন আর সিংহাসন নেই, সেই স্বপ্নের মতো আলো নেই। শুধু বাঁধানো চাতালে একটা পিদিম জ্বলছে। আধো-অন্ধকারে লম্বা পায়ে পায়চারি করছে রাঘব। তাকে দেখে বাঘের চোখে চাইল। সেই চোখ, যা দেখলে বাঘেরও বোধহয় রক্ত জল হয়ে যায়।

গৌর রাঘবের চোখের দিকে চেয়ে কেমন অবশ হয়ে গেল। সে টের পেল, রাঘবের সাঙ্গোপাঙ্গরা যতই সাঙ্ঘাতিক হোক, তারা কেউ রাঘবের হাজার ভাগের এক ভাগও নয়।

গমগমে স্বরে রাঘব বলল, "আমি কে তা জানিস?"

গৌর মাথা নেড়ে ক্ষীণ স্বরে বলল, "জানি। আপনি রাজা রাঘব।"

"আর কী জানিস?"

গৌর একটা শ্বাস ফেলল। তার মনটা ধীরে-ধীরে অবশ হয়ে যাচ্ছে। প্রতিরোধ চলে যাচ্ছে। সে সম্মোহিত হয়ে পড়ছে। ক্ষীণ স্বরে গৌর বলল, "আপনি আপনার রাজ্য আবার স্থাপন করতে চান। তার জন্য সৈন্যসামন্ত যোগাড় করছেন।"

"তাহলে সবই জানিস দেখছি। যোগেশ্বর নামে একটা শয়তান এখানে একসময়ে থানা গেড়েছিল। তার কয়েকজন শিষ্যসাবুদ এখনও এখানে আছে বলে খবর পেয়েছি। তারা নাকি আমাকে তাড়াতে চায়?"

"জানি।"

"লোকগুলোকে আমি চিনি না। শুনেছি তারা খুব গোপনে ষড়যন্ত্র আঁটছে। তুই জানিস তারা কারা?

"জানি।"

"নাম আর ঠিকানা বলে যা!"

"আপনি কি তাদের মারবেন?"

"আমার কাজে যে বাধা দেবে, তাকেই সরিয়ে ফেলতে হবে। কোনো উপায় নেই।"

"আমাদের এই গ্রাম কি আর এরকম থাকবে না?"

"না। সব ভেঙে ফেলে দেওয়া হবে। বাড়িঘর, মন্দির, সব। আবার সব গড়ে তোলা হবে যেমন আগে ছিল।"

"আর মানুষজন?"

"এখানকার মানুষ একসময়ে শত্রুতা করে আমাদের তাড়িয়েছিল। এখনও তাদেরই বংশধরেরা এখানে বাস করছে। সুতরাং সবাইকে উচ্ছেদ করা হবে। এবার নামগুলো বল্।"

"গোবিন্দদা, কবরেজমশাই, ফকিরসাহেব, সুবলদাদু।"

রাঘব তার যমদূতদের দিকে তাকিয়ে চোখের একটা ইংগিত করল। যমদূতদুটো চোখের পলকে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

রাঘব গৌরের দিকে সেই ভয়ঙ্কর চোখে চেয়ে বলে, "রাজা রাঘব বড় একটা ভুল করে না। কিন্তু তোর ব্যাপারে আজ আমার একটা মস্ত ভুল হয়েছে। কবচের জোরে নয়, নিজের ক্ষমতাতেই তুই আজ অনেক ভেলকি দেখিয়েছিস।"

গৌর চুপ করে রইল।

রাজা রাঘব বলল, "আমি তোর ওপর খুশিই হয়েছি। যদিও তুই যোগেশ্বরের এক চেলার নাতির নাতি, তবু তোকে ক্ষমা করতে পারি। একটা শর্তে।"

"কী শর্ত?"

"আমার হয়ে কাজ করতে হবে। একটু বেচাল দেখলেই খুন করব। আর কথামতো চললে কোনো অভাব থাকবে না।"

"আমাকে আপনার দলে নিতে চান?"

"চাই। তবে আমার দলে আসতে গেলে শুধু গায়ের জোর থাকলেই হবে না। শক্ত কলজে চাই। যদি সেই পরীক্ষায় পাশ করতে পারিস, তবেই দলে আসতে পারবি।"

"কী পরীক্ষা?"

"হাসতে হাসতে খুন করতে পারা চাই। রক্ত দেখে ভিরমি খেলে হবে না। গেরস্তের ঘরে আগুন দিবি, কিন্তু বুক কাঁপবে না।

পারবি ?"

"আপনি বললে চেষ্টা করতে পারি।"

"পরীক্ষা এখনই হবে। আমার লোকেরা ফিরে এল বলে।"

বাস্তবিকই কয়েক মিনিট বাদে যমদূতের চেহারার কয়েকজন লোক পিছমোড়া করে বেঁধে টানতে টানতে চারজন লোককে এনে হাজির করল। গৌর দেখল, গোবিন্দদা, কবরেজমশাই, ফকিরসাহেব আর সুবলদাদু। তিনজনেই ভয়ে জড়োসড়ো, মুখে কথা নেই।

রাঘব চারজনকে খুব তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে গৌরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, "এই চারটে মর্কটের কথাই বলেছিলি তো!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এখন এক-এক করে এদের ধরে নিয়ে গিয়ে চোরাবালিতে ফেলে দিয়ে আয়। খবর্দার, চালাকির চেষ্টা করিস না। আমার লোক নজর রাখবে। ওদিকটায় জলার ধারে একটা ঢিবি আছে। ঢিবির ওপর এক-একটাকে দাঁড় করিয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিবি। যা। এইটাই তোর পরীক্ষা।"

গৌর বলল, "যে আজ্ঞে।"

বলেই গৌর গিয়ে কবরেজমশাইয়ের হাত ধরল।

কবরেজমশাই ফোঁত করে একটা শ্বাস ছেড়ে ঢোক গিলে বললেন, "বাবা গৌর, তোর মনে কি এই ছিল ?"

পিছন থেকে এক যমদূত একখানা রদ্দা মারতেই কবরেজমশাই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। গৌর তাঁকে ধরে তুলল। তারপর হঠাৎ যমদূতটার ঘাড় ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "এ শিকার আমার। স্বয়ং হুজুর সামনে রয়েছেন। এরকম বেয়াদবি আর করলে মুণ্ডু ছিঁড়ে দেব। খেয়াল রেখো।"

সকলেই অবাক হয়ে গৌরের দুঃসাহস দেখল। যমদূতেরা হয়তো সবাই মিলে লাফিয়ে পড়ত গৌরের ওপর। কিন্তু সেই সময়ে রাজারাঘব চারদিক প্রকম্পিত করে বলে উঠল, "শাবাশ ! এই তো চাই।"

কবরেজমশাই কাঁপতে-কাঁপতে ঢিবির ওপর উঠলেন। অস্পষ্টভাবে বিড়বিড় করে বীজমন্ত্র জপ করছেন, শুনতে পেল গৌর। তাদের দুজনের দুদিকে চারজন চারজন করে আটজন বল্লম লাঠিধারী লোক।

কবরেজমশাই কাঁপতে-কাঁপতে বললেন, "গৌর, শেষে ব্রহ্মহত্যার পাতকী হলি ? রাঘবের দলে গেলি ? ওঃ, ভাবতে পারি না। আর কিনা তুই-ই ছিলি আমাদের শেষ ভরসা ! নাঃ, এর চেয়ে মরণ ভাল।"

বলতে-বলতেই কবরেজমশাই উচ্চৈঃস্বরে বীজমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে ঢিবি থেকে লাফ দিলেন। প্রায় হাত-দশেক নীচে চোরাবালি। গৌর ঝুঁকে দেখল, কবরেজমশাই বারকয়েক হাত-পা ছুঁড়লেন, তারপর তলিয়ে যেতে লাগলেন বালির মধ্যে।

এরপর সুবলদাদু। তিনি কোনো কথা বললেন না। কথা এমনিতেও কম বলেন। ঢিবির ওপর ওঠার সময় শুধু ট্যাঁক থেকে একটুকরো সুপুরি বের করে মুখে দিলেন। ওইটেই তাঁর একমাত্র নেশা। তারপর গৌরের দিকে চেয়ে বললেন, "কুলাঙ্গার।"

এই বলে তিনিও লাফ দিলেন। ঠেলা ধাক্কা দিতে হল না।

ফকিরসাহেব কেবল একবার রোষকষায়িত লোচনে গৌরের দিকে চেয়ে বললেন, "ফুঃ, আমাকে মারা কি অত সোজা রে ? শরীরখানা ছেড়েই আরশিতে ঢুকে পড়ব। তারপর কেবল ফুর্তি আর ফুর্তি। তোরা কাঁচকলা খা।" এই বলে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ফকিরসাহেব গিয়ে ঢিবির ধারে দাঁড়ালেন। তারপর চোখ বুজে একবার আল্লার নাম স্মরণ করেই মারলেন লাফ।

গোবিন্দ কোনো কথা বলল না, তাকালও না। চুপচাপ উঠে চলে এল ঢিবির ধারে। লাফ মারার আগে চাপা স্বরে শুধু বলল, "ঝিলিক দেখা গেছে।" তারপরেই লাফিয়ে পড়ল চোরাবালিতে।

কথাটার অর্থ প্রথমে বুঝতে পারেনি গৌর। তারপর মনে পড়ল। গোবিন্দদাই তাকে বলেছিল যে, কবচ জাগলে বিনা মেঘেও আকাশে তিনবার ঝিলিক দেখা যাবে। কিন্তু গৌরের এখন সে-সব ভাববার সময় নেই। রাঘবরাজাকে খুশি করাই এখন তার জীবনের লক্ষ্য। তার বেশ আনন্দ আর উত্তেজনা হচ্ছিল মনের মধ্যে। সে লোকের ঘরবাড়ি জ্বালাবে, গ্রামের পর গ্রাম শ্মশান করে দেবে, একের পর এক মানুষ মারবে। কী যে মজা হবে ! ওঃ ! তার গা রীতিমত গরম লাগছে। রক্তে যেন আগুন লেগেছে। আর বেশ নেশা-নেশা মাতলা-মাতলা ভাব।

গৌর বটতলায় ফিরে এসে রাঘবরাজার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে হাতজোড় করে বলল, "খুশি তো হুজুর ?"

হুজুর ! গৌর যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে রাঘবরাজাকে 'হুজুর' বলছে ! কিন্তু বলে বেশ ভালই লাগছিল তার। ইচ্ছে হচ্ছিল, রাঘবরাজার পায়ের ওপর মাথা রেখে ধুলোয় গড়াগড়ি খায়। আহা, রাঘবরাজার মতো মানুষ হয় না। মানুষও নয়, দেবতা। গৌরের চোখে আনন্দাশ্রু বইছিল।

রাঘবরাজা গম্ভীরমুখে তার বিশাল দক্ষিণবাহুটি তুলে বলল, "নাঃ, বাহাদুর আছিস বটে ! শাব্বাশ !"

"তাহলে পাশ তো হুজুর ? দলে নেবেন তো ?"

"হ্যাঁ। এবার যা, গাঁয়ের গোটা-দুই বাড়িতে আগুন লাগিয়ে আয়।"

গৌর সঙ্গে-সঙ্গে ছুটল। পথের ধারে দুটো খোড়ো ঘরে আগুন ধরিয়ে আবার দৌড়ে ফিরে এল। দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে, লোকজন প্রাণভয়ে চেঁচামেচি দৌড়োদৌড়ি করছে, আর গৌর তখন রাঘবরাজার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বিগলিত মুখে বলছে, "দিয়ে

এসেছি হুজুর। আর কী করতে হবে একবার হুকুম করুন।"

রাঘবরাজা মৃদু হেসে বলল, "আজকের মতো যথেষ্ট হয়েছে। কাল থেকে আমার সত্যিকারের কাজ শুরু হবে। কাল সকালে এসে এইখানে হাজির হবি। তোর যা এলেম দেখছি, তোকেই সর্দার করে দেব। এই নে আমার পাঞ্জা।"

রাঘবরাজা একখানা তুলোট কাগজ গৌরের হাতে দিল। তাতে একখানা প্রকাণ্ড হাতের ভুষোকালির ছাপ। গৌর কাগজটা নিয়ে কপালে ঠেকাল।

রাঘবরাজা বলল, "খুব সাবধানে রাখিস।"

"যে আজ্ঞে।"

"এখন বাড়ি গিয়ে ঘুমো। কাল অনেক কাজ।"

গৌর হাতজোড় করে বলল, "হুজুর, একটা কথা। অভয় দেন তো বলি।"

"বল্ বল্, অত সঙ্কোচ কিসের?"

"আমার দুই কুটুমকে পাচ্ছি না। খাউ আর মাউ। তাদের খুঁজে নিয়ে না গেলে দাদা বাড়িতে ঢুকতে দেবে না বলেছে।"

এ-কথায় রাঘবরাজার চোখ দুটো ঝলসে উঠল। পিদিমের ম্লান আলোতেও দেখা গেল, লম্বাটে মুখখানা পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে। চাপা হিংস্র গলায় বলল, "কে তোকে বাড়ি ঢুকতে দেবে না? কার এত বুকের পাটা? তোর দাদাকে যদি কড়াইয়ের মধ্যে পুরে আগুন দিয়ে বেগুনপোড়া না করি..."

"আজ্ঞে হুজুর, মায়ের পেটের ভাই। অতটা করার দরকার নেই।"

রাঘবরাজা ভ্রুকুটি করে কিছুক্ষণ গৌরের দিকে চেয়ে থেকে বলল, "খাউ আর মাউ কোনো কর্মের নয়। বরং ওদের বড় ভাইটা কাজের লোক। খাউ আর মাউকে বেঁধে বুড়ো শিবের মন্দিরে বন্ধ করে রেখেছি। ভেবেছিলাম কেটে নদীর জলে ভাসিয়ে দেব। আমার রাজ্যে অপদার্থের স্থান নেই।"

"হুজুর, আমারও তাতে অমত নেই। বলেন তো নিজের হাতেই কাটব। তবে বউদি বড় কান্নাকাটি করবে।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রাঘব বলে, "ঠিক আছে। তুই ওদের নিয়ে যা। একটু নজরে নজরে রাখিস। তোর মুখ চেয়েই ওদের ছেড়ে দিচ্ছি।"

আধমরা খাউ আর মাউকে নিয়ে বাড়ি ফিরেছে গৌর। তারপর খুব নিশ্চিন্তে নিজের বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়েছে। ভারী নিশ্চিন্ত। কবচ হারানোর দুঃখ আর নেই। কবচের বদলে রাঘবরাজার পাঞ্জা পেয়ে গেছে সে। আর দুঃখ কিসের? কাল থেকে সে হবে রাঘবরাজার দলের সর্দার। গ্রাম জ্বালাবে, মানুষ মারবে, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে। তারপর একদিন হবে রাঘবরাজার সেনাপতি। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে গৌর স্বপ্ন দেখছিল। সেনাপতি হয়ে সে ঘোড়ায় চেপে সৈন্যসামন্ত নিয়ে একটা রাজ্য জয় করে ফিরছে। তার

বল্লমের আগায় গাঁথা একটা নরমুণ্ড। নরমুণ্ডটা ভারী চেনা-চেনা। কিন্তু ঠিক মনে পড়ছিল না মুখটা কার।

হঠাৎ আকাশ থেকে একটা ঈগল পাখি শোঁ করে নেমে নরমুণ্ডটা তুলে নিয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছিল। গৌর কি কিছু কম যায়? সঙ্গে-সঙ্গে ধনুক বাগিয়ে তীর ছুঁড়ল। পাখিটা লাট খেয়ে পড়তে লাগল। আশ্চর্য! নরমুণ্ডটা এসে আবার বল্লমে গেঁথে গেল। আর ঈগলটা নেমে এসে হঠাৎ দুটো থাবায় চেপে ধরল তার গলা।

গৌরের দম বন্ধ হয়ে এল। চোখ কপালে উঠল। কিন্তু কিছুতেই ঈগলটা ছাড়ছে না তাকে। চোখের সামনে যেন বিদ্যুতের ঝিলিক দেখা গেল বার-কয়েক। আর সেই যন্ত্রণার মধ্যে গৌর বুঝতে পারল, বল্লমে গাঁথা নরমুণ্ডটা আসলে তারই মুখ। তাই অত চেনা।

ঘুম ভাঙতেই গৌর বুঝল, মস্ত একটা মানুষ অন্ধকারে প্রাণপণে লোহার থাবায় তার গলা চেপে ধরেছে। বুকে হাঁটু।

গৌর বুঝল, আর একটু পরেই সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। তাই পা দুখানা তুলে সে লোকটার গলায় লটকে একটা ঝট্‌কা দিল। দড়াম করে লোকটা খসে গেল তার বুক থেকে। গৌর বিদ্যুৎবেগে উঠে লোকটাকে একটা লাথি লাগাল কষে। তারপর অনায়াসে তার একটা হাত পিঠের দিকে ঘুরিয়ে অন্য হাতে গলা চেপে ধরল।

গৌরের এই বজ্রবাঁধনে লোকটা খাবি খাচ্ছে।

গৌর জিজ্ঞেস করল "তুমি কে?"

"আমি হাউ। খাউ আর মাউয়ের বড় ভাই।"

গৌর অবাক হয়ে বলল, "তুমি তো জেলখানায় ছিলে!"

"রাঘব আমাকে ছাড়িয়ে এনেছে। তারপর ন'পাড়ায় লুকিয়ে ছিলুম।"

"তা আমার ওপর তোমার রাগ কিসের?"

"আমার ভাইদের এই হেনস্থার জন্য তুই-ই দায়ী। তুই রাঘবরাজার নজরে পড়েছিস। এখন রাঘব আমাদের পাত্তা দিতে চাইছে না। তোকে খুন করা ছাড়া আমার অন্য উপায় ছিল না।"

"তুমি ন'পাড়ার কাবাডির দলে ছিলে?"

"হ্যাঁ। রাঘব হুকুম দিয়েছিল, খেলার মধ্যে যেন তোমাকে খুন করা হয়।"

"এখন যদি তোমার ঘাড়টা ভেঙে দিই?"

হাউ কোনো জবাব দিল না। কিন্তু আচমকাই পিছন থেকে বেড়ালের পায়ে চার-পাঁচজন লোক ঘরে ঢুকল। তাদের প্রত্যেকের হাতে লাঠি তরোয়াল খাঁড়া।

গৌর কিছু করার আগেই তার মাথায় বিশাল একটা লাঠি সজোরে এসে পড়ল। ফটাস করে একটা শব্দ আর সেই সঙ্গে ছড়াক করে খানিক রক্ত ছিটকে পড়ল মেঝেয়। তারপরেই উপর্যুপরি ধুপধাপ লাঠি এসে পড়তে লাগল চারধার থেকে। গৌর নড়বার সময় পেল না। লাঠির ঘায়ে কাটা কলাগাছের মতো অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

হাউ লোকগুলোর দিকে চেয়ে বলল, "লাশ এখানে ফেলে রাখা চলবে না। রাঘব সন্দেহ করবে। রক্তটা ভাল করে মুছে দে। আর চারজন ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে চোরাবালিতে ফেলে দিয়ে আয়। সর্দারি হওয়া ওর বের করছি।"

নিশুত রাতে চারজন লোক গৌরের অচেতন দেহখানা চ্যাংদোলা করে বটতলার ঢিবিটার ওপর নিয়ে তুলল। তারপর দু'বার দোল দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল চোরাবালির মধ্যে।

বালির মধ্যে আস্তে-আস্তে মিলিয়ে গেল গৌর। কেউ কিছু জানতে পারল না।

গৌরের চেতনা যখন ফিরল, তখন তার চারধারে বালি আর বালি। ওপরে বালি, নীচে বালি, চারধারে ঝুরঝুর করে ঝুরো বালির স্তর কেবল সরে যাচ্ছে, ঝরে পড়ছে। কিন্তু অবাক কাণ্ড! গৌরের তাতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। সে দম নিতে পারছে। সে অনুভব করছিল, বালির মধ্যে শক্তমতো ছোট একটা জিনিস বারবার তার হাতে, পিঠে, বুকে এসে ঠেকছে। গৌর হাত বাড়িয়ে জিনিসটা মুঠোয় নিল।

কবচটা না? হ্যাঁ, সেই কবচটাই তো মনে হচ্ছে! গোবিন্দদা কী যেন বলেছিল? হ্যাঁ, বলেছিল যে, ঝিলিক দেখা গেছে। তার মানে কি কবচটা জেগে উঠেছে।

কবচটা মুঠোয় চেপে শোয়া-অবস্থা থেকে গৌর উঠে দাঁড়ায়। কোনো অসুবিধে হয় না তার। হঠাৎ তার মনে পড়ে যায়, আজ রাঘবরাজার হুকুমে তার চারজন অকৃত্রিম শুভাকাঙ্ক্ষীকে এই চোরাবালিতে ডুবিয়ে মেরেছে। মনটা হায়-হায় করে ওঠে গৌরের। তার বুদ্ধিনাশ হয়ে গিয়েছিল। শোকে পাগলের মতো হয়ে গৌর চারদিকে বালির মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে লাগল ওঁদের। খুঁজতে খুঁজতে চোখের জল ফেলে সে বারবার বলছিল, "এ আমি কী করলাম! এ আমি কী করলাম!"

বেশি খুঁজতে হল না। প্রথমে কবরেজমশাইকে পেয়ে গেল সে। তারপর সুবলদাদু। একটু বাদেই হাত ঠেকল গোবিন্দদা আর ফকিরসাহেবের গায়ে।

একে-একে চারজনকেই টেনে-হিঁচড়ে ওপরে নিয়ে এল গৌর। চোরাবালিতে একটুও কষ্ট হল না তার। শরীরটা যেন পালকের মতো হালকা।

চারজনকেই ঘাসজমিতে শুইয়ে একে-একে নাড়ি দেখবে বলে গৌর প্রথমে কবরেজমশাইয়ের কব্জিটা ধরতেই কবরেজমশাই খেঁকিয়ে উঠলেন, "ওঃ, কী আমার ধন্বন্তরি এলেন রে! বলি নাড়িজ্ঞানটা আবার তোর কবে থেকে হল?"

গৌর আনন্দে কেঁদে ফেলে বলল, "আপনি বেঁচে আছেন কবরেজমশাই?"

"মারে কে? চোরাবালিতে পড়ার আগে একটা করে বিশল্যকরণীর বড়ি খেয়েছি না সবাই? মরা কি অত সোজা? তা ছাড়া, কবচ যে জেগেছে, সে-খবরও পেয়েছিলাম কিনা। যাকগে, তোকে ভাবতে হবে না। ওই তিনজনও বেঁচেই আছে। এক্ষুনি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠবে।"

গৌর আবাক হয়ে দেখল, সত্যিই তাই। কথা শেষ হতে না হতেই গোবিন্দদা, সুবলদাদু আর ফকিরসাহেব উঠে বসেছেন। একটা হাই তুলে ফকিরসাহেব বললেন, "বেশ ঘুম হল একখানা। ঘুমটার বড় দরকার ছিল।"

গোবিন্দদা গা থেকে বালি ঝাড়তে-ঝাড়তে বলল, "এখন বসে গল্প করার সময় নেই গো। কবচ জেগেছে, কিন্তু যোগেশ্বরবাবার বলা আছে, মস্ত বিপদের দিনে কবচ জেগে উঠবে বটে, তবে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য। তারপর যেই ভোর হবে, অমনি চিরতরে নিবে যাবে। সুতরাং যা করার এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। ওঠো সব, উঠে পড়ো।"

॥ ৮ ॥

রাঘবরাজার গুপ্ত আবাসের কথা তার সাঙ্গোপাঙ্গরা জানে না। জানা সম্ভবও নয়।

নদীর বাঁকের মুখে যেখানে স্রোত ভয়ঙ্কর, সেইখানে দক্ষিণ তীরে মাটির মধ্যে কিছু ইট গাঁথা আছে দেখা যায়। কোনো প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ বলে লোকে তেমন মনোযোগ দেয় না। তাছাড়া ওই জায়গাতেই নদীর মধ্যে একটা ঘুর্ণি আছে। মানুষ নৌকো, যা পড়বে তা-ই তলিয়ে যাবে। তাই ভয়ে কেউ ওই খাড়া পাড় আর ঘুর্ণির কাছাকাছি যায় না। তবে সাধারণ মানুষ যা পারে না, রাঘবের কাছে তা খুবই সহজ কাজ।

নিশুত রাতে রাঘব সেই খাড়া পাড়ের ধারে এসে দাঁড়িয়ে চারদিকে একবার দেখে নিল। তার বাঘের মতো চোখ অন্ধকারেও

সব কিছু দেখতে পায়। না, কোথাও কেউ নেই। কেউ তাকে লক্ষ করছে না। রাঘব নিঃশব্দে পাড়ের ধারে ইটের খাঁজে পা রাখল। তারপর অলৌকিক দক্ষতায় ঠিক টিকটিকির মতো প্রায় পনেরো হাত খাড়াই বেয়ে খরস্রোত জলের মধ্যে ঝুপ করে নামল। সেখানে জলের স্রোত এমন প্রবল যে, হাতি অবধি ভেসে যায়। কিন্তু রাঘব ভেসে গেল না। এমনকী, খুব একটা টললও না। জলের মধ্যে টুপ করে ডুব দিল সে। ডুব দিয়ে গভীর থেকে গভীরে নেমে গেল। একদম তলায় যখন নামল, তখন তার কাছ থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে পাতালের এক গহিন গহ্বর। নদীর জল চোরাস্রোতে বিভীষণ বেগে সেই গহ্বরে ঢুকে যাচ্ছে। একটু পা হড়কালেই সেই গহিন গহ্বরের উন্মত্ত জলরাশি কোথায় কোন্ পাতালগঙ্গায় টেনে নিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। অন্ধকারে একবার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে রাঘবরাজা গহ্বরটার দিকে চাইল। সামনে নদীর পাড়টা যেখানে এসে নীচে ঠেকেছে সেখানে ইটের ফাঁকে একটা সংকীর্ণ ফাটল। রাঘব ধীর পায়ে সেই ফাটলের মধ্যে ঢুকল। তারপর কতগুলো খাঁজ বেয়ে উঠে এল খানিকটা ওপরে।

মাটির নীচে অনেকগুলো সুড়ঙ্গের মতো পথ চলে গেছে নানা দিকে। রাঘব সামনের পথটা ধরে একটু নিচু হয়ে লম্বা পা ফেলে দ্রুত এগিয়ে চলল। ক্রমে সুড়ঙ্গটা চওড়া হতে হতে একটা মস্ত হলঘরের মতো জায়গায় এসে শেষ হল। সুড়ঙ্গটা পাথর দিয়ে বাঁধানো। দেয়ালে অনেক কুলুঙ্গি। একধারে একটা মস্ত কাঠের বাক্সের ওপর বিছানা পাতা। একটা দীপাধারে দীপ জ্বলছে। রাঘবের আস্তানা।

রাঘব ভেজা জামাকাপড় ছেড়ে শুকনো পোশাক পরল।

তারপর, দীপটা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল কুলুঙ্গির দিকে। কুলুঙ্গিগুলো বেশ চওড়া। প্রত্যেকটাতে একটা করে বড় কাঠের বাক্স, তাতে ঢাকনা দেওয়া। অনেকটা কফিনের মতো।

রাঘব প্রথম বাক্সটা খুলল। দীপের আলোয় দেখা গেল, বাক্সের মধ্যে একটা শুকনো মমির মতো মৃতদেহ। চামড়া কুঁচকে গেছে, চোখ কোটরে ঢোকানো, হাড়গুলো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। রাঘব ঢাকনাটা বন্ধ করে দিল। আর-একটা খুলল। এটার মধ্যেও আর একটা মৃতদেহ। তেমনি শুকনো, কোঁচকানো। একটার পর একটা বাক্স খুলল রাঘব। আবার বন্ধ করল। এ-সবই রাঘবের পূর্বপুরুষদের মৃতদেহ। বহুকাল আগে তাদের বংশে মৃতদেহ সংরক্ষণের প্রথা চালু হয়। প্রাসাদ থেকে একটি গুপ্ত সুড়ঙ্গপথে মৃতদেহগুলি এই পাতালঘরে এনে রাখা হত। সেই সুড়ঙ্গ এখন বুজে গেছে। নদীর তলা দিয়ে এখানে আসার পথটি আবিষ্কার করেছে রাঘব নিজেই।

কথা আছে, যদি রাঘবের কোনো বিপদ ঘটে তাহলে এইসব মৃতদেহ আর-একবার, শেষবারের মতো, জেগে উঠবে একদিন। জেগে উঠে তাদের বংশের দুলালকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবে। তারপর আবার ফিরে যাবে মৃতের জগতে।

রাঘব বুঝতে পারছে, আর দেরি নেই। ভোর হতে না হতেই সে শুরু করবে তার বিজয়-অভিযান। এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। অত্যাচার শুরু করলেই ভীরু, কাপুরুষ গাঁ-গঞ্জের লোকেরা পালাবে। একমাত্র বাধা ছিল শয়তান যোগেশ্বরের কয়েকজন চেলা। তা সেগুলোও সব নিকেশ হয়েছে। যোগেশ্বরের প্রধান চেলা ফটিকের এক বংশধর গৌরকে দিয়েই কাজ হাসিল করবে রাঘব। আর সেইটেই হবে যোগেশ্বরের ওপর তার প্রতিশোধ। না, রাঘবের আর কোনো বিপদ নেই। সুতরাং এইসব মৃতদেহও আর জাগবে না। এবার কাজ উদ্ধার হয়ে গেলে রাঘব মৃতদেহগুলি নদীর নীচের সেই গহ্বরে বিসর্জন দেবে।

বিছানায় জোড়াসনে বসে সে কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হল। চোখের সামনে ভেসে উঠল তার ভাবী রাজ্য। এই বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতেও সে এমন এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে, যা দেখে অবাক হয়ে যাবে লোকে। সেই রাজ্যে রাজাই হবে সবচেয়ে ক্ষমতাবান। প্রজারা বাস করবে অনুগত দাসের মতো। কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা থাকবে না। সামান্য বেয়াদবির শাস্তি হবে মৃত্যু।

ধ্যানস্থ অবস্থায় কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করল রাঘব। ধ্যানটা ভেঙে গেল। একটা শবাধারের ভিতরে একটু নড়াচড়ার শব্দ হল না? কান খাড়া করে শুনল রাঘব।

প্রদীপটা নিয়ে প্রথম কুলুঙ্গিটার কাছে গিয়ে ঢাকনাটা খুব ধীরে খুলল রাঘব। চিত হয়ে পড়ে থাকা মৃতদেহ পাশ ফিরে শুয়ে আছে।

রাঘব একটু চমকে উঠল। এ কী? মৃতদেহে কেন জাগরণের লক্ষণ?

আবার ধ্যানস্থ হল রাঘব। আবার অস্বস্তি। শবাধারে শব্দ। আর একটা মৃতদেহ পাশ ফিরল। তারপর আর একটা। আর একটা।

রাঘবের ঘাম হচ্ছে। তবু জোর করে ধ্যানস্থ হওয়ার চেষ্টা করল রাঘব। চোখ বুজেই শুনতে পেল, একটা শবাধারের ঢাকনা সরে যাচ্ছে।

রাঘব চোখ খুলল। শুকনো কঙ্কালসার একটি মৃতদেহ উঠে বসেছে। রাঘব ভ্রূকুটি করে চেয়ে রইল। আস্তে আস্তে মৃতদেহ কুলুঙ্গি থেকে নেমে আসার চেষ্টা করছে।

বিদ্যুৎগতিতে উঠে দাঁড়াল রাঘব। তারপর বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, "অসম্ভব! অসম্ভব! আমার সব শত্রুর নিপাত হয়েছে।"

শবদেহ তবু নেমে আসছে কেন?

রাঘব বিছানার পাশ থেকে একটা লম্বা তরোয়াল টেনে নিল হাতে। এই পাতালঘরে কোনো মানুষের পক্ষেই আসা সম্ভব নয়। ওই খাড়া পাড়, চোরা স্রোত, ঘূর্ণির ভিতর দিয়ে কে আসবে এখানে?

॥ ৯ ॥

চার বুড়ো মিলে নদীর ধারে একটা দড়ি ঝুলিয়ে বসে ছিল। দড়িটা টানটান হয়ে খরস্রোতের মধ্যে নেমে গেছে। দড়ির প্রান্তে গৌর। চারজন, অর্থাৎ কবরেজমশাই, ফকিরসাহেব, গোবিন্দচোর আর সুবলবুড়ো দড়িটা মাঝে-মাঝে টেনে দেখছে। না, এখনও গৌর দড়ি ছাড়েনি। এ-জায়গাটা বড় বিপজ্জনক। গৌর পারবে তো?

গৌর জলের তলায় নেমে ভয়ে চোখ বুজে ফেলেছিল প্রথমে। উত্তাল স্রোতের জল প্রথমটায় অনেকখানি টেনে নিয়েছিল তাকে। দড়ি ধরে আবার সে জায়গামতো ফিরেছে। কিন্তু জলের নীচে নেমে ঘূর্ণি দেখে তার মূর্ছা যাওয়ার যোগাড়। ওরেব্বাস, একটু পা পিছলে পড়লেই সর্বনাশ। পাতালে টেনে নিয়ে যাবে।

কিন্তু কিছুই হল না। আশ্চর্য এই, জলের তলায় দীর্ঘক্ষণ দমবন্ধ করে থাকতেও তার কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না। আর অন্ধকারেও সে বেশ দেখতে পাচ্ছিল।

ফাটলটা খুঁজে বের করতে তাকে বেশি বেগ পেতে হল না। ফাটলের মুখে পা দিয়ে সে দু'বার দড়িটা নাড়া দিয়ে ওপরে জানান দিল যে, সে নেমেছে।

আস্তে আস্তে সুড়ঙ্গ বেয়ে ওপরে উঠল সে। এখানে জল নেই। সে দম নিল। চারদিকে অনেকগুলো সুড়ঙ্গ গেছে। কোন্‌টায় যাবে সে। কবচটা একবার স্পর্শ করতেই মাথাটা যেন পরিষ্কার হয়ে গেল। ওই তো সামনের পথ!

গৌর এগোতে লাগল। খুব ধীরে-ধীরে এবং নিঃশব্দে। ভোর হতে আর দেরি নেই। ভোর হলেই কবচের ক্ষমতা শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং তাড়াতাড়ি করা দরকার। কিন্তু গৌর এটাও জানে, তাড়াতাড়ি করতে গেলে বিপদ বেশি।

সুড়ঙ্গটা চওড়া হচ্ছে। ক্রমে ক্রমে একটা মস্ত হলঘরের চেহারা

নিচ্ছে।

গৌর থমকে দাঁড়াল। অবাক হয়ে দেখল, পাতালে এক আশ্চর্য ঘর। পাথর দিয়ে তৈরি। মাঝখানে একটা দীপ জ্বলছে।

কিন্তু ও কী? ওরা কারা? পাথরের অনেক তাক চারদিকে। প্রত্যেকটা তাকে একটা করে লম্বা কাঠের বাক্স। আর সেইসব বাক্স থেকে কঙ্কালসার, মস্ত মস্ত মাকড়সার মতো ওরা কারা নেমে আসছে? মানুষ? মানুষ কি এরকম হয়?

হঠাৎ একটা অমানুষিক তীব্র আর্তনাদে ঘরটা ভরে গেল। গৌরের সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করে উঠল সেই শব্দে। মৃতদেহগুলি একসঙ্গে তীব্র নাকি সুরে চিৎকার করতে লাগল! "মার! মার! শত্রু মার! মার! মার! আপদ মার! নির্বংশ হ! নরকে যা!"

চারদিক থেকে মৃতদেহগুলো এগিয়ে আসতে থাকে গৌরের দিকে। কেমন যেন কাঁকড়ার মতো, মাকড়সার মতো চলার ভঙ্গি। চোখ কোটরে, দাঁত বেরিয়ে আছে, হাড়গুলো থেকে চামড়া ঝুলে, ঝুলে পড়ছে। বাসী, শুকনো, কবেকার মড়া! তবু আসছে, এগিয়ে আসছে!

গৌর প্রথমটায় নড়তে পারেনি ভয়ে। কিন্তু হঠাৎ যেন কে তাকে একটা ধাক্কা দিল। চনমন করে উঠল রক্ত। ট্যাঁক থেকে কবচটা খুলে সে মুঠোয় নিল। তারপর খুব দুঃসাহসে ভর করে একটা লাফ মেরে সামনে যে মড়াটা পেল, সেটাকে সাপটে ধরল।

কিন্তু ধরতেই বেকুব বনে গেল গৌর। মড়াটা যেন ধুলোবালি দিয়ে গড়া। সে ছুঁতেই ঝুরঝুর ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে গেল মেঝেয়। চিহ্নমাত্র রইল না। এই আশ্চর্য কাণ্ড দেখে গৌর অবাক। কিন্তু অবাক হয়ে থেমে থাকার উপায় নেই। সময় আর খুব কমই আছে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে কবচের খেলা শেষ হয়ে যাবে। গৌর আর-একটা মড়াকে ছুঁল। আর একটা। ঝুরঝুর ঝুরঝুর করে মৃতদেহগুলি ধুলোবালির মতো মিলিয়ে যেতে লাগল একে একে।

শুধু দুটো মড়া একটু তফাতে রয়ে গেল। কাছে আসছিল না। গৌর লক্ষ করল, এ মড়াদুটো অন্যগুলোর মতো তেমন শুঁটকো নয়। চোখও কোটরগত নয়, চামড়াও ঝুলে পড়েনি। একটু রোগাভোগা মানুষের মতোই দেখতে। গৌর তাদের দিকে দু'পা এগোতেই মড়াদুটো চোঁ-চাঁ দৌড়ে একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে পালাল। গৌর তাদের পিছু নিল না। মড়া মেরে আর লাভ কী? এখন তাড়াতাড়ি রাঘবের নাগাল পাওয়া দরকার।

কিন্তু কোথায় রাঘব? গৌর চারদিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল। সময় কত হল তা বুঝতে পারছে না গৌর। কিন্তু ভোর হতে যে আর দেরি নেই সেটা সে জানে। গৌর দৌড়োতে লাগল। একবার এই সুড়ঙ্গে ঢোকে, আবার ওই সুড়ঙ্গে ঢোকে। চারদিকে একটা গোলোকধাঁধা, এর মধ্যে রাঘব কোথায় লুকিয়ে আছে, তা কে বলবে!

ক্রমে ক্রমে ভারী হতাশ হয়ে পড়তে থাকে সে। একটু ভয়ও হয়। রাঘব তো সোজা লোক নয়। মাটির তলায় একটা ভ্যাপসা গরম আর সোঁদা গন্ধ। গৌরের ঘাম হতে থাকে, ক্লান্ত লাগে। তার চেয়েও বড় বিপদ, এতক্ষণ সে অন্ধকারেও বেশ দেখতে পাচ্ছিল— কবচেরই গুণ হবে, কিন্তু এখন আস্তে আস্তে চারদিকটা অন্ধকার হয়ে আসছে। গৌর বুঝল, কবচের তেজ নিঃশেষ হয়ে এল প্রায়। আর বেশিক্ষণ নয়।

গৌর সুড়ঙ্গের মধ্যে একটা বাঁক ঘুরে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। সামনেই কিছু দূরে একটা পিদিম জ্বলছে। একটা ছায়া আড়ালে সরে গেল।

"কে ওখানে?" গৌর জিজ্ঞেস করে।

একটা গমগমে গলা বলে ওঠে, "এসো গৌর, আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি।"

রাঘব! রাজা রাঘব! গৌর হাতের নিষ্ফলা কবচটার দিকে

একবার তাকাল।

রাঘবের গমগমে গলা বলে উঠল, "কবচের খেলা শেষ হয়ে গেছে গৌর। তোমার খেলাও। এগিয়ে এসো। পালাবার পথ নেই!"

গৌর আস্তে-আস্তে এগিয়ে গেল। পিদিমের আলোয় সুড়ঙ্গের মধ্যে একটা চওড়া ঘর দেখতে পেল গৌর। রাঘবকে দেখা যাচ্ছিল না। গৌর ঘরটার মাঝামাঝি এসে দাঁড়াল। চারদিকে তাকিয়ে দেখল, দেওয়ালে অনেক খাঁজ, অনেক কোটর।

দেওয়ালের একটা খাঁজের আড়াল থেকে কালান্তক যমের মতো বেরিয়ে এল রাজা রাঘব। দুটো চোখ ধকধক করে জ্বলছে। মুখটা গ্র্যানাইট পাথরের মতো কঠিন। পিদিমের আলোয় তার দীর্ঘ ছায়াটা ছাদে পৌঁছে গেছে।

গৌর রাঘবের চোখে চোখ রাখতেই কেমন যেন অবশ নিথর হয়ে এল। হাত পা সব যেন শিথিল। তার ফের হাঁটু গেড়ে বসতে ইচ্ছে করছিল রাঘবের সামনে। অস্ফুট কণ্ঠে সে বলল, "হুজুর!"

রাঘব একটু হাসল। ডান হাতখানা আশীর্বাদের ভঙ্গিতে তুলে বলল, "তুমি বাহাদুর ছেলে। কিন্তু বিপজ্জনক। একবার তোমাকে ক্ষমা করে ভুল করেছি। আর নয়। এগিয়ে এসো।"

"যে আজ্ঞে, হুজুর।"

গৌর এগিয়ে যায়।

"মাথা নিচু করো ক্রীতদাস। ভয় নেই, তোমাকে আমি বেশি কষ্ট দিয়ে মারব না। গলাটা শুধু এক কোপে কেটে ফেলব।"

গৌরের ভারী আহ্লাদ হয়। সে একগাল হেসে বলে, "হুজুর খুশি হলেই আমার আনন্দ। কাটুন হুজুর। একবার শুধু মরার আগে যদি একটু পায়ের ধুলো পেতাম হুজুর।"

রাঘব ভ্রুকুটি করে বলে, "পায়ের ধুলো? ঠিক আছে ক্রীতদাস। নাও।"

গৌর যখন নিচু হয়ে রাঘবের পায়ের দিকে হাত বাড়িয়েছে, তখন এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে সে থমকে হাঁ করে চেয়ে রইল। রাঘবের দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে পিছন দিকে অন্ধকারের মধ্যে সে দেখল, যে মড়াদুটো পালিয়ে গিয়েছিল, তারা ঘাপটি মেরে বসে জুলজুল করে তার দিকে চেয়ে আছে।

"কী হল গৌর?"

গৌর জবাব দিল না। মড়াদুটোর চোখ দিয়ে যে তীব্র রশ্মি ছুটে এল, তা যেন গৌরের গায়ে ছ্যাঁকার মতো লাগল। হঠাৎ যেন শরীরটা কেঁপে উঠল। মাথাটার ঝিমঝিমুনি ভাবটা কেটে গেল।

রাঘব তরোয়ালটা ধীরে ধীরে ওপরে তুলছিল। কিন্তু আচমকাই গৌর তার পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চোখের পলকে উল্টে দিল রাঘবকে। দশাসই শরীরটা ধমাস করে যখন পড়ল, সমস্ত সুড়ঙ্গটা কেঁপে উঠল।

কিন্তু এত সহজে কাবু হওয়ার লোক তো রাঘব নয়। পড়তে না পড়তেই সে আবার তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। কিন্তু গৌর প্রস্তুত ছিল। কাবাডি খেলার সব কলাকৌশলই যেন তার শরীরে কিলবিল করছে। তরোয়ালসুদ্ধু রাজা রাঘবের হাতখানা ধরে সে এক মোচড়ে অস্ত্রটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তার শরীর রাগে, ঘেন্নায় নিশপিশ করছে। সম্মোহন কেটে গেছে। এখন—হয় রাঘব, নয় সে।

রাঘব যে সাঙ্ঘাতিক শক্তিশালী পুরুষ, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার আসল শক্তি হল সম্মোহন। তার চোখের দিকে তাকালেই প্রতিপক্ষ দুর্বল হয়ে বশ মেনে নেয়। সেই সম্মোহনের জাল কেটে বেরিয়ে এসেছে গৌর। রাঘবের গায়ে যত জোরই থাক, গৌরও তো ভেড়া নয়।

দুজনের তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলতে লাগল। কখনও রাঘব তার গলা টিপে ধরে, কখনও গৌর তার কোমর ধরে প্যাঁচ মেরে ফেলে দেয়। কখনও রাঘব তার ঘাড়ে রদ্দা চালায়, কখনও গৌর তার ঠ্যাং ধরে উল্টে ফেলে দেয়।

মড়া দুটো ঘাপটি মেরে বসে সবই দেখছিল। একজন মাথা নেড়ে বলল, "হচ্ছে না।"

আর-একজন বলল, "তাহলে মুষ্টিযোগ দিই?"

"দাও।"

তখন একজন মড়া খুব চিকন সুরে বলে উঠল, "রাঘবের চুলে আরশোলা।"

এই শুনে রাঘব বে-খেয়ালে নিজের চুলে হাত দিল।

গৌর অবাক হয়ে দেখল, নিজের চুলে হাত দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে রাঘব চোখ উল্টে গোঁ-গোঁ আওয়াজ করতে-করতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

বেকুবের মতো কিছুক্ষণ রাঘবের দিকে চেয়ে রইল গৌর। তারপর তার নজর পড়ল, মড়া দুটোর ওপর। সেইরকম ঘাপটি মেরে বসে তাকে জুলজুল করে দেখছে।

"তবে রে? এবার তোদেরও ব্যবস্থা করছি!" বলে গৌর তাদের দিকে তেড়ে যেতেই মড়া দুটো ভয়ে সিঁটিয়ে গেল।

একটা মড়া বলে, "উহুঁ উহুঁ, ছুঁসনি রে হতভাগা! তফাত থাক! আমরা মড়া নই!"

"তবে কী?"

দাঁত খিঁচিয়ে মড়াটা বলল, "আমি ফটিক। তুই আমার নাতির নাতি। আমাদের দেবদেহ, ওই এঁটোকাঁটা নরদেহ নিয়ে আমাদের ছুঁলে মহাপাতক হবে।"

ফটিক! গৌর হাঁ হয়ে গেল।

মড়া দুটো উঠে দাঁড়িয়ে গা ঝাড়া দিল। ফটিক বলল "সারা জীবন লড়াই করেও রাঘবকে কাবু করতে পারবি না। ক্রমে-ক্রমে তোকে হাফসে-হাফসে মেরে ফেলত। তাই মুষ্টিযোগটা কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছিলাম।"

গৌর অবাক হয়ে বলল, "মুষ্টিযোগ কী?"

"রাঘবের নিয়তি ওর চুলে। চুলে হাত দিলেই ওর পতন। তা এমনিতে কিছুতেই চুলে হাত দেওয়ার লোক নয় রাঘব। তোর সঙ্গে লড়াই করতে-করতে যখন আনমনা হয়ে গিয়েছিল, তখনই কৌশলটা কাজে লাগালুম। এখন আমরা চলে যাচ্ছি। আর দেখা পাবি না।"

বলতে না বলতেই দুজন অন্ধকার একটা রন্ধ্রে ঢুকে সরে পড়ল।

গৌর পিছন থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ফটিকদাদু, উনি কে?"

"যোগেশ্বরবাবা।"

হাউ মাউ আর খাউকে দাদা বাড়ি থেকে তাড়িয়েছে। গৌরের এখন খুব খাতির বাড়িতে। গোরু চরাতে হয় না, লোক রাখা হয়েছে। বাসন-টাসন বউদিই মাজে। গৌর পেট ভরে চারবেলা ভালমন্দ খায়।

কবরেজমশাই, ফকিরসাহেব, গোবিন্দ, সুবল, যে যার কাজকর্ম করে। সবই আগের মতো। নদীর ধারে দুপুরের দিকে একটা লম্বা লোক জমি চাষ করে হালগোরু নিয়ে। লোকটা কে, তা গাঁয়ের লোক খুব ভাল করে জানে না। শুধু জানে, লোকটাকে খানিকটা চাষের জমি আর বাস্তু দিয়েছেন কবরেজমশাই।

লোকটা আর কেউ নয়, রাজা রাঘব।

কালাচাঁদজ্যাঠার কালোয়াতি

অশেষ চট্টোপাধ্যায়

"শৈবাল এল না কেন রে ?" কিটু জিজ্ঞাসা করল গাবলুকে খেলার মাঠে। "আসবে কী করে," গাবলু বলল, "তার সারা গায়ে এখন ভূমিকম্প। বাড়ির সব লেপকম্বল চাপা দিয়েও থামানো যাচ্ছে না।"

"বলিস কী রে, হয়েছেটা কী ?"

"শুনলাম ম্যালেরিয়া। আবার নাকি হচ্ছে মাঝেসাঝে। আমাদের বাড়ির কাজের লোক গোপালের মা আজ তিন দিন আসছে না। তার গোপালটি এসে বলে গেল মায়ের ম্যালোয়ারি হয়েছে।"

খেলার মাঠ বলতে যে জমিটুকু তাতে একটা মাঝারি বাড়ির একফালি বাগানের জায়গা হতে পারে বড় জোর। কলকাতা শহরে এটুকু জায়গাও খালি পড়ে থাকার নয়। এই পাড়াতেই পুরনো বাড়ি ভেঙে দু-দুটো ঢ্যাঙা বাড়ি উঠছে। এখনই তাদের ওপর থেকে হাওড়ার ব্রিজ দেখা যায়। এই জমিটার মালিকানা নিয়ে শরিকি গোলমাল আছে নাকি। তাই বছরের পর বছর পড়েই আছে। কিটু-গাবলুর বাবা-কাকারাও এখানেই খেলত। পাড়ার হরেকরকম পুজোর সময় ঠাকুরদেবতারা জমির দখল নেন। কিটুদের ক্লাব দুর্দম সঙ্ঘ ছাড়াও কিছু গোঁফ-গজানো ছেলেদের ক্লাব দুদ্দাড় সঙ্ঘেরও এজমালি খেলার মাঠ এটাই। আজ দুর্দম সঙ্ঘের খেলোয়াড়দের জমায়েত হতে কিছু দেরি হয়েছে। এই ফাঁকে দুদ্দাড় সঙ্ঘের ছেলেরা বল পেটাতে শুরু করে দিয়েছে। এদের অনেকেই জিরিয়ে-জিরিয়ে স্কুলের এক ক্লাস থেকে আর এক ক্লাসে ওঠে। কয়েকজন নিয়মিত দাড়ি কামায়। কিটুরা লেখাপড়ায় ওদের থেকে এগিয়ে। প্রায় সকলেই সামনের বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। কিন্তু মাঠ বেদখল দেখেও ওদের ঘাঁটাল না। রাস্তার ওপারের রোয়াকে এসে বসল।

পিণ্টু ফুটপাথের ওপর বলটা ড্রপ দিতে দিতে বলল, "বাবার কাছে শুনেছি আগেকার দিনে ম্যালেরিয়া হলে রোগীদের নাকি গাদা-গাদা কুইনাইন খাওয়াত। আর তাই খেয়ে কেউ-কেউ আবার বদ্ধ কালা হয়ে যেত।"

"হতে পারে," কিটু একটু ভেবে বলল, "আমার এক ঠাকুর্দা ডাক্তারি পাশ করেও কোনোদিন ডাক্তার হতে পারেননি ওই বেশি কুইনাইন খেয়ে কালা হয়ে যাবার জন্যে।"

ভণ্টুর আরেক নাম টিউব-লাইট। শুনেই সব কথা সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারে না। সে বলল, "কানে শুনতেন না বলে ডাক্তার হতে পারলেন না কেন ?"

"সাধে টিউব-লাইট বলে," কিটু ঝেঁঝে উঠে বলল, "যে ডাক্তার স্টেথসস্কোপে রুগির হার্ট-বিট শুনতে পায় না, সে কী করে ডাক্তারি করবে ?"

ভণ্টুর মুখ দেখলে মনে হয় যেন খালি পায়ে গোবর মাড়িয়ে ফেলেছে। গাবলুও কিটুর সেই ঠাকুরদার ডাক্তার হতে না পারার রহস্যটা ধরতে পারেনি। তাই তাড়াতাড়ি বলল, "তাহলে উনি কী করতেন ? হোমিওপ্যাথি, কবিরাজি, নাকি হেকিমি ?"

"ও সব কিছুই করেননি," গম্ভীরভাবে বলল কিটু, "তবে মাঝেসাঝে সার্জারি করতেন।"

"সার্জারি ?" গাবলুর সঙ্গে আরো কতকগুলো গলা মিশে প্রশ্নটা কোরাসের চেহারা নিল।

"হ্যাঁ, সার্জারি। রোজগারের ভাবনা বিশেষ ছিল না। আমার গ্রেট গ্র্যাণ্ড ফাদার ভাল পয়সাকড়ি রেখে গিয়েছিলেন। বাড়ির একতলায় ছিল একটা চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি। তার অনারারি সার্জেন ছিলেন আমার সেই ঠাকুর্দা। মানে গরিব লোকদের ফোড়াটোড়া কাটতেন আর কি। তা ছাড়া কালা হবার দরুন একটা বাড়তি সুবিধে ছিল। বল তো সেটা কী ?" কিটু চট করে কথার শেষে একটা প্রশ্নের বঁড়শি লাগিয়ে দিল।

সবাই বোবা। চোখগুলো ঘুরছে শুধু। কিটুকে গল্পটা বলার

ঝোঁকে পেয়েছে। তাই বেশিক্ষণ ঝুলিয়ে রাখল না। নিজের বানানো ধাঁধার জবাব নিজেই দিয়ে দিল। বলল, "উনি কখনো অ্যানেসথেসিয়া ব্যবহার করতেন না। ফোড়া কাটার সময় রোগী যতই চেঁচাক উনি কিছুই শুনতে পেতেন না। সঙ্গে বিস্কুট রাখতেন। বাচ্চা ছেলেমেয়ে হলে হাঁ-করা মুখে একটা বিস্কুট পুরে দিয়ে বলতেন, "অত হাঁ করিস না, মুখের মধ্যে মাছি ঢুকে যাবে।"

সকলে জবাব দিতে না পারার অস্বস্তিটা তাড়াতাড়ি একটা পাতলা হাসির পরতে মুড়ে দিল। ভণ্টু একটু বেশি শব্দ করে হাসল।

"আমার বড় মাসি একেবারে শুনতে পান না কানে," পিণ্টু বলল, "কী জানি কী অসুখ হয়েছিল, তার পর থেকে বাজ পড়লেও শুধু বিদ্যুতের ঝলক দেখেন, কানে কিছু শোনেন না। বল্ তো মেসো আর মাসি কথা বলেন কী করে?" কিটুর দিকে তাকিয়ে বলল পিণ্টু।

কিটু এমনিতে বেশ চালাকচতুর ছেলে। সব সময়েই চেষ্টা করে কথাবার্তায় বুদ্ধির একটা বাড়তি পালিশ লাগাতে। থতমত খেয়ে চুপ করে যাবার ছেলে নয়। "তোর মাসি আশা করি বোবা নন।" কিটু বলল।

"মোটেই না, কথা বলেন, এবং ভীষণ চেঁচিয়ে বলেন।"

"তাহলে বোধহয় ঠোঁট নাড়া দেখে অন্যের কথা বুঝতে পারেন, যাকে বলে লিপ রিডিং।"

"হয়নি, হয়নি, ফেল, কাক্কেশ্বর কুচকুচের মতো মাথা নেড়ে বলল পিণ্টু, মাসির সঙ্গে থাকে স্লেট আর তার সঙ্গে দড়িবাঁধা পেনসিল। মেসো আর মাসি এখন দুজনেই খুব বুড়ো হয়েছেন, বাড়ির বারান্দায় সারা বিকেল বসে থাকেন। মেসো কথা বলেন স্লেটে লিখে। মাসি সেই লেখা পড়ে জবাব দেন। কারুর বাড়ি গেলেও স্লেট নিয়ে যান।"

"আর কাটাকুটি খেলেন না?" ধারালো গলায় জিজ্ঞাসা করল কিটু। "হয়নি, হয়নি, ফেল।" শুনেই ওর ফর্সা মুখ লাল।

"আমার মাসি কিন্তু তোরও গুরুজন," ভারী গলায় বলল পিণ্টু।

কথাটা ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলেছিল কিটু। এবারে লজ্জা পেল। এক ভণ্টুই জোরে হেসে ফেলেছিল। কারুর মুখে হাসি নেই দেখে ঢোঁক গিলল। খেলার মাঠে একটা হল্লা। দুদ্দাড় সংঘের এক দল আরেক দলকে গোল দিল বোধহয়। সকলেরই চোখ নীচের দিকে। একটা অস্বস্তির খপ্পরে পড়ে গেছে। চুপচাপ বসে থাকার ছেলে কেউ নয়। একটু আগের হালকা মেজাজটা ফিরিয়ে আনার মতো কথা কারুর মনে আসছে না। সবাই এক সঙ্গে কথা হাতড়াচ্ছে।

"কালা মানুষও কিন্তু কখনো-কখনো একটা সাংঘাতিক কাণ্ড করে ফেলতে পারে," শুভ অনেকক্ষণ পরে মুখ খুলতেই সকলে তাকাল। সকলেই বুঝল একটা গল্পের আর্বিভাব আসন্ন। শুভর কথা সত্যি হলে ওর আত্মীয়-স্বজনরা সকলেই অতিমানব। কারুর শিকারের গল্প শুনলে মনে হবে জিম করবেট বা কেনেথ অ্যানডারসন গুলতি দিয়ে কাক তাড়িয়েছেন। কারুর আবিষ্কারের কাছে পেনিসিলিন বা অ্যাটম বোমা আবিষ্কারও হার মেনে যায়। এঁদের কেউ কখনো দেখেনি। সবাই শাপভ্রষ্ট দেবদূত। দু-দিনের জন্যে লীলাখেলা করতে পৃথিবীতে এসেছিলেন। এঁদের দেখতে চাইলে শুভ অমনি বলে দেয়, "এই তো গত বছর মার্চ কিংবা মে মাসে মারা গেলেন। গত বছর কথাটা সম্বন্ধে শুভর একটা অমানুষিক নিষ্ঠা আছে। অথচ এঁরা যে সময় এত সব তাক-লাগানো কাণ্ডকারখানা করেছেন, তাতে গত বছর পর্যন্ত জীবিত থাকলে এঁদের সকলকেই শতায়ু হতে হয়। শুভর গল্প শুরু হলে তবু কেউ রসভঙ্গ করে না। বরং উশকে দেয়। এক কিটু শুধু আড়ালে বলে, ঘনাদা।

"এই কালাশ্রেষ্ঠ কালাচাঁদ তোর কে ? মামা, না কাকা, না পিসে ?" সেই কিটুই আবার ঠাট্টার খোঁচা মেরে চাগিয়ে দিতে চাইল শুভকে।

"কেন তুই চিনতিস নাকি," শুভ যেন খুব অবাক হয়েছে এমন ভাব দেখিয়ে বলল, "আমার সেই সম্পর্কে জ্যাঠার সত্যি-সত্যি নাম ছিল কালাচাঁদ। কে জানে পরে একদিন কালা হবেন এবং কালা হয়েও চণ্ডীদাসের খুড়োর মতো অতুল কীর্তি রাখবেন জেনে ওঁর বাবা-মা আগেভাগেই কালাচাঁদ নাম রেখেছিলেন।"

কিটু নিজের কথা নিজেই গিলেছে দেখে সবাই খুব হাসল। পিণ্টু বলল, "আজ দুদ্দাড় সঙ্ঘ সহজে মাঠ ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না। বরং তোর কালাচাঁদজ্যাঠার কাণ্ডকারখানাই শুনি। তার আগে বল ইনি কালা হলেন কী করে ? বেশি কুইনাইন খেয়ে, না অসুখে ভুগে ?"

শুভ যে ভাবে পিণ্টুর দিকে তাকাল, একেই বোধহয় জ্বালাময়ী দৃষ্টি বলে। বলল, "তোর সেদিন কান পেকেছিল, আর হাঁচতে শুরু করলে একশো তিয়াত্তর বারের আগে থামতে পারিস না। তোর দৌড় জানা আছে।" একটু থামল শুভ। তারপর অনেকখানি নিশ্বাস টেনে বুকটা একটু চিতিয়ে বলল, "জানিস, কালাচাঁদজ্যাঠা দেশের জন্যে তাঁর কান বিসর্জন দিয়েছিলেন।"

"কী অরিজিনালিটি," তক্কে-তক্কে থেকে কেউ এতক্ষণে হাঁকড়াল, বীরেরা প্রাণ বিসর্জন দেয়, তোর কালাচাঁদজ্যাঠা কান-বিসর্জন দিলেন। তারপর থেকেই বোধহয় দু'কান-কাটা কথাটার চল হয়েছে ?"

"কিটু, তোকে যখন ক্লাসে অবনীবাবুস্যার বলেন, বাইরের দিকে তাকিয়ে আম্রপল্লব না গুনে আমার কথায় কান দাও, তখন কি তুই নিজের কানদুটো কেটে ডিশের ওপর সাজিয়ে স্যারের কাছে হাজির করিস," একটুও না চটে মিটিমিটি হেসে বলল শুভ।

সকলের হাসিকে থামিয়ে গাবলু বলল, "ওসব আজেবাজে কথা থাক। শুভ, গল্পটা এবার শুনি।"

"কালাচাঁদজ্যাঠা ইণ্ডিয়ান আর্মিতে ছিলেন," শুভ বলল, "সেভেণ্টি ওয়ানে পাকিস্তানের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় ওয়েস্টার্ন সেকটারে ওঁর ডাগ্‌-আউটের পনেরো গজের মধ্যে একটি একশো পঞ্চান্ন মিলিমিটারের কামানের গোলা ফাটে। সেই প্রচণ্ড শব্দে কালাচাঁদজ্যাঠার দুটো কানেরই পর্দা ফেটে গিয়ে কালা হয়ে যান। তা এই ব্যাপারটাকে দেশের জন্যে কান-বিসর্জন ছাড়া কী বলব ?" কিটু সকলের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল।

"তোর কালাচাঁদজ্যাঠা বুঝি আর্মিতে জেনারেল ছিলেন ?" কিটু তবু ফোঁস করতে ছাড়ে না।

"না," সেই রকম ঠাণ্ডা গলায় শুভ বলল, "কালাচাঁদজ্যাঠা লেখাপড়া বেশি শেখেননি। সাধারণ জওয়ান হয়ে ঢুকেছিলেন আর একাত্তরের লড়াইয়ের সময় ফোর্থ রাজপুতানা রাইফেল্‌সের সুবেদার মেজর ছিলেন। আর কোনো প্রশ্ন আছে ?" বলে ঠাণ্ডা চোখে শুভ তাকাল কিটুর দিকে।

শুভ বুঝল আর কেউ ফ্যাকড়া তুলবে না। তখন বলতে শুরু করল: "কালাচাঁদজ্যাঠা বাবার দূর সম্পর্কের দাদা। আত্মীয় হিসেবে হয়তো খুব কাছের নন। কিন্তু দেশে থাকতে আমাদের বাড়ির কাছেই থাকতেন। খুব ছোটবেলাতেই ওঁর দুটো বৈশিষ্ট্য সকলের নজরে পড়ে। একটা হল গায়ের জোর, আরেকটা খাবার ক্ষমতা। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওঁর এই দুটি প্রতিভার নানান কাহিনী সংখ্যায় বাড়তে থাকে। মাত্র তিন বছর বয়েসে একটা একসেরি দইয়ের হাঁড়ি চেটেপুটে পরিষ্কার করে ফেলেছিলেন। পাঁচ বছরে আচারের ভাগ কম দেওয়ায় তাঁর চেয়ে দশ বছরের বড় দাদাকে

ঘুসি মেরে হাসপাতালে পাঠান। সেই দাদা সেরে উঠে দুটি প্রতিজ্ঞা নেন। কালাচাঁদজ্যাঠার সঙ্গে আর কথা বলবেন না। জীবনে আর আচার খাবেন না। দুটি প্রতিজ্ঞাই তিনি শেষ পর্যন্ত রেখেছিলেন। সিকস্টি ফাইভে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সময় কালাচাঁদজ্যাঠা হাবিলদার মেজর। ডোগরাই বলে একটা জায়গায় একাই দুটো পাকিস্তানি পিল বকসের গুলি ছোঁড়ার ফুটোর মধ্যে হ্যাণ্ড গ্রেনেড গড়িয়ে দিয়ে বীরচক্র পেলেন। তার আগে একটা বুলেট উরুর মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। উনি নাকি বিশেষ টের পাননি। যুদ্ধের পর ছুটিতে বাড়ি এলেন। নানান আত্মীয়স্বজনের বাড়ি রোজ দু'বেলা নেমন্তন্ন। সেই দাদা তখন কলকাতায় কলেজের প্রিনসিপাল। কালাচাঁদজ্যাঠা তাঁর বাড়ি এসে তাঁকে প্রণাম করলে মুখটা ফিরিয়ে বললেন, 'ব্যাটাচ্ছেলের বীরচক্র পাওয়ার পেছনে আমারও ক্রেডিট আছে। আমার ওপর দিয়েই তো পয়লা চোটটা গিয়েছিল।' তারপর নিজের স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, 'গুণ্ডাটা খেতে ভালবাসে। এবেলা এমন করে গেলাও যাতে ওবেলাও এখানেই গিলে যেতে বাধ্য হয়।' বলে ফোঁত করে নাক টেনে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

"তোরা সকলেই জানিস যে, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক টমাস আলভা এডিসন ছোটবেলায় এক রেল-কর্মচারীর কাছে থাপ্পড় খেয়ে বাকি জীবন এক কানে কম শুনতে পেতেন। কালাচাঁদজ্যাঠা লেখাপড়া ছাড়া কোনো কিছুতেই ভয় পাননি। কিন্তু তাহলেও বিদ্যোৎসাহী লোক ছিলেন। অনেককেই এডিসন বানাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর হাতে চড় খেয়ে এক কানে কালা কিছু লোক হয়তো এখনো বেঁচে আছে। কিন্তু চড় হজম করে আবার হেঁটেচলে বেড়ানো ছাড়াও অন্য প্রতিভা দরকার। সেই প্রতিভা না থাকায় সেই সব লোক অজানা অখ্যাত হাফ-এডিসন হয়ে থেকে গেল।

"কালাচাঁদজ্যাঠা বামুনের ছেলে। পৈতে হবার পর ভিন গ্রাম থেকেও ব্রাহ্মণ-ভোজনের নেমন্তন্ন পেতেন। সেই ছোটবেলাতেই গায়ের জোর ছাড়াও খাইয়ে বলে তাঁর নামডাক অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। এক কায়স্থ-বাড়ির গিন্নি কালাচাঁদজ্যাঠার খাওয়া দেখে গলায় আঁচল দিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করেছিলেন। ভোজন-দক্ষিণা হিসেবে অন্য ব্রাহ্মণদের বরাদ্দ ছিল একটি করে রুপোর টাকা। কালাচাঁদজ্যাঠা পেয়েছিলেন পাঁচটি টাকা এবং একটি পুরনো গরদের জোড়। অন্য ব্রাহ্মণরা আড়-চোখে এই বাড়তি পাওনাটা দেখেছিলেন। কিন্তু কালাচাঁদজ্যাঠার অন্য খ্যাতির কথাও তাঁদের জানা ছিল। তাই এই নিয়ে আর কেউ কিছু বলেননি। বা বললেও বাড়ি ফিরে ঘরের লোকদের কাছে গাঁইগুঁই করে থাকতে পারেন।

"গ্রামে ভাল স্কুল না থাকায় কালাচাঁদজ্যাঠাকে শহরে পাঠানো হয়। এক মামার বাড়ি থেকে স্কুলে যাতায়াত করার কথা। সেই মামা এক সপ্তাহের মধ্যে কালাচাঁদজ্যাঠার বাবাকে খবর পাঠালেন—এই ভাগনেটি তাঁর বাড়িতে থাকলে তাঁর পুরো পরিবারের মাসে যা চাল, ডাল ইত্যাদি লাগে তার বাজার তাকে এখন প্রতি সপ্তাহে এবং অদূর ভবিষ্যতে তিন-চার দিন অন্তর করতে হবে। অগত্যা কালাচাঁদজ্যাঠাকে হোস্টেলে দেওয়া হল। অল্প দিনের মধ্যে স্কুলের হেডমাস্টার, যিনি কালাচাঁদজ্যাঠার বাবার সহপাঠী ছিলেন, জানালেন—একজনের হোস্টেল চার্জে সাতজনকে খাওয়ানো স্কুলের সাধ্য নয়। সুতরাং কালাচাঁদজ্যাঠার হোস্টেল খরচা যেন অন্তত চার গুণ করা হয়। তা ছাড়া খাবার সময় কালাচাঁদজ্যাঠার পাশে কেউ বসতে রাজি না হওয়ায় পুরো একটা বেঞ্চি ওঁর খাসদখলে। যারা ভুল করে আগে বসেছিল, তারা ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাওয়া শেষ করতে বাধ্য হয়। শেষ পর্যন্ত কালাচাঁদজ্যাঠার বাবাকে হোস্টেল চার্জ ডবল করতেই হল।

"তবে লেখাপড়া নিয়ে বেশি দিন ধস্তাধস্তি করতে হল না কালাচাঁদজ্যাঠাকে। এর মধ্যে এসে গেল স্বাধীনতা আর দেশভাগ। কালাচাঁদজ্যাঠারা চাটিবাটি তুলে চলে এলেন এ-দেশে। এসে কিন্তু মুশকিলে পড়ে গেলেন। রাতারাতি অবস্থা পড়ে গেল। সাধারণ-মাপের পেটের খাবার জোগাতেই প্রাণান্ত। কালাচাঁদজ্যাঠার মতো লোকের পেট ভরাতে তো পুরো ফ্যামিলির খাবার দরকার। পূর্ব বাংলার লোক অসুখ-বিসুখ না হলে রুটি খায় না। কথায় বলে খিদের জ্বালায় বাঘেও ঘাস খায়। তা কালাচাঁদ জ্যাঠাও রুটি, ছাতু সব খেতে শিখলেন। কিন্তু ভাত, রুটি, ছাতু সব মিলিয়েও পেট ভরে না। সেই অ্যাসটেরিকস কমিকসের ওবেলিস্কের অবস্থা। পেটের মধ্যে এক রাক্ষুসে ছ্যাঁদা। খাবার সঙ্গে সঙ্গে সব হজম। এই সময় কার কাছে শুনলেন কালাচাঁদজ্যাঠা, আর্মিতে লোক নিচ্ছে। চলে গেলেন ফোর্ট উইলিয়ামে। টিংটিঙে চেহারার বাঙালির ছেলেদের মধ্যে কালাচাঁদজ্যাঠাকে দেখে রিক্রুটিং অফিসারেরও তাক লেগে গেল। তখন কালাচাঁদজ্যাঠার বয়স আঠারো। লম্বায় পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি। বুকের ছাতি বেয়াল্লিশ ইঞ্চি। ওজন বাহাত্তর কে জি। সিলেকশান হতে সময় লাগল না। ইণ্ডিয়ান আর্মি কালাচাঁদজ্যাঠার খাওয়া-পরার দায়িত্ব নিল। আর্মি তাঁকে শুধু এক ধরনের লড়াই শেখাল না। বছর-পাঁচেকের মধ্যে সার্ভিসের হেভি ওয়েট রেসলিং টিমে কালাচাঁদজ্যাঠার নাম।"

দম নেবার জন্যে থামল শুভ। ফাঁক পেতেই পিণ্টু বলল, "এতক্ষণ ধরে তোর কালাচাঁদজ্যাঠা সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানলাম। শুধু জানা হল না উনি নিজের নামকে সার্থক করার পরের সাংঘাতিক কাণ্ডকারখানার ব্যাপারটা।"

"গল্পে একটা টেকনিক আছে," শুভ পিণ্টুর কথা গায়ে না মেখে বলল, "মেইন ক্যারাকটার, তার ব্যাকগ্রাউণ্ড, এ সব জানা দরকার। সব গল্পই নাটশেলে দু-লাইনে বলা যায়। তবে আর লেখকরা অত ধানাইপানাই করেন কেন। তবে তোর যখন এতই ট্রেন ধরার তাড়া, তখন সংক্ষেপেই সারছি।"

গল্পের খেইটা ফের ধরে ফেলল শুভ। "কালাচাঁদজ্যাঠার কাছে আর্মিই ঘর, আর্মিই সংসার। বিয়েথা করেননি। একটা জিনিস জানবি, সব দেশের আর্মিতেই, ইণ্ডিয়ান আর্মিতে তো বটেই, জে সি ও অর্থাৎ জুনিয়ার কমিশান্ড অফিসারদের একটা আলাদা ইজ্জত আছে। পদমর্যাদায় এরা সেকেণ্ড লেফটেন্যান্টেরও নীচে। কিন্তু ন্যাশানাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি থেকে শুধু থিওরি পড়ে পাশ করা খাজা অফিসারদের যুদ্ধবিদ্যায় হাতেকলমে তালিম হয় বহু সামনাসামনি লড়াইয়ে হাতপাকানো এই অভিজ্ঞ জে সি ও-দের কাছে। ব্যাটালিয়নের কম্যাণ্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাহেবও এদের সম্মান করেন। 'সুবেদারসাব আপ' বলে কথা বলেন। কালাচাঁদজ্যাঠা ফর্টি এইটে কাশ্মিরে পাকিস্তানি হামলা থেকে আরম্ভ করে সেভেন্টি ওয়ান পর্যন্ত সব যুদ্ধে লড়েছেন। বীরচক্র ছাড়াও পেয়েছেন শৌর্যচক্র। অজস্র বার ডেসপ্যাচে মেনশানড হয়েছেন। আর্মি হাসপাতাল অবশ্য ওঁর ফাটা ইয়ার ড্রাম তাপ্পিতোপ্পা দিয়ে মেরামত করে দিল। কিন্তু হিয়ারিং এড ছাড়া ভাল শুনতে পান না। রিটায়ারমেন্টের তখনো দু-তিন বছর বাকি। কিন্তু আর্মি ওঁকে বদলি করল রসদ সাপ্লাই দেবার ডিপার্টমেণ্ট আর্মি সার্ভিস কোরে। কালাচাঁদজ্যাঠা খাঁটি ইনফ্যান্ট্রি ম্যান। বুঝলেন, কালা লোক ইনফ্যান্ট্রিতে চলবে না বলে এই নিরামিষ উর্দিপরা কেরানির চাকরিতে তাঁর বদলি। কালাচাঁদজ্যাঠা আগেভাগে রিটায়ার করার জন্যে দরখাস্ত করলেন। ওপরওলা কর্তারা অনেক বোঝালেন। কিন্তু কালাচাঁদজ্যাঠার এক গোঁ—আর্মিতে থাকলে ইনফ্যান্ট্রিতেই থাকব, নইলে নয়। ওঁর জিদই বজায় থাকল। নানান লড়াইয়ে পাওয়া এক গাদা মেডেল আর ওঁর সব চেয়ে দামি পার্থিব সম্পদ বিবেকানন্দ আর নেতাজি সুভাষের দু-খানা ছবি নিয়ে আর্মি

ছাড়লেন। জীবনে কোনো নেশা করেননি। চা পর্যন্ত খান না। যতদিন ফৌজে ছিলেন, ততদিন প্রায় কোনো খরচই লাগেনি। এত বছরের জমানো মাইনে, তা ছাড়া প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি সব মিলিয়ে ভাল টাকাই ছিল হাতে। এর ওপর পেনশান তো আছেই। এবারে একটু থিতু হয়ে বসা দরকার। কিন্তু কলকাতায় নয়। ভিড়ে আর ধোঁয়া-ধুলোয় দম আটকে আসে। কলকাতায় সেই দাদার বাড়ি সেণ্টার করে জমির খোঁজে কালাচাঁদজ্যাঠা চরকি ঘুরাতে লাগলেন। দাদা অবশ্য ততদিনে গত হয়েছেন। বৌদি বলেছিলেন ওখানেই থেকে যেতে। কালাচাঁদজ্যাঠা বললেন, 'কভি নেহি।' এত কাল ফৌজে কাটিয়ে কথার মধ্যে হিন্দি পাকাপোক্তভাবে বাসা বেঁধেছে। প্ল্যান ঠিক করেছেন—অনেকখানি জমি নিয়ে চাষবাস করবেন। সেই সঙ্গে একটা কুস্তির আখড়া। রোগা প্যাংলা বাঙালি ছেলেদের দেহে-মনে তাগদ আনতে হবে। আর্মির তাবত ট্রেনিং নিয়েছেন—কম্যাণ্ডো, প্যারা, আনআর্মড, কমব্যাট। এখন চেলা চাই। চেহারা এখনো বুলডোজারের মতো। একটাই অসুবিধে। কানের কাছে মুখ এনে গাঁক-গাঁক করে না চেঁচালে শুনতে পান না। হিয়ারিং এড্ আছে। কিন্তু ব্যবহার করতে নারাজ। যন্ত্রটা লাগালে নাকি কানে সুড়সুড়ি লাগে। তা ছাড়া হিয়ারিং এড্ লাগানো মানেই তাবৎ লোককে জানানো—আমি কালা।

"সে দিন ক্যানিং লাইনের কোথায় গিয়েছিলেন জমির খোঁজে। মোটামুটি পছন্দ হল জায়গাটা। সন্ধের ট্রেন ধরে ফিরছেন শিয়ালদা। সারাদিন অনেক হাঁটাহাঁটি করেছেন। দুপুরবেলা জমির মালিক খাইয়েছিল ভাল। মনমেজাজ ভালই ছিল কালাচাঁদজ্যাঠার। মুড ভাল থাকলে বিবেকানন্দের 'মন চলো নিজে নিকেতনে' গানটি গাইতেন। ওই একটা গানই জানা ছিল। সেদিন সেইটেই গাইছিলেন। ট্রেন চলছে, থামছে, আবার চলছে। কালাচাঁদজ্যাঠার একটু ঝিমুনি-মতন এসেছিল। ঝিমুনি থেকে ঘুম। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লেও কালাচাঁদজ্যাঠার ভিতরকার ঝানু ইনফ্যান্ট্রিম্যানের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়টি সজাগ সেন্ট্রির কাজ করে। এই সিকস্‌থ সেন্‌সের জোরে লড়াইয়ের সময় মৃত্যুকে অ্যাবাউট টার্ন করিয়ে ছেড়েছেন।

"ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই সেই সেন্ট্রির হুকুমদার হাঁক শুনতে পেলেন। অমনি কান বাদ দিয়ে বাকি চারটি ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল। কালাচাঁদজ্যাঠা দেখলেন তাঁর সামনে একটা বেশ গাট্টাগোট্টা চেহারার বছর-কুড়ি বয়েসের ছেলে একটা ছ-ইঞ্চি ব্লেডের ছোরা ধরে কী জানি বলছে। ট্রেনে নানান ধরনের ফেরিওয়ালা ওঠে। কালাচাঁদজ্যাঠা বললেন, 'আমি ছুরি কিনব না। কুছ জরুরত নেহি। তুম দুসরা খরিদ্দার দেখো।' সামনের বেঞ্চের আধডজন লোক গল্‌ফ বলের মতো চোখে তাকিয়ে আছে। সকলেরই মুখ হাঁ-করা। সামনে দাঁড়ানো ছেলেটি চিৎকার করে কী যেন বলে ছুরির ফলাটা আরো এগিয়ে নিয়ে এল। কী নাছোড়বান্দা ফেরিওলা রে বাবা। কালাচাঁদজ্যাঠা এবারে সত্যি-সত্যি বিরক্ত হলেন।

"কম্যাণ্ডো আর আনআর্মড কমব্যাটের ট্রেনিংয়ে পোক্ত কালাচাঁদজ্যাঠার ডান হাতের পাতাটা কাটারির ভোঁতা দিকের ঘা হয়ে পড়ল ছেলেটার ছুরিধরা হাতের কবজিতে। ছুরিটা অমনি ঠিকরে গিয়ে কামরার মেঝের ওপর পড়ে স্লিপ করে উলটো দিকের বেঞ্চির তলায় ঢুকে গেল। কালাচাঁদজ্যাঠা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'বলেছি তো আমার ছুরির দরকার নেই।' বলতে বলতে দেখলেন ছেলেটা বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের কবজিটা চেপে ধরেছে। মুখে যন্ত্রণার ছাপ।

"কালাচাঁদজ্যাঠা অবাক হয়ে বললেন, 'কী, এতেই চোট লেগে গেল। ক্যায়সা দুবলা আদমি হ্যায় তুম।' ততক্ষণে একটা ঢ্যাঙা পাতলা চেহারার ছেলে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে একটুকরো জলের পাইপ। ধরেছে আবার স্টেনগান ধরার কায়দায়।

"তার চোখমুখের চেহারা দেখে সেই জলের পাইপটা ফশ করে তার হাত থেকে কেড়ে নিলেন কালাচাঁদজ্যাঠা। বললেন, 'এ কেয়া চিজ।' তারপর ভাল করে দেখেই আবছা মানে বুঝলেন, যদিও এর আগের পাইপগান কখনো দেখেননি। ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। উঠে দাঁড়াতেই ছেলে দুটো পিছিয়ে গেল। বললেন, 'ইসমে ট্রিগার লাগায়া হ্যায় কাহে? মালুম হোতা কুছ হাতিয়ার হোগা। আউর ইয়ে ভি মালুম হোতা তুমলোগ বদমাস আদমি হো।' বলতে বলতে কম্যাণ্ডো ট্রেনিংয়ে ওস্তাদ কালাচাঁদজ্যাঠা একটা অদ্ভুত খেল দেখালেন। এক হাতে পাইপগানটা ধরা। অন্য হাতে মাল রাখার র‍্যাকটা ধরে এক লহমারও কম সময়ে নিজের বিরাশি কে জি শরীরটা শূন্যে তুলে ভারী অ্যামুনিশান বুটপরা দু-পায়ে এক সঙ্গে দুজনের কোমর বরাবর জোড়া লাথি মারলেন।

"লাথি মারার আগেই লক্ষ করেছিলেন আরো দু'জন উলটো দিক থেকে ছুটে আসছে। একজনের হাতে রিভলভার, আরেকজনের হাতে মাংসকাটা চপার। তাদের আর ধাওয়া করে আসতে হল না। গুলতি থেকে ছিটকোনো নুড়ির মতো ছুরি আর পাইপগানের ভূতপূর্ব মালিকেরা উড়ে তাদের ওপর এসে পড়ল। চারজনের আট জোড়া হাত-পা মাকড়সা হয়ে ঝটপট করতে না করতে কামরার সমস্ত লোক তাদের ওপর ঝাঁপ খেল। কালাচাঁদজ্যাঠা এর মধ্যে চট করে হিয়ারিং এড্‌টা লাগিয়ে নিয়েছেন। কানে আসছে এক-নাগাড়ে কিল, ঘুসি, লাথি চড়ের শব্দ আর সঙ্গে বাবাগো, মাগো, আর করব না, ছেড়ে দাও।

"ট্রেন থেমে আসছে। কালাচাঁদজ্যাঠা লক্ষ করলেন দুটি ছোকরা একটু তাড়াতাড়ি নেমে যাবার জন্যে তোড়জোড় করছে। একজনের হাতে একটা লোহার রড। একলাফে দু-জনকে ধরে ফেললেন। বাঘের থাবা-মার্কা দুই মুঠোয় তাদের চুল ধরতেই তারা ডুকরে কেঁদে উঠল। সামনে সোনারপুর স্টেশান। পুলিশে দেবার আগে তাদের সার্চ করে বার হল বেশ কিছু ছিনতাই-করা হাতঘড়ি আর টাকাপয়সা।

"একজন বুড়োমতন যাত্রী বললেন, 'তেষট্টি বছর বয়েস হল এমন অভিজ্ঞতা হয়নি। একটা ডাকাত ভদ্রলোকের সামনে ছোরা ধরে বলছে, কী আছে বের করুন চটপট। আর উনি বলছেন, আমি ছুরি কিনব না। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছি, আবার পেট গুলিয়ে হাসি আসছে ওঁর কথা শুনে। দেখালেন বটে আপনি।' কালাচাঁদজ্যাঠা ততক্ষণে নিজের জায়গায় বসে গুনগুন করে আবার গাইছেন: মন চলো নিজ নিকেতনে।"

শুভ থামল। তারপর দম নিয়ে বলল, "দেখলি কালা মানুষের কালোয়াতি!"

"দেখলাম নয়, শুনলাম," কিটু বলল, "তা শেষ পর্যন্ত কোথায় কুস্তির আখড়া খুললেন তোর কালাচাঁদজ্যাঠা?"

"কোথ্‌থাও নয়," শুভ উদাস গলায় বলল, "বাঙালি ছেলেদের চারিত্রিক অবনতি দেখে তাঁর ঘেন্না ধরে গিয়েছিল। এর পরেই উনি চলে যান হরিদ্বারে এক স্বামীজির আশ্রমে। এখনো সেখানেই আছেন।"

"সে কী রে!" কিটু চোখ বড়-বড় করে বলল, "তোর সব গ্রেটম্যান আত্মীয়দের তো স্বর্গে পাঠাস। এঁকে যে বাঁচিয়ে রাখলি? ...কালাচাঁদজ্যাঠাকে হরিদ্বারে না পাঠিয়ে নিদেনপক্ষে কালাহারি মরুভূমিতেও তো পাঠাতে পারতিস।"

শুভ কটমট করে তাকাল কিটুর দিকে। তারপর আচমকা উঠে চলে গেল।

ছবি অহিভূষণ মালিক

লুক্‌সেমবুর্গের সেই রাত

মঞ্জুলিকা গঙ্গোপাধ্যায়

লুক্‌সেমবুর্গ থেকে বেরিয়েছিলুম প্যারিসের উদ্দেশে। ফ্রান্স আর জার্মানির মধ্যে একটি ছোট্ট রাজ্য এই লুক্‌সেমবুর্গ। একসময় লুক্‌সেমবুর্গকে ইউরোপের মজবুত দুর্গ বলা হত। চারদিকেই তার বিস্তর নমুনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে।

প্যারিস এখান থেকে বেশি দূরে নয়, তাই তাড়াহুড়ো না করে আমরা বিকেলের দিকেই বেরোলাম। বেরোবার আগে দেখে নিলাম গাড়ির তেল জল আর চাকার হাওয়া ঠিক আছে কি না। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই পড়লাম ফ্যাসাদে। তেলের ট্যাঙ্ক দ্রুত খালি হয়ে যাচ্ছে। গাড়ি থামিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে ধরা পড়ল যে, পেট্রোল ট্যাঙ্কে একটা বড় ধরনের ফুটো দেখা দিয়েছে। আশ্চর্য কাণ্ড! আমরা তো দেখেটেখে রওনা হয়েছিলাম, তাহলে এই ফুটো হল কীভাবে!

বিচ্ছিরি ব্যাপার! আমাদের সকলের মন খারাপ হয়ে গেল। তেল শেষ হলে না-হয় পথচলতি গাড়ি থামিয়ে তেল চেয়ে নেওয়া যেত, কিন্তু ট্যাঙ্কই যখন ফুটো তখন আর তেল ঢেলেই বা লাভ কী!

আমাদের মধ্যে একজন বললেন, "চলো না, যতটা যাওয়া যায়; কাছাকাছি কোনো মোটেল পেলে সেখানে রাত কাটিয়ে দেব। এই হাড়কাঁপানো কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যে তো আর পথে বসে থাকা যায় না।"

পরামর্শটা মন্দ নয়। গাড়ি আবার চলতে শুরু করল। কিন্তু কিছুদূর যাবার পরেই বার-দুয়েক গোঁ-গোঁ আওয়াজ। তারপরেই থেমে গেল গাড়ি। ট্যাঙ্কে আর একটুও তেল নেই। তাহলে উপায়? আমাদের ড্রাইভার হ্যারি বলল, "গাড়িটা মাঝ-রাস্তায়, আসুন সবাই ঠেলেঠুলে রাস্তার ধারে নিয়ে যাই।"

হ্যারির কথায় আমরা সবাই নেমে এলাম। গাড়িটাকে ঠেলে রাস্তার একপাশে সরিয়েও দিলাম। কিন্তু আমরা কোথায় এসেছি! আশেপাশে কোথাও জনবসতির চিহ্ন নেই। চারদিক অসম্ভব নির্জন। তা হলে কি আমরা ভুল রাস্তায় এসে পড়লুম?

আমরা দলে ছিলাম চারজন। অনু, আমি, মরগ্যান আর ড্রাইভার হ্যারি। মরগ্যান বহুদিন লুক্‌সেমবুর্গে ছিল, তাই এখানকার সব পথঘাট তার মুখস্থ। সে বলল, "আমরা ভুল-পথে আসিনি, এ-পথেও প্যারিস যাওয়া যায়।" কিন্তু মরগ্যান আমতা-আমতা
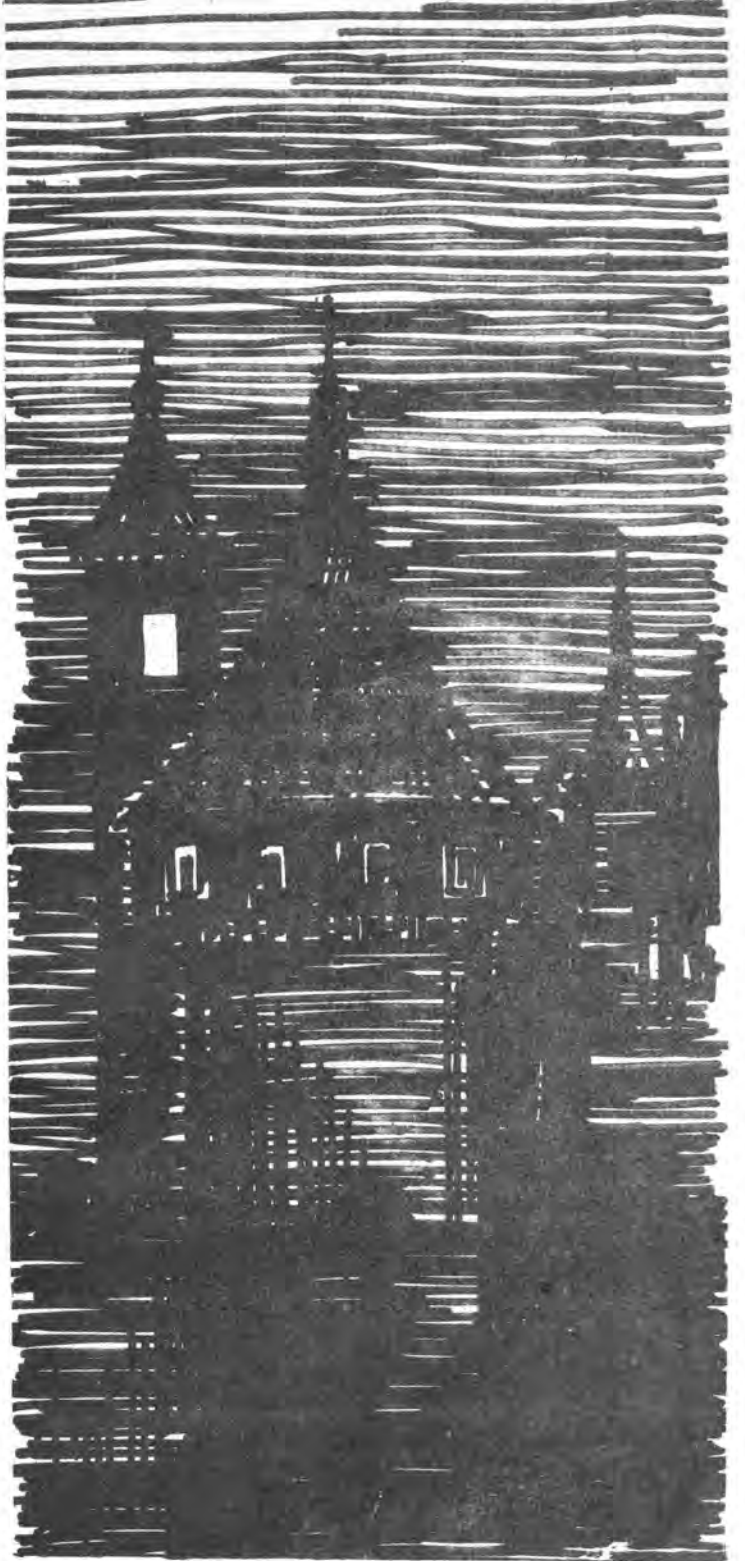
করছে দেখে আমরা একটু চিন্তায় পড়লুম। নাঃ, ও বোধহয় ঠিক বলছে না।

হঠাৎ অনু চেঁচিয়ে ওঠে, "আরে, ঐ তো একটা আলো দেখা যাচ্ছে।"

আমরা সবাই তাকিয়ে দেখি, সত্যিই একটা আলো মিটমিট করে জ্বলছে। কাছে নয়, বেশ দূরে। আলোটা লক্ষ করে আমরা এগোতে লাগলুম। একটু এগোবার পর মনে হল, আলোটা যেন আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। ভালই হল। এই অচেনা অজানা জায়গায় অন্ধকারে হোঁচট খেতে হবে না।

অন্যদিক থেকে যিনি এলেন, তিনি একজন বৃদ্ধা। সঙ্গে আর কেউ নেই। কাছে এসে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে বুঝি?"

সব কথা খুলে বললুম আমরা। তাতে তিনি বললেন, "চিন্তার কী আছে? চলো আমার সঙ্গে। রাতটা বরং আমার বাড়িতেই থেকে যাবে।" আমরা কিন্তু-কিন্তু করছি দেখে তিনি সহাস্যে বললেন, "আরে অত ভাববার কী আছে? অত বড় প্রাসাদ পড়ে রয়েছে, তোমাদের চারটে প্রাণীর জায়গা হবে না? চলো, চলো।"

চারদিক ফাঁকা। প্রাসাদ কোথায় এখানে! কিন্তু বৃদ্ধা এমন তাড়া লাগালেন যে, আমরা আর আপত্তি করলুম না। যা ঠাণ্ডা, এখন একটু মাথা গোঁজার জায়গা পেলে বর্তে যাই। বৃদ্ধার পিছন-পিছন আমরা হাঁটতে লাগলুম।

একটু এগিয়ে একটা মস্ত গাছের পাশে আসতেই চোখে পড়ল কালো কুচকুচে ভাঙাচোরা একটা বিশাল প্রাসাদ। এই নির্জন অঞ্চলে এমন একটি অট্টালিকা দেখে আমরা তো হতভম্ব। মরগ্যান বলল, "যতদূর মনে হয়, এই হচ্ছে 'ভিয়ানডেন কাস্‌ল'। আজ এই দুর্গ হয়তো জনহীন, কিন্তু চিরকাল এমন ছিল না।"

বৃদ্ধা মহিলা নিরুত্তর। শুধু আমাদের দিকে তাকিয়ে একটু রহস্যময় হাসলেন। হাসিটা আমার একটুও ভাল লাগল না।

ফিসফিস করে অনুকে আমি বললুম, "দ্যাখো, এ-সব পোড়ো প্রাসাদে গিয়ে কাজ নেই, তার চেয়ে বরং গাড়িতে বসেই রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাক।"

অনু আমার কথায় বিন্দুমাত্র গুরুত্ব না দিয়ে বলল, "পোড়ো প্রাসাদ তো কী হয়েছে? ভদ্রমহিলা এত আগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছেন যখন, ফিরে যাওয়াটা ভাল দেখাবে না।"

কথা বলতে বলতে আমরা প্রাসাদের সিঁড়ির কাছে এসে পড়লুম। বৃদ্ধা তাঁর হাতের লণ্ঠনের আলো দেখিয়ে আগে-আগে যাচ্ছিলেন। একটু গিয়েই বৃদ্ধা ডান দিকে ঘুরলেন। আমরাও তাঁকে অনুসরণ করে একটি গম্বুজের সামনে এসে দাঁড়ালুম। উপরের দিকে তাকাতে চোখে পড়ল, সেখানে একটি আলো জ্বলছে।

উপরে কেউ থাকেন কি না, অনু জিজ্ঞেস করতেই বৃদ্ধা তার মুখের কথা প্রায় কেড়ে নিয়ে বললেন, "কে আর থাকবে, আমি একাই থাকি।"

মরগ্যান জিজ্ঞেস করল, "এই জঙ্গলের মধ্যে একা-একা একটা প্রাসাদে থাকেন, ভয় করে না আপনার?"

"ভয়? কিসের ভয়?" হেসে উঠলেন বৃদ্ধা, "চলো, উপরে যাই।"

চলব কী, হ্যারি চেঁচিয়ে উঠল, "দ্যাখো না, কে আমার পা চেপে ধরেছে, আমি চলতে পারছি না।"

"কই, দেখি, দেখি," মরগ্যান একটু মাথা ঝুঁকিয়ে হ্যারির পা দেখতে গিয়েছিল, তারও হ্যারির মতো অবস্থা। সেও হ্যারির মতো চেঁচিয়ে উঠল, "গেলুম, গেলুম। কে যেন আমার পা ধরে টান মারছে।"

ওরে বাবা, এ কি উইচ্‌ক্র্যাফটের ব্যাপার নাকি? কথাটা মনে হতেই আমার কানের কাছে ফিসফিস করে কে যেন বলল, "না ম্যাডাম, এটা উইচক্র্যাফটের ব্যাপার নয়, অন্য কিছু।" চিৎকার করে বলতে চাইলুম, "চলো, এক্ষুনি আমরা এখান থেকে পালাই।" কিন্তু গলা দিয়ে কোনো স্বরই বেরুল না। হঠাৎ দেখি হ্যারি আর মরগ্যান চলতে শুরু করেছে, আমাকেও কে যেন এক ধাক্কায় উপরে তুলে দিল।

উপরে এসে দেখি, একটা ঘরে টিমটিম করে একটা প্রদীপ জ্বলছে। ঘরের মধ্যে চারখানা খাট পাতা রয়েছে। কেউ নিশ্চয় বিছানা পেতে রেখেছে আমাদের জন্যে।

এ কী অদ্ভুত কাণ্ড রে বাবা! বৃদ্ধা যে বললেন, তিনি একা থাকেন, তা হলে আমাদের জন্যে এই বিছানা কে পেতে রাখল!

আবার সেই গায়ে-কাঁটা-দেওয়া রহস্যময় হাসি।

মরগ্যান বলল, "এসেই যখন পড়েছি, উপায় কী? যে করে হোক, রাতটা তো কাটাতেই হবে।"

আমার ওখানে আর এক মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু কী করব, এত রাত্তিরে যাবই বা কোথায়। অগত্যা আমরা চারজন চারটি খাটে বসে পড়লুম। আমরা তো খাটগুলো দখল করে নিলুম, বৃদ্ধা শোবেন কোথায়? জিজ্ঞেস করলুম, "আপনি কোথায় শোবেন?"

বৃদ্ধা খিক্‌খিক্ করে হেসে উঠলেন, "এত বড় প্রাসাদ, শোবার জায়গার অভাব?" তারপর তিনি আর কোনো কথা না বলে অন্য ঘরে চলে গেলেন।

আমরা এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম যে, কারুর কিছুই খেতে ইচ্ছে করছিল না। শুয়ে পড়লুম। ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখ। হঠাৎ হ্যারি চেঁচিয়ে উঠল, "কে! কে! আমার পাশে কে?"

হ্যারির চিৎকারে ধড়মড় করে আমরা উঠে বসলুম। কিন্তু এ কী! ঘর অন্ধকার। কখন আলো নিভে গেছে। তারই মধ্যে অনু বলল, "আমার হাতে এটা কী লাগছে!"

উত্তর দেব কী, আমারও পায়ের আঙুলে কিসের যেন ছোঁয়া লাগল।

মরগ্যান চেঁচিয়ে উঠল, "আমার মাথার কাছে টর্চ ছিল, সেটা গেল কোথায়?"

সঙ্গে-সঙ্গে একটা তীব্র আলোয় ভরে গেল আমাদের ঘর। আর সেই আলোয় দেখলুম বৃদ্ধা এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছেন। এমন ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর মুখ আমি আগে আর কখনও দেখিনি।

আমাদের যখন ঘুম ভাঙল, তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। আমরা গাড়ির সিটে শুয়ে আছি। আমাদের সামনে তিজজন লোক দাঁড়িয়ে আছে।

শুনলাম এরা নদীর ধারে বেড়াচ্ছিল। প্রাসাদের আশেপাশে আমাদের অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে গাড়ির কাছে নিয়ে এসেছে। তারা আন্দাজ করেছিল, এটা আমাদেরই গাড়ি।

কারুর মুখে কোনো কথা নেই। রক্তহীন পাংশু মুখে তাকিয়ে আছে হ্যারি। তাকে জিজ্ঞেস করলুম, "হ্যারি, তুমি ঠিক কী দেখেছিলে বলো তো?"

হ্যারি কিছু বলবার আগেই লোকগুলি জানাল, এই বাড়িতে মেরি লুক্‌সেমবুর্গ নামে এক মহিলা থাকতেন। তাঁর স্বামী ভীষণ একগুঁয়ে আর বদমেজাজি। কী এক তুচ্ছ কারণে তাঁদের মধ্যে একদিন খুব ঝগড়াঝাঁটি হয়। ক্রুদ্ধ স্বামী মেরি লুকসেমবুর্গকে গলা টিপে খুন করেন। সেই থেকেই ঐ বাড়িতে চলে আসছে এইসব উপদ্রব। আমাদের বরাত ভাল যে, প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছি। ঐ বাড়িতে ঢুকলে নাকি কেউ জ্যান্ত ফেরে না।

ছবি অহিভূষণ মালিক

কলি-কথা

বাসুদেব দেব

ক্রুদ্ধ ও উদ্ধত ছিল বটে শ্রীনিবাস,
অপিসে যাবার পথে চেপে-চেপে মিনিবাস,
উঁচুগলা নেই আর, মাথা হেঁট বিনীত,
কোথায় সে চিনিবাস, দশে যারে চিনিত ?

ছিল বটে গয়ারাম, গাড়িতে না চড়িয়া
পায়ে হেঁটে পাড়ি দিত টালা থেকে গড়িয়া,
অলিম্পিকে সে যাবে নিশ্চয় একদা,
কী করে যে পুরসভা জেনেছিল সে-কথা।
বিষ্টিতে একদিন ম্যানহোলে পড়িয়া,
এখন সে কোনোমতে হাঁটে লাঠি ধরিয়া।

মগজে ক'গজ ছিট গজানন জ্যোতিষীর ?
হাত দেখে বলে সব, না মিললে ক্ষতি কী ?
এ সবই সে বলেছিল, বিশ্বাস কে হারায় !
'বদল হবেই হবে ভাগ্যে ও চেহারায়।'
দর্শনী বাড়ালেই ঘোর শনি শান্ত
করতে সে মন্ত্রের নানা প্যাঁচ জানত,
লোডশেডিং-এর রাতে সিঁড়ি থেকে পতিত,
তার সব গৌরব এখন যে অতীত।

মামলাবাজ

অভীক বসু

শ্যাম হালদার মামলাবাজ,
হামলার খোঁজ রাখে,
কোর্ট-কাছারির বারান্দাতেই
অষ্টপ্রহর থাকে।

সূত্র পেলেই ঝগড়া বাধায়,
যেন নারদমুনি,
তিলকে উনি তাল বানাবার
বিদ্যায় খুব গুণী।

এই তো সেদিন মিত্রমশাই
শ্যামের প্রতিবেশী,
হঠাৎ তাঁরই সঙ্গে শ্যামের
লাগল রেষারেষি।

মিত্রমশাই দুঃখ পেয়ে
আমগাছটি তাঁর
লোক লাগিয়ে কাটলেন, তাই
আম ফলে না আর।

শ্যাম বলল, "গাছ তো ওরই,
কিন্তু ওকে শুধাও,
গাছটা নাহয় কাটল, কিন্তু
ছায়াও হবে উধাও ?
ছায়ার মালিক মিত্তির নয়,
দেখিয়ে দিচ্ছি জুজু,
ছায়ার জন্য ওর বিরুদ্ধে
মামলা করব রুজু।"

ছবি অহিভূষণ মালিক

রঙিন টেলিভিশনে এই তিনটি প্রাথমিক রংকেই ব্যবহার করা হয়। এই তিনটি রং ঠিকমতো মিশিয়ে অন্য সব রং পাওয়া যেতে পারে। লাল নীল ও সবুজ রঙের বৃত্ত যে-জায়গায় মিশে গেছে, লক্ষ করে দ্যাখো, সেখানকার রং সাদা।
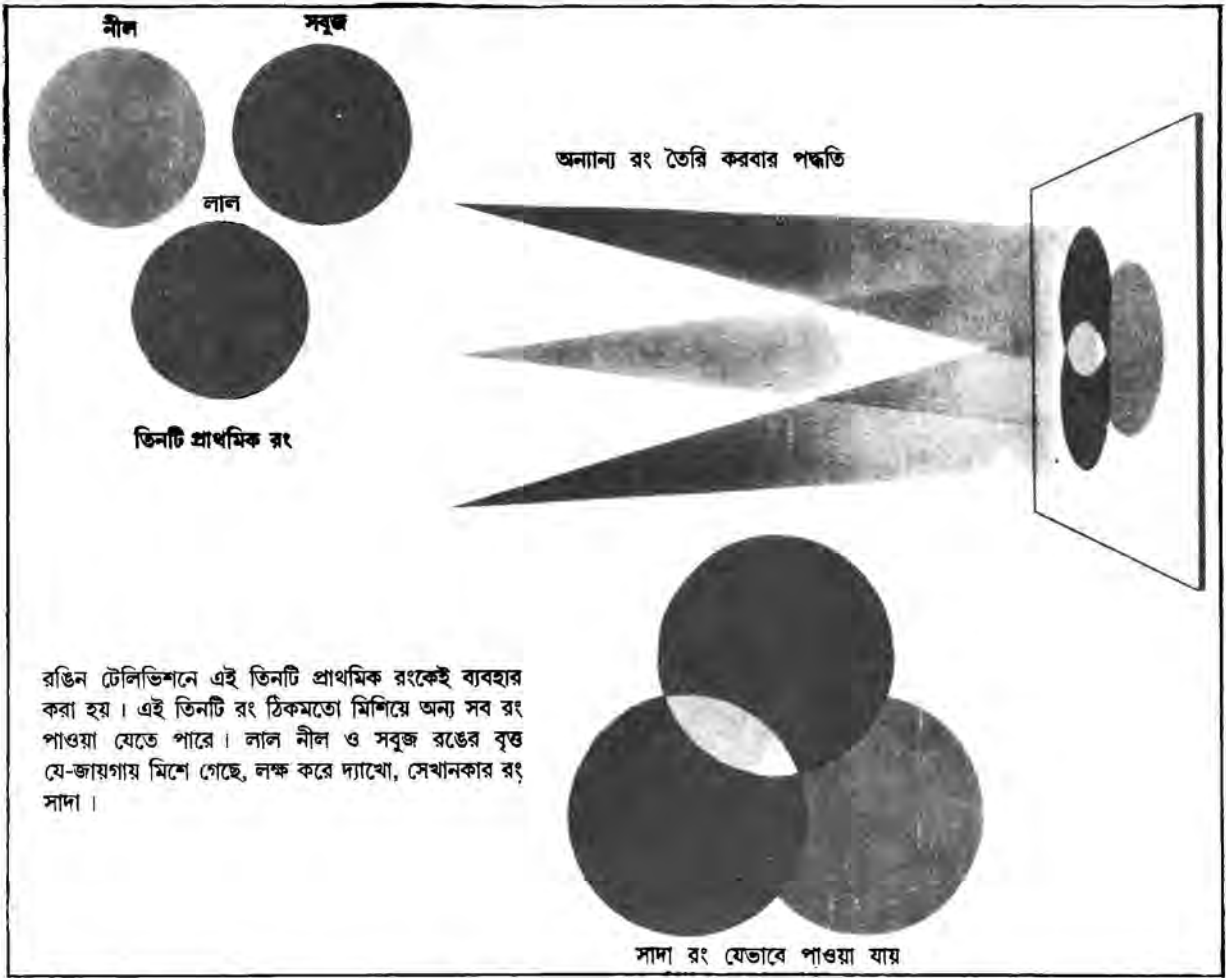
রঙিন টেলিভিশনের গল্প

পার্থসারথি চক্রবর্তী

ডিস্কু-টিস্কুদের বাড়িতে আজ হৈহৈ ব্যাপার। ছোটমামা আজ সকালেই জাপান থেকে ফিরে এসেছেন যে! ছোটদের জন্য পুতুল, হরেক রকম রঙিন বই, এসব তো এনেছেনই, তার উপর ডিস্কু-টিস্কুদের জন্যে ভারী সুন্দর একটা রঙিন টিভি-সেটও কিনে এনেছেন। রঙিন টিভি দেখে ওরা তো সবাই একেবারে আহ্লাদে আটখানা।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর মৌ বলল, "আচ্ছা ছোটমামা, টেলিভিশনে সাদা-কালো ছবির বদলে রঙিন ছবি কেমন করে ফুটে ওঠে?" টিস্কু পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলল, "ঐ সাদা-কালো ছবি টিভিতে আসবার পর তুলি দিয়ে রঙ লাগিয়ে দেওয়া হয়, তাই তো আমরা রঙিন ছবি দেখতে পাই।"

ছোটমামা একটু হেসে বললেন, "টিভিতে রঙিন ছবি দেখাতে হলে কতকগুলো কৌশল খাটাতে হয়। সেই কৌশলগুলো কী তা তোমরা বড় হয়ে জানবে। আমি শুধু খুব সহজ কথায় ব্যাপারটা তোমাদের বলছি"

বাবুন-মিঠুন বলল, "এক মিনিট ছোটমামা।" তারপর একদৌড়ে ওদের পড়ার ঘর থেকে টেপ-রেকর্ডারটা এনে চালিয়ে দিল। সেদিন ছোটমামা রঙিন ছবি টিভির পর্দায় কেমন করে ফুটে ওঠে, এ-সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, আমরা এখানে সেটা হুবহু তুলে দিলাম।

মহাভারতের সঞ্জয় কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের দৃশ্যগুলি দৃষ্টির অন্তরাল থেকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। দূরের জিনিসকে কাছে দেখবার কৌতূহল মানুষের চিরকালের। কিন্তু সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ও শ্রবণের ক্ষমতা তো সীমাবদ্ধ। তাই মনের এই গোপন ইচ্ছা মনেই রয়ে গিয়েছিল।

বিজ্ঞানীরা কিন্তু এ-ব্যাপারে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বহুদূর থেকে প্রিয়জনের কণ্ঠস্বর ভেসে এসে চিত্তকে করল প্রসন্ন। গ্রাহাম বেলের টেলিফোন আবিষ্কার মানুষের সেই দিব্যদৃষ্টি লাভের ইচ্ছাকে আরও জাগিয়ে তুলল। কবি বলেছেন, 'তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশি শুনেছি।' যার দূরের বাঁশির সুর মনকে উতলা, আকুল করে, তার ভুবনমোহন রূপ কি নয়ন একবার প্রত্যক্ষ করবে না? যে নয়নসমুখে নাই, সত্যি-সত্যি নয়নের মাঝখানে কি তার ঠাঁই হবে না? শ্রবণ যদি ধন্য হল, তবে নয়নকেই বা এত উপেক্ষা কেন?

বহুদূরের দৃশ্যাবলী চোখের সামনে আলোছায়ার আঁচড় দিয়ে মেলে ধরলেন কলির যে সঞ্জয় তাঁর নাম বিজ্ঞানী বেয়ার্ড। অন্তরালকে অগ্রাহ্য করে দূরের দৃশ্য পর্দায় প্রথম প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ তিনিই করে দিলেন।

মজার কথা এই যে, সেই টেলিভিশন পর্দার প্রথম শিল্পী বালক-ভৃত্যকে নগদ দক্ষিণা দিয়ে অতিকষ্টে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তবেই রাজি করানো গিয়েছিল। সেই ট্রাডিশন আজও সমানে চলেছে, এখনও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

এ তো গেল টেলিভিশন আবিষ্কারের কথা। কিন্তু এই আবিষ্কারের পিছনে কত কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে তার খবর রাখে ক'জন? যাই হোক, রয়্যাল ইনস্টিটিউটে বেয়ার্ড যখন এক প্রদর্শনী টেলিভিশন প্রোগ্রাম দেখালেন, তখন, সন্দেহ নেই, সকলেই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল।

আলো আছে, তাই তো আমরা দেখতে পাই। আলোর কণিকা এসে চোখে প্রবেশ করল, মগজের তীক্ষ্ণ অনুভূতি দিয়ে আমরা সব কিছু প্রত্যক্ষ করলাম। পরবর্তী কালে অবশ্য বিজ্ঞানীরা বললেন, "আলোর ছোট-বড় নানান মাপের ঢেউ নয়নে এসে আছড়ে পড়লে আমাদের দর্শনের অনুভূতি হয়। এই আলোর ঢেউ যখন কোনো রাস্তা ধরে হুড়মুড় করে এসে কোনো বস্তুর ওপর পড়ে তখনই আমরা তাকে বলি রশ্মি। আলোর ঢেউ ছোট অথবা বড় দুই-ই হতে পারে। আলোর ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য বদলে গেলে তার রংও যাবে বদলে। নীল, লাল, হলুদ, সবুজ, কমলা ইত্যাদি রঙের আলোর দৈর্ঘ্য একরকম নয়, ওদের তফাত আছে। আলোকরশ্মিকে সাদা কখন দেখায় বলতে পারো? যখন সব আকারের ঢেউ একসঙ্গে এসে হাজির হয়, তখনই আমরা আলোর রং সাদা দেখি।

আলোর ঢেউ এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। সূর্য, নক্ষত্র অথবা ক্ষুদ্র মোমবাতি, এরা নিজেরাই আলো ছড়িয়ে চলেছে। যাদের আলো ছড়ানোর ক্ষমতা নেই, সেইসব বস্তু দৃশ্যমান হয়ে ওঠে অন্যের ধার-করা আলো নিয়ে। যে বস্তু আছড়ে-পড়া সমস্ত আলোকরশ্মিকে যখন একেবারে বন্দী করে ফেলে, তখন তাকেই আমরা বলি কালো।

আমাদের চোখের ভিতরে একটা পর্দা আছে, যার নাম রেটিনা বা অক্ষিপট। কোনো বস্তু থেকে আলো বাধা পেয়ে ফিরে এসে যখন চোখে পড়ে, তখন ঐ অক্ষিপটের পর্দায় তার একটা ছবি ফুটে ওঠে। অক্ষিপটের বিভিন্ন জায়গায় নানা ধরনের দৈর্ঘ্যের আলো এসে আছড়ে পড়ে। দৃশ্যবহ স্নায়ুর সাহায্যে এই আলোকের অনুভূতি আমাদের মগজে তখন পৌঁছয়। আমরা তখন দেখতে পাই।

আমাদের চোখের সামনে আছে ছোট্ট একটা লেন্স। কোনো বস্তু থেকে এর মধ্যে দিয়ে আলো এসে যখন অক্ষিপটের পর্দায় পড়ে, তখনই সেখানে একটা সত্যিকার প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয়। অবশ্য এই প্রতিবিম্বের চেহারা বস্তুর ঠিক উল্টো, আর মগজই তাকে কৌশলে সোজা করে নেয়। আমরা তখন বস্তুটির আসল রূপ প্রত্যক্ষ করি। নয়নের গঠনকে অনুসরণ করেই তৈরি হয়েছে যে যন্ত্র, তার নাম ক্যামেরা। ক্যামেরার সামনের লেন্সের মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মি গিয়ে পড়ে ফোটোগ্রাফিক প্লেটে। এই নেগেটিভ প্লেট থেকেই তৈরি হয় আসল ছবি, সাদা-কালোর আঙিনায় যার কোথাও কম কালো কোথাও বা একটু বেশি কালো। দূরে কোনো দৃশ্যকে চালান করতে হলে এই আলোছায়ার লুকোচুরি খেলাকে, যে-ভাবেই হোক, কৌশল করে পাঠাতে হবে।

আমাদের অক্ষিপট আশ্চর্য উপায়ে আলোর ঔজ্জ্বল্যের এই হেরফের বুঝতে পারে। যাই হোক, কোনো বস্তুর চেহারা কী, দূরের লোককে জানাতে হলে প্রথমে ঐ বস্তুটির উপর আলো ফেলতে হবে। বস্তু থেকে আলো বাধা পেয়ে ফিরে এলে তাকে বিদ্যুতের

কাঁধে চাপিয়ে দাও। ব্যস, এই কাজটুকু করতে পারলেই যথেষ্ট—তোমার টেলিভিশন তৈরির কাজ অনেকটা এগিয়ে যাবে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, অনেক পদার্থ যেমন সিজিয়ম, সেলেনিয়ম প্রভৃতির উপর আলো পড়লে তারা ইলেকট্রন মুক্ত করতে পারে। আলোর উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পেলে ঐ পদার্থের মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যাও বেড়ে চলে। আর ইলেকট্রনের চলাফেরা মানেই হচ্ছে—ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ-প্রবাহ, এ-কথা তো তোমরা সকলেই জানো। আলোর সাহায্য নিয়ে এইভাবে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন করা হয় যে যন্ত্রে, তার নাম—ফোটো-সেল। ফোটো-সেলের কাজই হচ্ছে আলোর বৈদ্যুতিক প্রতিলিপি তৈরি করে দেওয়া। এখানে আর-একটা কথা বলে রাখা ভাল। বিদ্যুতের প্রভাবে আলো উৎপন্ন করে তারপর সেই বিদ্যুৎকে কমিয়ে অথবা বাড়িয়ে আলোর ঔজ্জ্বল্যকেও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। নিওন-আলোর টিউবে এই ঘটনাই তোমরা দেখতে পাও। তাহলে দেখতে পাচ্ছ, ফোটো-সেল যে কাজ করে, নিওন-টিউব করে ঠিক তার বিপরীত কাজ। প্রথম যন্ত্রের কাজ হচ্ছে আলো থেকে তড়িৎ সৃষ্টি করা, আর দ্বিতীয়টিতে আছে তড়িৎ থেকে আলো সৃষ্টি করার ব্যবস্থা।

যদি তুমি কোনো বস্তু বা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি দূরে পাঠাতে চাও, তাহলে প্রথমেই ওই বস্তু অথবা দৃশ্যকে অতি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে নিতে হবে। ইংরেজিতে একে বলে স্ক্যানিং। তারপর ঐ প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র অংশের আলো থেকে বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করতে

রঙিন ছবির গ্রাহক-যন্ত্র রংগুলিকে গ্রহণ করছে। লাল নীল ও সবুজ রঙের জন্য তিনটি আলাদা ক্যাথোড রে টিউব ব্যবহার করা হয়। পরে লেন্স সিস্টেমের সাহায্যে ওই তিনটি রঙের ছবি পরিণত হয় একটিই রঙিন ছবিতে।

হবে। অর্থাৎ বস্তু থেকে বেরিয়ে আসা আলোকে তুমি এবার বিদ্যুতের কাঁধে চাপিয়ে দেবে আর কী ! বস্তুর দেহ থেকে বিক্ষিপ্ত বিন্দু-বিন্দু আলো এসে ঠিকরে পড়বে ফোটো সেলে এবং আলোর ঔজ্জ্বল্য অনুসারে বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করবে। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে, বস্তুর দেহের আলাদা-আলাদা অংশ থেকে কখনও বা কম আলো কখনও বা বেশি আলো ঠিকরে আসবে এবং ঐ আলোর একটা বৈদ্যুতিক প্রতিলিপি তৈরি হবে।

তোমরা হয়তো ভাবছ, ঐভাবে কোনো দেখবার জিনিসকে কেটে কেটে দেখতে চাইলে (স্ক্যানিং) আমরা তাকে সত্যি দেখতে পাব তো ? হ্যাঁ, পাবে—কারণ আমাদের মগজের এক আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। আসলে ছবিকে তো আর সত্যি-সত্যি কাটা হয় না—এই স্ক্যানিং করে একটা যন্ত্র। তাহলে এখন মোদ্দা কথা দাঁড়াল এই যে, দূর থেকে প্রেরক-যন্ত্র দৃশ্য বা ছবিকে স্ক্যান করে সেই বিন্দু-বিন্দু আলো বিদ্যুতের ঘোড়ায় চাপিয়ে পাঠাবে, আর একটা গ্রাহক-যন্ত্র তাকে ধরে নিয়ে পর্দায় জ্যোতিষ্মান করে তুলবে। প্রেরক-যন্ত্রের নাম হল ট্রান্সমিটার আর গ্রাহক-যন্ত্রের নাম রিসিভার। খুব ভাল করে লক্ষ করলে দেখবে টেলিভিশনের পর্দায় অনেকগুলি সমান্তরাল রেখা রয়েছে। কখনও বা বদলে এই সংখ্যা হয়ে যাচ্ছে ৬২৫ ; টেলিভিশন পর্দার এই রেখার উপর চলমান আলোর বিন্দুর ঔজ্জ্বল্যকে নিয়ন্ত্রণ করলে ছবি ফুটে ওঠে। এই আলোর বিন্দু টেলিভিশনের ক্যাথোড রে-টিউব থেকে ইলেকট্রনের স্রোত হয়ে বেরিয়ে আসে। কোনো মুহূর্তে এই আলোকবিন্দু উজ্জ্বল হল—পরবর্তী মুহূর্তে হয়তো হয়ে গেল ক্ষীণ। এইভাবে আলোছায়ার লুকোচুরি খেলার জন্যই আমরা পর্দায় সাদা-কালো ছবি দেখতে পাই।

রঙিন টেলিভিশনে শুধু এই আলোকবিন্দুর ঔজ্জ্বল্যের হ্রাস-বৃদ্ধিই নয়, বিভিন্ন রংকেও ফুটিয়ে তোলা চাই। এটা সকলেরই জানা আছে যে, রঙিন ছবি যা আমরা সচরাচর দেখতে পাই, সেটা তিনটে রঙের মিশ্রণে তৈরি হয়। এই রংগুলো হচ্ছে—লাল, সবুজ ও নীল। রঙিন টেলিভিশনেও আসলে আমরা তিন রঙের তিনটে ছবিই চালান করে দিই, একটা লাল রঙের ছবি, একটা সবুজ ও অন্যটা নীল। টেলিভিশন সেট তখন এই তিনটে আলাদা রঙের ছবি থেকে সম্পূর্ণ একটা রঙিন ছবি তৈরি করে।

এর জন্যে যে দৃশ্য অথবা ব্যক্তির রঙিন ছবি তোলা হবে, টেলিভিশন স্টুডিওতে তাঁর তিনটে রঙকে কৌশলে আলাদা করে নেওয়া হয়। এই কেরামতিটা অবশ্য ক্যামেরাই করে। ক্যামেরার মধ্যে শুধু বিশেষ ধরনের আলো ঢুকবার ব্যবস্থা থাকে। অন্য অপ্রয়োজনীয় রংকে সে ফিলটার করে সরিয়ে দেয়। এইভাবে কোনো রঙিন দৃশ্যের ছবি লাল, সবুজ এবং নীল এই তিনটে রঙে আলাদা করে নেওয়া হয়। এই ক্যামেরায়, বিশেষ ধরনের আয়না থাকে—যারা বিশেষ ধরনের রংকেই প্রতিফলিত করতে পারে।

এই লাল, সবুজ এবং নীল ছবিকে তিনটে আলাদা ক্যামেরার টিউবের মধ্যে দিয়ে দেখে তিনটে বৈদ্যুতিক সিগন্যাল তৈরি করা যায়। (আলোর বিদ্যুতের ঘাড়ে চাপার কথা মনে আছে তো ?) এই আলাদা বৈদ্যুতিক সিগন্যালগুলোকে আবার একসঙ্গে মিশিয়ে ট্রান্সমিটারের সাহায্যে চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই সিগন্যালকেই তুমি তোমার টেলিভিশন সেটে বন্দী করে ছবি দেখতে পাও।

তোমার টেলিভিশন সেটের কাজ হচ্ছে এবার ঐ একসঙ্গে মিশে আসা রঙিন বৈদ্যুতিক সিগন্যালগুলিকে লাল, সবুজ ও নীল এই তিনটে রঙে বেছে নিয়ে আলাদা করা। স্টুডিওর ক্যামেরায় যে-ভাবে রংগুলোকে আলাদা করে দিয়েছিল, সে-কথা মনে আছে নিশ্চয় ? টেলিভিশনে তো আর ক্যামেরা নেই, এখানে ঐ কাজ সারে ইলেকট্রনিক সার্কিট। এছাড়া লাল, সবুজ ও নীল এই তিন রঙের আলোর বৈদ্যুতিক সিগন্যালকে তিনটে আলাদা ক্যাথোড রে-টিউবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই ক্যাথোড-রে টিউবগুলিতে লাল, সবুজ ও নীল রঙের ছবি ফুটে ওঠে। তারপর একটা লেন্স সিসটেমের সাহায্যে এই তিনটে বিভিন্ন রঙের ছবিকে পর্দায় ফেললে সম্পূর্ণ রঙিন ছবিটাই তাতে দেখা যায়।

এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে। লাল, নীল ও সবুজ এই তিনটে আলাদা রঙের ছবির ঠিক একই সাইজ হওয়া দরকার, নইলে পর্দায় তারা একে অন্যের পিঠে জড়িয়ে পড়বে। খুব বিরাট বড় ছবির জন্য এই 'প্রোজেকশন সিসটেম' উপযোগী।

আমাদের ঘরের টেলিভিশন সেটে একটা বিশেষ ধরনের ক্যাথোড-রে টিউব ব্যবহার করা হয়। এর নাম শ্যাডো-মাস্ক টিউব; এই টিউব থেকে ছবিকে সরাসরি দেখা চলে। এখানে একটার মধ্যে তিনটে ক্যাথোড রে-টিউব ঢোকানো থাকে। তিনটে আলাদা ইলেকট্রনের স্রোত ঐ টিউবগুলো থেকে বেরিয়ে আসে এবং টেলিভিশনের পর্দায় আছড়ে পড়ে। ঐ পর্দায় হাজার হাজার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর মতো রাসায়নিক বস্তু থাকে। ইংরেজিতে এর নাম 'ফসফর ডট'। এই বিন্দুগুলি পর্দায় এমন ভাবে সাজানো থাকে যে, ইলেকট্রন রশ্মি এসে লাল বিন্দুতে পড়লে ওর থেকে লাল রঙ ফুটে ওঠে। অন্য দুটো ইলেকট্রন রশ্মি সবুজ এবং নীল বিন্দুতে আছড়ে পড়ে এবং নীল এবং সবুজ আলো সৃষ্টি করে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে রঙিন টেলিভিশনের এই যন্ত্রে তিনটে ক্যাথোড রে-টিউবকেই একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। যখন তিনটে বৈদ্যুতিক সিগন্যাল ব্যবহার করে এই তিনটে ইলেকট্রন রশ্মিকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয় তখন আমরা পর্দায় সেইমতো রঙিন আলো দেখতে পাই। আসলে আমরা টেলিভিশনের পর্দায় তিনটে বিভিন্ন রঙিন ছবি উৎপন্ন করেছি। এই রঙিন ছবির বিভিন্ন বিন্দুগুলিও পরস্পরের থেকে পৃথক। একটু দূরে বসে টেলিভিশন দেখলে মনে হবে ঐ তিনটে রঙিন ছবি এক হয়ে মিশে গেছে।

সহজ উপায়

রূপক চট্টরাজ

মা বললেন, কানটি মুলে,
"পাজি হতচ্ছাড়া—
লেখাপড়া শিকেয় তুলে
কেবল আড্ডামারা।"
নির্ঘাত তুই ফেল করবি
গোল্লা পাবি আরো,
একই ক্লাসে থাকলে বুঝি
বুদ্ধি খোলে কারো ?"

"কান ছাড়ো মা, বলছি শোনো,
এক্ষুনি সব খুলে—
পড়লে কিছুই রয় না মনে
মুখস্থ যাই ভুলে।
তারচেয়ে মা, মনে রাখার
দাও না সহজ মন্ত্র,
কিংবা মাথায় দাও বসিয়ে
কম্পিউটার যন্ত্র।"

সম্পূর্ণ উপন্যাস

একদা এক বাঘের গলায়

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ছবি দেবাশিস দেব

মেজমামা আর মাসিমা পেছনের আসনে। আমি সামনে বড়মামার পাশে। গাড়ি চলেছে। বড়মামার হাত বেশ তৈরি হয়ে গেছে। এই সেদিন গাড়ি থেকে 'এল' প্লেটটা খোলার অনুমতি মিলেছে।

'বাঃ, তোমার হাত তো বেশ তৈরি হয়ে গেছে হে।'

মেজমামা পেছন থেকে নাকিসুরে বললেন। সুর নাকি হবার কারণ আছে। মেজমামা পুরীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন একা একা। হঠাৎ টেলিগ্রাম এল, 'কাম শার্প। ব্রাদার ইল।' বড়মামা ছুটলেন, সঙ্গে গেলেন কম্পাউণ্ডার দাদা। পরের পরের দিন ফিরে এলেন মেজমামাকে নিয়ে। খুব কাহিল অবস্থা মেজমামার। কোমরভাঙা দ হয়ে গাড়ি থেকে নেমে এলেন। মুখে লেগে আছে করুণ বীরের হাসি। কারুর বারণ না শুনে সমুদ্রে চান করতে নেমেছিলেন। ঢেউ এসে তালগোল পাকিয়ে দিয়েছে। ডুবেই যেতেন। চ্যাম্পিয়ান সাঁতারু পিনাকী রুদ্র সেই সময় পুরীতেই ছিলেন। সমুদ্রে চান করছিলেন সুইমিং কস্ট্যুম পরে। মেজমামার নড়া ধরে ডাঙায় তুলে এনেছিলেন। তুলতে তুলতেই নোনা জল খেয়ে মেজমামার ভুঁড়িটি গণেশঠাকুরের মতো হয়ে গিয়েছিল। সেই নোনাজলের চুবুনিতে সুর নাকি হয়ে গেছে। বড়মামা বলেছেন, 'সারতেও পারে, না-ও সারতে পারে।'

মেজমামা বললেন, 'আহা, হাত আর দুটো পা তোমার বেড়ে সুরে বলছে, যেন কনসার্ট।'

মাসিমা বললেন, 'অ্যাতো আস্তে চালাচ্ছ কেন ? এর চেয়ে বেশি স্পিড দেওয়া যায় না ?'

মেজমামা বললেন, 'গাড়িটা বৃদ্ধ হয়েচে তো, তাই ধীরে চলছে। সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়ি, চলছে যে এই না কত ! না, না, ধড়ফড় করে দরকার নেই, তুমি ধীরেই চলো। খরগোশও গন্তব্যে পৌঁছোবে, কচ্ছপও গন্তব্যে পৌঁছোবে। একদিন আগে আর পরে।'

আড়চোখে বড়মামার দিকে তাকালুম। রাগে মুখ লাল হয়ে উঠেছে। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'খরগোশ পৌঁছোতে পারেনি, কচ্ছপই পৌঁছেছিল। স্লো অ্যাণ্ড স্টেডি উইনস দি রেস।'

মাসিমা বললেন, 'পেছন থেকে অন্যসব গাড়ি হুশ হুশ করে চলে যাচ্ছে। যাবার সময় আমাদের দিকে তাকাতে তাকাতে যাচ্ছে। হাসছে। আমার ভীষণ অপমান লাগছে।'

'তুমি চোখ বুজে থাকো। চোখ খুলো না। চিড়িয়াখানা এলে আমি বলে দোব।' মেজমামা মুচকি হেসে বললেন।

'দাদা, তোমার ভয় করছে বুঝি ?' মাসিমা ভালমানুষের মতো বড়মামাকে প্রশ্ন করলেন।

বড়মামা বললেন, 'একটা অ্যাকসিডেন্ট হোক, এই বোধহয় চাইছিস কুসি !'

মেজমামা বললেন, 'সে-ভয় নেই বড়দা। তুমি তো একপাশ দিয়ে হেঁটে-হেঁটে চলেছ। তোমার মার নেই। অ্যাকসিডেন্ট হবে কী করে ? একে বলে ওয়াকিং-স্পিডে গাড়ি চালানো।'

বড়মামা শাঁত করে গাড়িটাকে রাস্তার বাঁ পাশে গাছতলায় দাঁড় করিয়ে দিলেন। মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হল, গাড়ির জলতেষ্টা পেয়েছে ?'

বড়মামা হাতজোড় করে বললেন, 'আপনারা দয়া করে নেমে যান। পেছনে বসে বসে আরাম করে কাছা ধরে টানা চলবে না, চলবে না। যেখানে একতা নেই, সেখানে গতিও নেই। ইউনাইটেড উই স্ট্যাণ্ড, ডিভাইডেড উই ফল। সেই পতনই এইবার হবে, দয়া করে আপনারা দুজনে নেমে যান।'

মেজমামা বললেন, 'কী হবে রে কুসি। বড়বাবু যে খেপে গেছে।'

'তুমি কান ধরে ক্ষমা চাও মেজদা। বলো, আর করব না। অন্যায় হয়ে গেছে।'

'আমি একা কেন ? যত দোষ নন্দ ঘোষ। তুইও কিছু কম যাস না। তুইও ক্ষমা চা।'

'আমার সঙ্গে বড়দার অন্য সম্পর্ক, স্নেহের সম্পর্ক। তুমি মেজদা চিরটা কাল সুযোগ পেলেই বড়দাকে খোঁচা মারো।'

বড়মামা বললেন, 'তোমরা কেউই কম যাও না। মিটমিটে শয়তান। গাড়িটা কেনার আগে তুই কুসি সবচেয়ে বিরোধিতা করেছিলিস। ঠ্যালাগাড়ি, ছ্যাকরাগাড়ি, যার পাঁঠা সেই বুঝুক, এই সব অনেক চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি ঝেড়েছিলে। একে রামে রক্ষে নেই, দোসর লক্ষ্মণ। মেজ তখন তালে তাল বাজিয়ে গিয়েছিল। তোমাদের আমি হাড়ে-হাড়ে চিনি। সব এক-একটি ধানি-লঙ্কা।'

দুজনে এক সঙ্গে বলে উঠলেন, 'বড়দা, আমাদের ক্ষমা করে দাও। তোমার দয়ার শরীর। সাক্ষাৎ মহাদেব। বাবা ভোলানাথ মাইনাস জটাজুট। ক্ষমা করে দাও প্রভু !'

'না, সম্ভব নয়। এ তো ক্ষমা চাওয়া নয়, এ একধরনের ব্যঙ্গ।'

মাসিমা বললেন, 'তুমি আর-একবার আমাদের চান্স দিয়ে দ্যাখো বড়দা, এবার আমরা একেবারে চুপচাপ থাকব।'

'চুপ করে থাকলেই হবে ! ভেতরে সব ব্যঙ্গবিদ্রূপ পুষে রাখবে, বাইরেটা সব সাজানো-গোজানো, চকচকে, চমৎকার। ওতে আমি আর ভুলছি না ভাই। তোমরা নেমে ট্যাকসি-ম্যাকসি ধরে বাড়ি চলে যাও। আমি আর আমার ভাগনে, পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর কেউ নেই।'

'কেন, তোমার ঈশ্বর !'

'আঃ, চুপ করো না মেজদা। তোমার স্বভাবটা বড় বিশ্রী হয়ে যাচ্ছে।'

'ক্ষমা চাইলে যে-মানুষ ক্ষমা করতে জানে না, সে কেমন মানুষ ?'

বড়মামা বললেন, 'বনমানুষ। তোমরা হলে সব শহর-মানুষ, আমি একটা শিমপাঞ্জি।'

'শুধু শুধু তোমরা কেন ঝগড়া করছ বলো তো। দিন-দিন তোমাদের বয়েস বাড়ছে না কমছে ? বড়দা, তুমি স্টার্ট দেবে কি-না বলো, এবার কিন্তু আমি নিজ-মূর্তি ধরব। লোক জড়ো হয়ে যাবে। ভাল হবে ?'

আড়চোখে মাসিমার দিকে তাকিয়ে বড়মামা গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। চিউয়িংগাম খাবার মতো মুখ নড়ছে। তার মানে কিছু একটা বলতে চান। না বলতে পেরে চিবিয়ে গিলে ফেলছেন। এবার সব চুপচাপ। কারুর মুখে কোনো কথা নেই। মেজমামা হুঁহুঁ করে গানের সুর ভাঁজছেন। গানটা আমার চেনা। বিশেষ সুবিধের গান নয়। বাণীটা বড়মামার চেনা হলে গাড়ি আবার থেমে পড়ত।

মেজমামার হুঁহুঁ ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। ভাব এসে গেছে। বড়মামা মেজমামাকে চাপা দেবার জন্যে কার-স্টিরিওর দিকে হাত বাড়ালেন। মেজমামা গান থামিয়ে বললেন, 'তুমি কি টেপ চালাচ্ছ ? তাহলে কীর্তন নয়, ইংরিজি কিছু চালাও।'

মাসিমা বললেন, 'রবীন্দ্রসংগীত নেই ?'

আমি বললুম, 'বড়মামা, আধুনিক আছে ?'

বড়মামা হাত টেনে নিতে নিতে বললেন, 'আমার কাছে কিছুই নেই।'

মেজমামা বললেন, 'অ, ওটা তাহলে তোমার ডামি-স্টিরিও। খোলস আছে, ভেতরে মাল নেই, ফর শো। কত কায়দাই জানো তুমি ! তোমার গাড়িতে ইঞ্জিন আছে তো ?'

মাসিমা বিরক্তির গলায় বললেন, 'আঃ, মেজদা, কেন বকবক করছ। এই একটু আগে চুক্তি হল, চুপচাপ বসে থাকবে, ফ্যাচর ফ্যাচর করবে না। এরই মধ্যে ভুলে গেলে !'

বড়মামা বললেন, 'স্বভাব কুসি, স্বভাব। স্বভাব সহজে পালটানো যায় না। দোয়েল কি কোয়েলের মতো ডাকতে পারবে ? ছাগল কি ভেড়ার মতো গুঁতোতে পারবে। ঘোড়া কি হাতির মতো স্থির ধীর হতে পারবে ?'

'শুনছিস কুসি, শুনছিস ? গাড়িধারী বড়লোকের বোলচাল শুনছিস ?'

মাসিমা বললেন, 'বড়দা, তুমি গাড়ি থামাও, আমি নেমে যাই। অষ্টপ্রহর গজকচ্ছপের লড়াই আমার অসহ্য লাগে।'

মেজমামা বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, এই আমি চুপ করছি। স্পিকটি নট। তবে আমিও বলে রাখছি, গাড়ি আমি কিনবই। নতুন গাড়ি, ধ্যাদ্ধেড়ে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড নয়। তখন কিন্তু আমি এই গাড়িতে পা দোব না। এর ত্রিসীমানায় আসব না। সাধলেও না।'

'যখন কিনবে তখন দেখা যাবে, আগেই এত আস্ফালন ভাল নয়। তোমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে, আমার জানা আছে। তোমার পাসবই তো আমার কাছে।'

'ধার করব।'

'কে তোমাকে ধার দেবে ?'

'ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্ক দেবে।'

বড়মামা হঠাৎ বললেন, 'কে গ্যারান্টার হবে ?'

'কেন, তুমি। তুমি হবে। তুমি ছাড়া আমার কে আছে ?'

বড়মামা হাহা করে হেসে উঠলেন, 'এই জন্যেই তোকে আমি

এত স্নেহ করি। বুদ্ধিশুদ্ধি তোর একদম পাকেনি। বুড়োখোকা।'

মাসিমা বললেন, 'আমি বুঝি তোমার কেউ নই ?'

মেজমামা বললেন, 'কেন অভিমান করছিস, তুই ছাড়া আমার জগৎ অন্ধকার।'

ঠ্যাং ঠ্যাং, ঠ্যাং ঠ্যাং ঘন্টা বাজিয়ে উলটো দিক থেকে একটা দমকল আসছে। বড়মামা বাঁ পাশে সরতে সরতে বললেন, 'সেরেছে, দমকল যে রে বাবা!'

মেজমামা বললেন, 'ভয় পেও না বড়দা, দমকল আগুন নিবিয়ে ফিরছে। যতই ঘন্টা বাজাক সে, তাড়া নেই। স্টিয়ারিং সোজা রাখো।'

বড়মামা শব্দ করে হেসে, গাড়িটাকে ঠেলে রাস্তায় তুললেন। ডান দিক দিয়ে ঝড়ের বেগে একটা দৈত্য-লরি বেরিয়ে গেল। বড়মামা চমকে বাঁ পাশে আমার দিকে কাত হয়ে পড়লেন। মেজমামা পেছন থেকে বলে উঠলেন, 'জয় ঠাকুর, প্রাণে বাঁচলে হয়।'

মাসিমা বললেন, 'ভয় পেও না, রাখে কেষ্ট মারে কে, মারে কেষ্ট রাখে কে ?'

বড়মামা বললেন, 'ঘাবড়াও মাত। তোমরা শুধু লরিগুলোকে একটু কনট্রোলে রাখো।'

মেজমামা প্রশ্ন করলেন, 'কীভাবে ?'

'পেছনে যারা আছ, তারা পেছনে তাকিয়ে থাকো। লরি এলেই আমাকে জানাবে।'

'তোমার মাথার ওপর একটা আয়না আছে। কী জন্যে আছে ?'

'আয়না দেখে বোঝা যায় না, আসছে না যাচ্ছে। গুলিয়ে যায়।'

গাড়ি চলেছে, গুড়গুড় করে। আর কতদূর! ভীষণ ভয় করছে। বড়মামা গাড়ি চালাচ্ছেন, না কোদাল চালাচ্ছেন, বোঝা শক্ত।

॥ ২ ॥

বড়মামার গাড়ি বড় রাস্তা ছেড়ে বাঁ দিকে বাঁক নিল। রাস্তাটা তেমন চওড়া না হলেও, পাকা। নতুন পিচ পড়েছে। দু'পাশে বিশাল দুই কারখানার জেলখানার মতো পাঁচিল। বাঁ পাশের দেয়ালে একটা সাইনবোর্ড। আমরা যেদিকে চলেছি সেই দিকে তীর-চিহ্ন। গোটা গোটা অক্ষরে লেখা, ফুলবাগানের ঝিল। উদয়াস্ত মাছ ধরার ব্যবস্থা। পাশের জন্যে যোগাযোগের ঠিকানা, বোকুবাবু, ছোকোন ঘোষের চায়ের দোকান, কুলতলি। দশটা-পাঁচটা। পাশের হার, দশ টাকা।

স্টিয়ারিং নিয়ে যুদ্ধ করতে করতে, বড়মামার নজরে সাইনবোর্ডটা পড়ে গেল। গাড়ি আড় হয়ে ঢুকছিল। স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। বাঁ দিকে হেলে, আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে, বড়মামা বললেন, 'পড় তো, পড় তো। কী লেখা আছে পড় তো!'

গাড়ির পেছন দিকে দুম করে কী একটা ধাক্কা মারল। সামান্য একটু দুলে উঠলুম আমরা। দুমদাম করে নানা রকমের জিনিস পড়ে যাবার শব্দ হল। শুধু পড়ল না, পড়ে গড়াতে শুরু করল। মাছ ধরার নোটিস আর পড়া হল না। সব কটা মাথা ঘুরে গেল পেছন দিকে। একটা সাইকেল-রিকশা। পেছনের কাঁচে ভাসছে রিকশা-চালকের মুখ। আরোহী আসছিলেন একগাদা বিভিন্ন মাপের অ্যালুমিনিয়ামের কৌটো নিয়ে। ধাক্কার ঝাঁকুনিতে সব ছিটকে পড়েছে। গড়গড়িয়ে কিছু চলে গেছে নর্দমায়। কালো জলের ওপর ভাসছে সাদা চকচকে কৌটো।

বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে নেমে পড়লেন। গাড়ির গায়ে চোট লেগেছে, আর রক্ষা আছে! গাড়ি হল বড়মামার প্রাণ। বড়মামা নামার সঙ্গে সঙ্গে আমিও নামলুম। পেছন দিকে তাকিয়ে মাসিমা আর মেজমামা বসে রইলেন।

বড়মামা ঝুঁকে পড়ে পেছনের বাম্পারটা দেখে বললেন, 'এটা কী হল ?'

রিকশাচালক বললে, 'আমার কী দোষ, আপনি হঠাৎ থামলেন কেন ?'

'সামনের গাড়ি থামলে পেছনের গাড়িকেও থামতে হয়। গাড়ি চালাবার ব্যাকরণ না শিখেই সিটে উঠে বসেছ ?'

'আপনিও ব্যাকরণ তেমন জানেন বলে মনে হচ্ছে না। জানলে এমন দুম করে মোড়ের মাথায় থেমে পড়তেন না।'

রিকশার আরোহী নামার জন্যে হাঁচড়পাঁচড় করছেন। পারছেন না। অ্যালুমিনিয়ামের হাজার-হাজার কৌটো নড়াচড়া বন্ধ করে দিয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে কৌটো-মানব। মুখটি শুধু জেগে আছে। কৌটো-মানব বললেন, 'আপনার আর কী হয়েছে! রিকশার ধাক্কায় মোটর-গাড়ির কিছু হয় না। ক্ষতি হল আমার। নর্দমার দিকে তাকিয়ে দেখুন। আমার এত দামের কৌটো খানায় ভাসছে।'

বড়মামা ঢুলুঢুলু চোখে খানার দিকে তাকালেন। কারুর ক্ষতি হলে বড়মামার বুক মুচড়ে ওঠে। মেজমামা নেমে এসেছেন। অবাক হয়ে আরোহীকে দেখছেন। থাকতে না পেরে প্রশ্ন করলেন, 'কী করে আপনি অমন হলেন ?'

'কী রকম ?'

'অমন কৌটোময়, কৌটোসমৃদ্ধ! কে আগে উঠেছে ? আপনি আগে, না কৌটো আগে ?'

'এটা একটা প্রশ্ন হল ? দেখলেই তো বোঝা যায়। আগে আমি, তারপর কৌটো।'

'কী করে নামবেন ?'

'হ্যাঁ, এটা একটা প্রশ্ন। সে এক সমস্যা মশাই। আমাকে না নামালে, আমার ক্ষমতা নেই নামার।'

'কেউ যদি না নামায়, সারা জীবন ওইভাবে বসে থাকতে হবে ? আপনার তো মশাই আচ্ছা লোভ!'
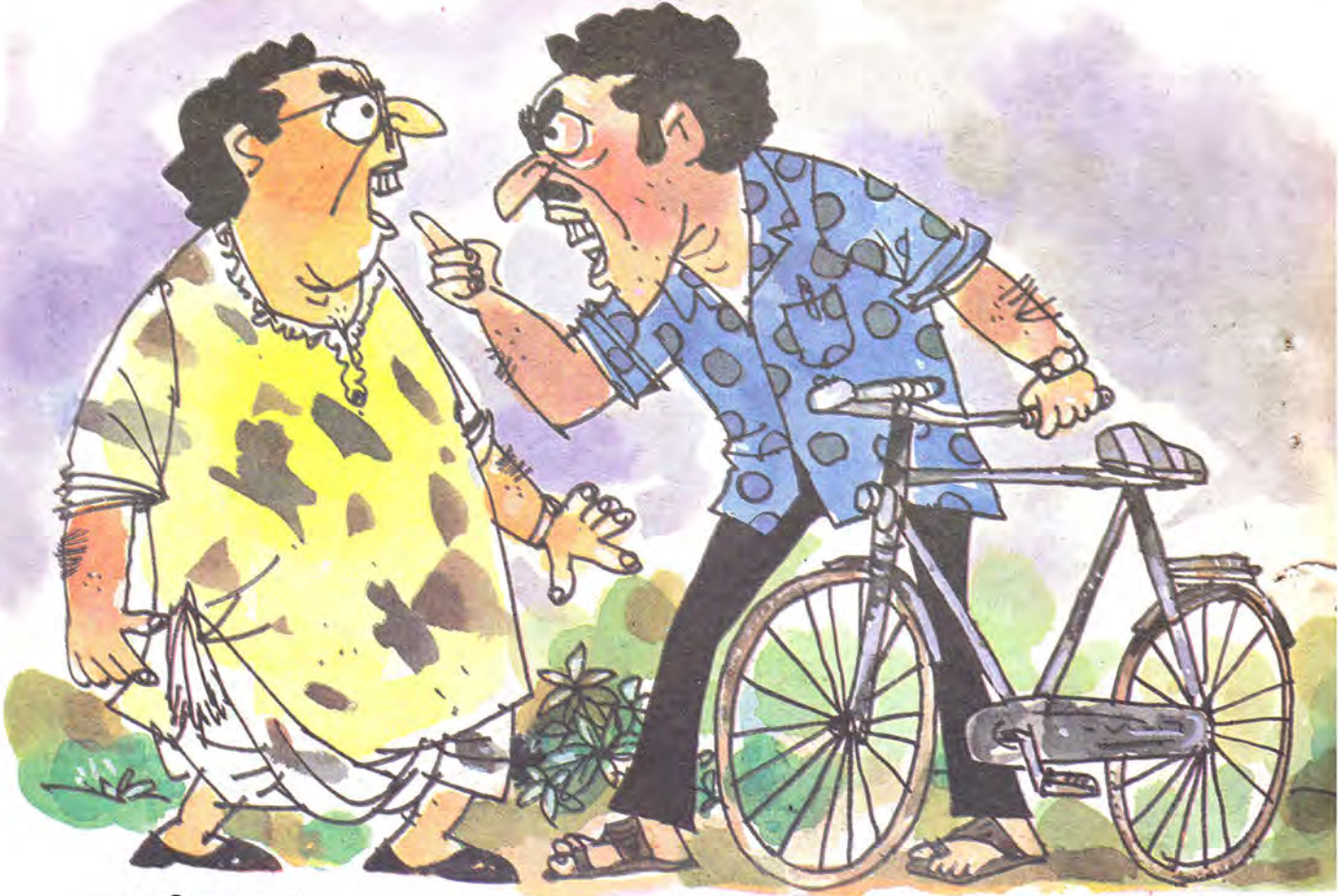
'লোভের কী দেখলেন ?'

'কৌটোর লোভ অবশ্য আমারও আছে, তবে আপনার চেয়ে অনেক কম। আপনি একেবারে গোটা একটা কৌটো-কারখানা কিনে এনেছেন !'

'উঁহু, উঁহু, বর্তমান কাল নয়, অতীত কাল হবে। কিনেছিলুম, এখন চলেছি ফেরত দিতে।'

'এত কৌটো সব আবার কিনে ফেরত দেবেন ? বড় দুঃখ হচ্ছে।'

'দুঃখ ! একটা কৌটোরও আপনি ঢাকনা খুলতে পারবেন না। যদি পারেন, আমার কান কেটে ফেলে দোব।'

'সে কী ? কোথা থেকে কিনেছিলেন ?'

'কে এক মশাই, ডাক্তার সুধাংশু মুখোপাধ্যায়, কুলতলিতে দুঃস্থ মহিলা সমিতি খুলেছেন, এ হল সেই সমিতির কারখানায় তৈরি ডিফেকটিভ মাল। মহিলা সমিতির নামে চালাতে চেয়েছিল। কৌটোর ধর্ম কী ?'

'আজ্ঞে টানলেই ঢাকনা খুলবে।'

'এ সব হল বিধর্মী কৌটো।'

'ডাক্তার সুধাংশু মুখোপাধ্যায় এই মুহূর্তে আপনার সামনে দণ্ডায়মান।'

'অ্যাঁ, তাই নাকি ? আপনিই সেই পরোপকারী ডাক্তারবাবু ?'

বড়মামা লাজুক-লাজুক মুখে বললেন, 'নমস্কার, নমস্কার।'

'আমাকে নমস্কার করে আর লজ্জা দেবেন না, আপনাকেই আমার শত কোটি প্রণাম করা উচিত। কী জিনিস বানিয়েছেন ডাক্তারবাবু, মানুষের প্রাণ ভরে রাখলে, যমেও ছুঁতে পারবে না। দেখা হয়ে ভালই হয়েছে রিকশাটাকে ছেড়েই দি। মাল সব গাড়ির পেছনে ভরে দেওয়া যাক। নর্দমায় যে কটা ভাসছে, নিজেই গুনে নিন। আমার এদিককার হিসেব ঠিক আছে।

মোটাসোটা চৌকো ধরনের ভদ্রলোক কৌটোর স্তূপ ঠেলে রিকশা থেকে নেমে এলেন। মালকোঁচা-মারা ধুতি। গায়ে শার্ট। বুক-পকেটে অ্যাতো কাগজপত্র ঠেসেছেন, ফেটে বেরিয়ে না যায়। গায়ের রঙ মিশকালো। দু' পাটি ঝকঝকে সাদা নিম-দাঁতন করা দাঁত। হাসিটা সেই কারণেই বড় স্পষ্ট।

বড়মামার গাড়ির বুটে একে একে সব ঢুকে গেল। ভদ্রলোক পেছনের আসনে জাঁকিয়ে বসলেন। এমন ভাবে বসেছেন, যেন নিজের গাড়ি। মেজমামা মাঝখানে। মুখ দেখে মনে হচ্ছে বেশ বিরক্ত হয়েছেন।

ভদ্রলোক হাত জোড় করে মাসিমা আর মেজমামার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'আমার নাম শ্রীআশুতোষ দাস। মল্লারচকে আমার মিষ্টির দোকান। এই রিসেন্টলি বেলের মোরব্বার কারবারে নেমেছি। ভেরি গুড মার্কেট। মিড্‌ল ইস্ট, জাপান, হংকং, হনলুলু, কামস্কাটকা, ফ্রান্স্‌, অ্যামেরিকা, জার্মানি, কোথায় না, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে, এ দাস্‌'স বেঙ্গলকুইন ইন থিক সিরাপ।'

কথা শেষ করে হাত খুললেন। মেজমামার মুখের চেহারা পাল্টে গেল ভদ্রলোকের মুখে পরিষ্কার ইংরেজি শুনে। বেশ শিক্ষিত বলেই মনে হচ্ছে, অথচ মিষ্টির কারব্যারি ! বড়মামার গাড়ি চলেছে ফুরফুর করে। ইঞ্জিনের শব্দ শুনলে মনে হবে বড়দাদু ভুড়ুক ভুড়ুক করে তামাক খাচ্ছেন।

মেজমামা শুদ্ধ বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'মশায়ের শিক্ষাদীক্ষা ?'

আশুবাবু খুব বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'যৎসামান্য। বায়ো কেমিস্ট্রিতে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট করার পর কিছুকাল একটা ফার্মে চাকরি। ভাল লাগল না দাসত্ব। কী করি, কী করি ? পিতার মৃত্যুর পর বসে পড়লুম দোকানে। ইনস্টিট্যুট অব কেটারিং টেকনোলজি থেকে একটা ডিপ্লোমা বাগিয়ে আনলুম। শিক্ষার কি শেষ আছে।

মিষ্টির জগতেও যে কত কী দেবার আছে !'

'মিষ্টির জগৎকে কী আর দেবেন ? সবই তো দেওয়া হয়ে গেছে। রসগোল্লা, সন্দেশ, ক্ষীরমোহন, রাজভোগ, লেডিকেনি, সীতাভোগ, মিহিদানা, চমচম, দধি, পয়োধি। নতুন আর কী দেবার আছে ?'

'আছে, আছে মুকুজ্যেমশাই। সব বিভাগেই রিসার্চের প্রয়োজন আছে। দুব্বোঘাসের কচুরি খেয়েছেন ?'

'দুব্বোঘাসের কচুরি ? জীবনে শুনিনি।'

'দয়া করে আমার দোকানে একদিন পায়ের ধুলো দেবেন। দেবেন। দুব্বোর মতো খাদ্যগুণে ভরপুর জিনিস আর দুটো নেই। গোরুরা জানে। সেই দুব্বোকে আমি বাঙালির নোলায় ফেলেছি।'

'নোলা শব্দটা পাল্টানো যায় না আশুবাবু ?'

'কেন বলুন তো ? নোলা কি খুব খারাপ শব্দ। নোলা শব্দটা মনে হয় ইংরেজি নলেজ শব্দ থেকে এসেছে।'

'প্লিজ, আপনি আর ভাষাতত্ত্ব নাড়াচাড়া করবেন না। মিষ্টান্নতত্ত্বেই আপনার নলেজকে ধরে রাখুন। আজেবাজে কথা শুনলে আমার ভীষণ ইরিটেশান হয়। সারা গা লাল-লাল চাকা-চাকা হয়ে ফুলে ওঠে।'

'অ্যাঁ, সে কী ? অ্যালারজি ! ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে এক দাগ ওষুধ খেয়ে নিলেই তো সেরে যায় !'

'খেয়ে দেখেছি। কিস্যু হয় না।'

'কিসে সারে তা হলে ?'

'গোটা-দুই চড় কষাতে পারলেই সেরে যায়।'

'তা হলে থাক, ভাষাতত্ত্ব না আলোচনা করাই ভাল। গায়ে লাল-লাল চাকা-চাকা হয়েছে ?'

'না, এখনও তেমন হয়নি।'

'জয় গুরু !'

'হ্যাঁ, জয় গুরু। আপনার ওই খাবার নিয়ে রিসার্চের কথা বলুন। শুনতে বেশ ভাল লাগছে।'

'খেতে আরও ভাল লাগবে। কচুরিপানা দিয়ে একটা আইটেম বানিয়েছি। ক্ষীরকচুরি, অসাধারণ জিনিস। এক সপ্তাহ খেলে তিন কেজি ওজন বাড়বে। বাড়বেই বাড়বে। কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

'ওজন কমাবার কিছু নেই ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, কাগজের সন্দেশ।'

'সে আবার কী ?'

'উঃ, সে এক অসাধারণ জিনিস। ছানার কোনো ব্যাপার নেই। কাগজের মণ্ড চিনি দিয়ে ভাল করে পাক করে ছাঁচে ফেলে সন্দেশ। একটা খেয়ে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল চালিয়ে দিন। ধীরে ধীরে পেট ফুলতে শুরু করবে। এক সময় জয়ঢাক। বুক আর পেট এক হয়ে যাবে। কম-সে-কম দু' দিন আর হাঁ করতে হবে না।'

'বাঃ, বেশ ভাল জিনিস বানিয়েছেন তো !'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। একেবারে আমাদের দেশের উপযোগী। এই আক্রা-গণ্ডার বাজারে সংসার চালাতে প্রাণান্ত। যে বাড়িতে দশ-বিশটা মুখ কেবল হাঁ-হাঁ করছে, সেখানে একটি করে এই সন্দেশ আর এক গেলাস কলের জল। দু দিন সব ঠাণ্ডা।'

'খেতে কেমন হয়েছে ?'

'অতি সুস্বাদু। একটা খেলে আর-একটা খেতে ইচ্ছে করবে, তবে দুটো না খাওয়াই ভাল।'

'এক-একটার দাম কত ?'

'মাত্র একটাকা।'

বড়মামা আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন আর সেই হাসিই হল সর্বনাশের কারণ। স্টিয়ারিং বাঁ দিকে বেমক্কা মোচড় খেল। গাড়ির সামনের বাঁ দিকের চাকা গোঁত করে পড়ে গেল পথের

পাশের খানায়। স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। বেশ বড় রকমের ম্যাজিক দেখাবার পর ম্যাজিশিয়ান দুটো হাত যেভাবে আকাশের দিকে তোলেন, বড়মামা সেই ভাবে হাত দুটো ওপরের দিকে তুলে চুপ করে বসে রইলেন।

আশুবাবু জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একবার দেখে নিয়ে বললেন, 'কী হল স্যার ?'

বড়মামা হালকা সুরে বললেন, 'অধঃপতন, পদস্খলনও বলা চলে।'

মাসিমা বললেন, 'এবার তা হলে কী হবে ?'

বড়মামা বললেন, 'কিছুই না। কী আবার হবে ! স্টার্ট তো অটোমেটিক বন্ধ হয়ে গেছে। আমার গাড়ি কত ভদ্র দেখেছিস কুসি ! যেই দেখলে ভুল পা পড়েছে, অমনি চলা বন্ধ হয়ে গেল। একেই বলে জেন্টলম্যান।'

মেজমামা বললেন, 'তোমার লেকচার বন্ধ করে গাড়িটা ব্যাক করে তোলার চেষ্টা করো।'

'অতই যদি সোজা হত ব্রাদার ! এ তো আর মানুষ নয়, এ হল গাড়ি। পতন আছে, উত্থান নেই।'

'তুমি এখন তা হলে কী করবে ?'

'তোমাদের সকলকে নামাব। তারপর ঠেলে তোলাব।'

'আমরা একটা সভা করতে যাচ্ছি। আমি হলুম গিয়ে সেই সভার সভাপতি। সভাপতি গাড়ি ঠেলবে ?'

'কেন, যে রাঁধে সে চুল বাঁধে না ! তুমিই না থেকে থেকে বলো, সেল্ফ হেলপ ইজ বেস্ট হেলপ। নাও, মেজাজ খারাপ না করে লক্ষ্মী ছেলের মতো আশুবাবুকে নিয়ে নেমে পড়ো। কিছুই না, একটু পেছন দিকে ঠেলে দিলেই রাস্তায় উঠে পড়বে।'

'আর তুমি কী করবে ?'

'আমাকে তো স্টিয়ারিং-এ বসতেই হবে ভাই। আমি যে কাণ্ডারী।'

'এমন জানলে তোমার গাড়িতে কে উঠত বড়দা ! তোমার মতো এমন ব্যাড ড্রাইভার কী করে লাইসেন্‌স পেল কে জানে ! ঘুষের খেলা।'

'আমি খুব একটা খারাপ ড্রাইভার নই ব্রাদার। আশুবাবুর হাজারখানেক কৌটো গাড়িকে বেটাল করেছে। গাড়ি কাত হওয়া মাত্রই গড়িয়ে ডান থেকে বাঁ দিকে চলে গেছে। দোষ আমার নয়, দোষ গাড়ির নয়, দোষ হল কৌটোর। আর দোষ হল তাদের, যারা পথের পাশে গাড়ি ধরার জন্যে নর্দমা পেতে রাখে।'

পেছনের আসন থেকে মেজমামা, আশুবাবু নেমে পড়লেন। মেজমামা সমানে গজগজ করে চলেছেন। আশুবাবুর মুখে লেগে আছে মিষ্টি হাসি। এমন মুখ দেখলে তবেই মনে হয়, জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।

মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'আমিও ঠেলব বড়দা ?'

'না, তোকে আর ঠেলতে হবে না, তুই নেমে দাঁড়িয়ে পুরো ব্যাপারটা পরিচালনা কর। তোর ভূমিকা হল, ডিরেক্টার অপারেশান।'

সামনের আসন থেকে আমিও নেমে পড়লুম। আমাকেও তো একটা কিছু করতে হয়। সামনের দিক থেকে ঠেলেঠুলে গাড়িটাকে পেছোতে হবে। একটা পাশ নর্দমায় কেতরে গেছে। ডানপাশ উঁচু হয়ে আছে। মেজমামা দেখেশুনে বললেন, 'অসম্ভব ব্যাপার। ইমপসিব্‌ল। সামনে দাঁড়াবার জায়গা নেই। ঠেলব কী করে ?'

আশুবাবু বললেন, 'অসম্ভব বলে কিছু নেই পৃথিবীতে। সবই সম্ভব। ইচ্ছে থাকলেই উপায় বেরোবে।'

'আমার ইচ্ছেও নেই, উপায়ও দেখতে পাচ্ছি না। আপনি তাহলে একাই ঠেলুন। অনেক রকম মিষ্টির ফিরিস্তি তো শোনালেন, সে সব নিজেও নিশ্চয় খেয়েছেন। ভেতরে অনেক হর্স-পাওয়ার জমা হয়েছে। আজ তার পরীক্ষা হয়ে যাক।'

আশুবাবু মৃদু হেসে বললেন, 'তবে তাই হোক। আমি এক হাতে পেছনের বাম্পার ধরে টেনে তুলে দোব। একটা গাড়ির ওজন আর কত হবে ? বিশ-বাইশ মণ !'

'আমি আমার ওজন জানি মশাই। গাড়ির ওজন জানা নেই।'

'ওই বিশ-বাইশ মণই হবে।'

আশুবাবু ঘুরে পেছন দিকে চলে গেলেন। আজ আশুবাবুর কপালে গভীর দুঃখ লেখা আছে। ব্যায়ামবীরের কাজ কি সাধারণ মানুষে পারে। হেরে ভূত হয়ে যাবেন। আর মেজমামা তালি বাজাবেন।

আশুবাবু প্রথমে মালকোঁচা মেরে নিলেন। তারপর চোখ বুজে হাত জোড় করে নমস্কার করতে করতে বললেন, 'জয় মহাবীরজি কি জয় !'

চোখ খুলে বললেন, 'আপনারা সেই মন্ত্রটা সমস্বরে, তালে তালে, সুর করে পতে পারবেন ?'

মেজমামা বললেন, 'কোন্‌টা ?'

'ওই যে, সেই শক্তিসঞ্চারী মন্ত্র, ঘাস-বিচুলি হেঁইও, আউর থোড়া হেঁইও, বয়লট ফাটে হেঁইও।'

'ওসব আমার দ্বারা হবে না।'

'খোকাবাবু, তুমি পারবে ?'

খোকাবাবু বলায় ভীষণ রাগ হলেও বললুম, 'হ্যাঁ, পারব।'

'দেন স্টার্ট।'

'ঘাস-বিচুলি হেঁইও, আউর থোড়া হেঁইও, বয়লট ফাটে হেঁইও...।'

আশুবাবুর ডান হাত বাম্পারে, বাঁ হাত কোমরে। ধীরে ধীরে টানছেন। গাড়ি দুলছে। 'আউর থোড়া হেঁইও, বয়লট ফাটে হেঁইও।' ভদ্রলোকের মুখ জবাফুলের মতো লাল হয়ে উঠেছে। গলার শিরা ফুলে উঠেছে।

হঠাৎ কী হল কে জানে ! বড়মামার গাড়ি ঘোঁত ঘোঁত করে দু'বার শব্দ করে উঠল। সামনের চাকা দুটো ফর্‌র ফর্‌র করে দুবার ঘুরে গেল অকারণে। একই সঙ্গে দুটো ঘটনা ঘটে গেল। চরকির মতো নর্দমার থকথকে কাদা ছিটকে উঠে মেজমামাকে স্প্রে-পেন্ট করে দিলে। সাদা জামা-কাপড় আর সাদা রইল না। হরিণের মতো চাকা-চাকা কালো দাগ সারা শরীরে। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। ফর্সা মুখে খাড়া উঁচু নাক। চোখে ব্রহ্মতেজ। পারলে গাড়িটাকে ভস্ম করে দেন। ওদিকে গাড়িটা ঝিকি মেরে হাতখানেক পেছিয়ে গেছে আচমকা। আশুবাবু উল্টে পড়ে আছেন মাটিতে। করুণ সুরে বলছেন, 'আর করব না, কক্ষনো করব না। দোহাই মহাবীর, মাপ করো মহাবীর।' মাসিমা গাড়ির আড়ালে ছিলেন বলে বেঁচে গেছেন ছেটকানো কাদার হাত থেকে। মাসিমা ছুটে গিয়ে আশুবাবুকে ভূমিশয্যা থেকে টেনে তুললেন। গাড়ি অবশ্য দু'ধাপ পেছিয়ে থেমে পড়েছে। নর্দমা থেকে চাকাও উঠে পড়েছে।

'জয় মহাবীরের জয়' বলতে বলতে আশুবাবু উঠে দাঁড়িয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে আবার প্রণাম করলেন। মেজমামা ধীরে ধীরে বড়মামার দিকে এগোতে লাগলেন। দাঁত কিড়িমিড়ি করছে।

'এটা কী হল বড়দা ?'

বড়মামা হাসতে হাসতে বললেন, 'তোকে অস্‌সাধারণ দেখাচ্ছে রে ! অনেকটা ডালমেশিয়ানের মতো, সাদার ওপর কালোর স্পট।'

'তোমার রসিকতা রাখো। এটা কী করলে তুমি ?'

'আমি কেন করব রে বোকা। করেছে আমার গাড়ি।'

সাইকেলে রাগী-রাগী চেহারার এক ভদ্রলোক আসছিলেন। হঠাৎ থেমে পড়ে বললেন, 'কী, হল কী ? ভিড়িয়ে দিয়েছে বুঝি ! বেশ ভাল করে চাবকে দিন মশাই। হাতে স্টিয়ারিং পড়লে, কাপ্তেনদের আর জ্ঞান থাকে না।'

আশুবাবু বললেন, 'আরে না না, এ আমাদের নিজেদের ব্যাপার। আপনি যেখানে যাচ্ছেন যান। মাথা গরম করবেন না।'

'অ, তাই নাকি, সেমসাইড হয়ে গেছে!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, বড় ভাই আর মেজ ভাইয়ে হচ্ছে। এখুনি মিটমাট হয়ে যাবে।'

'অ, ভাইয়ে ভাইয়ে হচ্ছে। সহজে মিটমাট হয়ে যাবে ভেবেছেন? কোথায় আছেন আপনি? কোর্ট অবদি গড়াবে। বছরের পর বছর চলবে। ভিটেতে পাঁচিল পড়বে। গাড়ির নাট-বল্টু খুলে খুলে ভাগাভাগি হবে। আছেন কোথায় মশাই? শোনেননি, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।'

মেজমামা ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ধ্যার মশাই। বাজে কথা না বলে যেখানে যাচ্ছেন সেখানে যান। বাঙালির স্বভাবই হল সব ব্যাপারে নাক গলানো।'

ভদ্রলোক তড়াক করে সাইকেল থেকে নেমে পড়লেন, 'কী হল? কথাটা কী হল? খুব মেজাজ লিচ্ছেন মনে হচ্ছে। প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়িয়ে খুব বড়ছোট কথা হচ্ছে? জানেন আমি কে?'

মেজমামা রাগের মাথায় বলে ফেললেন, 'জানি জানি, লাটসাহেবের নাতি।'

'মুখ সামলে। খুব সাবধান।'

'আরে মশাই যান, সব করবেন আপনি!'

'দেখবেন তা হলে?

'হ্যাঁ দেখব।'

বড়মামা নেমে এলেন, 'কী হচ্ছে কী? তিল থেকে তাল।'

ভদ্রলোক বললেন, 'তিল মানে? এটা তাল। তালকে আমি তাল-তাল করে ছাড়ব।'

আশুবাবু দু'ধাপ এগিয়ে এসে বললেন, 'নাঃ, আর সহ্য হচ্ছে না। এবার একটু হাত লাগাতে ইচ্ছে করছে।'

বড়মামা বুদ্ধদেবের মতো হাত তুলে আশুবাবুকে থামিয়ে বললেন, 'মুখটা খুব চেনা-চেনা মনে হচ্ছে! হ্যাঁ, চেনাই তো! তোমার নাম সরোজ মাইতি না! আজ থেকে বছর-তিনেক আগে মাঝরাতে তোমার অ্যাপেনডিক্স ফাটো-ফাটো হয়েছিল, মনে পড়ে? তোমার মা এসে কেঁদে পড়েছিলেন। সেই রাতেই তোমাকে অপারেশান করেছিলুম। অপারেশান না করলে মরে ভূত হয়ে যেতে এত দিনে! অপারেশানের ফি-টা অবশ্য এখনও বাকি আছে! তোমার বোলচাল তো বেশ ফুটেছে কার্তিক!'

লোকটি কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল। মুখে আর কথা সরছে না। নাকি সুরে বললে, 'কে, ডাক্তারবাবু? চিনতে পারিনি স্যার। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে আছেন তো, চেহারাটা কেমন যেন পালটে গেছে। ক্ষমা করবেন স্যার। বড় কষ্টে আছি।'

'কষ্টে কেন?'

'ব্যবসাটা লাটে উঠে গেল স্যার।'

'কী ব্যবসা ছিল তোমার?'

'আজ্ঞে, তেলেভাজার দোকান।'

'তেলেভাজা! আহা, বড় ভাল জিনিস! একেবারে উঠে গেল! একটুও নেই?'

'আজ্ঞে না। এমনকি উনুনটাও ভেঙে গেছে।'

'উনুনটা ভাঙলে কী করে?'

'পাওনাদারে লাথি মেরে ভেঙে দিয়ে গেছে।'

'দোকানঘরটা আছে?

'তা আছে। তালাবন্ধ পড়ে আছে।'

'কী কী তেলেভাজা হত? আলুর চপ হত?'

'ওইটাই তো আমার স্পেশাল আইটেম ছিল স্যার। বনগাঁ, বসিরহাট থেকেও খদ্দের আসত গাড়ি চেপে কার্তিকের লড়াইয়ের চপ খেতে।'

'লড়াইয়ের চপ! বলো কী? লড়াইয়ের চপ! কত টাকা হলে আবার দোকানটা চালু করা যায়?'

মাসিমা বড়মামার হাত খামচে ধরলেন। বড়মামা ঝটকা মেরে মাসিমার হাত সরিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'বেড়ালের মতো আঁচড়াচ্ছিস কেন কুসি? খিদে পেয়েছে?'

মাসিমা ফিসফিস করে বললেন, 'আবার টাকা পয়সার মধ্যে ঢুকছ কেন বড়দা?'

কার্তিকবাবু শুনতে পেয়েছেন ঠিক, বললেন, 'ওঁর যে দয়ার শরীর দিদি। দু'হাতে যেমন রোজগার করছেন, দু'হাতে তেমনি গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়েও যাচ্ছেন। জানেন যে, যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।'

আশুবাবু বললেন, 'আরে মূর্খ, সেটা টাকা নয়, বিদ্যে। উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে।'

'মূর্খ আপনি।'

'আবার চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। এ দেখি ধরলে চিঁ চিঁ করে। ছেড়ে দিলে তুড়ি লাফ মারে!'

বড়মামা বললেন, 'আহা, বেচারার মথার ঠিক নেই। হ্যাঁ, কত টাকা হলে দোকান আবার চালু করা যায়?'

'সে অনেক টাকা বড়বাবু। অত টাকা কি আপনি দিতে পারবেন? আপনি দিতে চাইলেও এঁরা কি দিতে দেবেন? হাত চেপে ধরবেন।'

ইলেকট্রিক শক খেলে যেমন হয়, বড়মামা চমকে উঠলেন। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'আমার টাকা, আমি তোমাকে দোব, কে তাতে বাধা দেবে! হু আর দে! তুমি, আমি আর আমাদের তেলেভাজার দোকান। বলো কত টাকা?'

'আজ্ঞে তা প্রায় হাজার-তিনেক টাকা। হাজার খানেকের মতো

দেনা আছে। একটা বড় কড়াই কিনতে হবে। উনুনটাকে ফের বানাতে হবে। তারপর তেল, ব্যাসন, আলু, বেগুন।'

'বেগুন ? বেগুন কী হবে ? তুমি তো বানাবে আলুর চপ !'

'আজ্ঞে স্যার, বেগুনি ছাড়া তেলেভাজার দোকান জমে না।'

'না, না, বেগুন-ফেগুন চলবে না। বেগুনে আমার অ্যালার্জি আছে।'

'আপনার অ্যালার্জি থাকলে কী হবে স্যার। চিরকাল লোকে চেয়ে আসছে, আলুর চপ, বেগুনি।'

আশুবাবু বললেন, 'লাইক ব্রেড অ্যাণ্ড বাটার, মিল্ক অ্যাণ্ড হানি, রোজ অ্যাণ্ড থর্ন, সাবজেক্ট অ্যাণ্ড প্রেডিকেট।'

বড়মামা বুদ্ধদেবের মতো হাত তুলে বললেন, 'ব্যাস, ব্যাস, হয়েছে, হয়েছে। বেগুনি হলে আমি একটি ফার্দিংও দোব না। আমি হলুম গিয়ে এক কথার মানুষ। বেগুনের গুণ নেই।'

'তা হলে স্যার পটুলি কি কুমড়ি ?'

'হ্যাঁ, তা চলতে পারে। এমনকি ফুলুরিও অ্যালউড।'

আশুবাবু বললেন, 'ফুলুরি খুব টেস্টফুল, তবে কিনা উচ্চারণটা বড় গোলমেলে। মাঝে মাঝে ফুরুলি বেরিয়ে যায়। যেমন বাতাসাটা মাঝে মাঝেই বাসাতা হয়ে যায়। যেমন পুঁটি মাছ। সেদিন বাজারে গিয়ে কিছুতেই আর মুখ দিয়ে বেরোল না, কেবলই বলি পুঁচি মাট। যেমন ফুলে ঢোল। হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে যায় ঢুলে ফোল। যেমন হাউসফুল আর হাউল ফুস। কী যে সব ডেনজারাস ডেনজারাস মুশকিলের ব্যাপার।'

মেজমামা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে ছিলেন। এবার বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ধ্যাত তেরি কা। পাগলের পাল্লায় পড়ে জীবনটা গেল। চল্, কুসি, আমরা চলে যাই।'

'আমি তো যাবার জন্যে পা বাড়িয়েই আছি। শুনলে না, একটু আগেই বলেছে, হু আর দে।'

'ঠিক ঠিক। আমরা হলুম গিয়ে ঠ্যালার লোক। নর্দমায় গাড়ি পড়লে ঠেলে তুলে দিতে হবে।'

বড়মামা একগাল হেসে দু'জনের দিকে তাকালেন। 'কেন রাগ করছিস পাগলা ? ইউনাইটেড উই স্ট্যাণ্ড। দেখলি না সকলের চেষ্টায় গাড়ি কেমন গাড্ডা থেকে উঠে পড়ল। গাড়ির শিক্ষা আমাদের জীবনের শিক্ষা। ঐকতান মাস্টার, ঐকতান। অনৈকতানে বাঙালি জাতটাই নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে।'

'তোমার লজ্জা করে না বড়দা, এই কাদামাখা অবস্থায় আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছ ! লোকে কী ভাবছে ?'

'লোকভয় ! এখনও এই বয়েসে তোর লোকভয় ! অশ্বিনী দত্ত মশাইয়ের লেখাটা আর-একবার পড়িস। জীবনে জ্ঞানের আলো ফেল পাগলা, জ্ঞানের আলো ফেল। নে, গাড়িতে উঠে পড়। ওখানে গিয়ে তোর জামাকাপড় পালটে দোব। তোরটা আমি পরব, আমারটা তুই পরবি।'

'আহা ! কী কথাই বললে ! তুমি আমার চেয়ে আধহাত লম্বা। তোমার পাঞ্জাবি তো আমার গায়ে লটরপটর করবে।'

'হাতার বাড়তি অংশটা কাঁচি দিয়ে ছেঁটে দেব। লোকে বলে হাতে পাঁজি মঙ্গলবার, আমি বলি হাতে কাঁচি হাতা লটরপটর। নে, উঠে পড়। অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেল। টাইম ইজ মানি।'

'তোমাকে দেখে তা মনে হয় না বড়দা। তোমার কাছে টাইম ইজ গানি।'

'তার মানে ? গানি মানে কী ?'

'গানি হল চট। তোমার কাছে সময় হল চটের মতোই মূল্যহীন।'

'ওরে পাগলা, চটের দাম জানিস ? জানলে আর মানির সঙ্গে গানি মেলাতিস না। চট সায়েবদের দেশে চালান যায়।'

বড়মামা বীরের মতো স্টিয়ারিং-এ বসলেন। আমরা সুড়সুড় করে যে যার আসনে। মাসিমা সিঁটিয়ে বসেছেন মেজমামার স্পর্শ বাঁচিয়ে।

মেজমামা বললেন, 'তুই অমন সিঁটিয়ে আছিস কেন কুসি ?'

'তুমি নর্দমা ছুঁয়েছ মেজদা। গায়ে গঙ্গাজল না ছিটোলে শুদ্ধ হবে না।'

'অ, তাই নাকি ? অদ্ভুত বিচার !'

'ছোঁয়াছুঁয়ি মানতে হয় মেজদা। তুমি এখন অপবিত্র।'

'আমি না তোর মেজদা !'

'হতে পারো মেজদা, তবে অপবিত্র মেজদা।'

বড়মামা গাড়িতে স্টার্ট দেবার চেষ্টা করছেন। ঘুরর ঘুরর আওয়াজ হচ্ছে, গাড়ি মাঝেমাঝে কেঁপে উঠছে, স্টার্ট কিন্তু ধরছে না। বড়মামা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছেন।

আশুবাবু বললেন, 'কী হল, গড়বড় করছে মনে হচ্ছে ?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। সেল্‌ফটা কাজ করছে না। আমাদের মধ্যে কেউ একজন অপয়া আছে।'

পেছনের আসন থেকে তিনজনে সমস্বরে বললেন, 'কে, কে, কে অপয়া ?'

'সেইটাই তো বুঝতে পারা যাচ্ছে না।'

আশুবাবু বললেন, 'আমি অপয়া নই তো ?'

মাসিমা বললেন, 'অপয়াদের চেনার কোনো উপায় আছে ? চেহারা দিয়ে বোঝা যায় ?'

আশুবাবু বললেন, 'যেমন ধরুন, আমি দৈর্ঘ্যে সামান্য খাটো, প্রস্থে একটু বিশাল, মুখটা কেমন ?'

মেজমামা বললেন, 'গোল আলুর মতো। একটু লালচে রঙ।'

'লালচে ? বলেন কী, লালচে ? তা হলে রক্ত। শরীরে রক্ত বেড়েছে।'

বড়মামা বললেন, 'আনন্দের কিছু নেই। এই বয়েসে বেশি রক্ত ভাল নয়। হাই প্রেশারে মরবেন। মাথার মাঝখানে টাক আছে ?'

মেজমামা বললেন, 'হ্যাঁ আছে। চিকচিক করছে।'

'আমি কি তাহলে অপয়া ?'

'সকালে আপনার নাম করলে হাঁড়ি চড়া বন্ধ হয় ? শুনেছেন কিছু ?'

'আজ্ঞে না, তেমন অভিযোগ তো কানে আসেনি।'

'আচ্ছা, আপনি একবার নেমে দাঁড়ান তো, দেখি স্টার্ট নেয় কি না !'

আশুবাবু নেমে দাঁড়ালেন। বড়মামার কেরামতি শুরু হল' সেল্‌ফ নিয়ে। কোথায় কী। গাড়ি স্টার্ট নিল না। আশুবাবু বড়মামার পাশে সরে এসে বললেন, 'কী মনে হচ্ছে, আমি কি তাহলে অপয়া ?'

বড়মামা বললেন, 'মনে হচ্ছে না।'

'তা হলে উঠে বসি ডাক্তারবাবু ?'

'আর উঠে কী হবে ! এবার ঠেলতে হবে। ঠেলে ঠেলে নিয়ে যেতে হবে। কতটাই বা পথ। বড় জোর এক মাইল !'

মেজমামা বললেন, 'আমি ঠেলতে পারব না। আমার ক্ষমতা নেই।'

'ছিঃ মেজ। সবে মিলে করি কাজ, হারিজিতি নাহি লাজ। একটু হাত লাগাও ভাই। মানুষ তো চিরকালই গাড়ি চেপে এল, গাড়ির যদি একদিন মানুষ চাপার শখ হয় তাতে মেজাজ খারাপ করলে চলে ? একদিনের তো মামলা রে ভাই। ইংরেজ হলে হাসিমুখে নেমে আসত, আমায় কিছু বলতে হত না।'

'আমি বাঙালি, ইংরেজ নই।'

'তা বললে চলে ? সব সময় ইংরেজির খই ফুটছে মুখে। নাও, নেমে পড়ো। দুর্গা বলে যাত্রা শুরু করা যাক। অনেক দেরি হয়ে-

গেল রে পাগলা !'

'পাগলা বলে যতই আদর করো, গাড়ি আমি ঠেলছি না। দিস ইজ টু মাচ।'

'এই তো ইংরিজি এসেছে, তার মানে ইংরেজ ভর করেছে। নাও, নেমে পড়ো। ঠেলতে শুরু করলেই দেখবে কী মজা ! গাড়ি-ঠেলার যে কত আনন্দ ! তখন থামতে বললেও আর থামতে ইচ্ছে করবে না। ঠেলে দ্যাখ, বয়েস তিরিশ বছর কমে যাবে।'

'আমি প্রতিজ্ঞা করছি বড়দা, জীবনে আর কোনো দিন তোমার গাড়িতে মরে গেলেও পা দোব না।'

'ছিঃ, প্রতিজ্ঞা করতে নেই মেজ। বাঙালির প্রতিজ্ঞা জানিস তো মেজ, এই করে এই ভাঙে। কাঁচের বাসনের মতো। তিন দিন পরেই তোমার গাড়ির দরকার হবে ভাই। মনে নেই, হাওড়ায় যাবে। প্রফেসার চিদাম্বরম আসছেন সকাল আটটা দশ মিনিটে। নাও, নেমে পড়ো। একটু ব্যায়ামও হবে। শরীরটা দিন-দিন বেঢপ হয়ে যাচ্ছে।'

দু'পাশের দরজা খুলে পেছনের আসন থেকে তিনজন নেমে পড়লেন। তেলেভাজার-দোকান-ফেল সরোজবাবু এগিয়ে এলেন, 'আমিও একটু হাত লাগাই স্যার !'

মেজমামা খ্যাঁক করে উঠলেন, 'তুমি হাত না লাগালেও টাকা পাবে। এখন বুঝছি অপয়া কে ? কাল সকালে উঠেই তোমার নাম করে দেখব, কপালে অন্ন জোটে কি না !'

'ঠিক ধরেছেন স্যার। এতক্ষণ বলিনি কিছু, চুপচাপ ছিলুম। সবাই আমাকে অপয়া বলে। নাম করলে হাঁড়ি ফেটে যায়।'

বড়মামা সামনের আসন থেকে বললেন, 'তুমি তাহলে ত্রিসীমানায় আর দয়া করে থেকো না। সরে পড়ো। আর সকালের দিকে দয়া করে বাড়িতে যেও না।'

সরোজ মাইতি সাইকেল নিয়ে সরে পড়লেন। ধীর গতিতে গাড়ি এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। আশুবাবু আর মেজমামা প্রাণপণে ঠেলছেন। মাসিমা আসছেন পায়ে পায়ে ইন্দিরা গান্ধীর মতো গম্ভীর চালে। বড়মামা গান ধরেছেন

মুক্তির মন্দির সোপান-তলে
কত প্রাণ হল বলিদান
লেখা আছে অশ্রুজলে।

আমি বনেটে টুকুস টুকুস করে তাল বাজাচ্ছি। বেশ জমে গেছে ব্যাপারটা।

॥ তিন ॥

বিরাট একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ল। কুলতলি দুঃস্থ মহিলা সমিতি। হলদের ওপর কালো অক্ষরে লেখা। তলায় ছোট ছোট করে লেখা, প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার সুধাংশু মুখোপাধ্যায়। ফুল দিয়ে সাজানো গেট। মোটা মোটা গাঁদার মালা ঝুলছে। একপাশে একটা বাছুর, আর একপাশে একটা ছাগল মনের সুখে চিবিয়ে যাচ্ছে। মাইকে স্তোত্র পাঠ হচ্ছে, যা দেবী সর্বভূতেষু। কিছুই তেমন বোঝা যাচ্ছে না। ক্যাড়ক্যাড় শব্দ হচ্ছে। গেটের ভেতরে মাঠে একদল মহিলা লালপাড় সাদা শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রত্যেকের হাতে শাঁখ।

বেশ স্বাস্থ্যবান এক ভদ্রলোক গাড়ি দেখে চিৎকার করে উঠলেন, 'এসে গেছেন, এসে গেছেন। স্টার্ট।'

সঙ্গে সঙ্গে শাঁখ বেজে উঠল। যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। ভদ্রলোক দু'হাত তুলে বড়মামাকে জানালেন, 'এইখানে স্যার, এইখানে স্যার। পার্ক করুন।'

সামনে থেকে বোঝার উপায় নেই, গাড়ি নিজের জোরে আসছে না, আসছে ঠেলার জোরে। গলদ্ঘর্ম দুটি মানুষ লেগে আছে

পেছনে

বড়মামা চিৎকার করছেন, 'স্টপ, স্টপ, নো মোর, নো মোর।

ভদ্রলোক চিৎকার করছেন, 'ব্রেক মারুন, ব্রেক মারুন।'

মেজমামাদের ঠেলার নেশায় পেয়ে গেছে। মাথা নিচু। ঠেলছেন তো ঠেলছেন। গেট ছেঁচড়ে, মালাফালা ছিঁড়ে গাড়ি ভেতরে ঢুকে গেল। তবু থামার নাম নেই। মহিলারা দৌড়ে সমিতির ঘরে। শাঁখ কিন্তু থামেনি, সমানে বেজে চলেছে। আরও জোরে। যেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হচ্ছে।

মাসিমা বলছেন, 'ও মেজদা, থামো থামো।'

মেজমামা বললেন, 'আমি কি আর ঠেলছি। আমি তো শুরু থেকেই থেমে আছি। গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে চলেছি। ঠেলছেন আশুবাবু।'

মাসিমা বললেন, 'আশুবাবুকে থামতে বলো।'

'নিজের ইচ্ছেয় উনি থামবেন কী করে? উনি তো ঘুমিয়ে পড়েছেন। নাক ডাকছে। ওর গাড়ি না থামলে আমি সোজা হই কী করে? মুখ থুবড়ে পড়ে যাব যে।'

সমিতির উঁচু রকে গাড়ি গিয়ে ঠেকল। মেয়েরা চিৎকার করে উঠল, 'যাঃ, বাড়িটা বোধহয় ভেঙে গেল!' ভাঙল না, একটা কোণ শুধু থেতরে গেল। গাড়ি থেমেছে। মেজমামা সোজা হলেন। আশুবাবু গাড়ির গায়ে ঢলে পড়লেন। গভীর ঘুম। ভোঁস ভোঁস করে নাক ডাকছে। বড়মামা হাসিমুখে নেমে এলেন, 'এই যে আমার মেজভাই। অধ্যাপক শান্তি মুখোপাধ্যায়। আপনাদের স্প্রে পেন্ট করা সভাপতি। আশুবাবু কোথায় গেলেন? আমাদের এক নম্বর পেট্রন। কোথায় তিনি?'

'তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

'সে কী, বিছানা পেলেন কোথায়?'

'বিছানার দরকার হয়নি। গাড়ির পেছনে শুয়ে পড়েছেন।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। পরিশ্রম হয়েছে। একটু বিশ্রাম করে নিন।'

আশুবাবু ঠিক এই সময় স্বপ্ন দেখে ডুকরে উঠলেন, 'মা মা, আমি কোথায়?'

মাসিমা বললেন, 'খুব হয়েছে, এবার উঠে পড়ুন।'

'অ্যাঁ, ভোর হয়ে গেছে! চা হয়ে গেছে!' ভদ্রলোক তড়বড় করে বাঁ দিকের রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করলেন।

'আরে মশাই, ওদিকে চললেন কোথায়?'

'যাই, দাঁতটা মেজে আসি।'

বড়মামা হাত চেপে ধরলেন, 'ধ্যাত মশাই, চোখ মেলে দেখুন কোথায় আছেন।'

কথা শেষ হতে না-হতেই শাঁখ বেজে উঠল।

ফট ফট করে গোটা দশ-বারো পটকা ফাটল। আশুবাবু বললেন, 'কী রে বাবা, কালীপুজো শুরু হয়ে গেল নাকি?'

রকের একধারে মঞ্চ তৈরি হয়েছে। বড় বড় চেয়ার। লম্বা একটা টেবিল। সাদা টেবিল ক্লথ। বড় দুটো ফুলদানি। নানা রঙের ফুল। পেছনে সাদা কাপড় ঝুলছে। তার ওপর বাসন্তী-রঙে সমিতির নাম। তার তলায় লেখা, প্রথম প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী। বড়মামা বলতে লাগলেন, 'আহা, কী আয়োজন! একেবারে ফাটিয়ে দিয়েছে। সুহাস একেবারে সুযোগ্য সেক্রেটারি…।'

বাকি কথা আর শোনা গেল না। মাইক ঘ্যাড়ঘ্যাড় করে উঠল, 'হ্যালো হ্যালো টেস্টিং। ওয়ান, টু, থ্রি ফোর।'

সুহাসবাবু বড়মামার কানে কানে কী বললেন। বড়মামা বললেন, 'কোথায় সে, কোথায় সে?'

'আজ্ঞে পেছন দিকের ঘরে বসে আছে।'

'চলো, চলো, কী বিপদ, কী বিপদ!'

পেছনের ঘরে এক মহিলাকে ঘিরে আরও অনেক মহিলা বসে

আছেন। সকলেই বলছেন, 'একটু খোলার চেষ্টা করো। নীচেরটা নীচের দিকে ওপরেরটা ওপরের দিকে জোরে ঠেলো না। অমন করে বসে থাকলে চলে!'

মাসিমা দু'পা সামনে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'কী হয়েচে, কী হয়েচে?'

'দাঁতে দাঁত লেগে গেছে।'

'মৃগী আছে বুঝি?'

সুহাস বললেন, 'আজ্ঞে মৃগী নয় দিদিমণি। ক্যাণ্ডি-ফ্লস টেস্ট করতে গিয়ে দাঁতকপাটি লেগে গেছে।'

'সে আবার কী? ক্যাণ্ডি-ফ্লস জিনিসটা কী?'

'দেখবেন? আমাদেরই তৈরি।' কাঁচের বয়াম থেকে ভদ্রলোক পাতলা কাগজে মোড়া চৌকোমতো কী একটা বের করে মাসিমার হাতে দিলেন।

'এ তো লজেন্স দেখছি।'

'আজ্ঞে ঠিক লজেন্স নয়। লজেন্স কড়মড় করে চিবিয়ে খাওয়া যায়। এ জিনিস আঠা-আঠা, চটচটে। সর্বক্ষণ চুষতে হবে। দাঁত দিয়ে কেরামতি করতে গেলেই ওপর পাটি, নীচের পাটি জুড়ে যাবে, ওই সীমার যেমন হয়েছে।'

'ট্রাই করে দেখব?'

চারপাশ থেকে সমস্বরে আর্তনাদের মতো শোনা গেল, 'না, না, খবরদার না। এখুনি আটকে যাবে।'

'কী এমন জিনিস মশাই, দাঁতে ভাঙা যায় না!' আশুবাবু মাসিমার হাত থেকে নিজের হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন। 'এ কি গীতার সেই আত্মপুরুষ! অস্ত্রে ছেদন করা যায় না, আগুনে পোড়ানো যায় না, জলে গলে না! কী করে বানালেন এমন জিনিস?'

'করতে, করতে হয়ে গেছে। তেমন কিছু চেষ্টার দরকার হয়নি।

একটা মুখে ফেললে এক মাস কেন, মনে হয় সারা জীবন চলে যাবে !'

'ভাল করে প্রচার করুন। এ এক যুগান্তকারী আবিষ্কার !'

সুহাসবাবু সবিনয়ে বললেন, 'সবই তাঁর ইচ্ছা। মানুষ নিমিত্তমাত্র।'

বড়মামা হাঁটু মুড়ে মহিলার পাশে বসেছেন। চামচ এসেছে নানা মাপের। সাহায্য করার জন্যে তিন-চার জন হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন। বড়, ছোট সব চামচেই ব্যর্থ হল। দাঁতকপাটি খোলা গেল না। বড়মামার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। চারপাশে তাকিয়ে বললেন, 'খুন্তি লে আও।'

'খুন্তি ? যে খুন্তি দিয়ে বেগুন ভাজে ?'

চারজন চার দিকে ছুটলেন। বড় ছোট চার-পাঁচ রকমের খুন্তি এসে গেল। বড়মামা বললেন, 'শুইয়ে দাও।'

আশুবাবু বললেন, 'এখানে সবই দেখছি না-খোলার কেস। কৌটোর ঢাকনা খোলে না, দাঁত থেকে দাঁত খোলে না।'

'আপনি চুপ করুন।' মেজমামা ধমকে উঠলেন।

রুগিকে চার-পাঁচজনে শুইয়ে ফেললেন। মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার তোমার কায়দাটা কী হবে শুনি বড়দা ?'

'ভেরি সিম্পল। ঝিনুকের মুখ ফাঁক করে যেভাবে মুক্তো বের করে আনে সেই কায়দায়...।'

'সেই কায়দায় ? ইনি মানুষ। সামুদ্রিক ঝিনুক নন। ঠোঁট দুটো আস্ত থাকবে ?'

'তা হলে কী করব ? এমন কেস তো জীবনে আমার হাতে আসেনি !'

মাসিমা বললেন, 'একটু মোটা সুতো আর মোম আছে ?'

সুহাসবাবু বললেন, 'অবশ্য আছে, অবশ্য আছে।'

মোম আর সুতো এসে গেল। বড়মামাকে সরিয়ে দিয়ে মাসিমা চিকিৎসায় লেগে গেলেন। প্রথমে মোটা সুতো জলে ভিজিয়ে দু'সার দাঁতের ফাঁকে ধরে ধীরে ধীরে ঘষতে লাগলেন। সকলে হাঁ করে দেখছেন। বড়মামা বলছেন, 'জয় বাবা বিশ্বনাথ, খুলে দাও বাবা। হ্যাঁ রে, চিচিং ফাঁক বললে কোনো কাজ হবে ?'

মাসিমা বললেন, 'তুমি চুপ করো।'

বেশ কিছুক্ষণ কেরামতি চলার পর ভদ্রমহিলার দাঁত খুলে গেল। সকলে আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন, 'খুল গিয়া, খুল গিয়া।'

মাসিমা দ্রুত হাতে মোমের টুকরোটা দু দাঁতের ফাঁকে গুঁজে দিলেন।

বড়মামা বললেন, 'ও আবার কী হল ?'

'দাঁতে দাঁত ঠেকলেই আবার জুড়ে যাবে। যে সাংঘাতিক জিনিস তৈরি করেছ ! যে কটা আছে সব গঙ্গাজলে ফেলে দিয়ে এসো।'

সুহাসবাবু বললেন, 'এঁকে সারা জীবনই কি তাহলে মোমের টুকরো দাঁতে নিয়ে ঘুরতে হবে ?'

'তা কেন ? এইবার বেশ করে ছাই দিয়ে দাঁত মেজে আসুন। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বড়মামা বললেন, 'কুসি, তোর এই চিকিৎসাটা মেডিকেল জার্নালে প্রকাশ করতে হবে।'

'থাক, এমন ঘটনা পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার ঘটবে বলে মনে হয় না।'

মেজমামা বললেন, 'এইবার আমার একটা ব্যবস্থা করো। এই কাদামাখা জামা পরে সভাসমিতি করা যায় ?'

বড়মামা চনমন করে উঠলেন, 'ঠিক ঠিক। এক কাজ কর, তুই আমার এই ধুতি-পাঞ্জাবিটা পর।'

'আবার তোমার সেই এক কথা। তোমার জামা আমার গায়ে বড় হবে।'

বড়মামা সুহাসবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চুন আছে, চুন ?'

'চুন কী করবেন ডাক্তারবাবু ?'

'হোয়াইট ওয়াশ। দেয়াল যদি চুনকাম করা যায়, ধুতি-পাঞ্জাবি কেন করা যাবে না। আলবাত যাবে।'

মেজমামা বললেন, 'থাক বড়দা, খুব হয়েছে। তোমার চিকিৎসা যেমন উদ্ভট, পরিকল্পনাও তেমনি উদ্ভট। আমি আর সভাপতি হতে চাই না। যা পারো তাই করো।'

বড়মামা বললেন, 'তা বললে চলে রে পাগলা ! এই সভার প্রধান আকর্ষণ তো তুই। তোর ওই কাতলা মাছের মতো মাথা থেকেই তো পথের নির্দেশ বেরোবে। তোর যা মাথা, একদিন তুই এম· এল· এ· হবি। এম· এল· এ· থেকে মন্ত্রী। তখন আমাদের জোর কত বেড়ে যাবে।'

মেজমামা বললেন, 'আমার মাথায় সাংঘাতিক এক আইডিয়া এসেছে বড়দা।'

'আসবেই তো, আসবেই তো, তুই যে আমারই ভাই। আমার মাথাটা দেখেছিস, আইডিয়ার পিন-কুশন। বল তোর কী আইডিয়া ?'

'কাপড়ের কাদামাখা অংশটা তো টেবিলের তলায় থাকবে, কেউ দেখতে পাবে না। সমস্যা পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবিটা উলটে পরলেই সব সমস্যার সমাধান। কী বলো ?'

'বাহা, বাহা, একেই বলে মাথা। কার মাথা দেখতে হবে তো ! আমার ভাইয়ের মাথা। এ-সব মাথা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখতে হয়।'

'তা হলে পরে ফেলি সেইভাবে ?'

'অবশ্যই, অবশ্যই। আর দেরি নয়।'

মেজমামা সমস্যা সমাধানের আনন্দে গান গেয়ে উঠলেন, 'আমার আর হবে না দেরি, আমি শুনেছি ওই ভেরি।'

মাসিমা বললেন, 'পাগলামির একটা সীমা আছে, বুঝলে ? যা বাড়িতে চলে, তা সভায় চলে না। উল্টো পাঞ্জাবির পকেট দুটো দু'পাশে জপের মালার ঝুলির মতো ঝুলবে, কী সুন্দর দেখাবে, তাই না !'

বড়মামা দরাজ হেসে বললেন, 'ডাক্তারের কাছে ওটা কোনও সমস্যাই নয়। অ্যাম্পুটেট করে দোব। পরিষ্কার অস্ত্রোপচার। কাঁচি

শব্দসন্ধানের সমাধান

পে	খ	ম		থ	রা		ত	ম	সা
	ঞ্জ		কা	না	কা	নি		ঞ্জু	
ঘু	র	পা	ক			ম	ব	ল	গ
ভুঁ		লি		ন	গ		লি		বা
র	ক্ষী		পা	ল	লি	ক		প	ক্ষ
	রি	ক	শা			র	দ	ন	
বৈ	কা	ল		তা	গা		শা	স	ন
র		তা	ক	লা	মা	কা	ন		ক্ত
	অ	ন	ল			ন	ন	দ	
প	রি		প	দ্মা	স	ন		ক্ষ	ত্র

দিয়ে কুসকুস করে ছেঁটে ফেলে দোব।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ... ছেঁটে ফেলে দাও। ও তো একটা কাঁচির ব্যাপার।' কথা বলতে বলতে মেজমামা পাঞ্জাবিটা উল্টো করে পরে ফেললেন। তারপর বোতাম আটকাতে গিয়ে গভীর চিন্তায় মাথা নিচু হয়ে গেল, 'দাদা, বোতাম!'

'বোতাম'

'হ্যাঁ গো বোতাম লাগাব কী করে?'

'কেন যেভাবে সবাই লাগায়! বোতামঘরের মধ্যে খুস্ করে বোতাম ঢুকিয়ে দিবি।'

'তুমি একেবারে গবেট হয়ে গেছ দাদা।'

'কেন, কেন? জানিস আমি ডাক্তার, তোর মতো ছেলেঠ্যাঙানো অধ্যাপক নই!'

'ওই রুগি-মারা ডাক্তারিটাই জানো, উল্টো জামায় বোতাম লাগাবার কিস্যুই জানো না। বোতাম আর ঘর দুটোই যে ভেতর দিকে চলে গেছে। বুকে খোঁচা মারছে।'

'মারছে মারুক। সহ্য করো। সবই কি আর সুখের হয় ভাই রে! জীবন দুঃখময়। যে কারণে রাজার ছেলে গৌতম সংসার ছেড়ে বুদ্ধ হলেন।'

'আমি গৌতমও নই, বুদ্ধও নই, বোতাম না লাগিয়ে বুক খোলা অবস্থায় অসভ্য ইয়ারের মতো সভায় যেতে পারব না। আমার একটা মানসম্মান আছে।'

'ওরে মূর্খ, সংস্কৃত জানিস, বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য,নির্বোধেস্তু কুতঃ বলং! চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়। ভাগ্নে আমার হামা দিয়ে পাঞ্জাবির ভেতর ঢুকে বোতাম লাগিয়ে দিক। ভেরি সিম্পল, ভেরি সিম্পল।'

'তা কী করে হয়?'

'খুব হয় রে ভাই, খুব হয়। গাড়ি কী করে মেরামত হয় দ্যাখোনি? মিস্ত্রি তলায় চিত হয়ে শুয়ে পড়ে, তারপর ওপর দিকে তাকিয়ে খুটুস খাটুস করে তার-মার জুড়ে-জাড়ে দেয়।'

মেজমামা একটু চিন্তা করে বললেন, 'তা হলে শুয়েই পড়ি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুয়েই পড়ো। একেবারে চিত হয়ে শুয়ে পড়ো।'

মাসিমা এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এইবার বললেন, 'তোমরা বাড়ি চলো, বাড়ি চলো, তোমাদের আর সভা করে দরকার নেই, খুব হয়েছে।'

দু'জনে সমস্বরে বললেন, 'বাড়ি চলে যাব? এ তুই কী বলছিস কুসি?'

সুহাসবাবু বললেন, 'আমার একটা বিনীত নিবেদন আছে।'

'বলে ফেলো, বলে ফেলো।'

'খুব সহজ সমাধান আমার মাথায় এসেছে।'

'এসেছে? এসেছে নাকি? নিবেদন করো, নিবেদন করো। নিবেদনমিদং।'

'আমাদের তাঁত বিভাগ থেকে একটা সাদা চাদর নিয়ে আসি, সেইটি গায়ে দিয়ে...'

বড়মামা লাফিয়ে উঠলেন, 'সুহাস, তোমার আইনস্টাইন হওয়া উচিত ছিল। তুমি আলেকজেন্ডার দি গ্রেট। তুমি চেঙ্গিজ খান।'

মেজমামা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'আঃ, উচ্চারণটা ঠিক করো বড়দা। চেঙ্গিজ নয়, জিঙ্গিজ।'

'হ্যা, হ্যা, সারা জীবন চেঙ্গিজ বলে এলুম। ম্যাট্রিক ইতিহাসে লেটার পেলুম। তুই এখন উচ্চারণ শেখাতে এলি! জানিস সায়েবরা আমার নাম কী ভাবে উচ্চারণ করে, সু-ড্যাংশু।'

'করো, তাহলে ভুল উচ্চারণই করো। শেখালে যখন শিখবে না, অশিক্ষিতই থেকে যাও।'

দু'জনের ঝগড়া আর তেমন এগোল না। পাড় বসানো সুন্দর একটা সাদা চাদর এসে গেল। উল্টো করে পরা পাঞ্জাবির ওপর চাদর ফেলে মেজমামা হাসি-হাসি মুখে বললেন, 'চলুন তাহলে শুরু

করে দেওয়া যাক। এদিকে যত রাত হবে ওদিকে তত দিন হবে।'

মাসিমা বললেন, 'তোমারও মাথাটা গেছে। কী বলতে কী যে বলছ? বলো, এদিকে যত দেরি হবে ওদিকে তত রাত হবে।'

বড়মামা বললেন, 'তা হলে একটা গল্প শোন।'

'এখন আর গল্প শোনার সময় নেই। তোমার গল্প ভীষণ বড় বড় হয়।'

'এটা খুব ছোট। সত্যি ঘটনা কি না!'

'কাল শোনা যাবে।'

'না, আজই শুনতে হবে। তা না হলে এই সভা আমি হতে দোব না।'

মেজমামা বললেন, 'যাঃ-ব্বাবা। বেশ মজার লোক তো! নিজের সভা নিজেই পণ্ড করবে?'

'আমার পাঁঠা আমি যেদিকে খুশি কাটতে পারি। ন্যাজেও পারি, মুণ্ডুতেও পারি।'

সুহাসবাবু বললেন, 'ছোট্ট যখন শুনেই নিন না! ঝামেলা চুকে যাক।'

'বেশ, বলো তাহলে।'

'এক দিন সকালে চেম্বারে বসে আছি।'

'কত সকালে?'

সুহাসবাবু মুচকি হেসে বললেন, 'কেন বাগড়া দিচ্ছেন মেজবাবু!'

'আচ্ছা, আচ্ছা। তুমি বলে যাও।'

'একটি ছেলে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে, ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু, শিগগির চলুন, মা আবার ঢুলে ফোল হয়ে গেছে। বলেই বেরিয়ে চলে গেল। আমি হাঁ। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেলেটি ফিরে এল। সেই একই ভাবে উর্ধ্বশ্বাসে, ডাক্তারবাবু, ঢুলে ফোল নয়, ফুলে ঢোল। ছুটতে ছুটতে চলে গেল।'

বড়মামা সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বললেন, 'কই, তোমরা হাসলে না?'

'হাসব কেন? এটা একটা গল্প হল?'

'গল্প হল না! তা হলে কী হল?'

'হেভ্ভর ভিম হল।'

'এটা গল্পের মতো সত্য।'

'সে আবার কী ? বলো সত্যের মতো গল্প।'

'দাঁড়া দাঁড়া, সব গুলিয়ে গেল। গল্পের মতো সত্য, সত্যের মতো গল্প। ট্রু স্টোরির ইংরিজি কী হবে ?'

সুহাসবাবু বললেন, 'সত্য গল্প।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্য গল্প। সত্য হাসির গল্প।'

মেজমামা বললেন, 'ভেরি সরি। আমাদের কিন্তু হাসি পেল না।'

'তার মানে তোমরা সমঝদার নও। তোমাদের মন তেমন সরল নয়। শিশুর মতো সরল মন না হলে প্রাণ খুলে হাসা যায় না রে পাগলা !'

সুহাসবাবু বললেন, 'আপনি লক্ষ করেননি, আমি কিন্তু ফিক্‌ফিক্ করে হেসেছি।'

'লক্ষ্মী ছেলে। লক্ষ্মী ছেলে।' বড়মামা পিঠ চাপড়ালেন।

'তবে আর বোধহয় দেরি করা ঠিক হবে না বড়বাবু। অনেক সব প্রবলেম আছে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার স্টার্ট।'

॥ চার ॥

ফুল, লতা, পাতা, রঙিন কাগজ, লাল নীল পতাকা। সভা একেবারে জমজমাট। লাউডস্পিকার কাসছে। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে একজন চিৎকার করছেন, টেস্টিং, টেস্টিং। বড়মামা বললেন, 'টেস্ট করে আর কী পাবে ! এ তো ব্রংকাইটিসের কাসি। বুকে সর্দি জমেছে।'

যে ভদ্রলোক টেস্ট করছিলেন তিনি যেই ওয়ান টু থ্রি বলতে গেলেন, মাইক চ্যাঁ করে চিৎকার করে উঠল। বড়মামা বললেন, 'ফেলে দাও, ফেলে দাও। মাচান থেকে নামিয়ে দাও। অসুস্থ, অসুস্থ। হাসপাতালে পাঠাও।'

ফোর, ফাইভ, সিক্‌স। সেভেনে এসে মাইক সুস্থ হল। স্বাভাবিক স্বর বেরোল। বড়মামা বুদ্ধদেবের মতো হাত তুললেন। মাইক নিয়ে ধস্তাধস্তি শেষ হল। সভা একেবারে লোকে লোকারণ্য। পুরুষ, মহিলা, ছেলে, মেয়ে, কেমন একটা গজর-গজর, ভজর-ভজর শব্দ হচ্ছে। একসঙ্গে অনেক মাছি উড়লে যেমন হয়।

সুহাসবাবু বললেন, 'সাইলেন্‌স্ ! সাইলেন্‌স্ !' প্রায় ধমকে উঠলেন, 'একদম চুপ, একদম চুপ।' ঠিক যেন আমাদের স্কুলের হেডমাস্টার ! এখুনি পড়া ধরবেন। না পারলে মাথায় ডাস্টার।

সুহাসবাবু বললেন, 'আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন। আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন।'

গুনুর গুনুর গোলমাল তখনও চলেছে। ছুঁচ পড়লে আওয়াজ হয় এমন নিস্তব্ধ তখনও হয়নি। একেবারে সামনের সারিতে দুটো বাচ্চা, এ ওর কান, ও এর কান ধরে কান-টানাটানি খেলা খেলছে। সুহাসবাবু মাইক ছেড়ে লাফিয়ে সভায় নামলেন। প্রথমেই দু'হাতে দুই থাপ্পড়। তারপর দুটোকেই বেড়ালছানার মতো নড়া ধরে তুলে ঝোলাতে ঝোলাতে সভার বাইরে ছেড়ে দিয়ে এলেন। এসেই আবার মাইক ধরলেন, 'আজ আমাদের অতিশয় আনন্দের দিন। গত বছর ঠিক এমনি দিনে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।'

পেছনের সারি থেকে একসঙ্গে অনেকে বলে উঠলেন, 'এবার উঠে যাবে।'

বড়মামা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললেন, 'কে বললে ? কে বললে উঠে যাবে ? কার এত সাহস ? উঠে যাবে কেন ?'

পেছনের সারিতে পরপর দশ-বারোজন উঠে দাঁড়ালেন, 'আমরা বলেছি স্যার। আজ আমাদের আনন্দের দিন নয়, দুঃখের দিন স্যার।'

'কেন, কেন ? দুঃখের দিন কেন ? কোনো কিছু জন্মালে কেউ কি দুঃখ করে, না আনন্দ করে ? আমি যখন জন্মেছিলুম তখন আমার বাড়ির সবাই হেসেছিল না কেঁদেছিল ? আমি অবশ্য ভ্যাঁ, ভ্যাঁ করে কেঁদেছিলুম। সে তো ভাই তুলসীদাসজি বলেই গেছেন—তুমি যখন এসেছিলে, জগৎ হেসেছিল, তুমি কেঁদেছিলে। তুমি যখন যাবে, জগৎ কাঁদবে আর তুমি হাসবে।'

'ডাক্তারবাবু, আমরা সে জন্ম বা মৃত্যুর কথা বলছি না, আমরা এই কুলতলি মহিলা সমিতির কথা বলছি স্যার।'

'অবশ্যই, অবশ্যই, সেই কথাই তো বলবেন। সেই কথা বলারই তো দিন আজ।'

'তা হলে বলেই ফেলি।'

'উঁহুঁ, আপনারা তো শুনবেন। আমরা আজ বলব। সভাপতি বলবেন, প্রধান অতিথি বলবেন। আপনারা শুধু কানখাড়া করে শুনবেন। শোনা শেষ হলে চটাপট, পটাপট হাততালি দেবেন।'

'সবই বুঝলুম। তবে আপনারা বলার আগে, আমরা যা বলতে চাই শোনা দরকার। অনেক টাকার ব্যাপার তো !'

'ও, এই প্রতিষ্ঠানকে আপনারা অর্থ দান করতে চান ? বাঃ বাঃ, অতি মহৎ প্রস্তাব। পৃথিবীতে দাতা তাহলে এখনও আছেন !'

'ভাল করে শুনুন। আমরা নিতে এসেছি, দিতে আসিনি। আমরা ক্ষতিপূরণ চাই।'

'ক্ষতিপূরণ ! সে আবার কী রে ভাই। আমরা তো কারুর কোনও ক্ষতি করিনি। আমরা তো মানুষের উপকার করার জন্যেই বাজারে নেমেছি।'

'ওই আনন্দেই থাকুন। এদিকে আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে।'

'কী রকম, কী রকম ?'

'বলছি, বলছি। একে একে বলছি। আমিই প্রথমে বলি, তারপর এরা বলবে।'

বড়মামা ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, 'সুহাস, সব যে বেসুরে বাজছে গো !' মাইকে বড়মামার আস্তে মন্তব্য বড় হয়ে সভায় ছড়িয়ে পড়ল।

মেজমামা বললেন, 'তা তো একটু বাজতেই পারে। সব সময়

সব কিছু কি সুরে বাজে ?'

মেজমামার মন্তব্যও সবাই শুনে ফেলল।

সুহাসবাবু মাইক টেনে নিয়ে বললেন, 'আজ আমাদের জন্মদিন, বড় আনন্দের দিন, আজ কোনো গণ্ডগোল করা কি ঠিক হবে! আসুন আমরা হাতে হাত মেলাই।'

সঙ্গে সঙ্গে পেছনের সারি থেকে মন্তব্য হল, 'জন্মদিন আর মৃত্যুদিন একও তো হয়ে যেতে পারে।'

'মৃত্যুর কথা আসছে কেন ভাই। এই তো সবে একবছর হল আমরা জন্মেছি।'

'তা হলে শুনুন, আপনাদের কীর্তিকাহিনী শুনুন। আপনাদের সেই প্যাকেটে ভরা মুড়কি, যার নাম রেখেছিলেন হরিভোগ। সেই মুড়কি আমার দোকানের কী সর্বনাশ করেছে!'

'ভাই, হরিভোগ তো সত্যিই হরির ভোগ। আমরা নিজেরা টেস্ট করে তবে বাজারে ছেড়েছি। ওতে বাদাম আছে, জিবেগজার সুস্বাদু টুকরো আছে, নকুলদানা আছে, আদার কুঁচি আছে। ভাবলেই আমার জিভে জল এসে যাচ্ছে রে ভাই!'

'আপনার জিভে জল, আর আমার চোখে জল। যা মাল তুলেছিলুম দু'চার প্যাকেট মাত্র বেচতে পেরেছি। এ বাজারে ওসব বৈষ্ণব-পথ্য চলে না মশাই। এ হল মাটনরোল, ফিশরোল, মোগলাইয়ের যুগ। আপনাদের হরিভোগ সব ধেড়ে-ইঁদুর-ভোগ হয়ে গেছে। তাও ইঁদুরে ভোগ করে ছেড়ে দিলে বাঁচতুম। হরিভোগ খেয়ে, ধেড়েরা এমন খেপে আছে, আমার দোকানের সব কাঁচের জার তো ভেঙে চুরমার করেছেই, আমাকেও দোকান খুলতে দিচ্ছে না, তেড়ে তেড়ে আসছে। কামড়েও দিয়েছে পায়ের বুড়ো আঙুলে। তলপেটে এখন ইন্‌জেকশান নিতে হচ্ছে।'

বড়মামা হাসতে হাসতে বললেন, 'এই ব্যাপার! আপনি আমাদের এই সমিতির তৈরি গোটাকতক আগমার্কা ইঁদুরকল ওই হরিভোগ দিয়েই পেতে রাখুন, সব ব্যাটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

'আগমার্ক ঘি হয় শুনেছি, ইঁদুরকলও হয় নাকি?'

'আরেব্বাপু রে, সেরা জিনিস মানেই আগমার্ক। আমাদের ইঁদুরকল বাজারের এক নম্বর। নাম্বার ওয়ান। লিকপ্রুফ। ইঁদুর এদিক দিয়ে পড়ে ওদিক দিয়ে ফুড়ুত করে বেরিয়ে যাবে, সে আর হচ্ছে না। আমরা সব জিনিস টেস্ট করে তবে বাজারে ছাড়ি।'

'ইঁদুরকল কী করে টেস্ট করবেন স্যার? ওটা তো খাদ্য নয়। কেক নয়, রুটি নয়।'

'ওই কেক আর রুটির কথা যখন উঠল, তখন বলেই ফেলি।' এবার দ্বিতীয় আর এক ভদ্রলোক। সুন্দর চেহারা। একমাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। বড়-বড় চোখ।

বড়মামা বললেন, 'আপনার আবার কী অভিযোগ? এ দেখছি আমদরবার বসে গেল। অ্যাতো অভিযোগ সামলাই কী করে?'

'আপনাদের ওই কেক আর রুটি স্যার আমার এতকালের ব্যবসার একেবারে বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। ও দুটোও কি টেস্ট করে ছেড়েছিলেন স্যার?

'অবশ্যই, অবশ্যই। আমি খাইনি, তবে এরা অবশ্যই খেয়েছে। খাবার জিনিস, না খেয়ে পারে?'

'আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে বেশ খিদে পেয়েছে। আমাদের সামনে দয়া করে একটু চাখুন না!'

'তা চাখতে পারি। আমার আবার খাওয়ার ব্যাপারে তেমন লজ্জাটজ্জা নেই।'

'তা হলে সভাপতি, প্রধান অতিথি দু দু-জনেই একটু একটু টেস্ট করুন। আমরা দেখি।'

মেজমামা লজ্জা-লজ্জা করে বললেন, 'কী যে বলেন?'

সুহাসবাবু কেক আর রুটি নিয়ে এলেন। দেখেই মনে হল বেশ গরম গরম। সুন্দর গন্ধ নাকের পাশ দিয়ে ভেসে চলে গেল। যেন ডাকছে—আয়, আয়, কপাকপ খেয়ে যা। বড়মামা একটুকরো কেক ভেঙে মুখে পুরলেন। মুখে পোরার সঙ্গে সঙ্গে চটাপট, পটাপট হাততালি। দেখতে দেখতে বড়মামার চোখ কপালে উঠে গেল। কী রে বাবা, এখুনি ফিট হয়ে যাবে নাকি।

সেই সুন্দরমতো ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, 'কী বুঝলেন স্যার? নুনে যবক্ষার। জিভ হেজে গেল। তাই না!'

বড়মামা ঢোক গিলে ডাকলেন, 'সুহাস।'

'বলুন স্যার। পাশেই আছি।'

'পাশেই আছ! আমি যে চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

'তা হতে পারে স্যার। অন্য কাজে ব্যস্ত রয়েছেন তো!'

'আজ্ঞে না, সেজন্যে না। এমন বিদঘুটে স্বাদ হল কী করে? অমানুষিক টেস্ট।'

'হতে পারে স্যার। খুব ভাল কারিগরের তৈরি কিনা!'

'ছাঁটাই করো, ছাঁটাই করো। সব পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে, হাতে পায়ে ধরে আজই বিদায় করো!'

সেই সুন্দরমতো ভদ্রলোক বললেন, 'তা হলে, আমার হাজার-পাঁচেক টাকা পাওনা হল। দোকান নতুন জায়গায় তুলে না নিয়ে গেলে, যেখানে আছি সেখানে আর ব্যবসা করে খেতে হবে না। সব খদ্দের ভয়ে সরে পড়েছে।'

বড়মামা বললেন, 'মিথ্যে কথা। এমন কিছু খারাপ খেতে হয়নি।'

'তা হলে আর-একটুকরো খান। আমরা বসছি।'

বড়মামা একটু ঘাবড়ে গিয়ে মেজমামা আর মাসিমার মুখের দিকে করুণ মুখে তাকালেন।

মাসিমা বললেন, 'পাঁচ হাজারের চেয়ে জীবন অনেক দামি বড়দা।'

বাইরে একটা হইহই শোনা গেল। 'কোথায়, কোথায় সেই ডাক্তারবাবু? আমি তাঁকে একবার দেখে নিতে চাই।'

বড়মামা ভয়ে ভয়ে বললেন, 'ওরে কুসি, আবার কে আসছে রে তেড়ে?'

মেজমামা বললেন, 'নাও এবার পরোপকারের ঠ্যালা বোঝো।'

মারমার করে রাগী চেহারার এক বৃদ্ধ সভায় এসে ঢুকলেন। 'ডক্টর মুখার্জি নাকি এসেছেন। তিনি কোথায়?'

পেছনের সারির ভদ্রলোকেরা একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'ওই যে, ওই যে মঞ্চে বসে আছেন। বসে বসে কেক খাচ্ছেন।'

'হ্যাঁ, সকলকে দেখিয়ে দেখিয়ে কেক তো খাবেনই। কারুর সর্বনাশ, কারুর পোষ মাস। ডক্টর মুখার্জি!'

ভদ্রলোক বুক চিতিয়ে পা দুটো ফাঁক করে সামনে এসে দাঁড়ালেন। যেন যুদ্ধ করবেন!

বড়মামা ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'আপনার কী সর্বনাশ হয়েছে?'

'কী সর্বনাশ হয়েছে দেখতে চাও ছোকরা? তোমাদের কৌশল কি আমি বুঝি না ভাবছ। সামনের চৈত্রে আমার বয়েস হবে সত্তর। দাঁতের ডাক্তারদের সঙ্গে ষড় করে তোমরা বাজারে টফি ছেড়েচ। ছেড়েচ কি না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, টফি আমরা ছেড়েচি, তবে দাঁতের ডাক্তারের সঙ্গে কোনও ষড় নেই।'

'তাই যদি হবে মানিক, তাহলে এই বুড়োর বাঁধানো দাঁত দুপাটির এ-হাল হবে কেন?'

পকেট থেকে খবরের কাগজের একটা মোড়ক বের করে টেবিলে মেলে ধরলেন। খিচিয়ে আছে দুপাটি দাঁত। বাঁধানো সারি থেকে গোটা-দুই খুলে পড়ে গেছে।

বড়মামা ভয়ে ভয়ে বললেন, 'আজ্ঞে টফি তো শিশুদের জন্যে, আপনি কেন খেতে গেলেন?'

'এটা কী কথা তুমি বললে হে ডাক্তার! তুমি কি জানো না,

আমার এখন দ্বিতীয় শৈশব চলেছে। টফি আমার নাতিও খায়, আমিও খাই। তুমি কি আইন করে আমার টফি খাওয়া ঠেকাবে ? এ তো মজা মন্দ নয় !'

'আমাদের টফি একটু কড়াপাক ধরনের। বেশ পাকলে-পাকলে ধৈর্য ধরে না খেলে দাঁত আপনার ভাঙবেই। এ আপনার নকল দাঁতের জিনিস নয়, আসল দাঁত চাই।'

'দ্যাখো বাপু, শাক দিয়ে আর মাছ ঢাকতে চেও না। আমি এই দাঁতে এখনও মাংসর হাড় চিবোই বৎস। যৌবনে সত্তর-আশি পাউণ্ড ওজনের বারবেল তুলতুম। এখনও নেমন্তন্নবাড়িতে গিয়ে ছাপান্নখানা লুচি মেরে দি। কী উল্টোপাল্টা বোঝাতে চাইছ আমাকে ? শোনো ডাক্তার, পাঁচশোটি টাকা আমি গুনে নিয়ে এখান থেকে যাব। আমাকে তুমি চেনো না। আমার নাম চিদানন্দ বণিক। আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ঘোড়ার পিঠে চড়ে তরোয়াল দিয়ে ইংরেজদের মুণ্ডু উড়িয়েছিল ক্যাচাক্যাচ।'

বড়মামা ঢোক গিলে মেজমামার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালেন। মেজমামা চোখের ইশারা করলেন। কী তার মানে কে জানে! বড়মামা আজ বেজায় কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। পাশে দাঁড়াবার মতো কেউ নেই। সুহাসবাবু কোন্ ফাঁকে সরে পড়েছেন।

হঠাৎ আশুবাবু এগিয়ে এলেন। মরেছে, ইনি আবার কৌটো-সমস্যা তুলবেন নাকি ? আশুবাবু মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা এইভাবে আজকের অনুষ্ঠান পণ্ড করবেন না। যার যা পাওনা, ডাক্তারবাবু সবই মিটিয়ে দেবেন। আপনারা একটা করে দরখাস্ত পেশ করুন।'

'দরখাস্ত ? তার মানে ? এ কি সরকারি দপ্তরে ডোলের আবেদন নাকি ? আমরা আমাদের ন্যায্য পাওনা আগে বুঝে নোব, তারপর আমাদের অন্য কথা। ফেলো কড়ি মাখো তেল।'

দাঁতভাঙা বৃদ্ধ বললেন, 'অ্যাঃ, সব উল্টোপাল্টা বকছে। এ-কথায় ওই কথা আসে কী করে ? ফেলো কড়ি মাখো তেল। এর পরেই মূর্খরা বলবে, গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল।'

পেছনের সারির ওঁরা তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন, 'তার মানে ? আমরা মূর্খ ! কী আমার জ্ঞানী, মহাপণ্ডিত বৃদ্ধ রে ! দাঁত ভেঙেছে, দাঁত ! প্রমাণ কী, টফি খেয়ে দাঁত ভেঙেছে ! ডাক্তারের সার্টিফিকেট কোথায় ?'

'ওরে মূর্খের দল এর আবার সার্টিফিকেট কী ?'

'বাঃ, মানুষ মরলে পোড়াবার আগে সার্টিফিকেট লাগে না

'আরে গাধা, মানুষ মরা আর মানুষের দাঁত ভাঙা এক হল ?'

'মানুষের দাঁত কেমন করে হল মানিক ? ও তো ছাঁচে ঢালাই নকল দাঁত। তাঁর জন্যে পাঁচশো। টাকা যেন খোলাম রে।'

'যা না ব্যাটারা, একবার খপর নিয়ে দেখ না, দু পাটি দাঁত বাঁধাবার খরচ কত ? এ তোদের খাতা বাঁধানো নয়, ছবি বাঁধানো নয়, গবেটের দল।'

'যা তা গালাগাল তখন থেকে চলেছে। এবার আমরা আর চুপ করে থাকব না। অ্যাকশান নিয়ে নোব।'

'একবার চেষ্টা করে দ্যাখ না চামচিকের দল।'

'তবে রে !'

মহা গোলমাল শুরু হয়ে গেল। আশুবাবু বড়মামার কানে কানে বললেন, 'পেছনের দরজা দিয়ে সরে পড়ুন। হাওয়া খুব ভাল নয়। এলোমেলো বইছে।'

॥ পাঁচ ॥

পেছনে ঝোপঝাড়, জঙ্গল, দেবদারু, ইউক্যালিপটাস, জোড়া পুকুর। ভাগ্য ভাল, সূর্য অনেক আগেই ডুবে গেছে। আকাশে যেন ঘোর লেগে গেছে। কোথা দিয়ে কোথায় যাচ্ছি কে জানে ! চোরের মতো। ছোট চোর, বড় চোর। আমার তেমন অসুবিধে হচ্ছে না। ঝোপেঝাড়ে বল খোঁজার অভ্যাস আছে। অসুবিধে হচ্ছে মেজমামা আর মাসিমার। মাসিমার শাড়ির আঁচল। মেজমামার চাদর। কেবলই জড়িয়ে যাচ্ছে ডালপালায়। ওদিকে খুব হই-হই হচ্ছে। ভাগ্যিস দাঁতভাঙা বৃদ্ধ এসেছিলেন।

বড়মামা ফিসফিস করে বললেন, 'টাকা তো আমাকে দিতেই হবে আশুবাবু ! ক্ষতি যখন হয়েছে !'

'কারুর কিস্যু ক্ষতি হয়নি। সব হল ধান্দাবাজ। বেড়ালের জাত মশাই। নরম মাটি দেখেছে কি অমনি আঁচড়াও।'

মাসিমা বললেন, 'দেখেশুনে মনে হল, কম-সে-কম হাজার-দশেক টাকার ধাক্কা।'

মেজমামা বললেন, 'আজ তোমার মহিলা সমিতি আর পরোপকারের শেষ দিন। আজ ওরা সব একখানা একখানা করে ইট খুলে নিয়ে যাবে।'

আশুবাবু বললেন, 'আপনার সেক্রেটারি সুহাসবাবু কোথায় গেলেন বলুন তো ?'

আমগাছের মোটা গুঁড়ির আড়াল থেকে উত্তর এল, 'আজ্ঞে আমি এখানেই আছি। মশায় সর্ব অঙ্গ জ্বলিয়ে দিয়েছে ডাক্তারবাবু।'

'তুমি আমাদের ফেলে রেখে পালিয়ে এলে সুহাস ?'

'আর যে কোনো পথ ছিল না দাদা ! জানেনই তো কথায় আছে—চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।'

বড়মামা বললেন, 'এ জায়গাটা তোমার কী রকম মনে হয়, বেশ নিরাপদ ? এক কাপ চা পেলে হত !'

'চা ? চা এখানে পাবেন কোথায়। সাপখোপ পেতে পারেন।'

'আমরা এখন তাহলে যাই কোথায় ?'

'আমি একটা ভাল কাজ করেছি স্যার। কাজের কাজ। ওই ধোবিডাঙার মাঠে আপনার গাড়িটা এনে রেখেছি।'

'সে কী হে ! আমার গাড়ি তো বিগড়ে বসে আছে। স্টার্ট নিচ্ছে না।'

'সে আমি ঠিক করে দিয়েছি। এক ফুঁয়ে সব ঠিক হয়ে গেছে। কারবুরেটারে ময়লা জমেছিল।'

'লক্ষ্মী ছেলে, সোনা ছেলে। একবার গাড়িতে উঠে বসতে পারলে আর আমাদের পায় কে ! চলো চলো, তাড়াতাড়ি পা চালাও।'

ঝোপঝাড় ভেঙে আমরা ধোবিডাঙার মাঠে এসে উঠলুম। একফালি চাঁদ মুচকি হাসছে আকাশে। গোটাকতক তারা এলোমেলো ছড়িয়ে অছে। আমার তেমন কোনো ভয় লাগছে না। মাঝে-মাঝে আমার কেবল হাসি পাচ্ছে। কী থেকে কী হয়ে গেল ! এ যেন কেঁচো খুঁড়তে সাপ।

সুহাসবাবু বললেন, 'এ হল ওই ঘোষালের কাজ। ভাল কিছু হতে দেখলেই লোক লাগিয়ে সব পণ্ড করে দেয়।'

'অ, তাই বলো, ঘোষাল কলকাঠি নেড়েছে ! ওকে আর কিছুতেই টিট্ করা গেল না !'

'যাবে না কেন ? সহজেই যায়। ওকে যদি প্রেসিডেন্ট করে দেন !'

'বেশ তো ! এ আর এমন শক্ত কী ! আজই করে দাও না।'

'আজ কী করে করবেন। প্রথমে টাকা দিয়ে ওকে সভ্য হতে হবে। তারপর নির্বাচন। সব ব্যাপারেরই তো একটা ইয়ে আছে। আজ ওরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করুক। আপনি দিনকতক বরং গা-ঢাকা দিয়ে থাকুন।'

'গা-ঢাকা দোব কেন ? আমি কি কাপুরুষ ? তা ছাড়া আমার কোনো শত্রু নেই।'

'এখন আপনার অনেক শত্রু। সমাজসেবা অত সহজ নয় ডাক্তারবাবু ! বেড অব রোজেস।'

'ভুল বললে। বেড অব থর্ন।'

'আজ্ঞে কাঁটা ছাড়া কি গোলাপ হয় !'

কথায় কথায় আমরা গাড়ির কাছে এসে পড়েছি। ফিকে চাঁদের আলোয় চকচক করছে। আমরা উঠে বসলুম। আশুবাবুও উঠলেন। বড়মামা বললেন, 'সুহাস, তুমি ?'

'আজ্ঞে, আমি বেশ আছি।'

'বেশ আছি মানে ! এই বললে, চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। ওরা তোমাকে একা পেলে তো ঠেঙিয়ে শেষ করে দেবে।'

'এই তো পাশেই আমার দিদির বাড়ি। সেইখানেই গা-ঢাকা দোব।'

'দেখো মার খেয়ে মোরো না। তুমি আমার রাইট-হ্যাণ্ড।'

স্টার্ট দিতেই গাড়ি স্টার্ট নিয়ে নিল। গোল একটা বৃত্ত তৈরি করে, সোজা রাস্তায় গিয়ে উঠল। আশুবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'সুহাসবাবু আপনার কত দিনের চেনা স্যার ?'

বড়মামা স্টিয়ারিং-এ পাক মারতে মারতে বললেন, 'এই বছরখানেক হবে।'

'লোক মোটেই সুবিধের নয়, বুঝলেন বড়বাবু ? এ হল গিয়ে ঘরের শত্রু বিভীষণ। ঘোষালের নিজের লোক। ভেতর থেকে সব চুরমার করতে চাইছে।'

'কী আশ্চর্য ! আমি তো খারাপ কিছু করতে চাইনি। আমি তো সকলের উপকার করতেই চেয়েছি।'

'সেই অপরাধেই তো আপনার বাঘের পেটে যাওয়া উচিত। মনে নেই নবকুমারের কী হয়েছিল !'

'এবার আমি সব ছেড়ে দোব। এমনকি ডাক্তারিও। এ দেশেই আর থাকব না।'

ফাঁকা রাস্তা ধরে বড়মামার গাড়ি ফরফর করে চলেছে। এটা আবার কোন্ রাস্তা কে জানে। মেজমামা বললেন, 'আজ যে কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছিলুম। মনে হয় কুসির মুখ দেখে।'

মাসিমা বললেন, 'আমি যে তোমার মুখ দেখে উঠেছিলুম সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।'

বড়মামা বললেন, 'আমি তাহলে কার মুখ দেখে উঠেছিলুম ?'

'রোজ যা করো। নিজের মুখ দেখেই উঠেছিলে।'

আমি বললুম, 'আমি তাহলে কার মুখ দেখে উঠেছিলুম ?'

মেজমামা বললেন, 'তুমি উঠেছিলে বড়মামার মুখ দেখে। ও মুখ দেখলে সারাদিন বড় আনন্দে কাটে।'

আশুবাবু হইহই করে উঠলেন, 'ডানদিক, ডানদিকে চলুন। বাড়ি যাবেন তো !'

'বাড়ি যাব কেন ? বাড়ি গেলে আর গা-ঢাকা দেওয়া হল কী ?'

মেজমামা বললেন, 'সে কী ! তুমি তাহলে কোথায় চললে ?'

'সোজা মধুপুর।'

মাসিমা বললেন, 'মধুপুর ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল বড়দা ?'

'কবে আর ভাল ছিল বোন ?'

আশুবাবু বললেন, 'সত্যি মধুপুর ?'

'আমি বড় একটা মিথ্যে বলি না আশুবাবু। আমার মন্ত্রই হল করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।'

মেজমামা বললেন, 'এতে তোমার মরার মতো কী করা হল ? তুমি যেখানে খুশি যাও, আমাদের নামিয়ে দাও।'

এক যাত্রায় পৃথক ফল কি হয় ভাই ! আমরা সদলে মধুপুর যাব।'

আশুবাবু বললেন, 'কোথায় থাকবেন ?'

'সেখানে আমাদের ফাসক্লাস বাগানবাড়ি আছে। বড় বড় গোলাপ।'

'কী মজা।' আশুবাবু আনন্দে আটখানা।'

মাসিমা বললেন, 'গাড়ি থামাও। আমরা নেমে যাই।'

আশুবাবু বললেন, 'মাঈজি, আপনাদের আনন্দ হচ্ছে না ? কী সুন্দর আমরা চেঞ্জে যাচ্ছি !'

মেজমামা বললেন, 'বাড়ির কথা ভেবেছ ?'

'খুব ভেবেছি, দশ-দশটা কুকুর পাহারা দেবে। কাকাতুয়া ধমকাবে।'

'ওদের দেখবে কে ?'

'লক্ষ্মী আছে, জনার্দন আছে, শামুকাকা আছে।'

'না ফিরলে ওরা ভাববে না ?'

'সখি ভাবনা কাহারে বলে, সখি যাতনা কাহারে বলে...।' বড়মামা গান ধরলেন। গাড়ির গতি বাড়ল।

আশুবাবুও হুঁ-হুঁ করছেন। খুব ফুর্তি। হুঁ-হুঁর মাঝেই সুরে বললেন, 'এইবার একটু চা হলে ভাল হত। ওই দেখা যায় দোকান দূরে।'

বড়মামা গানের সুরে উত্তর দিলেন, 'গাড়ি থামালেই। গাড়ি থামালেই। ওরা নেমে পালাবে। পালাবে, পালাবে, পালাবে। গাড়ি থামালেই।'

মেজমামা বললেন, 'আমরা চেঁচাব। চিল চেল্লান চিল্লে লোক জড়ো করে তোমাকে ছেলেধরার ধোলাই খাওয়াব। তোমাদের আহ্লাদ তখন বেরোবে।'

'ছেলেধরা ?' বড়মামার অট্টহাসি। 'বল্ বুড়োধরা। তোরা নিজেদের এখনও ছেলে ভাবিস ?'

আশুবাবু বললেন, 'ছোড়দা, কেন বাগড়া দিচ্ছেন ? কী মজা করে, কেমন কোথায় চলেছি। এখন একটু বেশ ছেলেমানুষ হয়ে যান না। একেবারে শিশু।'

'হ্যাঁ মশাই। শিশু হব বললেই শিশু হওয়া যায় ! খুব তো লাফাচ্ছেন। ওদিকে আপনার দোকানের সব মিষ্টি তো পচে ভ্যাট হয়ে যাবে।'

'সেই আনন্দেই থাকুন মেজবাবু। আমার মিষ্টি পচে না। সবই তো কাগজের তৈরি।'।

হুহু করে গাড়ি ছুটছে। বড়মামা বললেন, 'ব্যাণ্ডেল ছাড়ালুম। বুঝলি মেজ। শান্ত হয়ে বোস। বেশি ছটরফটর করিসনি। দুর্গাপুর আসার আগে দুর্গানাম জপ কর। ডাকাতের হাতে না পড়ে যাই। তার আগে শক্তিগড়ে পেট ভরে ল্যাংচা খাব। জয় বাবা তারকেশ্বর।'

মেজমামা বললেন, 'তাহলে আমরা চেল্লাই।'

'চেল্লাও বসে। আমিও গান ছেড়ে দিচ্ছি।'

বড়মামা টেপ ছাড়লেন, 'প্রেমদাতা নিতাই বলে গৌর হরি হরি বোল।'

সঙ্গে আশুবাবুর চটাস চটাস হাততালি। ভোঁ-ভোঁ গাড়ি ছুটছে। বড়মামার হাত খুলেছে। গাড়িটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠল। ভটাস্ করে একটা শব্দ।

'যাঃ, টায়ার গেল।'

গাড়ি ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে পথের বাঁ পাশে একটা বটগাছের তলায়। আশুবাবু গেয়ে উঠলেন, 'বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা।'

এরপর যা হল সে আর-এক গল্প।

ন্যাংচাদার দুঃখ নেই

অজেয় রায়

ন্যাংচাদার চেহারাটা ছিল লম্বা, রোগা, একটু সামনে ঝোঁকা। রং ফর্সা বটে, তবে রোদে-পোড়া। শুকনো হর্তুকির মতন চিমসে মুখখানার সামনে ঝুলত লম্বা নাকটি। বাঁ পা-টা একটু ছোট। তাই অল্প নেংচে-নেংচে বা যেন হোঁচট খেতে-খেতে হাঁটতেন। ওই জন্যই তাঁর নাম ন্যাংচাদা। তাঁর ভাল নাম কী, আজও জানি না। হয়তো পাড়ার বেশির ভাগ লোকই জানত না।

ন্যাংচাদা পরতেন খাটো ধুতি ও হাফশার্ট। পায়ে চটি। নাকের তলায় এক চিলতে গোঁফ। মাথার চুল টেনে আঁচড়ানো। সর্বদা গাল নড়ত। কারণ সুপুরি চিবোতেন। ছোট্ট একটা কৌটো থেকে সুপুরির কুচি বের করে ঘন-ঘন মুখে ফেলতেন। তাঁর গলার স্বর ছিল একটু খোনা। বয়স ? ঠিক বলতে পারব না। তবে পাড়ায় যাঁদের সঙ্গে তাঁর তুই-তোকারির সম্বন্ধ ছিল, সেই আন্দাজে মনে হয়, আমার প্রথম দেখার সময় তাঁর বয়স ছিল বছর তিরিশেক। আমি ন্যাংচাদার পাড়ায় ছিলাম দশ বছর। আমার এগারো বছর বয়স থেকে একুশ বছর অবধি। এর মধ্যে ন্যাংচাদার চেহারায় বিশেষ বদল দেখিনি।

ন্যাংচাদা শীতকালটা যথাসম্ভব ঘরের বার হতেন না। শুধু কয়েকটি বাঁধা সময়ে বাজারে বা দোকান-পাটে একটু আধটু দেখা দিতেন। কিন্তু গরম পড়লেই চৈত্র মাস নাগাদ তিনি গা-ঝাড়া দিয়ে বেরিয়ে আসতেন। তারপর থেকেই তিনি মহাব্যস্ত। প্রায় সর্বক্ষণই বাড়ির বাইরে। কারণটা ফুটবল।

ন্যাংচাদা নিজে কতটুকু ফুটবল খেলেছেন সন্দেহ। কিন্তু একেবারে ফুটবল-পাগল। ফুটবল-ম্যাচ দেখে বেড়াতেন, এবং তাঁর নেশা ছিল ছোট-ছোট ছেলেদের জুটিয়ে, টিম বানিয়ে, নানান জায়গায় ফুটবল টুর্নামেন্ট খেলিয়ে আনা।

তখন কলকাতার অনেক জায়গায় 'ফোর-টেন' হাইটে, সেভেন-এ-সাইডের ফুটবল-টুর্নামেন্ট হত। অর্থাৎ খেলোয়াড়দের উচ্চতা হতে হবে চার ফুট দশ ইঞ্চির মধ্যে এবং দলে খেলবে সাতজন। এমন ম্যাচের জন্যে বেশি জায়গা দরকার হত না। কোনো পার্ক বা মাঠের কোণ, বা কোনো বাড়ির সামনে টেনিস কোর্টের সাইজের ফাঁকা জমি পেলেই যথেষ্ট। খেলার ঠিক আগে ঝটপট এক-এক দিকে দুটো করে বাঁশের খুঁটি পুঁতে গোলপোস্ট এবং পোস্ট দুটোর মাথা জুড়ে একটা দড়ি খাটিয়ে দিলেই হল। খুব জমত খেলাগুলো। দর্শক ভেঙে পড়ত। চিৎকার উত্তেজনায় সরগরম হয়ে উঠত চারদিক।

ফুটবল-সিজন শুরু হতেই ন্যাংচাদা 'ফোর-টেন' হাইটের একগাদা টুর্নামেন্টে নিজের গাঁটের পয়সা থেকে এনট্রি-ফি দিয়ে আসতেন। অতঃপর ওই মাপের উত্তম খেলোয়াড় যোগাড় করতে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিতেন। 'ফাইভ-টু' অর্থাৎ পাঁচ ফুট দু'ইঞ্চি উচ্চতার ছেলেদের নিয়েও এই ধরনের টুর্নামেন্ট চলত। কিন্তু ন্যাংচাদার কারবার ছিল একদম খুদেদের নিয়ে। 'চার-দশ'-এর বেশি তিনি উঠতেন না।

ন্যাংচাদা চাকরি-বাকরি করতেন না। হয়তো চাকরি পাওয়ার তেমন যোগ্যতাও ছিল না। পৈতৃক ছোট একটি বাড়ি ছিল। তার দোতলাটা ভাড়া দিতেন। একতলায় থাকতেন নিজেরা। সংসারে কেবল ন্যাংচাদা এবং তাঁর মা। ভাড়ার টাকায় দু'জনের চলে যেত

কোনোরকমে। টিম তৈরি বা টুর্নামেন্ট খেলানোর পিছনে বেশি খরচা করার সঙ্গতি ছিল না ন্যাংচাদার।

ফুটবল-সিজনের গোড়ায় ন্যাংচাদা হাসি-হাসি মুখে ঘোষণা করতেন, "দ্যাখ্ না, এবার কেমন টিম বানাই।" কিন্তু মরসুম যত এগোত, ন্যাংচাদার মুখও তত ম্লান হত। বছরের পর বছর গড়ে পাঁচ-ছ'টা টুর্নামেন্টে নাম দিয়েও বেচারি ন্যাংচাদার ভাগ্যে একটি ট্রফিও কখনও জোটেনি।

জুটবে কী করে? তেমন খেলোয়াড় জুটত না যে। আমাদের পাড়াতেই ইয়াংবেঙ্গল স্পোর্টিং নামে একটা বড় ক্লাব ছিল। সেই ক্লাব থেকেও নাম দিত 'ফোর-টেন' হাইটের টুর্নামেন্টগুলিতে পাড়ার সেরা খুদে ফুটবলারগুলিকে টেনে নিত তারা। ফলে ন্যাংচাদার ভাগ্যে জুটত ঝড়তি-পড়তি। আবার সেরা সাতজনের পরের সেরা সাতটিকেও যে ন্যাংচাদা পেতেন, তাও নয়। অন্য পাড়ার ক্লাব টেনে নিত তাদের কাউকে কাউকে।

ন্যাংচাদা কিন্তু হতাশ হতেন না। তিনি মাঠে-ঘাটে পাড়ায় পাড়ায় খোঁজ করে বেড়াতেন চার-দশ মাপের ফুটবলার। চরকির মতো ঘুরতেন। কোথাও ছোট-ছোট ছেলেরা ফুটবল খেলছে দেখলেই দাঁড়িয়ে পড়তেন, তা আসল ফুটবল বা রবারের বল যাতেই হোক। কারও খেলা চোখে পড়লে তার সঙ্গে ভাব জমাতেন। তারপর নিজের টিমে ঢুকিয়ে নেবার চেষ্টা করতেন।

তবে সত্যি কোনো প্রতিভা জুটলেও ন্যাংচাদার বরাতে সে বেশি দিন টিকত না। কারণ কয়েকটি ম্যাচ খেলার পরই সে অন্য বড় ক্লাবের নজরে পড়ত, ফলে ন্যাংচাদাকে ত্যাগ করত।

বেচারা ন্যাংচাদার ট্যাঁকের জোর কম। খেলার পর যৎসামান্য টিফিন। খেলোয়াড়রা হেঁটে-হেঁটে যেত খেলতে। ট্রামে-বাসে চড়ে যাওয়ার সৌভাগ্য হত না। জার্সি নেই। তেমন দরের খেলোয়াড় হলেও অ্যাংক্লেট নি-ক্যাপ বকশিশ মিলত না। অবশ্য ন্যাংচাদা প্রতি বছরই আশ্বাস দিতেন, এবার এক সেট জার্সি বানিয়ে ফেলব। কিন্তু তা আর হয়ে উঠত না।

ন্যাংচাদা কথা দিয়েছিলেন যে, কোনো টুর্নামেন্ট জিতলেই প্রত্যেক প্লেয়ারকে একজোড়া নতুন অ্যাংক্লেট কিনে দেবেন। তবে এ-খরচটা তাঁকে কোনোদিন আর করতে হয়নি।

যা হোক, ন্যাংচাদা দমবার পাত্র ছিলেন না। ঠিক সাতজন খেলোয়াড় জুটিয়ে একটার পর একটা টুর্নামেন্ট খেলতে ছুটতেন। ফি বছরই তাঁর টিমের নতুন নতুন নাম দিতেন। যেমন, কোনোবার 'সেভেন বুলেটস্'। কখনও 'সেভেন স্টারস্'। একবার দিলেন বাংলা নাম 'আমরা সাত'। ইয়াং বেঙ্গলের ছেলেরা সেবার তাঁর টিমকে ঠাট্টা করে ডাকত—'হারাধনের সাতটি ছেলে।'

ন্যাংচাদা থাকতেন দক্ষিণ কলকাতায় দেশপ্রিয় পার্কের কাছে। তাঁর প্লেয়ারদের খেলতে যেতে হত পায়ে হেঁটে। তাই তাঁর দলের দৌড় ছিল দক্ষিণ ও মধ্য কলকাতার প্রতিযোগিতাগুলির মধ্যে।

ম্যাচের দিন বিকেলে দেখা যেত ন্যাংচাদা তাপ্পি-মারা ফুটবলটা বগলদাবা করে ফুটপাত ধরে চলেছেন। তাঁকে ঘিরে চলেছে সাতটি খুদে খেলোয়াড় এবং আরও কয়েকটি ওই মাপের সাপোর্টার। হাতে-কলমে খেলা শেখানোর সামর্থ্য ছিল না ন্যাংচাদার, তাই মৌখিক কোচিংই ভরসা। খেলতে যাওয়ার সময় গোটা পথ তিনি উচ্চস্বরে খোনা-গলায় তালিম দিতে দিতে যেতেন—কলকাতা ময়দানের বড় বড় টিমের খেলার কায়দা। বাঘা-বাঘা ফুটবলারদের কলাকৌশল। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার মোক্ষম সব সুলুক-সন্ধান। —"এবার ইস্টবেঙ্গলের নতুন টেকনিক দেখেছিস? ফরোয়ার্ড লাইনের সঙ্গে-সঙ্গে দুটো হাফও অ্যাটাকে উঠে যায়। ব্যস, তাহলে অপোনেন্ট-ডিফেন্স তছনছ। তোরাও সেই টেকনিক নিবি।।"

ছোটন মাথা চুলকে বলল, "ওদের এগারো জন প্লেয়ার, তিনটে হাফ-ব্যাক। আমাদের তো মোটে দুটো। দু'জনেই অ্যাটাকে গেলে হাফ লাইন ফাঁকা হয়ে যাবে যে?"

"ও, তা বটে। ঠিক আছে, তাহলে একজন হাফই উঠবি। আর গোলের সামনে একদম ড্রিবল নয়। স্পট্ কিক্ চাই, মেওয়ালালের মতো। মনে রাখিস, ওদের সেন্টার-ফরোয়ার্ডটা ডেঞ্জারাস। বেটো, তুই সেঁটে থাকবি ওর সঙ্গে। কিছুতেই কিক্ নিতে দিবি না।"

খেলা চলার সময়েও ন্যাংচাদা সাইড-লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে কোচিং চালাতেন।

অন্য সব দিনে প্লেয়ার যোগাড়ের ধান্দায় তিনি এমন ব্যস্ত থাকতেন যে, এমনি তালিম দেওয়ার বিশেষ সময় পেতেন না। তা ছাড়া নানা জায়গা থেকে জোটানো সবকটি প্লেয়ারকে ম্যাচের ঠিক আগে ছাড়া এক-সঙ্গে পাওয়াই মুশকিল। আবার অন্য সময়ে তাঁর এই লেকচার শুনতে ছেলেগুলোর মোটেই আগ্রহ ছিল না।

ম্যাচের আগের দিন ন্যাংচাদা ধরলেন ভজাকে, হাতে একটা কাগজে কী সব লেখা। "এই দ্যাখ, একখানা স্ট্র্যাটেজি কষে রেখেছি। কেমন করে অ্যাটাক করবি। স্যার দুখিরামের নাম শুনেছিস? ফেমাস কোচ। উনি বলতেন, ফুটবল একটা যুদ্ধ। ওয়ারফিল্ড। আগের থেকে প্ল্যান করে নামতে হয়। এই প্ল্যানটা একটা ম্যাগাজিন পেয়ে টুকে নিইচি। দ্যাখ, এই ফুটকি-ফুটকিগুলো প্লেয়ার। সেন্টারের পর কেমন করে এগুবি—"

ভজা দশ মিনিট শুনেই উসখুস করে বলল, "এবার যাই ন্যাংচাদা, পড়তে বসতে হবে।"

ন্যাংচাদা নিরাশ হয়ে বললেন, "বেশ, যা। আর কাউকে পেলে পাঠিয়ে দিস।"

ভজা নিজে তো পালালই, অন্যদেরও সাবধান করে দিল, "খবরদার, ওই রকে ন্যাংচাদা বসে আছে, ধরলেই ফুটকি দেখাবে।"

ব্যস, ন্যাংচাদার দলের আর-কেউ ও পথ মাড়াল না।

যা হোক, ন্যাংচাদার বিশ্বাস ছিল এই লাস্ট মোমেন্ট উপদেশটা খুব কাজের। এক্কেবারে তাজা থাকে মগজে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আসল সময়ে তাঁর অমন দামি-দামি উপদেশগুলো মাঠে মারা যেত। তাঁর টিমের ছেলেরা যে-যার খুশিমতো বা সাধ্যমতো খেলত। ফলে বেশির ভাগ সময়ই হারত। জিতত কদাচিৎ।

হেরে গেলে শুকনো মুখে ফেরা। ন্যাংচাদা মাঝারি এক ঠোঙা চিনেবাদাম-ভাজা প্লেয়ারদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলতেন, "নে, খা।" আর নিজে একটু ঝালনুন চাটতে চাটতে উদাস মুখে টেনে টেনে চলতেন। মাঝেমাঝে আপসোস "ইস, রেফারিটা জোচ্চোর। ওই ফাউলটা দিল না। নির্ঘাত পেনাল্টি পেতিস।··শিবু, তুই শুটিংটা আরও প্র্যাকটিস কর রে। অমন ওপন-নেটটা মিস্ করলি!"

খেলোয়াড়রা চুপচাপ চিনেবাদাম চিবোতে-চিবোতে যেত। বাদাম অবশ্য জনাপিছু পাঁচ-সাতটির বেশি মিলত না। খানিক বাদেই ন্যাংচাদা ফের তেড়েফুঁড়ে উঠতেন। "ঠিক হ্যায়, হাজরা পার্কেরটায় দেখে নেব। মনে রাখিস, আসচে রোববার খেলা।"

তবে হাজরা পার্কের ম্যাচে ন্যাংচাদা ওই পুরো টিম আনতে পারলেন না। খেলার দিন বিকেলে ন্যাংচাদার বাড়ির সামনে ছ'জন পুরনো প্লেয়ার জমা হয়েছে, কিন্তু দেবুর পাত্তা নেই। দেবু দলের সেরা খেলোয়াড়। সাড়ে চারটেয় খেলা। চারটের মধ্যে রওনা হওয়া দরকার। ন্যাংচাদা ছটফট করছেন। পৌনে চারটে নাগাদ একটা অচেনা ছেলে এসে বলল, "আপনি ন্যাংচাদা? দেবু আমায় পাঠিয়ে দিল ওর জায়গায় খেলতে।"

"কেন?" ন্যাংচাদা থ।

"দেবু অন্য টিমে খেলবে।"

"তুমি কে?"

"আমি বিষ্টু। দেবুর সঙ্গে পড়ি।"

"তুমি ফুটবল খেলো ?"
"হুঁ।"
"কোথায় ?"
"পাড়ায়

অগত্যা বিষ্টুকেই নিতে হল। অতি বাজে খেলল ছেলেটা। টিমও হারল।

টিম জিতলে ন্যাংচাদাকে দেখে কে ? আনন্দে তুড়িলাফ খেতেন লাফিয়ে লাফিয়ে পাড়ায় ফিরতেন। সেদিন খেলোয়াড়দের টিফিন বরাদ্দ ছিল প্রত্যেকে ছোট একঠোঙা বাদামভাজা এবং এক আনার আলুকাবলি।

আগেই বলেছি, ন্যাংচাদা ঘুরে-ঘুরে কত জায়গা থেকে যে তাঁর টিমের জন্যে প্লেয়ার ধরে আনতেন। ভাল খেলোয়াড় বেশির ভাগ জোটাতেন অজ্ঞাত গরিব ঘরের ছেলেদের থেকে। এদের অনেককেই তিনি সাধ্যমতো সাহায্য করতেন। ছেঁড়া প্যান্টের বদলে নতুন খেলার প্যান্ট কিনে দিতেন। ম্যাচের দিন খালি পেটে এলে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে যাহোক কিছু খাওয়াতেন। কিন্তু তাঁর দলের হয়ে কয়েকটি ম্যাচ খেলার পর যখন তাঁর আবিষ্কৃত খুদে ফুটবলারটি অন্য ক্লাবের নেকনজরে পড়ে আরও বেশি প্রাপ্তির লোভে তাঁকে ছেড়ে যেত, ন্যাংচাদা ক্ষুণ্ণ হতেন, দুঃখ পেতেন ; কিন্তু তাই নিয়ে রাগারাগি করতেন না। মুখে বলতেন, "যাঃ, চলে গেল ! কী করব ? ছেলেটার কিন্তু ফিউচার আছে।"

তেমন কোনো বিশ্বাসঘাতক সামনে পড়লে নিজেই তাকে ডাক দিতেন। লজ্জিত অপরাধী কাছে এসে মাথা নিচু করে দাঁড়ালে ন্যাংচাদা বলতেন, "কী রে, কেমন আচিস ? ভাল করে খেলচিস তো ? খুব সিরিয়াসলি প্র্যাকটিস করবি, বুঝলি।"

আবার কাউকে ডেকে পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলতেন, "তোর খেলা দেখলুম কাল লেক মাঠে। দারুণ খেলেচিস্। তোকে একদিন নিয়ে যাব মহাদেবদার কাছে। মহাদেবদাকে চিনিস ? উয়ারিতে খেলে। খুব নাম। খুব ভাল লোক। কত ছেলেকে ফার্স্ট ডিভিশনে চান্স করে দিয়েচে।"

শুধু দল ত্যাগ নয়। ন্যাংচাদার টিম গড়ার আর-এক সমস্যা ছিল—লম্বা হওয়া নিয়ে।

তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলে সব। ওই বয়সের ছেলেরা চড়চড় করে লম্বা হয়। একবার টুনু ন্যাংচাদার টিমে খেলেছিল। মোটামুটি ভালই খেলেছে। সে ন্যাংচাদার খুব ভক্ত হয়ে পড়েছিল। তাই পরের বছরেও ন্যাংচাদার দলে খেলবে ঠিক করে রেখেছিল। কিন্তু ফুটবল সিজনের গোড়ায় মাপ নিয়ে দেখা গেল, তার উচ্চতা চার-এগারোয় দাঁড়িয়েছে। ন্যাংচাদারও মাথায় হাত। এ-সব প্রতিযোগিতায় কড়াকড়ি খুব। উচ্চতা ভাঁড়ানোর সুযোগ নেই। করুণ স্বরে বললেন ন্যাংচাদা, "তোরা কী যে করিস ! দ্যাখ কাণ্ড !"

বেঁটে গোকুলের ওপর ন্যাংচাদার খুব ভরসা ছিল। চার ফুট আট ইঞ্চি থেকে চার ফুট দশ ইঞ্চিতে পৌঁছতে গোকুলের তিন বচ্ছর লেগেছিল। ন্যাংচাদার বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে, গোক্‌লেটা আর চার-দশ পেরুবে না। ছেলেটা খেলতে পারে না তেমন। তবু একটা হাফ-ব্যাকের সমস্যা তো পাকাপাকিভাবে মিটল। সেই গোকুলও যখন চার-দশ ছাড়াল, ন্যাংচাদা সত্যি খুব হতাশ হয়েছিলেন। গোকুল পাঁচ ফুট এক ইঞ্চিতে গিয়ে থেমে যায়। গোকুলকে দেখলে ন্যাংচাদা প্রায়ই আক্ষেপ জানাতেন "ওই তিন ইঞ্চি বেশি বেড়ে তোর কী এমন সুবিধে হল ? শুধু আমায় ডোবালি।"

ন্যাংচাদার মা মারা গেলেন। ফলে সংসারে তিনি একদম একা হয়ে পড়লেন। খাওয়া-দাওয়ার একটু কষ্ট হত। ভাত খেতেন। কখনও নিজে রেঁধে কখনও বা হোটেলে। একটি ঠিকে-ঝি তাঁর বাড়ির ধোয়ামোছার কাজ করে দিয়ে যেত। অবশ্য ন্যাংচাদার

বাইরের জীবন চলছিল যথারীতি। ফুটবল মরসুম পড়লেই সেই হন্তদন্ত ভাব। তবে শরীরটা আরও একটু শুকিয়েছে। নাকটি আরও যেন ঝুলে পড়েছে।

তখন আমি কলেজে পড়ি, ফোর্থইয়ারে। ন্যাংচাদার সঙ্গে দেখা হয় কম। বৈশাখের মাঝামাঝি। হঠাৎ শুনলাম ন্যাংচাদার অসুখ করেছে। টাইফয়েড জ্বর।

পাড়ার লোক ভাবনায় পড়ল। এখন রুগির সেবা করে কে? আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে ন্যাংচাদার প্রায় যোগাযোগ নেই। কাছের মধ্যে হুগলির এক পিসির কাছে একটু যা যাতায়াত ছিল। তাও সেই পিসিমা গত হয়েছেন দু'বছর। পিসির ছেলেরা ন্যাংচাদার খোঁজ নেয় না। পাড়ার ডাক্তারবাবু ন্যাংচাদাকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ভর্তি করানোর ব্যবস্থা করলেন। এই বরং ভাল। ঠিকঠাক চিকিৎসাটা হবে। নিরুপায় ন্যাংচাদা তাতেই রাজি হলেন। পাড়ার লোক তাঁকে দিয়ে এল হাসপাতালে।

আমরা পাড়ার ছেলেরা ন্যাংচাদাকে ভালবাসতাম। প্রায়-দিনই তাঁকে দেখতে যেতাম হাসপাতালে। একদিন তিনি চিঁচিঁ গলায় আক্ষেপ জানালেন, "এ সিজনটা বেকার গেল রে।"

আমরা সান্ত্বনা দিলাম, "মন খারাপ করছেন কেন? দেখুন না, দু'দিনে ফিট হয়ে যাবেন।"

ক্লান্ত সুরে ন্যাংচাদা বললেন, "না রে, বড্ড কাহিল হয়ে গেছি। ডাক্তারবাবু বলেছেন, রেস্ট নিতে হবে। নইলে ফের অসুখে পড়ব। ইশ্, এবার একটা গোলকিপার যা পেয়েছিলুম না, দারুণ। কসবা ছাড়িয়ে গাঁয়ে থাকে। বড় মাঠে খেলেনি কখনও। পরের বছর কি আর ও ফোর-টেনে খেলতে পারবে? উঁহু। দত্তদাকে বলিস, ওকে ইয়াং বেঙ্গলে খেলাতে। নয়তো ওর সিজনটা নষ্ট হবে। ছেলেটার ফিউচার আছে।"

ন্যাংচাদার আট-দশ দিন কেটেছে হাসপাতালে। এবার সেরে ওঠার পথে। সেদিন আমি ভজা আর শিবু ন্যাংচাদাকে দেখতে গিয়েছিলাম। ভিজিটিং আওয়ার শেষ হবার খানিক আগেই আমরা ফিরে যাচ্ছি, গেটের মুখে শ্যামল বোসের সঙ্গে দেখা।

শ্যামল বোস তখন কলকাতা ময়দানের একজন সেরা রাইট-আউট। মোহনবাগানে খেলছেন। গত দু'বছর বেঙ্গল টিমেও খেলেছেন। কয়েক বছর ধরে পত্রপত্রিকায় প্রায়ই তাঁর ছবি বেরোয়। হয়তো সে-বছর ইণ্ডিয়া টিমেও চান্স পেতে পারেন। শ্যামল বোসের পাশে আর-একজন মোহনবাগানের ফুটবলার। ইনিও বেশ নামজাদা। এই দু'জনের পিছনে তিন-চারটি যুবক। বোঝা যায়, ওই বিখ্যাত দুই খেলোয়াড়ের চেলা।

শ্যামল বোস আমাদের পাড়ায় থাকতেন আগে। বছর পাঁচেক আগে বাড়ি বদলে ভবানীপুরে উঠে গেছেন। তখনও অবশ্য এত নামডাক হয়নি। আমাদের সঙ্গে শ্যামলদার আলাপ ছিল। ভজা এগিয়ে গিয়ে বলল, "শ্যামলদা, কেমন আছেন? হাসপাতালে যে?"

শ্যামল বোস তাঁর পাশের খেলোয়াড়টির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "এই ব্যানার্জির কাকাকে দেখতে এসেছি। হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় কাল ভর্তি হয়েছেন এখানে। এখন অবশ্য অনেকটা ভাল। তা তোরা এখানে কী করতে?"

ভজা বলল, "ন্যাংচাদাকে দেখতে এসেছিলুম।"

"ন্যাংচাদা!" শ্যামল বোস থমকে গেলেন, "ন্যাংচাদার কী হয়েছে?"

"টাইফয়েড। বাড়িতে আর কেউ নেই, তাই হাসপাতালে দেওয়া হয়েছে।"

"কেমন আছেন ন্যাংচাদা?"

"এখন খানিকটা ভাল।"

শ্যামল বোস তাঁর সঙ্গীকে বললেন, "ব্যানার্জি, তুমি যাও তোমার কাকার কেবিনে। আমি একবার ন্যাংচাদাকে দেখে আসি।"

ব্যানার্জির চোখে কৌতূহল। "ন্যাংচাদা কে?"

শ্যামলদা বললেন, "আমার আগের পাড়ায় থাকেন। জানো তো, খুব গরিব ছিলাম। বস্তিতে থাকতাম। গলিঘুঁজিতে ফুটবল খেলে বেড়াতাম। এই ন্যাংচাদাই আমায় ডেকে এনে তাঁর টিমের হয়ে টুর্নামেন্ট খেলতে নিয়ে যান। তাঁর টিমে কিছু দিন খেলার পর অন্য এক বড় ক্লাবের নজরে পড়ি। তারপর থেকেই আমার ভাগ্য খুলে যায়। আমার আজকের এই সুনাম, রোজগার, সবই ন্যাংচাদার জন্যে। ন্যাংচাদার টিমে আমি খেলিনি বেশি দিন। কিন্তু উনি ডেকে না আনলে হয়তো আমার কোনোদিনই বড় ক্লাবে খেলার সুযোগ হত না। হয়তো কারও নজরেই পড়তাম না।

ব্যানার্জি অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বললেন, "চলো, আমিও তোমার ন্যাংচাদাকে দেখে আসি।"

ভজা, আমি, শিবু সদর্পে শ্যামলদাদের নিয়ে চললাম এবং গোটা দলটাকে ন্যাংচাদার বেডের পাশে হাজির করে দিলাম।

ন্যাংচাদা চোখ বুজে চিত হয়ে শুয়ে ছিলেন। পায়ের শব্দে চোখ খুলে বিছানার ধারে শ্যামল বোসকে দেখে যেন ভূত দখার মতো চমকে ধড়ফড় করে উঠে বসলেন। "অ্যাঁ, শ্যামল, তুই?"

শ্যামল বোস বললেন, "শুনলাম আপনার অসুখ, তাই দেখতে এলাম। কেমন আছেন?"

এই অভাবিত সৌভাগ্যে ন্যাংচাদার মুখ খুশিতে উজ্জ্বল। মাথা নেড়ে বললেন, "ও কিছু নয়। ভাল হয়ে গেচি। ওঃ, শ্যামল, তুই দারুণ খেলচিস। এবার ঠিক ইণ্ডিয়া টিমে চান্স পাবি। বলেছিলুম না, তোর ফিউচার আছে?"

শ্যামলদা তাঁর সহ-খেলোয়াড়টিকে দেখিয়ে বললেন, "একে চেনেন? পল্টু ব্যানার্জি। মোহনবাগানের হাফে খেলে।"

ন্যাংচাদা একগাল হেসে বললেন, "হ্যাঁ ভাই, তোমার খেলা দেকেচি। দারুণ।"

ব্যানার্জি বললেন, "শ্যামলের মুখে আপনার কথা শুনলাম। আপনার জন্যেই নাকি ও বড় ফুটবলার হবার সুযোগ পেয়েছে।"

"অ্যাঁ, তাই বলেছে! না, না, আমি আর কী করেছি? ওর ট্যালেন্ট ছিল, তাই পেরেছে। অ্যাঁ, বলেছে এই কথা? বলেছিস তুই শ্যামল? সত্যি?" ন্যাংচাদার আর কথা সরে না।

ইতিমধ্যে হাসপাতালে সাড়া পড়ে গেছে। কিছু ডাক্তার নার্স ও অন্যান্য কর্মীদের ভিড় জমতে শুরু করেছে আশেপাশে—লক্ষ্য দুই বিখ্যাত ফুটবলার। রুগিরাও কেউ-কেউ ঘাড় উঁচু করে দেখছে এদিকে। সবাই অবাক। সবারই মনে প্রশ্ন, জেনারেল বেডের ওই নিতান্ত খেমো চেহারার লোকটি কে, যাকে দেখতে এমন দুই নামকরা ফুটবলারের আগমন?

শ্যামল বোসের ডান হাতখানি নিজের দু'হাতে চেপে ধরে ন্যাংচাদা তখন বিড়বিড় করছেন, "তুই বড় হবি, মস্ত বড় হবি, শ্যামল। খুব নাম হবে।"

শ্যামল বোস মৃদুস্বরে বললেন, "আশীর্বাদ করুন ন্যাংচাদা।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, করব বই কী!" আবার ন্যাংচাদা বিড়বিড় করতে থাকেন, "অ্যাঁ, তোরা আমায় মনে রাখিস? সত্যি? নাঃ, আর আমার কোনো দুঃখ নেই।"

শ্যামল বোস লাজুক প্রকৃতির মানুষ। অনেক কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে অস্বস্তি বোধ করছিলেন। বললেন, "ন্যাংচাদা, এবার চলি। আবার আসব। তাড়াতাড়ি সেরে উঠুন। চলো, ব্যানার্জি।"

শ্যামল বোসের দল বিদায় নিলেন।

ন্যাংচাদার শীর্ণ মুখখানি তখন ঝকঝক করছে।

ছবি প্রণবেশ মাইতি

অ্যালটিনো হিলটপের ম্যাজিশিয়ান

বাণীব্রত চক্রবর্তী

মুকুট বালিয়াড়ির উপর দিয়ে ছুটছিল। ছুটতে ছুটতে চিৎকার করে রাহুলকে ডাকছিল। কিন্তু কোথায় রাহুল। ছুটতে ছুটতে মুকুট সেই আইসক্রিম স্টলটার সামনে এসে দাঁড়াল। কত লোকজন ও বাচ্চা ছেলেমেয়ে বসে-বসে আইসক্রিম খেতে খেতে গল্প করছে। কিন্তু রাহুল নেই। এখন মুকুট কী করবে? তার কান্না পেল। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখল অনেক দূরে একটা জাহাজ। মন দিয়ে লক্ষ করলে বোঝা যায়, জাহাজটা চলছে। ক্লান্ত পায়ে সে সমুদ্রের দিকে হাঁটতে লাগল। এখানে সন্ধে হয় দেরিতে। গোয়ার আবহাওয়াই অন্যরকম। ভূগোলের অনন্তবাবু হলে বলতেন, একেই বলে নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া। গোয়া বেশিদিন আগে স্বাধীন হয়নি। আগে এ-রাজ্য পর্তুগিজদের অধীনে ছিল, সে-কথা মুকুট জানে। কিন্তু রাহুল কোথায় গেল? বাঙ্গুর মাল্টিপার্পাস স্কুলের ক্লাস নাইনের মুকুটমণি বসু তার বন্ধু রাহুল রায়কে খুঁজে পাচ্ছে না

পানাজির রিভারসাইড হোটেল এই মিরামার সি বিচ থেকে খুব দূরে নয়। মুকুট ভাবল, তবে কি হোটেলেই ফিরে যাব? কিন্তু কোন্ মুখ নিয়ে ফিরব?

সমুদ্র পিছনে ফেলে একটু এগিয়ে গেলে বাস স্ট্যাণ্ড। বাসে উঠে পানাজি মার্কেটের টিকিট চাইতে হবে। পাবলিক বাসে টিকিট নেই। নামার সময় কণ্ডাক্টরের হাতে পঞ্চাশ পয়সা দিতে হয়। মুকুট বালিয়াড়ির উপর বসল।

বিকেলবেলায় ওরা দু'বন্ধু হোটেল থেকে বেরিয়েছিল। বেরোবার সময় মা ও মিনামাসিমা সস্ রে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোরা কোথায় যাচ্ছিস?"

নিখিলবাবু মানুষের স্বাধীনতায় বিশ্বা:, করেন। উনি বলেছিলেন, "যাক না। একটু ঘুরে-টুরে দেখুক। স্বাবলম্বী হতে শিখুক।"

এইজন্যেই তো বাবাকে মুকুটের এত ভাল লাগে। বরং প্রসাদমেসোমশাই একটু কিন্তু-কিন্তু করেছিলেন। রাহুল বলেছিল, "তুমি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছ, বাবা। যাচ্ছি তো মাণ্ডবী রিভার দেখতে। এই তো আমাদের হোটেলের সামনেই।" মাণ্ডবী নদী দেখে ওদের আশ মেটেনি। মুকুট প্রস্তাব করেছিল "তাহলে চল্, মিরামার সি বিচে যাই।"

ওরা হাতছানি দিয়ে একটা অটোকে ডেকেছিল। এখানকার অটোতে এখনও মিটার বসেনি। ভাড়া পড়েছিল ছ' টাকা।

সি বিচে এসে ওরা প্রথমেই আইসক্রিম খেয়েছিল। এমন সময় রাহুল কাকে যেন দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল এবং খুশিও হয়েছিল। "আশ্চর্য ব্যাপার, ব্রজদা না? তুই একটু দাঁড়া, আমি আসছি।" সেই যে গেল, এখনও ফিরল না। ব্রজদাকে রাহুল দেখতে পেয়েছিল। মুকুটকে চিনিয়ে দেয়নি। সেই খেলার মাঠের ব্রজদা নাকি? রাহুল ফুটবল বলতে পাগল। খেলার মাঠে মুকুটও যায়। তবে তার প্রিয় খেলা ক্রিকেট। মুকুট উঠে পড়ল। হোটেলেই ফেরা যাক। কিন্তু তার আর ফেরা হল না।

বাস স্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়ানোমাত্রই একটা নীলরঙের অ্যাম্বাসাডার তার সামনে এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে এক সুদর্শন ভদ্রলোক নেমে এসে মুকুটকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি রাহুলকে খুঁজছ? এসো।"

মুকুট সম্মোহিতের মতন গাড়িটায় উঠে পড়ল।

ভদ্রলোককে সুন্দর দেখতে। ধবধবে ধুতি-পাঞ্জাবি পরেছেন। গা থেকে দামি সেন্টের গন্ধ বেরোচ্ছে। ভদ্রলোকের দু'হাতের আঙুলে অনেকগুলি আংটি।

"আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

ভদ্রলোক ড্রাইভ করতে করতে বললেন, "গেলেই দেখতে পাবে।"

পাহাড়ি রাস্তায় গাড়িটা এঁকে-বেঁকে চলেছে। এবার উনি জিজ্ঞেস করলেন, "আমাকে তুমি চেনো না?"

মুকুট বলল, "না।"

ভদ্রলোক হেসে বললেন, "আমাকে একটু ভালভাবে লক্ষ করে দ্যাখো তো চিনতে পারো কিনা।"

মুকুট ভদ্রলোকের মুখটা তো দেখতে পাচ্ছে না। পিছন থেকে

দেখে কতটুকু চেনা যায়। পাহাড়ের উপর একটা বাংলোর সামনে এসে গাড়িটা থামল। উনি গাড়ি থেকে নেমে পিছনের দরজা খুলে ডাকলেন, "এসো, আমরা এসে গেছি।"

রাস্তার আলো ভদ্রলোকের মুখে এসে পড়েছে। মুকুট খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ভদ্রলোককে দেখল। কিন্তু বুঝতে পারল না লোকটিকে এর আগে দেখেছে কিনা।

বাংলোয় ঢুকে মুকুট দেখল বাগানে আলো জ্বলছে। ব্যাডমিন্টন খেলা হচ্ছে। দুটি ছেলে খেলছে। মুকুট আনন্দে চিৎকার করে উঠল, "রাহুল।" খেলা থামিয়ে অবাক হয়ে দুটি ছেলেই মুকুটের দিকে তাকাল। দু'জনে এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন তারা জীবনে কোনোদিন মুকুটকে দেখেনি। চেনে না। মুকুট ছুটে ওদের মধ্যে একজনের কাছে এগিয়ে গেল।

"কী রে রাহুল, তুই অমন করে তাকিয়ে আছিস কেন ? যেন আমাকে চিনিস না।"

ছেলেটা বলল, "চিনি না-ই তো। কে তুমি ?"

মুকুট অবাক। সে কি স্বপ্ন দেখছে ?

সুদর্শন ভদ্রলোকটি মুকুটের হাত ধরে টানলেন, "চলো, ভেতরে চলো।"

ওরা একটা আসবাবশূন্য ঘরে এল। কেবল মেঝেতে একটা সবুজ রঙের গালচে পাতা। উনি মুকুটকে নিয়ে তাতে বসলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি এখনও আমাকে চিনতে পারোনি ?"

মুকুট এবারও মাথা নাড়ল। সেই থেকে ভদ্রলোক এই একই কথা বারবার বলছেন কেন ?

এমন সময় সাইরেন বেজে উঠল। সকাল নটায় কলকাতার থানায় থানায় যেমন সাইরেন বেজে ওঠে, তেমন নয়। মন্ত্রীদের গাড়ির সঙ্গে যেমন পুলিশের গাড়ি সাইরেন বাজাতে-বাজাতে যায়, তেমন। ঘরের উজ্জ্বল আলোটা দপ্‌ করে নিভে গেল। সারা ঘরে হালকা সবুজ আলো ছড়িয়ে পড়ছে। ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। তারপর স্থির দৃষ্টিতে মুকুটের দিকে চেয়ে রইলেন। মুকুটের মনে হল তাকেও ঐ দুটি চোখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে হবে। সে চেষ্টা করলেও দৃষ্টি ফেরাতে পারবে না। চেয়ে থাকতেই হবে। চেয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হল, সে যেন কোথায় চলে যাচ্ছে। ঘরের হালকা সবুজ আলো এবং ওই একজোড়া চোখ তাকে সম্মোহিত করে দিচ্ছে। মুকুট বুঝতে পারল, তার চোখে ঘুম নেমে আসছে। ফলে আস্তে-আস্তে তার চোখের পাতা বুজে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে তার মনে হল, ভদ্রলোককে চিনতে পেরেছে। একেবারে ঘুমিয়ে পড়ার আগে মুকুট বিড়বিড় করে বলল, "ম্যাজিশিয়ানকাকা।" তারপর মুকুট ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটা স্বপ্ন দেখল। রাহুলদের আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়িতে বাবার সঙ্গে মুকুট এসেছে। আজ একজন ম্যাজিশিয়ান ম্যাজিক দেখাবেন। রাহুলও মুকুটের মতন ক্লাস ওয়ানে পড়ে। বাঙ্গুর মান্টিপার্পাসে নয়, সেন্ট পল্‌স্‌-এ। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মুকুট সেই স্বপ্নটাই দেখছিল। সন্ধেবেলায় রাহুলদের ড্রয়িংরুমে ম্যাজিক দেখাচ্ছিলেন এক সুন্দর চেহারার ভদ্রলোক। বাবা, প্রসাদমেসোমশাই কালো বোর্ডের উপর কঠিন কঠিন অঙ্ক লিখছিলেন। ম্যাজিশিয়ান চোখ-বাঁধা অবস্থাতেই অঙ্কগুলি কষে দিচ্ছিলেন। বাবা জিজ্ঞেস করেছিলেন, "এ জাদুকরকে কোথায় পেলে ?"

প্রসাদমেসোমশাই গর্বের সঙ্গে বললেন, "বিজ্ঞানী খোকা কুণ্ডুর ছাত্র। আমাদের আপিসের দত্তচৌধুরী এঁর হদিস দিয়েছেন।"

কতদিন আগেকার সে-সব কথা। দুই বন্ধুকে সেদিন শোয়ের পর ম্যাজিশিয়ান আদর করে বলেছিলেন, "আমি তোমাদের ম্যাজিশিয়ানকাকা।"

॥ দুই ॥

রিভারসাইড হোটেলে হুলুস্থুলু কাণ্ড। রুম নাম্বার সেভেন্‌টি ও সেভেন্‌টি ওয়ানের দুটি ছোট ছেলেকে পাওয়া যাচ্ছে না। ছেলে দুটির মা হাউহাউ করে কাঁদছেন। নিখিলবাবু ও প্রসাদবাবু কিছুক্ষণ আগে পুলিশ স্টেশন থেকে ঘুরে এসেছেন। গোয়ায় সারা বছরই ট্যুরিস্টদের ভিড়। বাঙালিও হরদম বেড়াতে আসছে। এই হোটেলের রুম নাম্বার ফাইভে এসেছেন এক বাঙালি যুবক। বারান্দায় চুপ করে দুই বন্ধু বসে আছেন। সেই যুবকটি এসে তাঁদের টেবিলের সামনে চেয়ার টেনে বসলেন। তারপর বললেন, "আমার নাম সাত্যকি দত্ত। যদি কিছু মনে না করেন, তবে বলুন তো ছেলে দুটি কেমন করে হারিয়ে গেল ?"

প্রসাদবাবু কোনো কথা বললেন না। নিখিলবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি কলকাতা থেকে আসছেন ?"

সাত্যকি বলল, "হ্যাঁ। আমি নর্থ ক্যালকাটায় থাকি।"

হঠাৎ প্রসাদবাবু চমকে উঠলেন। উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কী নাম বললেন ?"

সাত্যকি নিজের নামটা আবার বলল।

প্রসাদবাবুর চোখে জল এসে গেল। ধরা গলায় বললেন, "ভগবানের দয়া ছাড়া একে আর কী বলব বলুন ? নইলে এসময় আপনাকেই বা পাব কেন ?"

নিখিলবাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে তাকালেন। যেন জিজ্ঞেস করতে চাইলেন, কে ইনি ?

পরের দিন ভোরবেলায় সাত্যকি মাণ্ডবী নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর নদীকে পিছনে রেখে সামনে তাকাল। রাস্তার ওপারে রিভারসাইড হোটেল। ফোর্থ ফ্লোরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিখিলবাবু মুকুট ও রাহুলকে দেখেছিলেন। তখন ওরা নদীর দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু তারপর ? তারপর ওরা কোথায় গেল ? সেটা নিখিলবাবু বলতে পারেননি। সিগারেটের টুকরোটা বারান্দা দিয়ে ফেলতে গিয়ে যা দেখেছিলেন ওই পর্যন্ত। অতএব সাত্যকিকে এখন নিজের ক্ষমতায় ওদের খুঁজে বার করতে হবে। কোথায় যেতে পারে ওরা ? খুব কাছাকাছি এমন কোনো স্পট আছে যা ওদের অ্যাট্রাক্ট করবে ? সাত্যকি আবার নদীর দিকে মুখ ফেরাল। মাণ্ডবীর জলধারা বয়ে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে ? সমুদ্রের দিকে। আরে, এটা তো খেয়াল করেনি। সমুদ্র তো খুব কাছেই। সাত্যকি বাসস্টপে এসে দাঁড়াল। চলল মিরামার সি বিচ। বাস থেকে নেমেই চোখে পড়ল ভাস্কর্যটি। তারপরেই সমুদ্র।

বালিয়াড়িতে নেমে সাত্যকির চোখে পড়ল আইসক্রিমের স্টলটি। ছোটরা সমুদ্র ভালবাসে, আর ভালবাসে আইসক্রিম। আইসক্রিমের স্টলে গিয়ে কথায় কথায় মালিকের কাছ থেকে অনেক কিছুই জানা গেল। কতলোকই তো আসছে। কত বাঙালির ছেলেমেয়েরা আইসক্রিম খেতে আসে। তবে কাল বিকেলের দুটি সমবয়সী ছেলের কথা মনে আছে। তারা কাল এখানে আইসক্রিম খেয়েছিল। একজনের গায়ে লাল শার্ট, অন্যজনের শার্ট নীল। এই তথ্য যোগাড় করে সাত্যকি কিছুক্ষণ সমুদ্রের ধারে ঘুরল। তারপর বাসস্টপে এসে দাঁড়াল। এমন সময় একজন ফেরিঅলা সাত্যকির দিকে গোয়ার অ্যালব্যাম বাড়িয়ে দিল। কত দাম ? ছ টাকা। সাত্যকি অ্যালবাম কিনল এবং ফেরিঅলার সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলল। কথায় কথায় জানতে পারল লোকটি বেশির ভাগ দিন সকালে ও বিকেলে এখানে এইসব টুকিটাকি জিনিস বিক্রি করতে আসে। ...ফোল্ডিং কাঁচি নেবেন নাকি ? গ্যাস লাইটার ? সানগ্লাস ? কোন্‌টা চাই। ...লোকটা ভাঙা-ভাঙা ইংরিজিতে কথা বলছিল। দুটো নয়, সে একটা ছেলেকেই দেখেছে। তার গায়ে ছিল লাল শার্ট। ছেলেটাকে সে একটা নীলরঙের গাড়িতে উঠতে দেখেছে। কিন্তু সে গাড়ির নাম্বার তার মনে নেই। অতএব ? ব্যর্থ

মনে সাত্যকি ফিরেই যাচ্ছিল। ফেরিঅলা পিছু ডাকল। "শুনুন।"

সাত্যকি ঘাড় ফেরাতেই সে বলল, "গাড়িটা আমি চিনি।"

সাত্যকি লোকটার দিকে সিগারেট এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী রকম ?"

প্রত্যুত্তরে লোকটা জানাল, এখানকার আর্ট কলেজের অডিটোরিয়ামে কিছুদিন ধরে এক বাঙালি ভদ্রলোক ম্যাজিক দেখাচ্ছেন। সন্ধেবেলায় ওখানে সে যায়। তবে ম্যাজিক দেখানো হয় সোমবার আর শনিবার। ওখানে বিক্রি ভাল হয়। ঐ নীলগাড়িটি ম্যাজিক শোয়ের দিন আর্ট কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। শুনেছে, ওটি নাকি ঐ ম্যাজিশিয়ানের গাড়ি।

আজ শুক্রবার। উদ্ভ্রান্তের মতন সাত্যকি হোটেলে ফিরে এল।

॥ তিন ॥

পরের দিন শনিবার। সেই শনিবারের বিকেলে আর্ট কলেজের সামনে এসে সাত্যকি দেখতে পেল, একটা নীল অ্যাম্বাসাডার দাঁড়িয়ে আছে। সাত্যকির গলায় ঝুলছে ইনস্ট্যান্ট ক্যামেরা। সে যেন ট্যুরিস্ট। গোয়ার ছিমছাম পথঘাটের ছবি তুলল। আর খুব কাছ থেকে গাড়িটার একটা স্ন্যাপ নিল। এই ক্যামেরায় ছবি উঠতে সময় লাগে দু'মিনিট। ছবি তোলার পর পিক্চার কার্ডটা দেড় মিনিট আলো হাওয়ায় রাখতে হয়। আস্তে-আস্তে ছবিটা ফুটে ওঠে। ছবি তোলার জন্যেই বিকেলের আলো থাকতে-থাকতে সাত্যকি এখানে এসে হাজির হয়েছে। ম্যাজিক শো ভাঙতে এখনও দেরি আছে। এখন কী করি। ভাবতে ভাবতে অদূরে একটা কফি কর্নার নজরে পড়ল।

কফি কর্নারে এসে সে এমন একটি টেবিল বেছে নিল, যেখান থেকে নীল গাড়িটা স্পষ্ট দেখা যায়। এখনও কয়েক ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। কফি কর্নারে কতক্ষণ থাকা যাবে ? এইসব ভাবতে ভাবতে সাত্যকি কফির অর্ডার দিল। কফি পান করতে-করতে সে মেনু কার্ডটা দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে তার চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সময় কাটানোর একটা উপায় পাওয়া গেল। কফি কর্নারের দোতলায় ভিডিও দেখার বন্দোবস্ত আছে। কফি শেষ করে সাত্যকি টিকিট কিনে দোতলায় গেল। ছেলেবেলায় এই 'ম্যাগনিফিশেন্ট সেভ্ন্' ফিল্মটা তাকে অভিভূত করেছিল। এখন দেখতে বসে তো ভালই লাগছে। ছবি দেখে নীচে এসে দেখল, ম্যাজিক শো ভেঙেছে। একে একে দর্শকেরা বেরিয়ে আসছেন। দেখতে দেখতে রাস্তা ফাঁকা হয়ে গেল। কিছুক্ষণ বাদে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা এক সুদর্শন ভদ্রলোক আর্ট কলেজ থেকে বেরিয়ে এসে নীল গাড়িতে উঠলেন। গাড়ির পিছনে লাল আলো জ্বলে উঠল। নীল গাড়িটি পানাজি সিটির দিকে চলে গেল। সাত্যকি বোকার মতন ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। এক্ষুনি ঐ গাড়িটাকে অনুসরণ করা দরকার। কিন্তু রাস্তায় কোনো ফাঁকা ট্যাক্সি বা অটো নেই। নির্জন রাস্তায় সে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল। এক মিনিট দু'মিনিট করে ঘড়ির কাঁটা এগোচ্ছে। আর্ট কলেজের সামনে একটা ট্যাক্সি খালি হচ্ছে। সাত্যকি ছুটে গিয়ে ট্যাক্সিটা ধরে ফেলল।

ট্যাক্সি ছুটছে পানাজি সিটির দিকে। বাঁ দিকে আর্ট কলেজ ফেলে ট্যাক্সি ছুটে চলেছে। একে একে চিলড্রেন'স পার্ক মাণ্ডবী নদী পেরিয়ে গেল। সাত্যকি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে লক্ষ রাখছে। নীলগাড়ির ফোটোটা রাস্তার আলোয় দেখে নিল। গাড়ির নাম্বারটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ডান দিকে পড়ল কোর্ট। ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, "এবার কোন্‌দিকে ?"

সত্যিই তো কোন্‌দিকে ? হঠাৎ সাত্যকি আনন্দে লাফিয়ে উঠল। একটা পাম্পিং স্টেশন থেকে সেই নীলগাড়িটা বেরোচ্ছে। সাত্যকি বলল, "ওই গাড়িটার পেছন-পেছন চলুন।" গাড়ি বাঁক নিল। একপাশে পড়ে রইল জি· পি· ও·। এবার গাড়ি পাহাড়ি পথে উঠছে। এটা অ্যালটিনো হিলটপ। একটা বাংলোর সামনে এসে নীলগাড়িটা থামল। সাত্যকি ট্যাক্সিটা দাঁড় করাল।

*

রাহুল ও মুকুট দুজন চুপ করে বসে আছে। ম্যাজিশিয়ান ওদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের নাম মনে আছে তো ?"

রাহুল বলল, "কেন মনে থাকবে না! আমার নাম ভাস্কো দা গামা।"

সঙ্গে-সঙ্গে মুকুট বলল, "আমার নাম কলম্বাস।"

"আর আমার নাম ?" ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

দুটি ছেলে একসঙ্গে বলে উঠল, "ম্যাজিশিয়ান রাজা।"

॥ চার ॥

ভাস্কো দা গামা নামের ছেলেটি বাগানে চুপচাপ বসে আছে। বাংলোর বারান্দায় দাঁড়ালে পাহাড়ের নীচে একটা শহর দেখা যায়। তার কোনো আগ্রহ নেই। সে জানতে চায় না ঐ শহরটির কী নাম। সে ভাবছিল কলম্বাস এখনও বাগানে এল না কেন। সে বাগান ছেড়ে উঠে বাংলোয় ঢুকল পাশাপাশি তিনটি ঘর। একটি ঘরে থাকে ম্যাজিশিয়ান রাজা। একটি ঘরে সে আর কলম্বাস। তৃতীয় ঘরটিতে কে থাকে জানে না। কলম্বাসকে খুঁজতে এসে তার মনে হল শেষ ঘরটিতে একবার যাওয়া যাক। এই ঘরটির দরজা ভেজানো ছিল। দরজা খুলে সে অবাক হয়ে গেল। ঘরে কোনো আসবাব নেই। মেঝেতে একটা সবুজ রঙের গালচে পাতা। ছেলেটি সেই গালচের উপর বসল। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর তার কী খেয়াল হল সেই জানে। গালচেটা টেনে সরাল। মেঝেতে আংটা-অলা চৌকো পাল্লা। পাল্লার আংটা ধরে টানতে সেটা খুলে গেল। ছেলেটি দেখল, ধাপে ধাপে সিঁড়ি নীচের দিকে নেমে গেছে। ছেলেটি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল। যে-ঘরটিতে এসে পৌঁছল, সেটা একটা ল্যাবরেটারি। একদিকে একটি ক্যাম্পখাটে একজন বুড়ো মানুষ অকাতরে ঘুমোচ্ছেন। ছেলেটি উদাসভাবে ল্যাবরেটারির ভিতর ঘুরে বেড়াতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে এবার একটা আলমারির সামনে দাঁড়াল। আলমারির পাশে আকাশী রঙের ফ্রিজ। ছেলেটি ফ্রিজের পাল্লা খুলে ফেলল। ফ্রিজের ভিতর দুটি শিশি ছিল। একটির গায়ে লেখা ML, অন্যটির গায়ে MG লেখা। ML শিশিটি শূন্য। অন্যটি ভর্তি। ছেলেটি MG লেখা শিশিটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনুভব করল তার খুব তেষ্টা পাচ্ছে। ছেলেটির হাত ঐ শিশিটির দিকে এগিয়ে গেল। সে যন্ত্রের মতন শিশিটি হাতে তুলে নিয়ে মুখের কাছে নিয়ে এল। তরলপদার্থ মুখে পড়তেই তার মনে হল সব কিছু কাঁপছে। সে তলিয়ে যাচ্ছে। মুহূর্তগুলি অদ্ভুতভাবে তাকে অধিকার করছে। এই অন্ধকার, এই আলো। শরীর টলমল করে উঠল। তারপর শান্ত হল। ফ্রিজের পাশেই একটা চেয়ার ছিল। ছেলেটা চেয়ারটায় বসে পড়ল। তার বন্ধ চোখ এবার খুলে গেল। আমি কোথায় ? রাহুল লাফিয়ে উঠল। এখানে কেমন করে এলাম ? আস্তে আস্তে মনে পড়ল বাবার কথা, মায়ের কথা, মুকুটের কথা। সমুদ্রতীরে ব্রজদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ব্রজদা অবাক হয়ে খুশিতে বলে উঠেছিল,"কী ব্যাপার। তোমরাও বেড়াতে এসেছ বুঝি ?" রাহুল বলেছিল, "হ্যাঁ।" ব্রজদা ওকে টেনে নিয়ে এক ভদ্রলোকের কাছে গিয়েছিল। মুকুটকে ডাকা হল না। মুকুট রইল আইসক্রিমের স্টলে। একটা নীলরঙের মোটরে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা এক সুদর্শন ভদ্রলোক বসে ছিলেন। ব্রজদা বলেছিল, "ম্যাজিশিয়ান, এর নাম রাহুল।" ম্যাজিশিয়ান বলেছিল, "এসো রাহুল।"

রাহুল সম্মোহিতের মতন গাড়িটায় উঠে পড়ে। তারপর আর কিছুই মনে নেই। রাহুল দেখল বৃদ্ধ লোকটি তখনও ঘুমোচ্ছেন। রাহুল সন্তর্পণে ল্যাবরেটারি থেকে বেরিয়ে এল। বারান্দায় মুকুটকে

দেখতে পেল। সে চাপা গলায় ডাকল, "মুকুট। এই মুকুট।"

ছেলেটা ওর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, "তুমি কাকে ডাকছ ভাস্কো দা গামা?"

রাহুল বলল, "আমার নাম রাহুল। আর তুমি মুকুট।"

ছেলেটা বলল, "কী আবোল-তাবোল বকছ তুমি!"

রাহুল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখে জল এসে যাচ্ছে। মুকুটের এ কী হল। তারপর কী ভেবে মুকুটের হাত ধরে সেই ল্যাবরেটারিতে ফিরে এল। বৃদ্ধ তখনও ঘুমোচ্ছেন। ফ্রিজ থেকে সেই তরল সে মুকুটের মুখে ঢেলে দিল।

ঠিক তখনি পুলিশ বাংলোটিকে ঘিরে ফেলেছে।

এক তরুণ সকলের আগে-আগে পা ফেলে ফেলে ল্যাবরেটারিতে এসে দাঁড়াল। বৃদ্ধের ঘুম ভেঙে গেছে। তার দিকে রিভলভার উঁচিয়ে সেই তরুণ বলল, "প্রফেসর কুণ্ডু, হ্যাণ্ডস আপ!"

তরুণটির নাম সাত্যকি দত্ত।

॥ পাঁচ ॥

আজ আমহার্স্ট স্ট্রিটে প্রসাদবাবুর বাড়িতে মুকুটকে নিয়ে নিখিলবাবু সস্ত্রীক এসেছেন। সবাই ড্রয়িংরুমে একজনের জন্যে অপেক্ষা করছেন। কলিং বেল বেজে উঠল। প্রসাদবাবু দরজা খুলে আনন্দিতকণ্ঠে বললেন, "আসুন। আসুন।" মুকুট ও রাহুল একসঙ্গে বলে উঠল, "কাকু।" সাত্যকি স্মিত হেসে একটা চেয়ারে বসল।

প্রসাদবাবু বললেন, "মিঃ দত্ত, কী খাবেন বলুন। চা না শরবত?"

সাত্যকির হাসিটি বড় সুন্দর। হেসে বলল, "চা।"

রাহুলের মা মিনা দেবী বললেন, "আপনার কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ। সেদিন আপনি যদি গোয়ায় না থাকতেন, তাহলে কী যে হত ভাবতে পারি না।"

মুকুটের মা'ও বললেন, "সে-সব দিনের কথা ভাবলে এখনও গা শিউরে ওঠে।"

নিখিলবাবু সাত্যকির দিকে সিগারেট এগিয়ে দিলেন।

সাত্যকি সিগারেট ধরিয়ে বলল, "আমিও মাঝে-মাঝে ভাবি। বৈজ্ঞানিক কুণ্ডুর মতন জিনিয়াস ব্যক্তিরাও একদিন অপরাধী হয়ে ওঠেন।"

মিনা দেবী ইতিমধ্যে বাড়ির ভিতরে গেছেন। এবং এখন ফিরলেন ট্রেতে খাবার ও চা নিয়ে। সাত্যকির সামনে সেগুলি টেবিলের উপর নামিয়ে রাখতে-রাখতে বললেন, "নিন, শুরু করুন।"

সাত্যকি বলল, "আমাকে কি ভীমচন্দ্র ঠাওরালেন? তা-ছাড়া আমি একা একাই বা খাব কেন?"

বাড়ির কাজের লোক ট্রেতে চায়ের কাপ সাজিয়ে ঢুকল।

প্রসাদবাবু বললেন, "নিন, শুরু করুন, এই তো, আমরাও চা খাব।"

সাত্যকি চায়ের কাপ টেনে নিয়ে বলল, "আমরা সকলেই চা খাব।"

মিনা দেবী বললেন, "না, না, তা হবে না। আপনার শুধু চা খেলে হবে না।"

সাত্যকি চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "বিজ্ঞানী খোকা কুণ্ডুর আবিষ্কারের পরিচয় পেয়ে আমার ডঃ জেকিল অ্যাণ্ড মিঃ হাইডের গল্পটা মনে পড়েছিল। যদিও তাঁর ওষুধ মানুষকে দেব বা দানব করছে না। তাঁর আবিষ্কৃত ওষুধ খেলে মানুষ সাময়িকভাবে শুধু নিজের পরিচয় ভুলে যায়। আমি কে, আমার পূর্ব পরিচয় কী ছিল, এসব কিছুই মনে থাকে না। তখন আমি কর্তার হাতের পুতুল। ঠিক যেমনটি হয়েছিল এরা। ম্যাজিশিয়ান রাজার পাপেট। তাই রাহুল দুটি শিশি দেখেছিল। ML সম্ভবত মেমারি লসের ইঙ্গিত দিচ্ছে। MG তে মেমারি গেনের ইঙ্গিত। একটা কথা আগেই বলে নেওয়া ভাল, ম্যাজিশিয়ান রাজা একজন ভাল ম্যাজিশিয়ান। তার ম্যাজিক-পার্টির সঙ্গে ছেলেচুরির কোনো সংস্রব নেই। তাদের ইউনিটের অধিকাংশ লোক নির্দোষ। তারা উঠেছিল গোয়ার একটা হোটেলে।"

নিখিলবাবু এবার কথা বললেন, "কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। ওরা মুকুট ও রাহুলকে চুরি করল কেন?"

প্রসাদবাবুও জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা তো লক্ষপতি বা কোটিপতি নই। তবে?"

সাত্যকি বলল, "সমস্ত ব্যাপারটাই অদ্ভুত জটিল, রহস্যময়। অ্যালটিনো হিলটপে আমরা বিচিত্র ল্যাবরেটারি আবিষ্কার করেছি। শুধু বাচ্চা ছেলে নয়, আমার ধারণা, অনেক নিখোঁজ মানুষের ঠিকানা এরা জানে।" সাত্যকি চুপ করল।

রাহুল বলল, "বাবা, আমি ও মুকুট একবার ওপর থেকে ঘুরে আসব?"

প্রসাদবাবু বললেন, "হ্যাঁ, যাও।"

সকলে সাত্যকির দিকে তাকাল। সাত্যকি আবার কথা শুরু করল, "আমার ধারণা, সারা ভারতবর্ষে এদের ফাঁদ পাতা। এদের আসল লক্ষ ছোট ছেলেদের চুরি করা। ব্রজ যেমন খেলার মাঠে রাহুলের সঙ্গে আলাপ করেছিল, তেমনি প্রসাদবাবুর কলিগ দত্তচৌধুরীর সূত্রে অনেকদিন আগে ম্যাজিশিয়ান রাজা এ-বাড়িতে এসেছিল। আপনারা গোয়ায় যাচ্ছেন এ-খবরটা ওরা পেয়েছিল। অ্যালটিনো হিলটপে বিজ্ঞানী কুণ্ডুর পরীক্ষাগার। গোয়ায় ট্যুরিস্টদের ভিড় প্রায় সারা বছর লেগেই থাকে। বাঙালিও কম আসেন না। বিজ্ঞানী কুণ্ডুর আস্তানাটা সবে হয়েছে। আর আপনাদের গোয়ায় যাওয়াটা কো-ইন্সিডেন্স বলতে পারেন। ম্যাজিশিয়ান রাজা ভাল ম্যাজিক জানে, হিপ্নোটিজমে ওস্তাদ। তাছাড়া ওদের হাতে আছে বিজ্ঞানী কুণ্ডুর মহৌষধ।"

সাত্যকি থামল। ঘরের সবাই চুপ। সাত্যকি আবার একটা সিগারেট ধরাল। তারপর ধোঁয়া গিলে তা আস্তে আস্তে ছাড়তে লাগল। সাত্যকি কথা শুরু করল, "আমার মনে হয়, পৃথিবীতে যে-ক'টি মুষ্টিমেয় মানুষ আণবিক শক্তিতে আস্থাশীল, যারা গড়তে জানে না, ভাঙতে প্রস্তুত, তাদের একজন বিজ্ঞানী কুণ্ডু। অবশ্য তাঁর সম্পর্কে গড়তে জানে না এ-কথাটা বলা হয়তো সঙ্গত হল না, কিন্তু যে-দৃষ্টির লক্ষ্যই হল ধ্বংস, তাকে আমি সৃষ্টি বলব না।"

মিনা দেবী বললেন, "উ-ফ্। কী ভয়ঙ্কর।"

"হ্যাঁ, ভয়ঙ্কর। পৃথিবীতে ভয়ঙ্কর-ভয়ঙ্কর ব্যাপারের মূলে আছেন প্রতিভাবান বুধমণ্ডলী।" বলে সাত্যকি হেসে ফেলল, "কথাটা একটু বই-বই মনে হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু মোদ্দা ব্যাপারটা তো সত্যি।··· বাচ্চাদের নিয়ে ওরা নিশ্চয়ই কোনো ইউনিট গড়ে তুলতে চেয়েছিল। যারা একদিন বড় হয়ে সামাজিক ধ্বংসের কাজে আরও তৎপর হয়ে উঠবে।"

ঘরের সবাই স্তব্ধ হয়ে সাত্যকির কথা শুনছিল। এমন সময় মুকুট ও রাহুল ঘরে ঢুকল। রাহুলের হাতে ছোট একটি লাল খাতা। ওদের দেখে সাত্যকির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সাত্যকি বলল, "এবার আমি একটি প্রশ্ন করব। বলো তো অ্যালটিনো হিলটপের আসল ম্যাজিশিয়ানটি কে?"

দুই বন্ধু সমস্বরে বলল, "বিজ্ঞানী খোকা কুণ্ডু।"

সাত্যকি ঘড়ি দেখল। এবার উঠতে হবে। রাহুল ও মুকুট ছুটে এল।

"একটু দাঁড়ান," বলে রাহুল হাতের ছোট লাল খাতাটা সাত্যকির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "একটা অটোগ্রাফ দিন।"

ছবি জয়ন্ত ঘোষ

সেলাপেটার ডাকবাংলোয়

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

মিঠুকাকা বড় মুশকিলে পড়েছে। বাড়িটা বেশ কদিন ঠাণ্ডা ছিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে আর পাকিস্তানে ইণ্ডিয়ান ক্রিকেট টিম গোবেড়েন খেয়েছে। ফুটবলে মোহনবাগান কুপোকাত। ইস্টবেঙ্গলের মাজা-ভাঙা দশা। খেলাধুলো সম্বন্ধে বাড়ির লোকদের উৎসাহটা একটু কমেছিল।

এ-বাড়ির ধারাটাই কীরকম যেন। পপনরা নাহয় ছোট, ওরা একটু-আধটু হল্লা করতে পারে। কিন্তু পপনের বাবা এই বুড়োবয়সেও কিছুক্ষণ মোহনবাগানের খেলা দেখেনই। ফুলদা ইস্টবেঙ্গল নিয়ে মাতামাতি করবেই। সারা ফুটবল মরসুমে বাড়িতে ফুটবল নিয়ে হল্লা লেগেই আছে। পপনের ফুলদা (আসলে কাকা, তবে ছোটবেলা থেকে দাদা বলে আসছে বলে পপন এখনও দাদাই বলে) মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল খেলার দিন সকালবেলা সবাইকে শাসিয়ে দেয়, সন্ধ্যাবেলা ইস্টবেঙ্গল হারলে কেউ বাঁকা কথা বলবে না।

পপনদের বাড়ির এই আরেকটা বৈশিষ্ট্য। এ-বাড়িতে সোজা কথা কেউ বলে না। ধরো, ইস্টবেঙ্গল হেরেছে। খাওয়ার টেবিলে বাবা শুরু করবেন, "জানিস্ ভানু, চন্দ্রকেতুগড়ে নতুন যেসব খোঁড়াখুঁড়ি হচ্ছে, তাতে জানতে পারা গেছে, এখন যেটাকে আমরা কলকাতা বলি, মধ্যযুগে সেখানে একটা দারুণ উত্তেজক খেলা হত। একটা গোল জিনিসকে সবাই লাথি মারত। তাতে সেই গোলকটা নানাদিকে যেত, আর তাই নিয়ে লোকেরা খুব নাচানাচি করত। সত্যি, মধ্যযুগে মানুষরা কী বোকাই না ছিল।"

এমনিতেই তিন-তিনটে সহজ গোলের সুযোগ নষ্ট করে একটা ফালতু শটে হেরে গেলে কারুরই মেজাজ ভাল থাকে না। তারপর খোঁচা মারবার জন্য যদি কেউ পুরাতত্ত্ব শুরু করে, তাহলে কার বা ভাল লাগে। মিঠুকাকা খেলা সম্বন্ধে কিচ্ছু বোঝে না। কিন্তু এ কথাটা শুনে বলল, "কী বলছিস রে দাদা, চন্দ্রকেতুগড়েও ফুটবল খেলা হত? আমি অবিশ্যি একবার চন্দ্রকেতুগড়ে..."

মিঠুকাকা কথাই বলার সুযোগ পায় না, ভেবেছিল এই সুযোগে একটা গল্প বলে নেবে। কোথায় বা কী? ফুলদা রেগেমেগে খাবার টেবিল ছেড়ে উঠে গেল। বলল, "কী যে ছাইপাঁশ পোস্ত রাঁধো রোজ, খেতে ইচ্ছে করে না।" এতে মাম্মা খুব অবাক হয়ে গেলেন। কারণ এ-বাড়িতে সবাই সব বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করে। পপনের বাবা মনে করেন, গাওসকর ভারতের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার। পপন আর ফুলদা মনে করে, গাওসকর বৃদ্ধ। বাড়ির তিন-অষ্টমাংশ ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক, পাঁচ-অষ্টমাংশ মোহনবাগানের, সত্যজিৎ রায় থেকে শুরু করে পুরী ভাল, না দার্জিলিং ভাল, এ নিয়ে এ-বাড়িতে কখনও কোনো বিষয়ে কেউ কারও সঙ্গে একমত হয় না। শুধু ব্যতিক্রম ওই পোস্ত। পোস্তচচ্চড়ি হলে সবাই খুশি। শুধু দু'কিলো পোস্ত যাকে বাটতে

হয়, সে-ই একটু গজগজ করে, এই যা। ইস্টবেঙ্গল হেরে গেলে সেই পোস্ত নিয়েও ফুলদা আপত্তি করে। মাম্মা বলেন, এরা যে কী নিয়ে রাগারাগি করে কিছুই বুঝি না।

এই সবকিছু বন্ধ ছিল এ ক'টা দিন। বাড়িতে কোনো উত্তেজনা নেই। কেউ খাবার ফেলে উঠছে না। মোহনবাগান ফেডারেশন কাপ হারলেও কেউ উচ্চবাচ্য করল না। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল তো ছার, যখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজে খেলা চলছিল তখন কেউ রেডিও পর্যন্ত শুনল না। মিঠুকাকাও বেশ আনন্দে ছিলেন। কিন্তু লোকগুলো এমন মুষড়ে পড়েছিল যে, বাড়িতে কোনো কথা বলে আনন্দ ছিল না। এই তো সেদিন মিঠুকাকা তার একটা নিখাদ সত্যি গল্প বলতে শুরু করেছিল। পপন একটু উৎসাহিতও হয়েছিল, কিন্তু দাদুই বলে উঠলেন, "জীবনটাই কী রকম জোলো হয়ে গেছে! তোর গল্পগুলোও তেমন আর জমছে না।" মিঠুকাকার মুখটা একেবারে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। শেষে বাবাও?

বাড়িতে আবার একটু জীবনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। হঠাৎই, একদম হঠাৎই ভারতীয় ক্রিকেট টিম প্রুডেনশিয়াল কাপে গিয়ে ভাল খেলে ফেলেছে। বাঘা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টিমকে হারানো চাট্টিখানি কথা? বাড়ি আবার কলকলিয়ে উঠেছে। দুপুরবেলা থেকে রেডিও চলেছে। এর চেয়ে ভাল রেডিও কেনা দরকার কি না, তাই নিয়ে গবেষণা চলেছে। ভূগোল নিয়ে গবেষণা চলেছে। জিম্বাবোয়ে কোথায়, এ সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। জাঞ্জিবার কিংবা গাম্বিয়া জিম্বাবোয়ে হয়েছে কিনা, এ নিয়ে তর্ক চলতে দেখে পপন বলেছে, "ওটা আগে রোডেশিয়া ছিল, এখন জিম্বাবোয়ে হয়েছে।"

তবু সাধুদেরও একটা দিন থাকে। বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ। স্কুল-কলেজ খোলার সময় হয়ে এসেছে। তাই যারা সবাই বাইরে গিয়েছিল, তারা ঘরে ফিরতে শুরু করেছে। মণিকাকি কালিম্পং গিয়েছিলেন। সেখান থেকে খুব সুন্দর ক্ষীরের ললিপপ নিয়ে এসেছেন। পপনের ভাইবোনেরা যে-কোনো জিনিস মুহূর্তে হাওয়া করে দেবার ম্যাজিক জানে, সুতরাং ললিপপগুলো বেশিক্ষণ টেকেনি। এ-বাড়িতে কিলো-কিলো বিস্কুট, হাজার-হাজার চিনাবাদাম, গণ্ডা-গণ্ডা জিলিপি, সবই খুব সহজে লোপাট হয়। ললিপপও তাই হয়েছে। তারপর সবাই মণিকাকিকে ধরে গল্প শুনতে বসেছে। মণিকাকি সেই সময় গল্পটা বলেছেন। ওরা গিয়ে উঠেছিল একটা ছোট হোটেলে। সেই বাড়িটা আগে এক চা-বাগানের সাহেবের ছিল। সেই সাহেব মরে যাবার পর বর্তমান মালিক সেটা হোটেল করে চালাচ্ছেন। মণিকাকি বলছিলেন, "কী বলব, সারাদিন তো খুব সুন্দর কাটত, কিন্তু রাত্রি হলেই নানারকম শব্দ হত। কখনও মশমশ শব্দ, কখনও খরখর শব্দ। সব সময় মনে হত যেন কেউ আছে। বড্ড ভয় করত। আমাদের হোটেলের মালিক বলতেন, ওসব কিছু না, কাঠের বাড়িতে হাওয়ায় ওরকম শব্দ হয়। তবে আমাদের হোটেলে ভানুমতী বলে যে মেয়েটি কাজ করত, সে আমাকে বলেছে, টমাস সাহেব (সেই চা-বাগানের সাহেবের নাম) রোজ রাত্রে তাঁর বাড়িতে দেখতে আসেন কে আছে না আছে।"

মণিকাকা বললেন, "যত্ত সব বাজে কথা!"

মণিকাকি বললেন, "তুমি থামো। নাহলে সব ফাঁস করে দেব।"

এরপর যা হয়, তা-ই হল। সবাই চেপে ধরল। বলল, বলতেই হবে কী হয়েছিল। মণিকাকির অবিশ্যি বলারই ইচ্ছে। তাই খুব অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলে ফেললেন, "যেদিন ভানুমতী বলল কথাটা, তারপর আমরা তিন রাত ছিলাম। আর তিনরাত তোমাদের মণিকাকা সন্ধে হলেই দুটো ঘুমের বড়ি খেয়ে ফেলত। ফলে রাত্তিরের খাওয়া প্রায় ঘুমন্ত অবস্থায় খেয়েই সোজা বিছানায়।"

সবাই হেসে উঠল।

মিঠুকাকা বলল, "তোমরা মিছেই মণিদাকে বকছ। সকলের কি আর সমান সাহস থাকে? সেলাপেটার ডাকবাংলোয় আমার আর কৈলাসের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সেটার আসল মানে যে কী, কৈলাস তো সে-সময় তা ধরতেই পারেনি। পরে যখন বুঝল, তখন আমার অবস্থা কাহিল। বিদেশ-বিভুঁইয়ে অতবড় চেহারার একটা লোক ঘন-ঘন অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে, এটা কি একটা সুখকর অভিজ্ঞতা!"

মণিকাকা বললেন, "কেন, কী হয়েছিল?"

মিঠুকাকা পপনদের দিকে তাকাল। বলল, "এখনি বৃষ্টি থেমে যাবে, অস্ট্রেলিয়ার খেলা আবার শুরু হবে।"

মণিকাকা বললেন, "কেন জ্বালাচ্ছ ভাই, শুরু করো।"

"শুরুর কথাটাই যদি বলো মণিদা, তাহলে কৈলাসকে দিয়েই শুরু করি। কৈলাস আমার সহকর্মী। প্রচণ্ড আমুদে। বাংলা উচ্চারণে একটু টান আছে। বোম্বাইয়ের লোকেদের যেমন থাকে। কিন্তু ভাল বাংলা বলে। বিশাল চেহারা। ওর গেঞ্জি ওর জুতো অর্ডার না দিলে পাওয়া যায় না। খাবার ব্যাপারে কৈলাস এ-বাড়ির ছেলে হবার যোগ্য।"

এ-কথায় ফুলদা, পপন, রাঙাকাকা সবাই একটু আপত্তি করল। কিন্তু মিঠুকাকা তাদের একদম পাত্তা না দিয়ে বলল, "অমলেট যে চারটের কম ডিমে হয়, কৈলাস সেটা বিশ্বাস করে না। চিকেন-কারি তিন ডোঙা খায় মনখারাপ থাকলে। মন ভাল থাকলে মুরগি-বংশ ধ্বংস হয়। কাজ করে পাঁচজনের, খায়ও ভাল-খাইয়ে পাঁচজনের সমান। ওকে নিয়ে কাজে বেরোলে মাঝে-মাঝেই খাবারের জন্য দাঁড়াতে হয়। আমরা অনেক মাইল ঘুরেছি সেদিন। পাহাড়ে রাস্তা। কোথাও জনমানব নেই। কৈলাস খাওয়ার অভাবে খুবই কাতর হয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত একটা পকোড়া-চায়ের দোকানে গাড়ি থামাল। আমায় বলল, 'দাদা, তুমি এখানে আরামসে বইঠো। আমি খাবার যোগাড় করছি।' পকোড়াওয়ালাকে কী বোঝাল ভগবান জানেন। এসে বলল, 'আর কিছুক্ষণ বাদেই গরম ভাত আর চিকেন-কারি পাবে।' পেলামও। তবে ঘণ্টা দুয়েক বাদে। সে খাবারের স্বাদ সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে চাই না। পকোড়া ভাজতে যা মশলা লাগে সেই মশলা দিয়েই রেঁধেছে। থকথকে ব্যসনের মধ্যে মুরগির ঠ্যাং। কৈলাসেরই ক্ষমতা আছে ওই খাবার মুখে দেবার। মধ্যে থেকে আমাদের দেরি হয়ে গেল। আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারলাম না। গভীর রাতে এসে হাজির হলাম সেলাপেটার ডাকবাংলোয়।

"কৈলাসের হাঁকাহাঁকিতে চৌকিদার বেরিয়ে এল। নাম বলল বেঞ্জামিন। গোয়ানিজ। বলল, 'জায়গা মিলবে।' খুব ভদ্রলোক। আমাদের ঘর দেখিয়ে দিল। বাড়তি কম্বল লাগবে কি না জিজ্ঞেস করল। বলল, 'খাতাতে নাম লিখতে হবে। তবে সে-সব করবে আমার ছেলে আলেক্স। সে কাল বিকেলে ফিরবে। শহরে গিয়েছে। তবে আপনাদের কোনো অসুবিধে হবে না।'

"সারাদিনের ক্লান্তিতে ঘুম এসে গিয়েছিল। খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লাম। কিন্তু খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল। দরজায় খটখট করে কে ধাক্কা দিচ্ছে। খুলে দেখি বেঞ্জামিন। জিজ্ঞেস করল আমাদের গরম জল চাই কি না। এখন চা খাব কি না। ছোট হাজরি খাব না ব্রেকফাস্ট করব? একটু রাগ হয়েছিল। কিন্তু লোকটার ব্যবহারে রাগ করতে পারলাম না। ভোরবেলা পাহাড়ের ওপর এই ডাকবাংলোর বারান্দা থেকে দৃশ্য দেখতে ভারী ভাল লাগছিল। বেঞ্জামিন চা-ও করেছিল ভাল। কৈলাস কম্বল-মুড়ি দিয়ে এসে বসল। হাঁক পাড়ল, 'বেঞ্জামিন।' বেঞ্জামিনও 'হুজুর' বলে এসে হাজির হল। কৈলাস হুকুম করল 'ব্রেকফাস্ট তৈয়ার করো।' দেখবার মতো ব্রেকফাস্ট খাওয়াল বেঞ্জামিন। বলল, 'হুজুর, বেকন পরিজ তো কিছু পাওয়া যায় না এখানে। ইণ্ডিয়ান ব্রেকফাস্ট খাবেন?' কৈলাস তাতেই রাজি। পুরি-তরকারি আর ডিমের ডালনা

করে আনল। ভাল গোয়ানিজ রান্না যদি না খেয়ে থাকো তাহলে বুঝবে না সামান্য পুরি-তরকারি কত সুস্বাদু হতে পারে। পঞ্চাশটা পুরি খেয়ে কৈলাস ফুরসত পেল একটু। বলল, 'খাসা রেঁধেছ বেঞ্জামিন।' বেঞ্জামিনও তাতে খুশি হয়ে মাথা নাড়ল।

"আমাদের তাড়া ছিল। বললাম, 'কই বেঞ্জামিন, তোমার বিল-টিল নিয়ে এসো। খাতাপত্তর কী সই করতে হবে দাও। ফেরার পথে এখানে আরেক রাত কাটাব।' বেঞ্জামিন বলল, 'সেই ভাল হুজুর, তখনই সব শোধ দেবেন। কবে আসবেন? আমরা বললাম, 'আজই তো কাজ শেষ হয়ে যাবে। আজকেই ফিরে আসব। তুমি একটু দেখো হরিণের মাংসটাংস পাও কি না।'

"ফিরলাম আবার রাত্রিবেলা। কৈলাস গাড়ি ছেড়ে নেমেই হাঁক দিল, 'বেঞ্জামিন, হরিণের মাংস পেলে?' বেঞ্জামিন বেরোল না। একজন অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের লোক বেরিয়ে এল। বুঝলাম, আলেক্স ফিরে এসেছে। কৈলাস বলল, 'তুমিই আলেক্স বোধহয়?' একটু অবাক হয়ে তাকাল ছেলেটি। তারপর ইংরেজিতে বলল, 'ইয়েস স্যার।' কৈলাস বলল, 'কাল রাতে আর আজ সকালে তোমার বাবা আমাদের অনেক যত্ন করেছে। এখন কিন্তু পেটে আগুন জ্বলছে।' আলেক্স বলল, 'একটু বসুন। হরিণের মাংসটা হয়ে এল, এরপর চাপাটি করে দেব।' সেদিন খাওয়াটা দারুণ হল। আমরা ঘুমোতে গেলাম।

"গোলমাল বাধল পরের দিন সকালে। আলেক্স খাবারের দাম নেবার সময় শুধু রাতের খাবার ছাড়া অন্য-কিছুর দাম নেবে না। বলল, 'স্যার, কাল হঠাৎই একজন বুনো লোক হরিণের মাংস দিয়ে গেল। আমার ভাঁড়ারে কিছুই ছিল না, আটা ছাড়া। আপনি রুটির দাম ছাড়া কিছু দেবেন না।'

"কৈলাস বলল, 'আর তোমার বাবা যে আমাদের এত খাওয়ালেন তার দাম কে নেবে?'

"আলেক্স এবার মুখ তুলে বলল, 'স্যার, আমার বাবার নাম বেঞ্জামিন, তিনি এই সেলাপেটা ডাকবাংলোর চৌকিদার ছিলেন, এ-সবই ঠিক। তবে আমি যখন খুব ছোট, আমার বাবা তখন মারা গেছেন। সে প্রায় বছর কুড়ি আগের কথা। এখনও বিদেশী লোক যদি এই ডাকবাংলোয় অসময়ে এসে হাজির হন, তাহলে তিনি তাঁদের দেখাশোনা করেন। আপনারা ওঁকে হরিণের মাংসের কথা নিশ্চয় বলেছিলেন, তাই উনি আমার কাছে হরিণের মাংস পাঠালেন। আপনারা তাঁর মেহমান। তবে মেহমানরা ওঁকে দেখতে পান, আমি কখনো পাইনি।'

"ঠাস করে মাটিতে পড়া কাকে বলে, কৈলাস তৎক্ষণাৎ তার একটা উদাহরণ দেখাল। মেডিক্যাল কলেজে দেখালে ছেলেদের পড়াশোনার একটু সুবিধা হত। আমায় বড্ড অসুবিধায় ফেলল কৈলাস। পরে অবশ্যি ঠিক হয়ে গেছে,তবে হরিণের মাংসটা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে।"

মণিকাকা-মণিকাকি গল্প শুনে খুব খুশি হলেন। শুধু রসভঙ্গ করলেন পপনের বাবা। বললেন, "হ্যাঁ রে মিঠু, সেলাপেটা কোথায় রে? এমন বিনি পয়সার ভোজ পাওয়া যায় যখন, ঘুরে আসি একবার।" মিঠুকাকা খুব রাগ করল। বলল, "দাদা, তুই গুরুজন। তোকে কিছু বলা আমার উচিত নয়। তবে ভূগোল সম্বন্ধে তোর জ্ঞানটা নেহাতই কম। তোর চেয়ে টুকটুকি অনেক ভাল ভূগোল জানে, ওর কাছে জেনে নিস।" বলে উঠে গেল।

ওদিকে বৃষ্টি থেমে গেছে। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলা শুরু হল আবার। সেদিন আর কোনো গোলমাল হল না। ভারত যথারীতি হেরে গেল। খেলার আলোচনায় অল্পদিনের জন্য ভাঁটা পড়ল পপনদের বাড়িতে। তারপর দ্বিগুণ জোয়ারে ফিরে এল। সে অন্য গল্প।

ছবি জয়ন্ত ঘোষ

ফেলুরাম

মৃণালকান্তি দাশ

অঙ্কে একশো আর
বিজ্ঞানে আশি—
দেখব কী করে বকে
ছোটমামা, মাসি!
ব্যাকরণে চল্লিশ,
করে গেছি পাশ,
আসলে তো ভাল জানি
সন্ধি, সমাস!
ভূগোলে গোল্লা পাই
এ যে দেখি ষাট!
এবার পুজোতে ঠিক
নেব লাল শার্ট।
ভাবা যায়, ইতিহাসে
পুরো নব্বই!
একশোই হত যদি
পড়তাম বই!
বাস্ রে দু' কানে কেন
এত জোর টান—
বই খুলে ঘুমোলেই
বাবা টের পান।
স্বপ্ন দেখে যে কেন
করি নাচানাচি—
ফেল করে এক ক্লাসে
দু' বছর আছি!

ছবি অহিভূষণ মালিক

কাঠবেড়ালি

মৃণাল দত্ত

কাঠবেড়ালি, কাঠবেড়ালি, এদিক-ওদিক চাও !
এ-গাছ থেকে ও-গাছ তুমি লাফিয়ে ছুটে যাও ।
কিসের এমন ব্যস্ততা যে, তর্‌তরিয়ে ওঠো
এক্কেবারে মগডালেতে, কেন এমন ছোটো ?
আমরা যারা বন্ধুতা চাই, করছ না তোয়াক্কা,
কুটুম-কাটুম শব্দে ভাঙো বাদাম না মনাক্কা ?
এই দেখলাম ল্যাজটি তুলে তাড়িয়ে দিলে শালিখ,
ভাবটি যেন এই বাগানের তুমিই হচ্ছ মালিক ।
বেশ তা না হয় হল, তুমি আমার কথা রাখো,
সারাটা দিন সঙ্গী হয়ে আমার সঙ্গে থাকো ।
দুপুরটাকে খেলতে খেলতে পার করে দিই, সন্ধে
নামিয়ে আনি টিলার মাথায় তক্ষুনি আনন্দে ।
কিন্তু তোমার মতিগতি বোঝাই বড় ভার,
চঞ্চলতা ভর করেছে চার পায়ে তোমার ।
পালিয়ে গেলে, কাঠবেড়ালি, তোমার সঙ্গে আড়ি,
তোমার জন্যে এনেছিলাম মস্ত জুড়িগাড়ি ।

নতুন বিদ্যে

রঞ্জন ভাদুড়ী

এই শহরে কেউ-বা আলোয় ডগ-শো করে,
কেউ-বা আবার হাতের লেখা মক্‌শো করে
অন্ধকারে—নেই কেরোসিন, বিজ্‌লি-বাতি,
চতুর্দিকে অন্ধরা সব দেখছে হাতি ।
অন্ধকারে যায় না পড়া, বরং লেখা
চলতে পারে—নতুন বিদ্যে হবেও শেখা ।
লেখার লাইন করতে পারে ভীষণ সুয়িং,
করুক গে যাক, মরুক গে যাক, নাথিং ডুয়িং ।
হরফগুলো এ-ওর গায়ে হুমড়ি খাবে,
উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে কেউ চাপাবে—
র-এর ফুটকি ব-এর উপর, রেফ-ঋকারও
জায়গা বদল করবে কেমন—দেখতে পারো !

অন্ধকারে লিখতে শেখো, নাম ছড়াবে ।
লেখায় যদি খুঁত না থাকে, প্রাইজ পাবে ।

ছবি অহিভূষণ মালিক

ঈগলের নখ

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

ঘটনাটা ঠিক এইভাবে ঘটেছিল। কলকাতার চার পাঁচটি ব্যাঙ্ক-ডাকাতির আসামি শরদিন্দু রায় গত ১৫ এপ্রিল পুলিশের সঙ্গে রবিনসন রোডের প্যারাডাইস অ্যাপার্টমেন্টের পঁচিশতলার ফ্ল্যাটটিতে আসে। পুলিশকে সে বলেছিল, এই ফ্ল্যাটে ব্যাঙ্ক থেকে লুঠ করা পনেরো লক্ষ টাকা লুকানো আছে। ফ্ল্যাটটির মালিক এক সিন্ধি ব্যবসায়ী। তিনি অধিকাংশ সময় বম্বে থাকেন। ফ্ল্যাটে থাকে নেপালি দরোয়ান নরবাহাদুর।

ঘটনার দিন অর্থাৎ ১৫ এপ্রিল দুপুরবেলা লালবাজারের ডাকাতি নিরোধ শাখার সাব-ইন্সপেক্টর সমীর প্রধান শরদিন্দুকে নিয়ে এই ফ্ল্যাটে আসেন। সমীরের সঙ্গে ছিল দুজন আর্মড কনেস্টবল আর দুজন সাদা পোশাকের কনেস্টবল।

শরদিন্দু রায় দুর্ধর্ষ আসামি। এর আগেও তিনটি ব্যাঙ্ক ডাকাতির ঘটনায় পুলিশ তার নামে ওয়ারেন্ট বার করে। কিন্তু চার পাঁচ বছর সে দেশে ছিল না। বাংলাদেশ হয়ে বার্মার মধ্য দিয়ে সে তাইল্যাণ্ডে যায় ও সেখানে চোরাকারবারের ব্যবসায়ে যোগ দেয়। সেখান থেকে শরদিন্দু হংকং যায়। হংকং-এর নাথন রোডে সে একটি হোটেলের ম্যানেজার হয়ে কিছুদিন কাজ করেছিল। কিন্তু ওই হোটেলের মালিককে খুন করে সে সরে পড়ে। নেপাল থেকে সে আবার ভারতে ঢোকে। এরপর কলকাতার ব্যাঙ্ক-ডাকাতির সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়ে।

পুলিশরা খুব ভাগ্যে বিশ্বাস করে। তারা বলে, ভাগ্য প্রসন্ন না হলে দাগি আসামিদের ধরা মুশকিল। সমীর প্রধান ব্যাঙ্ক-ডাকাতির ইনভেস্টিগেটিং অফিসার। চারমাস ধরে সে তন্ন-তন্ন করে আসামিদের খুঁজছিল। কিন্তু কোথাও কোনো ক্লু পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষে নেহাত এক দৈববশে ধরা পড়ে।

আমি সমীরের বস। ডি· ডি·র অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। সমীর দশবছর ধরেই ডি· ডি·তে। আমি দশবছর পরে সদ্য ডি· ডি·র চার্জ পেয়েছি।

আমাদের এই লাইনে সবাই নিজের নিজের সোর্স ও কাজকর্ম সম্পর্কে মন্ত্রগুপ্তি রাখে। কিন্তু সমীর আমাকে সব কথা খুলে বলত। শরদিন্দুর গ্রেফতারের ব্যাপারে সে আমাকে এক অদ্ভুত কাহিনী শোনায়।

সমীরের জবানিতেই বলি

ব্যাঙ্ক ডাকাতির ব্যাপারে কিনারা করার জন্য হন্যে হয়ে যখন সারা ভারত ঘুরে বেড়াচ্ছি, তখন একদিন রাত্তিরবেলা আমার দরজায় টোকা পড়ে। রাত তখন বড়জোর নটা হবে। লোডশেডিং। আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে পাশের ঘরে শুয়ে। আমি মোমবাতি জ্বেলে কতগুলি কাগজপত্র পরীক্ষা করছি।

আমি বললাম, "কে ?"

কোনো উত্তর দিল না কেউ। আবার দরজায় টোকা।

যদিও পুলিশ কোয়ার্টার্সে সাধারণ ক্রিমিন্যাল বদ-মতলবে ঢুকবে না, তবু সাবধানের মার নেই।

আমি ড্রয়ার থেকে রিভলভারটা বার করলাম। তারপর দরজা খুললাম।

দেখলাম এক রোগা বৃদ্ধ, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা। মুখে খোঁচা-খোঁচা পাকা দাড়ি। তিনি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে।

আমি বললাম, "কে আপনি ? কী চান ?"

লোকটি বলল, "আমাকে চিনবেন না। আপনি তো সমীরবাবু, ব্যাঙ্ক-ডাকাত শরদিন্দু রায়কে খুঁজছেন ?"

আমি চমকে উঠলাম। শরদিন্দু রায় যে এই ডাকাতদলের নেতা

এটা অত্যন্ত গোপন খবর। এ খবর আমার এক সোর্স দিয়েছে। কিন্তু এ-খবর আমি ডি· সি· ডি· ডি-কেও বলিনি। খবরের কাগজকে বলেছি, এটা উত্তরপ্রদেশের একটা গ্যাং-এর কীর্তি। তারা এ-নিয়ে রঙ চড়িয়ে অনেক কিছু লিখেছে।

আমি বললাম, "আপনার পরিচয় জানতে পারি ?"

লোকটি বলল, "আমি শরদিন্দুর বাবা।"

শুনে আমি চমকে উঠলাম। ভদ্রলোক বললেন, "নিজের ছেলেকে ধরিয়ে দিতে এসেছি। শরদিন্দু আমার একমাত্র ছেলে। মা-মরা ছেলে। বুকে-পিঠে করে মানুষ করেছি। কিন্তু স যে এমন অমানুষ হয়ে যাবে, তা ভাবিনি।

"আপনি বাবা হয়ে ছেলেকে ধরিয়ে দেবেন ?"

"আপনি যদি ওকে আজকালের মধ্যে গ্রেফতার না করেন, তাহলে ও খুন হয়ে যাবে। টাকার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে দলের মধ্যে ভীষণ গোলমাল দেখা দিয়েছে। আমি বাবা, ছেলে যে-যে অন্যায় করেছে, তার জন্য আইনে যা শাস্তি আছে পাক। কিন্তু ওর প্রাণটা বাঁচুক। আপনি ওকে গ্রেফতার করুন।"

"কীভাবে ?"

"আমি বলে দেব ও কোথায় আছে।"

"আপনি এত কথা কী করে জানলেন ?"

"দয়া করে এ-কথা জিজ্ঞাসা করবেন না। তবে আমি সব দেখতে পাই। কে কোথায় কী করছে সব জানতে পারি। আপনি আর জানতে চাইবেন না। আসামিকে গ্রেফতার করুন।"

"কবে নিয়ে যাবেন ?"

"আগামীকাল এই সময় আসব, তৈরি থাকবেন।"

সেই সময় হঠাৎ দমকা হাওয়ায় মোমবাতিটা নিবে গেল। কিছু বলতে যাবার আগে দেখি ভদ্রলোক দরজা খুলে বেরিয়ে গেছেন। তাড়াতাড়ি সিঁড়ির সামনে গিয়ে কাউকে দেখতে পেলাম না। যেন অদৃশ্য হয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

খুব খটকা লাগল পুরো ব্যাপারটা। কোনো ট্র্যাপ নয় তো ? এইভাবে ফাঁদ পেতে অনেক পুলিশকে হত্যা করা হয়েছে। আমি অবশ্য চিরকাল ডেয়ারিং, সবাই জানে। নয়তো চিনের বিখ্যাত ক্যারাটে লড়িয়ে লি চিয়া হুইকে সেই কোকেন কেসে অমন কাবু করতে পারতাম না।

পরদিন পাঁচজনের একটা সাদা পোশাকের ফোর্স নিয়ে রেডি থাকলাম।

ঠিক ন'টা বাজার সঙ্গে-সঙ্গে লোডশেডিং হয়ে গেল। আর মিনিট দশেকের মধ্যে দরজায় খটখট আওয়াজ।

দরজা খুলে দিলাম। বৃদ্ধ ঢুকলেন।

"রেডি ?"

"আমি ভেবেছিলাম আপনি বুঝি আর এলেন না।"

"কথা যখন দিয়েছি, আসবই। আর আপনার চেয়ে আমার দায় অনেক বেশি সমীরবাবু। আমার ছেলের জীবন নির্ভর করছে এর ওপর।"

"আপনি এখন কোথায় থাকেন ?"

এবার বৃদ্ধ যেন একটু অসন্তুষ্ট হলেন। "এ-কথা জেনে আপনার লাভ কী ?"

"না, এমনি জিজ্ঞেস করছি।"

বৃদ্ধ বললেন, "অন্যায় কৌতূহল সংবরণ করুন। আমার সম্পর্কে বেশি জানতে চাইবেন না। আপনাদের পুলিশ কোডেই আছে, সোর্সকে সব সময় গোপন রেখে দিতে হয়। চলুন। আরে বাবা, এত ঘর-ভর্তি লোকের কোনো দরকার ছিল না।"

"ভুলে যাবেন না, আমরা বরযাত্রী যাচ্ছি না। দুর্ধর্ষ আন্তর্জাতিক ক্রিমিন্যালকে ধরতে যাচ্ছি।"

"আমার ছেলে মোটেই দুর্ধর্ষ নয়। ছেলেবেলায় সে আরশোলা দেখে ভয়ে শিউরে উঠত। সে ছিল আরামপ্রিয়, চরম ফাঁকিবাজ, আর ভীষণ আদুরে। পড়াশোনায় ফাঁকি দিত ছেলেবেলা থেকে, মনটা নরম ছিল। একবার এক ভিখিরিকে আমার এক নতুন ধুতি দিয়ে দিয়েছিল বলে মার খেয়েছিল আমার কাছ থেকে। সেই ছেলে কীভাবে ডাকাত হয়ে গেল তা ভাবাই যায় না। জীবনে যে কাউকে কড়া কথা বলেনি, মারধোর করেনি। পুজোয় বলি দেখতে পারত না, বলত—আমার কষ্ট হয়। সেই ছেলে !"

আমি বললাম, "এমন হয়। কেউ তো আর জন্ম-অপরাধী হয় না। কুসঙ্গে পড়ে বহু ভাল ছেলে বিগড়ে যায়। চলুন, কোথায় যেতে হবে ? আপনাকে আমার জিপে বসতে হবে।"

আমার জিপে আমার পাশে ভদ্রলোক বসলেন। সত্যি কী রোগা মানুষ ! মনে হচ্ছে একটা কঙ্কালের গায়ে কে যেন ধুতি-পাঞ্জাবি পরিয়ে দিয়েছে। উনি যে আমার পাশে বসে আছেন, আমি তা অনুভবও করতে পারছি না।

বৃদ্ধ আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। আমাদের জিপ এসে থামল হ্যারিসন রোডের একটি হোটেলের সামনে। হোটেলের নাম জয়কৃষ্ণ লজ। ভদ্রলোক বললেন, "হোটেলের চারতলার চিলেকোঠার ঘরে চলে যান। শরদিন্দুকে পাবেন। আমার একান্ত অনুরোধ, তাকে মারধোর করবেন না। আইনত যা শাস্তি তার পাওনা, তাই তাকে দেবেন। তার কোনো ক্ষতি করবেন না। আমি কিন্তু সব কিছুই দেখছি। নিজের ছেলেকে ধরিয়ে দিয়েছি, বুঝতেই পারছেন আমি সাধারণের থেকে একটু আলাদা।"

"আপনি গাড়িতে বসুন। ড্রাইভার রইল আপনার সঙ্গে।"

"না, আমি ওর সামনে দাঁড়াতে পারব না। আমি চলি। দরকার হলেই আমাকে পাবেন।"

"আপনার ঠিকানা ?"

"আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখব।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোক ভিড়ের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেলেন। আমরা জয়কৃষ্ণ লজের দিকে ধীরে ধীরে এগোলাম। শরদিন্দুকে পাওয়া গেল ঠিক চিলেকোঠার ঘরে। মানস পাত্র, এই নামে রানিগঞ্জের ব্যবসায়ী সেজে সে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিল।

*

সমীরের মুখে শরদিন্দুর গ্রেফতারের রহস্য শুনেছিলাম। সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক, যিনি শরদিন্দুর বাবা তিনি আর আসেননি। সমীরও এ নিয়ে শরদিন্দুকে কিছু বলেনি। শরদিন্দু জেরার মুখে স্বীকার করে, ব্যাঙ্ক-লুঠের টাকা কোথায় কোথায় আছে। তার মধ্যে এক জায়গার নাম করে, সেটি প্যারাডাইস অ্যাপার্টমেন্ট। আর ওই প্যারাডাইস অ্যাপার্টমেন্টে লুকোনো টাকা সে যখন দেখাতে আসে, তখনই ঘটে সেই ঘটনাটি।

সমীরের বক্তব্য অনুসারে শরদিন্দু আর সমীর শোবার ঘরে ঢোকে। কনেস্টবলরা দরজার বাইরে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ শরদিন্দু আলমারির ড্রয়ার খুঁজবার ভান করে। তারপর জানালার সামনে এসে দাঁড়ায়। জানালায় কোনো গ্রিল ছিল না। হঠাৎ নিমেষের মধ্যে শরদিন্দু পঁচিশ তলা থেকে মরণ-ঝাঁপ দেয়। সমীর চিৎকার করে ওঠে। চিৎকার শুনে কনেস্টবলরা এসে দেখে, সমীর জানালা দিয়ে ঝুঁকে নীচে কী দেখছে। কনেস্টবলদের বলে, "সর্বনাশ হয়ে গেছে ! আসামি ঝাঁপ দিয়েছে। চলো, নীচে চলো।"

শরদিন্দুর এই মৃত্যু সমীরের মতে আত্মহত্যা। কিন্তু একজন বিচারাধীন আসামির পুলিশের হেফাজতে থাকা অবস্থায় এই যে অস্বাভাবিক মৃত্যু, এর সমস্ত দায় সমীরের ওপর এসে পড়েছে। তাকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে।

কিন্তু ঘটনা এখানেই থেমে যেত, যদি না একটি দৈনিক পত্রিকার ক্রাইম রিপোর্টার সঞ্জয় সেন তিনটি প্রবন্ধ লিখে প্রমাণ করতেন যে, শরদিন্দুকে হত্যা করা হয়েছে। শরদিন্দু নাকি লুকোনো টাকার হদিস

ঠিকই দিয়েছিল, কিন্তু ইনভেস্টিগেটিং অফিসার সমীর ওই টাকা আত্মসাৎ করতে উৎসুক। আর এই টাকা আত্মসাৎ করা খুবই সহজ হয়ে দাঁড়ায়, যদি শরদিন্দুকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়। নয়তো ওই মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিংয়ে তাকে নিয়ে যাওয়ার কোনো দরকার ছিল না। ওই বাড়ির মালিক সিন্ধি ব্যবসায়ীর সঙ্গে শরদিন্দুর মাত্র একবার দেখা হয়েছিল। ওই ভদ্রলোকের আরও ফ্ল্যাট আছে। শরদিন্দু সম্ভবত ব্যাঙ্ক-ডাকাতির টাকায় একটি ফ্ল্যাট কিনতে চেয়েছিল। এছাড়া আর কোনো সম্পর্ক ছিল না শরদিন্দুর সঙ্গে। সমীর ওই ফ্ল্যাটে এর আগে একবার এসেছিল। তখনই শরদিন্দুকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে সে।

এই প্রতিবেদন নিয়ে সারা শহরে হইচই পড়ে। আর আমার ওপর পড়ে একটি অপ্রিয় কাজের ভার। এই ঘটনার তদন্ত। আমাকে বার করতে হবে, সত্যি-সত্যি ইচ্ছা করেই সমীর শরদিন্দুকে ফেলে দিয়েছে কি না।

আমি যতদূর সমীরকে জানি, সে একজন সৎ ও দক্ষ অফিসার। সে কেন এতবড় একটা ঝুঁকি নিতে যাবে। তার একটা বড় ভুল হয়েছিল শরদিন্দুকে নিয়ে ওইভাবে ঘরে ঢোকা। বিশেষ করে জানালায় যখন গ্রিল নেই। কিন্তু আমাকে সমীর বলেছিল, "বিশ্বাস করুন স্যর, আমার একদম মনে হয়নি শরদিন্দু আত্মহত্যা করতে পারে। সে ভেতরে-ভেতরে খুব অনুতপ্ত হয়েছিল। সমস্ত ঘটনার স্বীকারোক্তি করেছিল। তার স্টেটমেন্টের ওপর ভিত্তি করে গোটা দলটাকে আমরা ধরে ফেলি। কিন্তু শরদিন্দু নিজে যে এভাবে ঝাঁপ দেবে তা বুঝতে পারিনি।"

আমি বলেছিলাম, "সমীর, কিছু মনে কোরো না, তদন্ত না করে আমি তোমার সপক্ষে বা বিপক্ষে কোনো রায় দিতে পারব বলে মনে হয় না। তুমি আমাকে একবার ওই বাড়িতে নিয়ে গিয়ে দেখাবে কী ভাবে শরদিন্দু ঝাঁপ দিয়েছিল?"

সমীর বলল, "নিশ্চয়ই। আপনি যেদিন বলবেন।"

আমি বললাম, "চলো, কালই আমরা যাব।"

উঁচুবাড়ির পঁচিশতলা থেকে কলকাতাকে অপূর্ব দেখায়। মনেই হয় না কলকাতার চেয়ে ভাল জায়গা আর কোথাও আছে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। কত ছোট ছোট দেখাচ্ছে নীচের মানুষজনকে। জানালাটা একটু উঁচুতে। একজনকে উঠতে গেলে লাফিয়ে উঠতে হবে। একটি জলজ্যান্ত লোক জানালার উপর উঠল, নীচে ঝাঁপ দিল, এতে তো সময় লেগেছে কিছুটা। কিন্তু সমীর তখন করছিল কী? তার উচিত হয়নি অতখানি অন্যমনস্ক হওয়া।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে বাজ পড়লেও এত চমকাতাম না। দেখি এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক কোন্ ফাঁকে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। নিমেষের মধ্যে বৃদ্ধ এগিয়ে গেলেন সমীরের দিকে।

সমীর তাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েছিল। কিন্তু গলা থেকে স্বর বেরুল না। আমি ছুটে যাবার আগে দেখলাম জানালায় দুজনের ধস্তাধস্তি হচ্ছে।

বৃদ্ধ এক ঝটকায় সমীরকে যেন শূন্যে তুলে ধরলেন। তারপর যেমনভাবে কোনো ভারী জিনিস কেউ ফেলে দেয়, তেমনি করে সমীরকে ফেলে দিলেন খোলা জানালা দিয়ে। সমীরও বোধহয় লোকটির গলা জড়িয়ে ধরেছিল। সেও একই সঙ্গে নীচে পড়ল। চোখের সামনে নিমেষের মধ্যে এই ঘটনা ঘটে গেল। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

ততক্ষণে আমার সঙ্গীরা সবাই এসে গেছে। তাদের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে শুধু বললাম, "সর্বনাশ হয়েছে।"

কিন্তু কোথায় গেল সেই বৃদ্ধের মৃতদেহ? তন্নতন্ন করে খুঁজেও তার মৃতদেহ পাওয়া গেল না! শুধু শান-বাঁধানো মেঝের ওপর

সমীরের থেঁতলানো দেহটা পড়ে আছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে সমস্ত জায়গাটা।

এই ঘটনার পর আমার পক্ষে মানসম্ভ্রম নিয়ে চাকরিতে টিঁকে থাকাটাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

একটি খুনের কিনারা করতে গিয়ে পরোক্ষভাবে আমি আর একটি মর্মান্তিক মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম। আমার প্রথম কাজ হল শরদিন্দুর বাবা সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া। এতদিন ধরে যে রহস্যময় লোকটি সমীরকে অনিবার্য পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, কে সে? সে কি কোনো বাস্তব অস্তিত্ব?

অনেক খোঁজখবর করে যে তথ্য যোগাড় করলাম তাতে আমি স্তম্ভিত। আজ থেকে পাঁচবছর আগে উত্তরপ্রদেশের এক অখ্যাত শহরে মৃত্যু হয়েছিল যোগেন্দ্রমোহন রায়ের।

শরদিন্দুর বাবা যোগেন্দ্রমোহন। উত্তরপ্রদেশ থেকে তাঁর যে ছবিটি যোগাড় করেছিলাম, সেটি দেখে চমকে উঠলাম। এই তো সেই বৃদ্ধ। যাঁকে আমি ক্ষণিকের জন্য দেখেছিলাম শীর্ণ হাত দুটি দিয়ে প্যারাডাইস অ্যাপার্টমেন্টের জানালা থেকে সমীরকে ফেলে দিতে। কিন্তু সমীরকে তিনি হত্যা করবেন কেন? তবে কি সত্যিই সমীর টাকার লাভে শরদিন্দুকে হত্যা করে সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপাট করার চেষ্টা করেছিল? ঘটনাটা আজও আমার কাছে রহস্যাবৃত।

সমীরের মৃত্যুর জের মেটাতে হয় আমার পুলিশি জীবনের অবসান ঘটিয়ে। তদন্ত কমিটিতে আমি নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছি। প্রমাণিত হয়েছে: সমীরের মৃত্যু আত্মহত্যা।

পুলিশের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আমি এখন একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি চালাই।

ছবি জয়ন্ত ঘোষ

এক মিনিটের ছবি

সন্তোষ চক্রবর্তী

একটু কাগজ কলম নিয়ে
পদ্য লেখো কবি ।
এক মিনিটে আঁকতে পারো
প্রসিদ্ধ এক ছবি ?

স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ভেবে
কিচ্ছু পেলে নাকো ?
বলছি শোনো, একটি শুধু
বর্গক্ষেত্র আঁকো ।

ব্যস্, তাহলেই কেল্লাফতে,
দেখলে কেমন মজা !
ছবির মানে ? তা-ও বোঝোনি ?
এক্কেবারে সোজা !

একটি গোরু উধাও খেয়ে
মাঠের যত ঘাস
গোরুও নেই, ঘাস-ও নেই,
শূন্য ক্যানভাস ।

এবার ভেবেচিন্তে দাও তো
জগৎ-জোড়া নাম ।
হাংরি কাউ ? অল্ ইজ্ ওভার ?
কোটি ডলার দাম ।

ফুলের দুষ্টুমি

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

টুকটুক ফুটফুট ফুলগুলি ফুটল
ছুটছুট সুগন্ধ চারদিকে ছুটল ।
রিংকু ও বিংকুরা ঘুম থেকে উঠল
টুকটুক ফুটফুট ফুলগুলি ফুটল ।

হাতমুখ ধুয়ে নিয়ে বইখাতা খুলল
অঙ্ক ও ইংরেজি তক্ষুনি ভুলল ।
জানালার পাশে যেই ফুলেদের ফুল্ল
মুখখানি দেখে ফেলে সব কিছু ভুলল ।

মেজদার থাপ্পড় তক্ষুনি পড়ল,
জলভরা চোখে ভাবে এ কী তারা করল !

যুদ্ধ, শান্তি

সুব্রত রুদ্র

বাবা-মায়ের ঝগড়া
যাবই চলে মগরা ।

কেউ দিয়ো না বাগড়া
না-হয় যাব খাগড়া ।

বাবা বুঝি রাগবেন ?
তাঁরা একাই থাকবেন ।

আপনি তো খুব শান্ত
বোর্ডিং-টোর্ডিং যান তো ?

বর-হনুমান

আশিস সান্যাল

হনুমানের সাধ হয়েছে
করতে যাবে বিয়ে ;
জুতো-জামায় পরিপাটি—
টোপর মাথায় দিয়ে ।

কিন্তু কনে কোথায় পাবে ?
হনুর বড় ভাবনা ।
ভাবল হনু কনে খুঁজতে
যাবেই শেষে পাবনা ।

ভাবতে ভাবতে পুলক জাগে,
মনে কত রঙ্গ,
নাচে হনু গাছের ডালে
দোলায় সারা অঙ্গ ।

ধিন্‌তা ধি-না, ধিন্‌তা ধি-না,
দোলে হনুর গা
ধপাস করে পড়ল নীচে
ফশ্‌কে গিয়ে পা ।

মাথার টোপর ছিটকে গেল,
পড়ল কাঁটা-বনে ।
কেঁদে বলে বর-হনুমান
"চাই না বিয়ের কনে ।"

ছবি অহিভূষণ মালিক

ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনার ভোম্বলমামা

চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত

সায়েববাঁধের পাড়ের ঢালু জমিতে বসে মেজদা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। ইদানীং আমরা চৌধুরীদের আমবাগানে বড়-একটা যাই না। তার প্রধান কারণ সেই ঐতিহাসিক গোটফাইট। রামছাগলের শিং উঁচিয়ে তাড়া করা আর সবশেষে মেজদার পপাত পানাপুকুরে, এই ঘটনাটার কথা মেজদা ভুলতে পারেনি। এজন্য, বিশেষত শরৎকালে, চৌধুরীদের আমবাগানে যেতে মেজদা নারাজ। কারণ, মেজদার মতে, মানুষের মুড ভাল থাকলে যেমন গান গায়, তেমনি ছাগলজাতীয় প্রাণীর মুড ভাল থাকলে ওরা শিং উঁচিয়ে মানুষকে তাড়া করে। আর শরৎকালেই নাকি ওদের মুড ভাল থাকে। ওদের মুড ভাল থাকাটা মানুষের পক্ষে অবশ্যই বিশেষ বিড়ম্বনার ব্যাপার, যেহেতু ছাগল ছাগলই।

এখন আসন্ন পুজোর ছুটির খুশিয়ালিতে আমাদের মনমেজাজ বেশ ভাল। আমরা সায়েববাঁধের পাড়ে পৌঁছে বসতে না বসতেই মেজদা ওর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ডাম্বেলের মতো মুখ করে উইদাউট রেফারেন্স টু দি কনটেক্সট আলটপকা প্রশ্ন ছুঁড়ল একটা। "বল্ তো 'দ্বিরদরদনির্মিত দ্বারে দুয়ারী দ্বিরদ' কথাটার মানে কী?"

আমরা, মানে আমি আর বিল্টু হতভম্বের মতো তাকিয়ে থাকায় মেজদা আবার বলল, "বাংলা কথা।"

কিন্তু আমাদের কাছে গ্রিক। গোটা বাক্যটির মধ্যে দ্বার ও দুয়ারী শব্দ দুটি ছাড়া আর কোনো শব্দের মানে জানা নেই আমাদের।

কিন্তু মেজদার এহেন কঠিন বাক্যবাণ নিক্ষেপের কারণটা একটু ভাবতেই আন্দাজ করতে পারলাম।

বাংলার স্যার কদিন আগে শরৎকাল নিয়ে একটা কবিতা লিখতে বলেছিলেন। একদিন পুকুর-পাড়ে বসে ঝাড়া দু'ঘণ্টা মকসো করে দু'ছত্র কবিতা লিখে শুনিয়েছিল মেজদা

হেথা বসে আমি শরৎকালেতে
পুকুরের শোভা দেখি,
শিক্ষকের কথা হইল স্মরণ
তাই এ কবিতা লেখি।

তারপর আর এগোয়নি। তাই শুনে বিল্টু বলেছিল, "বিলকুল রদ্দি। ওটা কবিতার ছেঁচকি হয়েছে।"

মুখের উপর এমন একটা জবাব বিল্টুর কাছ থেকে আশা করেনি মেজদা। তাই বিল্টুর দুঃসাহস দেখে অবাক না হয়ে বরং ভারসাম্য হারিয়ে মেজদা কিছুটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। ভাবটা এইরকম যে, বিল্টু, শেষে কিনা তুইও?

অন্যসময় হলে মেজদা শেক্সপিয়রসাহেবের ডায়ালগ ঝাড়ত, "এত্ তু বিল্টু?" অর্থাৎ কিনা, "বিল্টু, তুইও?" কিন্তু ব্যাপারটা হাল্কা হয়ে যাবে, তাই মেজদা কোনো কথা না বলে মুখ গোঁজ করে রইল।

আমি সান্ত্বনাচ্ছলে মেজদাকে বললাম, "বিল্টু বাংলা কবিতা কী

বোঝে মেজদা ? ও নিজেই হিন্দির জলে ধুয়ে বাংলা বলে। ওর কথায় হতাশ হওয়ার কিছু নেই। তুমি বরং কবিতাটা শেষ করো, তারপর শোনা যাবে।"

হাত-পা ঝেড়ে চাঙ্গা হয়ে উঠে বসে মেজদা বলল, "হিপোক্যাম্পাস। ওর কথা শুনে যদি আমায় কবিতা লেখা ছেড়ে দিতে হয়, তাহলে তো সাপ, ব্যাঙ, ইঁদুর, বেড়ালের হাঁচিকাসিতেও···যাকগে সেসব, ওকে একদিন শব্দকল্পদ্রুমটা ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে।"

বিল্টু নির্বিকারভাবে চোরকাঁটার শিষ চিবোতে চিবোতে বলল, "ও, তুমি দুড়ুম সমঝাও আর দাড়াম সমঝাও মেজদা, তোমার ওটা কিন্তু কবিতা হয়নি।"

মেজদা চটেমটে 'কম্বুকম্ব কোথাকার' বলে ইতি টেনেছিল আলোচনার। আজকের এই দ্বিরদরদর বাক্যবাণটি তারই জের।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর মেজদা বলল, "কী হল, একেবারে স্পিকটি নট ?"

আমি বললাম, "জানি না।"

আমার কথায় সায় দিয়ে বিল্টুও বলল, "জানতা নেহি।"

মুখ ভেংচে মেজদা বলল, "জানতা নেহি তো সব কথায় মাতব্বরি কাঁহে করতা ?"

আমরা বুঝলাম, আজ মেজদার পালা। আমাদের চুপ করে থাকতে দেখে নেহাত করুণা করে কথাটা খোলসা করল মেজদা, "শোন, দ্বিরদ মানে হাতি, আর দ্বিরদরদ মানে হাতির দাঁত। তাহলে কথাটা কী দাঁড়াল ? হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি দরজায় হাতি প্রহরী।"

আমি আমতা-আমতা করে বললাম, "শব্দগুলো ভারী কঠিন।"

মেজদা বলল, "হবে না ? কে বলেছিল দেখতে হবে তো ? দি গ্রেট লাঙ্গুয়েজ ট্রেনার ভোম্বল সেন।"

"ভোম্বলমামা ?"

বিল্টু বলল, "ভালুমার ভোম্বলমামা ?" অর্থাৎ ভালুক-শিকারি ভোম্বলমামা ?

মেজদা বলল, "ইয়েস।"

আমি শুধোলাম, "ভোম্বলমামা বুঝি অনেকগুলো ভাষা জানতেন ?"

মেজদা বলল, "মোটেই না। ইংরেজি, বাংলা আর কাজ-চালানো হিন্দি ছাড়া আর অন্য কোনো ভাষা জানতেন না ভোম্বলমামা। কিন্তু ওঁর ট্রেনিং দেওয়ার একটা বিশেষ পদ্ধতি ছিল। একটি কি দুটি সেনটেন্স শিখিয়ে দিতেন। তাই দিয়েই কিস্তিমাত। সায়েবরা তাই দিয়ে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিত। আর কিছু শেখার দরকারই হত না।"

বিল্টু অবাক হয়ে বলল, "স্রেফ একটি কি দুটি ?"

মেজদা বিজ্ঞের মতো বলল, "ইয়েস। তাহলে একটা গল্প বলি শোন।"

তারপর, পাছে আমরা গুল বলে ভাবি, এইজন্য, শুধরে নিল কথাটা, "নট গল্প, সত্যি ঘটনা। ভোম্বলমামা তখন পশ্চিমের কোনো একটা কমিসরিয়টে চাকরি করতেন। ওপরওলারা সবাই লালমুখো সায়েব। ওরা দু'তিন বছর পরপরই বছরখানেকের ছুটি নিয়ে হোমে যেত, মানে বিলেতে, ওদের জায়গায় বিলেত থেকে নতুন সায়েব আসত। একেবারে নতুন, চকচকে, ঝকঝকে। চিনেবাড়ির আনকোরা জুতোর মতো। ওরা এদেশের ভাষা কিছুই বুঝত না। বিলেত থেকেই ভোম্বলমামার রেফারেন্স নিয়ে আসত। এদেশে এসেই খোঁজ পড়ত, বোলাও ব্যাম্বুলবাবুকো।

"সেবার বিলেত থেকে এক আনকোরা নতুন সায়েব এ-দেশের মাটিতে পা দিয়েই ভোম্বলমামাকে ডেকে বলল, 'ব্যাম্বুলবাবু, ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনিং-এ তোমার আশ্চর্য দক্ষতার কথা বিলেত থেকেই শুনে এসেছি। তুমি আমাকে এ-দেশের ভাষা শিখিয়ে দাও।'

"ভোম্বলমামা বললেন, 'সায়েব, এই তো সবে বিলেত থেকে এসেছ, দুদিন জিরিয়ে নাও।'

"সায়েবের আর তর সয় না। জিদ ধরল, 'না, আজ থেকেই। ফ্রম টুডে।"

"ভোম্বলমামা কোনো উপায় না দেখে বললেন, 'শোনো সায়েব, তোমাকে আমি মাত্র দুটো কথা শেখাব। খুব দরকারি কথা। আর তাই সারাজীবন তোমার কাজে লাগবে।'

"সায়েব তো অনুগত শিষ্যের মতো উবু হয়ে ভোম্বলমামার পায়ের কাছে বসল।"

বিল্টু বলে উঠল, "মহাভারতে দ্রোণ আর একলব্যের তস্‌বিরটা দেখেছিল শায়দ।"

মেজদা হুঙ্কার দিয়ে বলল, "আবার ফুট কাটছিস ?"

আমি মেজদাকে আশ্বাস দিলাম, "ছেড়ে দাও মেজদা। বিল্টু অবোধ প্রাণী। না বুঝে বলে ফেলেছে।"

মেজদা ঠাণ্ডা হয়ে বলল, "হ্যাঁ যা বলছিলাম, সায়েব তো শিষ্যের মতো ভোম্বলমামার পায়ের কাছে বসল। ভোম্বলমামা বললেন, 'দ্যাখো সায়েব, নেটিভ আর্দালিরা তো তোমাদের ভাষা বোঝে না। তাই দরজা খোলা-বন্ধের লব্জটা তোমায় আগে শেখাচ্ছি। যখন দরজা বন্ধ করার অর্ডার দেবে, তখন তোমার নিজের ভাষায় বলবে, দেয়ার ওয়াজ এ ব্রাউন ক্রো। আর যখন দরজা খোলার অর্ডার দেবে, তখন বলবে, দেয়ার ওয়াজ এ কোল্ড ডে। তাহলেই তোমার হুকুম তামিল হবে।'

"সায়েব তো মহাখুশি। মহানন্দে ভোম্বলমামাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'ও ব্যাম্বুলবাবু, য়ু আর গ্রেট।"

বিল্টু অধৈর্য হয়ে বলল, "লেকিন কৌয়াগুলোর কী হল ?"

মেজদা অবাক হয়ে বলল, "কৌয়া ? কৌয়া কী ?"

বিল্টু বলল, "কৌয়া বোঝো না ? কাক, কাক। ওই যে বললে না ব্রাউন ক্রো ?"

মেজদা বেশ বিরক্ত হয়ে বলল, "আগে গোটা ব্যাপারটা শুনবি তো, কম্বুকম্ব কোথাকার ! তারপর সেইদিনই অফিসঘরে ঢুকে সায়েব আর্দালিকে ডেকে বলল, দেয়ার ওয়াজ এ ব্রাউন ক্রো। সায়েবি উচ্চারণে সেটা দাঁড়াল : দার ওয়াজআ ব্রান ক্রো। আর্দালি শুনল দারওয়াজা বন্ধ করো। ও দরজা বন্ধ করে দিল। দেখেশুনে সায়েব তো একেবারে থ। সন্ধেবেলায় সায়েব আর্দালিকে বলল, দেয়ার ওয়াজ এ কোল্ড ডে। সায়েবি উচ্চারণে সেটা হল : দার ওয়াজআ কোল্ড ডে। আর্দালি শুনল : দারওয়াজা খোল্ দে।' ও দরজা খুলে দিল। সায়েব ভোম্বলমামাকে আর একদফা থ্যাঙ্কস্ দিয়ে বলল, 'ব্যাম্বুলবাবু, য়ু আর ওয়াণ্ডারফুল। আর কিছু শেখাবে না ?'

"ভোম্বলমামা বললেন, 'সায়েব, কিছু না জেনেই তোমরা দুশো বছর ধরে আমাদের ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছ। আর বেশি শিখে দরকার নেই। ভয় পেলে আর্দালিকে বলবে দরজা বন্ধ করে দিতে। আর পালাতে হলে বলবে দরজা খুলে দিতে। দুটো মোদ্দা কথা তোমাকে শিখিয়ে দিলাম।'"

বিল্টু চোখ কপালে তুলে বলল, "আই বাপ্‌স।"

আমি বললাম, "কথা দুটো আখেরে কাজে লেগেছিল সায়েবের ?"

মেজদা বলল, "তবে আর বলছি কী ! একবার স্বদেশী বাবুরা সায়েবের বাংলো অ্যাটাক করেছিল। তখন, দেয়ার ওয়াজ এ কোল্ড ডে বলে আর্দালিকে দিয়ে খিড়কির দরজা খুলিয়ে পগার পার হয়েছিলেন। মানে পালিয়েছিলেন।"

আমি বললাম, "ভয়ে ?"

মেজদা বলল, "না, নির্ভয়ে !"

আষাঢ়ে, তবু আষাঢ়ে নয়

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়
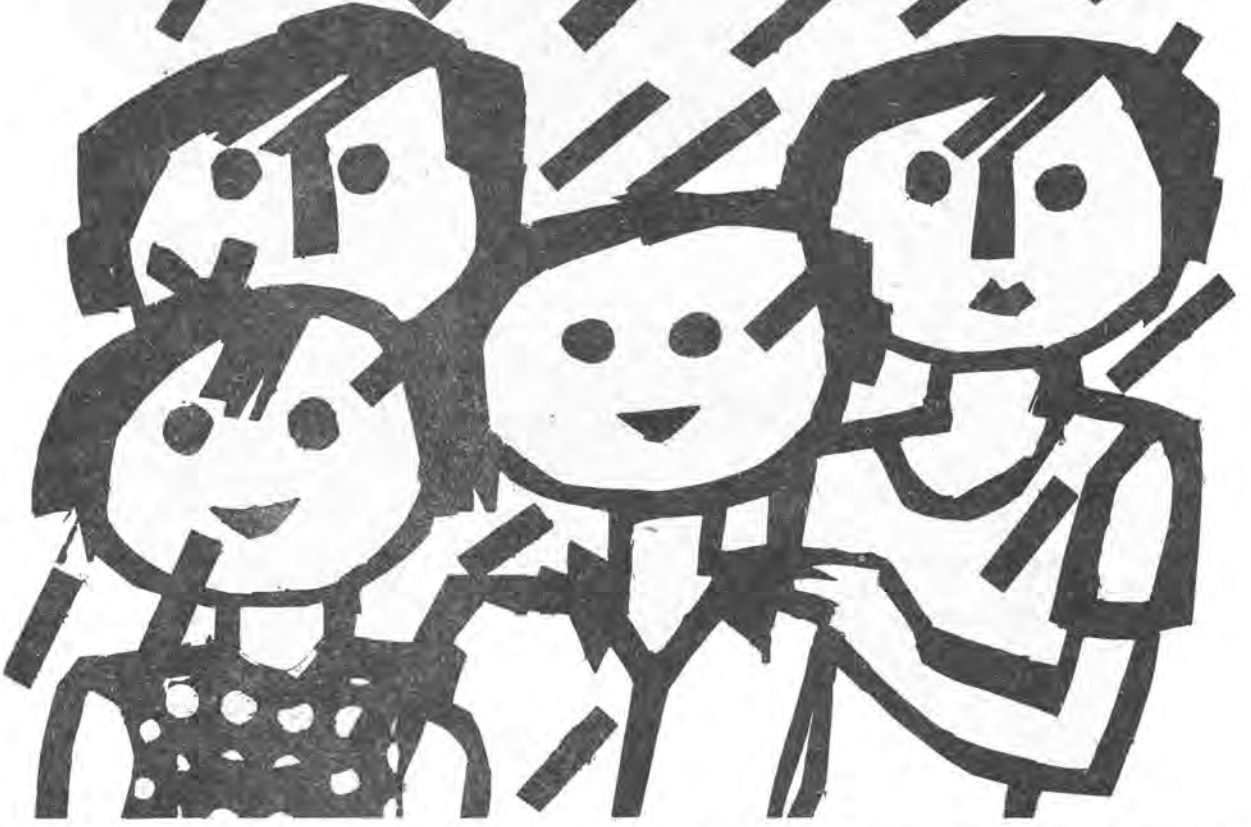
ক্রিং ক্রিং ! ক্রিং ক্রিং ! একহাঁটু জলে ভেজা গোটানো প্যান্টটা সবে পিকলু নামাতে আরম্ভ করেছে, ফোনটা বাজতে আরম্ভ করল। কলকাতায় কাল থেকে যা বর্ষা, ছোটপিসির ফোনটা এখনও এত জোরে বাজছে ! পিক্‌লু তো অবাক। ছিয়ানব্বই হাজার নষ্ট ফোনের মধ্যে ছোটপিসিরা পড়েনি ! ভাবা যায় না।

"হ্যালো ! কাকে চাই ?"

"সজল ব্যানার্জি আছেন ?"

"না, উনি তো একটা সভায় গেছেন। ওঁর স্ত্রী আছেন। ডেকে দেব ? ··· আচ্ছা।"

পিকলু ফোন ধরে হাঁকল, "সোনামা, ছোটপিসেমশাইকে একটা ছেলে খুঁজছে—নাম বলেনি। তোমাকে চায়।"

সোনামা রান্নাঘর থেকে আসতে গিয়ে পা হড়কে উঠোনে বার দুই ছপ্‌ছপিয়ে খানিকটা ভিজে-টিজে এসে ফোন ধরলেন।

"হ্যালো, আমি আলো ব্যানার্জি বলছি।"

"কোথায় ? ··· ঐ মিটিংয়ে গিয়ে আমি দেখা করব। আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি তার সাথে দেখা করতে। আপনি পথটা বাতলে দেবেন ?"

"বাংলাদেশ থেকে আসছ ? তোমার নাম কী ?"

"দোয়েল অজিতেশ।"

কয়েক সেকেণ্ড সোনামার হাতে রিসিভারটা হতভম্ব হয়ে আটকে রইল। তারপর—

"কী নাম বললে ?"

"দোয়েল অজিতেশ।"

"ঠিক বুঝলাম না। অজিতেশ তোমার পদবী ? কখনও শুনিনি তো এদিকে।"

"ঐ সবটা আমার নাম। অজিতেশ ব্যানার্জিরে চেনেন ? শের আফগান করে ? তার নাম থেকে অর্ধেক আর অর্ধেক গাইয়ে-পাখি দোয়েল থেকে। কেন, আপনার অসুবিধা হয় ? আমি চৌরঙ্গিতে আছি। এখন বলেন।"

"না, না, বলছি, অসুবিধে কী ?" বলে সোনামা তাকে চৌরঙ্গি থেকে কী করে সে দক্ষিণ কলকাতার সেই লেখক-শিল্পীদের সভায় আসবে তা বলে দিলেন।

টেলিফোনের চারধারে তখন বেশ বড় সমাবেশ। পিকলুর ছোট্‌কা খিচুড়ির লোভে পৌঁছে গেছেন, সোনামার বড় ছেলে পানু আর ছোট ছেলে শানু, মেয়ে চুনমুন্‌, জ্যাঠামণির কবি ছেলে নীলাঞ্জন, চেনে বাঁধা একটি কুকুর, দূরে রান্নাঘরের চালে দুটি বেড়াল এবং অনেকগুলো কাক।

হৈচৈ, ছপ্‌ছপ্‌ জল, ঝিপ্‌ঝিপ্‌ বৃষ্টি, খিচুড়ির জিভে-জল-আসা

গন্ধের সঙ্গে পাঁপড় ভাজার গন্ধ মিশছে, এমন সময় ছপাছপ্ করে জল ভাঙতে ভাঙতে সজল ব্যানার্জি অর্থাৎ পিক্‌লুর লেখক ছোটপিসে আর তাঁর হাত ধরে একটি বারো-তেরো বছরের ছেলে—নিশ্চয়ই সেই দোয়েল অজিতেশ—বাইরের ঘরের সামনের ভেসে যাওয়া সিঁড়ি পেরিয়ে বাড়ি ঢুকলেন।

"বোসো দোয়েল। এই, তোরা আলাপ কর। ওকে শুক্‌নো জামাকাপড় দে, পিক্‌লু। তোর সোনামাকে বল্ ও খাবে। পানুর একটা প্যান্ট আর শার্ট দিতে বল্।" বলে ছোটপিসেমশাই চলে গেলেন ভিজে জামাটামা ছাড়তে।

পিক্‌লু এক দৌড়ে রান্নাঘর আর বারান্দার মাঝখানের সিঁড়িতে পায়ে জল কাটতে কাটতে চাপা গলায় বলল, "সোনামা, এসে গেছে, তোমার সেই দোয়েল পাখি, শিগ্‌গির শুক্‌নো জামাকাপড় দাও, পানুর সাইজ!"

ইতিমধ্যে বাইরের ঘরে বাড়ির সবাই এসে হাজির হয়েছে। চুনমুন্ ঢুকতে-ঢুকতে শুনল ছোটকা বলছেন, "সে যে যাই বলুক, তোমাদের মুজিবর রহমান পূর্ববাংলার নাম একেবারে গোটা 'বাংলাদেশ' করে খুব অন্যায় করেছেন। ফলে আমরা পশ্চিমবাংলার লোকরা হয়ে পড়েছি না ঘাটকা, না ঘরকা।"

দোয়েল বলল, "হইতে পারে। তবে কলকাতায় দেখি সকল লোকই ইংরাজিতে কথা কয়। এর নাম হাফ্-বাংলা হইলেও হইত।"

ছোটকার সঙ্গে সঙ্গে সবাই হেসে উঠল। মন্দ বলেনি। সজল বললেন, "সত্যিই তাই। আমরা ঘটিরা বাংলাভাষার মোটেই কদর করছি না। এখনই ভুগছি। পরে স্বহস্তে-খোঁড়া কবরে ঢুকতে হবে।"

সোনামা আধা-ভেজা কাপড়ে পুরো-ভেজা হাত দুটো মুছতে মুছতে বাইরের ঘরের দিকে আসছিলেন, হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। পশ্চিম দিকের পাঁচিলের ওধারে, পাশের বাড়ির পেয়ারাগাছের ওপর দুটো সত্যিকারের দোয়েলপাখি সুই-ই, সুই-ই করে ডাকতে ডাকতে ওঁদের দালানের কাছে এসে ছটফট করে ঘুরতে আর নাচতে আরম্ভ করতেই সোনামা, 'আয় তো পাখি' বলে যেই হাত বাড়িয়েছেন, অমনি তারা চ-র-র্-র্-র্ চ-র্-র্-র্ আওয়াজ করে রান্নাঘরের ওপরের কাঁটাতারের বেড়ার ওপর গিয়ে বসল। রসল মানে কেবলই উস্‌খুশস করে নেচেকুঁদে অস্থির হতে লাগল। পিক্‌লু হেসে বলল, "ঐ যে আওয়াজ করছে, ওটা ওরা বর্ষাকালে করে। কিন্তু পুরুষ দোয়েল এমন অপূর্ব গান গায়—সে গরমকালে। সে গান শুনলে তুমি মুগ্ধ হয়ে যাবে সোনামা। শ্যামাপাখির গান খুব ক্ল্যাসিকাল ধরনের, কিন্তু দোয়েল হল লোকসঙ্গীত, দারুণ গায়।"

সোনামা হেসে উঠে বললেন, "আচ্ছা আচ্ছা পক্ষীবিশারদমশাই! আমি তো কই শুনিনি কোনোদিন। ওরা তো মাঝে-মাঝেই আসে। দোয়েল, শালিক, বুলবুলি, ফিঙে, কোকিল —এমন কী মৌচুষিও দেখেছিলাম একবার, তেমন ক্ল্যাসিকাল গান তো শুনিনি।"

পিক্‌লু উত্তেজিত হয়ে উত্তর দিল, "কী করে শুনবে? লেকের কাছে থাকো বলে তবু এই পাখিরা পোকামাকড়ের খোঁজে আসে এসব বাগানে। পরে আর আসতেই পারবে না। কলকাতায় থাকা পাখিদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ছে, এক কাকদের ছাড়া। আমি এবার গরমে জ্যাঠামণির সঙ্গে সুন্দরবনে গেলাম না, সেখানেই তো সব শুনলাম, এখন আমি বার্ডওয়াচার। পক্ষীবিশারদও বলতে পারো।"

সোনামা হঠাৎ চমকে উঠে পাখি দুটোর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, "এই রে, আমার বাগানের প্রজাপতিদের পাতায়

ধাঁধা-মজা-হেঁয়ালির সমাধান

উত্তর ॥ (১) সেনশর্মা ইঞ্জিনিয়ার নয় (ক), ব্যারিস্টার নয় (গ)। তাহলে সে হয় অধ্যাপক, নয় ডাক্তার। অধ্যাপকের সঙ্গে বাকি তিনজনের মধ্যে দু'জনের সম্পর্ক ভাল (ঘ), সেনশর্মার সম্পর্ক দু'জনের সঙ্গে খারাপ (ক)। সুতরাং সেনশর্মা অধ্যাপক নয়, ডাক্তার।

ইঞ্জিনিয়ার দাসশর্মা নয়, সেনশর্মাও নয় (ক), দাশগুপ্ত নয়, কেননা, ডাক্তার বা সেনশর্মার সঙ্গে দাশগুপ্তের বন্ধুত্ব (খ), সুতরাং ইঞ্জিনিয়ারের পদবী সেনগুপ্ত।

দাসশর্মার সঙ্গে সেনশর্মার (ডাক্তার) সম্পর্ক ভাল নয় (ক), অথচ অধ্যাপক ডাক্তারের বন্ধু (ঘ), তাহলে অধ্যাপক দাসশর্মা নয়, দাশগুপ্ত। দাসশর্মা ব্যারিস্টার।

(২) কাকাতুয়াটা আসলে বধির। দোকানদার বলেছিল, যা শুনবে তাই বলবে। না শুনলে আর কী করে বলবে?

(৩)
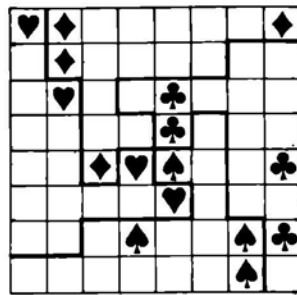
(৪) তথ্য বেশিই দেওয়া রয়েছে। উত্তরটা শুধু মিলিয়ে নাও— জ্যোতির্ময় সভাপতি। কল্যাণ সম্পাদক। প্রমিতা সহ-সভাপতি। সাহিত্য-সম্পাদক বন্দনা।

(৫) DENY

(৬)

(৭)
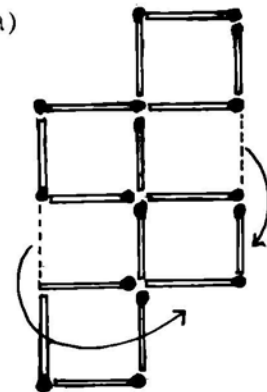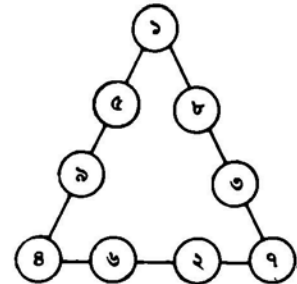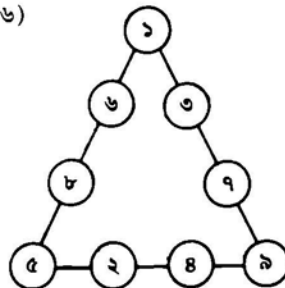
(৮) ক্ষুদ্রতর

আটকানো শুঁয়োগুলো খেয়ে ফেলবে না তো ? তাহলে তো আর প্রজাপতিই থাকবে না ।"

"না, না, অত নীচে নামবে না । বড় গাছের পোকা খাবে । ঐ ধেড়ে বেলগাছটা বা টগর গাছটায় যা পোকা জমে আছে···"

বাইরের ঘর থেকে হৈহৈ করে হাসির আওয়াজ শুনে ওঁরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন । সোনামা বললেন, "চল্ চল্ পিক্‌লু, এবার মানুষ দোয়েলটাকে দেখে আসি ।"

ঘরে ঢুকে সোনামা সোজাসুজি তাকিয়ে দেখলেন ওঁর স্বামীর হাঁটুতে মাথা ঠেকিয়ে মাটিতে বসে আছে একটি বালক । গায়ের রঙ গাঢ় শ্যামলা । সরু টানা চোখের ওপর ভারী লম্বা ভুরু । ঘন চুল ছোট করে ছাঁটা । ছিপছিপে শরীরটা, লম্বা লম্বা হাত-পা'গুলো নিশপিশ করছে । এক কথায়—অস্থিরতার প্রতিমূর্তি । চুন্‌মুন্ মুখটা তার মা'র কানের কাছে এনে গলা নামিয়ে বলল, "ভীষণ বাঙাল ! উচ্চারণ বোঝা যায় না ।"

আস্তে বললেও কথাটা দোয়েলের কানে গেছে বোঝা গেল । কবিতা বলার ঢঙে সে বলতে লাগল, "বাঙালটা পায়ের কাছে এসে বসতেই ঘটিগুলো একে একে উঠে গিয়ে লাইন করে ঘুরে দাঁড়াল—এক হাতে তাদের সাজি-মাটি অন্য হাতে কুলফি মালাই ।"

হাসিতে ঘর ফেটে পড়ল ।

সোনামা ছোট্‌কার দিকে তাকিয়ে ইশারা করে বললেন, "ছোড়দা, ইনিও কি কবি নাকি ?"

নীলাঞ্জন উৎসাহের সঙ্গে উত্তর দিল ছোটকা কিছু বলার আগেই, "হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয় কবি । রসজ্ঞান আছে যাই বলো ।"

"দ্যাখ্ পিক্‌লু, ওর সঙ্গে কিন্তু সত্যিকারের দোয়েলপাখির দারুণ আদল, না রে ?" সোনামার এ কথায় সবাই একসঙ্গে এবং একদৃষ্টে দোয়েলের দিকে চাইতেই সে ফিক্ করে হেসে বলল, "আর অজিতেশ —সে-ও কি আমার মতো ?"

নীলাঞ্জন হেসে উঠে জবাব দিল, "না, না, কোনো আদল নেই, বরং ভীষণ বিপরীত ।"

"যাকে বলে কনট্রাস্ট ম্যাচিং । নামটা বেড়ে বার করেছ । এ-নাম দিল কে তোমায় ? বাবা ?" ছোটকার প্রশ্নের উত্তরে দোয়েল একটু চুপ করে রইল, তারপর দুষ্টুমি-ভরা চোখে বলল, "না, আব্বাও নয়, আম্মাও নয়, লটারি করে বন্ধুরা মিলে রেখেছি । ওই নামই এখন চালু । দাদাকে দিয়ে এফিডেভিট করিয়ে নিয়েছি । ইস্কুলেও এই নাম ।" তারপর একটু ভেবে নিয়ে বলল, "কাল যাব অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে আলাপ করতে । শের আফগান সাহেবের সাথে···"

ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল । ছোট্‌কা গলাটা দু'বার পরিষ্কার করে নিয়ে শেষে বললেন, "অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মারা গেছেন । হার্ট ফেল করে ।"

"অসম্ভব ! মিথ্যা কথা ।"

"সত্যি !"

ঘরটা অস্বস্তিতে ভরে উঠতেই বোঝা গেল, বাইরে বৃষ্টি আরও হুড়হুড়িয়ে নামছে । জল হু হু করে বাড়ছে । সোনামা ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, রান্নাঘরের অবস্থা দেখতে । দোয়েলের মাথায় হাত রেখে সজল বললেন, "দুঃখু কোরো না । আরও অনেকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব । লেখক, সাহিত্যিক, কবি, অভিনেতা···"

"আমার অনেক চাই না । অজিতেশকে চাই ।"

তারপর···

তারপর অনেকক্ষণ ধরে ছোটকার সুরেলা গমগমে গলাকে অনুসরণ করে কোরাস গান হল । ভেজা-ভেজা বর্ষামাখানো রবীন্দ্রসঙ্গীত, বাঙাল-বাঙাল ভাটিয়ালি আর দু'চারখানা স্বদেশী-স্বদেশী নজরুলগীতি । চুন্‌মুনের চড়া গলা উঠছিল সকলের ওপর । পানু, পিক্‌লু, শানু আর নীলাঞ্জনের গলার সঙ্গে অদ্ভুত পূর্ববঙ্গীয় টানে সুর মেলাচ্ছিল দোয়েল । একেবারে মশ্‌গুল বর্ষা !

রান্নাঘর থেকে চিৎকার শোনা গেল সোনামার, "শিগ্‌গির এসো সব, আমার পায়ের পাতা ভিজে গেছে । এখুনি রান্নাঘর ভেসে যাবে ! উনুন ! উনুন ওঠাব কী করে ?"

দুড়দাড় করে সভা ভেঙে ভেতরের বারান্দায় এসে সবাই দেখে রান্নাঘরে কুলকুল করে জল ঢুকছে । বাগান, গলি সব থইথই করছে ময়লা জলে । এ-বাড়ির দুর্দান্ত বদরাগী কুকুরটা পর্যন্ত কেঁচো হয়ে শুয়ে আছে তক্তাপোশের নীচে । বেড়ালরা দূর থেকে মিয়াও-মিয়াও করে চেঁচাচ্ছে ।

এখন উপায় ? ছোট্‌কা মাথা চুলকে সজলের দিকে তাকাতে তিনি তাকালেন নীলাঞ্জনের দিকে । নীলাঞ্জন জলের দিকে তাকাল, কেননা, অন্য আর সবাই ছোট ছেলে, কেবল চুনমুনই একটু বড়, কিন্তু তবু নেহাতই কিশোরী । হঠাৎ দেখা গেল, দোয়েল তড়াক করে লাফিয়ে রান্নাঘরে নেমে, উনুনের আগুনের ওপর একখণ্ড টিন ফেলে, সাঁড়াশি বাগিয়ে বালতি-উনুনটা প্রচণ্ড এক ধরনের কায়দায় সকলকে তাক লাগিয়ে খাবার ঘরে পৌঁছে দিল । জল তখন বারান্দা ছুঁই-ছুঁই । ছোটকা হাঁ করে খানিকটা চেয়ে থেকে বলে উঠলেন, "তুমি যে কালে-কালে মহীরুহ হয়ে উঠবে হে দোয়েলপাখি ।"

সোনামা তো দারুণ খুশি । কী বলবেন ঠিক করতে না পেরে দোয়েলকে কাছে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "বাংলাদেশে কোথায় তোমার বাড়ি ?"

"কুষ্টিয়ায় ।"

"শুনছ ? ওর বাড়ি কুষ্টিয়ায় । তোমাদের আর ওর দেশ একই জায়গায় । আমার বাপের বাড়ি নদীয়ায় । ভালই হল, একই জেলার আমরা সবাই । নদীয়া ভেঙেই কুষ্টিয়া । আচ্ছা, তুমি এলে কী করে ? পাসপোর্ট বা পারমিট—"

"না না, ওসব কিছু নাই । খালি গায়ে তেল মেখে কাপড়ের পুঁটলিটা ছুঁড়ে দিলাম এপারে । তারপর দে ছুট । বর্ডার-পুলিশ ধরতে গেলে হাত পিছলে যায় তেলে, লোকে পালায় । এখন বেড়া হচ্ছে । সেও টপকাব । ইণ্ডিয়ায় এই প্রথম আসছি । কলকাতা দারুণ । রবীন্দ্রনাথ থাকতেন ।" এই পর্যন্ত বলেই সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গ তুলল, "আমি যদি দোয়েলপাখি তো আপনি নূরজাহান বেগম ; সম্রাটদের বেগমের মতো রান্না করেন, খিচুড়িতে লবণ দেন নাই ।" এক হাতে খিচুড়ি প্লেটে ঢালা ছিল, তা চাখতে-চাখতে ও আবার হাসল । কষা মাংস হয়েছিল । তাও খানিকটা চাখতে দিয়েছিলেন সোনামা । মুখে দিয়ে হাসি-মাখানো গলায় বলল, "ইন্দিরা গান্ধী রাঁধতে পারে না ।"

"সে কী ! আমার তো মাংস রাঁধায় নাম আছে রীতিমত । আজ এই জলে বোধহয়—"

"ঘটিরা সব-কিছুতে মিষ্টি দেয় । আমার আম্মা যা রাঁধে না···"

"তোমার আম্মার মতো পারি কখনও ? পূর্ববাংলার মুসলমান মেয়েদের রান্না শুনেছি অপূর্ব ।"

দোয়েল এবার একেবারেই অন্যমনস্ক হয়ে গেল । এটা-সেটা ঘাঁটাঘাঁটি করল, কিন্তু আর কথা বলল না । বোঝা গেল, মা'র প্রসঙ্গটা ওকে উতলা করেছে । সোনামা আড়চোখে দেখে নিলেন মুখখানা । কোথায় যেন দুঃখ জমে আছে ।

খাওয়া-দাওয়া হতে হতেই বৃষ্টিটা ধরে গেল । কিন্তু আকাশের মুখ এমনি টসটসে হয়ে রয়েছে যে, যে-কোনো মুহূর্তে সে ভ্যাঁ করে কেঁদে ভাসিয়ে দিতে পারে । ছোটকা অতিরিক্ত খেয়ে হাঁসফাঁস করতে করতে সোনামাকে বললেন, "দ্যাখ আলো, তোর আর চুনমুনের গোছানোর পাট শেষ হলেই ছেলেগুলোকে বাড়ির ভেতরে আটকে রাখবি । বাইরে ভীষণ বিপদ হাঁ করে আছে । টিভিতে বলেছে, আজ ৫ই জুন বান আসার দিন । সজল তো এর মধ্যেই

ঘুমিয়ে অজ্ঞান। নীলাঞ্জনও তো মুখে কাগজ চাপা দিয়েছে দেখছি। আমার আর চোখ খুলে রাখার উপায় নেই।" বলে ছোটকা দক্ষিণের ঘরে বড় তক্তাপোশটায় কুকুরটার গা ঘেঁষেই শুয়ে পড়লেন।

কাজ হয়ে গেল হাতে-হাতে। চুনমুন হঠাৎ তার মা'র দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলল, "ওদের কারুর গলার আওয়াজ পাচ্ছি না তো। অতগুলো ছেলে⋯" ও ঘরে গিয়ে দেখে ভোঁ ভাঁ। কেউ কোথাও নেই। সোনামার তো চোখ কপালে উঠল।

ততক্ষণে পিকলুর এবং দোয়েলের দু'ধরনের প্ররোচনায় পানু আর শানু চলে এসেছে বড় রাস্তায় পাতালরেলের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে। পিকলু আর শানুর উচ্চতা পাঁচ ফুটের বেশি না হওয়ায় কোথাও কোথাও ওদের বুকজল ঠেলতে হচ্ছে। পানু আর দোয়েল আরও ইঞ্চি-তিনেক করে বড় হওয়ায় ওরা আরও একটু কম কষ্টে এগোচ্ছে। হঠাৎ দোয়েল বলল, "দূর, আয়, জলের সঙ্গে লড়াই করে ছুটি।" পিকলু বিজ্ঞের মতো বাধা দিয়ে বলল, "চেষ্টাও করিস নে। একেবারে ড্রেনের গর্তে পড়বি, সোজা গঙ্গায় নিয়ে যাবে, সাবধান।" পানু ফোড়ন কাটল, "এমটিপির ময়াল সাপ তো সামনেই, গিলে খেলেই তো কম্ম সারা।"

কিন্তু দোয়েল কলকাতা চেনে না। সাঁতার কাটার ভঙ্গিতে জোরে এগিয়ে যেতে লাগল। হাত দুটো বাতাসে পাখির মতো নেড়ে নেড়ে। পিকলুদেরও মেজাজ গেল খুলে। কেননা, আবার আকাশ হাপুস নয়নে কাঁদতে শুরু করেছে। আর সেই জল কী ঝরঝরিয়ে গায়ে মাথায় পড়ছে। রাস্তার ধার ঘেঁষে কিছু লোকও চলেছে। দূরে গাড়িবারান্দার তলায় হাঁটুজলে দুজন পুলিশ বা পুলিশের মতো দেখতে কারা গল্পগুজব বা নিজেদের কপালের শ্রাদ্ধ করছে।

হঠাৎ শানু চিৎকার করে উঠল, "দাদা, আমায় টেনে নিচ্ছে! পিকলু, আমায় ধর! দোয়েলদা।" ব্যস্! এই পর্যন্ত আওয়াজ শুনে তাকাতে না তাকাতে শানু বেশ খানিকটা দূরে ভেসে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে ঝপাং! দোয়েল লম্বা ঝাঁপ দিয়ে শানুকে লক্ষ করে ডুব দিল। পিকলুরা দেখছে, জল নড়ে নড়ে এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু মানুষ নেই। ওদিকে শানুও গেল ডুবে।

মেট্রো রেলের গর্তের দিকে তাকিয়ে তখন বেশ কিছু লোক চেঁচাচ্ছে। জানলা থেকে, গাড়িবারান্দা থেকে, রাস্তা থেকে। কিন্তু কেউ কিছু করতে পারছে না। দুজন লোক ছুটে এসে পিকলু আর পানুকে ধরে রাখল, ওরাও যাতে না টানের দিকে চলে যায়। পুলিশ দুজন হায় হায় করতে লাগল। কিন্তু একই জায়গায় দাঁড়িয়ে।

জলের মধ্যে থেকে হঠাৎ একটা হাত বেরিয়ে এল—দূরে। তারপর দুটো মাথা। একটা হাতে একটা লোহার বিম ধরে অন্যহাতে শানুর চুলের মুঠি ধরে দোয়েল আস্তে-আস্তে উঠে এল লোহার কাঠামোর ওপর। শানুর অজ্ঞান দেহটাকে টেনে তুলে নিল জলের তোড়ের সীমানা ছাড়িয়ে।

চারদিক চেঁচামেচিতে ভরে উঠল। কাছেই থানা। গা বাঁচিয়ে পুলিশ-অফিসার এলেন। লোহার কাঠামোর ওপর দিয়ে রাস্তার ওপার থেকে এল রেসকিউ পার্টি। একটি অজ্ঞান এবং একটি আধা-অজ্ঞান কিশোরকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যেতে ওদের বিশেষ অসুবিধে হল না। কেবল নীচের দিকে তাকালেই হাত-পা হিম হয়ে যায়, এই যা।

অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম? কী সাহস তোমার!"

"দোয়েল!"

"দোয়েল কী?"

এত দুঃখেও দোয়েলের চোখে দুষ্টুমি খেলে গেল। বলল, "দোয়েল ব্যানার্জি।"

ততক্ষণে শানুর জ্ঞান হয়েছে। পিকলু আর পানু দুজনেই হাপুস নয়নে কাঁদছিল। ওদের সব একসঙ্গে জড়ো করে রেসকিউ পার্টি জল্পনা-কল্পনা করছে, দূরে দেখা গেল ছোটকাদের।

তারপর সে এক মহামারী ব্যাপার শুরু হল। বাড়িতে কান্নাকাটি, হাসি, বকাবকি মিলে সে এক নরক গুলজার কাণ্ড। পুলিশ-অফিসার যাবার সময় দোয়েলের মাথা থাবড়িয়ে দিয়ে বললেন, "আপনাদের এই ছেলেটির এক্সেলেন্ট কোয়ালিটি। এসব ব্যাপারে সাহসটাই আসল। ওকে আমি পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করব। নামটা মনে থাকবে। লিখে রেখেছি—দোয়েল ব্যানার্জি।"

কেউ কিছু বলল না। দোয়েলই হেসে উঠল অফিসারটি চলে যেতে। "দোয়েল অজিতেশ বললেই তো ওপার করে দিত!"

সোনামা যে দোয়েলকে কী দেবেন, কী খাওয়াবেন ঠিক করতে পারেন না। ওর জন্যে শানুকে ফিরে পেয়েছেন। সকলেরই ওকে ভালবাসতে ইচ্ছে হচ্ছে।

সেদিন রাত্তিরটাও যেন হুম্ হুম্ করে ভয় দেখাতে লাগল কলকাতাকে। সারাদিনের ক্লান্তি নেমে এসেছে ছেলেদের চোখে। পিকলু আর ছোট্কা আর বাড়ি ফিরলেন না। ওরা সব মাটিতে বড় করে বিছানা করে শুয়ে পড়ল। দোয়েল কেবল বাইরের ঘরে সজলের কাছে শুল। আসলে সজলই তো তার এ-বাড়িতে আসার আকর্ষণ। তাই তাঁর কাছে থাকা আর কী।

ভোর হতেই কী এক অস্বস্তিতে সোনামা'র ঘুম ভেঙে গেল। উঠে এলেন বাইরের ঘরে। বৃষ্টি থেমেছে। কিন্তু জল যেন অথৈ। সজল ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু দোয়েল নেই। বালিশের ওপর একটুকরো কাগজ উপুড় করা রয়েছে। উল্টিয়ে পড়লেন—

"আলো ব্যানার্জি/আমি যাচ্ছি/আবার দেখা হবে! দোয়েল অজিতেশ ব্যানার্জি (?)"

৬-৬-৮৪

সেদিন কারুর আর মেজাজ ঠিক হল না। সকলেরই যেন বই পড়ায় মন। হঠাৎ শানু হরলিকস খেতে-খেতে কেঁদে ফেলল, "দোয়েলদা চলে যাবে কেন?"

কে উত্তর দেবে। পিকলু আর ছোট্কা বাড়ি যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছেন।

"সোনামা!" পিক্‌লু ডাকল।

সোনামা ওদের পেছনের ছোট্ট বাগানে পায়ের পাতা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাকালেন।

পিকলু গা ঘেঁষে দাঁড়াল। "ঐ যে পশ্চিম আকাশ দেখছ, ওই দিক থেকে দোয়েলপাখিরা আসে। আসলে কিন্তু পুব-বাংলা থেকে উড়ে আসে। মনে হয় যেন পশ্চিম থেকে আসছে। গ্রীষ্মকালে আসবে, দেখো। তখন তো গান গাইতেই হবে কিনা।"

সোনামা পিকলুর হাতটি ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। কী গাঢ় টসটসে মেঘ কালো হয়ে ঘনিয়ে উঠেছে পশ্চিম-আকাশে।

তাহলে গ্রীষ্মকালের জন্যে অপেক্ষা করা যাক।

ছবি প্রণবেশ মাইতি

ছবি : শেখর রায়

সম্পূর্ণ উপন্যাস

কালা জুজু

শৈলেন ঘোষ

লোকটার নাম তাসানু। আর তার ছেলের নাম কুহা। পৃথিবীসুদ্ধ মানুষ তাসানুর নাম জানবে, এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু ওই যে শহরটা, ওই যে পাহাড়ের পায়ে-পায়ে যে-শহরটা গড়ে উঠেছে, সেখানকার সব মানুষই চেনে তাসানুকে। চোখে না-দেখলেও অন্তত নামটা কারো অজানা নয়। অথচ অঢেল পয়সার মালিকও নয় তাসানু, অথবা দু-চারটে বাড়ির মালিকানাও নেই তার। তবুও তাসানুকে লোকে চেনে। চেনে, একজন জবরদস্ত লড়াকু মানুষ বলে। হ্যাঁ, তাসানু লড়াই করে। তবে সে-লড়াই বন্দুক-হাতে যুদ্ধ নয়। সে লড়াই করে পাঁচিল-ঘেরা রিঙের মধ্যে মত্ত বলদের সঙ্গে। হ্যাঁ, তাসানু একজন বুল-ফাইটার। টগবগে, তাজা ভয়ঙ্কর হিংস্র বলদের সঙ্গে লড়াই করে সে, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। এ যেন প্রাণ নিয়ে এক মারাত্মক খেলা। এ-খেলায় আজ পর্যন্ত হার স্বীকার করেনি তাসানু। দুরন্ত দানবের মতো ওই জন্তুটা যেন তাসানুর কাছে নেহাতই একটা তুচ্ছ প্রাণী। জন্তুটা যখন তার খাঁচার ঘর থেকে ছাড়া পেয়ে তাসানুর দিকে খাড়া দুটো শিং উঁচিয়ে ধেয়ে আসে, তখন তাসানু অন্য মানুষ। তখন তাসানুর হাতে কোনো অস্ত্র নেই। শুধু একটা লাল-কাপড়ের টুকরো। নিমেষে নিজেকে সামলে নিয়ে, ওই লাল-কাপড়ের উড়ন্ত হাওয়ায়, তাকে করে তোলে আরও ভয়াবহ। জন্তুটার নিশ্বাসের শব্দে বুক কেঁপে ওঠে ওই রিঙের চারপাশে জমায়েত মানুষগুলোর। কিন্তু ভয় নেই তাসানুর। দেখলে মনে হবে, মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে দুর্দান্ত সাহসী এক মানুষ, দুর্ধর্ষ এক বোকা-শত্রুর সঙ্গে লড়াই-লড়াই খেলা করছে। তারপর সেই শত্রুর শিঙ দুটো

আঁকড়ে ধরে তার ঘাড়টা মটকে দেয় সজোরে। শত্রুর বিরাট দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পড়ে-পড়ে হাঁসফাঁস করতে থাকে। আর তখন হাজার-হাজার দর্শক চিৎকার করে ওঠে আনন্দে। সেই দর্শকের দল পাগলের মতো হাত-পা ছুঁড়ে রিঙ ডিঙিয়ে ছুটে যেতে চায় তাসানুর কাছে। ইচ্ছে করে তাকে মাথায় নিয়ে নাচে। তখন রিঙের চারপাশে শুধু তাদের একটি আদরের নাম আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তোলে, "তাসানু, তাসানু।" আর তাসানু তখন বুক ফুলিয়ে, হাত নেড়ে তাদের উল্লাসের সাড়া দিতে-দিতে রিঙ পেরিয়ে চোখের আড়ালে হারিয়ে যায়। কিন্তু তাসানুর নামটা হারায় না। সে-নাম ছড়িয়ে যায় ঘরে-ঘরে, সকলের মুখে-মুখে।

এমনি করে লড়াই করতে-করতে মানুষটাকে যেন রক্তের নেশা পেয়ে বসে। এখন সে জানে শুধু খুন করতে। তার চেয়ে যে শক্তিশালী, তাকে হত্যা না-করতে পারলে তার সুখ নেই। তার সবল আর পাথরের মতো শক্ত দেহটা দেখে ভয় পাবে না কোন মানুষ! কারণ সে-দেহে দয়া নেই, মায়া নেই, নেই একটুখানি স্নেহ। ছিল না কোনোদিনই। তাসানু যেন এক ভয়ঙ্কর জন্তুর চেয়েও নৃশংস একটা হাত-পা-ওলা জীব। সে যখন তার মা-বাবার কাছে থাকতে থাকতে বড় হয়েছে, তখন থেকেই তার হাত-দুটো আঁকপাঁক করত কিম্বা চোখ দুটো হিংসায় ঝলসে উঠে যেন বলতে চাইত, "এসো, আমি তোমার ঘাড়টা মটকে দিই।"

তাসানুর এখন আর কেউ নেই। আছে শুধু ওই ছেলেটি, কুহা। বউটারও মরে যাবার কথা নয়। মরে যাবার মতো তার বয়েসও হয়নি। কিন্তু অকালে চলে গেল। সে তো তাসানুরই জন্যে। একদিন তাসানু বউকে নিয়ে গেছল তার লড়াইয়ের খেলা দেখাতে। সেদিন ছিল খুব বড় খেলা। খুব ধুমধাম। অনেক উপহার। তার বউ যেতে চায়নি এ-খেলা দেখতে। কিন্তু তাকে যেতে হয়েছিল তাসানুরই চাপে। কিন্তু লড়াইয়ের সেই ভয়াবহ দৃশ্য সহ্য করতে পারেনি তার বউ। তাসানু যখন একটা মারমুখী বলদের ঘাড় ধরার জন্যে এগিয়ে গেছল, তখনই সেই ক্ষিপ্ত জন্তুটা তার শিঙ দুটো উঁচিয়ে তেড়ে গেছে তাসানুর দিকে। আর তখনই মূর্ছা গেছল তার বউ। আর জ্ঞান ফেরেনি।

মায়ের জন্যে ছেলেটা কেঁদেছিল অনেক। দুঃখ পেয়েছিল বটে তাসানুও। কিন্তু সে-দুঃখ তার কোনোদিনই বুকে চেপে বসতে পারেনি। সে শুধু ভাবত, যেদিন তার ক্ষমতা কমবে, সেদিন ছেলেকে সে দিয়ে যাবে তার সেই ক্ষমতা। সেদিন তারই মতো ছেলে কুহার নামও ছড়িয়ে পড়বে সবার মুখে-মুখে। বাপের মতো ছেলেও হবে এক সাহসী লড়াকু।

হ্যাঁ, সত্যিই যত দিন যায় ছেলেটার বুকখানাও যেন ততই চওড়া হয়ে ওঠে। তেমনি শক্ত-সমর্থ। তাসানু ছেলের মুখের দিকে তাকায় আর মনে-মনে ভাবে, তার সময় এগিয়ে আসছে। তার শক্তি যেন লুকিয়ে লুকিয়ে ছেলের বুকেই উঁকি মারছে। ছেলের ওই পাট্টাই চেহারাটা দেখে আনন্দে শিউরে ওঠে তাসানু। কখনও বা ছেলের হাতটা নিজের হাতের মুঠি দিয়ে জাপটে ধরে জিজ্ঞেস করে, "পারবি না, আমার মতো লড়াই করতে?"

উত্তর দেয় না কুহা। শুধু তার বাবার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। আর নয়তো বাবার হাতে ফুলে-ওঠা ওই লোহার মতো শক্ত মাংসপেশীর দিকে চমকে-চমকে দেখে। ওই হাতের দুরন্ত আঘাতে কতই-না বলদের ঘাড় মটকে দিয়েছে তার বাবা। মনে-মনে ভাবে, এই নিষ্ঠুর খেলাটা যদি মানুষের মগজে বাসা না-বাঁধত, তাহলে নিশ্চয়ই পৃথিবী রসাতলে যেত না। মানুষের মগজটা যেন অন্যায় আর অপকর্মের আখড়া!

খুব যখন ছোট ছিল কুহা, তখন সে একেবারে কাছে-কাছে থাকত তার মায়ের। হয়তো-বা মা-ই তাকে কাছে-কাছে লুকিয়ে রাখত। হয়তো মা ভয় পেত কুহার বাবাকে। ভয় পেত, যদি তার বুক থেকে ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় তার বাবা! না, ছেলে তার বাপের মতো হোক, কুহার মা তা কোনোদিনই চাইত না। চাইত না, ছেলে হোক অমন নৃশংস কিম্বা অমন ঘাতক। তাই কুহার বাবা ছিল তার কাছে একটা আতঙ্ক!

কিন্তু ভয় পেত না কুহা তার বাবাকে। সে তার বাবার মুখের দিকে যখনই তাকাত, দেখত, বাবার মুখের চোয়াল দুটো যেন হিংসায় ছটফট করছে। যখন চোখের দিকে তাকাত, দেখত বাবার লাল-টকটকে চোখ দুটো যেন এক্ষুনি ঠিকরে বেরিয়ে এসে কাউকে ভস্ম করে দেবে! ঠোঁটে হাসি নেই, কিংবা বুকে আদর। বাবাকে দেখতে-দেখতে যখনই সে মায়ের কাছে ছুটে যেত, মনে হত, একমুঠো জ্যোৎস্নার আলোয় যেন ডুব দিয়ে একঝাঁক ফুলের বুকে এসে সে লুটোপুটি খাচ্ছে!

হ্যাঁ, ফুলই ভালবাসত কুহা। কিংবা ভাল লাগত দুই-পাহাড়ের মাঝখানে ওই যে কাচের মতো নিথর জলের হ্রদ, ওখানে ছুটে যেতে। ওই জলের ছায়ায় কত গাছের ছবি। সেই ছবির ফাঁকে-ফাঁকে কুহার মুখের ছায়াটাও ভেসে ওঠে। ঠিক সেই মুহূর্তে সেই জলের দোলনায় সে-ও যেন ছবির মতো দোল খায়। সেই হ্রদের ধারে-ধারে যত পাথরের টুকরো, কিংবা যত গাছ, সবার সঙ্গে জানা-চেনা কুহার। যখনই কুহা সেখানে যায়, যখনই পাহাড়ের গায়ে-গায়ে বাতাসের দোলা এসে গাছের গায়ে ছড়িয়ে পড়ে, তখনই যেন কুহার মনে হয়, সেই বাতাস হু-হু করে বইতে-বইতে তার নাম ধরে ডাকছে, "কুহা-হা, কুহা-হা।" কুহা হা-হা করে হেসে ওঠে, আর নয়তো লাফিয়ে-লাফিয়ে, পাথরে পা ফেলে এ-পাহাড় থেকে ও-পাহাড়ে ছুটে যায়। এ ছিল কুহার খেলা। কুহা তখন জানতেও পারত না, তার বাবাও খেলা করছে। তার বাবাও এইমাত্র আর একটা বলদের দুটো শিঙ জড়িয়ে ধরে মাটির ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছে। আর হাজার-হাজার মানুষ সেই দৃশ্য দেখতে-দেখতে চিৎকার করে উল্লাস করছে।

এমনি করে দিন যায়। বড় হয়ে ওঠে কুহা।

এমনি করে দিন যায়। বয়স বাড়ে তাসানুর। কিন্তু না, তাসানু বয়স মানে না। সে তার দেহের মাংসপেশীগুলোকে নিজে-নিজেই দেখে আর খুশিতে ডগমগ করে। আর মনে-মনে ভাবে, বয়সকে থোড়াই কেয়ার! তার শক্তির সে কী দেমাক!

কিন্তু একদিন তার এই দেমাক লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। একদিন হঠাৎ তার মাথায় উঁকি দিল একটি পাকাচুল। তার ছেলে হেসে গড়িয়ে গেল তাই দেখে। তাসানু বুঝতে পারে না কেন ছেলে হাসে! ছেলের মুখের দিকে তাকায় তাসানু। তবু ছেলের হাসি থামে না। রেগে যায় তাসানু। ছেলে তবু থামে না। অবাক হয় তাসানু। যে-ছেলে তার মুখের দিকে চেয়ে কোনোদিন কথা বলতে সাহস করে না, সেই ছেলে হাসে! মেজাজ তার বিগড়ে যায়। থাকতে পারে না। ধমক মারে ছেলেকে, "আমি তোর বাপ, আমার সামনে হাসিস তুই!"

কুহা বলে, "এতদিন হাসি পায়নি, আজ পাচ্ছে।"

আরও জ্বলে ওঠে তাসানু, "আমি তোর ঠাট্টার পাত্তর! দুনিয়াসুদ্ধ লোক আমায় ভয় পায়; আর তুই হাসিস!"

"আর ভয় পাবে না কেউ।" ভারী হালকা-স্বরে উত্তর দেয় কুহা।

ছেলের মুখে এইকথা শুনে উন্মাদের মতো শক্ত তার বাহুদুটো উঁচিয়ে ধরে তাসানু! বলে, "দেখছিস!"

কুহা বাবার বাহু দুটোর ওপর হাত বুলিয়ে বলে, "এমন শক্ত আর কদিন থাকবে?"

তাসানু চিৎকার করে ওঠে। বলে, "চিরদিন।"

"কিন্তু তোমার দিন তো ফুরিয়ে আসছে বাবা। তোমার চুলে পাক ধরেছে।"

লাফিয়ে ওঠে যেন তাসানু। একটা ক্ষিপ্ত বাঘের মতো কুহার মাথার ঝুঁটিটা খামচে ধরে বলে, "আর একবার বল্।"

কুহা ভয় পায় না। বাবার মুখের সামনে বুকখানা উঁচিয়ে বলে, "আমি তোমার লড়াইয়ের বলদ নই। আমি তোমার ছেলে। মনে কোরো না, আমার শক্তি কারো চেয়ে কম! আমি মনে করি, আমার গায়ে হাত তোলার আগে, আমার বয়সটা তোমার ভেবে দেখা উচিত ছিল। মনে কোরো না, আমি দুর্বল। মনে কোরো না, আমি আমার মায়ের চেয়ে নরম। তোমার নির্দয় বাহাদুরি দেখানোর জন্যে, আমার মাকে মরতে হয়েছে। এ-কথা তুমি ভুলে থাকতে পারো, কিন্তু আমি ভুলিনি। ভুলব না কোনো দিনও। সুতরাং আশা করব, তুমি এখনই আমার মাথা থেকে তোমার হাত সরিয়ে নেবে।"

ছেলের কথা শুনে তাসানুর দেমাক এতটুকু কমে না। সে আরও উত্তেজিত হয়ে বলে, "আমাকে ভয় দেখাস তুই!"

কুহা তেমনি ঠাণ্ডা-মেজাজে বলে, "তোমার এই দেমাক ভিতুর আস্ফালন। তোমার এ-আস্ফালন শেষ হতে আর দেরি নেই।"

কুহার মাথার চুল থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিয়ে, রাগে কাঁপতে-কাঁপতে তাসানু ছেলেকে দু'হাত দিয়ে প্রচণ্ড শক্তিকে জাপটে ধরল। তারপর চিৎকার করে বলে উঠল, "আমি শুধু বলদই মারতে পারি না, আমি মানুষেরও টুঁটি ছিড়ে ফেলতে পারি।"

কুহা নিজেকে আর সামলে রাখতে পারল না। বাবার দুই বাহুর প্রচণ্ড চাপে তার দম আটকে আসছে। মুহূর্তে তার মনে হল, এই নির্দয় মানুষটার হাতে দুর্বলের মতো মরলে সেটা হবে কাপুরুষের মরণ। সুতরাং প্রচণ্ড জোরে একটা ঝটকা মারল কুহা তার বাবার বুকে। তাসানু তার তাজা ছেলেটার আচমকা আঘাতে আর্তনাদ করে দু'হাত দূরে ছিটকে পড়ল। পড়ে হাঁফাতে লাগল। হাঁফাতে-হাঁফাতে ছেলের মুখের দিকে আহত বাঘের মতো জুলজুল করে তাকিয়ে থাকে তাসানু। বুকের ভেতরটা চমকে ওঠে কুহার! ছিঃ! ছিঃ! এ কী করল সে! সে কি সত্যি-সত্যি তার বাবাকে আঘাত করল। চোখের পলকে কুহা বাবার কাছে ছুটে যায়। দু'-হাত দিয়ে বাবার শরীরটা জড়িয়ে ধরে মাটি থেকে তুলে নেয়। তারপর কাঁপা-কাঁপা স্বরে বলে, "আমি অন্যায় করে ফেলেছি বাবা, আমায় তুমি ক্ষমা করো।"

আজই প্রথম, এবং বোধহয় কুহার জ্ঞানে প্রথম, সে বাবার ঠোঁটে হাসি দেখল। অবাক হয়ে যায় কুহা বাবাকে হাসতে দেখে! তাসানু দাঁড়িয়ে উঠে আনন্দে উদ্বেল হয়ে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে ওঠে, "শাবাশ!"

বাবার বুকের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে কুহা আরও অবাক হয়ে যায়! ভয়ে-ভয়েই জিজ্ঞেস করে, "তুমি কিছু মনে করোনি তো বাবা?"

তাসানু বলে, "মনে করব কী রে! আজ আমার সবচেয়ে আনন্দের দিন। আজ পর্যন্ত আমি কারও কাছে হারিনি। আজ পর্যন্ত কারও সাহস হয়নি আমার গা স্পর্শ করে। কিন্তু আজ আমি আমার ছেলের কাছে হেরে গেছি। এ আমার কম আনন্দ? আমি বুঝেছি, এবার আমার শক্তি আমার ছেলেকে দিয়ে যাবার সময় হয়েছে। এবার সত্যিই আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার ছুটির সময় এগিয়ে আসছে।"

বাবার বুকের মধ্যে থরথর করে কাঁপতে লাগল কুহা। কান্নাটাকে শত চেষ্টা করেও লুকোতে পারল না। তাসানু ছেলের মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে বলল, "দূর বোকা, কাঁদছিস কেন? আমার দিন শেষ হলে তোকেই তো করতে হবে আমার মুখ উজ্জ্বল। তুই পারবি না?"

"কী?"

"আমার মুখ উজ্জ্বল করতে?"

"পারব।"

"শাবাশ।" বলে আনন্দে চিৎকার করে ছেলেকে তাসানু জড়িয়ে ধরল। তারপর আবার বলল, "আমি দেখতে চাই, আমার চেয়েও বড় হয়েছিস তুই। আমার চেয়ে আরও শক্তিশালী বলদের সঙ্গে লড়াই করে চমক লাগিয়ে দিচ্ছিস সকলকে।"

চুপ করে রইল কুহা। বাবা জিজ্ঞেস করল, "কী রে, কিছু বলছিস না যে!"

হঠাৎই যেন বলে ফেলে কুহা, "এ-লড়াই আমার ভাল লাগে না বাবা!"

তাসানুর হাসিমুখখানা কুহার উত্তর শুনে ফ্যাকাসে হয়ে যায়। আবার জিজ্ঞেস করে, "কেন?"

"কষ্ট হয়।"

তাসানু চেঁচিয়ে ওঠে, "ছিঃ! ছিঃ! তুই না জোয়ান ছেলে! কষ্টের কথা মুখে আনতে তোর আটকাল না! আমি যে কতদিন সেই স্বপ্ন দেখেছি কুহা! দেখেছি, তুই-ও আমার মতো লড়াইয়ের [illegible] একটা ভীষণ-মূর্তি বলদের সঙ্গে লড়াই করছিস। সবাই তোর লড়াই দেখে, আমার মতো তোরও নাম ধরে উল্লাস করছে। আমার মতো তোরও নাম ঘরে-ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে। ছেলের গর্বে আমার বুকখানা ফুলে উঠছে। সে কী আনন্দ আমার।"

কুহা আদর করে বাবাকে। তারপর নরম গলায় বলে, "একটা নিরীহ জীবকে হত্যা করতে আমার ভাল লাগে না বাবা।"

তাসানু চুপসে যায়। গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করে, "তবে কি আমি মনে করব, আমার ছেলে একটা নির্জীব হাড়গোড়-ভাঙা মাংসের ডেলা!"

"বাবা, আমিও কি তবে মনে করব, আমার বাবা দয়াহীন, মায়াহীন একটা হিংস্র দানব!"

থতমত খেয়ে যায় তাসানু ছেলের কথা শুনে। এই একটু আগে যে-লোকটার মুখখানা হাসিতে ঝকঝক করছিল, সেই মুখ এখন রাগের আগুনে ঝলসে উঠছে। ছেলের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে তাসানু গর্জে উঠল, "আমার ছেলে তুই। আমার জন্যে এই পৃথিবীতে তুই বেঁচে আছিস। আমার জন্যে ওই চোখ দুটো তোর আলো দেখছে। আমারই জন্যে তোর মুখে কথা ফুটেছে। আমি যা হুকুম করব, তোকে তা-ই করতে হবে। আমার হুকুম, আমারই মতো তোকে বলদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। তোকে আমার সঙ্গে যেতে হবে কাল। আমার নিজের হাতে তোকে আমি খেলা শেখাব। আর যদি আমায় অবজ্ঞা করিস, তবে আমারই হাতে মরতে হবে তোকে!"

বাবার এ-কথা শুনে কুহা যেন আতঙ্কে থমকে যায়। মুখে তার কথা আসে না। কী-ইবা বলবে সে! কাকেই বা বলবে। যে-মানুষটা বলতে পারে নিজের হাতে ছেলেকে মারবে, সে কি আর মানুষ আছে! শিউরে ওঠে কুহা! বুঝি-বা সত্যি সে বোবা হয়ে গেল। কেননা, সারাদিনে একটি কথাও তার মুখ দিয়ে বেরোয়নি। কেমন যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে তার মনের ভেতরটা। এখন কুহা বুঝতে পেরেছে, এই মানুষটার হাত থেকে সে কিছুতেই নিস্তার পাবে না। বাঁচতে হলে হয় তাকে লড়াই করতে হয়, আর তা না হলে তার বাবার হাতে তার নিশ্চিত মরণ।

সারাদিন ধরে কুহা যে কী ভাবল, কেউ জানে না। সারাদিন ধরে সে বাবার চোখের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখল। তারপর রাত নিঃঝুম গড়িয়ে এলে নিজের ঘরে শুয়ে পড়ল। ঘুমোল না কুহা। নিস্তব্ধ রাতে সে নিশ্চুপ হয়ে কিসের জন্যে যেন অপেক্ষা করতে লাগল। গভীররাতের কালো ওড়নাটা যখন এই শহরের মুখখানা একেবারে ঢেকে ফেলল, তখন কুহা চুপিচুপি নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সতর্কপায়ে এগিয়ে গেল বাবার ঘরের দিকে। উঁকি
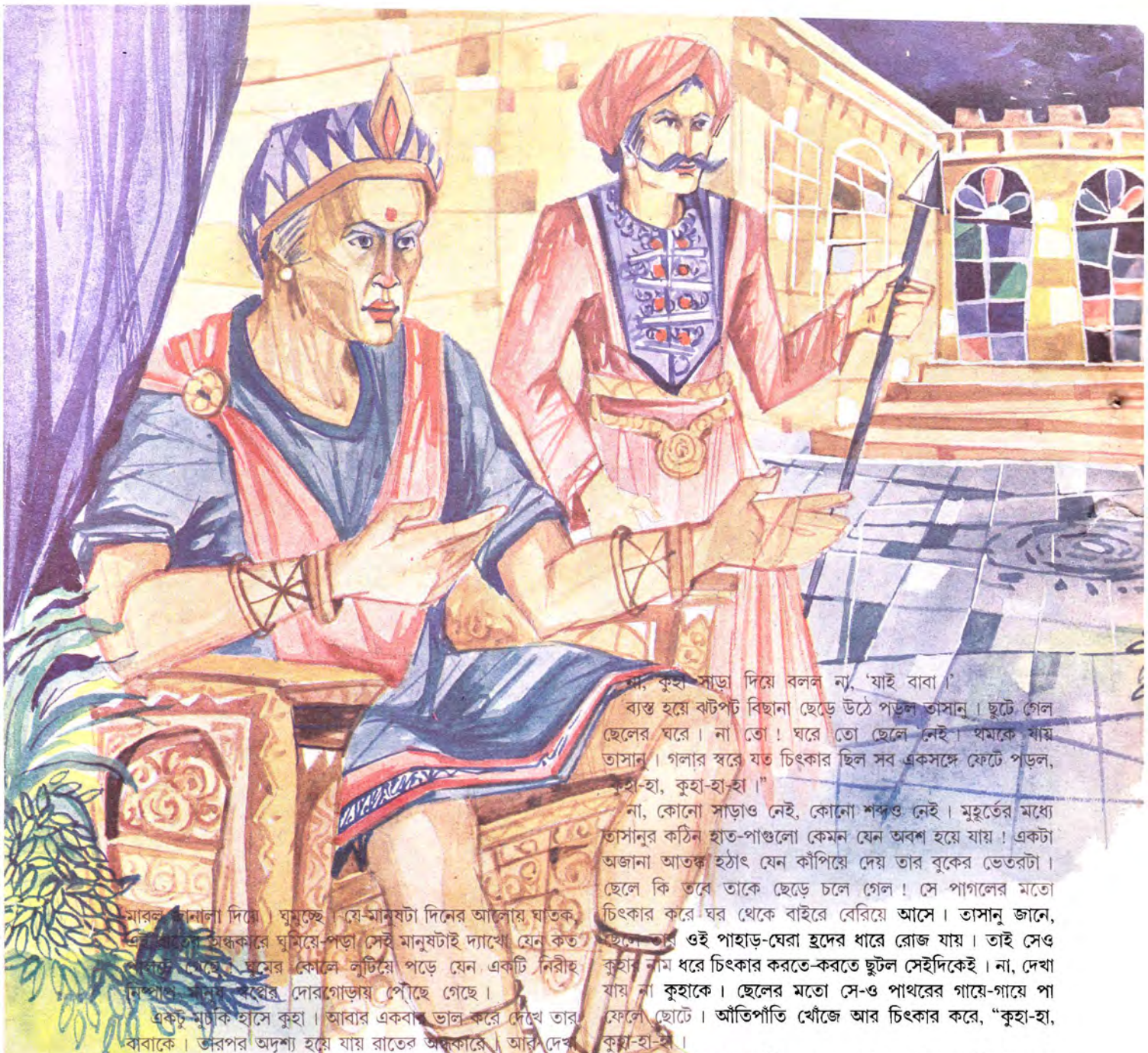
মারল জানালা দিয়ে। ঘুমুচ্ছে। যে-মানুষটা দিনের আলোয় ঘাতক, এই রাতের অন্ধকারে ঘুমিয়ে-পড়া সেই মানুষটাই দ্যাখো যেন কত পালটে গেছে। ঘুমের কোলে লুটিয়ে পড়ে যেন একটি নিরীহ নিষ্পাপ মানুষ স্বপ্নের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে।

একটু মুচকি হাসে কুহা। আবার একবার ভাল করে দেখে তার বাবাকে। তারপর অদৃশ্য হয়ে যায় রাতের অন্ধকারে। আর দেখা গেল না।

॥ ২ ॥

যেমন রোজ খুব সকালে সে ঘুম থেকে ওঠে, সেদিনও তাসানু তেমনি সকালেই জেগে উঠেছিল। কিন্তু যেমন রোজ সকালে কুহা তার বাবার সামনে এসে দাঁড়ায়, আজ তেমন করে এসে দাঁড়াল না কুহা।

যেমন সে রোজ সকালে বাবার সামনে দাঁড়িয়ে বলে, 'তোমার আজকের দিন সুখের হোক,' আজ তেমনি করে বলতে এল না কুহা।

অবাক হল তাসানু। ভাবল, তবে কি কুহার ঘুম ভাঙেনি ডাকল সে ছেলের নাম ধরে, "কুহা

কোনো সাড়া পেল না।

আবার ডাকল, "কুহা-হা!"

এবারও কোনো সাড়া মিলল না।

কেমন যেন চমকে উঠল তাসানু। এবার বেশ চিৎকার করেই ডাক দিল, "কুহা-হা-হা।"

না, কুহা সাড়া দিয়ে বলল না, 'যাই বাবা।'

ব্যস্ত হয়ে ঝটপট বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল তাসানু। ছুটে গেল ছেলের ঘরে। না তো! ঘরে তো ছেলে নেই। থমকে যায় তাসানু। গলার স্বরে যত চিৎকার ছিল সব একসঙ্গে ফেটে পড়ল, "কুহা-হা, কুহা-হা-হা।"

না, কোনো সাড়াও নেই, কোনো শব্দও নেই। মুহূর্তের মধ্যে তাসানুর কঠিন হাত-পাগুলো কেমন যেন অবশ হয়ে যায়! একটা অজানা আতঙ্ক হঠাৎ যেন কাঁপিয়ে দেয় তার বুকের ভেতরটা। ছেলে কি তবে তাকে ছেড়ে চলে গেল! সে পাগলের মতো চিৎকার করে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। তাসানু জানে, ছেলে তার ওই পাহাড়-ঘেরা হ্রদের ধারে রোজ যায়। তাই সেও কুহার নাম ধরে চিৎকার করতে-করতে ছুটল সেইদিকেই। না, দেখা যায় না কুহাকে। ছেলের মতো সে-ও পাথরের গায়ে-গায়ে পা ফেলে ছোটে। আঁতিপাঁতি খোঁজে আর চিৎকার করে, "কুহা-হা, কুহা-হা-হা।

নির্জন সেই হ্রদের তীরে, সবুজ সেই গাছে-গাছে, বিরাট সেই পাহাড়ের গায়ে-গায়ে প্রতিধ্বনিই শুধু শুনতে পায় তাসানু। কিন্তু ছেলের সাড়া সে শুনতে পায় না। পাগলের মতো ছোটাছুটি শুরু করে দেয় তাসানু। ছুটতে-ছুটতে পাথরের গায়ে হোঁচট খায়। কখনও পড়ে যায়। ওঠে আবার চিৎকার করে। যেন জেরবার হয়ে যায় তাসানু নামে দুর্ধর্ষ মানুষটা। দেখলে মনে হবে, যেন ঝড়-ঝঞ্ঝায় ধ্বস্ত একটুকরো শুকনো-গাছের ডাল ভেঙে-মচকে ছটফট করছে!

আর বেশিক্ষণ পারল না তাসানু। পারল না ছুটতে, চেঁচাতে। ভীষণ তেষ্টায় সে ক্লান্ত। লুটিয়ে পড়ল পাথরের ওপর। পড়ে-পড়ে হাঁফাতে লাগল।

অনেকক্ষণ পরে, অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়াতে পারল তাসানু। টলতে-টলতে সে নেমে গেল হ্রদের তীরে। কাচের মতো স্বচ্ছ সেই জল নিজের চোখে-মুখে ছিটিয়ে নিয়ে চুমুক দিল। আঃ যেন বাঁচে তাসানু। আর-একবার চারিদিকটা সে ভাল করে দেখল। কিন্তু হায় সে কাউকে দেখতে পেলে না। কোনো সাড়াও পেলে না।

শুধু নির্জন সেই হ্রদের তীরে বাতাসের ঝুমঝুমি ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। ভারী শান্ত চারিপাশ।

এখন কী করা উচিত, ভেবে পায় না তাসানু। ছেলে তাকে ছেড়ে চলে যাবে এ-কথা যেন সে বিশ্বাসই করতে পারে না। মনে-মনে ছেলের ওপর কখনও ভীষণ রাগে, আবার কখনও ভাবনায় থমকায়।

এমনই সময় হঠাৎ তাসানুর মনে হল, ছেলেটা এখানে না-এসে অন্য কোথাও তো যেতে পারে! কে জানে, সেখান থেকে এতক্ষণে হয়তো ঘরে ফিরে এসেছে! যেমনি এ-কথা মনে হল, সঙ্গে সঙ্গে সে ঘরের দিকে ছুটল। পারে না ছুটতে। ক্লান্ত পা-দুটো তার টলে টলে হোঁচট খায়। অনেক কষ্টে ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায় সে। ঘরের ভেতর চোখ ফিরিয়ে সে চমকে যায়। এ কী! রাজপ্রাসাদের দূত কেন অপেক্ষা করছে তার জন্যে ঘরের ভেতর! নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করে তাসানু। কোনো কথা না-বলে অবাক হয়ে তাকায় তার দিকে। দূত হাসে। তবু কিছু জিজ্ঞেস করে না তাসানু। বোবামূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তার সামনে। দূত জিজ্ঞেস করে, "কী হয়েছে তাসানু? দেখে মনে হচ্ছে, তুমি খুবই ক্লান্ত।"

তাসানু তবুও নিশ্চুপ।

দূত আবার বলে, "তোমার জন্যে একটি সুসংবাদ এনেছি।"

তাসানু শুধু চেয়েই থাকে।

দূত থামল না। বলল, "তুমি নাকি আজ মস্ত লড়াইয়ের খেলায় নামছ? সম্রাট এ-খবর শুনে অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। তিনি আজ নিজেই তোমার লড়াই দেখার জন্যে উপস্থিত থাকবেন। রাজপ্রাসাদ থেকে এ-সংবাদ তোমায় পৌঁছে দেবার জন্যে আমায় পাঠানো হয়েছে তোমার কাছে। সম্রাটের সামনে তুমি খেলা দেখাবে, কী ভাগ্যবান তুমি। তোমাকে আমার অভিনন্দন।"

এবার তাসানুর মুখে কথা ফোটে। সে শান্তস্বরে বলে, "আজ আমায় রেহাই দাও।"

"মানে!" প্রথমে চমকে যায়, তারপর হেসে ওঠে দূত। বলে, "তাসানুর মুখে এ কী কথা!"

তাসানু বলে, "হ্যাঁ, আজ আমার ছুটি চাই।"

"তুমি লড়াই করবে না?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে দূত।

"না।" দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দেয় তাসানু।

"তাসানু, এ-সুযোগ বারবার আসে না। সম্রাটের সামনে খেলা দেখাবে, এ তোমার কত বড় ভাগ্য! এ-সৌভাগ্য ক-জনের কপালে জোটে। তিনি খুশি হলে তোমার জয়জয়কার! চাই কী, তোমার কোনো অভাবই থাকবে না।"

"থামো!" দূতের কথা শেষ হবার আগেই আচমকা ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল তাসানু।" আমি আজ লড়াই করতে পারব না। আমার এ-সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিতে পারো সম্রাটকে।"

দূত আর কোনো কথা বলতে সাহস করল না। সে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল তাসানু। ঘরের মধ্যে এখন সে একা। কিছু ভাবতে পারে না। কেমন যেন সব তার এলোমেলো হয়ে গেছে! কী সে করবে এখন? এখন সে ছেলের খোঁজে পথে বেরুবে, না, সম্রাটের আদেশমতো লড়াইয়ের রিঙে যাবে! একটা মত্ত বলদের সঙ্গে লড়াই করে সম্রাটকে খুশি করা এখন তার কাছে বড়, না, ছেলেকে খুঁজে বার করা! ভাবতে-ভাবতে এই কঠিন মানুষটা কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়ে। কখনও সে বিছানায় মুখ গুঁজে হাঁফায়। নয়তো জানালায় মুখ বাড়ায়। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সামনের পথের দিকে। ওই পথে যদি তার ছেলে আসে! সে যদি দেখতে পায়! তাসানু নামে ভয়ঙ্কর এই মানুষটা এখন নিজেই নিজের সঙ্গে লড়াই করছে। যে-মানুষটা হারেনি কোনোদিন কারো কাছে, সেই মানুষই আজ আধমরা মানুষের মতো ধুঁকতে ধুঁকতে এই ঘরটার চারপাশে আকুল হয়ে কাকে যেন খুঁজে বেড়ায়! কিন্তু এ-ঘরে কেউ নেই। শূন্য। তাসানুর বুকের ভেতরটা হু-হু করে জ্বলে যায়। এইখানেই একদিন সে তার বউকে নিয়ে ঘর বেঁধেছিল। এই ঘরেই তার ছেলেটা প্রথম হামাগুড়ি দিতে শিখেছিল। এই ঘরেই সে তাসানুকে প্রথম 'বাবা' বলে ডেকেছে। মায়ের কোলে লুকোচুরি খেলেছে। কী সুখের সংসার ছিল তাদের। কী সুন্দর ছিল সেই মানুষটি, যে তাকে মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে এনে এই ঘরে আশ্রয় দিয়েছিল। সেই মানুষটিও ছেড়ে চলে গেছে এই পৃথিবী তার বউয়ের মতো। আর আজ তার ছেলেটাও তাকে ফেলে চলে গেল! পারল না তাসানু আর চুপ করে থাকতে। শূন্য ঘরের ভেতর উন্মাদের মতো আচমকা চেঁচিয়ে উঠল,

"কুহা, কুহা-হা।" দুমদাম করে ঘরের দরজাটা খুলে ফেলল। ছুটে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। তারপর ওই শক্তিমান মানুষটা ছুটতে-ছুটতে চেঁচাতে লাগল, "কুহা, কুহা-হা।"

সে এখন জানে না, ছুটতে-ছুটতে কোথায় যাবে। এখন সে শুধু জানে, এই শহরটা ফেলে পালাতে হবে তাকে। এ-শহর শহর নয়! এ যেন এক কসাইখানা। নিরীহ প্রাণীকে হত্যা করতে না দেখলে, এ-শহরের মানুষের চোখে ঘুম আসে না। এ-শহরের মানুষ রক্ত দেখলে উল্লাস করে। আজ সে বুঝতে পেরেছে, এ অন্যায়, এ মিথ্যা। সে বুঝতে পেরেছে আজ, এ-পৃথিবীটা শুধু মানুষের একার নয়। মানুষের মতো আর যে প্রাণীগুলো এই পৃথিবীর বাতাসে নিশ্বাস নেয়, এ-পৃথিবী তাদেরও। এখানে কি মানুষ আর-সকলকে মেরে একাই বেঁচে থাকতে চায়। এত স্বার্থপর।

কিন্তু এ-শহর ছেড়ে পালাতে পারল না তাসানু। কেননা, সম্রাটের শান্ত্রির দল তাকে ধরার জন্যে ধাওয়া করল। তাসানু তাদের চোখকে ফাঁকি দিতে পারল না। সে ধরা পড়ে গেল। তাকে বন্দী করা হল। হাজির করা হল সম্রাটের সামনে।

এ তো নতুন কথা নয়, সম্রাটকে অগ্রাহ্য করে যে-মানুষ পালাবার চেষ্টা করে, তার জন্যে কেউ ফুলের শয্যা সাজিয়ে রাখে না। সুতরাং সম্রাট ক্ষিপ্ত হলেন ভয়ঙ্কর রকম। তাসানুকে দেখে গর্জন করে উঠলেন, "এই লোকটাই তাসানু? এঁঃ? এই লোকটাই ভয়ে কুকুরের মতো লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছিল?"

সম্রাটের পার্শ্বচররা বলে উঠলেন, "হ্যাঁ সম্রাট, এই সেই লোক।"

সম্রাট এবার রুক্ষস্বরে ধমকে উঠলেন, "তবে যে আমায় বলা হয়েছিল, লোকটা সাহসী!"

একজন পার্শ্বচর সম্রাটের এ-প্রশ্নে আমতা-আমতা করে ঘাড় চুলকিয়ে বললেন, "আজ্ঞে, লোকটা আগে সাহসী ছিল। এখন একটু ইয়ে—"

তার কথা শেষ হবার আগেই সম্রাট কড়কে উঠলেন, "মূর্খ।" তারপর তাসানুর মুখের ওপর সম্রাট কঠোর দৃষ্টি হেনে বললেন, "তোমার নাকি এমন স্পর্ধা, আমার দূতকে তুমি অপমান করেছ? বলেছ, আমাকে তুমি খেলা দেখাতে পারবে না? জানো, আমি এ-দেশের সম্রাট!"

তাসানু এতটুকু ভয় না-পেয়ে উত্তর দিল, "সম্রাটের সামনে সেই কথা বলতে আমি এখনও ভয় পাই না।"

তাসানুর মুখে এমন দুঃসাহসিক উত্তর শোনার জন্যে সম্রাট আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি হতচকিত। অপমানে তাঁর চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল। যে-সম্রাটের সামনে কোনো মানুষের টুঁ শব্দ করার সাহস নেই, সেই সম্রাটের মুখের ওপর কথা বলে কে, না সামান্য বলদের সঙ্গে লড়াই করে এমন একটা লোক! সম্রাট ক্ষিপ্ত হয়ে গর্জে উঠলেন, "জানো, আমি এখনই তোমাকে হত্যা করতে পারি!"

তাসানু বলল, "হ্যাঁ, এ কথা আমার জানা আছে। আমি এও জানি, হত্যা শুধু আপনি একা করতে পারেন না, এ-শহরের সবাই হত্যা করতে পারে। এ-শহর একটা কসাইখানা।"

"কী!" ভীষণ চিৎকার করে উঠলেন সম্রাট। তিনি যেন সিংহাসনে বসতে পারছেন না! ভয়ঙ্কর রকম বিচলিত তিনি! সাংঘাতিক অপমানবোধ করলেন সম্রাট। আর কিছু ভেবে না-পেয়ে বলে উঠলেন, "আমি তোমাকে নরখাদক বাঘের মুখে ফেলে দেব। তোমাকে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খাবে, আমি দেখব।"

তাসানু তেমনি ধীরভাবে বলল, "এ তো যথার্থ কসাইখানার সম্রাটেরই মতো কথা।"

সম্রাট সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি উত্তেজিত। তিনি কাঁপছেন। কাঁপতে-কাঁপতে নিজের হাত তাসানুর দিকে ছুঁড়ে বললেন, "আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। আমি জানতে চাই, তুমি লড়াই করবে কিনা!"

"আজ্ঞে না।"

তাসানুর এই উদ্ধত উত্তর শুনে সম্রাট উত্তেজনায় দ্বিগুণ জোরে কাঁপতে-কাঁপতে বললেন, "নির্বোধ, আমায় অগ্রাহ্য করো তুমি! শেষবারের মতো ভেবে দ্যাখো। হয় আমায় খেলা দেখাও, নয় বাঘের মুখে জীবন দাও।"

তাসানু এতটুকু বিচলিত না-হয়ে আগের মতোই শান্তস্বরে বলল, "আমি আগেও বলেছি, আবার বলছি, লড়াই আমি করব না।"

সম্রাট এবার হাতের মুঠি পাকিয়ে বললেন, "আমিও তোমায় ছেড়ে দেব না।" তারপর নিমেষে কী ভাবলেন যেন সম্রাট। ভেবেই বললেন, "তুমি আবার ভেবে দ্যাখো! সময় চাও, তোমাকে একদিন সময়ও দিলুম। একদিন তুমি আমার কারাগারে বন্দী থাকবে। একদিন ওই নির্জন কারাগারে তুমি ভাবতে পারবে, কোন্‌টা তুমি চাও, লড়াই, না, মৃত্যু।"এই বলে তিনি সিংহাসন ছেড়ে চলে গেলেন।

শান্ত্রিরা তাসানুকে বন্দী করে রাখল কারাগারে।

অন্ধকার সেই কারাগারে বন্দী মানুষটা এখন বুঝতে পারল, এ-শহরের সেইসব মানুষ, যারা একদিন তাসানুকে মাথায় করে নেচেছে, তার জয়গান করেছে, এখন তারা কেউ তার পাশে নেই। তা যদি থাকত, তবে সম্রাটের আদেশ শুনে কেউ না কেউ তাকে বাঁচাতে আসত। কিন্তু কেউই তো এল না। কেউ তো বলল না, 'সম্রাট, এই সাহসী মানুষটি সারাজীবন আমাদের মতো লক্ষ-লক্ষ মানুষকে আনন্দ দিয়েছে। আজ মানুষটা যখন ছুটি চাইছে, তখন তাকে ছুটি না-দিয়ে, কারাগারে বন্দী করাটা সম্রাটের সঠিক বিচার নয়।' কে বলবে এমন কথা? এমন কথা যে বলতে পারে, তার বুকের পাটা থাকা চাই! সে-মানুষ কোথায় এখানে?

কিন্তু তাসানুও কি বোকার মতো মৃত্যুকে মেনে নেবে! না মেনে উপায়? তার তো কিছু করার নেই আর! এই কারারক্ষীদের সজাগ দৃষ্টি এড়িয়ে সে তো আর ফটক ভেঙে পালাতে পারবে না। কিন্তু তবুও কি তার ভাবা উচিত নয়? অপমরণে মরাটা কি সত্যিই বোকামি নয়? কার ওপরে অভিমান করে মরতে চায় সে? ছেলের ওপর? ছেলে যদি ভুলই করে ফেলে, তবে বাবাই তো তাকে ভালবেসে তার ভুল ভেঙে দেবে! কিংবা যদি কোনো দুঃখ থাকে তার, মন থেকে মুছিয়ে দেবে!

এমনই সময় সে যেন আলো দেখতে পেল। হঠাৎ যেন তার মনে হল মরা তার হবে না। সে লড়াই-ই করবে। লড়াই করলে সে মুক্তি পাবে। আর এখন সেই মুক্তিই সে চায়। কেননা, মুক্তির পর সে ছেলেকে খুঁজে বার করবে। যেমন করেই হোক, ছেলেকে তার বার করা চাই। যতক্ষণ না ছেলের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে সে বলতে পারছে, কোনো জীবনকে সে আর হত্যা করবে না কোনোদিন, ততক্ষণ যেন শান্তি নেই তার। সুতরাং সে কারাগারের লৌহকপাট দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, "ওহে কারারক্ষী, সম্রাটকে খবর দাও, আমি মরতে চাই না। আমি একটি নিরীহ প্রাণীকে হত্যা করার কৌশল দেখিয়ে সম্রাটকে খুশিই করতে চাই। সুতরাং আমায় যেন এখনই মুক্তি দেওয়া হয়।"

খুশি হয়েই সম্রাট তাসানুকে মুক্তি দিলেন।

॥ ৩ ॥

আজ বুঝি তাসানুর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলা। সম্রাটের নিজের ইচ্ছায় আজকের এ-খেলার আয়োজন। সুতরাং এ যেন একটা রাজকীয় উৎসব। সারা শহর জুড়ে সেই উৎসবের সাজ-সাজ রব। সমস্ত মানুষের মুখে-মুখে তাসানুর কথা। তাসানুর গায়ে আজ নতুন পোশাক। এ-পোশাককে ওরা বলে আলোর পোশাক।

এ-পোশাকের থরে-থরে সোনা আর চাঁদি ঝলমল করছে। যে-জ্যাকেটটা তাসানু গায়ে দিয়েছে, সেটি সম্রাটের নিজের হাতের উপহার। সুতরাং সেই জ্যাকেটটির যে কত দাম, তার হিসেব কে করবে!

তাসানু ঠিকই করেছিল, আজ রিঙের মধ্যে সে থাকবে একা। আর কেউ না। হাজার-হাজার দর্শকের মাঝখানে সম্রাটও উপস্থিত। ব্যাণ্ড বেজে উঠল। তাসানু বীরের মতো ছুটে ঢুকে পড়ল লড়াইয়ের রিঙের মধ্যে। সম্রাটকে সে অভিবাদন করল। সম্রাট খুশিতে হাত তুলে সে-অভিবাদন গ্রহণ করলেন। অভিবাদন করল সে দর্শকদের। উত্তেজিত দর্শকরা আনন্দে উথলে চিৎকার করে উঠল। ঠিক সেই মুহূর্তে ক্ষিপ্ত বলদ তার বন্দী-ঘর থেকে ছাড়া পেল। সঙ্গে-সঙ্গে সেই বলদ তীক্ষ্ণ শিঙ দুটো উঁচিয়ে, ঝড়ের বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাসানুর ওপর। তড়িৎগতিতে তাসানু নিজেকে একটু সরিয়ে নিয়ে, তার হাতের সেই লাল-কাপড়টা উড়িয়ে দিল তার মুখের সামনে। মাথায় এমন এক ঝাঁকুনি দিল বলদটা, না-পিছিয়ে রক্ষে নেই তাসানুর। পিছিয়ে যেতেই বলদটা নিজের ভার নিজেই সামলাতে পারে না যেন। টাল-মাটাল করতে-করতে আবার ঘুরে দাঁড়ায়। আবার তেড়ে যায় তাসানুকে। এখন সে চিনে ফেলেছে তাসানুকে। চিনে ফেলেছে, এই লোকটাই তার শত্রু। এই শত্রু শুধু একদল নিষ্ঠুর মানুষকে আনন্দ দেওয়ার জন্য এইমাত্র তার পিঠের ওই কুঁজটার ওপর বর্শার ফলক ছুড়ে গেঁথে দিল। আর-একটা ছুঁড়ল। ছুঁড়ল একটা, দুটো, তিনটে। গড়িয়ে পড়ছে তার গা দিয়ে টাটকা, ঘন রক্ত। অসহ্য যন্ত্রণা। সে-যন্ত্রণা মানার এখন সময় নেই। এখন তাকে বাঁচার জন্যে লড়াই করতে হবে। সে আক্রমণ করে ওই মানুষটাকে, যে-মানুষটা অকারণেই তাকে কুঁদে-কুঁদে মারছে হাতে অস্ত্র নিয়ে। ঠিক বটে, বলদের হাতে কোনো অস্ত্র নেই। কিন্তু সে দুর্বলের মতো মরতে জানে না। সে-ও তার শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই করে মরতে-মরতে বলে যাবে, ওই মানুষের মতো সে-ও এই পৃথিবীতে বাঁচতে এসেছিল।

সত্যিই সে লড়াই করতে-করতেই মরল। এখন লড়াইয়ের শেষধাপে যখন পৌঁছে গেল তাসানু, তখন তার হাতে তরোয়াল। মানুষের নিষ্ঠুর কৌশলের কাছে হেরে গিয়ে যখন বেদম হয়ে পড়ছিল সেই বলদ, তার নিশ্বাসটা যখন ধীরে ধীরে তার বুকের মধ্যে আটকে আসছিল, তখনই তাসানুর হাতের সেই তরোয়াল খুন করল সেই বলদকে।

কী চিৎকার! কী উল্লাস! সে কী আনন্দ!

অবাককথা, সেই চিৎকার শুনে কিন্তু তাসানু আজ নিজে এতটুকু আনন্দ প্রকাশ করল না। সেই ওই মৃত-বলদটার সামনে বোবার মতো দাঁড়িয়ে পড়ে। দ্যাখে! তার চোখের কোণে ক'ফোঁটা অশ্রু যেন উছলে ওঠে। সে যেন শুনতে পায় দু-দিন আগে তার ছেলে যা বলে গেছে, 'আমি কি তবে মনে করব, আমার বাবা দয়াহীন, মায়াহীন একটা হিংস্র দানব!' হঠাৎ সেই রিঙের মধ্যে, বলদটার সামনে দাঁড়িয়ে সে চিৎকার করে ওঠে, "না।" তারপর সে ছুঁড়ে ফেলে দেয় তার হাতের তরোয়াল। ছুঁড়ে ফেলে, আকাশের দিকে তাকিয়ে, কঠিনস্বরে বলে ওঠে, "বিশ্বাস কর কুহা, এ-লড়াই আমার শেষ লড়াই। এ-লড়াই আমি করেছি কদিনবেঁচে থাকব বলে। বেঁচে থেকে তোকে শেষ দেখা দেখে যাব কুহা। আমি যে তোর বাবা!"

রিঙের চারপাশের সেই আনন্দমত্ত মানুষের দল ধেয়ে আসে তাসানুর দিকে। তারা যেন তাসানুকে মাথায় নিয়ে নাচতে চায়। তাসানু আর দাঁড়াল না সেখানে এক মুহূর্তও। ছুটে আসা ওই মানুষগুলোর হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্যে সে-ও ছুটল। ছুট দিল রিঙের বাইরে। তার সেই বন্ধ ঘরে। তারপর সেখানেই সে লুকিয়ে বসে রইল।

অনেকক্ষণ পর, যখন সব মানুষের কণ্ঠস্বর নিশ্চুপ হয়ে গেছল, যখন একটি মানুষও আর তাসানুর নাম ধরে চিৎকার করেনি, তখন তাসানু ফিরে গেছল তার ঘরে। একা, নিঃসঙ্গ!

সারারাত ঘুমোতে পারেনি তাসানু। ক্লান্ত-মানুষটার যদি-বা কখনও চোখের পাতায় ঘুম ছুঁই-ছুঁই করে, অমনি তখনই সেই হাজার-হাজার মানুষের পিশাচের মতো চিৎকারধ্বনি তার বুকে কাঁপন জাগায়। শিউরে উঠে, কখনও সে বিছানায় বসে পড়ে। কখনও সে দু'হাত দিয়ে নিজের কানদুটো চেপে ধরে। সে পারে না, কিছুতেই পারে না সেই চিৎকার সহ্য করতে। বুঝি বা তাসানু পাগল হয়ে যায়। তবে কি সে এখান থেকে ছুটে পালালে বাঁচবে! ছুটে পালালে বুঝি এ-শব্দ তার কানে আর কোনোদিন ভেসে আসবে না! হয়তো এই কথাটাই সত্যি মনে হল তাসানুর। তাই সে এই অন্ধকার রাতে ঘুমের বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ছুট দিল আচম্বিতে। ঘর ছেড়ে বাইরে সে বেরিয়ে এল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওই চিৎকারও যেন তাকে পিছু তাড়া করেছে। দিগ্বিদিক ভুলে গিয়ে যেদিকে পারল সেইদিকেই পালায় সে। তবু তার নিস্তার নেই। যেন এ-চিৎকার সেইদিকেই ছোটে। অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে যায় তাসানু। ছুটতে-ছুটতে এই সাহসী বলবান মানুষটা পৃথিবীর এই অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

॥ ৪ ॥

কত যে দিন কেটে গেল তাসানুর ছেলেকে খুঁজতে-খুঁজতে, কত বছর, তার হিসাব করতে পারে না। হয়তো অনেক বছর। কেননা, মানুষটাকে এখন আর চেনবার যো নেই। কী চেহারা হয়েছে! অমন দশাসই শরীরটা ভেঙে মুচকে গেছে। চোখদুটো কোটরে ঢুকেছে। চৌকো চোয়ালদুটো মুখের দুপাশে যেন দুটো ঢিপি। সেই চওড়া বুকখানা চুপসে একেবারে হাড়-জিরজির করছে। মাথার যত চুলে পাক ধরেছে, তারও বেশি চুল পড়ে গেছে। অমন ঝলমলে তাজা মানুষটা এই ক'বছরে এমন বুড়িয়ে গেছে, না-দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না। যেন ধুঁকছে। এতদিন ধরে সে কুহাকে তন্ন-তন্ন করে খুঁজেছে। কিন্তু হায় রে! ছেলের খোঁজ সে এখনও পেল না। এমনিই হয়। তাসানু নামে এই মানুষটাও তো একদিন বাপ-মা'র মনে কষ্ট দিয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছে, আর ফেরেনি।

হ্যাঁ, পালিয়ে এসেছে তাসানু। আজ তার সেই পুরনোদিনের সব কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায় তাসানুর বুড়ো মা-বাবার মুখদুটি। তার বাবা পেটের অন্ন জোটাতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কী পরিশ্রমটাই না করেছে। আর তাসানু, ছি ছি, কী কষ্টই না দিয়েছে তাদের। ছোটবেলায় সে ছিল যেন একটা দজ্জাল খুদে ডাকাত। মা-বাবার কথা শোনা তো দূরের কথা, সারাদিন মারামারি, নয়তো গুণ্ডাবাজি! স্কুলে পাঠাল বাবা, সেখানে পড়ার নামে অষ্টরম্ভা। বছর-বছর সেখান থেকে গোল্লা নিয়ে বাড়ি ফেরে তাসানু।

ছেলে যে তার মুখ্যু হয়েই থাকবে, এ-কথাটা তাসানুর বাবার বুঝতে বেশি দেরি হয়নি। কী করলে যে ছেলেটা মানুষ হবে, এই ভাবনায় লোকটার চোখে ঘুম আসে না। নিজে সারাদিন পাহাড়ের মাথায় পাথর ভেঙে ঝুড়ি বোঝাই করে। এ-কাজে ক'টা পয়সাই বা পায় সে। নিজে আধপেটা খেয়ে থাকা যায়! কিন্তু ছেলেটা যেন কষ্ট না পায়। কোন্ বাপ-মা আর চায়, ছেলে তার দুঃখ-কষ্টে থাকে! সে-কথা আর বোঝে কে!

তার কষ্ট ঘোচাতে বাবা যে কত কষ্ট করছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাতে তাসানুর বয়েই গেছে। সকাল-সন্ধে দুটো জুটলেই হল। আর না জুটলে, সে কী হম্বিতম্বি! যেন এখুনি পেলেই হাতে মাথা কাটে! মানুষেরও তো সহ্যের একটা সীমা আছে। এক-একদিন তাসানুর বাবা যখন আর ছেলের বেয়াদপি সহ্য করতে পারে না,
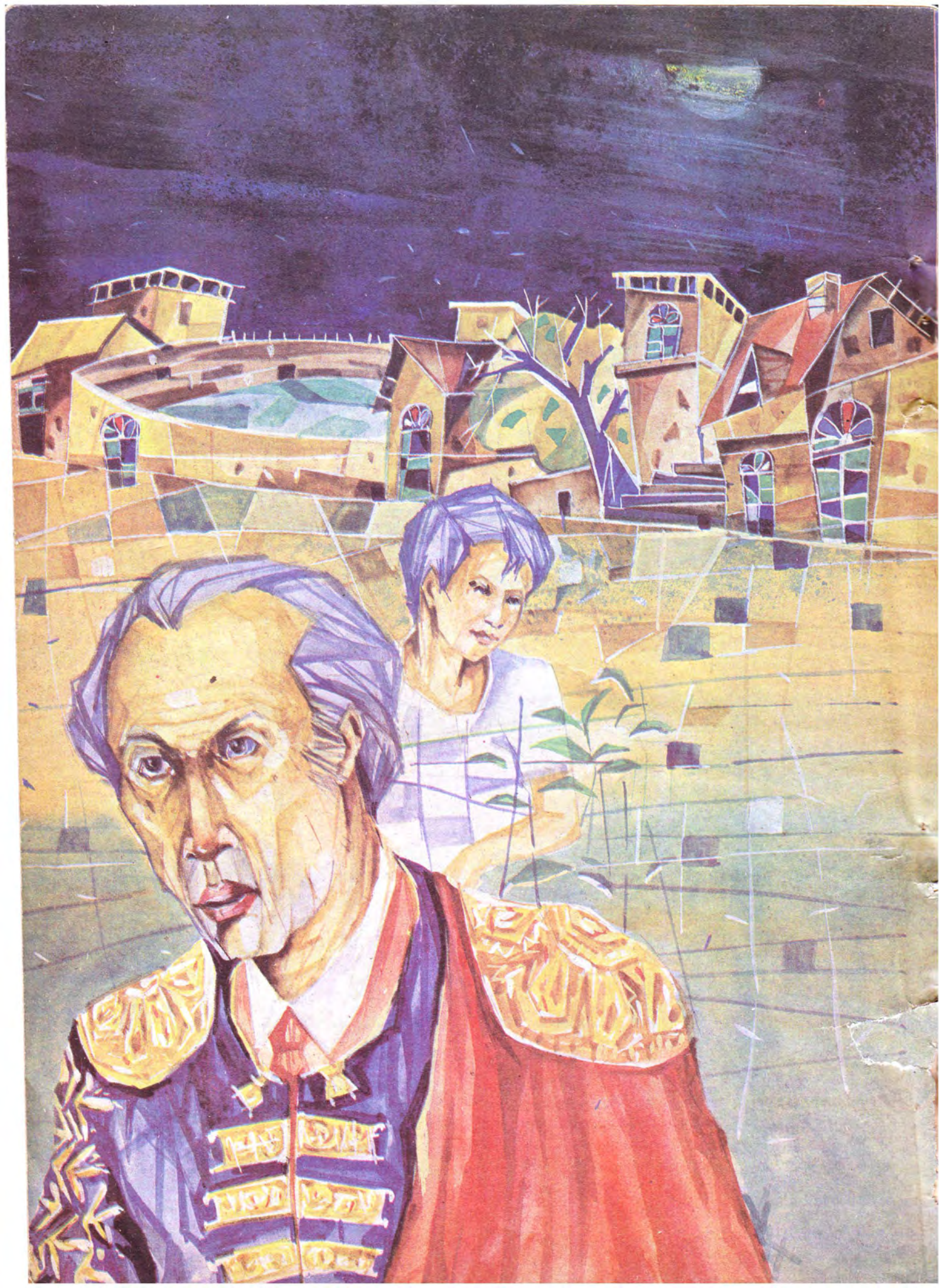
তখন তার মনে হয় দু-চার ঘা দেয় বসিয়ে ! কিন্তু না, ছেলে বড় হয়েছে ! গায়ে হাত তোলাটা উচিত না।

কিন্তু একদিন পারল না তাসানুর বাবা। ছেলে এমন চোটপাট শুরু করে দিলে যে, ভীষণ রেগে তার ঘাড়টা খামচে ধরলে তাসানুর বাবা। রাগে ঠকঠক করে কাঁপতে-কাঁপতে বললে, "লজ্জা করে না? তোর মতো একটা জুয়ান ছেলে বসে-বসে বাপ-মার অন্ন ধ্বংসাচ্ছিস, আবার লম্বা-চওড়া কথাও বলছিস ! আর যদি বেশি কথা বলিস, এই ঘাড়টা ভেঙে জঞ্জালে ফেলে দিয়ে আসব।"

তাসানু ঝটকা মেরে বাবার হাতটা নিজের ঘাড় থেকে সরিয়ে নিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, "আমার গায়ে তুমি হাত তোলো ! তুমি কি ভুলে গেছ, আমি জোয়ান? আমার গায়ের জোরটা তোমার চেয়ে নিশ্চয়ই কম নয়।"

তাসানু আরও যেন কী বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই বাবা চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কেন, মারবি আমায় ? অতই যদি তোর টনটনে জ্ঞান, মনে ভেবে থাকিস জোয়ান হয়েছিস, তবে বাপের ঘাড়ে বসে আছিস কেন ? যা না, নিজের ধান্দা নিজে করে নিগে যা না।"

তাসানু তেমনি গোঁয়ারের মতো চিল্লিয়ে উঠল, "হ্যাঁ, তা-ই যাব।"

কিন্তু সে তো তাসানুর মুখের কথা। যাবে কোথায় ? কে তাকে বসিয়ে-বসিয়ে খাওয়াবে ? মুরোদ যে কত, সে আর জানতে বাকি নেই। পেটে টুঁ মারলে তো ক অক্ষর বেরোবে না ! তার আবার টেণ্ডাই-মেণ্ডাই দ্যাখো ! আশ্চর্য !

কিন্তু বাপ-মাকে কষ্ট দিয়ে কি আর মানুষ পার পায় ! পেলেও, কদিন ? একদিন-না-একদিন ঠিক ধরা পড়বে ! আর হলও তাই ! এমন বিপদে পড়ল না তাসানু ! অবিশ্যি তার আগে বেচারা বুড়োবাপটাকে একটা পা খেসারত দিতে হল ! হয়েছে কী, সেদিনও পাথর ভাঙতে পাহাড়ে উঠেছিল তার বাবা। পা ফসকাল। খাদে পড়ল। পা ভাঙল। রক্ষে, এমন কিছু গভীর ছিল না খাদটা। মানুষটা বেঁচে গেল। কিন্তু একে কি বাঁচা বলে ! এখন সে খোঁড়া, অকেজো। এ-বাঁচা তো না-বাঁচারই সমান। ঘরে পড়ে-পড়ে এখন পেটের খিদে মেটানোর জন্যে সে ছেলের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। তাসানুও এতদিনে বুঝতে পারে খিদের কী জ্বালা ! না-খেতে পেয়ে এখন তার চোটপাট মায়ের ওপর। কিন্তু মা-ই বা কী করবে ? ছেলের যদি এখনও আক্কেল না হয়, ছেলে যদি এখনও চেষ্টা-চরিত্তির করে দু-চারটে পয়সা রোজগার করে না-আনতে পারে, তবে তাসানুর বুড়ি-মা কি এর ঘর, তার দোরে ঘুরে-ঘুরে ভিক্ষে করে আনবে ? একা-একা চোখের জল ফেলে তাসানুর মা। আর ছেলেকে বলে, "কিছু না পারিস, যা না পাহাড়ে। বাপের মতো পাথর কেটে দুটো পয়সা রোজগার করে নিয়ে আয় না !"

যায় না তাসানু। যায় অন্য কোথাও। সারাদিন ঘরে থাকে না। কোথা যায়, কেউ জানতেও পারে না। ঘরের খবর রাখার তার গরজ নেই। পা ভেঙে বাপটা কেমন আছে, তা জানার যেন তার দায়ই নেই। দিন পেরুলে রাতের অন্ধকারে সে ঘরে ঢোকে। একবারও জিজ্ঞেস করে না, ভাল-মন্দ কোনো কথা। নিজের ঘরে ঘুমিয়ে পড়ে। কাকপক্ষী ডাকার আগেই আবার কেটে পড়ে !

একদিন সে ফিরল না। সারাদিন, সারারাত সে ফিরল না। ছেলের জন্যে ঘুম আসে না মা'র। একবার ঘর আর একবার বার করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল সে তাসানুর বাবার কাছে। বাবা বিছানায় শুয়ে-শুয়েই জিজ্ঞেস করলে, "কী হয়েছে বউ, অমন বারবার ঘর আর বাইরে যাচ্ছ কেন ? কী হয়েছে ?"

বউ চুপ করে থাকে।

বাবা বলে, "তুমি চুপ করে থাকলে ভাবছ আমি কিছু বুঝতে পারি না !"

বউ আঁতকে ওঠে। জিজ্ঞেস করে, "কী বুঝেছ ?"

"তাসানু ঘরে ফেরেনি, তাই না ?"

বউ ভয়ে-ভয়ে উত্তর দেয়, "হ্যাঁ, কী করব এখন আমি ?"

"কিচ্ছু করতে হবে না তোমায়। ও ঠিকই ফিরবে। সঙ্গে বিপদ মাথায় নিয়ে ফিরবে।"

এ-কথা শুনে শিউরে ওঠে তাসানুর মা। বলে, "অমন কথা কেন বলছ ?"

"ঠিক কথাই বলছি বউ। আমাদের বিপদে না ফেলে ছেলে তোমার ছাড়বে না। সে চায় না, আমরা বেঁচে থাকি। তা যদি চাইত, আমাদের মুখে দুটো অন্ন দেবার জন্যে সে পাথর কাটতেও পাহাড়ে উঠত।" বলতে-বলতে দুঃখে যেন গলাটা ধরে আসে তাসানুর বাবার।

থাকতে পারে না মা। ডুকরে কেঁদে ওঠে।

বাবা আবার বলে, "কেঁদো না বউ। তুমি কিচ্ছু ভেবো না। আমি খোঁড়া, অথর্ব হয়ে গেলেও তোমাকে উপোসি করে কোনোদিনই রাখব না। তুমি দেখো, আমি কালই আবার পাথর কাটতে পাহাড়ে উঠব। আমার পা ভাঙলে কী হয়েছে, হাত দুটো তো এখনও ঠুঁটো হয়ে যায়নি। আমি পারব, ঠিক পারব। মনে করো, আমাদের যদি ছেলে না-ই থাকত, তখন কী হত ? আমরা কি পড়ে-পড়ে মার খেতুম ?"

হঠাৎ সেই অন্ধকার রাতে বাইরের দরজায় কে যেন ধাক্কা দিল। তাসানুর বাবা মা দুজনেই চমকে ওঠে। মা তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "ওই এসেছে।" হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে যাবার জন্যে যেই পা ফেলেছে, বাবা মায়ের হাতটা ধরে ফেললে। চুপিসাড়ে বললে, "এত রাত্রে অমন হুট করে দরজা খুলো না ! আগে জিজ্ঞেস করো, কে ডাকে।"

কিন্তু এরই মধ্যে আরও কবার ধাক্কা পড়ল। মা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে, "কে ?"

"আমরা।"

ধক করে শিউরে উঠল বুকের ভেতরটা। এ তো তার ছেলের গলা নয় ! ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কে তোমরা ?"

"আমরা পুলিশ। দরজা খোলো।"

মায়ের হাত-পাগুলো ঠকঠক করে কেঁপে উঠল। গায়ে কাঁটা দিল। কাঁপাস্বরে জিজ্ঞেস করল, "কেন বাবা ?"

"আগে দরজা খোলো, তারপর বলছি।"

বাবা গম্ভীর গলায় শুয়ে-শুয়েই বললে, "খুলে দাও বউ ! ওদের আসতে দাও !"

ঘরের দরজা খুলতেই পুলিশের বড়-কর্তা গলাটাকে বিচ্ছিরি করে জিজ্ঞেস করলে, "এটা তো তাসানুর বাড়ি ?"

মা আতঙ্কে যেন কুঁকড়ে গেছে ! বললে, "হ্যাঁ বাবা, কেন কী হয়েছে ?"

"সে কোথায় ?"

"সে তো নেই।"

"বাড়ি ফেরেনি ?"

"না বাবা !"

"আমরা তল্লাশি করে দেখব।"

"আমি তো বলছি বাবা, সে ঘরে নেই।"

"মুখের কথা আমরা শুনতে চাই না।"

"আমি তার মা।"

"তুমি মা হতে পারো, কিন্তু তোমার ছেলে একটা চোর। কাল সে কয়েক হাজার টাকার সোনা চুরি করে ভেগেছে। সে বাড়িতে লুকিয়ে আছে কিনা, কিম্বা চোরাইমালগুলো বাড়িতে রেখেছে কি না, আমরা তল্লাশি করে দেখতে চাই।"

এরপর মা আর কথা বলবে কী করে। গলা দিয়ে যেন স্বর আর বেরোয় না। তবু তাকে আর-একবার বলতে হল, "বিশ্বাস করো বাবা, ছেলে আমার ঘরে নেই।"

পুলিশ-অফিসার খেঁকিয়ে উঠে বললে, "পৃথিবীর সব মা-ই এই কথা বলে। আমাদের ভেতরে যেতে দাও।"

শুনতে পেয়েছিল তাসানুর বাবা পুলিশের হম্বিতম্বি। তাই ঘর থেকেই চিৎকার করে বলে উঠল, "ওদের আটকে রেখো না বউ। ওরা ভেতরে এসে দেখে যাক, পৃথিবীতে তোমার মতো মায়েরাও আছে, যারা কোনোদিন মিথ্যা বলে না।"

সুতরাং তাসানুর মা দরজা ছেড়ে ওদের ভেতরে আসার পথ করে দিল।

কিন্তু জানা-ই তো ছিল যে, শত চেষ্টা করলেও তাসানুকে তারা এখানে খুঁজে পাবে না। তবু তারা যখন পুলিশ, তখন তন্ন তন্ন করে না-খুঁজে ছাড়ছে না। তাসানুকে না-পাওয়া গেলেও তারা খুঁজবে চোরাই সেই সোনা। তাই পুলিশের বড়কর্তা ঘরে যা দুটো আসবাব ছিল, ভেঙে, ছড়িয়ে ছত্রাকার করে দিয়ে গেল। যাবার সময় শাসিয়ে গেল, "ছেলেকে না-পাওয়া গেলে, তোমাদেরও ছাড়ান নেই।"

পুলিশের বড়কর্তার এই কথা শুনে তাসানুর বাবা মুচকি-মুচকি হেসেছিল। তারপর বলেছিল, "আমাদের ছেড়ো না দারোগাবাবু। তুমি আমাদের ধরে রাখলে আমরা এ-যাত্রা বেঁচে যাই।"

তাসানুর বাবার এই কথায় পুলিশের বড়কর্তা তিরিক্ষি মেজাজে কড়কে উঠেছিল, "কে বাঁচে আর কে মরে,পরে দেখা যাবে!" বলে বড়কর্তা সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সব কিছু নিস্তব্ধ হয়ে গেল যেন কিছুক্ষণের জন্যে। সেই ভয়ংকর রাতটা তাসানুর বাবা আর মার সামনে যেন রাক্ষসীর মতো চোখ মটকে হাসতে লাগল। সারারাত ঘুমুতে পারেনি দুটো বুড়োমানুষ। রাতভোর দুটো মানুষ শুধু ভেবেছে, যারা কোনোদিন অন্যায় করেনি, যাদের মনে কোনোদিন পাপ বাসা বাঁধতে পারেনি, তাদের কপালেই কি যত দুঃখ দেখা দেয়। দুটো মানুষ সারারাত নিশ্চল হয়ে বসে ছিল সেই ঘরের নির্জনতায়। তারপর শেষ রাতের হাওয়া গায়ে লাগতেই ক্লান্ত দুটো মানুষ ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ঘুম যখন ভেঙেছিল তাদের, তখন রোদ উঠে গেছে। ঘুম-ভাঙা চোখে দুজনেই দুজনের মুখের দিকে হতবাক হয়ে চেয়ে ছিল। কী করবে এখন জানে না। ভেতরে-ভেতরে রাগে গুমরে কাঁপতে থাকে তাসানুর বাবা। তারপর একসময় ফেটে পড়ে চেঁচিয়ে ওঠে, "আমি এখন একটা চোরের বাপ!"

মায়ের চোখের জল, সে তো বাধা মানবে না। আপনমনেই বলে ফেলে, "ছেলেটা ধরা পড়লে?"

"পড়ুক! অমন ছেলের বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল।"

উঠে পড়ল মা। কাল রাতে পুলিশের তাণ্ডবে ঘর-দোর লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে। ঘরের শ্রী ফিরিয়ে আনার জন্যে মা যখন ভাবছে, কোন্‌খানকার জিনিস কোথায় রাখবে, তখন আবার বাইরের দরজায় ঠেলা পড়ল, "দরজা খোলো!"

থতমত খেয়ে গেছে মা। এ যে তাসানুর গলা!

বাবা বলল, "তিনি এলেন।"

মা দরজাটা খুলে ফেলতেই তাসানু ঝড়ের মতো ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে। সে হাঁফাচ্ছে। তার হাতভর্তি খাবারের ঠোঙা। মাকে বললে, "এই নাও! এবার প্রাণভরে যত পারো খাও।"

ছেলেকে দেখে বাবা বিছানায় উঠে বসল। ছেলের মুখের দিকে কটমট করে তাকাল। তারপর জিজ্ঞেস করলে, "কোথা ছিলি সারারাত?"

তাসানুর যেন লজ্জা নেই। বেহায়ার মতো উত্তর দিল, "তোমাদের পেটের যোগাড় করছিলুম।"

"কোথায় পেলি এত খাবার?" গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল বাবা।

"সে তোমাদের দেখতে হবে না।" উত্তর দিল তাসানু।

"মনে করছিস আমি জানি না!"

"কী জানো তুমি? তোমার জানবার আছেই বা কী!"

"কোথায় সেই সোনার বাণ্ডিল?"

থমকে গেছে তাসানু বাবার কথা শুনে, "মানে?"

"মনে হচ্ছে আকাশ থেকে পড়লি? মানেটা এরপরও আরও খোলসা করে বলতে হবে?" বলে চেঁচিয়ে উঠল তাসানুর বাবা, "তুই একটা চোর। তুই আমাদের মুখে কালি দিয়েছিস। তোর মুখ দেখাও পাপ!"

তর্জন করে উঠল তাসানু, "দেখো না আমার মুখ!"

বাবাও গলার স্বর আরও উঁচিয়ে বললে, "বার কর সেই সোনা!"

"না, বার করব না।"

দাঁড়িয়ে পড়ল তাসানুর খোঁড়া বাবা। মা তাড়াতাড়ি গিয়ে ধরে ফেললে তাকে। বাবা বললে, "না, ছেড়ে দাও আমায়।" বলে একটা ঝটকা মেরে ছেলের চুলের ঝুঁটিটা নিজের মুঠোয় খামচে ধরে বললে, "বার কর্ সেই সোনা!"

"তুমি আমার চুলের মুঠি ছাড়বে কিনা?"

"চোর কোথাকার! আমার ছেলে হয়ে তুই চুরি করিস! তোর জন্যে আমার ঘরে পুলিশ ঢোকে! দ্যাখ হতচ্ছাড়া, পুলিশ আমাদের ঘরদোর কী করে গেছে!"

"পুলিশ!" ভয়ে আঁতকে ওঠে তাসানু।

"হ্যাঁ, পুলিশ!"

ছটফট করে চেঁচিয়ে উঠল তাসানু, "পুলিশ জানতে পারল কী করে? তাহলে তোমরাই বলেছ!"

বাবা তেমনি ধমক মেরে বললে, "বলতে পারলে বাঁচতুম। কিন্তু আমরা জানতুম না রে শয়তান, রাতের অন্ধকারে তুই নিজের ঘরে না এসে, অন্যের ঘরে সিঁদ কাটছিস! তোর চুলের মুঠি আমি ছাড়ব না! পুলিশ এসে তোকে না-পেটালে, আমার শান্তি নেই।" বলে ঘরের ভেতর থেকেই গলা চড়িয়ে হাঁকাহাঁকি শুরু করে দিলে, "কে কোথায় আছ, আমার ঘরে চোর, চোর!"

বাবার চিৎকার শুনে মরিয়া হয়ে তাসানু বাবার হাত থেকে মাথার চুল ছাড়াবার জন্যে ধস্তাধস্তি লাগিয়ে দিলে। কিন্তু ওই হাতে তার বাবা এতদিন পাথর ভেঙে এসেছে। ওই হাত ছাড়াবে তাসানু, এমন তার সাধ্য আছে! যখন সে সত্যিই তার বাবার শক্তির কাছে হার মানল, যখন দেখল আর বেশিক্ষণ টানাহ্যাঁচড়া করলে সে ধরা পড়ে যাবে, তখন প্রাণের দায়ে সে কবুল করল, সে চুরি করেছে। সে নিজের জামার নীচে কোমরে হাত ঢুকিয়ে এক বাণ্ডিল সোনার গয়না বাবার হাতে তুলে দিয়ে বলল, "এই নাও, এবার আমায় ছেড়ে দাও।"

থমকে গেছে তাসানুর বাবা। তার হাতের মুঠি যেন আপনা থেকেই আলগা হয়ে তাসানুর মাথা থেকে নেমে এল। সোনার বাণ্ডিলটা তাসানুর হাত থেকে নিজের হাতে নিয়ে, ধিক্কার দিয়ে উঠল, "ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! তাসানু, এইটাই শেষে সত্যি হল? তাসানু, তুই আমার ছেলে হয়ে আজ চোর হলি!" আর কিছু বলতে পারল না। ছেলের মুখের দিকে চাইতেই, পাথর ভেঙে শক্ত হয়ে গড়ে উঠেছে যে-মানুষটা, তার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল।

তাসানু ছাড়া পেয়েই তীরের মতো ছুটে পালাল ঘর থেকে। কেননা, তার বাবার সেই 'চোর-চোর' চিৎকারের শব্দটা এতক্ষণ পাড়াপড়শির কানে পৌঁছে গেছে, এটা বুঝতে পেরেছিল তাসানু। সুতরাং সে দাঁড়াল না। সে প্রাণপণে ছুটে পালাল।

কিন্তু পড়শিরা যখন হৈ-হৈ করে ছুটে এসে তাসানুদের ঘরে ঢুকে

পড়েছিল, তখনও তাসানুর বাবা বোবার মতো দাঁড়িয়ে।

"কই চোর, কই চোর" বলে যখন তারা ঘরের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারছিল, তখন তাসানুর মা আর থাকতে পারল না। হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল।

তার কান্না শুনে তাসানুর বাবা কথা বলল। বলল, "কেঁদো না বউ, চলো, আমরা পুলিশের কাছে যাই।"

পাড়াপড়শি জিজ্ঞেস করলে, "চোর কই?"

তাসানুর বাবা হাতের সোনার বাণ্ডিলটা তাদের দেখিয়ে বললে, "এই তো চোর, আমি আর আমার বউ।"

"তোমরা?" অবাক হয়ে গেল পাড়াপড়শিরা।

"হ্যাঁ, আমরা। তোমরা আমাকে আর আমার বউকে থানায় নিয়ে চলো। আমার পা'টা তো ভাঙা, তোমরা কেউ যদি একটু সাহায্য করো, তা হলে আমি হাঁটতে পারি।"

পাড়াপড়শি সাহায্য করল। তাসানুর বাবা খোঁড়া পায়ে হাঁটতে-হাঁটতে বউকে নিয়ে থানায় পৌঁছে গেল।

"দারোগাবাবু!" থানার বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেল তাসানুর বাবা পুলিশের বড়কর্তাকে।

বড়কর্তা তাসানুর বাবার দিকে কটমট করে তাকাল। বললে, "ভেতরে এসো।" তাসানুর মা আর বাবা কাছে আসতেই জিজ্ঞেস করলে, "তোমরাই তো তাসানুর বাবা আর মা?"

"হ্যাঁ হুজুর।"

"ছেলে ফিরেছে?"

"ছেলে চুরি করেনি হুজুর। চুরি করেছি এই আমরা দুজনে, আমি আর আমার বউ।"

পুলিশের বড়কর্তা থতমত খেয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, "মানে?"

"হুজুর, কদিন ধরে ছেলেটাকে কিছু খেতে দিতে পারিনি। পাথর কাটতে গিয়ে আমার পা'টা জখম হবার পর থেকে উপোসে আমাদের দিন চলছিল। পেটের খিদে সহ্য করতে না-পেরে, আমি আর আমার বউ এই কাজ করেছি। আমরাই দুজনে চোর হুজুর। কিন্তু হুজুর, চুরি করার পর থেকে দগ্ধে দগ্ধে মরছি আমরা। এ-পাপকাজের জন্যে আমাদের ঘুম নেই। আমরা প্রায় পাগল হয়ে যেতে বসেছি। তাই হুজুর, থাকতে না-পেরে সেই চোরাইমাল আপনাকে ফেরত দেব বলে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। এই দেখুন।" বলে তাসানুর বাবা সেই সোনার বাণ্ডিলটা পুলিশের বড়কর্তার সামনে রাখল। বড়কর্তা অবাক হয়ে তাকাল তাসানুর বাবা আর মা'র মুখের দিকে।

"বিশ্বাস করুন হুজুর, ছেলেটা আমার কিচ্ছু জানে না। খিদের জ্বালায় ছেলেটা আমার কাল থেকে ঘরে ফেরেনি। আমি বাপ হয়ে তার মুখে দুটো অন্ন দিতে পারিনি বলে অভিমান করে সে চলে গেছে হুজুর।"

পুলিশের বড়কর্তা এবার তাসানুর বাবার মুখের ওপর একদৃষ্টে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর একটু হাসল। তারপর বলল, "চোরাইমাল যখন তোমাদের কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে, আর তোমরা নিজেরাই যখন কবুল করছ, তোমরা চোর, তখন মনে রেখো, শাস্তি তোমাদের পেতেই হবে।"

"সে তো জানিই হুজুর।"

পুলিশের বড়কর্তা আবার বললে, "তোমরা বুড়োমানুষ। আরও ভাল করে ভেবে দ্যাখো! সত্যিকথাটা চেপে গেলে তোমাদের জেল হবে!"

তাসানুর বাবা ব্যস্ত হয়ে বললে, "আমাদের জেল হবে, এই কথাটাই সত্যি দারোগাবাবু! আমাদের তো জেলই হওয়া উচিত। আমরা তো চোর।"

পুলিশের বড়কর্তা অগত্যা বাবা আর মাকে আর কিছুই জিজ্ঞেস করলে না। কয়েদের ফটক খুলে তখনকার মতো দুজনকে আটকে রাখা হল। তারপর বিচার।

আশ্চর্য! তাসানুর বাবা এতটুকু লজ্জা পেল না। দেখলে মনে হবে, মুখখানি তার হাসি-হাসি। অথচ বউ যেন তার লজ্জায় বোবা হয়ে আছে। তাই দেখে তাসানুর বাবা হাসতে-হাসতে বলল, "অমন চুপ করে আছ কেন বউ? আজ তো আনন্দ করবে। আজ থেকে আমরা খেতে পাব। জেলখানার খাবার। পেটটা তো ঠাণ্ডা হবে।" হাসতে-হাসতেই বলছিল মানুষটা। তারপর যে কী হল, বলতে-বলতে যেন নিজেকে আর সামলে রাখতে পারল না। চোখের জল গড়িয়ে এল গাল বেয়ে। মাথাটা যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে সে কাঁদতে লাগল।

এখানে তাসানুর বাবা-মা কয়েদে। আর ওদিকে তাসানু প্রাণের ভয়ে কোথায় যে পালাল, আর ধরা গেল না। সে জানত, এ-তল্লাটে থাকলে তার নির্ঘাত মরণ। সুতরাং সে পগারপার। একবারও ভাবল না বুড়ো মা-বাবার কথা।

পালাল বটে তাসানু, কিন্তু কোথায় যাবে সে? কদিন যদি লুকিয়ে না-থাকে, ধরা পড়ার ষোলো আনা ভয়। অথচ কোথায় যে লুকোবে, তাও জানে না সে! একটা গোপন আশ্রয় তো তার চাই। সুতরাং যদ্দিন না সে-ব্যবস্থা হচ্ছে, তদ্দিন কী করবে তাসানু!

বুদ্ধি তার ঠিক জুটে গেল। শয়তানি বুদ্ধি তো মাথায় ঠাসা। তাই ভাবল, যে-কটা দিন আশ্রয় না-মেলে, সে তার ভোল পালটে ফেলবে। করলও তাই। তাসানু সারা গায়ে ধুলোবালি মাখল। গায়ের জামাটা এদিক-ওদিক ছিঁড়ে-ফেড়ে কাদা লাগাল। পরনের প্যান্টটা পায়ের ওপর টেনে তুলে একটা কিম্ভূতকিমাকার ভূতের মতো চেহারা করে ভিখিরি সাজল। ভিখিরি সেজে পথে হাঁটে আর হাত পাতে। হাত পাতলে দু' চারটে দয়ালু মানুষের অভাব হয় না। সুতরাং পেটের অন্নও তার জুটে গেল। কী আশ্চর্য! ছেলের জন্যে বাপ-মা কয়েদে ঢুকে খিদে মেটায়। আর চোর-ছেলেটা ভিখিরি সেজে খাবার চায়। একেই বোধহয় বলে কপাল।

এ তো জানা কথাই, তাসানুর মা-বাবার বিচারে জেল হবে। এবং হলও। বুড়োমানুষ বলেই হয়তো বিচারকের দয়া হয়েছিল। তাই তাদের জেল হয়েছিল একবছরের। তাসানুর বাবা বউকে বলে, "বউ, এক বছরের জেল মানে জানো? একবছর উপোসি থাকতে হবে না। বাইরে থেকে কী করবে বউ! বাইরে এত ছদ্মবেশী চোর চারদিকে ছড়িয়ে আছে, তার চেয়ে কয়েদই ভাল। অন্তত, কয়েদের এই চোরগুলো মানুষ ঠকিয়ে ছদ্মবেশে এখানে আসেনি। এরা সাঁচ্চা চোর। এদের চিনতে কষ্ট নেই। সবাই না হলেও, অধিকাংশ চোরই তো পেটের দায়ে চুরি করেছে।"

বউ তার উত্তর দিল, "তোমার ছেলেও তো পেটের দায়েই চুরি করেছিল।"

"না, সে পেটের দায়ে চুরি করেনি। একটা জোয়ান ছেলে, যে গায়ে-গতরে খেটে দুটো পয়সা উপায় করতে ভয় পায়, যার আমার মতো পাথর ভেঙে পয়সা রোজগার করতে সম্মানে বাধে, সে যখন চুরি করে, তখন তার আর-এক নাম শয়তান।"

॥ ৫ ॥

কী আশ্চর্য! শয়তানই শয়তানকে চেনে। সেদিন যখন তাসানু পথে-পথে ভিখিরি সেজে হাঁটছিল আর ভিক্ষে করছিল, তখন তাসানুকে চিনতে পেরেছিল এমনই এক শয়তান। সেই শয়তানটিও একটি ভিখিরি। তাসানু যেমন ভিক্ষে করছিল, সেও তেমনি। তাসানুকে লক্ষ করতে-করতে, লোকটা তাসানুর কাছে এগিয়ে এসেছিল। তারপর মুখে হাসি টেনে, চোখটা মটকে জিজ্ঞেস করেছিল, "নতুন মনে হচ্ছে?"

"মানে?" অচেনা লোকের মুখে, আচমকা এমন একটা প্রশ্নে

খুবই ঘাবড়ে গেছল তাসানু। সে প্রায় লাফিয়ে দৌড় দিতে গেছে। লোকটা ধাঁ করে তার হাত ধরে ফেলে বললে, "আরে করছ কী! এক্ষুনি দুজনেই ধরা পড়ে যাব! আমাকে ভয় নেই। তুমিও যা, আমিও তাই!"

তাসানু তেমনি আড়ষ্ট হয়েই বললে, "তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলুম না তো!"

"তুমি তো ছদ্মবেশী?" সে জিজ্ঞেস করে তাসানুর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

তাসানু ভ্যাবার মতো জিজ্ঞেস করে বসল, "তুমি কেমন করে জানলে?"

অমনি লোকটা এমন একটা অদ্ভুত শব্দ করে "ইট্‌টিমাস, ইট্‌টিমাস" বলে চেঁচিয়ে উঠল যে, তাই শুনে আরও ঘাবড়ে গেল তাসানু।

তাসানুর মুখের চেহারাটা দেখে লোকটাও বুঝেছে, তাসানু গোঁত খেয়েছে। এক্ষুনি উপড়ে যাবার ভয় আছে। তাই সঙ্গে সঙ্গে বললে, "আমার কথা শুনে তোমার ঘাবড়াবার কিছু নেই। ওটার মানেটা খুব সোজা। মানে তোমার চালচলন দেখেই বুঝেছি, তুমি একটি—" সং কথাটা শেষ না-করে এই পর্যন্ত বলে থামল। তারপর আবার হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "কেসটা কী? চুরি না খুন?"

"চুরি।"

"টাকা? না গয়না?"

"গয়না।"

"সঙ্গে আছে না গেছে?"

"গেছে।"

"কার খপ্পরে গেছে? পুলিশ, না জনতার?"

"বাবার।"

লোকটা যেন ভূত দেখলে, "এঁঃ, বাবার খপ্পরে! ইট্‌টিমাস! কী রকম?"

"বাবা কেড়ে নিল।"

"আর তুমি লক্ষ্মীছেলের মতো দিয়ে দিলে?"

"দিতুম না, এমন চুলের মুঠি ধরল, না-দিয়ে পারলুম না।"

"দূর! একদম ফোকাস!"

"মানে?"

"ফোকাস মানে জানো না? ইট্‌টিমাস! ফোকাস মানে বোকাদের জ্যাঠা! মানে তুমি বোকা জ্যাঠা। নাম কী?"

"তাসানু।"

"নিজের? না ভাড়া-করা?"

"নিজের।"

"এঃ!" লোকটা যেন গাছের মগডাল থেকে ডিগবাজি মারল। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলে, "বলো কী! এখনও নিজের আসল নামটা চালু রেখেছ? ফশ করে আমার কাছে বলে ফেললে? সব্বনাশ! এক্ষুনি পালটে ফেলো, নইলে এমন প্যাঁচে পড়ে যাবে, আর বেরিয়ে আসতে পারবে না! এই যে আমার আসল নামটা, তুমি শত চেষ্টা করলেও আমার পেট থেকে বার করতে পারছ না! আসল নামটা পালটে আমি এখন ঘষতে-ঘষতে হয়ে গেছি গুড্ডাবাবা! দ্যাখো বাপু, এইসব কাজে এই জ্ঞানটুকু যদি না থাকে তবে ঝুলখাণ্ডা হয়ে যাবার খুব ভয় থাকে।"

তাসানু লোকটার কথা শুনে সত্যি ভয় পেল। তবে ঝুলখাণ্ডা কথাটার মানে জানে না বলে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়ে যাবে?"

"ঝুলখাণ্ডা।"

তাসানু কথাটা শুনে ফ্যালফ্যাল করে লোকটার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তাসানুর চাউনি দেখেই লোকটার মালুম হয়েছে, সে কিছুই বোঝেনি। তাই একটু মুচকি হাসি ঠোঁটে ছড়িয়ে বললে, "তোমার তো দেখছি এখনও হামাগুড়ি দেবার মতোও শক্তি হয়নি। ঠিক আছে! এক কাজ করো, আগে নামটা পালটাও। তারপর ওইসব কথার মানে-টানেগুলো শিখিয়ে দেব।"

লোকটার বকবকানি শুনে তাসানুর যেন কেমন সব গোলমাল হয়ে গেছে। তাই জিজ্ঞেস করলে, "নামটা কী নামে রাখব?"

লোকটা হাত নেড়ে বললে, "এটাও বলে দিতে হবে? তুমি তো দেখছি এখনও একটু ভজু টাইপের আছ! ঠিক আছে, তোমার নাম রাখো কালাভজু।"

তাসানুর মুখ দেখেই বোঝা গেল, নামটা তার পছন্দ হয়নি। তাই কোনো উত্তরই দিল না।

লোকটা জিজ্ঞেস কলে, "কী, পছন্দ হল না?"

তাসানু বললে, "দূর! আমি শুধুমুধু ভজু হতে যাব কেন?"

"তবে কী হবে তুমি?"

"ভাবছি।"

"ভাবো, আমিও ভাবি।" বলে দুজনেই একটু চুপ করে রইল।

হঠাৎ তাসানুই বলে উঠল, "আমার নামটা আমি ঠিক করে ফেলেছি।"

"কী?"

"কালা-ভজু নয়। কালা-জুজু।"

লোকটা যেন শুকনো মরুতে ঠাণ্ডা পানির গন্ধ পেলে। তাসানুকে একেবারে দু'হাত দিয়ে দুমড়ে ধরে আদর করে চেঁচাল, "আকুরপাঞ্জা।"

তাসানু লোকটার দু'হাতের মধ্যে চেপ্টা হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "এটার মানে আমি বুঝতে পেরেছি!"

"কী?"

"মানে, শাবাশ। এবার ছাড়ো, নইলে দম আটকে মরব।"

লোকটা তাসানুকে ছেড়ে দিয়ে পিঠে তারিফ করে একটা চড় মেরে বলল, "না, তুমি দেখছি শিখতে সময় নেবে না বেশি।" তারপর জিজ্ঞেস করলে, "এখন কী করবে?"

তাসানু বলল, "এখন মনে হচ্ছে, এখানে আমাদের বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না।"

"চলো, হাঁটি।"

"কোথা যাবে?"

"চলো, আমাদের গাড্ডায় চলো।"

"সেটা কী জিনিস?"

"সেখানেই তো আসল ব্যাপার। তুমি ভাবছ বুঝি আমরা শুধু ভিক্ষে করেই বেড়াই!"

"তবে?"

"আছে, আছে। চলো এখন, সেখানে তোমার নামটা সিল করে রিপিট করে রাখা হবে, যাতে ভোকাট্টা না হয়ে যাও।"

তার এই কথা শুনে তাসানু বেশ ঘাবড়ে গেল। লোকটা সাংঘাতিক ধড়িবাজ। তাসানুর মুখের দিকে চেয়েই বুঝতে পেরেছে মনের কথাটা। সঙ্গে-সঙ্গে হেসে উঠে বললে, "আরে ছ্যা, এমন একটা জোয়ান ছেলে রিপিটের নাম শুনে ভড়কে গেল! আরে বাবা, সেসব কিচ্ছু না। আমাদের গাড্ডায় তো আরও অনেকে আছে, তাদের সঙ্গে তোমার একটু জান-পয়ছান হবে। তুমি তো বাঁচতে চাও? নাকি, একা-একা রাস্তায় ঘুরে নিজের বিপদ ডেকে আনতে চাও? আমাদের গাড্ডায় চলো, দেখবে ভয়ও নেই, ডরও নেই। একসঙ্গে থাকবে, ভিখ মাঙবে, খানা খাবে আর মজাসে নাক ডাকাবে। চলো!"

সুতরাং তাসানু চলল তার সঙ্গে। অবিশ্যি এটাও ঠিক, বাঁচতে গেলে এমনি একটা জায়গারই দরকার ছিল তাসানুর। অন্তত এখনকার মতো। একা-একা পথে ভিখিরি সেজে ঘুরে বেড়ানোটা যে মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়, তাসানু সেটা আগে না-বুঝলেও এখন বুঝতে পেরেছে। সুতরাং সে আর দোনোমোনো না-করে তার

সঙ্গে তার গাড্ডার দিকে হাঁটা দিল।

বেশ অনেকটা পথ তারা হাঁটল। পাহাড়ি-পথ বলে বেশ কিছুটা ওঠানামা করতে-করতে সে লোকটার সঙ্গে যেখানে এসে পৌঁছাল, সেটা কাউকে বলবার মতো জায়গা নয়। কেননা, সেখানে যারা আছে, সকলেই ভিখিরি। ছদ্মবেশী। যতটা আলো পড়ে সেখানে, তার চেয়ে অনেকখানি বেশি ছায়া। যেমন ঘিঞ্জি, তেমনি নোংরা।

দেখেশুনে তাসানুর গা-টা ঘিনঘিন করে উঠলেও, কাউকে বুঝতে দিল না। তবে সে বুঝতে পারল, আপাতত পুলিশের হাত থেকে রেহাই পেতে গেলে, এটা একটা চোস্ত জায়গা। এমন সময় হঠাৎ তাসানুর নজরে পড়ল, অন্ততপক্ষে দশটা লোক ইদিক-উদিক থেকে দাঁত ছরকুট্টে তার দিকে দেখছে! তাসানুর তখন কী করি, কী বলি অবস্থা। অবশ্য তাকে কিছু বলতে হল না, করতেও হল না। বলার আগেই লোকগুলো হো-হো করে হেসে উঠল। গুড্ডাবাবাও তাদের সঙ্গে বেহায়ার মতো হাসতে-হাসতে তাদেরই জিজ্ঞেস করলে, "চলবে?"

তখন সেই দশটা লোকের একটা লোক তেমনি হাসি-ফসকানো দাঁত বার করেই বললে, "চলবে মানে! একদম টগবগে জোয়ান ছেলে!"

"আরে বাবা, এ আমার নজর! এড়িয়ে যাওয়া অত সহজ নয়" বলে গুড্ডাবাবা তাসানুর পিঠে একটু হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "এখানে কোনো অসুবিধা হবে না তো?"

তাসানুর এখন অসুবিধা হলেই বা কী, আর না-হলেই বা কী। বিপদ মাথায় নিয়ে পথে-পথে ঘুরঘুর করার চেয়ে, এ-ব্যবস্থাটা তার ভাল লাগবারই কথা। সুতরাং সে ঘাড় নেড়ে বললে, "না, অসুবিধা কেন হবে। বেশ তো ভালই।"

অমনি সেই দশটা লোক আবার একসঙ্গে হেসে উঠল, কিন্তু কথা বলল একজন। ঠোঁটদুটো শালপাতার মতো চেটালো করে বলল, "দ্যাখো বাপু, তোমার মুখের বাক্যিগুলোকে একটু পালটাতে হবে। অমন রসিয়ে-রসিয়ে বললে চলবে না। গলার স্বরটিকে ভেঙে একেবারে কাঁসার ঘটি করে ফেলতে হবে। কখনও ঘ্যাঙ-ঘ্যাঙ করবে, আবার কখনও খ্যান-খ্যান করবে। দরকার হলে প্যান-প্যানও করতে হবে।" তারপর গুড্ডাবাবার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, "এই যে ইনি, যার সঙ্গে তুমি এলে, ইনি যে আমাদের গোদাবাবা, সেটা বোধহয় তোমার আগেই জানা হয়ে গেছে। আসলে ইনি হচ্ছেন আমাদের সর্দার।"

এতক্ষণে তাসানু কথা বলল। বলল, "ইনি তো গোদাবাবা নন, ইনি তো গুড্ডাবাবা।"

লোকটা একেবারে ল্যাজ-কাটা ফেউয়ের মতো ফ্যা-অ্যা-অ্যা করে হেসে উঠে বললে, "একদম ধসকা-মারা বুদ্ধি। সোজা কথাটা বুঝতে এত দেরি করলে, বড়-বড় কাজে প্যাঁচ মারবে কী করে? আরে বাবা, গোদাবাবাকে কি আর আমরা আজ থেকে চিনি! সেই কোন্ কাল থেকে গোদা গোদা বলে গোঙাচ্ছি। গোঙাতে-গোঙাতে কখন যে আমাদের আদরের গোদাবাবা গুড্ডাবাবা হয়ে গেল, আমরা নিজেরাই জানি না।" বলেই আবার ফ্যা-অ্যা-অ্যা করে হেসে উঠল। তার হাসির শব্দে তাসানুর মুখের চেহারাই কেমন হাঁদা-হাঁদা হয়ে গেছে! সেই হাঁদা-মুখ দেখে কে আর না-হেসে থাকতে পারে। সবাই হেসে ফেটে পড়ল। অতগুলো লোকের অত রকমের হাসি শুনে কানের পর্দাটা বুঝি দুম-ফট হয়ে যায় এখুনি।

হাসির দম ফুরিয়ে যেতেই, সেই লোকটাই গুড্ডাবাবাকে জিজ্ঞেস করল, "তাহলে একে কী নামে ডাকা হবে?"

গুড্ডাবাবা বললে, "ওর নাম রেখেছি কালা-জুজু।"

"কালা-জুজু!" হঠাৎ সবাই এমন চিৎকার করে উঠল, চিৎকার করে তাসানুর পিঠে এমন চাপড়া-চাপড়ি শুরু করে দিলে যে, তাসানুর প্রাণ প্রায় যায়-যায়!

চাপড়ানিটা থিতিয়ে আসতেই গুড্ডাবাবা বললে, "তাহলে ব্যাপারটা এই দাঁড়াচ্ছে, কালা-জুজু আজ থেকে আমাদের গাড্ডায় থাকছে। আমাদের সঙ্গে কাজ করছে। খেতে পেলে খাচ্ছে। না-পেলে মুখে কুলুপ এঁটে পড়ে থাকছে। রাজি?"

সবাই একসঙ্গে গুড্ডাবাবার কথায় সায় দিয়ে বললে, "রাজি।"

কিন্তু তাসানু চুপ করে রইল।

তাকে চুপ থাকতে দেখে গুড্ডাবাবাই বলল, "তুমি কী ভাবছ?"

তাসানু বললে, "আসলে আমার তো ভিক্ষে করা অভ্যেস নেই।"

"আরে বাবা, পেট থেকে পড়েই কি আর কেউ বলে, গুড মর্নিং স্যার।" বলেই গুড্ডাবাবা আবার হেসে উঠল। হাসতে-হাসতে বললে, "ঘাবড়াবার কিছু নেই, সব শিখিয়ে দেব। এমন কী, তোমার চেহারার ভোল পালটে একটি খাসা ভিখিরি বানিয়ে ছেড়ে দেব তোমাকে। দ্যাখো বাপু, কেউ এই ব্যবসায় একদিনে পোক্ত হয়ে ওঠে না। আমরাও হইনি। আমাদের অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হচ্ছে। তোমাকেও হবে। তাছাড়া, আর একটা কথা শুনে রাখো, আমরা শুধু ভিক্ষে করি না। তাল পেলেই তলে-তলে আমরা লুঠতরাজও করি। আমাদের সে-কাজটা তুমি কাল দেখতে পাবে। আমরা কাল মেলায় যাব। মেলার মতো ভিড়ভাট্টার জায়গাগুলো আমাদের স্বর্গরাজ্য। সুতরাং তোমার আজ বিশ্রাম। খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়তে পারো।"

শুয়ে পড়ার ইচ্ছে যদিও তাসানুর ছিল না, তবু এখন যখন রাত হয়ে আসছে, সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়বে, তখন কি আর একলাটি কারো জেগে বসে থাকতে ভাল লাগে! সুতরাং তাসানু ওদের তৈরি শুকনো রুটি চিবিয়ে সত্যিই শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম এল না তাসানুর। অজানা জায়গায়, অচেনা মানুষের সঙ্গে এই নোংরা বিছানায় শুয়ে ঘুম পায় না কোনো মানুষেরই। সে শুয়ে-শুয়ে উসখুস করতে লাগল, আর ভাবতে লাগল, শেষ পর্যন্ত কি তাকে এখানেই ঘাঁটি গাড়তে হবে! কে জানে! এখন তো আর অন্য কিছু করার নেই। পেছনে পুলিশ! অবিশ্যি পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্যে এই জায়গাটা যে কতটা নিরাপদ, এটা এখনও সে ঠিক-ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। আর সেই কারণেই মনের মধ্যে আতঙ্কটাও বেশ চেপে বসেছে তার। কিন্তু এখনও সে জানে না, তার বাবা আর মা ছেলেকে বাঁচানোর জন্যে জেলে ঢুকেছে। ছেলের দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়েছে তার মা আর বাবা।

হঠাৎ চমকে ওঠে তাসানু।

ফিসফিস করে কারা যেন কথা বলছে!

বিছানায় মটকা মেরে পড়ে থাকে তাসানু।

হ্যাঁ, এই গভীর রাতের অন্ধকারে এ মানুষেরই ফিসফিসানি।

কান খাড়া করে থাকে তাসানু। কিন্তু এতই অস্পষ্ট সেই শব্দ যে, একটা কথাও সে বুঝতে পারছে না। তাসানুকে কেমন যেন ভয় পাইয়ে দেয়! তার বুকটা সন্দেহে কাঁপতে থাকে। সে চুপিসাড়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। বুকের ওপর ভর দিয়েই তাসানু সেই শব্দের দিকে এগিয়ে চলল।

হ্যাঁ, খানিকটা গিয়েই তাসানু দেখতে পেয়েছে। ওই তো, সে স্পষ্ট দেখছে, একটা ঘুপচিমতো জায়গায় গুড্ডাবাবা যেন কার সঙ্গে কথা বলছে! তাসানু মাটির সঙ্গে একেবারে মিশে গেল। মিশে আরও একটু এগিয়ে যেতেই গুড্ডাবাবার কথা তার কানে এল, "প্রথমেই তুমি লোকটার ডান-পা ভেঙে দেবে, তাহলে পালাতে পারবে না। তারপর তুমি ওর বাঁ-চোখটা গেলে দেবে। একচোখ কানা আর এক-ঠ্যাং-ভাঙা একটি ভিখিরি বানাতে হবে কালা-জুজুকে। লোকটা তাহলে জুজুর মতোই দেখতে হবে। আমাদের কাছ থেকে পালাতেও পারবে না, আমাদের ঠকাতেও

পারবে না।" বলে একটু থামল। তারপর দুজনে চোখাচোখি করে একটু মুচকি হাসল। একটা পাথর সরিয়ে একটা গর্তের মধ্যে হাত পুরে একটা বস্তামতো কী যেন রাখল। হয়তো কিছু গুপ্তধন। কিন্তু সেই গুপ্তধন যে কী, তাসানু এতদূর থেকে তা ঠাওর করতে পারল না। সে একদম চুপ! দৃষ্টি তার স্থির।

অবিশ্যি বেশিক্ষণ তাকে ওই অবস্থায় থাকতে হল না। একটু পরেই গুড্ডাবাবা আর সেই লোকটা একটা পাথর টেনে সেই গর্তের মুখটা ঢেকে দিল। তারপর গুড্ডাবাবা হয়তো ইশারায় কিছু বলল। বলে, নিজে নিঃসাড়ে সেখান থেকে চলে গেল। কিন্তু সঙ্গের লোকটা সেখান থেকে নড়ল না। বসে রইল পাহারাদারের মতো সেইখানেই। আর তাসানু ভাবতে লাগল এখন সে কী করবে?

তাসানু সেই আড়ালে অনেকক্ষণ ঘাপটি মেরে পড়ে রইল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। কিন্তু লোকটার সেখান থেকে চলে যাওয়ার কোনো লক্ষণই দেখতে পেল না তাসানু।

আরে, লোকটা যেন ঢুলছে! চনমন করে লাফিয়ে ওঠে তাসানুর চোখের পাতা দুটো। আরও ভাল করে দেখল তাসানু। হ্যাঁ, ঘুমের ঘোরে লোকটা লটকাচ্ছে মাঝে-মাঝে। কী যেন ভাবল তাসানু। সেই ঘুটঘুটে জায়গাটার এদিক-ওদিক আর-একবার ভাল করে দেখে নিল তাসানু। উঠে দাঁড়াল। আলতো পায়ের ডিঙি মেরে এগিয়ে গেল। তারপর আচমকা ছুটে গিয়ে ঝট করে তার মুখটা জাপ্টে ধরলে। ধরেই এক ঘুসি। লোকটা লাফিয়ে উঠেছে। চিৎকার করার আগেই ওর মুখটা নিজের বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে তাসানু বেদম ঘুসি চালাতে লাগল। ধস্তাধস্তি করে লোকটা কোনোরকমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে, যেই আবার চেঁচাতে গেছে, তাসানু চট করে তার গলাটা টিপে ধরেছে। মাটির ওপর চিত করে তার বুকের ওপর বসে পড়ল। লোকটা আরও কিছুক্ষণ হাত-পা ছোঁড়াছুড়ি করল। আরও কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি। তারপর নিজে-নিজেই নেতিয়ে গোঙাতে লাগল। আরও কবার তার মুণ্ডুটা ধরে ঝাঁকানি দিল তাসানু। ঠাণ্ডা মেরে গেল লোকটা। তাড়াতাড়ি তার ঠ্যাং ধরে টান মারল। একটু তফাতে টেনে ফেলে রেখে, গর্তের পাথরটা সরাল। একটু শব্দ হল। শব্দটা খুব জোরে না-হলেও, বলা যায় না, কেউ শুনেও ফেলতে পারে তো! তাই চট করে আবার লুকিয়ে পড়ল তাসানু। হাঁপাচ্ছে তাসানু। দারুণ উত্তেজনা। নিশ্বাসের শব্দটাকে সে যেন কিছুতেই বাগ মানাতে পারছে না।

কিন্তু না, কেউ এল না। রক্ষে! তাহলেও বেশিক্ষণ এ-অবস্থায় থাকাটা নিরাপদ নয়। আর-একবার চারদিক বেশ ভাল করে দেখে নিয়ে, তাসানু ছুটে গেল সেই গর্তের দিকেই। গর্তের মধ্যে সে হাত ঢোকাতেই স্পষ্ট বুঝল, একটা ছোট্টমতো বস্তা। সে টেনে তুলল। বস্তার মুখে জড়ানো দড়িটাকে তড়িঘড়ি টানতে গিয়ে গেল জট পাকিয়ে। খুলতে পারে না তাসানু। কিন্তু বেশিক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে বস্তার জটটা টানাটানি করলে যে বিপদ নিশ্চিত, এ-কথাটা না-বললেও কি আর বোঝে না? সুতরাং তাসানু মুখ-বাঁধা বস্তাটা কাঁধে ফেলেই সেখান থেকে হাওয়া! অবিশ্যি বস্তাটা তেমন ভারী নয় বলে ছুটতে তার কষ্ট হচ্ছিল না। কিন্তু একটা সন্দেহ তাকে পেয়ে বসল, বস্তাটা এত হালকা কেন? তবে কি এর মধ্যে দামি কিছু নেই? যাই থাক, এখন তাকে ওই বস্তা কাঁধে ফেলে পালাতে হবে। সুতরাং সেই অন্ধকারে এই অচেনা জায়গার অজানা পথে সে পড়িমরি ছুটতে লাগল। এসব দেখলে, এখন এ-কথা কাউকে বলার দরকার নেই যে, তাসানু সত্যিই এক ডাকু! তা না হলে, এই নিশুতিরাতে বেমালুম একটা লোককে খুন করতে পারে! মানুষের লোভ যেন মানুষের প্রাণের চেয়েও বড়।

॥ ৬ ॥

তাসানু যখন অনেকটা ছুটে, খানিকটা হেঁটে পাহাড়ি-পথের খানা-খন্দ ডিঙোচ্ছিল, তখন রাতও হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকেনি। ধীরে-ধীরে ভোরের আলো আকাশে উপচে পড়ার জন্যে পুবদিকে উঁকিঝুঁকি মারছে। তাসানু বুঝতে পারল, সে পুবদিকেই যাচ্ছে। ভোরের আলো যতই তার গায়ে ছড়াচ্ছে, ভয়ও যেন তাকে ততই পেয়ে বসছে।

সত্যিই তো! এখন এই বস্তাটা কাঁধে নিয়ে সে কোথায় যাবে! ভোর হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে পথে-ঘাটে মানুষের চলাফেরাও শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু জায়গাটা তাসানুর একেবারেই চেনা লাগছে না। সে যে কতটা পথ এসেছে, সেটাও সে এখন খেয়াল করতে পারছে না। কিন্তু তাকে এখনই একটা আস্তানা খুঁজে বার করতে হবে। যেখানে সে অন্তত এখনকার মতো লুকিয়ে থাকতে পারে। কারণ এ-ভাবে পথে-পথে ঘুরে বেড়ালে গুড্ডাবাবার দল যদি তাকে দেখতে পায়! আর সে-ভয়টা তো একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না!

যত ভোর কাটছে, ততই তার ভয়ও বাড়ছে। অবিশ্যি এটাও ঠিক, বস্তাটার মধ্যে কী আছে, সেটা জানার জন্যে তার মনটাও ভীষণ ছুঁক-ছুঁক করছে। এতক্ষণ ধরে যে-বস্তাটা কাঁধে ফেলে সে এতখানি পথ হেঁটে এল, কে জানে সেটা তাসানু ঝুটমুট বয়ে নিয়ে এল কি না! সুতরাং এর ভেতরটা না-দেখে, এটা ঘাড়ে ফেলে হাঁটার কোনো মানে আছে? অবিশ্যি দিন বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে পথঘাটে লোকজন যে-হারে বাড়ছে, তাতে তো আর মাঝপথে বসে দেখতে পারে না! যাবেই বা কোথায়? চেনা-জানা জায়গা হলেও কথা ছিল। এ তো তাসানুর কাছে একদম বিদেশ। এখানকার গোপন-জায়গার হদিসটি তো তার জানা নেই। কিন্তু একটা হিল্লে এখনই হওয়া দরকার। এমনভাবে দিনের আলোয় হেঁটে চলাটা খুব একটা বুদ্ধিমানের মতো কাজ হচ্ছে না। গুড্ডাবাবা তো আছেই। তার ওপর আর-একটা খাঁড়া মাথার ওপর ঝুলছে। সে-খাঁড়ার নাম পুলিশ!

সুতরাং হাঁটতে-হাঁটতে তাসানু বেশ কবার বস্তাটার গায়ে হাত দিয়ে টেপাটিপি করল। তেমন শক্ত কিছু মালুম হল না। তবে বুঝতে পারল শক্ত করে বাঁধা যেন কাগজের প্যাকেট। অনেকগুলো। আরও ধাঁধা লেগে গেল তাসানুর। না, এখনই খুলে দেখতে হচ্ছে! অন্তত মুখটা খুলে টুপ করে একটু উঁকি মারার লোভটা সে কিছুতেই সামলাতে পারল না।

ভাগ্য বলতে হবে, একটা সুনসান জায়গা তার নজরে পড়ে গেল! কেউ দেখছে কি তাকে? না। চট করে সেই জায়গাটার মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। চটপট বস্তাটা কাঁধ থেকে নামিয়ে, বস্তার মুখের সেই জটপাকানো দড়িটায় দিলে এক টান, ফট! দড়িটা ছিঁড়ল। আরিব্বাস! এ কী কাণ্ড! বস্তাভর্তি যে টাকার বাণ্ডিল! তাসানুর বুকটা ধড়াস করে লাফিয়ে উঠল। রাখ্! রাখ্! ঢেকে রাখ্! আর বলতে! তাসানু সঙ্গে-সঙ্গে সেই টুকরো দড়িটা দিয়েই বস্তার মুখটা কোনোরকমে বেঁধে ফেলল। সেখান থেকে মার ছুট!

উফ্! তাসানুর পা-দুটো যেন আর চলতে চাইছে না। এ কী দেখল সে, একবস্তা টাকার বাণ্ডিল! গায়ে কাঁটা দেয় তাসানুর। থরথর করে কাঁপছে যেন সারা শরীর। বাস রে বাস, এত টাকা নিয়ে সে কী করবে? একদিনেই সে এত বড়লোক হয়ে গেল। কখনও ভাবছে, এখুনি একটা বাড়ি কিনে ফেলে। আবার ভাবছে, ধরা পড়ে গেলে? ভাবছে, একটা হাতি হলে মন্দ হয় না। আবার ভাবছে, শুধুমুধু একটা হাতিই বা পুষতে যাবে কেন? তবে একটা জাহাজ কিনে ফেলাই ভাল! হ্যাঁ, এটা মন্দ না। মস্ত একটা জাহাজ। জাহাজে ভেসে সমুদ্রে পাড়ি। আঃ হাঃ! চারিদিকে শুধু

অতল জলের হাতছানি। এগিয়ে চলো দুলতে-দুলতে। সমুদ্র পেরিয়ে তেরো নদীর দেশে। তখন আর পুলিশকেও আসতে হচ্ছে না, কিম্বা গুড্ডাবাবার দলও জানতে পারছে না। দারুণ হবে কিন্তু! সে তো হবে। তা একটা জাহাজের দাম কত সেটা জানা আছে কি? সে দেখা যাবে'খন। বস্তাভর্তি টাকা। এক বস্তায় একটা জাহাজ ঠিকই হয়ে যাবে। তবে বাপু, যদি টুপুস করে ডুবে যায়, তাহলেই সব কম্ম শেষ! আরে বাবা, ডুবব বললেই কি আর ডুবছে! জাহাজ বলে কথা! সে তো বুঝলুম জাহাজ। তাই বলে কি মাথা কিনে রেখেছে! একবার যদি মাঝদরিয়ায় ঝঞ্ঝা ওঠে, আর সমুদ্র উত্তাল হয়ে নাচনকোঁদন শুরু করে দেয়, তখন আর ট্যাঁ-ফুঁ করতে হবে না। এ তো আর ডাঙায় ঝড় নয় যে, উঠল আর ঘরের কোণে সেঁদিয়ে গেলুম। তার ওপর আছে আবার এখানে-ওখানে তুষারের চাঁই। ভেসে এসে জাহাজের গায়ে যদি মারে ধাক্কা, তাহলে আর দেখতে হবে না, ভু-স্‌স্—

আরে! আরে! সামনে একটা পান্থশালা নয়?

হ্যাঁ, তাই তো!

তাসানু যেন হাতে চাঁদ পেয়ে গেল। ভাবল, এখানে তো এখন সে দিব্যি ঢুকে পড়তে পারে! বস্তাঠাসা যখন টাকা আছে, তখন তো আর ভাবনা নেই। যা লাগে দেবে বস্তা। তার ওপর সারাটা পথ রাতভোর হেঁটে, এখন একটু জিরিয়ে না নিলে শরীর যেন আর বইছে না। তাছাড়া গুড্ডাবাবার গাড্ডাখানায় এখন যে কী হাড্ডাহাড্ডি কাণ্ড চলছে, সেটা না বললেও কে না বোঝে! চাই কী, এতক্ষণে যে গুড্ডাবাবার চাঁইবাবারা লাঠিসোঁটা নিয়ে তাসানুর খোঁজে বেরিয়ে পড়েনি, এ-কথা মূর্খেই ভাববে। সুতরাং এই পান্থশালায় এখন ঢুকে পড়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

ঢুকে সে পড়ল। পান্থশালায় যে লোকটার সঙ্গে তার প্রথম দেখা হল, তাসানু বুঝতে পারল, এই পান্থশালার মালিক।

মালিক দেখল তাসানুকে। কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই তাসানুই তাকে জিজ্ঞেস করল, "এখানে থাকার ব্যবস্থা হবে কি?"

সে বলল, "এটা তো থাকারই জায়গা।"

"হ্যাঁ, তা জানি, কিন্তু জায়গা হবে কিনা তাই জিজ্ঞেস করছি।" মোলায়েম সুরে তাসানু বলল।

লোকটা জিজ্ঞেস করল, "ক'জন?"

তাসানু বলল, "আমি, একজন।"

"ক'দিন?"

"আজকের দিন।"

"শুধু থাকা, না খাওয়া?"

"দুটোই।"

"কী করা হয়?"

"ব্যবসা।"

"বস্তায় কী আছে?" বলে লোকটা যেন কেমন সন্দেহে তাকাল।

হকচকিয়ে গেছে তাসানু হঠাৎ তার এই প্রশ্নে। চট করে তার মুখে কোনো উত্তর এল না বলে আমতা-আমতা করতে লাগল। তারপর ফস করে মাথায় বুদ্ধিটা আসতেই সে বলল, "শস্তায় কিছু মাল পেয়েছি। সওদা করেছি।"

"বিছানা?"

"সঙ্গে নেই। লাগবেও না। একটা দিন তো থাকব।"

"তবে সামনের ঘরটায় ঢুকে পড়ুন," বলে লোকটা ঘরের দিকে আঙুল দেখাল।

তাসানু ওইখানে দাঁড়িয়েই ঘরটা দেখে লোকটার দিকে মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কত পড়বে?"

লোকটা যেন তাসানুকে একটা ছোট্ট ধমক মেরেই বলল, "দূর মশাই, ওসব নিয়ে এখন মাথা ঘামাচ্ছেন কেন বলুন তো! খরচের কথা পরে হবে। আগে ঠাণ্ডা হয়ে নিন, তারপর কথা হবে। আপনাকে দেখে তো মনে হচ্ছে, ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।"

"তা একটু ক্লান্ত হয়েছি বটে। তাহলেও পাওনা-গণ্ডার ব্যাপারটা..."

তাসানুকে কথা শেষ করতে না-দিয়েই সে বলল, "কখন থেকে হাঁটছেন?"

"তা অনেকক্ষণ থেকে।"

"তবে! যান যান, একটু বিশ্রাম নিয়ে নিন। পয়সার জন্যে কি আর কিছু আটকায়!"

তাসানু তবু বলল, "তাহলেও হিসেব-পত্রের ঝামেলাটা মিটিয়ে রাখাই ভাল।"

"আরে মশাই, আপনি তো দেখছি আচ্ছা মুশকিলে ফেলেছেন। বলছি তো, পরে কথা বলব। কিছুর জন্যে কি কিছু আটকায়? আপনি আমার আশ্রয়ে এসেছেন, আমি আপনার সঙ্গে পয়সা নিয়ে ঝুট-ঝামেলা করব, এটা আপনি ভাবলেন কী করে? পয়সাটাই বড় হল?"

তাসানুর ভাল লেগে গেল লোকটাকে।

লোকটা আবার জিজ্ঞেস করল, "কিছু যদি মনে না করেন, আপনার নামটা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?"

হঠাৎ নাম জিজ্ঞেস করতেই তাসানু একেবারে থতমত খেয়ে গেছে। ভাববার আগেই মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে গেল, "কালা-জুজু।"

"আরে মশাই, সাংঘাতিক রহস্য-রহস্য নাম তো আপনার!"

"কী করব? গুরুজনরা রেখেছেন। ফেলে দিতে পারি না তো!"

"ফেলবেন কেন? এমন একটা দুর্দান্ত নাম কি ফেলে দিয়ে নষ্ট করে কেউ! তা সঙ্গের টাকা-পয়সাগুলো কোথায় রেখেছেন?" বলে তিনি তাসানুর মুখের দিকে পিটপিট করে চেয়ে রইলেন।

আবার থমকে গেছে তাসানু। এবার বুঝতে না-দিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল, "সে রেখেছি।"

"সাবধানে রাখবেন মশাই। যা দিনকাল পড়েছে। তা ছাড়া এটা পাঁচজনের জায়গা। পাঁচটা লোক যাচ্ছে আসছে। কার পেটে কী আছে, কে জানছে বলুন! তবে একটা কাজ আপনি করতে পারেন। নিজের কাছে রাখতে না-চাইলে আমার কাছে রেখে দিতে পারেন। চাবির মধ্যে থাকবে। একেবারে নিরাপদ।"

তাসানু একটু হাসল। তারপর বলল, "না, খুব একটা বেশি কিছু নেই। থাক, আমার কাছেই থাক।"

"আপনি যা ভাল বোঝেন।"

তাসানু জিজ্ঞেস করল, "তাহলে ওই সামনের ঘরটায় যাব ?"

"হ্যাঁ, চলুন, আমি দেখিয়ে দিয়ে আসি।"

তাসানু তার সঙ্গে গিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

পান্থশালার ঘর যেমন হওয়া উচিত, ঘরটা তেমনই। খুব একটা ভালও না, আবার খুব যে একটা বাসের অযোগ্য, তেমনও না। তা, তাসানুর এখন যা অবস্থা, তাতে ঘর ভাল কি মন্দ তা নিয়ে বিচার করতে গেলে নিজেরই বিপদ ঘনিয়ে আসবে। এখন যেন-তেন-প্রকারেণ একটা ফোকরে ঢুকে পড়া। সোজাকথায় লুকিয়ে থাকা। আপাতত গুড্ডাবাবার হাত থেকে তো বাঁচা যাক। তারপর দেখা যাবে। তবু ভাল যে, ঘরে একটা খাটিয়া আছে। দিব্যি শোয়া যাবে! কিন্তু এই বস্তাটা ? এই বস্তাভর্তি টাকাগুলো সে রাখে কোথায় ? সেও তো এক সমস্যা! কী আশ্চর্য কাণ্ড বাবা! টাকা থাকলেও জ্বালাতন, আবার না-থাকলেও জ্বালাতন! যাই হোক, এখন ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দেওয়া যাক। বন্ধই করে দিল সে। বস্তাটা মাথায় দিয়ে খাটিয়ার ওপর শুয়ে পড়ল। আঃ! আড়ামোড়া ভেঙে একটা বেশ লম্বা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভাবল, ব্যাপারটা কি খুব ভুল হয়ে গেল ?

কোন ব্যাপারটা ?

মানে ফস্ করে কালা-জুজু নামটা বলে ফেলার ব্যাপারটা।

না, একপক্ষে ভাল। তার কালা-জুজু নামটা তো আর পুলিশ জানছে না। পুলিশ তার আসল নামটাই জানে, তাসানু। কিন্তু এখন যেটা ভেবে পাচ্ছে না তাসানু, সেটা হল, এখন তার কাছে কে সবচেয়ে বেশি ভয়ংকর, গুড্ডাবাবা, না পুলিশ ? হয়তো দুজনেই। এই দুজনই তার সবচেয়ে বড় দুশমন। আর এ তো তার নিজেরই জন্যে হয়েছে। সোনা যদি সে চুরি না-করত, পুলিশ তার পিছু নিত না। আর পুলিশ পিছু না-নিলে গুড্ডাবাবার পাল্লাতেও তাকে পড়তে হত না। তা-ও না-হয় গুড্ডাবাবার পাল্লায় পড়ল, কিন্তু তারপর সেখানে যে-কাণ্ডটা করল, তাকে কী বলবে তুমি ? খুব বুদ্ধিমানের কাজ ? একটা লোককে খুন করে টাকার বস্তা নিয়ে ভেগে পড়ে এখন তাসানু নিজেই নিজের জালে জড়িয়ে পড়েছে। কেউ তো আর ওপর-পড়া হয়ে তাকে এইসব বুদ্ধি দেয়নি। নিজের যা মনে হচ্ছে, তাই করেছে!

শুয়ে-শুয়ে ঘুম আসছিল না তাসানুর। মনটা তার ভারী উসখুস করছিল। বারবার মাথার বস্তাটা খামচে-খামচে ধরছে আর মনে-মনে ভাবছে, টাকা-পয়সাগুলো যদি এক্ষুনি গুনে ফেলতে পারত। না, এখন দরকার নেই। দিনের বেলা কে কোত্থেকে দেখে ফেলবে! রাত্তিরবেলা সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়বে, তখন। কিন্তু পান্থশালার লোকটার কী রকম আহ্লাদেপনা দেখেছ ? বলে, সঙ্গে যদি টাকা-পয়সা থাকে তো তার কাছে রেখে দিতে! খেপেছ! তারপর আর-একটা এক কাণ্ড হোক আর কী

দুপুরবেলা পেটে দুটো পড়তেই তাসানু নাক ডাকাতে শুরু করে দিলে। টেনে একটি ঘুম দিয়ে যখন বাছাধন উঠল, তখন সন্ধে গড়াচ্ছে! আজকের রাতটা সে না-হয় এখানে থাকল, কিন্তু কাল ? রাত পোহালেই তো সকাল। তখন ? কালকের কথা তাসানু আজকে এখনও ভাবেনি। তার এখন একটাই শুধু ভাবনা, সেটা হল ওই বস্তাটা। ওই বস্তাটার টাকাগুলো সে যতক্ষণ না গুনে ফেলছে, ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হতে পারছে না যেন! সুতরাং ঘুমিয়ে পড়ার রাতটা যত তাড়াতাড়ি আসে ততই মঙ্গল।

ঘুমিয়ে পড়ার রাত এল ঠিকই। ঠিক এই সময়েই হঠাৎ পান্থশালার সেই লোকটি একেবারে তাসানুর ঘরে হাজির। "কী মশাই, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি ?" বলে দরজা ঠেলে লোকটি ঘরে ঢুকে পড়ল।

তাসানু তার এভাবে আচমকা ঘরে ঢুকে পড়ায় থতমত খেয়ে গেছে। আমতা-আমতা করে বললে, "না, এখনও জেগে আছি।"

লোকটি সারা ঘরে বেশ ভাল করে চোখ বুলিয়ে হাসতে-হাসতে বলল, "বস্তাটাকে তো দেখছি মাথার বালিশ করে ফেলেছেন!"

চমকে ওঠে তাসানু। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে হাসতে-হাসতে বললে, "একটা কিছু মাথায় তো দিতে হয়।"

"তা থাকছেন তো দু-একদিন ?"

"না, কাল সকালেই যাচ্ছি।"

"সকালেই!"

"হ্যাঁ, হাজারটা কাজ, বুঝলেন না! কিন্তু আপনি তো বললেন না, কত কী দিতে হবে ?"

"সে হবে'খন। এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? এখন যাই। আপনি আরাম করুন। পরে দেখা হবে।"

লোকটা বেরিয়ে গেল।

তাসানু ঘরের দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল। বস্তার মুখটা খুলি-খুলি করেও খুলতে পারছে না। অথচ তরও সইছে না। কিন্তু না। এখনও সবাই ঘুমিয়ে পড়েনি। কে আবার কখন হুট করে দরজায় ঠেলা মেরে বসে! তার চেয়ে রাত গভীর হোক না। সবাই ঘুমিয়ে পড়ুক, তারপর দেখা যাবে। এত ব্যস্ত হবার কী আছে ? কেউ তো আর কেড়ে নিচ্ছে না বস্তাটা। দূর, বস্তা নিয়ে কে অত মাথা ঘামায়!

সুতরাং তাসানু গভীর রাতের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। সে কান পেতে ছিল। শুনতে পাচ্ছিল, রাত যতই এগিয়ে আসছে, ধীরে-ধীরে সব নিঃঝুমও হয়ে আসছে। যখন তাসানুর মনে হল, আর কোনো শব্দ নেই, বাইরে কোনো কথাবার্তা নেই, তখন তার ইচ্ছে হল, বাইরে একবার উঁকি মারে! সে সত্যি-সত্যি দরজা খুলে ফেলল। উঁকিও মারল। কিন্তু কাউকে দেখা গেল না। যাক বাবা! এতক্ষণে একটু সুযোগ এল! সত্যি বলতে কী, এমন উত্তেজনা তাকে পেয়ে বসল, ঘরের দরজাটায় যে খিল দিতে হবে, সে-কথাটা তার খেয়ালই হল না। আনমনে তড়িঘড়ি দরজাটা ভেজিয়ে দিয়েই বস্তাটা নিয়ে বসে পড়ল তাসানু। খুলে ফেলল বস্তা। উপুড় করে নাড়া দিতেই থোকা-থোকা টাকার বাণ্ডিল ছড়িয়ে পড়ল। উঃ! কত টাকা! এক রাত্তিরে এত টাকা সে গুনবে কী করে ? গুনেই বা করবে কী! বুঝতেই তো পেরেছে। এ তো আর একশো-দুশো হবে না! হাজার-হাজার! তাসানুর বুকের ভেতরে আনন্দে দাপাদাপি শুরু হয়ে গেছে! আনন্দে বস্তার ভেতরে টাকাগুলো আবার লুকিয়ে ফেলার কথা সে ভুলেই বসেছে! টাকাগুলো নিয়ে একবার এদিকে রাখে, একবার ওদিকে রাখে। কখনও ছড়ায়। কখনও দু'হাত দিয়ে খামচে ধরে লোফালুফি লাগিয়ে দেয়। আনন্দে সে হাসবে, না কাঁদবে ? সে হেসে উঠল। হাসতে-হাসতে হাসির শব্দটাকে গলার মধ্যে চেপে ধরে সে খিলখিল করতে লাগল। চেষ্টা করেও সে হাসিটাকে আটকে রাখতে পারল না। কিন্তু কেউ শুনে ফেললে! হাসিটাকে একবার সামলায় তো দশবার ফেটে পড়ে। শেষে হাসতে-হাসতে সে টাকাগুলোর ওপর গড়াগড়ি শুরু করে দিলে। উঃ! সে কী দারুণ উত্তেজনা!

খুট্!

চমকে ওঠে তাসানু।

"কে!"

ধড়ফড় করে উঠে পড়ে তাসানু।

এই সব্বনাশ! দরজাটা যেন আস্তে-আস্তে খুলে যাচ্ছে!

পড়িমরি ছুটে গেল তাসানু। দরজাটা বন্ধ করার জন্যে হাত বাড়াতেই থমকে গেছে! এ কী, এ যে সেই লোকটা! ঢুকে পড়ল

সে "হ্যাল্লো. কালা-জুজু !"

ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে তাসানু। মারল ছুট টাকাগুলোর কাছে। লুকিয়ে ফেলার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল টাকাগুলোর ওপর।

লোকটা বলে উঠল. "কালা-জুজু, আর লুকিয়ে কী করবেন ? আমি দেখে ফেলেছি দেখে ফেলেছি এখন নয়, যখন আপনি পান্থশালায় এসেছেন. তখনই। বস্তার পিঠে যে একটা ফুটো, সেটা আপনার মতো একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির চোখ এড়িয়ে গেছে, এতেই আমি অবাক হচ্ছি ওই ফুটো দিয়ে টাকার বাণ্ডিল উঁকি মারছে দেখেই আপনাকে আমি ধরে ফেলেছি।"

তাসানু যেন পাথর

লোকটা এবার ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর মুচকি-মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল, "এত টাকা পেলেন কোত্থেকে

তাসানু চুপ করেই রইল।

লোকটা জিজ্ঞেস করল, "কী চুপ কেন ? বলুন এত টাকা পেলেন কোথায় ?"

তাসানু যে চটপট বলে ফেলবে একটা কিছু, তেমন বুদ্ধি তার লোপ পেয়েছে তখন। যেমন চুপ করে ছিল, তেমনই চুপ থাকলে মিটে যেত। তা না, এমন তোতলাতে শুরু করে দিলে যে, লোকটা আরও পেয়ে বসল। আবার জিজ্ঞেস করল, "আপনি চুরি করেছেন ?"

তাসানু এবার বেশ চিৎকার করেই বলে উঠল, "কে বলেছে, আমি চুরি করেছি ! এ-টাকা আমার।"

"তবে যে বললেন, শস্তার মাল সওদা করেছেন ?"

তাসানু এবার যেন একটু রোষ দেখিয়েই বলল, "সে আপনাকে দেখতে হবে না।"

"দেখতে হবে বই কী ! একটা চোর যদি আমার পান্থশালায় ঢুকে বসে, তাকে তো পুলিশের হাতে আমাকেই দিতে হবে। কত টাকা আছে ?"

তাসানু খেঁকিয়ে উঠল, "যত টাকাই থাক।"

এগিয়ে গেল লোকটা।

তাসানু রুখে দাঁড়াল, "কাছে আসবেন না বলছি।"

"কেন, মারবেন ?"

"সরে যান বলছি।"

এবার কিন্তু লোকটি নিজের মূর্তি ধরল। ধাঁ করে ধরে ফেলল তাসানুর একটা হাত। তাসানু টেনে এক ঝটকা মারল লোকটিকে। লোকটি এবার ঝাঁপিয়ে পড়ল তাসানুর ঘাড়ের ওপর। তাসানুও ছাড়বার পাত্তর নয়। দুজনের মধ্যে আচমকা লেগে গেল প্রচণ্ড মারামারি।

লোকটির সত্যিই ভীষণ শক্তি। দেখলেই মনে হয়, তাসানুর মতো চারটে লোককে একাই ঘায়েল করতে পারে। সুতরাং তাসানু বারবার প্যাঁচ খেয়ে লটকে-লটকে মাটিতে পড়ছে। আবার উঠছে। জাপ্টে ধরছে। টানাহ্যাঁচড়া করছে। কিন্তু আবার কাত হয়ে ডিগবাজি খাচ্ছে। একফাঁকে তাসানু তার একটা হাত এমন জোরে কামড়ে ধরলে যে, লোকটির হাতটা বুঝি দু-টুকরো হয়ে যায় ! তাসানুর মুখ থেকে হাত ছাড়াবার জন্যে লোকটি মরিয়া হয়ে ঝাপটা-ঝাপটি শুরু করে দিল। তাসানু ছাড়েই না। শেষমেশ লোকটা আর সহ্য করতে না-পেরে, একহাত দিয়েই তার মাথায় এমন একটা ঘুসি মারল যে, মনে হল, তাসানুর ঘাড় থেকে বুঝি মুণ্ডুটা ছিটকে বেরিয়ে গেল। আসলে, মুণ্ডুটা ছিটকে বেরিয়ে না-গেলেও তাসানু ছিটকে পড়ল মাটিতে। পড়ল, আর উঠতে পারল না। এ কী ! তাসানু যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে ! তবে কি এক ঘায়েই সে কুপোকাত ! হতে পারে ! কেননা, মাথায় আঘাত তো ! হয়তো মোক্ষম লেগেছে ! তাহলে কী হবে এবার ?

লোকটা কিন্তু একটুও ঘাবড়াল না। সঙ্গে-সঙ্গে ছড়ানো-মড়ানো টাকাগুলোকে আবার বস্তার মধ্যে পুরে ফেলল। সেই বস্তাটা নিয়ে নিঃশব্দে নিজের ঘরে রেখে আবার এল তাসানুর ঘরে। তাসানুকে ঘর থেকে টেনে বার করে, সেই অন্ধকার রাত্তিরে তাকে ঘাড়ে নিয়ে কোথায় যে ফেলে দিয়ে এল, কেউ জানতেও পারল না।

লোকটা হয়তো ভেবেছিল, তাসানু খতম হয়ে গেছে। সুতরাং এখন তাকে পায় কে ! না-বললেও কে আর বোঝে না, নিজে টাকাগুলোকে হাতাবে বলেই তো এমন একটা মতলব সে ফেঁদেছিল। এখন তার হাতে চাঁদ। কে এমন মূর্খ আছে, টাকার বস্তা হাতে পেয়ে, সেই টাকা মাঠে ছড়িয়ে দেয় !

॥ ৭ ॥

তাসানু পড়ে ছিল একটা জঙ্গলে। সেই পান্থশালা থেকে বেশ অনেকটা দূরে। ভাগ্যি ভাল, তখনও তার প্রাণটি বুকের মধ্যে ধুকপুক করছিল। কতক্ষণ যে তাসানু সেইখানে পড়ে-পড়ে ধুঁকেছে, কেউ জানে না। যখন সকালে রোদ উঠে গেছল, তখনও সে মরেনি। তাকে আধমরা অবস্থায় দেখতে পেয়েছিল একটি দয়ালু মানুষ। সে তাসানুকে সেখান থেকে নিয়ে গেছল নিজের ঘরে। তখনও তাসানু চোখ খুলে দেখেনি। দেখেনি, যে-মানুষটি তাকে বাঁচানোর জন্যে আপ্রাণ লড়াই করছে, সে-মানুষটির বুক-ভর্তি দয়া আর স্নেহ জমে আছে। এই লোকটির অবিশ্যি সবাই আছে, বউ, ছেলে, মেয়ে। কিন্তু এখন এই ঘরে সে একা। কারণ তারা থাকে অনেক দূরে। তার দেশে। লোকটি এখানে কাজ করে জঙ্গলে। কাজ করে আরও পাঁচটা লোকের সঙ্গে। করাত দিয়ে গাছ কেটে কাঠ বার করে। বলতে পারো, চাকরি করে। মাসে-মাসে মাইনে পায়। একখানাই ঘর তার। এই জঙ্গলেরই ধারে। সেদিন যখন সে কাজে যাচ্ছিল, তখনই সে আচমকা দেখতে পেয়েছিল তাসানুকে। প্রথমটা হয়তো সে ভেবেছিল, তাসানু মরেই গেছে। কিন্তু না। একটা জীবন্ত মানুষকে এখানে এভাবে পড়ে থাকতে দেখে সে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছল। মানুষটাকে বাঁচানোর জন্যে সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এখানে এমন কেউ নেই যে, তাকে একটু সাহস দিতে পারে। একটু সাহায্য করতে পারে। কিন্তু দেরি তো করা যায় না ! অগত্যা লোকটি নিজের কাঁধেই তাসানুকে তুলে নিল। নিয়ে চলল নিজের ঘরে। নিজের ঘরে নিজের বিছানায় সে শুইয়ে দিল তাসানুকে। তাসানুর চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিল। তারপর ওর মাথায় আলতো হাতের স্পর্শ দিল। তেমন একটা আঘাতের চিহ্ন তার শরীরে সে কোথাও দেখতে পেলে না। শুধু দেখতে পেল, তাসানুর নিশ্বাসটা যেন সহজ হয়ে আসছে। লোকটা স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সেইদিকে। শুনতে পেল, তাসানুর গলা দিয়ে যেন একটা ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসছে ! ব্যস্ত হয়ে তাকাল লোকটি। তাসানুর মাথাটা এদিক থেকে ওদিকে হেলে পড়ল। জ্ঞান আসছে তাসানুর। হ্যাঁ, চোখ চাইল তাসানু। তারপর ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

লোকটি তাসানুর মাথায় হাত রাখল।

তাসানুর ফ্যাকাসে চোখে অবাক চাউনি।

লোকটির মুখে হাসি। জিজ্ঞেস করল, "কষ্ট হচ্ছে ?" ভারী স্নেহমাখা গলার স্বর।

তাসানুর গলায় কোনো উত্তর নেই। হয়তো উত্তর দেবার মতো তার এখন ক্ষমতাই নেই। তাই সে ফ্যালফ্যাল করে চেয়েই রইল।

লোকটি আবার বললে, "কিচ্ছু ভয় নেই। ভাল হয়ে যাবে।"

তাসানু চেয়েই রইল।

হ্যাঁ, তাসানু একদিন সত্যিই ভাল হয়ে উঠেছিল। সে উঠে বসেছিল। তারপর একদিন বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

তারপর তাসানু একদিন লোকটিকে বলেছিল, "এবার আমি যেতে পারব।"

লোকটি জিজ্ঞেস করেছিল, "কোথায় যাবে ? বাড়ি ?"

তাসানু বলেছিল, "বাড়ি থাকলে তবে তো যাব।"

"কেন, তোমার মা, বাবা কেউ নেই ?"

তাসানু এ-কথার কোনো উত্তর না-দিয়ে একটু হাসল। সে-হাসি ভারী কষ্টের।

লোকটি জিজ্ঞেস করল, "কী করো তুমি ?"

তাসানু তাকাল লোকটির মুখের দিকে। হয়তো কিছু ভাবল। তারপর স্পষ্ট গলায় বলে উঠল, "চুরি।"

চমকে চাইল লোকটি।

তাকে চমকাতে দেখে তাসানু আবার বলল, "হ্যাঁ, আমি চোর।"

বেশ নির্ভয়েই সে বলল। কেননা, তাসানুর মনে হয়েছিল, যে-মানুষটা তার প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছে, অন্তত তার কাছে সে কিছুতেই মিথ্যে বলবে না। মিথ্যে সে অনেক বলেছে। তাতে কী লাভ হয়েছে তার ! এখন যদি এ-মানুষটা তাকে হাজারো শাস্তি দেয়, তবে সে-শাস্তি মাথা পেতে নিতে তাসানু একটুও পিছপা হবে না। কারণ, এই মানুষটার মুখখানা দেখে তার যেন মন বারবার বলে উঠেছে, এতদিন সে যা করেছে, সব ভুল, সব মিথ্যে !

লোকটি কিন্তু তাসানুকে আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। সে হয়তো বুঝতে পেরেছিল, সে চোর বলেই বোধহয় কেউ তাকে মেরে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে গেছে। অবশ্য জিজ্ঞেস করেছিল তাসানুর নামটি।

তাসানু উত্তরে বলেছিল, "আমি যখন বাবা-মা'র সঙ্গে থাকতুম, তখন তারা আমায় তাসানু বলে ডাকত। তারপর পাকেচক্রে আমি যখন চুরি করতে শিখলুম, তখন আমার নাম হল 'কালা-জুজু'।"

সে জিজ্ঞেস করেছিল, "বাবা মা'র কাছে এখন থাকো না কেন ?"

"চোর-ছেলের মুখ দেখতে চায় কোন্ মা-বাবা ?" উত্তর দিয়েছিল তাসানু।

লোকটি বলল, "না, না, ওকথা বলে না। বাবা-মা'র দুঃখ হলেও ছেলেই তো তাদের দুঃখ ঘোচাবে। চলো, আমি তোমায় তাদের কাছে নিয়ে যাব।"

তাসানু লোকটির কথা শুনল। তারপর একটু চুপ থেকে বলল, "হ্যাঁ, আমি যাব। কিন্তু এখন নয়। এখন আমি কাজ খুঁজব। নিজের পায়ে দাঁড়াব। চোর হয়ে নয়, তাদের ছেলের মতোই তাদের সামনে দাঁড়াতে চাই আমি।"

"বেশ, আমার সঙ্গে কাজ করবে তুমি ?"

"কী কাজ ?"

"আমি জঙ্গলে কাজ করি। করাত টেনে কাঠ কাটি।"

তাসানু বলল, "আমি তো করাত টানতে জানি না।"

"আমি শিখিয়ে দেব।"

তাসানু বলল, "তাহলে পারব।" তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করেছিল, "কিন্তু এখানে আমি থাকব কোথায় ?"

লোকটি উত্তর দিল, "কেন, আমি তো আছি। আমার কাছে থাকবে।"

"তুমি চোরকে আশ্রয় দেবে ?" জিজ্ঞেস করেছিল তাসানু।

লোকটি একটু হাসল। তাসানুর কাঁধে হাত রাখল। একটু মৃদু ঝাঁকানি দিয়ে বলল, "না, তুমি চোর নও। তুমি আমার আপনার জন। আমার ছেলের মতো।"

দুটি চোখ জলে ভরে গেল তাসানুর।

সুতরাং তাসানু সেই লোকটির কাছেই থেকে গেল।

লোকটির নাম তাকাজি। হাসি-ভরা মুখটি তার। দেখলেই এত ভাল লাগে। মাথার চুলে যদিও পাক ধরেছে, কিন্তু দেহে তার অসম্ভব ক্ষমতা। কিন্তু দেহে যত ক্ষমতা, তার চেয়ে বেশি ভালবাসা তার মনে। সেই ভালবাসার ছোঁয়া লেগে তাসানু যেন আস্তে আস্তে কেমন এক অন্যমানুষ হয়ে ওঠে। সে এখন জানে না মানুষকে ঠক্যাতে, কিংবা মিথ্যা বলতে। এখন তার বুক-ভর্তি আনন্দ। কেন না, সে এখন তাকাজির সঙ্গে জঙ্গলে যায়। তাকাজির সঙ্গে হাত মিলিয়ে করাত টেনে কাঠ কাটে। বাড়ন্ত দেহের মাংসপেশীগুলো তার ফুলে-ফুলে ওঠে। একটা শক্ত-সমর্থ মানুষ হয়ে ওঠে তাসানু।

এমনি করে দিন চলে যায়।

এমনি একটা দিনে তাসানু তাকাজিকে বলেছিল, "তাকা, তুমি আর না-ই বা এত খাটলে।"

তাকা বলেছিল, "আমার না-খাটলে চলবে কেমন করে ? দেশে আমার ছেলে রয়েছে, মেয়ে রয়েছে। তারা পড়াশোনা করে। আমার বউ আছে। আমি না-খাটলে তাদের কে দেখবে ?"

তাসানু বলেছিল, "একদিন তো তুমি বুড়ো হয়ে যাবে, একদিন তো তোমার খাটবার ক্ষমতা থাকবে না। সেদিন ?"

তাকাজি উত্তর দিয়েছিল, "সেদিন আমার মেয়ে যাবে শ্বশুরবাড়ি আর ছেলে দেখবে আমাদের, তার বুড়ো মা-বাপকে।"

তাসানুর বুকটা শিউরে উঠল। হঠাৎ যেন ঝাপসা হয়ে তার বুড়ো বাবা-মা'র মুখ দুটি তার চোখের ওপর ভেসে ওঠে। ছিঃ ! সে তাদের ফেলে রেখে পালিয়ে এসেছে ! এ কী করেছে সে ! দুঃখে যেন বোবা হয়ে যায় তাসানু। ইশ্ ! না-জানি তারা এখন কত কষ্ট পাচ্ছে !

তাসানু এখন করাত টানে গভীর জঙ্গলে। গাছের ফাঁকে-ফাঁকে করাতের শব্দ ওঠে। ওই শব্দ ছাড়া এখন আর সে কিছু জানে না। সে জানে, ওই শব্দ যত গর্জে উঠবে, ততই তার বুকের ঘাম মাটিতে ছড়িয়ে পড়বে। সেই তার সুখ। এখন তাকে কেউ বলবে না, সে চোর। সে জোয়ান ছেলে। মেহনত করতে জানে সে। আর ভয় কী তার !

তাসানু একদিন তাকাজির সঙ্গে মাটি কোপাতে লাগল। তাকাজির তো মাত্তর একখানা ঘর ছিল। মাটি কুপিয়ে দুজনে মিলে আর-একখানা ঘর তুলল। একটা তোরঙ্গ ছিল, দুটো হল। একটা তোরঙ্গে যত পোশাক ছিল, আরও তত পোশাক হল। য'খানা বাসন ছিল, আরও ততখানা হল। ঘর ভরে গেল খুশিতে।

একদিন খুশিতে উছলে উঠেই তাসানু তার তাকাজিকে বলেছিল, "তাকা, তুমি তো অনেকদিন দেশে যাওনি। যাও না এবার। কদিন ঘুরে এসো। ছেলে-মেয়েকে দেখে এসো। আমি আছি।"

তাকাজি বলেছিল, "হ্যাঁ, যাব। তাসানুর বিয়ে দিয়ে যাব।"

তাসানুর মুখখানা লাল হয়ে ওঠে।

একদিন সত্যিই তাসানুর বিয়ে হল। সেই জঙ্গলের নির্জন ছায়ায় একদিন বিয়ের বাদ্যি বেজে উঠল। সেই জঙ্গলের নির্জন ঘরে আরও অনেকদিন পর একটি ছেলে জন্মাল তাসানুর। ছেলের নাম রাখল কুহা। খুশিতে উছলে ওঠে তাকাজি। বলে, "তাসানু, ঘরে আমার নাতি এল। নতুন দিনের নতুন মানুষ। এবার আমার ছুটি। এবার আমার ছেলে-মেয়ের কাছে ফিরে যাবার সময় হল। তাসানু, জঙ্গলের কাজ আমার শেষ হয়েছে। এবার আমি দেশে যাব।"

তাসানুর বুকের ভেতরটা কেমন যেন থমকে যায়।

একদিন সত্যিই খুব সকালে এই জঙ্গলের শেষ রাস্তায় জুড়ি-ঘোড়ার এক্কাগাড়ি ছুটে যায়। চেয়ে থাকে তাসানু। গাড়িতে তার তাকাজি। তেমনি হাসি-মাখা মুখ। ঘোড়া ছোটে। তার পায়ের শব্দ ভেসে আসে। সে-শব্দ মনে হয় যেন তার তাকাজির বুক-ভর্তি ভালবাসার শব্দ। বোবার মতো সেই শব্দ শুনতে থাকে তাসানু। আহা রে ! তাসানু হয়তো মানুষটাকে আর কোনোদিনই কাছে পাবে না। কেন না, এখান থেকে, এই জঙ্গল পেরিয়ে

তাকাজি যাবে বন্দরে। সেই বন্দর থেকে তার জাহাজ সমুদ্রের জলে ঢেউ তুলে যাবে অনেকদূরে, আর-এক বন্দরে। সেখান থেকে তার দেশে।

তাকাজি চলে গেল। কেমন যেন নিঃঝুম হয়ে গেল বাড়িটা। আর যেন কিছুই ভাল লাগে না তাসানুর। জঙ্গলে যায়। কাঠ কাটে। কিন্তু যে করাতের শব্দে একদিন সে সুখ দেখেছিল, আজ যেন আর সে-সুখ নেই। তাকাজির জন্যে ব্যথায় ভরে যায় তার মন। এমনি করে ভাবতে-ভাবতে যে তার শরীরটাও ভেঙে পড়বে, এ-কথাটা বুঝতে পেরেছিল তার বউ। তাই একদিন বউ বলল, "এমনি করে তুমি মন খারাপ করে বসে থাকলে আমাদেরও কি ভাল লাগে! তার চেয়ে চলো, একদিন সবাই মিলে ঘুরে আসি তাকার দেশ থেকে!"

তার বউয়ের মুখে এ-কথা শুনে খুব খুশি হয়েছিল তাসানু। বলল, "কিন্তু বউ, তাকার দেশে যাব যে, আমাদের অত পয়সা কই?"

বউ বলল, "একটু খরচ কমিয়ে, কিছু পয়সা জমিয়ে কদিন পরে যাব।"

বউয়ের বুদ্ধির তারিফ করেছিল তাসানু। আর সত্যি-সত্যি সেদিন থেকে পয়সাও বাঁচাতে শুরু করে দিল তারা।

যেদিন অনেক পয়সা জমে গেল, সেদিন জঙ্গল থেকে কদিনের ছুটি নিয়ে তারা রওনা দিল। রওনা দিল তাকাজির দেশে। এবারও সেই তেমনি জুড়ি-ঘোড়ার এক্কাগাড়ি। তবে তাকাজির মতো তাসানু কিন্তু একা নয়। সঙ্গে তার ছেলে আর বউ। এক্কাগাড়ি বন্দরে পৌঁছলে, দুরন্ত সমুদ্রে ওদেরও জাহাজ ভেসে চলল। ওরা চলল আর-এক বন্দরে, তাকাজির দেশে। আঃ! কতদিন তাসানু তার তাকাজিকে দেখেনি। আবার দেখতে পাবে। তাকা বলে আনন্দে জড়িয়ে ধরবে। ভাবতেই তাসানুর সারা গায়ে যেন শিহরণ লাগে। আর কতদূর তাকাজির দেশের সেই বন্দর। ধৈর্য হারিয়ে ফেলে যেন তাসানু। কখন সে দেখা পাবে সেই বন্দরের।

দেখা পেয়েছিল তাসানু। দেখা পেয়েছিল সেই বন্দরের। কিন্তু পৌঁছতে পারেনি তার তাকাজির কাছে। পৌঁছবে কী করে? এ যে এক মস্ত শহর। এই শহরের কোন্ চত্বরে যে তার তাকার বাড়ি, সেটা খুঁজে বার করা কি সহজ কাজ! তাসানু ভেবেছিল, বন্দরে নামবে, কাউকে জিজ্ঞেস করবে, অমনি সে পৌঁছে যাবে সেই বাড়িতে। কিন্তু এ তো শহর। শহরে কে আর অন্যের খোঁজ রাখে! এখানে যেমন গিজগিজ করছে মানুষজন, তেমনি অগুনতি বাড়িঘর। রাস্তাঘাট, গাড়িঘোড়া, হৈ-হল্লা, হট্টমালার শহর যেন!

তাসানু তার ছেলে-বউকে নিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে ধাঁধায় পড়ে যায়! কোথায় যাবে, কাকে জিজ্ঞেস করবে? কেউ কথাও বলে না, চেয়েও দেখে না। কে তো কে! অথচ এমন করে বোকার মতো পথে-পথে কত ঘুরবে? শেষে তাসানু বউকে জিজ্ঞেস করল, "কী করা যায় বলো তো?"

বউ বলল, "ফিরে চলো।"

তাসানু বলল, "কিন্তু এত কষ্ট করে, এতটা পথ এসে তাকার সঙ্গে দেখা না-করে ফিরে যাব?"

"তা ছাড়া আর কী উপায় বলো! আমরা তো তার ঠিকানাই জানি না।"

সত্যি কথাই। তাসানুর সব জানা আছে, কিন্তু মানুষটার ঠিকানাই সে জানে না। সুতরাং সে বলল, "সে-ভুলটা, আমরা তাকে যেমন করে হোক খুঁজে বার করে, শুধরে নেব।"

অগত্যা বউ বলল, "তবে দ্যাখো চেষ্টা করে। কিন্তু সারাক্ষণ তো পথে-পথে ঘোরা যায় না।"

তাসানু বলল, "চলো একটা আস্তানা খুঁজি।"

পুজোর ছুটি

শ্যামলকান্তি দাশ

ফুলে ফুলে চারদিক
ছবি হয়ে আছে,
পুজো এসে উঁকি মারে
দরোজার কাছে।
কাঁই নানা কাঁই বাজে
কোটালপাড়ায়,
তিরতিরে রোদ কাঁপে
খোলা জানলায়।
শাপলার জঙ্গলে
জলপিপি হাসে,
ফড়িং খাবার খোঁটে
টিয়েরঙ ঘাসে।
আকাশ কী সাফসুফ,
তকতকে নীল,
খুশিতে উধাও দূরে
ঘুড়ির মিছিল।
শ্রীমান বাবুইবাবু
এ-সময় ঘরে,
ইসকুল-ব্যাগে জামা
পেন্টুল ভরে।
ফুর্তিতে দৌড়োয়
ডানপিটে ভুলো,
মেঝেতে গড়ায় রঙ-
পেনসিলগুলো।
আর আঁকাজোকা নয়,
এসে গেল ছুটি,
ঘণ্টা কয়েক বাদে
যেতে হবে উটি।

ছবি দেবাশিস দেব

শহরের আস্তানা মানে তো হোটেল। সুতরাং তারা একটা ছোটখাটো হোটেলেই উঠল। এতখানি পথ এসেছে তারা, জঙ্গল থেকে শহরে, অন্তত পথের সেই ধকলটা তো এখানে সামলাতে পারবে।

একটু পরে হোটেল থেকে তাসানু এবার একাই পথে বার হল তাকাজিকে খুঁজতে। পথঘাট তার একেবারে অচেনা। ঘোঁতঘাঁত কিচ্ছু জানে না। তবু সে নাছোড়বান্দা। খুঁজে তাকে পেতেই হবে।

কিন্তু পেল না তাসানু তার তাকার খোঁজ। এবার সে সত্যিই বিপদে পড়ে গেল। একদিন-দুদিন নয়, কদিন ধরেই তাসানু শহরের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াল। ঘুরতে-ঘুরতে তার পয়সাও ফুরিয়ে এল। এমনকী, তার সেই জঙ্গলের ঘরে ফিরে যাওয়ার পয়সাতেও টান পড়ল। কী করবে এখন তাসানু ?

বউ জিজ্ঞেস করল, "ফিরবে কী করে ? যে-কটা পয়সা আছে, কদিন পরে ফুরিয়ে গেলে, তখন ছেলেটাকে কী খেতে দেব ?"

তাসানু বলল, "বউ, ভয় পেয়ো না। গায়ে যতক্ষণ তাগদ আছে, ততক্ষণ তোমাদের না-খেয়ে থাকতে হবে না। কিছু না-পেলে মোট তো বইতে পারব।"

আজও পথে বার হল তাসানু। তবে আজ তাকার খোঁজে নয়, কাজের খোঁজে। সে বোধহয় বুঝতেই পেরেছে তাকার সঙ্গে আর দেখা হবে না। সুতরাং সে একা-একাই পথে হাঁটছিল আর ভাবছিল, এত লোকের মধ্যে সে কাকে বলবে তাকে একটা কাজ দেবার কথা। অবিশ্যি করাত টানতে-টানতে তাসানুর চেহারাটা এখন যা হয়েছে, যে-কোনো কাজই সে করতে পারে। যেমন লম্বা-চওড়া, তেমনি লোহার মতো পেটা-পেটা চমৎকার স্বাস্থ্য। কিন্তু স্বাস্থ্য দেখে আর কার মন গলবে যে, এক্ষুনি ডেকে তাকে কাজ দেবে !

কিন্তু সত্যি ঠিক এমনই এক কাণ্ড ঘটে গেল সেদিন। পথচলতি অনেক মানুষের মধ্যে একজন মানুষের নজর কেড়েছিল তাসানু। সত্যি বলতে কী, তাসানুকে দেখে লোকটি চমকে উঠেছিল। এবং তাসানু তার দৃষ্টির বাইরে চলে যাবার আগেই সে তাসানুকে ডাক দিল, "ও ভাই, একটু দাঁড়াবে ?"

তাসানু প্রথমটা খেয়ালই করেনি। মুখ ফিরিয়ে চলেই যাচ্ছিল। লোকটি আবার ডাকল, "তোমাকে ডাকছি ভাই, তোমাকে !"

"আমাকে ?" তাসানু উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ, তোমাকে।"

তাসানু এগিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, "কিছু বলবেন ?"

"না, তোমাকে একটু ভাল করে দেখব। ভারী চমৎকার স্বাস্থ্যটি তোমার।" বলে লোকটি তাসানুর কাঁধে হাত রাখল।

তাসানু কিছু না-বলে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে একটু হাসল।

"কী করা হয় ?" লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল।

"কিছু না।" তাসানু উত্তর দিল, "একটা কাজ খুঁজছি।"

"করবে একটা কাজ ?"

কথাটা শুনে থতমত খেয়ে গেছে তাসানু। এতক্ষণ ধরে পথে পথে সে তো কাজের জন্যেই ঘুরেছে। আর সেই কাজ এখন তার সামনে হাজির। যেন নিজের কান দুটোকে বিশ্বাসই করতে পারে না তাসানু। তাই খুব আগ্রহের সঙ্গেই সে বলল, "পেলে নিশ্চয়ই করব।"

লোকটি বলল, "আমি তোমায় কাজ দেব।"

"আপনি ?" যেন স্বপ্ন দেখছে তাসানু।

"কোথায় থাকো ?" জিজ্ঞেস করল লোকটি।

"এখানে থাকি না। থাকি অনেক দূরে। এখানে এসেছি আমার তাকাজির খোঁজে। কিন্তু খোঁজ পেলুম না। তাই ফিরে যাব ভাবছি। আপাতত এই শহরেরই এক হোটেলে আছি। সঙ্গে আছে বউ আর ছেলে।"

"আমি তোমায় যে-কাজটা দেব, সেটা কিন্তু খুব ভয়ঙ্কর কাজ।"

শুনে একটু যেন মুষড়ে গেল তাসানু। তবে কি লোকটি তাকে আবার কোনো বদ কাজে লাগিয়ে দেবে? সুতরাং তাসানু খুব স্পষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করল, "চুরি-ডাকাতি নয় তো?"

লোকটি হো-হো করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বলল, "না, না, সে-সব কিছু নয়।"

"তবে?" তবু তার মন থেকে সন্দেহ গেল না।

লোকটি উত্তরে বলল, "কাজটাকে ঠিক কাজ না-বললেও ক্ষতি নেই। কাজের বদলে এটাকে খেলা বললে মানায় ভাল।"

লোকটার কথাগুলো কেমন যেন হেঁয়ালির মতো শোনাল তাসানুর কানে। শেষকালে আবার আর-এক ফাঁদে পড়বে নাকি! তাই নিজের ভয়টাকে সে ভদ্রলোককে জানতে না-দিয়ে বলল, "যদি বলেন কাজটা কী ধরনের?"

"বুল-ফাইটিং জানো? মানে, বলদের সঙ্গে লড়াই করার কথা শুনেছ কখনো? কাজটা সেই বলদের সঙ্গে লড়াই। বলদের সঙ্গে লড়াই করে জিততে হবে তোমায়। আসলে এটা বলদ-মারার খেলা। খেলায় একবার যদি কোনোরকমে বীরত্ব দেখাতে পারো, তবে নাম তো হবেই, সেইসঙ্গে হবে অনেক পয়সা।"

তাসানু বলল, "আজ্ঞে, এমন খেলা তো আমার জানা নেই।"

"আমি তোমায় শিখিয়ে দেব। আমি বহুলোককে শিখিয়েছি এই খেলা। তারা এক-একজন তাবড়-তাবড় বুল-ফাইটার।"

তাসানু উত্তর দিল, "না-দেখলে আন্দাজে কেমন করে বলি?"

"তোমার এখন সময় আছে?" লোকটি জিজ্ঞেস করল।

তাসানু বলল, "হ্যাঁ, তা আছে।"

"তবে তুমি আমার সঙ্গে যেতে পারো। আমি এখন এমনই এক খেলার রিঙে যাচ্ছি। আজ একটা খুব হাড্ডাহাড্ডি লড়াই আছে। তুমি দেখলে বুঝতে পারবে।"

তাসানু ভদ্রলোকের সঙ্গে লড়াই দেখতে চলে গেল।

খেলা দেখে রাজি হয়ে গেল তাসানু। হ্যাঁ, সে বুল-ফাইটারই হবে। সেই লোকটির কাছে সে খেলা শিখতে শুরু করলে। তারপর? সে হয়ে উঠল এক ভয়ঙ্কর হিংস্র মানুষ। অনেক তার পয়সা।

এইখানেই তার ছেলে কুহা ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠেছিল। এইখানেই কুহা লেখাপড়া শিখল একটি-একটি ক্লাসে উঠে। এইখানেই তাসানু তার ছেলে কুহাকে বলেছিল, "তোকেও আমার মতো লড়াই করতে হবে বলদের সঙ্গে। আর তা যদি না-করিস, তবে তোকে মরতে হবে আমার হাতে।"

কুহা বলে, নিরীহ জীবকে সে হত্যা করতে পারবে না। এখানেই ছেলের কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তাসানু। আর তখন এখান থেকেই তার ছেলে কুহা বাবাকে ছেড়ে চলে যায়। আর ফিরে আসে না। তাসানু বুঝি বুঝতে পারে তার ভুল। সে ছুটে পালায় এ-শহর ছেড়ে। খুঁজে বেড়ায় তার ছেলেকে। খুঁজতে-খুঁজতে বুড়ো হয়ে গেল লোকটা। কতদিন হয়ে গেল। কত বছর। কিন্তু এখনও সে তার ছেলেকে খুঁজে পেল না। এখনও না।

॥ ৮ ॥

এখন দ্যাখো ওই মানুষটাকে। চিনতে পারছ? ওরই নাম তো তাসানু। যেন একটা পাগল। একমাথা ঝাঁকড়া চুল। গালভর্তি দাড়ি। কতদিন চান করেনি। হাতের নোখগুলো কী বিচ্ছিরি ময়লা। জামাটা শতচ্ছিন্ন। প্যান্টে তাপ্পিমারা। পায়ে জুতো নেই। ওই তো হেঁটে চলেছে। দ্যাখো, একদল কাক কেমন মাথায় উড়ে-উড়ে ওকে বিরক্ত করছে। ওকে দেখলেই যেন কাকগুলো পেয়ে বসে। কা-কা-কা। পালায় তাসানু।

কিন্তু পালাবে কোথায়? তার না আছে ঘর, না আছে দোর। পথে-পথেই সে পালিয়ে বেড়ায়। তারপর রাত যখন আসবে, কোনো পোড়োবাড়ির ভাঙা দেওয়ালের আড়ালে ঘুমিয়ে পড়বে। আঃ! রাত এলে নিশ্চিন্ত। অন্তত কাকের জ্বালাতন থেকে তো বাঁচে। কিন্তু তার বদলে আর-এক বিপদ। রাতের অন্ধকারে শীতটা এমন কামড়ে ধরে যে, বেচারা ঘুমুতেই পারে না। তবু তাকে পড়ে থাকতেই হবে অন্ধকারে। আর হেঁটে চলতে হবে দিনের আলোয় এখানে-ওখানে।

একদিন এমনি করেই হাঁটছিল সে। এমনি করে কাকের তাড়া খাচ্ছিল। এমনই সময়ে হঠাৎ যেন সে শুনতে পেয়েছিল এক গভীর জলের ছলাতকার। হ্যাঁ, একটু এগিয়ে সে দেখতে পেয়েছিল একটা নদী। মস্ত মস্ত পাথর ডিঙিয়ে ঠিক যেন ঝরনার মতো বয়ে যাচ্ছে ঢালু-পথে। সে আরও দেখল, এই পাথরের ওপর পা রেখে অথবা নদীর জলে পা ডুবিয়ে এপারের মানুষ ওপারে যাচ্ছে। আরও একটু এগিয়ে যেতে তাসানু দেখল, ঝরনার মতো এই নদী লাফ দিয়ে নীচে, আরও নীচে অঝোর ধারায় ঝরে যায়। নীচে, দুই পাহাড়ের মাঝে, আর-এক নদী। সে-নদীর জল আকাশভরা নীল। আর এ-নদীর জল কাচের মতো স্বচ্ছ। স্বচ্ছ জলের নদী নীল জলের বুকে পড়ে উথলে ওঠে। তার চারদিকে জলের বিন্দুগুলি যেন কুয়াশা। সেইদিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে তাসানু। তারপর হঠাৎ চমকে ওঠে। দেখে কী, ফুলের কুঁড়ির মতো দুটি ছোট্ট ছেলে। ছুটে যায় এই স্বচ্ছ নদীর পাথর ডিঙিয়ে, কিংবা জলে পা ভিজিয়ে। ছুটতে-ছুটতে তারা হাসে। দুই নদীর জলের কলতানের মতো সেও যেন এক বাজনা। ভারী মিষ্টি। স্থির হয়ে যায় তাসানুর চোখ। ভয় পায়, যদি পিছলে পড়ে। এগিয়ে যায় তাসানু। কিন্তু ওদের নাগাল পায় না। ওরা এই জলের মতোই কলকল করতে-করতে এপার থেকে ওপারে হারিয়ে গেল। তাসানুও বুঝি ছুটতে চায়। ছুটে-ছুটে ওদের দেখতে চায়। কিন্তু পারে না। কখনও জল খরস্রোত। কখনও বালি, গভীর খাদ। তাসানু ছুটতে গিয়ে হোঁচট খায়। না-হয় থমকে দাঁড়ায়। আবার ছোটে। যেন মানতে চায় না কোনো বাধা। সে যাবেই ওপারে। ওপারে সেই সবুজ গাছের অরণ্যে সে ঢুকেও পড়ল। উঁচু-নিচু পাহাড়ি পাথরের গায়ে-গায়ে যে গাছ বেড়ে উঠেছে, সে তার ফাঁকে চোখ মেলে উঁকি দিল। দেখে কী, গাছের সঙ্গে দুটি ঘোড়া বাঁধা! সাদা ধবধব করছে গায়ের রঙ। ছোট্ট। কিন্তু কী তেজিয়ান। তাসানু চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

একটুখানি দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই সে আবার চমকে উঠেছে। আবার সেই ছোট্ট ছেলেদুটির হাসির শব্দ সে শুনতে পেল। সে শব্দ দূর থেকে কাছে এগিয়ে আসছে। উত্তেজনায় দুরুদুরু বুক কাঁপছে তাসানুর। এখন কী করবে সে! ওই তো এসে পড়েছে ছেলেদুটি! তাদের দুজনেরই হাতে রাশরাশ সবুজ ঘাস। তাদের দেখে সে কী আনন্দ দুই ঘোড়ার। ছুটে গেল ছেলে দুটি। আদর করল ঘোড়া দুটিকে। মুখে ঘাস দিল।

একেবারে কাঠের মতো আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল তাসানু। কে ছেলেদুটি? ভেবে পাচ্ছিল না তাসানু। তাসানুর ছেলেটাও যখন ছোট ছিল, সে-ও ছিল এমনি। হাসি-খুশি, ছটফটে। সে-ও এমনি করে গাছের ফাঁকে-ফাঁকে ছুটত, খেলা করত। হাসতে-হাসতে তার মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ত। সে-দৃশ্য যেন এখনও সে দেখতে পায়। সেই দৃশ্যের কথা ভাবতে-ভাবতে এখন হঠাৎ এমন আচমকা হেসে ওঠে! এ কী! তাসানু নিজের মনে পাগলের মতো হেসে ওঠে কেন? এখনই ওরা শুনতে পাবে যে!

শুনতেই পেয়েছিল ছেলেদুটি। হকচকিয়ে গেছে। ভয় পেল নাকি! হয়তো। কেন না, তারা পেছন ফিরে তাকাল একবার! তারপর ঘোড়ার পিঠে লাফ দিয়ে মারল ছুট।

গাছের আড়াল থেকে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছে তাসানু। ছিঃ, ছিঃ, এ কী করল সে ! সে কি চিৎকার করে ওদের ডাক দেবে !

ডাকবে কী, ডাকার আগেই তারা পগারপার। তবে কি তারা তাসানুর ভয়ে হারিয়ে গেল ! বুকটা ছ্যাঁত করে ওঠে তাসানুর। না, এ হতে পারে না। এই অরণ্যের অন্ধকারে সে তাদের হারিয়ে যেতে দেবে না। কিছুতেই না।

কিন্তু কোথায় পাবে তাদের তাসানু ? খুঁজতে-খুঁজতে তো সে নিজেই হারিয়ে যাবে। যাক না। তাসানু তো অনেকদিন আগেই হারিয়ে গেছে। সুতরাং নতুন করে আর কী হারাবে ? তাই সে অরণ্যের গভীরে হাঁটতে লাগল।

কতক্ষণ আর পারবে সে হাঁটতে এই শরীরে ? পারে না। বসে পড়ে ! তারপর কেমন যেন ঝিমুতে লাগল ! তবু ভাল, এখানে কাকের ঝামেলা নেই। অবিশ্যি পাখির ডাক সে শুনতে পাচ্ছে। অরণ্যের গাছে-গাছে পাখি। এ-সব পাখি তো আর কাকের মতো ছ্যাঁচড়া নয়। ওরা নিজের নিয়েই আছে। গান গাইছে, আর নয়তো পাতার ফাঁকে লুকোচুরি খেলছে। কে কোথায় বসে-বসে ঝিমুচ্ছে, তা নিয়ে ওদের অত মাথা ব্যথা নেই।

কিন্তু তাসানুর মাথাটা কেমন যেন হঠাৎ ঝনঝন করে ওঠে। অরণ্যের ঝরে-পড়া পাতার ওপর যেন খসখস শব্দ শুনতে পায় তাসানু ! ভয় পায়। কোনো ভয়ঙ্কর জন্তু নাকি ! উঠে দাঁড়াল তাসানু। এমন শক্তি নেই যে, এক্ষুনি একটা গাছের ওপর উঠে পড়ে। ওকে বোধহয় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই মরতে হবে। কেন না, মনে হচ্ছে, জন্তুটা তার খুবই কাছে এগিয়ে আসছে। সুতরাং তাসানু একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইল।

একটু পরেই তার ভুল ভাঙল। সে দেখতে পেল, জন্তু নয়, একজন মানুষকে। দেখতে তারই মতো অথর্ব। হয়তো-বা তার চেয়েও বুড়ো। তারই মতো ঠুকঠুক করে হাঁটছে, পিটপিট করে চাইছে। তারই মতো মুখভর্তি দাড়ি ! নোংরা, ছেঁড়া চিরকুট জামা-প্যান্ট।

জন্তুর ভয়টা তাসানুর মন থেকে মুছে গেলেও, লোকটাকে দেখে কেমন যেন সন্দেহ হল। হওয়ারই কথা। এই নির্জন অরণ্যে হঠাৎ এ-সময়ে কেন ঘুরঘুর করছে লোকটা ! লোকটাকে দেখে তার সন্দেহ হলেও তেমন ভয় পাবার মতো কিছু মনে হল না। সুতরাং সে গাছের আড়ালে লুকিয়ে না-থেকে তার সামনে এসে দাঁড়াল। এবং এখন তার মনে হল, লোকটার সঙ্গে দুটো কথা বলে দেখা যেতে পারে লোকটার মতলব কী। তাই তাসানু তাকে উদ্দেশ করে গলাখাঁকারি দিল। লোকটা থমকে দাঁড়াল।

"এই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?" জিজ্ঞেস করল তাসানু।

সে বলল, "আমি কোথায় যাই সেটা বলার আগে আমি কি জিজ্ঞেস করতে পারি, তুমিই বা এখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কী কম্ম করছ ?"

তাসানু উত্তর দিল, "আমি কী করছি, সেটা তোমায় দেখতে হবে না। এখানে আমি যা খুশি করব। এ-বন আমার। এখানে তুমি কার হুকুমে ঢুকেছ ? জানো, আমি তোমায় এক্ষুনি গ্রেপ্তার করতে পারি !"

লোকটা তাসানুর কথা শুনে হ্যা-হ্যা করে হেসে উঠে বললে, "পাগল।" বলে, তাসানুর মুখের কাছে আরও খানিকটা এগিয়ে এসে, তার কোমর থেকে ধাঁ করে একটা ছুরি বার করে বললে, "আমি কে দেখতে পাচ্ছ ? আমি এই জঙ্গলের রাজা। এক্ষুনি তোমাকে ঘ্যাঁচ করে দেব।"

তাসানু থতমত খেয়ে গেছে। ছুরিটা দেখে নয়, লোকটার মুখ দেখে। দাড়িগোঁফের ভেতর দিয়ে লোকটার যেটুকু মুখ উঁকি মারছে, তাই দেখে ওর যেন লোকটাকে খুব চেনা-চেনা লাগছে ! কোথায় দেখেছি, কোথায় দেখেছি ভাবতে-ভাবতে সে একেবারে লোকটার মুখের কাছাকাছি চলে গেল। মুখের শব্দটাকে জিবের ডগায় সামলে রেখে হঠাৎ ভেবে বসল, লোকটা কি সেই গুড্ডাবাবা।

ঠিক তাই, এই-লোকটাই সেই গুড্ডাবাবা। তাসানুর মতো এই লোকটাও সব হারিয়ে, এখন বনের ভেতর লুকিয়ে-ছাপিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে !

কিন্তু আশ্চর্য, গুড্ডাবাবাও তাসানুকে চিনে ফেলেছে। সে আচমকা চিৎকার করে উঠেছে, "কালা-জুজু !" বলেই তাসানুর গলাটা খচ করে খামচে ধরে বললে, "ব্যাটা শয়তান, আমার টাকার বস্তা নিয়ে পালিয়ে এসে এখানে লুকিয়ে আছিস ? বার কর বস্তা।"

তাসানুও কি কমতি আছে ? খ্যাঁচ করে গুড্ডাবাবার পাকা দাড়ির গোছা খামচে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, "ছাড় ব্যাটা গুড্ডা, আমার গলা ছাড়। নইলে তোর দাড়ি উপড়ে ফেলব !"

কিন্তু কেউ ছাড়ে না। আঃ উঃ করতে-করতে দুজনেই খামচাখামচি লাগিয়ে দিলে। শেষে ফশ করে তাসানু তার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে মার ছুট। কিন্তু ছুটতে পারলে তবে তো ! তার আগেই গুড্ডাবাবা ছুরি উঁচিয়ে তার সামনে হাজির ! হাঁপাচ্ছে। হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, "এখন আর পালাবি কোথায় ? এতদিন তো পালিয়ে বেড়িয়েছিস। এবার বার কর বস্তা। নইলে এই ছুরি দিয়ে তোর কম্ম শেষ করে দেব।"

তাসানু ঢোক গিলতে শুরু করে দিলে। পালাবার ফন্দি খুঁজছে সে। কিন্তু কোথায় পালাবে ? অবিশ্যি এই বনে-জঙ্গলে একটা সুবিধে এই, একবার যদি ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়তে পারো, তো ব্যস, কেল্লা ফতে ! তখন আর খুঁজে বার করতে হচ্ছে না। কিন্তু তেমন কোনো ঝোপঝাড় নজরেই পড়ছে না তাসানুর। অথচ বিপদ ঘনিয়ে আসছে। সুতরাং সে ভাবল, মরতেই যখন হবে, তখন আর ভয় পেয়ে কী লাভ। চোখের পলকে সে গুড্ডার ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ধাঁই করে ধাক্কা খেতেই গুড্ডার হাত থেকে ছুরিটা গেছে ছিটকে ! তারপর লেগে গেল কোস্তাকুস্তি দুজনের মধ্যে। কিন্তু দুই বুড়োই তো বেতোরুগি। দুজনেই বাতের ব্যথায় কাতরায়। তবু চালিয়ে যায়।

শেষে দুজনেই কাত। দুজনেরই হাঁপ ধরে গেল। দুজনেই দুপাশে চিতপাত হয়ে ফোঁস-ফোঁস করতে লাগল।

হয়তো বয়সটা একটু কম বলে তাসানুই প্রথম হাত-পা ঝেড়ে ওঠবার চেষ্টা করে। কিন্তু উঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ ! ব্যথার চোটে প্রাণ যায় রে বাবা ! তবু তাকে উঠতে হবে। অন্তত লোকটার পাল্লা থেকে শটকে পড়তে না-পারলে তার ঘোর বিপদ। তাই শত কষ্ট সহ্য করে সে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়াতেই তার নজরে পড়ে গেল, গুড্ডাবাবার হাত-ফসকানো সেই ছুরিটা। তুলে নিল। ছুড়ে ফেলে দিল গভীর জঙ্গলে। তারপর সেখান থেকে মার দৌড় !

গুড্ডাবাবাও উঠে পড়েছে। সে-ও তাড়া লাগাল। সে-ও চিৎকার শুরু করে দিল। কিন্তু তাসানুও লুকিয়ে-ছাপিয়ে খুঁজতে লাগল বাঁচার পথ।

একটা পথ সে পেল। বন থেকে পালাবার পথ। সেই পথে সে পা বাড়াল। সেখান থেকে সে জনপদে পড়ল। কিন্তু গুড্ডাবাবার নজর সে এড়াতে পারল না। সে-ও তার পিছু নিয়েছে। তবে কি তাসানু শেষ পর্যন্ত ধরা পড়বে লোকটার হাতে ?

না। তাসানুর চোখের সামনে একটা পাঁচিল-ঘেরা মস্ত বাগান। বাগানের মধ্যে একটা কী সুন্দর ছবির মতো ছোট্ট বাড়ি ! বাঁচতে হলে তাসানুকে এখন এই বাগানেই ঢুকে পড়তে হয় ! সে বাগানের ফটক ঠেলে সত্যিই ঢুকে পড়ল। তারপর ঝটপট ফটকটা আবার বন্ধ করে, আগলটা লাগিয়ে দিলে। কে জানে, গুড্ডাবাবা তাকে এই

বাগানে ঢুকতে দেখেছে কি না। হয়তো দেখেছে। কিন্তু এখন তো তাসানু বেঁচে গেছে। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল তাসানু। উঃ, কী ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যেই না পড়েছিল। কিন্তু এখানেই বা সে কতক্ষণ থাকতে পারবে। এখনই তো সে ধরা পড়বে। তাই তাসানু আগুপিছু কিচ্ছু না-ভেবে বাগানের আরও ভেতরে ঢুকে পড়ল। মতলব একটা যদি তেমন ঘুপচিমতো জায়গা পায়, সেখানেই লুকিয়ে পড়বে। অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে। তেমনই একটা জায়গা সে খুঁজতে লাগল।

তেমন জায়গা সে দেখতে পেল না। কিন্তু যা দেখতে পেল, তা দেখে থমকে যায় তাসানু। দেখতে পেল, বাগানভর্তি যত ফুল, তত পাখি। যত হরিণ, তত খরগোশ। যতগুলো বলদ দেখে, তার বেশি দেখে ঘোড়া। বাগানের মাঝখানে মস্ত পুকুরটায় যত মাছ, তত হাঁস। অবাক হয়ে দেখতে-দেখতে তাসানু নিজের কথা ভুলেই বসল। সে লোভ সামলাতে পারল না। একটা বলদের গায়ে সে হাত দিল। আহা রে! এমন নিরীহ বলদ সে কত মেরেছে!

"এই, ওখানে কে দাঁড়িয়ে আছো?" কে যেন আচমকা ধমক মেরে হাঁক পাড়ল। সে বোধহয় বাগানের মালি।

বুকটা ধক করে ওঠে তাসানুর। তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়ল সে একটা গাছের ফাঁকে। কিন্তু পারল না মালির চোখ এড়াতে। মালি দৌড়ে এসে ধরে ফেলল তাসানুকে। ভয়ে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল তাসানু, "আমায় মেরো না বাবা, আমি চোর নই।"

লোকটা আবার ধমকাল, "কেন ঢুকেছ এখানে?"

"বুঝতে পারিনি বাবা।"

"চোর কোথাকার, বুঝতে পারিনি!" মালি তার ঘাড় ধরে মারলে এক হ্যাঁচকা।"

শুনতে পেয়েছিল বাগানের মালিক। বাড়ির দরজা ঠেলে সে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এল। ওখান থেকেই চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কী হয়েছে মালি?"

"আজ্ঞে একটা চোর ঢুকেছে।"

"চোর।" অবাক হল মালিক। বলল, "মেরো না। দাঁড়াও, আমি

যা বৃষ্টি !

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বৃষ্টি পড়ে, বৃষ্টি পড়ে,
ওই গাঁয়ে আর এই শহরে।
খেত-খামারে, গাছের পাতায়,
ঝুপসি বুড়োবটের মাথায়,
পুকুর, ডোবা, ময়লা খালে,
বসতবাড়ির টিনের চালে।
লেবুর পাতায় করমচা,
যা বৃষ্টি, পালিয়ে যা !

বৃষ্টি পড়ে, বৃষ্টি পড়ে,
ওই গাঁয়ে আর এই শহরে।
ধর্মতলায়, গড়ের মাঠে
লোকজনেরা সাঁতার কাটে।
শ্যামবাজারে, কোমর-জলে
গলির মধ্যে নৌকো চলে।
বাবুরা খায় গরম চা,
যা বৃষ্টি, পালিয়ে যা !

যায় বৃষ্টি, পালিয়ে যায়,
আয় রোদ্দুর, দৌড়ে আয় !
আকাশটা হোক দারুণ নীল,
ছড়াক ডানা শঙ্খচিল।
ঘাসের ডগায় হিরের দুল,
হলুদ-বোঁটা শিউলি ফুল।
ভর্তি এখন দোকানপাট,
পুজোর বাজার জমজমাট।

ছবি দেবাশিস দেব

যাচ্ছি।"

তাসানু প্রায় কেঁদে উঠল, "আমায় ছেড়ে দাও। আমি চোর নই।"

বাড়ির মালিক তাসানুর সামনে এসে দাঁড়াল। থমকে চাইল। সে যেন হতচকিত। ব্যস্ত হয়ে মালিকে বলল, "তোমার হাতটা ওর ঘাড় থেকে সরিয়ে নাও মালি, সরিয়ে নাও।"

মালি হাত সরিয়ে নিল।

মালিক আরও কিছুক্ষণ চোখ সরাল না তাসানুর মুখের ওপর থেকে। দৃষ্টি তার স্থির। তারপর অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞেস করল, "কে তুমি ?"

তাসানু আবার বলল, "আমি চোর নই বাবা।"

"কী তোমার নাম ?" ব্যস্ত হয়েই সে জিজ্ঞেস করল।

"বাবা আমার আদর করে নাম রেখেছিল তাসানু। যেদিন আমি আমার বুড়ো বাপ-মাকে দুঃখ দিয়ে ঘর থেকে পালাই, সেদিন আমার নাম হল, কালা-জুজু।"

"একসময় তুমি করাত দিয়ে কাঠ কেটে পয়সা উপায় করতে ?"

"হ্যাঁ বাবা।" অবাক হয়ে উত্তর দিল তাসানু।

"তুমি বলদের সঙ্গে লড়াই করতে ?"

"তুমি কেমন করে জানলে বাবা ?"

"তুমি ছেলের নাম রেখেছিলে কুহা ?"

"হ্যাঁ, হ্যা, কুহা," ভারী ব্যস্ত হয়ে উঠল তাসানু, "তাকে আমি খুঁজছি, কতদিন ধরে খুঁজছি।"

"আমায় তুমি চিনতে পারছ ?"

"তেমন করে তো চোখে দেখতে পাই না।"

"আমার কাছে এগিয়ে এসো। ভাল করে দ্যাখো !"

"কই, চিনতে পারছি না তো !"

"আর-একটু কাছে এসো।"

তাসানু এগিয়ে গেল কাছে, আরও একটু কাছে। তারপর অপলকে চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগল। দেখতে-দেখতে হঠাৎ যেন তার ঠোঁটদুটি থরথর করে কেঁপে উঠল। উত্তেজনায় বুকটা তার ধড়ফড় করতে লাগল। সে হাঁপাতে লাগল। তারপর আচমকা চিৎকার করে তাকে জড়িয়ে ধরল, "আমার কুহা, আমার কুহা !" তারপর হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলল।

সেই বাগানের মালিক, সেই ফুল আর পাখির মালিক, সেই বলদ আর ঘোড়ার মালিক, সেই হাঁস আর হরিণের মালিক কুহা, তার চোখেও নিঃশব্দে অশ্রু ঝরে যায়। কুহা ভালবেসেছে পৃথিবীর সব প্রাণীকে। আর এতদিন তার বাবার বুকের মধ্যে যে-ভালবাসা জমাট বেঁধে ছিল, সেই ভালবাসা আজ ভেঙে-ভেঙে ঝরে পড়ছে তারই বুকে। বাবা আর ছেলে দুজনেই কাঁদে। কাঁদে না শুধু পাখিরা, কিংবা হরিণ অথবা বলদ। হাঁস কিংবা খরগোশ। কারণ তারা জানে ওই বাবা আর ছেলের মতো এ-পৃথিবীটা তাদেরও।

এমনই সময় দুটি ছেলে ছুটে গেল বাগানের ভেতর দিয়ে খলখল করে হাসতে-হাসতে। তাসানু চমকে তাকায়। চিনতে পারে। এই তো সেই ছেলে দুটি। ঘোড়ায় চড়ে অরণ্যে ছুটে পালাল ! তাসানু নিজের চোখের অশ্রু মুছে ফেলে, দেখতে-দেখতে অস্ফুটস্বরে বলে উঠল, "কে ওরা ?"

"আমার ছেলে," উত্তর দিল কুহা।

চিৎকার করে হেসে উঠল তাসানু। হাসতে-হাসতে ছেলের বুকে মাথা রাখল। তাকিয়ে রইল ওইদিকে, ওই নতুন দুটি মানুষের দিকে। আর মনে-মনে ভাবতে লাগল, "আহা ! পৃথিবীটা আমাদের সকলের বলেই বুঝি এত সুন্দর।" তারপর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ছেলেকে জড়িয়ে ধরল।

কুহার ছেলেদুটিও তখনও হাসছে। শোনা যাচ্ছে সেই হাসির শব্দ। যেন বাতাসের মতো ফুরফুরে সেই হাসির কলতান।

মা আমায় বলতে পারো কেন তুমি যুদ্ধ করো?

সে অনেক দিন আগেকার কথা। একবার অসুর দেবতাদের ভীষণ মারধোর করছিল। দেবতারা তো মহা বিরক্ত। শেষে সকলে একজোট হয়ে তৈরি করল এক মহাশক্তি। আমি সেই মহাশক্তি!

শুরু হল যুদ্ধ। কিন্তু অসুর কি আর আমাদের সঙ্গে পারে? সে চালাকি করে মোষের রূপ ধারণ করল। তখন আমার দশ হাতে দশ রকমের অস্ত্র। ঝাঁপিয়ে পড়লাম মোষের উপর। দিলাম গলাটা কেটে। অসুর যেই পড়ি-কি-মরি করে বেরিয়ে আসছে তক্ষুণি ত্রিশূল ছুঁড়ে মারলাম। আমার সিংহ তো অসুরকে ছিঁড়ে খায় আর কি! অসুর বধ হল। আবার শান্তি ফিরে এলো।

বাঃ বেশ তোমার অসুরবধের গপ্পো! তবে এই কজনই শুধু তোমার সৈন্য?

না না, এরাই আমার ছেলেমেয়ে। ঐ যে ময়ূর চড়ে, সে আমার ছেলে কার্তিক–বীরযোদ্ধা। গণেশ–সিদ্ধিদাতা। বিদ্যাবতী সরস্বতীকে তো চেনোই। ঝাঁপি নিয়ে লক্ষ্মী–সম্পদ ও সঞ্চয়ের দেবী। বাড়িতে মায়ের নিশ্চয়ই লক্ষ্মীর ঝাঁপি আছে। তাতে তোমরাও যদি একটু একটু করে টাকা জমাও, দেখবে একদিন অনেক টাকা জমে গেছে–জীবনে অনেক কাজে লাগবে। পরের বছর আবার এসে দেখবো কত জমালে তোমরা!

REGD. NO. WB/CC-264 MH-BY-SOUTH 683